শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

স্বামী সারদানন্দ



প্রথম খণ্ড

১.১. ভূমিকা

ঈশ্বরকৃপায় আবির্ভাব-প্রয়োজনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যজীবনের সবিস্তার বিবরণ প্রকাশিত হইল। নানা লোকের মুখ হইতে তাঁহার ঐ কালের ঘটনাসমূহ অসম্বদ্ধভাবে শ্রবণ করিয়া আমাদিগের চিত্তে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, পাঠককে তাহার সহিত পরিচিত করিতেই আমরা ইহাতে সচেষ্ট হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আমাদিগকে ঘটনাবলীর সময়নিরূপণে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিলেও কোন কোন স্থলে উহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা ও অগ্রজ প্রভৃতির জন্মকোষ্ঠীসকল প্রদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকালে তাঁহার পিতার বয়স ৬১/৬২ বৎসর ছিল', 'তাঁহার অগ্রজ রামকুমার তাঁহার অপেক্ষা ৩১/৩২ বৎসরের বড় ছিলেন', এইভাবে সময় নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে সন ও তারিখ আমরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম, তৎসম্বন্ধে যে কোন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই, ইহা পাঠক 'মহাপুরুষের জন্মকথা' নামক এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায় পাঠ করিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার স্বীয় উক্তি হইতেই আমরা উহা নিরূপণে সক্ষম হইয়াছি, সুতরাং ঐ বিষয়ের জন্য তিনিই স্বরূপতঃ সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থস্থ ঘটনাবলীর অনেকগুলিই আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের লীলাবলী লিপিবদ্ধ করিবার প্রারম্ভে আমরা তাঁহার বাল্য ও যৌবনের ঘটনাসমূহকে যে এত বিশদ এবং সম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিব, এরূপ আশা করি নাই। সুতরাং, যিনি মূককে বাগ্মী করিতে এবং পঙ্গুকে বিশালগিরি-উল্লঙ্ঘন-সামর্থ্য-প্রদানে সক্ষম, একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই উহা সম্ভবপর হইল ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, পাঠক বর্তমান গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে 'সাধকভাব' ও 'গুরুভাব' গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকাল হইতে সন ১২৮৭ সাল বা ইংরাজী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার জীবনেতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। ইতি –

প্রণত

গ্রন্থকার

১.২. অবতরণিকা

ধর্মই ভারতের সর্বস্ব

ভারত ও তদিতর দেশসমূহের আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাসসকল তুলনায় আলোচনা করিলে, উহাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ উপলব্ধি হয়। দেখা যায়, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসকলকে ধ্রুবসত্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিতে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত নিজ সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছে এবং ঐরূপ সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিকেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের চরম সীমারূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। উহার সমগ্র চেষ্টা এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকতায় চিরকালের জন্য রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

মহাপুরুষসকলের ভারতে প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণই ঐরূপ হইবার কারণ

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সকলে ঐরূপ একান্ত অনুরাগ কোথা হইতে উপস্থিত হইল, এ কথার মূল-অন্বেষণে বুঝিতে পারা যায়, দিব্যগুণ এবং প্রত্যক্ষসম্পন্ন পুরুষসকলের ভারতে নিয়ত জন্মগ্রহণ করাই উহার একমাত্র কারণ। তাঁহাদিগের বিচিত্র দর্শন ও অসাধারণ শক্তি-প্রকাশ সর্বদা প্রত্যক্ষ এবং আলোচনা করিয়াই সে ঐসকলে দৃঢ়বিশ্বাস এবং অনুরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে বহু প্রাচীনকাল হইতে আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া, প্রত্যক্ষ ধর্মলাভরূপ লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অদৃষ্টপূর্ব, অভিনব সমাজ এবং সামাজিক প্রথাসকল সৃজন করিয়াছিল। জাতি এবং সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রকৃতিগত গুণাবলম্বনে দৈনন্দিন কর্মসকলের অনুষ্ঠানপূর্বক ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া যাহাতে চরমে ধর্মলাভ বা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে পারে, ভারতের সমাজ একমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম এবং প্রথাসকল যন্ত্রিত করিয়াছিল। পুরুষানুক্রমে বহুকাল পর্যন্ত ঐসকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসাতেই ভারতে ধর্মভাবসকল এখনও এতদূর সজীব রহিয়াছে, এবং তপস্যা, সংযম ও তীব্র ব্যাকুলতা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই যে জগৎকারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার সহিত নিত্য-যুক্ত হইতে পারে, ভারতের প্রত্যেক নরনারী এ কথায় এখনও দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া রহিয়াছে।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরে ভারতের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত—উহার প্রমাণ

শ্রীভগবানের দর্শনলাভের উপরেই যে ভারতের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, একথা সহজেই অনুমিত হয়। ধর্মসংস্থাপক আচার্যগণকে বৈদিক যুগ হইতে আমরা যে-সকল পর্যায়ে নির্দেশ করিয়াছি, সেইসকল বাক্যের অর্থ অনুধাবন করিলেই ঐ কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে, যথা—ঋষি, আপ্ত, অধিকারী বা প্রকৃতি-লীন পুরুষ ইত্যাদি। অতীন্দ্রিয় পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহারা ঐসকল নামে নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন, একথা নিঃসন্দেহ। বৈদিক যুগের ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের অবতার-প্রথিত পুরুষসকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত কথা সমভাবে বলিতে পারা যায়।

ভারতে অবতারবিশ্বাস উপস্থিত হইবার কারণ ও ক্রম। সাংখ্যদর্শনোক্ত ‘কল্পনিয়ামক ঈশ্বর’

আবার বৈদিক যুগের ঋষিই যে, কালে পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৈদিক যুগে মানব কতকগুলি পুরুষকে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থসকল দর্শন করিতে সমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয়ের শক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে একমাত্র ‘ঋষি’-পর্যায়ে নির্দেশ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কালে মানবের বুদ্ধি ও তুলনা করিবার শক্তি যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ততই সে উপলব্ধি করিতে লাগিল—ঋষিগণ সকলেই সমশক্তিসম্পন্ন নহেন; আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহাদিগের কেহ সূর্যের ন্যায়, কেহ চন্দ্রের ন্যায়, কেহ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, আবার

কেহ বা সামান্য খদ্যোতের ন্যায় দীপ্তি প্রদানপূর্বক জ্যোতিষ্মান হইয়া রহিয়াছেন। তখন ঋষিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মানবের চেষ্টা উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয়কে সে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশে বিশেষ সামর্থ্যবান বা ঐ শক্তির বিশেষভাবে অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ঐরূপে দার্শনিক যুগে কয়েকজন ঋষি 'অধিকারি-পুরুষ'-পর্যায়ে অভিহিত হইলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহবান সাংখ্যকার আচার্য কপিল পর্যন্ত ঐরূপ পুরুষসকলের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারেন নাই; কারণ, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকে কে কবে সন্দেহ করিতে পারে? সুতরাং শ্রীভগবান কপিল ও তৎপদানুসারী সাংখ্যাচার্যগণের গ্রন্থে 'অধিকারি-পুরুষ'-সকলকে 'প্রকৃতি-লীন'-পর্যায়ে অভিহিত হইয়া স্থান প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। ঐরূপ অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষসকলের উৎপত্তিবিষয়ে কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন –

পবিত্রতা, সংযমাদিগুণে ভূষিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানলাভে সমর্থ হইলেও ঐরূপ পুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধন-বাসনা তীব্রভাবে জাগরিত থাকে, সেজন্য তাঁহারা অনন্তমহিমামণ্ডিত স্ব-স্বরূপে কিয়ৎকাল লীন হইতে পারেন না; কিন্তু ঐ বাসনাবলে সর্বশক্তিমতী প্রকৃতির অঙ্গে লীন হইয়া তাঁহারা তাঁহার শক্তিসমূহকে নিজ শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, এবং ঐরূপে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন হইয়া এক কল্পকাল পর্যন্ত অশেষ প্রকারে জনকল্যাণসাধনপূর্বক পরিণামে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন।

'প্রকৃতি-লীন' পুরুষসকলের মধ্যে শক্তির তারতম্যানুসারে সাংখ্যাচার্যগণ আবার দুই শ্রেণীর নির্দেশ করিয়াছেন, যাহা–'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' ও 'ঈশ্বর-কোটি'।

ভক্তি-যুগের বিরাট ব্যক্তিত্ববান ঈশ্বর

দার্শনিক যুগের অন্তে ভারতে ভক্তি-যুগের বিশেষভাবে আবির্ভাব হইয়াছিল। বেদান্তের তীব্র নির্ঘোষে ভারত-ভারতী তখন সর্ব ব্যক্তির সমষ্টিভূত এক বিরাটব্যক্তিত্ববান ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া কেবলমাত্র অনন্যভক্তিসহায়ে তাঁহার উপাসনায় জ্ঞান এবং যোগের পূর্ণতাপ্রাপ্তি-বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যদর্শনোক্ত 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বরকে' তখন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাববিশিষ্ট বিরাট ব্যক্তিত্ববান ঈশ্বরের আংশিক বা পূর্ণ প্রকাশে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। ঐরূপেই পৌরাণিক যুগে অবতারবিশ্বাসের উৎপত্তি এবং বৈদিক যুগের বিশিষ্টগুণশালী ঋষির ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতি অনুমিত হয়। অতএব, স্পষ্ট বুঝা যায়, অসাধারণ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষসকলের আবির্ভাবদর্শনেই ভারত ক্রমে ঈশ্বরাবতারত্বে বিশ্বাসবান হইয়াছিল, এবং ঐরূপ মহাপুরুষসকলের অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অনুভবাদির উপরেই ভারতীয় ধর্মের সুদৃঢ় সৌধ ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া তুষারমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় গগন স্পর্শ করিয়াছিল। ঐরূপ পুরুষসকলকে ভারত মনুষ্যজীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যলাভে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া 'আপ্ত'-সংজ্ঞায় নির্দেশপূর্বক তাঁহাদিগের বাণীসমূহে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া 'বেদ' শব্দে অভিহিত করিয়াছিল।

অবতারবিশ্বাসের অন্য কারণ–গুরূপাসনা

বিশিষ্ট ঋষিগণের ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতির অন্য প্রধান কারণ–ভারতের গুরু-উপাসনা। বেদোপনিষদের যুগ হইতেই ভারত-ভারতী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানদাতা আচার্য গুরুর উপাসনা করিতেছিল। ঐ পূজোপাসনাই তাহাদিগকে কালে দেখাইয়া দেয় যে, মানবের ভিতর অতীন্দ্রিয় ঐশী শক্তির আবির্ভাব না হইলে সে কখনও গুরুপদবীগ্রহণে সমর্থ হয় না। সাধারণ মানবজীবনের স্বার্থপরতা এবং যথার্থ গুরুগণের অহেতুক করুণায় লোকহিতাচরণ তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে প্রথমে এক বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর মানবজ্ঞানে পূজা করিতে থাকে। পরে আস্তিক্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদিগের মনে ঘনীভূত হইয়া যথার্থ গুরুগণের অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ তাহারা যত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাঁহাদিগের দেবত্বে তাহারা ততই দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা এতকাল ধরিয়া

শ্রীভগবানের করুণাপূর্ণ দক্ষিণামূর্তির নিকট যে সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিল—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"—গুরুগণের ভিতর দিয়া তাহাই এখন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীভগবানের করুণাই মূর্তিমতী গুরুশক্তিরূপে তাহাদিগের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে।

বেদ এবং সমাধি-প্রসূত দর্শনের উপর অবতারবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত

আবার গুরূপাসনায় মানবমন যখন এতদূর অগ্রসর হইল, তখন যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ঐ শক্তির বিশেষ লীলা প্রকটিত হইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের জ্ঞানপ্রদা দক্ষিণামূর্তির সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ঐরূপে আচার্যোপাসনা কালে ভারতে অবতারবাদের আনয়নে ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব, অবতারবাদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি পৌরাণিক যুগে উপস্থিত হইলেও, উহার মূল যে বৈদিক যুগ পর্যন্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহা আর বলিতে হইবে না। বেদ, উপনিষদ্ এবং দর্শনের যুগে মানব ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, পৌরাণিক যুগে সেই সকলই স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া অবতারবিশ্বাসরূপে অভিব্যক্ত হইল। অথবা, সংযম তপস্যাদিসহায়ে ঔপনিষদিক যুগে মানব 'নেতি নেতি'-মার্গে অগ্রসর হইয়া নির্গুণব্রহ্মোপাসনায় সাফল্যলাভপূর্বক সমাধিরাজ্য হইতে বিলোমমার্গাবলম্বনে অবতরণ করিয়া সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া যখন দেখিতে সমর্থ হইল, তখনই সগুণ বিরাট ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রেম-ভক্তি উপস্থিত হইয়া, সে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল—এবং তখনই সে তাঁহার গুণ, কর্ম, স্বভাবাদি সম্বন্ধে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিশেষভাবে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশ্বাসবান হইল।

ঈশ্বরের করুণার উপলব্ধি হইতেই পৌরাণিক যুগে অবতারবাদ-প্রচার

পূর্বে বলা হইয়াছে, পৌরাণিক যুগেই ভারতে অবতারবিশ্বাস বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। ঐ যুগের আধ্যাত্মিক বিকাশে নানা দোষ উপলব্ধ হইলেও, একমাত্র অবতার-মহিমা-প্রকাশে উহার বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কারণ, অবতার-বিশ্বাস আশ্রয় করিয়াই মানব সগুণব্রহ্মের নিত্যলীলাবিলাস বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা হইতেই সে বুঝিয়াছে যে, জগৎকারণ ঈশ্বরই আধ্যাত্মিক জগতে তাহার একমাত্র পথপ্রদর্শক; এবং উহা হইতেই তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, সে যতকাল পর্যন্ত যতই দুর্নীতিপরায়ণ হউক না কেন, শ্রীভগবানের অপার করুণা তাহাকে কখনই চিরদিন বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে দিবে না—কিন্তু বিগ্রহবতী হইয়া উহা যুগে যুগে আবির্ভূত হইবে এবং তাহার প্রকৃতির উপযোগী নব নব আধ্যাত্মিক পথসমূহ আবিষ্কারপূর্বক তাহার পক্ষে ধর্মলাভ সুগম করিয়া দিবে।

অবতারপুরুষের দিব্যস্বভাব-সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির সারসংক্ষেপ

অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষসকলের দিব্যজন্মকর্মাদি সম্বন্ধে স্মৃতি ও পুরাণসকলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। তাঁহারা বলেন, অবতারপুরুষ ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান। জীবের ন্যায় কর্মবন্ধনে তিনি কখনও আবদ্ধ হয়েন না। কারণ, জন্মাবধি আত্মারাম হওয়ায় পার্থিব ভোগসুখলাভের জন্য জীবের ন্যায় স্বার্থচেষ্টা তাঁহার ভিতর কখনও উপস্থিত হয় না, শরীরধারণপূর্বক তাঁহার সমগ্র চেষ্টা অপরের কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। আবার, মায়ার অজ্ঞানবন্ধনে কখনও আবদ্ধ না হওয়ায় পূর্ব পূর্ব জন্মে শরীরপরিগ্রহ করিয়া তিনি যে-সকল কর্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সকলের স্মৃতি তাঁহাতে লুপ্ত হয় না।

অবতারপুরুষের অখণ্ড স্মৃতিশক্তি

প্রশ্ন হইতে পারে, ঐরূপ অখণ্ড স্মৃতি কি তবে তাঁহাতে আশৈশব বিদ্যমান থাকে? উত্তরে পুরাণকার বলেন, অন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও শৈশবে তাঁহাতে উহার প্রকাশ থাকে না; কিন্তু শরীর-মনোরূপ যন্ত্রদ্বয় সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইবামাত্র স্বল্প বা বিনায়াসে উহা তাঁহাতে উদিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রত্যেক চেষ্টাসম্বন্ধেই ঐকথা বুঝিতে হইবে; কারণ, মনুষ্যশরীরধারণ করায় তাঁহার সকল চেষ্টা সর্বথা মনুষ্যের ন্যায় হয়।

অবতারপুরুষের নবধর্ম স্থাপন

ঐরূপে শরীর-মন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবামাত্র অবতারপুরুষ তাঁহার বর্তমান জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক্ অবগত হন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্যই তাঁহার আগমন হইয়াছে। আবার ঐ উদ্দেশ্য সফল করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা কোথা হইতে অচিন্ত্য উপায়ে তাঁহাদিগের নিকট স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। মানবসাধারণের নিকট যে পথ সর্বদা অন্ধকারময় বলিয়া উপলব্ধ হয়, তিনি সেই মার্গে উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হন এবং উদ্দেশ্যলাভে কৃতার্থ হইয়া জনসাধারণকে সেই পথে প্রবর্তিত করেন। ঐরূপে মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপের এবং জগৎকারণ ঈশ্বরের উপলব্ধি করিবার অদৃষ্টপূর্ব নূতন পথসমূহ তাঁহার দ্বারা যুগে যুগে পুনঃপুনঃ আবিষ্কৃত হয়।

অবতারপুরুষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি

অবতারপুরুষের গুণ, কর্ম, স্বভাবাদির ঐরূপে নির্ণয় করিয়াই পুরাণকারেরা ক্ষান্ত হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল পর্যন্ত স্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সনাতন সর্বজনীন ধর্ম যখন কালপ্রভাবে গ্লানিযুক্ত হয়, যখন মায়াপ্রসূত অজ্ঞানের অনির্বচনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহকাল এবং পার্থিব ভোগসুখলাভকেই সর্বস্ব জ্ঞানপূর্বক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে এবং আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় নিত্য পদার্থসকলকে কোন এক ভ্রমান্ধ যুগের স্বপ্নরাজ্যের কবিকল্পনা বলিয়া ধারণা করিয়া বসে—যখন ছলে-বলে-কৌশলে পার্থিব সর্বপ্রকার সম্পদ ও ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিয়াও সে প্রাণের অভাব দূর করিতে না পারিয়া অশান্তির অন্ধতমসাবৃত অকূল প্রবাহে নিপতিত হয় এবং যন্ত্রণায় হাহাকার করিতে থাকে—তখনই শ্রীভগবান স্বকীয় মহিমায় সনাতন ধর্মকে রাহুগ্রাসমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলেন এবং দুর্বল মানবের প্রতি কৃপায় বিগ্রহবান হইয়া তাহার হস্তধারণপূর্বক তাহাকে পুনরায় ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ না থাকিলে কার্যের উৎপত্তি কখন সম্ভবপর নহে—তদ্রূপ সর্বজনীন অভাব দূরীকরণরূপ প্রয়োজন না থাকিলে ঈশ্বরও কখন লীলাচ্ছলে শরীরপরিগ্রহ করেন না। কিন্তু ঐরূপ কোন অভাব যখন সমাজের প্রতি অঙ্গকে অভিভূত করে, শ্রীভগবানের অসীম করুণাও তখন ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে জগদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইতে প্রযুক্ত করে। ঐরূপ প্রয়োজন দূর করিতে ঐরূপ লীলাবিগ্রহের বারংবার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই যে পুরাণকারেরা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

বর্তমানকালে অবতারপুরুষের পুনরাগমন

অতএব দেখা যাইতেছে, নবীন ধর্মের আবিষ্কর্তা জগদ্‌গুরু, সর্বজ্ঞ অবতারপুরুষ যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্যই আবির্ভূত হন। ধর্মক্ষেত্র ভারত নানা যুগে বহুবার তাঁহার পদাঙ্ক হৃদয়ে ধারণ করিয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। যুগ-প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষের শুভাবির্ভাব এখনও তাহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিঞ্চিদূর্ধ্ব চারিশত বৎসরমাত্র পূর্বে ঐরূপে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর অদৃষ্টপূর্ব মহিমায় শ্রীহরির নামসংকীর্তনে উন্মত্ত হইবার কথা লোকপ্রসিদ্ধ। আবার কি সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে? আবার কি বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, নষ্টগৌরব, দরিদ্র ভারতে যুগ-প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়নপূর্বক

তাঁহাকে বর্তমানকালে শরীরপরিগ্রহ করাইয়াছে? হে পাঠক, অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন যে মহাপুরুষের কথা আমরা তোমাকে বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনালোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে, ঘটনা ঐরূপ হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, বর্তমানকালের যুগ-প্রয়োজন সাধিত করিতে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত পুনরায় ধন্য হইয়াছে।

১.৩. প্রথম অধ্যায়: যুগ-প্রয়োজন

মানব বর্তমানকালে কতদূর উন্নত ও শক্তিশালী হইয়াছে

বিদ্যা, সম্পদ ও পুরুষকার-সহায়ে মানবজীবন বর্তমানকালে পৃথিবীর সর্বত্র কতদূর প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। মানব যেন কোন ক্ষেত্রেই একটা গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ হইয়া এখন আর থাকিতে চাহিতেছে না। স্থলে জলে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিয়া সুখী না হইয়া সে এখন অভিনব যন্ত্রাবিষ্কারপূর্বক গগনচারী হইয়াছে; তমসাবৃত সমুদ্রতলে ও জ্বালাময় আগ্নেয়গিরিগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া সে নিজ কৌতূহলনিবৃত্তি করিয়াছে; চিরহিমানীমণ্ডিত পর্বত ও সাগরপারে গমনপূর্বক সে ঐসকল প্রদেশের যথাযথ রহস্য-অবলোকনে সমর্থ হইয়াছে; পৃথিবীস্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় লতা, ওষধি ও পাদপের ভিতর সে আপনার ন্যায় প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাইয়াছে এবং সর্বপ্রকার প্রাণিজাতকে নিজ প্রত্যক্ষ ও বিচারচক্ষুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জ্ঞানসিদ্ধিরূপ স্বকীয় উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে। ঐরূপে ক্ষিত্যপ্তেজাদি ভূতপঞ্চের উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্বক সে এখন জড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া সুদূরাবস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদির সম্যক সংবাদ লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ক্রমে উহাতেও কৃতকার্য হইতেছে। অন্তর্জগৎ-পরিদর্শনেও তাহার উদ্যমের অভাব লক্ষিত হইতেছে না। ভূয়োদর্শন এবং গবেষণা-সহায়ে ঐ ক্ষেত্রেও মানব নূতন তত্ত্বসকল এখন নিত্য আবিষ্কার করিতেছে। জীবনরহস্য অনুশীলন করিতে যাইয়া সে একজাতীয় প্রাণীর অন্য জাতিত্বে পরিণতির বা ক্রমাভিব্যক্তির কথা জানিতে পারিয়াছে; শরীর ও মনের স্বভাব আলোচনাপূর্বক আদ্যন্তবান সূক্ষ্ম জড়োপাদানে মনের গঠনরূপে তত্ত্ব-নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছে; জড়জগতের ন্যায় অন্তর্জগতের প্রত্যেক ঘটনা অলঙ্ঘ্য নিয়মসূত্রে গ্রথিত বলিয়া জানিতে পারিয়াছে এবং আত্মহত্যাদি অসম্বদ্ধ মানসিক ব্যাপারসকলের মধ্যেও সূক্ষ্ম নিয়মশৃঙ্খলের পরিচয় পাইয়াছে। আবার ব্যক্তিগত জীবনের চিরাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় প্রমাণলাভে সমর্থ না হইলেও, ইতিহাসালোচনায় মানব তাহার জাতিগত জীবনের ক্রমোন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা ঐরূপে জাতিগত জীবনে দেখিতে পাইয়া সে এখন উহার সাফল্যের জন্য বিজ্ঞান ও সংহতচেষ্টা-সহায়ে অজ্ঞানের সহিত চিরসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে এবং অনন্ত সংগ্রামে অনন্ত উন্নতি কল্পনাপূর্বক বহিরন্তর-রাজ্যের দুর্লক্ষ্য প্রদেশসমূহে পৌঁছিবার জন্য অনন্ত বাসনাপ্রবাহে আপন জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছে।

ঐ উন্নতি ও শক্তির কেন্দ্র পাশ্চাত্ত্য হইতে প্রাচ্যে ভাববিস্তার

পাশ্চাত্ত্য মানবকে অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত জীবন-প্রসার বিশেষভাবে উদিত হইলেও ভারতপ্রমুখ প্রাচ্যদেশসকলেও উহার প্রভাব স্বল্প লক্ষিত হইতেছে না। বিজ্ঞানের অদম্য শক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ প্রতিদিন যত নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেছে, প্রাচ্য মানবের প্রাচীন জীবনসংস্কারসমূহ ততই পরিবর্তিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য মানবের ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। পারস্য, চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশসমূহের বর্তমান অবস্থার আলোচনায় ঐ কথা বুঝিতে পারা যায়। ফলাফল ভবিষ্যতে যেরূপই হউক না কেন, প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্ত্যের ঐরূপে ভাববিস্তার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না, এবং সমগ্র পৃথিবীর কালে পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্ত্য মানবের জীবন দেখিয়া ঐ উন্নতির ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ণয় করিতে হইবে

পূর্বোক্ত প্রসারের ফলাফল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্যকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। বিচারসহায়ে পাশ্চাত্ত্য মানবের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে—ঐ প্রসারের মূল কোথায় এবং উহা কীদৃশ স্বভাববিশিষ্ট, উহার প্রভাবে পাশ্চাত্ত্য জীবনের পূর্বতন উত্তমাধম ভাবসকলের কতদূর উন্নতি ও বিলোপ সাধিত হইয়াছে এবং উহার ফলে পাশ্চাত্ত্যে ব্যক্তিগত

মানবমনে সুখ ও দুঃখ পূর্বাপেক্ষা কত অধিক বা অল্প পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। ঐরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত পাশ্চাত্ত্য-জীবনে উহার ফলাফল একবার নির্ণীত হইলে, দেশকালভেদে ঐ বিষয় অন্যত্র নির্ণয় করা কঠিন হইবে না।

পাশ্চাত্ত্য মানবের উন্নতির কারণ ও ইতিহাস

ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছে, দুঃসহ শীতের প্রকোপ অতি প্রাচীনকাল হইতে পাশ্চাত্ত্য মানবমনে দেহবুদ্ধির দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া তাহাকে একদিকে যেমন স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি আবার সংহত চেষ্টায় স্বার্থসিদ্ধি—একথা সহজেই বুঝাইয়া উহাতে স্বজাতিপ্রীতির আবির্ভাব করিয়াছিল। ঐ স্বার্থপরতা এবং স্বজাতিপ্রীতিই তাহাকে, কালে অদম্য উৎসাহে অপর জাতিসকলকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের ধনসম্পদে নিজ জীবন ভূষিত করিতে প্ররোচিত করে। উহার ফলে যখন সে নিজ জীবনযাত্রার কতকটা সুসার করিতে পারিল, তখনই তাহাতে ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া তাহাকে ক্রমে বিদ্যা ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হইতে প্রবৃত্ত করিল। ঐরূপে জীবনসংগ্রাম ভিন্ন উচ্চ বিষয়সকলে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র সে দেখিতে পাইল—ঐ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথে ধর্মবিশ্বাস এবং পুরোহিতকুলের প্রাধান্য তাহার অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান। দেখিল, বিদ্যাশিক্ষায় শ্রীভগবানের অপ্রসন্নতালাভে অনন্তনিরয়গামী হইতে হইবে, কেবলমাত্র ইহা বলিয়াই পুরোহিতকুল নিশ্চিন্ত নহেন; কিন্তু ছলে বলে কৌশলে তাহাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর। তখন স্বার্থসাধন-তৎপর পাশ্চাত্ত্য মানবের কর্তব্য-নির্ধারণে বিলম্ব হইল না। সবলহস্তে পুরোহিতকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে আপন গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। ঐরূপে ধর্মযাজকের সহিত শাস্ত্র ও ধর্মবিশ্বাসকে দূরে পরিহার করিয়া পাশ্চাত্ত্য নবীন পথে নিজ জীবন পরিচালিত করে; এবং পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতারূপ নিশ্চিত প্রমাণপ্রয়োগ না করিয়া কোন বিষয় কখন বিশ্বাস বা গ্রহণ করিবে না, ইহাই তাহার নিকট মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিচারানুমানাদিপূর্বক বিষয়-বিশেষের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পাশ্চাত্ত্য এখন হইতে যুষ্মদ্‌প্রত্যয়গোচর বিষয়ের উপাসক হইয়া পড়ে এবং অস্মদ্‌প্রত্যয়গোচর বিষয়ীকে বিষয়সকলের মধ্যে অন্যতম ভাবিয়া উহার স্বভাবাদিও পূর্বোক্ত প্রমাণপ্রয়োগে জানিতে অগ্রসর হয়। গত চারিশত বৎসর সে ঐরূপে জাগতিক প্রত্যেক ব্যক্তি বা বিষয়কে পঞ্চেন্দ্রিয়সহায়ে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ঐ কালের ভিতরেই বর্তমান যুগের জড়বিজ্ঞান শৈশবের জড়তা এবং অসহায়তা হইতে মুক্ত হইয়া যৌবনের উদ্যম, আশা, আনন্দ ও বলোন্মত্ততায় উপস্থিত হইয়াছে।

আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মানবের মূর্খতা উহার কারণ; এবং ঐজন্য তাহার মনের অশান্তি

কিন্তু জড়বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিলেও, পূর্বোক্ত নীতি আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যকে পথ দেখাইতে পারে নাই। কারণ সংযম, স্বার্থহীনতা এবং অন্তর্মুখতাই ঐ বিজ্ঞানলাভের একমাত্র পথ এবং নিরুদ্ধবৃত্তি মনই আত্মোপলব্ধির একমাত্র যন্ত্র। অতএব, বহির্মুখ পাশ্চাত্ত্যের ঐ বিষয়ে পথ হারাইয়া দিন দিন দেহাত্মবাদী নাস্তিক হইয়া উঠায় কিছুমাত্র আশ্চর্য নাই। সেজন্য ঐহিকের ভোগসুখই পাশ্চাত্ত্যের নিকট এখন সর্বস্বরূপে পরিগণিত এবং তল্লাভেই সে সবিশেষ যত্নশীল; এবং তাহার বিজ্ঞানলব্ধ পদার্থজ্ঞান ঐ বিষয়েই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইয়া তাহাকে দিন দিন দাম্ভিক ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। ঐজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্ত্যে সুবর্ণগত জাতিবিভাগ, প্রলয়বিষাণনাদী করাল কামানবন্দুকাদি, অসামান্য শ্রীর পার্শ্বে দারিদ্র্যজাত অসীম অসন্তোষ এবং ভীষণ ধনপিপাসা, পরদেশাধিকার ও পরজাতি-প্রপীড়নাদি। ঐজন্যই আবার দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগসুখের চরমে উপস্থিত হইয়াও পাশ্চাত্ত্য নরনারীর আত্মার অভাব ঘুচিতেছে না এবং মৃত্যুর পারে জাতিগত অস্তিত্বে বিশ্বাসমাত্র-অবলম্বনে তাহারা কিছুতেই

সুখী হইতে পারিতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে পাশ্চাত্ত্য এখন বুঝিয়াছে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান তাহাকে দেশকালাতীত বস্তুতত্ত্বাবিষ্কারে কখন সমর্থ করিবে না। বিজ্ঞান তাহাকে ঐ বস্তুর ক্ষণিক আভাসমাত্র প্রদানপূর্বক উহাকে ধরা বুঝা তাহার সাধ্যাতীত বলিয়া নিবৃত্ত হয়। অতএব যে দেবতার বলে সে আপনাকে এতকাল বলীয়ান ভাবিয়াছিল, যাঁহার প্রসাদে তাহার যাবতীয় ভোগশ্রী ও সম্পদ, সেই দেবতার পরাভবে পাশ্চাত্ত্য মানবের আন্তরিক হাহাকার এখন দিন দিন বর্ধিত হইতেছে এবং আপনাকে সে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিতেছে।

পাশ্চাত্ত্যের ন্যায় উন্নতিলাভ করিতে হইলে স্বার্থপর ও ভোগলোলুপ হইতে হইবে

পাশ্চাত্ত্য জীবনের পূর্বোক্ত ইতিহাসালোচনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, উহার প্রসারভিত্তির মূলে বিষয়প্রবণতা, স্বার্থপরতা এবং ধর্মবিশ্বাসরাহিত্য বিদ্যমান। অতএব ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনে পাশ্চাত্ত্যের অনুরূপ ফললাভ করিতে হইলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অপরকে ঐ ভিত্তির উপরেই নিজ জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানী প্রভৃতি যে-সকল প্রাচ্য জাতি পাশ্চাত্ত্যের ভাবে জাতীয় জীবনগঠনে তৎপর হইয়াছে, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির সহিত তাহাদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত দোষসকলেরও আবির্ভাব হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত হওয়ার উহাই বিষম দোষ। পাশ্চাত্ত্যসংসর্গে ভারতের জাতীয় জীবনে যে অবস্থার উদয় হইয়াছে, তাহার অনুশীলনে ঐ কথা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের ভিত্তি

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—পাশ্চাত্ত্যসংসর্গে আসিবার পূর্বে 'জাতীয় জীবন' বলিয়া একটা কথা ভারতে বিদ্যমান ছিল কি না। উত্তরে বলিতে হইবে, কথা না থাকিলেও ঐ কথার লক্ষ্য যাহা, তাহা যে একভাবে ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, তখনও সমগ্র ভারত শ্রীগুরু, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গীতায় শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল, তখনও গোকুলের পূজা উহার সর্বত্র লক্ষিত হইত, তখনও ভারতের আবালবৃদ্ধনরনারী রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থসকল হইতে একই ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে বহন করিয়া জীবন পরিচালিত করিত এবং উহার বিভিন্ন বিভাগের বুধমণ্ডলী আপন আপন মনোভাব দেবভাষায় পরস্পরের নিকটে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। ঐরূপ আরও অনেক একতাসূত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং ধর্মভাব ও ধর্মানুষ্ঠান যে ঐ একতার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল, একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

উহা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ভোগ-সাধন লইয়া ভারতের সমাজে কখন বিবাদ উপস্থিত হয় নাই

ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে ধর্মাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহার সভ্যতা এক অপূর্ব বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে হইলে, সংযমই ঐ সভ্যতার প্রাণস্বরূপ ছিল। ব্যক্তি এবং জাতি উভয়কেই ভারত সংযমসহায়ে নিজ নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা প্রদান করিত। ত্যাগের জন্য ভোগের গ্রহণ এবং পরজীবনের জন্য এই জীবনের শিক্ষা—একথা সকলকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করাইয়া ব্যক্তি ও জাতির ব্যবহারিক জীবন সে সর্বদা উচ্চতম লক্ষ্যে পরিচালিত করিত। সেজন্যই উহার বর্ণ বা জাতিবিভাগ এতকাল পর্যন্ত কোন শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করিয়া তাহাদিগের বিষম অসন্তোষের কারণ হয় নাই। কারণ, সমাজের যে শ্রেণী বা স্তরে মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরের কর্তব্য নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই সে যখন অন্যের সহিত সমভাবে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী হইবে, তখন তাহার অসন্তোষের কারণ আর কি হইতে পারে? শ্রেণীবিশেষের ভোগসুখের তারতম্যকে অধিকার করিয়া পাশ্চাত্ত্যসমাজের ন্যায় ভারতের সমাজে যে প্রাচীনকালে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তাহার কারণ—জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকার ছিল বলিয়া।

প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি স্মরণে রাখিয়া দেখা যাউক, পাশ্চাত্ত্য-সংসর্গে উহার জীবনে কীদৃশ পরিবর্তনসকল এখন উপস্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের ভারতাধিকার ও তাহার ফল

পাশ্চাত্ত্যের ভারতাধিকারের দিন হইতে ভারতের জাতীয় ধনবিভাগপ্রণালীতে যে একটা বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের ঐ ভাগ মাত্র পরিবর্তিত করিয়াই পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব নিবৃত্ত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতে যে-সকল মূল সংস্কার লইয়া ভারত-ভারতী ব্যক্তি ও জাতিগত জীবন পরিচালিত করিতেছিল, সেই সকলের মধ্যে ঐ প্রভাব এক অপূর্ব ভাবপরিবর্তন উপস্থিত করিল। পাশ্চাত্ত্য বুঝাইল, ত্যাগের জন্য ভোগ—একথা পুরোহিতকুলের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উদ্‌ভূত হইয়াছে। পরজীবনের ও আত্মার অস্তিত্বস্বীকার এক প্রকাণ্ড কবিকল্পনা; সমাজের যে স্তরে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরেই সে আমরণ নিবদ্ধ থাকিবে—ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর, অন্যায় নিয়ম আর কি হইতে পারে? ভারতও ক্রমে তাহাই বুঝিল এবং ত্যাগ ও সংযম-প্রধান পূর্ব জীবন-লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর ভোগলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ঐরূপে উহাতে পূর্ব শিক্ষাদীক্ষার লোপ হইল এবং নাস্তিক্য, পরানুকরণপ্রিয়তা ও আত্মবিশ্বাসরাহিত্যের উদয় হইয়া উহাকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর তুল্য নিতান্ত নির্বীর্য করিয়া তুলিল। ভারত বুঝিল, সে এতকাল ধরিয়া যাহা হৃদয়ে বহন করিয়া যত্নে অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল; বিজ্ঞানবলে বলীয়ান পাশ্চাত্ত্য তাহার সংস্কারসমূহকে অমার্জিত ও অর্ধবর্বর বলিয়া যেরূপ নির্দেশ করিতেছে, তাহাই বোধ হয় সত্য। ভোগলালসামুগ্ধ ভারত নিজ পূর্বেতিহাস ও পূর্বগৌরব বিস্মৃত হইল। স্মৃতিভ্রংশ হইতে তাহার বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হইল এবং উহা তাহার জাতীয় অস্তিত্বের বিলোপসাধন করিবার উপক্রম করিল। আবার ঐহিক ভোগলাভের জন্য তাহাকে এখন হইতে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হওয়ায় উহার লাভও তাহার ভাগ্যে দূরপরাহত হইল। ঐরূপে যোগ ও ভোগ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কর্ণধারশূন্য তরণীর ন্যায় সে পরানুকরণ করিয়া বাসনাবাত্যাভিমুখে যথা-ইচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

পাশ্চাত্ত্যভাব-সহায়ে নির্জীব ভারতকে সজীব করিবার চেষ্টা ও তাহার ফল

তখন চারিদিক হইতে রব উঠিল, ভারতের জাতীয় জীবন কোনকালেই ছিল না। পাশ্চাত্ত্যের কৃপায় এতদিনে তাহার ঐ জীবনের উন্মেষ হইতেছে, কিন্তু উহার পূর্ণবিকাশের পথে এখনও অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। ঐ যে উহার দুর্নিবার্য ধর্মসংস্কার, উহাই উহার সর্বনাশ করিয়াছে। ঐ যে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা—ঐ পৌত্তলিকতাই তাহাকে এতদিন উঠিতে দেয় নাই। উহার বিনাশ কর, উচ্ছেদ কর, তবেই ভারত-ভারতী সজীব হইয়া উঠিবে। ঈশাহি ধর্ম এবং তদনুকরণে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্ত্যানুকরণে সভা-সমিতি গঠিত হইয়া প্রাণহীন ভারতকে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতার উপকারিতা প্রভৃতি নানা কথা শ্রবণ করান হইল—কিন্তু তাহার অভাববোধ ও হাহাকার নিবৃত্ত না হইয়া প্রতিদিন বর্ধিত হইতে লাগিল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যত কিছু সাজসরঞ্জাম একে একে ভারতে উপস্থিত করা হইল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা—যে ভাবপ্রেরণায় ভারত সজীব ছিল, তাহার অনুসন্ধান এবং পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা ঐ সকলে কিছুমাত্র হইল না। ঔষধ যথাস্থানে প্রযুক্ত হইল না, রোগের উপশম হইবে কিরূপে? ধর্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম সজীব না হইলে সে সজীব হইবে কিরূপে? পাশ্চাত্ত্যের ভাবপ্রসারে তাহাতে যে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, নাস্তিক পাশ্চাত্ত্যের তাহা দূর করিবার সামর্থ্য কোথায়? স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্ত্য অপরকে সিদ্ধ করিবে কিরূপে?

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের দোষগুণ-বিচার

পাশ্চাত্ত্যাধিকারের পূর্বে ভারতের জাতীয় জীবনে যে কিছুমাত্র দোষ ছিল না, একথা বলা যায় না। কিন্তু জাতীয় শরীর সজীব থাকায় ঐ দোষনিবারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টাও উহাতে সর্বদা লক্ষিত হইত। জাতি এবং সমাজের ভিতর এখন সেই চেষ্টার বিলোপ দেখিয়া বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্ত্যভাব-প্রসাররূপ ঔষধ-প্রয়োগ রোগের সহিত রোগীকেও সরাইতে বসিয়াছে!

পাশ্চাত্ত্যভাব-বিস্তারে ভারতের বর্তমান ধর্মগ্লানি

অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্ত্যের ধর্মগ্লানি ভারতেও অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবিক ঐ গ্লানি বর্তমানকালে পৃথিবীর সর্বত্র কতদূর প্রবল হইয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধর্ম বলিয়া যদি কোন বাস্তব পদার্থ থাকে এবং বিধাতার নির্দেশে তল্লাভ যদি মানবের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে বর্তমান যুগের ভোগপরায়ণ মানবজীবন যে উহা হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, একথা নিঃসন্দেহ। বিজ্ঞান-সহায়ে মানবের বর্তমান জীবন-প্রসার মানবকে বিচিত্র ভোগসাধনলাভে সমর্থ করিলেও, তাহাকে যে শান্তির অধিকারী করিতে পারিতেছে না, তাহা ঐজন্য। কে উহার প্রতিকার করিবে? পৃথিবীর ঐ অশান্তি ও হাহাকার কাহার প্রাণে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া তাহাকে সর্বভোগসাধন উপেক্ষাপূর্বক যুগোপযোগী নূতন ধর্মপথাবিষ্কারে প্রযুক্ত করিবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ধর্মগ্লানি দূর করিয়া শান্তিময় নূতন পথে জীবন পরিচালিত করিতে মানবকে পুনরায় কে শিক্ষা প্রদান করিবে?

ঐ গ্লানি-নিবারণের জন্য ঈশ্বরের পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া

গীতামুখে শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জগতে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই তিনি নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক শরীরধারিরূপে প্রকাশিত হইবেন এবং ঐ গ্লানি দূর করিয়া পুনরায় মানবকে শান্তির অধিকারী করিবেন। বর্তমান যুগ-প্রয়োজন কি তাঁহার করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়ন করিবে না? বর্তমান অভাববোধ ও অশান্তি কি তাঁহাকে শরীরপরিগ্রহ করিতে প্রযুক্ত করিবে না?

হে পাঠক! যুগ-প্রয়োজন ঐ কার্য সম্পন্ন করিয়াছে—শ্রীভগবান জগদ্গুরুরূপে সত্য সত্যই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। আশ্বস্তহৃদয়ে শ্রবণ কর, তাঁহার পূত আশীর্বাণী—"যত মত তত পথ", "সর্বান্তঃকরণে যাহাই অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্রীভগবানকে লাভ করিবে।" মুগ্ধ হইয়া মনন কর—পরাবিদ্যা পুনরানয়নের জন্য তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যা!—এবং তাঁহার কামগন্ধহীন পুণ্যচরিত্রের যথাসাধ্য আলোচনা ও ধ্যান করিয়া আইস, আমরা উভয়ে পবিত্র হই।

১.৩. প্রথম অধ্যায়: যুগ-প্রয়োজন

মানব বর্তমানকালে কতদূর উন্নত ও শক্তিশালী হইয়াছে

বিদ্যা, সম্পদ ও পুরুষকার-সহায়ে মানবজীবন বর্তমানকালে পৃথিবীর সর্বত্র কতদূর প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। মানব যেন কোন ক্ষেত্রেই একটা গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ হইয়া এখন আর থাকিতে চাহিতেছে না। স্থলে জলে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিয়া সুখী না হইয়া সে এখন অভিনব যন্ত্রাবিষ্কারপূর্বক গগনচারী হইয়াছে; তমসাবৃত সমুদ্রতলে ও জ্বালাময় আগ্নেয়গিরিগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া সে নিজ কৌতূহলনিবৃত্তি করিয়াছে; চিরহিমানীমণ্ডিত পর্বত ও সাগরপারে গমনপূর্বক সে ঐসকল প্রদেশের যথাযথ রহস্য-অবলোকনে সমর্থ হইয়াছে; পৃথিবীস্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় লতা, ওষধি ও পাদপের ভিতর সে আপনার ন্যায় প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাইয়াছে এবং সর্বপ্রকার প্রাণিজাতকে নিজ প্রত্যক্ষ ও বিচারচক্ষুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জ্ঞানসিদ্ধিরূপ স্বকীয় উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে। ঐরূপে ক্ষিত্যপ্তেজাদি ভূতপঞ্চের উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্বক সে এখন জড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া সুদূরাবস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদির সম্যক সংবাদ লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ক্রমে উহাতেও কৃতকার্য হইতেছে। অন্তর্জগৎ-পরিদর্শনেও তাহার উদ্যমের অভাব লক্ষিত হইতেছে না। ভূয়োদর্শন এবং গবেষণা-সহায়ে ঐ ক্ষেত্রেও মানব নূতন তত্ত্বসকল এখন নিত্য আবিষ্কার করিতেছে। জীবনরহস্য অনুশীলন করিতে যাইয়া সে একজাতীয় প্রাণীর অন্য জাতিত্বে পরিণতির বা ক্রমাভিব্যক্তির কথা জানিতে পারিয়াছে; শরীর ও মনের স্বভাব আলোচনাপূর্বক আদ্যন্তবান সূক্ষ্ম জড়োপাদানে মনের গঠনরূপে তত্ত্ব-নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছে; জড়জগতের ন্যায় অন্তর্জগতের প্রত্যেক ঘটনা অলঙ্ঘ্য নিয়মসূত্রে গ্রথিত বলিয়া জানিতে পারিয়াছে এবং আত্মহত্যাদি অসম্বদ্ধ মানসিক ব্যাপারসকলের মধ্যেও সূক্ষ্ম নিয়মশৃঙ্খলের পরিচয় পাইয়াছে। আবার ব্যক্তিগত জীবনের চিরাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় প্রমাণলাভে সমর্থ না হইলেও, ইতিহাসালোচনায় মানব তাহার জাতিগত জীবনের ক্রমোন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা ঐরূপে জাতিগত জীবনে দেখিতে পাইয়া সে এখন উহার সাফল্যের জন্য বিজ্ঞান ও সংহতচেষ্টা-সহায়ে অজ্ঞানের সহিত চিরসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে এবং অনন্ত সংগ্রামে অনন্ত উন্নতি কল্পনাপূর্বক বহিরন্তর-রাজ্যের দুর্লক্ষ্য প্রদেশসমূহে পৌঁছিবার জন্য অনন্ত বাসনাপ্রবাহে আপন জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছে।

ঐ উন্নতি ও শক্তির কেন্দ্র পাশ্চাত্ত্য হইতে প্রাচ্যে ভাববিস্তার

পাশ্চাত্ত্য মানবকে অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত জীবন-প্রসার বিশেষভাবে উদিত হইলেও ভারতপ্রমুখ প্রাচ্যদেশসকলেও উহার প্রভাব স্বল্প লক্ষিত হইতেছে না। বিজ্ঞানের অদম্য শক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ প্রতিদিন যত নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেছে, প্রাচ্য মানবের প্রাচীন জীবনসংস্কারসমূহ ততই পরিবর্তিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য মানবের ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। পারস্য, চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশসমূহের বর্তমান অবস্থার আলোচনায় ঐ কথা বুঝিতে পারা যায়। ফলাফল ভবিষ্যতে যেরূপই হউক না কেন, প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্ত্যের ঐরূপে ভাববিস্তার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না, এবং সমগ্র পৃথিবীর কালে পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্ত্য মানবের জীবন দেখিয়া ঐ উন্নতির ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ণয় করিতে হইবে

পূর্বোক্ত প্রসারের ফলাফল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্যকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। বিচারসহায়ে পাশ্চাত্ত্য মানবের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে—ঐ প্রসারের মূল কোথায় এবং উহা কীদৃশ স্বভাববিশিষ্ট, উহার প্রভাবে পাশ্চাত্ত্য জীবনের পূর্বতন উত্তমাধম ভাবসকলের কতদূর উন্নতি ও বিলোপ সাধিত হইয়াছে এবং উহার ফলে পাশ্চাত্ত্যে ব্যক্তিগত

মানবমনে সুখ ও দুঃখ পূর্বাপেক্ষা কত অধিক বা অল্প পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। ঐরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত পাশ্চাত্ত্য-জীবনে উহার ফলাফল একবার নির্ণীত হইলে, দেশকালভেদে ঐ বিষয় অন্যত্র নির্ণয় করা কঠিন হইবে না।

পাশ্চাত্ত্য মানবের উন্নতির কারণ ও ইতিহাস

ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছে, দুঃসহ শীতের প্রকোপ অতি প্রাচীনকাল হইতে পাশ্চাত্ত্য মানবমনে দেহবুদ্ধির দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া তাহাকে একদিকে যেমন স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি আবার সংহত চেষ্টায় স্বার্থসিদ্ধি—একথা সহজেই বুঝাইয়া উহাতে স্বজাতিপ্রীতির আবির্ভাব করিয়াছিল। ঐ স্বার্থপরতা এবং স্বজাতিপ্রীতিই তাহাকে, কালে অদম্য উৎসাহে অপর জাতিসকলকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের ধনসম্পদে নিজ জীবন ভূষিত করিতে প্ররোচিত করে। উহার ফলে যখন সে নিজ জীবনযাত্রার কতকটা সুসার করিতে পারিল, তখনই তাহাতে ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া তাহাকে ক্রমে বিদ্যা ও সদ্গুণ-সম্পন্ন হইতে প্রবৃত্ত করিল। ঐরূপে জীবনসংগ্রাম ভিন্ন উচ্চ বিষয়সকলে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র সে দেখিতে পাইল—ঐ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথে ধর্মবিশ্বাস এবং পুরোহিতকুলের প্রাধান্য তাহার অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান। দেখিল, বিদ্যাশিক্ষায় শ্রীভগবানের অপ্রসন্নতালাভে অনন্তনিরয়গামী হইতে হইবে, কেবলমাত্র ইহা বলিয়াই পুরোহিতকুল নিশ্চিন্ত নহেন; কিন্তু ছলে বলে কৌশলে তাহাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর। তখন স্বার্থসাধন-তৎপর পাশ্চাত্ত্য মানবের কর্তব্য-নির্ধারণে বিলম্ব হইল না। সবলহস্তে পুরোহিতকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে আপন গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। ঐরূপে ধর্মযাজকের সহিত শাস্ত্র ও ধর্মবিশ্বাসকে দূরে পরিহার করিয়া পাশ্চাত্ত্য নবীন পথে নিজ জীবন পরিচালিত করে; এবং পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতারূপ নিশ্চিত প্রমাণপ্রয়োগ না করিয়া কোন বিষয় কখন বিশ্বাস বা গ্রহণ করিবে না, ইহাই তাহার নিকট মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিচারানুমানাদিপূর্বক বিষয়-বিশেষের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পাশ্চাত্ত্য এখন হইতে যুষ্মদ্প্রত্যয়গোচর বিষয়ের উপাসক হইয়া পড়ে এবং অস্মদ্প্রত্যয়গোচর বিষয়ীকে বিষয়সকলের মধ্যে অন্যতম ভাবিয়া উহার স্বভাবাদিও পূর্বোক্ত প্রমাণপ্রয়োগে জানিতে অগ্রসর হয়। গত চারিশত বৎসর সে ঐরূপে জাগতিক প্রত্যেক ব্যক্তি বা বিষয়কে পঞ্চেন্দ্রিয়সহায়ে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ঐ কালের ভিতরেই বর্তমান যুগের জড়বিজ্ঞান শৈশবের জড়তা এবং অসহায়তা হইতে মুক্ত হইয়া যৌবনের উদ্যম, আশা, আনন্দ ও বলোন্মত্ততায় উপস্থিত হইয়াছে।

আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মানবের মূর্খতা উহার কারণ; এবং ঐজন্য তাহার মনের অশান্তি

কিন্তু জড়বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিলেও, পূর্বোক্ত নীতি আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যকে পথ দেখাইতে পারে নাই। কারণ সংযম, স্বার্থহীনতা এবং অন্তর্মুখতাই ঐ বিজ্ঞানলাভের একমাত্র পথ এবং নিরুদ্ধবৃত্তি মনই আত্মোপলব্ধির একমাত্র যন্ত্র। অতএব, বহির্মুখ পাশ্চাত্ত্যের ঐ বিষয়ে পথ হারাইয়া দিন দিন দেহাত্মবাদী নাস্তিক হইয়া উঠায় কিছুমাত্র আশ্চর্য নাই। সেজন্য ঐহিকের ভোগসুখই পাশ্চাত্ত্যের নিকট এখন সর্বস্বরূপে পরিগণিত এবং তল্লাভেই সে সবিশেষ যত্নশীল; এবং তাহার বিজ্ঞানলব্ধ পদার্থজ্ঞান ঐ বিষয়েই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইয়া তাহাকে দিন দিন দাম্ভিক ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। ঐজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্ত্যে সুবর্ণগত জাতিবিভাগ, প্রলয়বিষাণনাদী করাল কামানবন্দুকাদি, অসামান্য শ্রীর পার্শ্বে দারিদ্র্যজাত অসীম অসন্তোষ এবং ভীষণ ধনপিপাসা, পরদেশাধিকার ও পরজাতি-প্রপীড়নাদি। ঐজন্যই আবার দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগসুখের চরমে উপস্থিত হইয়াও পাশ্চাত্ত্য নরনারীর আত্মার অভাব ঘুচিতেছে না এবং মৃত্যুর পারে জাতিগত অস্তিত্বে বিশ্বাসমাত্র-অবলম্বনে তাহারা কিছুতেই

সুখী হইতে পারিতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে পাশ্চাত্ত্য এখন বুঝিয়াছে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান তাহাকে দেশকালাতীত বস্তুতত্ত্বাবিষ্কারে কখন সমর্থ করিবে না। বিজ্ঞান তাহাকে ঐ বস্তুর ক্ষণিক আভাসমাত্র প্রদানপূর্বক উহাকে ধরা বুঝা তাহার সাধ্যাতীত বলিয়া নিবৃত্ত হয়। অতএব যে দেবতার বলে সে আপনাকে এতকাল বলীয়ান ভাবিয়াছিল, যাঁহার প্রসাদে তাহার যাবতীয় ভোগশ্রী ও সম্পদ, সেই দেবতার পরাভবে পাশ্চাত্ত্য মানবের আন্তরিক হাহাকার এখন দিন দিন বর্ধিত হইতেছে এবং আপনাকে সে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিতেছে।

পাশ্চাত্ত্যের ন্যায় উন্নতিলাভ করিতে হইলে স্বার্থপর ও ভোগলোলুপ হইতে হইবে

পাশ্চাত্ত্য জীবনের পূর্বোক্ত ইতিহাসালোচনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, উহার প্রসারভিত্তির মূলে বিষয়প্রবণতা, স্বার্থপরতা এবং ধর্মবিশ্বাসরাহিত্য বিদ্যমান। অতএব ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনে পাশ্চাত্ত্যের অনুরূপ ফললাভ করিতে হইলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অপরকে ঐ ভিত্তির উপরেই নিজ জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানী প্রভৃতি যে-সকল প্রাচ্য জাতি পাশ্চাত্ত্যের ভাবে জাতীয় জীবনগঠনে তৎপর হইয়াছে, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির সহিত তাহাদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত দোষসকলেরও আবির্ভাব হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত হওয়ার উহাই বিষম দোষ। পাশ্চাত্ত্যসংসর্গে ভারতের জাতীয় জীবনে যে অবস্থার উদয় হইয়াছে, তাহার অনুশীলনে ঐ কথা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের ভিত্তি

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—পাশ্চাত্ত্যসংসর্গে আসিবার পূর্বে 'জাতীয় জীবন' বলিয়া একটা কথা ভারতে বিদ্যমান ছিল কি না। উত্তরে বলিতে হইবে, কথা না থাকিলেও ঐ কথার লক্ষ্য যাহা, তাহা যে একভাবে ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, তখনও সমগ্র ভারত শ্রীগুরু, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গীতায় শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল, তখনও গোকুলের পূজা উহার সর্বত্র লক্ষিত হইত, তখনও ভারতের আবালবৃদ্ধনরনারী রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থসকল হইতে একই ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে বহন করিয়া জীবন পরিচালিত করিত এবং উহার বিভিন্ন বিভাগের বুধমণ্ডলী আপন আপন মনোভাব দেবভাষায় পরস্পরের নিকটে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। ঐরূপ আরও অনেক একতাসূত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং ধর্মভাব ও ধর্মানুষ্ঠান যে ঐ একতার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল, একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

উহা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ভোগ-সাধন লইয়া ভারতের সমাজে কখন বিবাদ উপস্থিত হয় নাই

ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে ধর্মাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহার সভ্যতা এক অপূর্ব বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে হইলে, সংযমই ঐ সভ্যতার প্রাণস্বরূপ ছিল। ব্যক্তি এবং জাতি উভয়কেই ভারত সংযমসহায়ে নিজ নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা প্রদান করিত। ত্যাগের জন্য ভোগের গ্রহণ এবং পরজীবনের জন্য এই জীবনের শিক্ষা—একথা সকলকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করাইয়া ব্যক্তি ও জাতির ব্যবহারিক জীবন সে সর্বদা উচ্চতম লক্ষ্যে পরিচালিত করিত। সেজন্যই উহার বর্ণ বা জাতিবিভাগ এতকাল পর্যন্ত কোন শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করিয়া তাহাদিগের বিষম অসন্তোষের কারণ হয় নাই। কারণ, সমাজের যে শ্রেণী বা স্তরে মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরের কর্তব্য নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই সে যখন অন্যের সহিত সমভাবে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী হইবে, তখন তাহার অসন্তোষের কারণ আর কি হইতে পারে? শ্রেণীবিশেষের ভোগসুখের তারতম্যকে অধিকার করিয়া পাশ্চাত্ত্যসমাজের ন্যায় ভারতের সমাজে যে প্রাচীনকালে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তাহার কারণ—জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকার ছিল বলিয়া।

প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি স্মরণে রাখিয়া দেখা যাউক, পাশ্চাত্ত্য-সংসর্গে উহার জীবনে কীদৃশ পরিবর্তনসকল এখন উপস্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের ভারতাধিকার ও তাহার ফল

পাশ্চাত্ত্যের ভারতাধিকারের দিন হইতে ভারতের জাতীয় ধনবিভাগপ্রণালীতে যে একটা বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের ঐ ভাগ মাত্র পরিবর্তিত করিয়াই পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব নিবৃত্ত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতে যে-সকল মূল সংস্কার লইয়া ভারত-ভারতী ব্যক্তি ও জাতিগত জীবন পরিচালিত করিতেছিল, সেই সকলের মধ্যে ঐ প্রভাব এক অপূর্ব ভাবপরিবর্তন উপস্থিত করিল। পাশ্চাত্ত্য বুঝাইল, ত্যাগের জন্য ভোগ—একথা পুরোহিতকুলের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উদ্‌ভূত হইয়াছে। পরজীবনের ও আত্মার অস্তিত্বস্বীকার এক প্রকাণ্ড কবিকল্পনা; সমাজের যে স্তরে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরেই সে আমরণ নিবদ্ধ থাকিবে—ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর, অন্যায় নিয়ম আর কি হইতে পারে? ভারতও ক্রমে তাহাই বুঝিল এবং ত্যাগ ও সংযম-প্রধান পূর্ব জীবন-লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর ভোগলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ঐরূপে উহাতে পূর্ব শিক্ষাদীক্ষার লোপ হইল এবং নাস্তিক্য, পরানুকরণপ্রিয়তা ও আত্মবিশ্বাসরাহিত্যের উদয় হইয়া উহাকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর তুল্য নিতান্ত নির্বীর্য করিয়া তুলিল। ভারত বুঝিল, সে এতকাল ধরিয়া যাহা হৃদয়ে বহন করিয়া যত্নে অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল; বিজ্ঞানবলে বলীয়ান পাশ্চাত্ত্য তাহার সংস্কারসমূহকে অমার্জিত ও অর্ধবর্বর বলিয়া যেরূপ নির্দেশ করিতেছে, তাহাই বোধ হয় সত্য। ভোগলালসামুগ্ধ ভারত নিজ পূর্বেতিহাস ও পূর্বগৌরব বিস্মৃত হইল। স্মৃতিভ্রংশ হইতে তাহার বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হইল এবং উহা তাহার জাতীয় অস্তিত্বের বিলোপসাধন করিবার উপক্রম করিল। আবার ঐহিক ভোগলাভের জন্য তাহাকে এখন হইতে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হওয়ায় উহার লাভও তাহার ভাগ্যে দূরপরাহত হইল। ঐরূপে যোগ ও ভোগ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কর্ণধারশূন্য তরণীর ন্যায় সে পরানুকরণ করিয়া বাসনাবাত্যাভিমুখে যথা-ইচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

পাশ্চাত্ত্যভাব-সহায়ে নির্জীব ভারতকে সজীব করিবার চেষ্টা ও তাহার ফল

তখন চারিদিক হইতে রব উঠিল, ভারতের জাতীয় জীবন কোনকালেই ছিল না। পাশ্চাত্ত্যের কৃপায় এতদিনে তাহার ঐ জীবনের উন্মেষ হইতেছে, কিন্তু উহার পূর্ণবিকাশের পথে এখনও অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। ঐ যে উহার দুর্নিবার্য ধর্মসংস্কার, উহাই উহার সর্বনাশ করিয়াছে। ঐ যে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা—ঐ পৌত্তলিকতাই তাহাকে এতদিন উঠিতে দেয় নাই। উহার বিনাশ কর, উচ্ছেদ কর, তবেই ভারত-ভারতী সজীব হইয়া উঠিবে। ঈশাহি ধর্ম এবং তদনুকরণে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্ত্যানুকরণে সভা-সমিতি গঠিত হইয়া প্রাণহীন ভারতকে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতার উপকারিতা প্রভৃতি নানা কথা শ্রবণ করান হইল—কিন্তু তাহার অভাববোধ ও হাহাকার নিবৃত্ত না হইয়া প্রতিদিন বর্ধিত হইতে লাগিল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যত কিছু সাজসরঞ্জাম একে একে ভারতে উপস্থিত করা হইল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা—যে ভাবপ্রেরণায় ভারত সজীব ছিল, তাহার অনুসন্ধান এবং পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা ঐ সকলে কিছুমাত্র হইল না। ঔষধ যথাস্থানে প্রযুক্ত হইল না, রোগের উপশম হইবে কিরূপে? ধর্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম সজীব না হইলে সে সজীব হইবে কিরূপে? পাশ্চাত্ত্যের ভাবপ্রসারে তাহাতে যে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, নাস্তিক পাশ্চাত্ত্যের তাহা দূর করিবার সামর্থ্য কোথায়? স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্ত্য অপরকে সিদ্ধ করিবে কিরূপে?

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের দোষগুণ-বিচার

পাশ্চাত্ত্যাধিকারের পূর্বে ভারতের জাতীয় জীবনে যে কিছুমাত্র দোষ ছিল না, একথা বলা যায় না। কিন্তু জাতীয় শরীর সজীব থাকায় ঐ দোষনিবারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টাও উহাতে সর্বদা লক্ষিত হইত। জাতি এবং সমাজের ভিতর এখন সেই চেষ্টার বিলোপ দেখিয়া বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্ত্যভাব-প্রসাররূপ ঔষধ-প্রয়োগ রোগের সহিত রোগীকেও সরাইতে বসিয়াছে!

পাশ্চাত্ত্যভাব-বিস্তারে ভারতের বর্তমান ধর্মগ্লানি

অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্ত্যের ধর্মগ্লানি ভারতেও অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবিক ঐ গ্লানি বর্তমানকালে পৃথিবীর সর্বত্র কতদূর প্রবল হইয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধর্ম বলিয়া যদি কোন বাস্তব পদার্থ থাকে এবং বিধাতার নির্দেশে তল্লাভ যদি মানবের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে বর্তমান যুগের ভোগপরায়ণ মানবজীবন যে উহা হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, একথা নিঃসন্দেহ। বিজ্ঞান-সহায়ে মানবের বর্তমান জীবন-প্রসার মানবকে বিচিত্র ভোগসাধনলাভে সমর্থ করিলেও, তাহাকে যে শান্তির অধিকারী করিতে পারিতেছে না, তাহা ঐজন্য। কে উহার প্রতিকার করিবে? পৃথিবীর ঐ অশান্তি ও হাহাকার কাহার প্রাণে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া তাহাকে সর্বভোগসাধন উপেক্ষাপূর্বক যুগোপযোগী নূতন ধর্মপথাবিষ্কারে প্রযুক্ত করিবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ধর্মগ্লানি দূর করিয়া শান্তিময় নূতন পথে জীবন পরিচালিত করিতে মানবকে পুনরায় কে শিক্ষা প্রদান করিবে?

ঐ গ্লানি-নিবারণের জন্য ঈশ্বরের পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া

গীতামুখে শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জগতে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই তিনি নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক শরীরধারিরূপে প্রকাশিত হইবেন এবং ঐ গ্লানি দূর করিয়া পুনরায় মানবকে শান্তির অধিকারী করিবেন। বর্তমান যুগ-প্রয়োজন কি তাঁহার করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়ন করিবে না? বর্তমান অভাববোধ ও অশান্তি কি তাঁহাকে শরীরপরিগ্রহ করিতে প্রযুক্ত করিবে না?

হে পাঠক! যুগ-প্রয়োজন ঐ কার্য সম্পন্ন করিয়াছে—শ্রীভগবান জগদ্গুরুরূপে সত্য সত্যই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। আশ্বস্তহৃদয়ে শ্রবণ কর, তাঁহার পূত আশীর্বাণী—"যত মত তত পথ", "সর্বান্তঃকরণে যাহাই অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্রীভগবানকে লাভ করিবে।" মুগ্ধ হইয়া মনন কর—পরাবিদ্যা পুনরানয়নের জন্য তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যা!—এবং তাঁহার কামগন্ধহীন পুণ্যচরিত্রের যথাসাধ্য আলোচনা ও ধ্যান করিয়া আইস, আমরা উভয়ে পবিত্র হই।

১.৪. দ্বিতীয় অধ্যায়: কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

দরিদ্রগৃহে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার কারণ

ঈশ্বরাবতার বলিয়া যে-সকল মহাপুরুষ জগতে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন, শ্রীভগবান রামচন্দ্র ও শাক্যসিংহের কথা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহাদিগের সকলেরই পার্থিব জীবন দুঃখ-দারিদ্র্য, সংসারের অসচ্ছলতা এবং এমনকি কঠোরতার ভিতর আরম্ভ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা–ক্ষত্রিয়রাজকুল অলঙ্কৃত করিলেও শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের কারাগৃহে জন্ম ও আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে, নীচ গোপকুলমধ্যে বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; শ্রীভগবান ঈশা পান্থশালায় পশুরক্ষাগৃহে দরিদ্র পিতামাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; শ্রীভগবান শঙ্কর দরিদ্র বিধবার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নগণ্য সাধারণ ব্যক্তির গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন; ইস্লামধর্ম-প্রবর্তক শ্রীমৎ মহম্মদের জীবনেও ঐ কথার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ হইলেও কিন্তু যে দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর সন্তোষের সরসতা নাই, যে অসচ্ছল সংসারে নিঃস্বার্থতা ও প্রেম নাই, যে দরিদ্র পিতামাতার হৃদয়ে ত্যাগ, পবিত্রতা ও কঠোর মনুষ্যত্বের সহিত কোমল দয়াদাক্ষিণ্যাদি ভাবসমূহের মধুর সামঞ্জস্য নাই, সেস্থলে তাঁহারা কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ভাবিয়া দেখিলে, পূর্বোক্ত বিধানের সহিত তাঁহাদিগের ভাবী জীবনের একটা গূঢ় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কারণ, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে যাঁহাদিগকে সমাজের দুঃখী, দরিদ্র এবং অত্যাচারিতদিগের নয়নাশ্রু মুছাইয়া হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করিতে হইবে, তাঁহারা ঐসকল ব্যক্তির অবস্থার সহিত পূর্ব হইতে পরিচিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে ঐ কার্যসাধন করিবেন কিরূপে? শুধু তাহাই নহে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি সংসারে ধর্মগ্লানি-নিবারণের জন্যই অবতারপুরুষসকলের অভ্যুদয় হয়। ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পূর্বপ্রচারিত ধর্মবিধানসকলের যথাযথ অবস্থার সহিত প্রথমেই পরিচিত হইতে হয় এবং ঐ সকল প্রাচীন বিধানের বর্তমান গ্লানির কারণ আলোচনাপূর্বক তাহাদিগের পূর্ণতা ও সাফল্যস্বরূপ দেশকালোপযোগী নূতন বিধান আবিষ্কার করিতে হয়। ঐ পরিচয়লাভের বিশেষ সুযোগ দরিদ্রের কুটির ভিন্ন ধনীর প্রাসাদ কখনও প্রদান করে না। কারণ, সংসারের সুখভোগে বঞ্চিত দরিদ্র ব্যক্তিই ঈশ্বর এবং তাঁহার বিধানকে জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে সর্বদা দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া থাকে। অতএব সর্বত্র ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইলেও পূর্ব পূর্ব বিধানের যথাযথ কিঞ্চিদাভাস দরিদ্রের কুটিরকে তখনও উজ্জ্বল করিয়া রাখে; এবং ঐজন্যই বোধ হয়, জগদ্গুরু মহাপুরুষসকল জন্মপরিগ্রহকালে দরিদ্র পরিবারেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

যে মহাপুরুষের কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনারম্ভও পূর্বোক্ত নিয়ম অতিক্রম করে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর

হুগলি জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সন্ধিস্থলের অনতিদূরে তিনখানি গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে পরস্পরের সন্নিকট অবস্থিত আছে। গ্রামবাসীদিগের নিকটে ঐ গ্রামত্রয় শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুররূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিলেও উহারা পরস্পর এত ঘন সন্নিবেশে অবস্থিত যে, পথিকের নিকটে একই গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সেজন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে উহারা একমাত্র কামারপুকুর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় জমিদারদিগের বহুকাল ঐ গ্রামে বাস থাকাতেই বোধ হয় কামারপুকুরের পূর্বোক্ত সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেইকালে কামারপুকুর শ্রীযুক্ত বর্ধমান মহারাজের গুরুবংশীয়দিগের লাখরাজ জমিদারিভুক্ত ছিল এবং তাঁহাদিগের বংশধর শ্রীযুক্ত গোপীলাল, সুখলাল প্রভৃতি গোস্বামিগণ[1] ঐ গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

কামারপুকুর হইতে বর্ধমান শহর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত শহর হইতে আসিবার বরাবর পাকা রাস্তা আছে। কামারপুকুরে আসিয়াই ঐ রাস্তার শেষ হয় নাই; ঐ গ্রামকে অর্ধবেষ্টন করিয়া উহা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ৺পুরীধাম পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পাদচারী দরিদ্র যাত্রী এবং বৈরাগ্যবান সাধুসকলের অনেকে ঐ পথ দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে গমনাগমন করেন।

কামারপুকুরের প্রায় ৯।১০ ক্রোশ পূর্বে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া কামারপুকুরে আসিবার একটি পথ আছে। তদ্ভিন্ন উক্ত গ্রামের প্রায় নয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ঘাটাল হইতে এবং প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বন-বিষ্ণুপুর হইতেও এখানে আসিবার প্রশস্ত পথ আছে।

কামারপুকুর অঞ্চলের পূর্ব-সমৃদ্ধি ও বর্তমান অবস্থা

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়াপ্রসূত মহামারীর আবির্ভাবের পূর্বে কৃষিপ্রধান বঙ্গের পল্লীগ্রামসকলে কি অপূর্ব শান্তির ছায়া অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ, হুগলি জেলার এই গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ধান্যপ্রান্তরসকলের মধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি বিশাল হরিৎসাগরে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইত। জমির উর্বরতায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব না থাকায় এবং নির্মল বায়ুতে নিত্য পরিশ্রমের ফলে গ্রামবাসীদিগের দেহে স্বাস্থ্য ও সবলতা এবং মনে প্রীতি ও সন্তোষ সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। বহুজনাকীর্ণ গ্রামসকলে আবার কৃষি ভিন্ন ছোটখাট নানাপ্রকার শিল্পব্যবসায়েও লোকে নিযুক্ত থাকিত। ঐরূপে উৎকৃষ্ট জিলাপি, মিঠাই ও নবাত প্রস্তুত করিবার জন্য কামারপুকুর এই অঞ্চলে চিরপ্রসিদ্ধ এবং আবলুস কাষ্ঠনির্মিত হুঁকার নল নির্মাণপূর্বক ঐ গ্রাম কলিকাতার সহিত কারবারে এখনও বেশ দু'পয়সা অর্জন করিয়া থাকে। সূতা, গামছা ও কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য এবং অন্য নানা শিল্পকার্যেও কামারপুকুর এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। বিষ্ণু চাপড়ি প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী এই গ্রামে বাস করিয়া তখন কলিকাতার সহিত অনেক টাকার কারবার করিতেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে গ্রামে এখনও হাট বসিয়া থাকে। তারাহাট, বদনগঞ্জ, সিহড়, দেশড়া প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকল হইতে লোকে সূতা, বস্ত্র, গামছা, হাঁড়ি, কলসী, কুলা, চেঙ্গারি, মাদুর, চেটাই প্রভৃতি সংসারের নিত্যব্যবহার্য পণ্য ও ক্ষেত্রজ দ্রব্যসকল হাটবারে কামারপুকুরে আনয়নপূর্বক পরস্পরে ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। গ্রামে আনন্দোৎসবের অভাব এখনও লক্ষিত হয় না। চৈত্রমাসে মনসাপূজা ও শিবের গাজনে এবং বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে চব্বিশপ্রহরীয় হরিবাসরে কামারপুকুর মুখরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন জমিদারবাটীতে বারমাস সকলপ্রকার পালপার্বণ এবং প্রতিষ্ঠিত দেবালয়সকলে নিত্যপূজা ও পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য দারিদ্র্যজনিত অভাব বর্তমানে ঐ সকলের অনেকাংশে লোপসাধন করিয়াছে।

ঐ অঞ্চলে ৺ধর্মঠাকুরের পূজা

৺ধর্মঠাকুরের পূজায়ও এখানে এককালে বিশেষ আড়ম্বর ছিল। কিন্তু এখন আর সেই কাল নাই; বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম শ্রীধর্ম এখন কুর্মমূর্তিতে পরিণত হইয়া এখানে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে সামান্য পূজামাত্রই পাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণকেও সময়ে সময়ে ঐ মূর্তির পূজা করিতে দেখা গিয়া থাকে। উক্ত ধর্মঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিভিন্ন গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা, কামারপুকুরের ধর্মঠাকুরের নাম—'রাজাধিরাজ ধর্ম'; শ্রীপুরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত ঠাকুরের নাম—'যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম' এবং মুকুন্দপুরের সন্নিকটে মধুবাটী নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের নাম—'সন্ন্যাসীরায় ধর্ম'। কামারপুকুরের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রথযাত্রাও এককালে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। নবচূড়াসমন্বিত সুদীর্ঘ রথখানি তখন তাঁহার মন্দিরপার্শ্বে নিত্য নয়নগোচর হইত। ভগ্ন হইবার পরে ঐ রথ আর নির্মিত হয় নাই। ধর্মমন্দিরটিও সংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে দেখিয়া ধর্মপণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাঁহার নিজ বাটীতে ঠাকুরকে এখন স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

হালদারপুকুর, ভূতির খাল, আম্রকানন প্রভৃতির কথা

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতী, সদ্গোপ, কামার, কুমার, জেলে, ডোম প্রভৃতি উচ্চনীচ সকলপ্রকার জাতিরই কামারপুকুরে বসতি আছে। গ্রামে তিন-চারিটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে হালদারপুকুরই সর্বাপেক্ষা বড়। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অনেক আছে। তাহাদিগের কোন কোনটি আবার শতদল কমল, কুমুদ ও কহ্লারশ্রেণী বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। গ্রামে ইষ্টকনির্মিত বাটীর ও সমাধির অসদ্ভাব নাই। পূর্বে উহার সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। রামানন্দ শাঁখারীর ভগ্ন দেউল, ফকির দত্তের জীর্ণ রাসমঞ্চ, জঙ্গলাকীর্ণ ইষ্টকের স্তূপ এবং পরিত্যক্ত দেবালয়সমূহ নানাস্থানে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ের এবং গ্রামের পূর্বসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রামের ঈশান ও বায়ুকোণে 'বুধুই মোড়ল' ও 'ভূতীর খাল' নামক দুইটি শ্মশান বর্তমান। শেষোক্ত স্থানের পশ্চিমে গোচর-প্রান্তর, মানিকরাজা-প্রতিষ্ঠিত সর্বসাধারণের উপভোগ্য আম্রকানন এবং আমোদর নদ বিদ্যমান আছে। ভূতীর খাল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গ্রামের অনতিদূরে উক্ত নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

ভূরসুবোর মানিকরাজা

কামারপুকুরের অর্ধক্রোশ উত্তরে ভূরসুবো নামক গ্রাম। শ্রীযুক্ত মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তির তথায় বাস ছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে ইনি 'মানিকরাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্বোক্ত আম্রকানন ভিন্ন 'সুখসায়ের', 'হাতিসায়ের' প্রভৃতি বৃহৎ দীর্ঘিকাসকল এখনও ইঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। শুনা যায়, ইঁহার বাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন।

গড় মান্দারণ

কামারপুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নিকোণে মান্দারণ গ্রাম। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বে কোনকালে এখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রকায় আমোদর নদের গতি কৌশলে পরিবর্তিত করিয়া উক্ত গড়ের পরিখায় পরিণত করা হইয়াছিল।

উচালনের দীঘি ও মোগলমারির যুদ্ধক্ষেত্র

মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন তোরণ, স্তূপ ও পরিখা এবং উহার অনতিদূরে শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও বর্তমান থাকিয়া পাঠানদিগের রাজত্বকালে এইসকল স্থানের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতেছে। গড় মান্দারণের পার্শ্ব দিয়াই বর্ধমানে গমনাগমন করিবার পূর্বোক্ত পথ প্রসারিত রহিয়াছে। ঐ পথের দুইধারে অনেকগুলি বৃহৎ দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়। উক্ত গড় হইতে প্রায় নয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত উচালন নামক স্থানের দীর্ঘিকাই তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত পথের একস্থানে একটি ভগ্ন হস্তিশালাও লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐসকল দর্শনে বুঝিতে পারা যায়, যুদ্ধবিগ্রহের সৌকর্যার্থেই এই পথ নির্মিত হইয়াছিল। মোগলমারির প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র পথিমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দেরে গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়ের কথা

কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় একক্রোশ দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক তিনখানি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত আছে। এই গ্রামসকল এককালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। দেরের দীর্ঘিকা ও তৎপার্শ্ববর্তী দেবালয় এবং অন্যান্য নানা বিষয় দেখিয়া ঐ কথা অনুমিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে উক্ত গ্রামত্রয় ভিন্ন জমিদারিভুক্ত ছিল এবং উহার জমিদার রামানন্দ রায় সাতবেড়ে নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই জমিদার বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও বিষম প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোন কারণে কাহারও উপর কুপিত হইলে, ইনি ঐ প্রজাকে

সর্বস্বান্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহার পুত্রকন্যাদির মধ্যে কেহই জীবিত ছিল না। লোকে বলে, প্রজাপীড়ন-অপরাধেই ইনি নির্বংশ হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পরে ইঁহার বিষয়-সম্পত্তি অপরের হস্তগত হইয়াছিল।

দেরে গ্রামের মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে মধ্যবিত্ত-অবস্থাসম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণপরিবারের দেরে গ্রামে বাস ছিল। ইঁহারা সদাচারী, কুলীন এবং শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়সমন্বিত পুষ্করিণী এখনও 'চাটুয্যে পুকুর' নামে খ্যাত থাকিয়া ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উক্তবংশীয় শ্রীযুক্ত মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র এবং এক কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ক্ষুদিরাম সম্ভবতঃ সন ১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে রামশীলা নাম্নী কন্যার এবং নিধিরাম ও কানাইরাম নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হইয়াছিল।

তৎপুত্র ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কথা

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অর্থকরী কোনরূপ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কি-না জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণসমূহ সদ্‌ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট আছে, বিধাতা তাঁহাকে ঐ সকল গুণ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ ও সবল ছিলেন, কিন্তু স্থূলকায় ছিলেন না; গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। বংশানুগত শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি তাঁহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রতিদিন পুষ্পচয়নপূর্বক ৺রঘুবীরের পূজান্তে জলগ্রহণ করিতেন। শূদ্রের নিকট হইতে দানগ্রহণ দূরে থাকুক, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই এবং যে-সকল ব্রাহ্মণ পণগ্রহণ করিয়া কন্যাসম্প্রদান করিত, তাহাদিগের হস্তে জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। ঐরূপ নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত।

ক্ষুদিরাম-গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী

পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের স্কন্ধেই পতিত হইয়াছিল এবং ধর্মপথে অবিচলিত থাকিয়া তিনি ঐ সকল কার্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেও তাঁহার পত্নী অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং আন্দাজ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিল; কিন্তু বাটিতে ইঁহাকে সকলে 'চন্দ্রা' বলিয়াই সম্বোধন করিত। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর পিত্রালয় সরাটিমায়াপুর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। তিনি সুরূপা, সরলা ও দেবদ্বিজপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসাই তাঁহার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে এবং ঐ সকলের জন্যই তিনি সংসারে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১১৯৭ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সন ১২০৫ সালে বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র ছিল। সম্ভবতঃ সন ১২১১ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামকুমার জন্মগ্রহণ করে। উহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমতী কাত্যায়নী নাম্নী কন্যার এবং সন ১২৩২ সালে দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বরের মুখাবলোকন করিয়া তিনি আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

জমিদারের সহিত বিবাদে ক্ষুদিরামের সর্বস্বান্ত হওয়া

ধর্মপথে থাকিয়া সংসারযাত্রানির্বাহ করা যে কতদূর কঠিন কার্য, তাহা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয়ঙ্গম হইতে বিলম্ব হয় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা কাত্যায়নীর জন্মপরিগ্রহের কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন। গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়ের প্রজাপীড়নের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেরেপুরের কোন ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি এখন মিথ্যাপবাদে আদালতে মকদ্দমা আনয়ন করিলেন এবং বিশ্বস্ত সাক্ষীর প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। ধর্মপরায়ণ ক্ষুদিরাম আইন-আদালতকে সর্বদা ভীতির চক্ষে দেখিতেন এবং ঘটনা সত্য হইলেও ইতিপূর্বে কখনও কাহারও বিরুদ্ধে উহাদিগের আশ্রয় লইতেন না। সুতরাং জমিদারের পূর্বোক্ত অনুরোধে আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান না করিলে জমিদারের বিষম কোপে পতিত হইতে হইবে, একথা স্থির জানিয়াও তিনি উহাতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অগত্যা এস্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল; জমিদার তাঁহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রদানপূর্বক নালিশ রুজু করিলেন এবং মকদ্দমায় জয়ী হইয়া তাঁহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেরেপুরে থাকিবার বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। গ্রামবাসী সকলে তাঁহার দুঃখে যথার্থ কাতর হইলেও তাঁহাকে জমিদারের বিরুদ্ধে কোনই সহায়তা করিতে পারিল না। ঐরূপে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এককালে নিঃস্ব হইলেন।

ক্ষুদিরামের দেরে-গ্রাম পরিত্যাগ

পিতৃপুরুষদিগের অধিকারিস্বত্বে ও নিজ উপার্জনের ফলে যে সম্পত্তি[2] তিনি এতকাল ধরিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বায়ুতাড়িত ছিন্নাভ্রের ন্যায় উহা এখন কোথায় এককালে বিলীন হইল! কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাকে ধর্মপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। তিনি ৺রঘুবীরের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণ গ্রহণ করিলেন এবং স্থিরচিত্তে নিজ কর্তব্য অবধারণপূর্বক দুর্জনকে দূরে পরিহার করিবার নিমিত্ত পৈতৃক ভিটা ও গ্রাম হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায়গ্রহণ করিলেন।

সুখলাল গোস্বামীর আমন্ত্রণে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আগমন ও বাস

কামারপুকুরের শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামীজীর কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সহিত ইঁহার পূর্ব হইতে বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। বন্ধুর ঐরূপ বিপদের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ বিচলিত হইলেন এবং নিজ বাটীর একাংশে কয়েকখানি চালাঘর চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম উহাতে অকূলে কূল পাইলেন এবং শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলাতেই পূর্বোক্ত অনুরোধ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে কামারপুকুরে আগমনপূর্বক তদবধি ঐ স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। বন্ধুপ্রাণ সুখলাল উহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ধর্মপরায়ণ ক্ষুদিরামের সংসারযাত্রানির্বাহের জন্য এক বিঘা দশ ছটাক ধান্যজমি তাঁহাকে চিরকালের জন্য প্রদান করিলেন।

[1] ৺হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে সুখলালের স্থলে অনুপ গোস্বামীর নাম বলিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয়, উহা সমীচীন নহে। গ্রামের বর্তমান জমিদার লাহাবাবুদের নিকটে শুনিয়াছি, উক্ত গোস্বামীজীর নাম সুখলাল ছিল এবং ইঁহার পুত্র কৃষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট হইতেই তাঁহারা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কামারপুকুরের অধিকাংশ জমি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। আবার গ্রামে প্রবাদ আছে, ৺গোপেশ্বর নামক বৃহৎ শিবলিঙ্গ গোপীলাল গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত করেন। অতএব উক্ত গোপীলাল গোস্বামী সুখলালের কোন পূর্বতন পুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অথবা এমনও হইতে পারে, সুখলালের অন্য নাম গোপীলাল ছিল।

[2] ৺হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, দেরেপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমি ছিল।

১.৫. তৃতীয় অধ্যায়: কামারপুকুরে ধর্মের সংসার

কামারপুকুরে আসিয়া ক্ষুদিরামের বানপ্রস্থের ন্যায় জীবনযাপন করিবার কারণ

প্রায় দশ বৎসরের পুত্র রামকুমার ও চারি বৎসরের কন্যা কাত্যায়নীকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক ক্ষুদিরাম যেদিন কামারপুকুরে আসিয়া পর্ণকুটিরে বাস করিলেন, তাঁহাদিগের সেদিনকার মনোভাব বলিবার নহে। ঈর্ষাদ্বেষপূর্ণ সংসার সেদিন তাঁহাদিগের নিকট অন্ধতমসাবৃত বিকট শ্মশানতুল্য; স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় তথায় মধ্যে মধ্যে ক্ষীণালোক বিস্তার করিয়া হৃদয়ে সুখাশার উদয় করিলেও, পরক্ষণেই উহা কোথায় বিলীন হয় এবং যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই সেখানে বিরাজ করিতে থাকে। পূর্বাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া ঐরূপ নানাকথা যে তাঁহাদের মনে এখন উদিত হইয়াছিল, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ দুঃখ-দুর্দিনে পড়িয়াই মানব সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করে। অতএব শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রাণে এখন যে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আবার, পূর্বোক্ত অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আশ্রয়লাভের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ধর্মপ্রাণ অন্তর যে এখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতায় পূর্ণ হইয়াছিল, একথা বলিতে হইবে না। সুতরাং ৺রঘুবীরের হস্তে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক পুনরায় সংসারের উন্নতিসাধনে উদাসীন হইয়া তিনি যে এখন শ্রীভগবানের সেবাপূজাতে দিন কাটাইতে থাকিবেন, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? বাস্তবিক সংসারে থাকিলেও তিনি এখন হইতে অসংসারী হইয়া প্রাচীন কালের বানপ্রস্থসকলের ন্যায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অদ্‌ভুত উপায়ে ক্ষুদিরামের ৺রঘুবীরশিলা-লাভ

এই সময়ের একটি ঘটনায় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মবিশ্বাস অধিকতর গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। কার্যবশতঃ একদিন তাঁহাকে গ্রামান্তরে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে ফিরিবার কালে তিনি শ্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁহার চিন্তাভারাক্রান্ত মনে শান্তি প্রদান করিল এবং নির্মল বায়ু ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার শয়নেচ্ছা বলবতী হইল এবং শয়ন করিতে না করিতে তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপ্নাবেশে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার অভীষ্টদেব নবদূর্বাদল-শ্যাম-তনু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেন দিব্য বালকবেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং স্থানবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "আমি এখানে অনেকদিন অযত্নে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাটীতে লইয়া চল, তোমার সেবাগ্রহণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" ঐ কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে বারংবার প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমি ভক্তিহীন ও নিতান্ত দরিদ্র, আমার গৃহে আপনার যোগ্য সেবা কখনই সম্ভবে না, অধিকন্তু সেবাপরাধী হইয়া আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে, অতএব ঐরূপ অন্যায় অনুরোধ কেন করিতেছেন?" বালক-বেশী শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্বক বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমার ক্রটি কখনও গ্রহণ করিব না, আমাকে লইয়া চল।" ক্ষুদিরাম শ্রীভগবানের ঐরূপ অযাচিত কৃপায় আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

জাগরিত হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভাবিতে লাগিলেন—এ কি অদ্‌ভুত স্বপ্ন! হায়, হায়, কখনও কি তাঁহার সত্য সত্য ঐরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবে? ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিকটবর্তী ধান্যক্ষেত্রে পতিত হইল এবং বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ঐ স্থানটিই তিনি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি তখন গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঐ স্থানে পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, একটি সুন্দর শালগ্রামশিলার উপরে এক ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! তখন শিলা হস্তগত করিতে তাঁহার মনে প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল এবং তিনি দ্রুতপদে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গ অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহার বিবরমুখে

শালগ্রামটি পড়িয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন অলীক নহে ভাবিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয় তখন বিষম উৎসাহে পূর্ণ হইল এবং আপনাকে দেবাদিষ্টজ্ঞানে তিনি ভুজঙ্গদংশনের ভয় না রাখিয়া 'জয় রঘুবীর' বলিয়া চীৎকারপূর্বক শিলা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম শিলার লক্ষণসকল নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, বাস্তবিকই উহা 'রঘুবীর' নামক শিলা। তখন আনন্দে ও বিস্ময়ে অধীর হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং যথাশাস্ত্র সংস্কার-কার্য সম্পন্ন করিয়া উহাকে নিজ গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। ৺রঘুবীরকে ঐরূপ অদ্‌ভুত উপায়ে পাইবার পূর্বে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিজ অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ভিন্ন, ঘট প্রতিষ্ঠাপূর্বক ৺শীতলাদেবীকে নিত্য পূজা করিতেছিলেন।

সাংসারিক কষ্টের মধ্যে ক্ষুদিরামের অবিচলতা ও ঈশ্বরনির্ভরতা

একের পর এক করিয়া দুর্দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, ক্ষুদিরামও সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টে উদাসীন থাকিয়া একমাত্র ধর্মকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয়পূর্বক হৃষ্টচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সংসারে কোন কোনদিন এককালে অন্নাভাব হইয়াছে, পতিপ্রাণা চন্দ্রাদেবী ব্যাকুলহৃদয়ে ঐ কথা স্বামীকে নিবেদন করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিয়াছেন, "ভয় কি, যদি ৺রঘুবীর উপবাসী থাকেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার সহিত উপবাসী থাকিব।" সরলপ্রাণা চন্দ্রাদেবী তাহাতে স্বামীর ন্যায় ৺রঘুবীরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া গৃহকর্মে নিরতা হইয়াছেন–আহার্যের সংস্থানও সেদিন কোনরূপে হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মীজলায় ধান্যক্ষেত্রে

ঐরূপ একান্ত অন্নাভাব কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামী তাঁহাকে লক্ষ্মীজলা নামক স্থানে যে এক বিঘা দশ ছটাক ধান্য-জমি প্রদান করিয়াছিলেন, ৺রঘুবীরের প্রসাদে তাহাতে এখন হইতে এত ধান্য হইতে লাগিল যে, উহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের অভাব সংবৎসরের জন্য নিবারিত হওয়া ভিন্ন কিছু কিছু উদ্‌বৃত্ত হইয়া অতিথি-অভ্যাগতের সেবাও চলিয়া যাইতে লাগিল। কৃষাণদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম উক্ত জমিতে চাষ করাইতেন এবং ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া বপনকাল উপস্থিত হইলে ৺রঘুবীরের নাম গ্রহণপূর্বক স্বয়ং কয়েক গুচ্ছ ধান উহাতে প্রথমে রোপণ করিতেন, পরে কৃষকদিগকে ঐ কাজ নিষ্পন্ন করিতে বলিতেন।

ক্ষুদিরামের ঈশ্বরভক্তির বৃদ্ধি ও দিব্যদর্শনলাভ। প্রতিবেশিগণের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা

দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে দুই-তিন বৎসর কাটিয়া গেল এবং ৺রঘুবীরের মুখ চাহিয়া প্রায় আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিলেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সংসারে মোটা অন্নবস্ত্রের অভাব হইল না। কিন্তু ঐ দুই-তিন বৎসরের কঠোর শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে এখন যে শান্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বরনির্ভরতা নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল, তাহা স্বল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। অন্তর্মুখ অবস্থায় থাকা তাঁহার মনের স্বভাব হইয়া উঠিল এবং উহার প্রভাবে তাঁহার জীবনে নানা দিব্যদর্শন সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিতে বসিয়া যখন তিনি ৺গায়ত্রীদেবীর ধ্যানাবৃত্তিপূর্বক তচ্চিন্তায় মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার বক্ষঃস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত এবং মুদ্রিত নয়ন অবিরল প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিত। প্রত্যুষে যখন তিনি সাজিহস্তে ফুল তুলিতে যাইতেন, তখন দেখিতেন তাঁহার আরাধ্যা ৺শীতলাদেবী যেন অষ্টমবর্ষীয়া কন্যারূপিণী হইয়া রক্তবস্ত্র ও নানা অলঙ্কার ধারণপূর্বক হাসিতে হাসিতে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন এবং পুষ্পিত বৃক্ষের শাখাসকল নত করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে ফুল তুলিতে সহায়তা করিতেছেন! ঐ সকল দিব্যদর্শনে তাঁহার অন্তর এখন সর্বদা উল্লাসে পূর্ণ হইয়া থাকিত এবং তাঁহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি বদনে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে এক অপূর্ব দিব্যাবেশে নিরন্তর পরিবৃত করিয়া রাখিত। তাঁহার সৌম্য শান্ত মুখদর্শনে গ্রামবাসীরা উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া

তাঁহাকে ক্রমে ঋষির ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিলে তাহারা বৃথালাপ পরিত্যাগপূর্বক সসম্ভ্রমে উত্থান ও সম্ভাষণ করিত; তাঁহার স্নানকালে সেই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতে তাহারা সঙ্কোচ বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিত; তাঁহার আশীর্বাণী নিশ্চিত ফলদান করিবে ভাবিয়া তাহারা বিপদে সম্পদে উহার প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত।

শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীকে প্রতিবেশিগণ যে চক্ষে দেখিত

স্নেহ ও সরলতার মূর্তি শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীও নিজ দয়া ও ভালবাসায় তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের মাতৃভক্তির যথার্থই অধিকারিণী হইলেন। কারণ সম্পদ বা আপৎকালে তাঁহার ন্যায় হৃদয়ের সহানুভূতি তাহারা আর কোথাও পাইত না। দরিদ্রেরা জানিত, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর নিকট তাহারা যখনই উপস্থিত হইবে, তখন সুদ্ধ যে এক মুঠা খাইতে পাইবে, তাহা নহে; কিন্তু উহার সহিত এত অকৃত্রিম যত্ন ও ভালবাসা পাইবে যে, তাহাদিগের অন্তর পরম পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ভিক্ষুক সাধুরা জানিত, এ বাটীর দ্বার তাহাদিগের নিমিত্ত সর্বদা উন্মুক্ত আছে। প্রতিবেশী বালক-বালিকারা জানিত, চন্দ্রাদেবীর নিকটে তাহারা যে-বিষয়ের জন্যই আবদার করুক না কেন, তাহা কোন না কোন উপায়ে পূর্ণ হইবেই হইবে। ঐরূপে প্রতিবেশীদিগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের পর্ণকুটিরে যখন-তখন আসিয়া উপস্থিত হইত এবং দুঃখদারিদ্র্য বিদ্যমান থাকিলেও উহা এক অপূর্ব শান্তির আলোকে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত।

ক্ষুদিরামের ভগিনী শ্রীমতী রামশীলার কথা

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের রামশীলা নাম্নী এক ভগিনী এবং নিধিরাম ও কানাইরাম বা রামকানাই নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। দেরেপুরের জমিদারের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়া যখন তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন তখন তাঁহার উক্ত ভগিনীর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের ত্রিশ ও পঁচিশ বৎসর হইবে। তাঁহারা সকলেই তখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ছিলিমপুরে ৺ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী রামশীলার বিবাহ হইয়াছিল এবং রামচাঁদ নামক এক পুত্র ও হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত বিপদের সময় রামচাঁদের বয়স আন্দাজ একুশ বৎসর এবং হেমাঙ্গিনীর ষোল বৎসর ছিল। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ তখন মেদিনীপুরে মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে মাতুলালয়েই জন্ম হইয়াছিল এবং ভ্রাতা অপেক্ষাও তিনি মাতুলদিগের অধিকতর স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইঁহাকে কন্যানির্বিশেষে পালন করিয়া বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কামারপুকুরের প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিহড় গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি ক্রমে রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম নামে চারি পুত্রের জননী হইয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের নিধিরাম নামক ভ্রাতার কোন সন্তান হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ কানাইরামের রামতারক ওরফে হলধারী এবং কালিদাস নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। কানাইরাম ভক্তিমান ও ভাবুক ছিলেন। এক সময়ে কোন স্থানে ইনি যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের অভিনয় হইতেছিল। উহা শুনিতে শুনিতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার মন্ত্রণাচেষ্টাদিকে সত্য জ্ঞান করিয়া ঐ ভূমিকার অভিনেতাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পৈতৃক

সম্পত্তি হারাইবার পরে নিধিরাম ও কানাইরাম দেরেপুর পরিত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ যে যে গ্রামে তাঁহাদিগের শ্বশুরালয় ছিল, সেই সেই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ

শ্রীমতী রামশীলার পুত্র শ্রীযুক্ত রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেদিনীপুরে মোক্তারি করিবার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্যবসায়সূত্রে ইনি ক্রমে মেদিনীপুরে বাস করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতে লাগিলেন। তখন মাতুলদিগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ইনি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে মাসিক পনর টাকা এবং নিধিরাম ও কানাইরামের প্রত্যেককে মাসিক দশ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভাগিনেয়ের কিছুকাল সংবাদ না পাইলেই চিন্তিত হইয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইতেন এবং দুই-চারিদিন তাঁহার আলয়ে কাটাইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করিতেন। একবার ঐরূপে মেদিনীপুর আগমনকালে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ঘটনাটি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের আন্তরিক দেবভক্তির পরিচায়ক বলিয়া আমরা উহার এখানে উল্লেখ করিলাম।

ক্ষুদিরামের দেবভক্তির পরিচায়ক ঘটনা

কামারপুকুরের প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর অবস্থিত। রামচাঁদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের কুশল-সংবাদ অনেক দিন না পাওয়ায় চিন্তিত হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম একদিন ঐ স্থানে যাইবার জন্য বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন মাঘ বা ফাল্গুন মাস হইবে। বিল্ববৃক্ষের পত্রসকল এই সময় ঝরিয়া পড়ে এবং যতদিন না নবপত্রোদ্‌গম হয়, ততদিন লোকের ৺শিবপূজা করিবার বিশেষ কষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঐ কষ্ট কিছুদিন পূর্ব হইতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন।

অতি প্রত্যুষে বহির্গত হইয়া তিনি প্রায় দশ ঘটিকা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া একটি গ্রামে পৌঁছিলেন এবং তথাকার বিল্ববৃক্ষসকল নবীন পত্রাভরণে ভূষিত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিল। তখন মেদিনীপুর যাইবার কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া তিনি গ্রাম হইতে একটি নূতন ঝুড়ি ও একখানি গামছা ক্রয় করিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে বেশ করিয়া ধৌত করিলেন। পরে নবীন বিল্বপত্রে ঝুড়িটি পূর্ণ করিয়া ভিজা গামছাখানি উহার উপর চাপা দিয়া অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌঁছিয়াই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম স্নানসমাপনপূর্বক ঐ পত্রসকল লইয়া মহানন্দে ৺মহাদেব ও ৺শীতলামাতার বহুক্ষণ পর্যন্ত পূজা করিলেন; পরে স্বয়ং আহারে বসিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন অবসর লাভ করিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিল্বপত্রে দেবার্চনা করিবার লোভে এতটা পথ অতিবাহন করিয়াছেন জানিয়া যারপরনাই বিস্মিতা হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম পুনরায় মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন।

রামকুমার ও কাত্যায়নীর বিবাহ

এক, দুই করিয়া ক্রমে কামারপুকুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। তাঁহার পুত্র রামকুমার এখন ষোড়শ বর্ষে এবং কন্যা কাত্যায়নী একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে দেখিয়া তিনি এখন পাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কামারপুকুরের উত্তরে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত আনুড় গ্রামের শ্রীযুক্ত কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে কন্যা সম্প্রদানপূর্বক কেনারামের ভগিনীর সহিত নিজ পুত্র রামকুমারের উদ্বাহকার্য সম্পন্ন করিলেন। রামকুমার নিকটস্থ গ্রামের চতুষ্পাঠীতে ইতিপূর্বে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ সমাপ্ত করিয়া এখন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যু ইত্যাদি

ক্রমে আরও তিন-চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ৺রঘুবীরের প্রসাদে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সংসারে এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তিনিও নিশ্চিন্তমনে শ্রীভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। ঘটনার মধ্যে ঐ চারি বৎসরে শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতি-অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সংসারের আর্থিক উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের পরম বন্ধু সুখলাল গোস্বামী উহার কোন সময়ে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত সুখলালের মৃত্যুতে যে তিনি বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

ক্ষুদিরামের ৺সেতুবন্ধতীর্থদর্শন ও রামেশ্বর নামক পুত্রের জন্ম

রামকুমার মানুষ হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিশ্চিন্ত হইয়া এখন অন্য বিষয়ে মন দিবার অবসর লাভ করিলেন। তীর্থ-দর্শনের জন্য তাঁহার অন্তর এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সম্ভবতঃ সন ১২৩০ সালে তিনি পদব্রজে ৺সেতুবন্ধরামেশ্বরদর্শনে গমন করিলেন এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের তীর্থসকল পর্যটন করিয়া প্রায় এক বৎসর পরে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ৺সেতুবন্ধ হইতে এই সময়ে তিনি একটি বাণলিঙ্গ কামারপুকুরে আনয়নপূর্বক নিত্য পূজা করিতে থাকেন। ৺রামেশ্বর নামক ঐ বাণলিঙ্গটিকে এখনও কামারপুকুরে ৺রঘুবীর-শিলার ও ৺শীতলাদেবীর ঘটের পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বহুকাল পরে পুনরায় এই সময়ে গর্ভধারণ করিয়া সন ১২৩২ সালে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ৺রামেশ্বর তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইহার নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন।

রামকুমারের দৈবী শক্তি

এই ঘটনার পরে প্রায় আট বৎসর কাল পর্যন্ত কামারপুকুরের এই দরিদ্র সংসারে জীবন-প্রবাহ প্রায় সমভাবেই বহিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতির বিধান দিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম করিয়া এখন উপার্জন করিতেছিলেন; সুতরাং সংসারে এখন আর পূর্বের ন্যায় কষ্ট ছিল না। শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্মে রামকুমার বিশেষ পটু হইয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি ঐ বিষয়ে দৈবী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-অধ্যয়নের ফলে তিনি ইতিপূর্বে আদ্যাশক্তির উপাসনায় বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর নিকট ৺দেবীমন্ত্রও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভীষ্টদেবীকে নিত্য পূজা করিবার কালে একদিন তাঁহার অপূর্ব দর্শনলাভ হয় এবং তিনি অনুভব করিতে থাকেন যেন ৺দেবী নিজ অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার জিহ্বাগ্রে জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য কোন মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া দিতেছেন। তদবধি রোগী ব্যক্তিকে দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে আরোগ্যলাভ করিবে কি-না এবং ঐ ক্ষমতাপ্রভাবে তিনি এখন যে রোগীর সম্বন্ধে যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহাই ফলিয়া যাইতে লাগিল। ঐরূপে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া তাঁহার এইকালে এতদঞ্চলে সামান্য প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। শুনা যায়, তিনি এই সময়ে কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নিমিত্ত স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইতেন এবং জোর করিয়া বলিতেন, এই স্বস্ত্যয়ন-বেদীতে যে শস্য ছড়াইতেছি, তাহাতে কলার উদ্‌গম হইলেই এই ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিবে। ফলেও বাস্তবিক তাহাই হইত। তাঁহার পূর্বোক্ত ক্ষমতার উদাহরণস্বরূপে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের নিকটে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছিলেন—

ঐ শক্তির পরিচায়ক ঘটনাবিশেষ

কার্যোপলক্ষে রামকুমার কলিকাতায় আগমন করিয়া একদিন গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। কোন ধনী ব্যক্তি ঐ সময়ে সপরিবারে তথায় স্নান করিতে আসিলেন এবং উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর স্নানের জন্য শিবিকা গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাওয়া হইলে, উহার মধ্যে বসিয়াই ঐ যুবতী স্নানসমাপন করিতে থাকিলেন। পল্লীগ্রামবাসী রামকুমার স্নানকালে স্ত্রীলোকদিগের ঐরূপে আবরুরক্ষা কখন

নয়নগোচর করেন নাই। সুতরাং বিস্মিত হইয়া উহা দেখিতে দেখিতে শিবিকামধ্যে অবস্থিত যুবতীর মুখকমল ক্ষণেকের নিমিত্ত দেখিতে পাইলেন এবং পূর্বোল্লিখিত দৈবীশক্তিপ্রভাবে তাঁহার মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"আহা! আজ যাহাকে এত আদবকায়দায় স্নান করাইতেছে, কাল তাহাকে সর্বজনসমক্ষে গঙ্গায় বিসর্জন দিবে!" ধনী ব্যক্তি ঐ কথা শুনিতে পাইয়া ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমারকে নিজালয়ে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল, ঘটনা সত্য না হইলে রামকুমারকে বিশেষরূপে অপমানিত করিবেন। যুবতী সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় ঐরূপ ঘটনা হইবার কোন লক্ষণও বাস্তবিক তখন দেখা যায় নাই; কিন্তু ফলে শ্রীযুক্ত রামকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তিও তাঁহাকে মান্যের সহিত বিদায়দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঐ শক্তির পরিচায়ক রামকুমারের স্ত্রীর সম্বন্ধীয় ঘটনা

নিজ স্ত্রী-ভাগ্য দর্শন করিয়াও শ্রীযুক্ত রামকুমার এক সময়ে বিষম ফল নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং ঘটনাও কিছুকাল পরে ঐরূপ হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার স্ত্রী বিশেষ সুলক্ষণসম্পন্না ছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২২৬ সালে শ্রীযুক্ত রামকুমার পাণিগ্রহণ করিয়া যেদিন তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া পত্নীকে কামারপুকুরে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার ভাগ্যচক্র উন্নতির পথে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতার দরিদ্র সংসারেও সেইদিন হইতে ঐরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মেদিনীপুরনিবাসী ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাসিক সাহায্য ঐ সময় হইতে আসিতে আরম্ভ হয়। স্ত্রী বা পুরুষ কোন ব্যক্তির সংসারে প্রথম প্রবেশকালে ঐরূপ শুভফল উপস্থিত হইলে হিন্দুপরিবারে সকলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া থাকে, একথা বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ, রামকুমারের বালিকা পত্নী তখন আবার এই দরিদ্র সংসারে একমাত্র পুত্রবধূ। সুতরাং বালিকা যে সকলের বিশেষ আদরের পাত্রী হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপ অতিমাত্রায় আদরযত্ন পাইয়া তাহার নানা সদ্‌গুণের সহিত অভিমান ও অনাশ্রবতারূপ দোষদ্বয় প্রশ্রয় পাইয়াছিল। ঐ দোষ সকলের চক্ষে পড়িলেও কেহ কিছু বলিতে বা সংশোধনের চেষ্টা করিতে সাহসী হইত না। কারণ, সকলে ভাবিত সামান্য দোষ থাকিলেও তাহার আগমনকাল হইতেই কি সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই? সে যাহা হউক, কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত রামকুমার তাঁহার প্রাপ্তযৌবনা স্ত্রীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "সুলক্ষণা হইলেও গর্ভধারণ করিলেই ইহার মৃত্যু হইবে!" পরে বহুকাল গত হইলেও যখন পত্নীর গর্ভ হইল না, তখন তিনি তাঁহাকে বন্ধ্যা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পত্নী প্রথম ও শেষবার গর্ভবতী হইয়া সন ১২৫৫ সালে ছত্রিশ বৎসরে এক পরম রূপবান পুত্র-প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই পুত্রের নাম অক্ষয় রাখা হইয়াছিল। উহা অনেক পরের ঘটনা হইলেও সুবিধার জন্য পাঠককে এখানেই বলিয়া রাখিলাম।

ক্ষুদিরামের পরিবারস্থ সকলের বিশেষত্ব

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মের সংসারে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই একটা বিশেষত্ব ছিল। অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অন্তর্গত ঐ বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম শক্তিসকলের অধিকার হইতে সর্বথা সমুদ্‌ভূত হইত। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পত্নীর ভিতর ঐরূপ বিশেষত্ব অসাধারণভাবে প্রকাশিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিসকলে অনুগত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে উক্ত-বিষয়ক অনেক কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। শ্রীমতী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে এখন ঐরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ অযোগ্য হইবে না। ঘটনাটিতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বামীর ন্যায় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীতেও দিব্যদর্শনশক্তি সময়ে সময়ে প্রকাশিত থাকিত। ঘটনাটি রামকুমারের বিবাহের কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল।

পঞ্চদশবর্ষীয় রামকুমার তখন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন ভিন্ন যজমানবাটীসকলে পূজা করিয়া সংসারে যথাসাধ্য সাহায্য করিত।

চন্দ্রাদেবীর দিব্যদর্শন-সম্বন্ধীয় ঘটনা

আশ্বিন মাসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে রামকুমার ভূরসুবো নামক গ্রামে যজমানগৃহে উক্ত পূজা করিতে গিয়াছিল। অর্ধরাত্রি অতীত হইলেও পুত্র গৃহে ফিরিতেছে না দেখিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বিশেষ উৎকণ্ঠিতা হইলেন এবং গৃহের বাহিরে আসিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ঐরূপে কাটিবার পরে তিনি দেখিতে পাইলেন, প্রান্তরপথ অতিবাহিত করিয়া ভূরসুবোর দিক হইতে কে একজন কামারপুকুরে আগমন করিতেছে। পুত্র আসিতেছে ভাবিয়া তিনি উৎসাহে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি নিকটবর্তী হইলে দেখিলেন সে রামকুমার নহে, এক পরমা সুন্দরী রমণী নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একাকিনী চলিয়া আসিতেছেন। পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন বিশেষ আকুলিতা, সুতরাং ভদ্রবংশীয়া যুবতী রমণীকে গভীর রজনীতে ঐরূপে পথ অতিবাহন করিতে দেখিয়াও বিস্মিতা হইলেন না। সরলভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" রমণী উত্তর করিলেন, "ভূরসুবো হইতে।" শ্রীমতী চন্দ্রা তখন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র রামকুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল? সে কি ফিরিতেছে?" অপরিচিতা রমণী তাঁহার পুত্রকে চিনিবেন কিরূপে, একথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না। রমণী তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক বলিলেন, "হাঁ, তোমার পুত্র যে বাটীতে পূজা করিতে গিয়াছে, আমি সেই বাটী হইতেই এখন আসিতেছি। ভয় নাই, তোমার পুত্র এখনই ফিরিবে।" শ্রীমতী চন্দ্রা এতক্ষণে আশ্বস্তা হইয়া অন্য বিষয় ভাবিবার অবসর পাইলেন এবং রমণীর অসামান্য রূপ, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও নূতন ধরণের অলঙ্কারসকল দেখিয়া এবং মধুর বচন শুনিয়া বলিলেন, "মা, তোমার বয়স অল্প; এত গহনা-গাঁটি পরিয়া এত রাত্রে কোথা যাইতেছ? তোমার কানে ও কি গহনা?" রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "উহার নাম কুণ্ডল, আমাকে এখনও অনেক দূরে যাইতে হইবে।" শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন তাঁহাকে বিপন্না ভাবিয়া সস্নেহে বলিলেন, "চল না, আমাদের ঘরে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম করিয়া কাল যেখানে যাইবার, যাইবে এখন।" রমণী বলিলেন, "না মা, আমাকে এখনি যাইতে হইবে; তোমাদের বাড়ীতে আমি অন্য সময়ে আসিব।" রমণী ঐরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর বাটীর পার্শ্বেই লাহাবাবুদের অনেকগুলি ধান্যের মরাই ছিল, তদভিমুখে চলিয়া যাইলেন। রাস্তা না ধরিয়া লাহাবাবুদের বাটীর দিকে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া চন্দ্রাদেবী বিস্মিতা হইলেন এবং রমণী পথ ভুলিয়াছে ভাবিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন রমণীর বাক্যসকল স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার প্রাণে উদয় হইল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিলাম নাকি? অনন্তর কম্পিতহৃদয়ে স্বামীর পার্শ্বে গমনপূর্বক তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম সমস্ত শ্রবণ করিয়া 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীই তোমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। রামকুমারও কিছুক্ষণ পরে বাটীতে ফিরিয়া জননীর নিকট ঐ কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

ক্ষুদিরামের ৺গয়াতীর্থে গমন

ক্রমে সন ১২৪১ সাল সমাগত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের জীবনে এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। তীর্থদর্শনে তাঁহার অভিলাষ পুনরায় প্রবল ভাব ধারণ করায়, পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধারকল্পে তিনি এখন গয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ষাট বৎসরে পদার্পণ করিলেও তিনি পদব্রজে ঐ ধামে গমন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার

ভাগিনেয়ী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার গয়াধাম যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে একটি অদ্‌ভুত ঘটনা আমাদিগের নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের গয়া গমন সম্বন্ধে হৃদয়রাম কথিত ঘটনা

নিজ দুহিতা শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীর বিশেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এই সময়ে একদিন আনুর গ্রামে তাঁহাকে দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কাত্যায়নীর বয়স তখন আন্দাজ পঁচিশ বৎসর হইবে। পীড়িতা কন্যার হাবভাব ও কথাবার্তায় তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইল, তাঁহার শরীরে কোন ভূতযোনির আবেশ হইয়াছে। তখন সমাহিতচিত্তে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া তিনি কন্যা-শরীরে প্রবিষ্ট জীবের উদ্দেশে বলিলেন, "তুমি দেবতা বা উপদেবতা যাহাই হও, কেন আমার কন্যাকে এরূপ কষ্ট দিতেছ? অবিলম্বে ইহার শরীর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন কর।" তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত জীব ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীমতী কাত্যায়নীর শরীরাবলম্বনে উত্তর করিল, "গয়ায় পিণ্ডদানে প্রতিশ্রুত হইয়া যদি আপনি আমার বর্তমান কষ্টের অবসান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার দুহিতার শরীর এখনি ছাড়িতে স্বীকৃত হইতেছি। আপনি যখনি ঐ উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইবেন, তখন হইতে ইহার আর কোন অসুস্থতা থাকিবে না, একথা আমি আপনার নিকটে অঙ্গীকার করিতেছি।" অনন্তর শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঐ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমি যত শীঘ্র পারি ৺গয়াধামে গমনপূর্বক তোমার অভিলাষ সম্পাদন করিব এবং পিণ্ডদানের পরে তুমি যে নিশ্চয় উদ্ধার হইলে, ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ নিদর্শন পাইলে বিশেষ সুখী হইব।" তখন প্রেত বলিল, "ঐ বিষয়ের নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপে সম্মুখস্থ নিম্ব-বৃক্ষের বৃহত্তম ডালটি আমি ভাঙ্গিয়া যাইব, জানিবেন।" হৃদয়রাম বলিলেন, উক্ত ঘটনাই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে ৺গয়াধামে যাত্রা করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল এবং উহার কিছুকাল পরে উক্ত বৃক্ষের ডালটি সহসা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সকলে ঐ প্রেতের উদ্ধার হইবার কথা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছিল। শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীও তদবধি সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইয়াছিলেন। হৃদয়রাম-কথিত পূর্বোক্ত ঘটনাটি কতদূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম যে এই সময়ে ৺গয়াদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, একথায় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৺গয়াধামে ক্ষুদিরামের দেবস্বপ্ন

সন ১২৪১ সালের শীতের কোন সময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বারাণসী[1] ও ৺গয়াধামদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত স্থানে ৺বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া যখন তিনি গয়াক্ষেত্রে পৌঁছিলেন, তখন চৈত্রমাস পড়িয়াছে। মধুমাসে ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ডপ্রদানে পিতৃপুরুষসকলের অক্ষয় পরিতৃপ্তি হয় জানিয়াই বোধ হয় তিনি ঐ মাসে গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় এক মাসকাল তথায় অবস্থানপূর্বক তিনি যথাবিহিত ক্ষেত্রকার্যসকলের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডপ্রদান করিলেন। ঐরূপে যথাশাস্ত্র পিতৃকার্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বিশ্বাসী হৃদয়ে ঐ দিন যে কতদূর তৃপ্তি ও শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। পিতৃঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করিয়া তিনি যেন আজ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীভগবান তাঁহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে ঐ কার্য সমাধা করিতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞ অন্তর অভূতপূর্ব দীনতা ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দিবাভাগে তো কথাই নাই, রাত্রিকালে নিদ্রার সময়েও ঐ শান্তি ও উল্লাস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে না যাইতে তিনি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন, তিনি যেন শ্রীমন্দিরে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মসম্মুখে পুনরায় পিতৃপুরুষসকলের উদ্দেশ্যে পিণ্ডপ্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা যেন দিব্য জ্যোতির্ময় শরীরে উহা সানন্দে গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন! বহুকাল পরে তাঁহাদিগের দর্শনলাভ করিয়া তিনি যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছেন না; ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদিগের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার দেখিতে লাগিলেন, যেন অদৃষ্টপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃপুরুষগণ সসম্ভ্রমে,

সংযতভাবে দুই পার্শ্বে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দিরমধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে সুখাসীন এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করিতেছেন। দেখিলেন, নবদূর্বাদল-শ্যাম জ্যোতির্মণ্ডিততনু ঐ পুরুষ স্নিগ্ধপ্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অবলোকনপূর্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন! যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া তিনি যেন তখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক হৃদয়ের আবেগে কতপ্রকার স্তুতি ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঐ দিব্য পুরুষ যেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া বীণানিস্যন্দি মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব!" স্বপ্নেরও অতীত ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার যেন আনন্দের অবধি রহিল না, কিন্তু পরক্ষণেই চিরদরিদ্র তিনি তাঁহাকে কি খাইতে দিবেন, কোথায় রাখিবেন ইত্যাদি ভাবিয়া গভীর বিষাদে পূর্ণ হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন, "না, না প্রভু, আমার ঐরূপ সৌভাগ্যের প্রয়োজন নাই; কৃপা করিয়া আপনি যে আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন এবং ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; সত্য সত্য পুত্র হইলে দরিদ্র আমি আপনার কি সেবা করিতে পারিব!" এই অমানব পুরুষ যেন তখন তাঁহার ঐরূপ করুণ বচন শুনিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "ভয় নাই, ক্ষুদিরাম, তুমি যাহা প্রদান করিবে তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব; আমার অভিলাষ পূরণ করিতে আপত্তি করিও না।" শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এই কথা শুনিয়া যেন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি পরস্পরবিপরীত ভাবসমূহ তাঁহার অন্তরে যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে এককালে স্তম্ভিত ও জ্ঞানশূন্য করিল। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কামারপুকুরে প্রত্যাগমন

নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম কোথায় রহিয়াছেন, তাহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলেন না। পূর্বোক্ত স্বপ্নের বাস্তবতা তাঁহাকে এককালে অভিভূত করিয়া রাখিল। পরে ধীরে ধীরে তাঁহার যখন স্থূল জগতের জ্ঞান উপস্থিত হইল, তখন শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন স্মরণ করিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। পরিণামে তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় স্থিরনিশ্চয় করিল, দেবস্বপ্ন কখনও বৃথা হয় না—নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ তাঁহার গৃহে শীঘ্রই জন্মপরিগ্রহ করিবেন—বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয় তাঁহাকে পুনরায় পুত্রমুখ অবলোকন করিতে হইবে। অনন্তর ঐ অদ্ভুত স্বপ্নের সাফল্য পরীক্ষা না করিয়া কাহারও নিকট তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প তিনি মনে মনে স্থির করিলেন এবং কয়েক দিন পরে ৺গয়াধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সন ১২৪২ সালের বৈশাখে কামারপুকুরে উপস্থিত হইলেন।

---

[1] কেহ কেহ বলেন, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বহুপূর্বে এক সময়ে দেরেপুর হইতে তীর্থগমনপূর্বক শ্রীবৃন্দাবন, ৺অযোধ্যা, ও ৺বারাণসী দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং উহার কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ঐ তীর্থযাত্রার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের রামকুমার ও কাত্যায়নী নামকরণ করিয়াছিলেন। শেষবারে তিনি কেবলমাত্র ৺গয়াধামদর্শন করিয়াই বাটী ফিরিয়াছিলেন।

১.৬. চতুর্থ অধ্যায়: চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অনুভব

অবতারপুরুষের আবির্ভাবকালে তাঁহার জনক-জননীর দিব্য অনুভবাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রকথা

জগৎপাবন মহাপুরুষসকলের জন্মপরিগ্রহ করিবার কালে তাঁহাদিগের জনক-জননীর জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভব ও দর্শনসমূহ উপস্থিত হইবার কথা পৃথিবীস্থ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, মায়াদেবীতনয় বুদ্ধ, মেরীনন্দন ঈশা, শ্রীভগবান শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি যে-সকল মহামহিম পুরুষপ্রবর মানবমনের ভক্তিশ্রদ্ধাপূত পূজার্ঘ্য অদ্যাবধি প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জনক-জননীর সম্বন্ধেই ঐরূপ কথা শাস্ত্রনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা এখানে স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে -

যজ্ঞাবশিষ্ট পাত্রাবশেষ বা চরু ভোজন করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রপ্রমুখ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জননীগণের গর্ভধারণের কথা কেবলমাত্র রামায়ণপ্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে ও পরে তাঁহারা যে বহুবার উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে জগৎপাতা শ্রীভগবান বিষ্ণুর অংশসম্ভূত ও দিব্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, একথাও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী তাঁহার গর্ভপ্রবেশকালে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন মূর্তিমান ঈশ্বররূপে অনুভব করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্মগ্রহণের পরক্ষণ হইতে প্রতিদিন তাঁহাদিগের জীবনে নানা অদ্ভুত উপলব্ধির কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের গর্ভপ্রবেশকালে শ্রীমতী মায়াদেবী দর্শন করিয়াছিলেন, জ্যোতির্ময় শ্বেত হস্তীর আকার ধারণপূর্বক কোন পুরুষপ্রবর যেন তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তাঁহার সৌভাগ্যদর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ যাবতীয় দেবগণ যেন তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন।

শ্রীভগবান ঈশার জন্মগ্রহণকালে তজ্জননী শ্রীমতী মেরী অনুভব করিয়াছিলেন, নিজ স্বামী শ্রীযুত যোষেফের সহিত সঙ্গতা হইবার পূর্বেই যেন তাঁহার গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে - অননুভূতপূর্ব দিব্য আবেশে আবিষ্ট ও তন্ময় হইয়াই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীভগবান শঙ্করের জননী অনুভব করিয়াছিলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্যদর্শন ও বরলাভেই তাঁহার গর্ভধারণ হইয়াছে।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জননী শ্রীমতী শচীদেবীর জীবনেও পূর্বোক্ত প্রকার নানা দিব্য অনুভব উপস্থিত হইবার কথা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রমুখ গ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম ঈশ্বরের সপ্রেম উপাসনাকে মুক্তিলাভের সুগম পথ বলিয়া মানবের নিকট নির্দেশ করিয়াছে; তাহাদিগের সকলেই ঐরূপে ঐ বিষয়ে একমত হওয়ায় নিরপেক্ষ বিচারকের মনে স্বতই প্রশ্নের উদয় হয়, উহার ভিতর বাস্তবিক কোন সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি-না এবং মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে বর্ণিত ঐসকল আখ্যায়িকার ভিতর কতটা গ্রহণ এবং কতটা বা ত্যাগ করা বিধেয়।

ঐ শাস্ত্রকথার যুক্তিনির্দেশ

যুক্তি অন্যপক্ষে মানবকে ইঙ্গিত করিয়া থাকে যে, কথাটার ভিতর কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কারণ, বর্তমান যুগের বিজ্ঞান যখন উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতারই উদার চরিত্রবান পুত্রোৎপাদনের সামর্থ্য স্বীকার করিয়া থাকে, তখন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও ঈশাদির ন্যায় মহাপুরুষগণের জনক-জননী যে বিশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন, একথা গ্রহণ করিতে হয়। তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ সকল পুরুষোত্তমকে জন্মপ্রদানকালে তাঁহাদিগের মন সাধারণ মানবাপেক্ষা

অনেক উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করিয়াছিল এবং ঐরূপে উচ্চ ভূমিতে অবস্থানের জন্যই তাঁহারা ঐ কালে অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদির অধিকারী হইয়াছিলেন।

সহজে বিশ্বাসগম্য না হইলেও ঐসকল কথা মিথ্যা বলিয়া ত্যাজ্য নহে

কিন্তু পুরাণেতিহাস ঐ বিষয়ক নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেও এবং যুক্তি ঐকথা ঐরূপে সমর্থন করিলেও, মানবমন উহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারে না। কারণ, উহা সর্বোপরি নিজ প্রত্যক্ষের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেজন্য আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি, পরকাল প্রভৃতি বিষয়সকলেও অপরোক্ষানুভূতির পূর্বে কখনও নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারে না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি অসাধারণ বা অলৌকিক বলিয়াই কোন বিষয়কে ত্যাজ্য মনে করে না - কিন্তু স্বয়ং সাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া স্থিরভাবে তদ্বিষয়ে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ প্রমাণসকল সংগ্রহে অগ্রসর হয় এবং উপযুক্ত কালে তদ্বিষয় মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ অথবা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, যে মহাপুরুষের জীবনেতিহাস আমরা লিখিতে বসিয়াছি, তাঁহার জন্মকালে তাঁহার জনক-জননীর জীবনেও নানা দিব্যদর্শন ও অনুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। সুতরাং সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে ঐরূপ কয়েকটি কথা পাঠককে বলিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীমতী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে ঐরূপ সকল কথা আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গয়া হইতে ফিরিয়া ক্ষুদিরামের চন্দ্রাদেবীর ভাব-পরিবর্তন দর্শন

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ৺গয়াধামে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম যে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, গৃহে ফিরিয়া তাহার কথা কাহাকেও না বলিয়া তিনি নীরবে উহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্তন প্রথমেই তাঁহার নয়নে পতিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, মানবী চন্দ্রা এখন যেন সত্য সত্যই দেবীত্ব পদবীতে আরূঢ়া হইয়াছেন! কোথা হইতে একটা সর্বজনীন প্রেম আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া সংসারের বাসনাময় কোলাহল হইতে তাঁহাকে যেন অনেক উচ্চে তুলিয়া রাখিয়াছে। আপনার সংসারের চিন্তা অপেক্ষা শ্রীমতী চন্দ্রার মনে এখন অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশিসকলের সংসারের চিন্তাই প্রবল হইয়াছে। নিজ সংসারের কর্তব্যপালন করিতে করিতে তিনি দশবার ছুটিয়া যাইয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া আসেন এবং আহার্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসকলের ভিতর যাহার যে বস্তুর অভাব দেখেন, আপন সংসার হইতে লুকাইয়া লইয়া যাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঐসকল তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আবার ৺রঘুবীরের সেবা সারিয়া স্বামীপুত্রাদিকে ভোজন করাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে স্বয়ং ভোজনে বসিবার পূর্বে শ্রীমতী চন্দ্রা পুনরায় তাহাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসেন, তাহাদিগের সকলের ভোজন হইয়াছে কি-না। যদি কোন দিন দেখিতে পান যে, কোন কারণে কাহারও আহার জুটে নাই, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাদরে বাটীতে আনয়নপূর্বক নিজের অন্ন ধরিয়া দিয়া স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে সামান্য জলযোগমাত্র করিয়া দিন কাটাইয়া দেন।

চন্দ্রাদেবীর অপত্যস্নেহের প্রসারদর্শন

শ্রীমতী চন্দ্রা প্রতিবেশী বালকবালিকাগণকে চিরকাল অপত্যনির্বিশেষে ভালবাসিতেন। ক্ষুদিরাম দেখিলেন, তাঁহার সেই অপত্যস্নেহ এখন যেন দেবতাসকলের উপরও প্রসারিত হইয়াছে। কুলদেবতা ৺রঘুবীরকে তিনি এখন আপন পুত্রগণের অন্যতমরূপে সত্য সত্যই দর্শন করিতেছেন এবং ৺শীতলাদেবীর ও ৺রামেশ্বর বাণলিঙ্গটিও যেন তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐসকল দেবতার সেবাপূজাকালে ইতিপূর্বে তাঁহার অন্তর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে সর্বদা পূর্ণ থাকিত; ভালবাসা আসিয়া সেই ভয়কে যেন এখন কোথায় অন্তর্হিত করিয়াছে। দেবতাগণের

নিকটে তাঁহার এখন আর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, লুকাইবার এবং চাহিবার যেন কিছুই নাই! আছে কেবল তৎস্থলে আপনার হইতে আপনার বলিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান করা, তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্য সর্বস্বপ্রদানের ইচ্ছা এবং তাঁহাদিগের সহিত চিরসম্বন্ধ হওয়ার অনন্ত উল্লাস।

তদ্দর্শনে ক্ষুদিরামের চিন্তা ও সঙ্কল্প

ক্ষুদিরাম বুঝিলেন, ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ দেবভক্তি ও নির্ভর-প্রসূত উল্লাসই সরলহৃদয়া চন্দ্রাকে এখন অধিকতর উদারস্বভাবা করিয়াছে। উহাদিগের প্রভাবেই তিনি এখন কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে বা পর ভাবিতে পারিতেছেন না। কিন্তু স্বার্থপর পৃথিবীর লোক তাঁহার এই অপূর্ব উদারতার কথা কি কখনও যথাযথভাবে গ্রহণ করিবে? - কখনই না। তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি বা 'পাগল' বলিবে, অথবা কঠোরতর ভাষায় তাঁহাকে নির্দেশ করিবে। ঐরূপ ভাবিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাদেবীর দেব-স্বপ্ন

ঐরূপ অবসর আসিতে বিলম্বও হইল না। সরলপ্রাণা চন্দ্রা স্বামীর নিকট নিজ চিন্তাটি পর্যন্ত কখনও গোপন করিতে পারিতেন না। বয়স্যাদিগের নিকটেই তিনি অনেক সময় মনের সকল কথা বলিয়া ফেলিতেন, তা পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা যাঁহার সহিত তাঁহার নিকট সম্বন্ধ ঈশ্বর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিকট ঐসকল গোপন করিবেন কিরূপে? অতএব ৺গয়াদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বাটী ফিরিলেই কয়েকদিন ধরিয়া চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে তাঁহার অনুপস্থিতকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, দেখিয়াছিলেন, অথবা অনুভব করিয়াছিলেন - সেই সমস্ত কথা সুবিধা পাইলেই যখন তখন বলিতে লাগিলেন। ঐরূপ অবসরে একদিন বলিলেন, "দেখ, তুমি যখন ৺গয়া গিয়াছিলে, তখন একদিন রাত্রিকালে এক অদ্‌ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম, যেন এক জ্যোতির্ময় দেবতা আমার শয্যাধিকার করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তুমি, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম কোন মানবের ঐরূপ রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক, ঐরূপ দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখনও মনে হইতে লাগিল তিনি যেন শয্যায় রহিয়াছেন। পরক্ষণে মনে হইল, মানুষের নিকট দেবতা আবার কোন্ কালে ঐরূপে আসিয়া থাকেন? তখন মনে হইল, তবে বুঝি কোন দুষ্ট লোক কোন মন্দ অভিসন্ধিতে ঘরে ঢুকিয়াছে এবং তাহার পদশব্দাদির জন্য আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। ঐকথা মনে হইয়াই বিষম ভয় হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলাম; দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই, গৃহদ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ তেমনি রহিয়াছে। তত্রাচ ভয়ে সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। ভাবিলাম, কেহ হয়তো কৌশলে অর্গল খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং আমাকে জাগরিতা হইতে দেখিয়াই পলাইয়া পুনরায় কৌশলে অর্গলবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। প্রভাত হইতে না হইতে ধনী কামারনী ও ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নকে ডাকাইলাম এবং তাহাদিগকে সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কি বুঝ বল দেখি, সত্য সত্যই কি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল? আমার সহিত পল্লীর কাহারও বিরোধ নাই, কেবল মধু যুগীর সহিত সেদিন সামান্য কথা লইয়া কিছু বচসা হইয়াছিল - সেই কি আড়ি করিয়া ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল?' তখন তাহারা দুইজনে হাসিতে হাসিতে আমাকে অনেক তিরস্কার করিল। বলিল, 'মর মাগী, বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হলি নাকি যে, স্বপ্ন দেখে এইরূপে ঢলাচ্ছিস্! অপর লোক একথা শুনলে বলবে কি বল্ দেখি? তোর নামে একেবারে অপবাদ রটিয়ে দেবে। ফের যদি ওকথা কাউকে বলবি তো মজা দেখতে পাবি!' তাহারা ঐরূপ বলাতে ভাবিলাম, তবে স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। আর ভাবিলাম একথা আর কাউকে বলিব না, কিন্তু তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমাকে বলিব।

শিবমন্দিরে চন্দ্রাদেবীর দিব্য দর্শন ও অনুভব

"আর একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, ৺মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য হইয়া ধনীকে ঐ কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া এককালে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলাম। পরে ধনীর শুশ্রূষায় চৈতন্য হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। সে শুনিয়া প্রথমে অবাক হইল, পরে বলিল, 'তোমার বায়ুরোগ হইয়াছে।' আমার কিন্তু তদবধি মনে হইতেছে ঐ জ্যোতি যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে! ঐ কথাও ধনী এবং প্রসন্নকে বলিয়াছিলাম। তাহারা শুনিয়া আমাকে 'নির্বোধ' 'পাগল' ইত্যাদি কত কি বলিয়া তিরস্কার করিল এবং মনের ভ্রম হইতে অথবা বায়ুগুল্ম নামক ব্যাধি হইতে ঐরূপ অনুভব হইতেছে, এইরূপ নানা কথা বুঝাইয়া ঐ অনুভবের কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিল। তোমাকে ভিন্ন ঐ কথা আর কাহাকেও বলিব না নিশ্চয় করিয়া তদবধি এতদিন চুপ করিয়া আছি। আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? ঐরূপ দর্শন কি আমার দেবতার কৃপায় হইয়াছে, অথবা বায়ুরোগে হইয়াছে? এখনও আমার কিন্তু মনে হয়, আমার যেন গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।"

ঐসকল কথা কাহাকেও না বলিতে চন্দ্রাদেবীকে ক্ষুদিরামের সতর্ক করা

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ৺গয়ায় নিজ স্বপ্নের কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীমতী চন্দ্রার সকল কথা শুনিলেন এবং উহা রোগজনিত নাও হইতে পারে, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "এখন হইতে ঐরূপ দর্শন ও অনুভবের কথা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিও না; শ্রীশ্রীরঘুবীর কৃপা করিয়া যাহাই দেখান তাহা কল্যাণের জন্য, এই কথা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে। ৺গয়াধামে অবস্থানকালে, শ্রীশ্রীগদাধর আমাকেও অলৌকিক উপায়ে জানাইয়াছেন, আমাদিগকে পুনরায় পুত্রমুখ দর্শন করিতে হইবে।" শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী দেবপ্রতিম স্বামীর ঐরূপ কথা শুনিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া এখন হইতে পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীরঘুবীরের মুখাপেক্ষিণী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন আসিয়া ব্রাহ্মণদম্পতির পূর্বোক্ত কথোপকথনের পরে ক্রমে তিন চারি মাস অতীত হইল। তখন সকলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ক্ষুদিরাম-গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী সত্য সত্যই পুনরায় অন্তর্বত্নী হইয়াছেন। গর্ভধারণ করিবার কালে রমণীর রূপলাবণ্য সর্বত্র বর্ধিত হইতে দেখা যায়। চন্দ্রাদেবীরও তাহাই হইয়াছিল। ধনীপ্রমুখ তাঁহার প্রতিবাসিনীগণ বলিত, এইবার গর্ভধারণ করিয়া তিনি যেন অন্যান্য বার অপেক্ষা অধিক রূপলাবণ্যশালিনী হইয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার উহা দেখিয়া জল্পনা করিত, 'বুড়ো বয়সে গর্ভবতী হইয়া মাগীর এত রূপ! বোধ হয় ব্রাহ্মণী এবার প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিতা হইবে।'

চন্দ্রাদেবীর পুনরায় গর্ভধারণ ও ঐকালে তাঁহার দিব্য-দর্শনসমূহ

সে যাহা হউক, গর্ভবতী হইয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দিব্যদর্শন ও অনুভবসকল দিন দিন বর্ধিত হইয়াছিল। শুনা যায়, এই সময়ে তিনি প্রায় নিত্যই দেবদেবীসকলের দর্শনলাভ করিতেন; কখন বা অনুভব করিতেন, তাঁহাদিগের শ্রীঅঙ্গনিঃসৃত পুণ্যগন্ধে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে; কখন বা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইতেন। আবার শুনা যায়, সকল দেব-দেবীর উপরেই তাঁহার মাতৃস্নেহ যেন এইকালে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; শুনা যায়, এইকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন ঐসকল দর্শন ও অনুভবের কথা নিজ স্বামীর নিকটে বলিয়া কেন তাঁহার ঐরূপ হইতেছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া ঐসকলের জন্য শঙ্কিতা হইতে নিষেধ করিতেন। ঐ কালের একদিনের ঘটনা আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, এখানে বিবৃত করিতেছি।

শ্রীমতী চন্দ্রা তাঁহার স্বামীর নিকটে সেদিন ভয়চকিতা হইয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন, দেব, শিবমন্দিরের সম্মুখে জ্যোতিদর্শনের দিন হইতে মধ্যে মধ্যে কত যে দেব-দেবীর দর্শন পাইয়া থাকি, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদিগের অনেকের মূর্তি আমি ইতিপূর্বে কখনও ছবিতেও দেখি নাই। আজ দেখি, হাঁসের উপর চড়িয়া একজন আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া ভয় হইল; আবার রৌদ্রের তাপে তাহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মন কেমন করিতে লাগিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওরে বাপ্ হাঁসেচড়া ঠাকুর রৌদ্রে তোর মুখখানি যে শুকাইয়া গিয়াছে; ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যা!' সে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল! আর দেখিতে পাইলাম না। ঐরূপ কত মূর্তি দেখি! পূজা বা ধ্যান করিয়া নহে - সহজ অবস্থায় যখন তখন দেখিয়া থাকি। কখন কখন আবার দেখিতে পাই, তাহারা যেন মানুষের মত হইয়া সম্মুখে আসিতে আসিতে বায়ুতে মিলাইয়া গেল। কেন ঐরূপ সব দেখিতে পাই, বল দেখি? আমার কি কোন রোগ হইল? সময়ে সময়ে ভাবি আমাকে গোসাঁইয়ে[1] পাইল না কি? শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তখন তাঁহাকে ৺গয়ায় দৃষ্ট নিজ স্বপ্নের কথা বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, অশেষ সৌভাগ্যের ফলে তিনি এবার পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পুণ্যসংস্পর্শেই তাঁহার ঐরূপ দিব্য দর্শনসমূহ উপস্থিত হইতেছে। স্বামীর উপর অসীম বিশ্বাসশালিনী চন্দ্রার হৃদয় তাঁহার ঐসকল কথা শুনিয়া দিব্য ভক্তিতে পূর্ণ হইল এবং নবীন বলে বলশালিনী হইয়া তিনি নিশ্চিন্তা হইলেন।

ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পূতস্বভাবা গৃহিণী শ্রীশ্রীরঘুবীরের একান্ত শরণাগত থাকিয়া যাঁহার শুভাগমনে তাঁহাদিগের জীবন ঐশী ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ-পুত্রের মুখদর্শন-আশায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

---

[1] শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যুর পরে নানা দৈব উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় পল্লীবাসিগণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, উক্ত গোস্বামী বা তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তি মরিয়া প্রেত হইয়া গোস্বামীদিগের বাটীর সম্মুখে যে বৃহৎ বকুল গাছ ছিল, তাহাতে অবস্থান করিতেন। ঐ বিশ্বাসপ্রভাবেই লোকে ঐ সময়ে কাহারও কোনরূপ দিব্যদর্শন উপস্থিত হইলে বলিত, ‘উহাকে গোসাঁইয়ে পাইয়াছে।’ সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবী সেইজন্যই এই সময়ে ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

১.৭. পঞ্চম অধ্যায়: মহাপুরুষের জন্মকথা

মহাপুরুষের জন্মকথা

শরৎ, হেমন্ত ও শীত অতীত হইয়া ক্রমে ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হইল। শীত ও গ্রীষ্মের সুখসম্মিলনে মধুময় ফাল্গুন স্থাবরজঙ্গমের ভিতর নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া আজ ষষ্ঠ দিবস সংসারে সমাগত। জীবজগতে একটা বিশেষ উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমের প্রেরণা সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মানন্দের এক কণা সকলের মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাদিগকে সরস করিয়া রাখিয়াছে–ঐ দিব্যোজ্জ্বল আনন্দকণার কিঞ্চিদধিক মাত্রা পাইয়াই কি এই কাল সংসারের সর্বত্র এত উল্লাস আনয়ন করিয়া থাকে?

চন্দ্রাদেবীর আশঙ্কা ও স্বামীর কথায় আশ্বাসপ্রাপ্তি

৺রঘুবীরের ভোগ রাঁধিতে রাঁধিতে আসন্নপ্রসবা শ্রীমতী চন্দ্রা প্রাণে আজ দিব্য উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কখন কি হয়; এখনই যদি প্রসবকাল উপস্থিত হয় তাহা হইলে গৃহে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে, অদ্যকার ঠাকুরসেবা চালাইয়া লইবে। তাহা হইলে উপায়? ভীতা হইয়া তিনি ঐকথা স্বামীকে নিবেদন করিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, "ভয় নাই, তোমার গর্ভে যিনি শুভাগমন করিয়াছেন, তিনি ৺রঘুবীরের পূজাসেবায় বিঘ্নোৎপাদন করিয়া কখনই সংসারে প্রবেশ করিবেন না–ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস; অতএব নিশ্চিন্তা হও, অদ্যকার মত ঠাকুরসেবা তুমি নিশ্চয় চালাইতে পারিবে; কল্য হইতে আমি উহার জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং ধনীকেও বলা হইয়াছে যাহাতে সে অদ্য হইতে রাত্রে এখানেই শয়ন করিয়া থাকে।" শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরূপ কথায় দেহে নবীন বলসঞ্চার অনুভব করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে পুনরায় গৃহকর্মে ব্যাপৃতা হইলেন। ঘটনাও ঐরূপ হইল–৺রঘুবীরের মধ্যাহ্ন-ভোগ এবং সান্ধ্যশীতলাদি কর্ম পর্যন্ত সেদিন নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গেল। রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও রামকুমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ধনী আসিয়া চন্দ্রাদেবীর সহিত এক কক্ষে শয়ন করিয়া রহিল। ৺রঘুবীরের ঘর ভিন্ন বাটীতে বসবাসের জন্য দুইখানি চালাঘর ও একখানি রন্ধনশালা মাত্র ছিল, এবং অপর একখানি ক্ষুদ্র চালাঘরে একপার্শ্বে ধান্য কুটিবার জন্য একটি ঢেঁকি এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য একটি উনান বিদ্যমান ছিল। স্থানাভাবে শেষোক্ত চালাখানিই শ্রীমতী চন্দ্রার সূতিকাগৃহরূপে নির্দিষ্ট রহিল।

গদাধরের জন্ম

রাত্রি-অবসান হইতে প্রায় অর্ধদণ্ড অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে চন্দ্রাদেবীর প্রসবপীড়া উপস্থিত হইল। ধনীর সাহায্যে তিনি পূর্বোক্ত ঢেঁকিশালে গিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রার জন্য ধনী তখন তৎকালোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া জাতককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিল, ইতিপূর্বে তাহাকে যেখানে রক্ষা করিয়াছিল, সেই স্থান হইতে সে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! ভয়ত্রস্তা হইয়া ধনী প্রদীপ উজ্জ্বল করিল এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, রক্তক্লেদময় পিচ্ছিল ভূমিতে ধীরে ধীরে হড়কাইয়া ধান্য সিদ্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর প্রবেশপূর্বক সে বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ কোন শব্দ করে নাই। ধনী তখন তাহাকে যত্নে উঠাইয়া লইল এবং পরিষ্কৃত করিয়া দীপালোকে ধরিয়া দেখিল, অদ্‌ভুত, প্রিয়দর্শন বালক যেন ছয় মাসের ছেলের মত বড়। প্রতিবেশী লাহাবাবুদের বাটী হইতে তখন প্রসন্নপ্রমুখ চন্দ্রাদেবীর দুই-চারিজন বয়স্যা সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে–ধনী তাহাদিগের নিকটে এ সংবাদ ঘোষণা করিল এবং পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীযুক্ত

ক্ষুদিরামের তপস্বী দরিদ্র কুটির শুভ শঙ্খারাবে পূর্ণ হইয়া মহাপুরুষের শুভাগমনবার্তা সংসারে প্রচার করিল।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম নবাগত বালকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে যাইয়া দেখিলেন, জাতক বিশেষ শুভক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলেন –

গদাধরের শুভ জন্ম-মুহূর্ত সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা

ঐদিন সন ১২৪২ সালের অথবা ১৭৫৭ শকাব্দের ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, শুক্লপক্ষ, বুধবার। রাত্রি একত্রিশ দণ্ড অতীত হইয়া অর্ধদণ্ডমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শুভা দ্বিতীয়া তিথি ঐ সময়ে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সহিত সংযুক্তা হইয়া সংসারে সিদ্ধিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। বালকের জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র ও বুধ একত্র মিলিত রহিয়াছে এবং শুক্র, মঙ্গল ও শনি তুঙ্গস্থান অধিকারপূর্বক তাহার অসাধারণ জীবনের পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে। আবার মহামুনি পরাশরের মত অবলম্বনপূর্বক দেখিলে রাহু ও কেতু গ্রহদ্বয়কে তাঁহার জন্মকালে তুঙ্গস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপরি, বৃহস্পতি তুঙ্গাভিলাষিরূপে বর্তমান থাকিয়া বালকের অদৃষ্টের উপর বিশেষ শুভ প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

গদাধরের রাশ্যাশ্রিত নাম

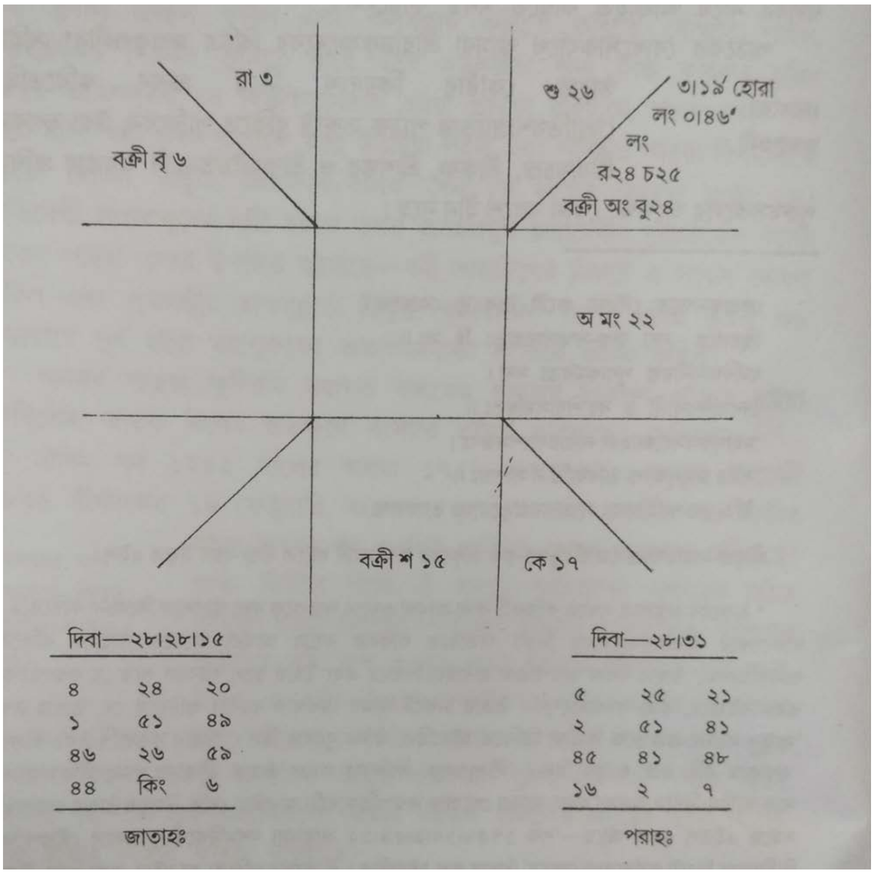
অতঃপর বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ্‌গণ নবজাত বালকের জন্মক্ষণ পরীক্ষাপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, জাতক যেরূপ উচ্চলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্র নিঃসন্দেহে নির্দেশ করে যে, ঐরূপ ব্যক্তি ধর্মবিৎ ও মাননীয় হইবেন এবং সর্বদা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহুশিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন; এবং নবীন ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধিলাভপূর্বক সর্বত্র সকল লোকের পূজ্য হইবেন।[1] শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মন উহাতে বিস্ময়পূর্ণ হইল। তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, ৺গয়াধামে তিনি যে দেবস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সত্য সত্যই পূর্ণ হইল। অনন্তর জাতকর্ম সমাপনপূর্বক বালকের রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র স্থির করিলেন এবং ৺গয়াধামে অবস্থানকালে নিজ বিচিত্র স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে শ্রীযুক্ত গদাধর নামে অভিহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

গদাধরের জন্মকুণ্ডলী

পাঠকের বোধসৌকর্যার্থে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচিত্র জন্মকুণ্ডলীর[2] সহিত তাঁহার কোষ্ঠীর কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করিতেছি। জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ পাঠক তদ্দৃষ্টে বুঝিতে পারিবেন, উহা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদি অবতারপ্রথিত পুরুষসকলের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

গদাধরের জন্মপত্রিকার কিয়দংশ

শুভমস্তু। শক-নরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ ১৭৫৭।১০।৫।৫৯।২৮।২৯ সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, রাত্রি অবসানে (অর্ধদণ্ড রাত্রি থাকিতে) কুম্ভলগ্নে প্রথম নবাংশে জন্ম। কুম্ভরাশি, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রথম পাদে জন্ম। রাত্রিজাত দণ্ডাদিঃ ৩১।০।১৪, সূর্যোদয়াদিষ্ট দণ্ডাদিঃ ৫৯।২৮।২৯, অক্ষাংশ ২২।৩৪, পলভা ৫।১।৫।১০।



চান্দ্রফাল্গুনস্য শুক্লপক্ষীয়-দ্বিতীয়া জন্মতিথিঃ।

পূর্বভাদ্রপদ-নক্ষত্র-মানং ৬০।১৫।০

তস্য ভোগ্যদণ্ডাদিঃ ৫২।১২।৩১

ভুক্ত-দণ্ডাদিঃ ৮।২।২৯

(শকাব্দা ১৭৫৭), এতচ্ছকীয় সৌর-ফাল্গুনস্য ষষ্ঠ-দিবসে, বুধবাসরে, শুক্লপক্ষীয়-দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ, পূর্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রস্য প্রথমচরণে সিদ্ধিযোগে, বালবকরণে এবং পঞ্চাঙ্গ-সংশুদ্ধৌ, রাত্রি চতুর্দশ-বিপলাধিকৈকত্রিংশদ্দণ্ড-সময়ে অয়নাংশোদ্ভব-শুভ-কুম্ভলগ্নে (লগ্নস্ফুট-রাশ্যাদি ১০।৩।১´৯।´৫´৩।´২´০), শনৈশ্চরস্য ক্ষেত্রে, সূর্যস্য হোরায়াং সূর্যসুতস্য দ্রেক্কাণে, শুক্রস্য নবাংশে, বৃহস্পতের্দ্বাদশাংশে, কুজস্য ত্রিংশাংশে এবং ষড়্‌বর্গ পরিশোধিতে পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিতকুম্ভরাশিস্থিতে চন্দ্রে বুধস্য যামার্ধে, জীবস্য দণ্ডে, কোণস্থে গুরৌ কেন্দ্রস্থে বুধে চন্দ্রে চ লগ্নস্থে চন্দ্রে, ত্রিগ্রহযোগে, ধর্মকর্মাধিপয়োঃ শুক্রভৌময়োঃ তুঙ্গস্থিতয়োঃ, বর্গোত্তমস্থে লগ্নাধিপে শনৌ চ তুঙ্গে, পরাশরমতেন তু রাহুকেতোস্তুঙ্গস্থয়োঃ (যতঃ উক্তং, 'রাহোস্তু বৃষভং কেতোর্বৃশ্চিকং তুঙ্গসঙ্গিতম্' ইত্যাদিপ্রমাণাৎ) অতএব উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে, অসাধারণ পুণ্যভাগ্যযোগে, শুক্লপক্ষে নিশিজন্মহেতোঃ বিংশোত্তরী দশাধিকারে জন্ম, এতেন বৃহস্পতের্দশায়াং, তথা দেশভেদেন দশাধিকারনিয়মাচ্চ অষ্টোত্তরীয়-রাহোর্দশায়াং, অশেষগুণালঙ্কৃত-স্বধর্মনিষ্ঠ-ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়-মহোদয়স্য (সহধর্মিণী-দয়াবতী-চন্দ্রমণি-দেবী-মহোদয়ায়াঃ গর্ভে) শুভ তৃতীয়পুত্রঃ সমজনি। তস্য রাশ্যাশ্রিতং নাম শম্ভুরাম দেবশর্মা। প্রসিদ্ধনাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ। সাধনাসিদ্ধিপ্রাপ্ত-জগদ্বিখ্যাতনাম শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব-মহোদয়ঃ।" [3]

অনন্তর প্রিয়দর্শন পুত্রের মুখ দর্শন এবং তাহার অসাধারণ ভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রমণি আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন এবং যথাকালে তাহার

নিষ্ক্রামণ ও নামকরণাদি সম্পন্ন করিয়া অশেষ যত্নের সহিত তাহার লালনপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

---

[1] ধর্মস্থানাধিপে তুঙ্গে ধর্মস্থে তুঙ্গখেচরে।

গুরুণা দৃষ্টিসংযোগে লগ্নেশে ধর্মসংস্থিতে।।

কেন্দ্রস্থানগতে সৌম্যে গুরৌ চৈব তু কোণভে।

স্থিরলগ্নে যদা জন্ম সম্প্রদায়প্রভুঃ হি সঃ।।

ধর্মবিন্মাননীয়স্তু পুণ্যকর্মরতঃ সদা।

দেবমন্দিরবাসী চ বহুশিষ্যসমন্বিতঃ।।

মহাপুরুষসংজ্ঞোঽয়ং নারায়ণাংশসম্ভবঃ।

সর্বত্র জনপূজ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।

ইতি ভৃগুসংহিতায়াং সম্প্রদায়প্রভুযোগঃ তৎফলঞ্চ।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী হইতে উক্ত বচন উদ্‌ধৃত হইল।

[2] ঠাকুরের জন্মকাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা এখানে পাঠককে বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিবার কালে আমরা অনেকে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'তাঁহার যথার্থ জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে এবং উহার স্থলে বহুকাল পরে যে জন্মপত্রিকা করান হইয়াছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ।' তাঁহার নিকটে আমরা একথাও বহুবার শুনিয়াছি যে, তাঁহার জন্ম 'ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে হইয়াছিল, ঐদিন বুধবার ছিল।' তাঁহার কুম্ভরাশি এবং তাঁহার 'জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র ও বুধ ছিল।' 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখিবার কালে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর যথাযথ সাল-তারিখ-নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষোক্ত জন্মপত্রিকাখানি আনাইয়া দেখি, উহাতে তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে - 'শক ১৭৫৬।১০।৯।৫৯।১২ ফাল্গুনস্য দশমদিবসে বুধবাসরে গৌরপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ পূর্বভাদ্রনক্ষত্রে' তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ঐ সালের পঞ্জিকা আনাইয়া দেখা গেল, উক্ত কোষ্ঠীতে উল্লিখিত সালের ঐ দিবসে কৃষ্ণপক্ষ নবমী তিথি এবং শুক্রবার হয়। সুতরাং উক্ত জন্মপত্রিকাখানিকে ঠাকুর কেন ভ্রমপূর্ণ বলিতেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া উহা পরিত্যাগপূর্বক পুরাতন পঞ্জিকাসকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কোন্ শকের ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় বুধবার এবং রবি, চন্দ্র ও বুধ কুম্ভরাশিতে একত্র মিলিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে ঐরূপ দুইটি দিন পাওয়া গেল, একটি ১৭৫৪ শকে এবং দ্বিতীয়টি ১৭৫৭ শকে। তন্মধ্যে প্রথমটিকে আমরা ত্যাগ করিলাম। কারণ ১৭৫৪ শক ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে, তাঁহার মুখে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তদপেক্ষা ৩ বৎসর ২ মাস বাড়াইয়া তাঁহার আয়ুগণনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ১৭৫৭ শককে তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে তাঁহার জীবৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ তাঁহার যে জন্মোৎসব করিতেন, তৎকালে তিনি নিজ বয়স সম্বন্ধে যেরূপ নির্ণয় করিতেন, তাহা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার পরমায়ু গণনা করিতে হয় না। সুদ্ধ তাহাই নহে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, ঠাকুরের বিবাহকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর বয়স ৫ বৎসর মাত্র ছিল - ঐবিষয়েও কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন, ঠাকুর দেহরক্ষা করিলে সমবেত ভক্তগণ কাশীপুর-শ্মশানের মৃত্যু-নির্ণায়ক (রেজেস্টারী)

পুস্তকে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর লিখাইয়া দিয়াছিলেন - তাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের আবশ্যক হয় নাই। ঐসকল কারণে আমরা ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া অবধারিত করিলাম।

ঐরূপ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু কলিকাতা, বহুবাজার, ২ নম্বর রাসবিহারী ঠাকুর লেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্যের নষ্ট কোষ্ঠী-উদ্ধারের অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মকুণ্ডলী প্রেরণ করি এবং তদ্দৃষ্টে গণনা করিয়া ঠাকুরের জন্মকুণ্ডলী নির্ণয় করিয়া দিতে অনুরোধ করি। তিনিও ঐ বিষয় গণনাপূর্বক ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া স্থির করেন।

ঐরূপে ১৭৫৭ শকে বা সন ১২৪২ সালেই ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল, এ কথায় দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমরা শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়কে তদনুসারে ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া দিতে অনুরোধ করি এবং তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উহা সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

ঠাকুরের ব্রাহ্মমুহূর্তে জন্মের কথা আমরা কেবলমাত্র কোষ্ঠীগণনায় স্থির করি নাই; কিন্তু ঠাকুরের পরিবারবর্গের মুখে শ্রুত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেও নির্ণয় করিয়াছি। তাঁহারা বলেন, ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরে হড়কাইয়া সূতিকাগৃহে অবস্থিত ধান্য সিদ্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর পড়িয়া ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত শিশুর যে ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা অন্ধকারে বুঝিতে পারা যায় নাই। পরে আলোক আনিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে উক্ত চুল্লীর ভিতর হইতে বাহির করা হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, ১৭৫৭ শকের ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয়ায় ঠাকুরের জন্ম যেরূপ অদ্‌ভুত লগ্নে হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া সম্যক্ উপলব্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-ঘটনাসমূহ কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া দেখিয়া ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্র যথার্থই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, ঠাকুরের ভ্রমপূর্ণ পুরাতন কোষ্ঠী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত তাঁহার বিশুদ্ধ কোষ্ঠী এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মকুণ্ডলীদর্শনে গণনাপূর্বক ঠাকুরের যে জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া দেন, সে সমস্ত বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

[3] শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী হইতে পূর্বোক্তাংশ উদ্‌ধৃত হইল।

১.৮. ষষ্ঠ অধ্যায়: বাল্যকথা ও পিতৃবিয়োগ

রামচাঁদের গাভীদান

শাস্ত্রে আছে, শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারপুরুষসকলের জনক-জননী, তাঁহাদিগের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে ও পরে নানারূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবরক্ষিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেও পরক্ষণেই অপত্যস্নেহের বশবর্তী হইয়া ঐ কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং তাঁহাদিগের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তদীয় গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারা যায়। কারণ, তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মুখকমল দেখিয়া ৺গয়াক্ষেত্রের দেবস্বপ্ন, শিবমন্দিরের দিব্যদর্শন প্রভৃতির কথা এখন অনেকাংশে ভুলিয়া যাইলেন এবং তাহার যথাযথ পালন রক্ষণের জন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। উপার্জনক্ষম ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রামচাঁদের নিকটে মেদিনীপুরে পুত্রের জন্মসংবাদ প্রেরিত হইল। মাতুলের দরিদ্র সংসারে দুগ্ধের অভাব হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রেরণ করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ঐ চিন্তা নিবারণ করিলেন। ঐরূপে নবজাত শিশুর জন্য যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে লাগিল, তখনই তাহা নানাদিক হইতে অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ হইলেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবীর চিন্তার বিরাম হইল না। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

গদাধরের মোহিনীশক্তি

এদিকে নবজাত বালকের চিত্তাকর্ষণ-শক্তি দিন দিন বর্ধিত হইয়া জনক-জননীর উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, পরন্তু পরিবারস্থ সকলের এবং পল্লীবাসিনী রমণীগণের উপরেও নিজ আধিপত্য ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া বসিল। পল্লীরমণীগণ অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রাকে এখন নিত্য দেখিতে আসিতেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'তোমার পুত্রটিকে নিত্য দেখিতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল; নিত্যই আসিতে হয়!' নিকটবর্তী গ্রামসকল হইতে আত্মীয়া রমণীগণও ঐ কারণে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দরিদ্র কুটিরে এখন হইতে পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলের আদরযত্নে সুখপালিত হইয়া নবাগত শিশু ক্রমে পঞ্চমাস অতিক্রম করিল এবং তাহার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইল।

অন্নপ্রাশনকালে ধর্মদাস লাহার সাহায্য

পুত্রের অন্নপ্রাশনকার্যে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিজ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাই প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সমাপনপূর্বক ৺রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে প্রদান করিয়া ঐ কার্য শেষ করিবেন এবং তদুপলক্ষে দুই-চারি জন নিকট আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ করিবেন–কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পরম বন্ধু গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার গুপ্ত প্রেরণায় পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ আসিয়া তাঁহাকে সহসা ধরিয়া বসিলেন, পুত্রের অন্নপ্রাশন দিবসে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুরোধে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কারণ, পল্লীর সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে আমন্ত্রণ করিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আবার তাঁহাদিগের সকলকে বলিতে তাঁহার সামর্থ্য কোথায়? সুতরাং 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত ধর্মদাসের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ বিষয়ে স্থির করিতে আসিলেন এবং বন্ধুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই উপর উক্ত কার্যভার প্রদানপূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীযুক্ত ধর্মদাসও হৃষ্টচিত্তে অনেকাংশে আপন ব্যয়ে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপে গদাধরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে পল্লীর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কুটিরে

আসিয়া ৶রঘুবীরের প্রসাদভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে অনেক দরিদ্র ভিক্ষুকও ঐরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার তনয়ের দীর্ঘজীবন ও মঙ্গলকামনা করিয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রাদেবীর দিব্যদর্শন-শক্তির বর্তমান প্রকাশ

দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের বালচেষ্টাসমূহ মধুরতর হইয়া উঠিয়া চন্দ্রাদেবীর হৃদয়কে আনন্দ ও ভয়ের পুণ্য-প্রয়াগে পরিণত করিল। পুত্র জন্মিবার পূর্বে যিনি দেবতাদিগের নিকটে কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না, সেই তিনিই এখন প্রতিদিন তনয়ের কল্যাণকামনায় শতবার, সহস্রবার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সকরুণ নিবেদন তাঁহাদিগের চরণে অর্পণ করিয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তা হইতে পারিতেন না। ঐরূপে তনয়ের কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ শ্রীমতী চন্দ্রার ধ্যান-জ্ঞান হইয়া তাঁহার ইতিপূর্বের দিব্যদর্শনশক্তিকে যে এখন ঢাকিয়া ফেলিবে, একথা সহজে বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ঐ শক্তির সামান্য প্রকাশ তাঁহাতে এখনও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কখন বিস্ময়ে এবং কখন বা পুত্রের ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় পূর্ণ করিত। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনা যাহা আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এখানে বলিলে পাঠক পূর্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল –

ঐ বিষয়ক ঘটনা–গদাধরকে বড় দেখা

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন সাত-আট মাস হইবে। শ্রীমতী চন্দ্রা একদিন প্রাতে তাহাকে স্তন্যদানে নিযুক্তা ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে নিদ্রিত দেখিয়া মশকদংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে মশারির মধ্যে শয়ন করাইলেন; অনন্তর ঘরের বাহিরে যাইয়া গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল গত হইলে প্রয়োজনবশতঃ ঐ ঘরে সহসা প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, মশারির মধ্যে পুত্র নাই, তৎস্থলে এক দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ মশারি জুড়িয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বিষম আশঙ্কায় চন্দ্রা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে আসিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পুনরায় গৃহে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, বালক যেমন নিদ্রা যাইতেছিল তেমনি নিদ্রা যাইতেছে। শ্রীমতী চন্দ্রার তাহাতেও ভয় দূর হইল না। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, “নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা হইতে ঐরূপ হইয়াছে; কারণ আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি পুত্রের স্থলে এক দীর্ঘাকার পুরুষ শয়ন করিয়াছিল; আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই এবং সহসা ঐরূপ ভ্রম হইবার কোন কারণও নাই; অতএব শীঘ্র একজন বিজ্ঞ রোজা আনাইয়া সন্তানকে দেখাও, নতুবা কে জানে, এই ঘটনায় পুত্রের কোন অনিষ্ট হইবে কি-না!” শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, “যে পুত্রের জন্মের পূর্ব হইতে আমরা নানা দিব্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে এখনও ঐরূপ কিছু দেখা বিচিত্র নহে; অতএব উহা অপদেবতাকৃত–একথা তুমি মনে কখনও স্থান দিও না, বিশেষতঃ, বাটীতে ৶রঘুবীর স্বয়ং বিদ্যমান; উপদেবতাসকল এখানে কি কখন সন্তানের অনিষ্ট করিতে সক্ষম? অতএব নিশ্চিন্ত হও এবং একথা অন্য কাহাকেও আর বলিও না। জানিও ৶রঘুবীর সন্তানকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন।” শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরূপ বাক্যে তখন আশ্বস্তা হইলেন বটে, কিন্তু পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কার ছায়া তাঁহার মন হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত হইল না। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রাণের বেদনা সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত কুলদেবতা ৶রঘুবীরকে নিবেদন করিলেন।

গদাধরের কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্বমঙ্গলা

ঐরূপে আনন্দে, আবেগে, উৎসাহে, আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত গদাধরের জনক-জননীর দিন যাইতে লাগিল এবং বালক প্রথম দিন হইতে তাঁহাদিগের ও অন্য সকলের মনে যে মধুর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দিন দিন দৃঢ় ও ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে চারি-পাঁচ বৎসর অতীত হইল;

ঘটনার ভিতর ঐ কালের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সর্বমঙ্গলা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

গদাধরের বিদ্যারম্ভ

বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এইকালে বিস্ময় ও আনন্দে অবলোকন করিয়াছিলেন। কারণ চঞ্চল বালককে ক্রোড়ে করিয়া তিনি যখন নিজ পূর্বপুরুষদিগের নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তোত্র ও প্রণামাদি, অথবা রামায়ণ, মহাভারত হইতে কোন বিচিত্র উপাখ্যান তাহাকে শুনাইতে বসিতেন, তখন দেখিতেন, একবার মাত্র শুনিয়াই সে উহার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছে! আবার বহুদিন পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন, সে ঐসকল সমভাবে আবৃত্তি করিতে সক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবিষয়েও পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি বিষয়কে যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ ও ধারণা করে, অপর কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে আবার তেমনি উদাসীন থাকে—সহস্র চেষ্টাতেও ঐসকলে তাহার অনুরাগ অঙ্কুরিত হয় না। গণিতশাস্ত্রের নামতা প্রভৃতি শিখাইতে যাইয়া তিনি ঐ বিষয়ের আভাস পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, চপলমতি বালককে এত অল্প বয়সে ঐসকল শিখাইবার জন্য পীড়ন করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সে অত্যধিক চঞ্চল হইতেছে দেখিয়া পঞ্চম বর্ষেই তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে পাঠশালে পাঠাইতে লাগিলেন। বালক তাহাতে সমবয়স্ক সঙ্গীদিগের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ সুখী হইল এবং সপ্রেম ব্যবহারে শীঘ্রই তাহাদিগের এবং শিক্ষকের প্রিয় হইয়া উঠিল।

লাহাবাবুদের পাঠশালা

গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত নাট্যমণ্ডপে পাঠশালার অধিবেশন হইত এবং প্রধানতঃ তাঁহাদিগের ব্যয়েই একজন সরকার বা গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের ও নিকটস্থ গৃহস্থসকলের বালকগণকে অধ্যয়ন করাইতেন। ফলতঃ পাঠশালাটি লাহাবাবুরাই একরূপ পল্লীবালকগণের কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কুটিরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। প্রাতে ও অপরাহ্নে দুইবার করিয়া প্রতিদিন পাঠশালা খোলা হইত। ছাত্রগণ প্রাতে আসিয়া দুই-তিন ঘণ্টা পাঠ করিয়া স্নানাহার করিতে যে যাহার বাটীতে চলিয়া যাইত এবং অপরাহ্নে তিন-চারি ঘটিকার সময় পুনরায় সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত পাঠাভ্যাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক ছাত্রগণের অবশ্য এত অধিককাল পাঠাভ্যাস করিতে হইত না, কিন্তু তথায় হাজির থাকিতে হইত। সুতরাং পাঠের সময় পাঠাভ্যাস করিয়া তাহারা সেখানে বসিয়া থাকিত এবং কখন বা সঙ্গীদিগের সহিত ঐ স্থানের সন্নিকটে ক্রীড়ায় রত হইত। পাঠশালার পুরাতন ছাত্রেরা আবার নূতন ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিত এবং তাহারা পুরাতন পাঠ নিত্য অভ্যাস করে কি-না, তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিত।

এইরূপে একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত থাকিলেও পাঠশালার কার্য সুচারুরূপে চলিয়া যাইত। গদাধর যখন পাঠশালে প্রথম প্রবেশ করে, তখন শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার তথায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। উহার কিছুকাল পরে তিনি নানা কারণে ঐকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পাঠশালার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বালকের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের অভিজ্ঞতা

বালকের জন্মিবার পূর্বে তাহার মহৎ জীবনের পরিচায়ক-স্বরূপে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম যে-সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দর্শনাদি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল তাঁহার মনে চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বালকসুলভ চপলতায় সে এখন কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করিতেছে দেখিলেও তিনি তাহাকে মৃদুবাক্যে নিষেধ করা ভিন্ন কখনও কঠোরভাবে দমন করিতে সক্ষম

হইতেন না। কারণ, সকলের ভালবাসা পাইয়াই হউক বা নিজ স্বভাবগুণেই হউক, তাহাতে তিনি এখন সময়ে সময়ে অনাশ্রবতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐজন্য অপর পিতামাতাসকলের ন্যায় তাহাকে কখনও তাড়না করা দূরে থাকুক, তিনি ভাবিতেন, উহাই বালককে ভবিষ্যতে বিশেষরূপে উন্নত করিবে। ঐরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি দেখিতেন, দুরন্ত বালক কখন কখন পাঠশালায় না যাইয়া সঙ্গিগণকে লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে ক্রীড়ায় রত থাকিলে অথবা কাহাকেও না বলিয়া নিকটবর্তী কোন স্থলে যাত্রাগান শুনিতে যাইলেও যখন যাহা ধরিত, তাহা সম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হইত না; মিথ্যাসহায়ে নিজকৃত কোন কর্ম কখনও ঢাকিতে প্রয়াস পাইত না এবং সর্বোপরি তাহার প্রেমিক হৃদয় তাহাকে কখনও কাহারও অনিষ্টসাধন করিতে প্রবৃত্ত করিত না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু এক বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, হৃদয় স্পর্শ করে এমনভাবে কোন কথা না বলিতে পারিলে উহা বিধি বা নিষেধ যাহাই হউক-না-কেন, বালক উহার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সর্বদা তদ্বিপরীতাচরণ করিয়া বসে। উহা তাহার সকল বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসার পরিচায়ক হইলেও সংসারের সর্বত্র বিপরীত রীতির অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, কেহই বালককে ঐরূপে সকল বিষয়ের কারণ নির্দেশ করিয়া তাহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে না এবং তজ্জন্য অনেক সময়ে তাহার সদ্বিধিসকল মান্য না করিয়া চলিবার সম্ভাবনা। এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মনে বালকের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত চিন্তাসকল উদিত হইয়াছিল এবং এখন হইতে তিনি তাহার মনের ঐরূপ প্রকৃতি বুঝিয়া তাহাকে সতর্কভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ইহাই –

ঐ বিষয়ক ঘটনা

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বাটীর একরূপ পার্শ্বেই হালদারপুকুর নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান। পল্লীর সকলে উহার স্বচ্ছ সলিলে স্নান, পান ও রন্ধনাদি কার্য করিত। অবগাহনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষদিগের নিমিত্ত দুইটি বিভিন্ন ঘাট নির্দিষ্ট ছিল। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক বালকেরা স্নানার্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দিষ্ট ঘাটে অনেক সময়ে গমন করিত। দুই-চারিজন বয়স্যের সহিত গদাধর একদিন ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া জলে উল্লম্ফন-সন্তরণাদি দ্বারা বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। উহাতে স্নানের জন্য সমাগতা স্ত্রীলোকদিগের অসুবিধা হইতে লাগিল। সন্ধ্যাহ্নিককর্মে নিযুক্তা বর্ষীয়সী রমণীগণের অঙ্গে জলের ছিটা লাগায় নিষেধ করিয়াও তাঁহারা বালকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তোরা এ ঘাটে কি করতে আসিস? পুরুষদিগের ঘাটে যাইতে পারিস্ না? এ ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নানান্তে পরিধেয় বসনাদি ধৌত করে। জানিস্ না, স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গিনী দেখিতে নাই?” গদাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন দেখিতে নাই?” তিনি তাহাতে সে বুঝিতে পারে, এমন কোন কারণ নির্দেশ না করিয়া তাহাকে অধিকতর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন এবং বাটীতে পিতামাতাকে বলিয়া দিবেন ভাবিয়া বালকগণ তখন অনেকটা নিরস্ত হইল। গদাধর কিন্তু উহাতে মনে মনে অন্যরূপ সঙ্কল্প করিল। সে দুই-তিনদিন রমণীগণের স্নানের সময় পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনন্তর পূর্বোক্ত বর্ষীয়সী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিল, “পরশু চারিজন রমণীকে স্নানকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল ছয়জনকে এবং আজ আটজনকে ঐরূপ করিয়াছি, কিন্তু কই আমার কিছুই তো হইল না।” বর্ষীয়সী রমণী তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর নিকটে আগমনপূর্বক হাসিতে হাসিতে ঐ কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রা তাহাতে গদাধরকে অবসরকালে নিকটে পাইয়া মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, “ঐরূপ করিলে তোমার কিছু হয় না, কিন্তু রমণীগণ আপনাদিগকে বিশেষ অপমানিতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা আমার সদৃশা, তাঁহাদিগকে অপমান করিলে আমাকেই অপমান করা হয়। অতএব আর

কখনই ঐরূপে তাঁহাদিগের সম্মানের হানি করিও না। তাঁহাদিগের ও আমার মনে পীড়া দেওয়া কি ভাল?” বালকও তাহাতে বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ আচরণ আর কখনও করিল না।

গদাধরের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার

সে যাহা হউক, পাঠশালে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল না। সে অল্পকালের মধ্যেই সামান্যভাবে পড়িতে এবং লিখিতে সমর্থ হইল। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাহার বিদ্বেষ চিরদিন প্রায় সমভাবেই রহিল। অন্যদিকে বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী-শক্তি দিন দিন নানা নূতন দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। গ্রামের কুম্ভকারগণকে দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট যাতায়াত ও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং উহা তাহার ক্রীড়ার অন্যতমরূপে পরিগণিত হইল। পটব্যবসায়িগণের সহিত মিলিত হইয়া সে ঐরূপে চিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের কোথাও পুরাণকথা অথবা যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই সে তথায় গমন করিয়া শাস্ত্রোপাখ্যানসকল শিখিতে লাগিল এবং শ্রোতাদিগের নিকটে ঐসকল কিরূপে প্রকাশ করিলে তাহাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হয়, তাহা তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বালকের অপূর্ব স্মৃতি ও মেধা তাহাকে ঐসকল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল।

আবার সদানন্দ বালকের রঙ্গরসপ্রিয়তা তাহার অদ্ভুত অনুকরণশক্তিসহায়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া একদিকে যেমন তাহাকে নরনারীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব অভিনয় করিতে এই বয়স হইতেই প্রবৃত্ত করিল, অন্যদিকে তেমনি তাহার মনের স্বাভাবিক সরলতা ও দেবভক্তি তাহার জনক-জননীর দৈনন্দিন অনুষ্ঠানসকলের দৃষ্টান্তে দ্রুতপদে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ঐকথা যে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ ও স্বীকার করিয়াছে, তাহা দক্ষিণেশ্বরে আমাদের নিকটে উক্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে পাঠক বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারিবেন— “আমার জননী মূর্তিমতী সরলতাস্বরূপা ছিলেন। সংসারের কোন বিষয় বুঝিতেন না; টাকা পয়সা গণনা করিতে জানিতেন না। কাহাকে কোন্ বিষয় বলিতে নাই, তাহা না জানাতে আপনার পেটের কথা সকলের নিকটেই বলিয়া ফেলিতেন, সেজন্য লোকে তাঁহাকে ‘হাউড়ো’ বলিত এবং তিনি সকলকে আহার করাইতে বড় ভালবাসিতেন। আমার জনক কখনই শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই; পূজা, জপ, ধ্যানে দিনের ভিতর অধিককাল যাপন করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবার কালে ‘আয়াহি বরদে দেবি’ ইত্যাদি গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার বক্ষ স্ফীত ও রক্তিম হইয়া উঠিত এবং নয়নের অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইত; আবার, যখন পূজাদিতে নিযুক্ত না থাকিতেন, তখনও তিনি ৶রঘুবীরকে সাজাইবার জন্য সূচ সূতা ও পুষ্প লইয়া মালা গাঁথিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন। মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকে তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মান্য ভক্তি করিত।”

বালকের সাহস

বালকের অসীম সাহসের পরিচয়ও দিন দিন পাওয়া যাইতেছিল। বয়োবৃদ্ধেরাও যেখানে ভূত-প্রেতাদির ভয়ে জড়সড় হইত, বালক সেখানে অকুতোভয়ে গমনাগমন করিত। তাহার পিতৃষ্বসা শ্রীমতী রামশীলার উপর কখন কখন ৶শীতলাদেবীর ভাবাবেশ হইত। তখন তিনি যেন ভিন্ন এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। কামারপুকুরে ভ্রাতার নিকটে এই সময়ে অবস্থানকালে একদিন তাঁহার সহসা ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া পরিবারস্থ সকলের মনে ভয় ও ভক্তির উদয় করিয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ অবস্থা শ্রদ্ধার সহিত সন্দর্শন করিলেও কিন্তু গদাধর উহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। সে তাঁহার সন্নিকটে অবস্থানপূর্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল এবং পরে বলিয়াছিল, “পিসীমার ঘাড়ে যে আছে, সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়।”

বালকের অপরের সহিত মিলিত হইবার শক্তি

কামারপুকুরের অর্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভূরসুবো অথবা ভূরশোভা নামক গ্রামের বিশিষ্ট দাতা ও ভক্ত জমিদার মানিকরাজার কথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বে বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ছয় বৎসরের বালক গদাধর পিতার সহিত একদিন মানিকরাজার বাটীতে যাইয়া সকলের প্রতি এমন চিরপরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে মধুর ব্যবহার করিয়াছিল যে, সেদিন হইতেই সে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মানিকরাজার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বালককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিলেন, "সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নহে, ইহাতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞান হয়! তুমি যখন এদিকে আসিবে, বালককে সঙ্গে লইয়া আসিও, উহাকে দেখিলে পরম আনন্দ হয়।" শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইহার পরে নানা কারণে মানিকরাজার বাটীতে কিছুদিন যাইতে পারেন নাই। মানিকরাজা উহাতে নিজ পরিবারস্থ একজন রমণীকে সংবাদ লইতে এবং সুস্থ থাকিলে গদাধরকে কিছুক্ষণের জন্য ভূরসুবো গ্রামে আনয়ন করিতে পাঠান। বালক তাহাতে পিতার আদেশে সানন্দে উক্ত রমণীর সহিত আগমন করিয়াছিল এবং সমস্ত দিবস তথায় থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বে নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং কয়েকখানি অলঙ্কার উপহার লইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। গদাধর ক্রমে এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের এত প্রিয় হইয়া উঠে যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভূরসুবো যাইতে কয়েক দিন বিলম্ব করিলেই তাঁহারা লোক পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেন। ঐরূপে দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া বালক ক্রমে সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিল এবং শৈশবের মাধুর্য ঘনীভূত হইয়া তাহাকে এখন দিন দিন সকলের অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলিল। পল্লীবাসিনী রমণীগণ বাটীতে কোনরূপ সুখাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় তাহাকে উহার কিয়দংশ কেমন করিয়া ভোজন করাইবেন সেই কথাই অগ্রে চিন্তা করিতেন, সমবয়স্ক বালকবালিকাগণ তাহাদিগের ভোজ্যাংশ তাহার সহিত ভাগ করিয়া খাইয়া আপনাদিগকে অধিকতর পরিতৃপ্ত বোধ করিত এবং প্রতিবেশী সকলে তাহার মধুর কথা, সঙ্গীত ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার বালকসুলভ দৌরাত্ম্যসকল হৃষ্টচিত্তে সহ্য করিত।

গদাধরের ভাবুকতার অসাধারণ পরিণাম

এই কালের একটি ঘটনায় বালক তাহার জনকজননী এবং বন্ধুবর্গকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়াছিল। ঈশ্বর-কৃপায় গদাধর সুস্থ ও সবল শরীর লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং জন্মাবধি একাল পর্যন্ত তাহার বিশেষ কোনও ব্যাধি হয় নাই। বালক সেজন্য গগনচারী বিহঙ্গের ন্যায় অপূর্ব স্বাধীনতা ও চিত্তপ্রসাদে দিন যাপন করিত। শরীরবোধরাহিত্যই পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ভিষকগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। বালক জন্মাবধি ঐরূপ স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিতেছিল। তদুপরি তাহার স্বাভাবিক একাগ্র চিত্ত বিষয়বিশেষে যখন নিবিষ্ট হইত, তখন তাহার শরীরবুদ্ধির অধিকতর হ্রাস হইয়া তাহাকে যেন এককালে ভাবময় করিয়া তুলিত। বিশুদ্ধ-বায়ু-আন্দোলিত প্রান্তরের হরিৎ-সুন্দর ছবি, নদীর অবিরাম প্রবাহ, বিহঙ্গের কলগান এবং সর্বোপরি সুনীল অম্বর ও তন্মধ্যগত প্রতিক্ষণ-পরিবর্তনশীল অভ্রপুঞ্জের মায়ারাজ্য প্রভৃতি যখন যে পদার্থ আপন রহস্যময় প্রতিকৃতি তাহার মনের সম্মুখে আপন মহিমা প্রসারিত করিয়া উহাকে আকৃষ্ট করিত, বালক তখনই তাহাকে লইয়া আত্মহারা হইয়া ভাবরাজ্যের কোন এক সুদূর নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইত! বর্তমান ঘটনাটিও তাহার ভাবপ্রবণতা হইতে উপস্থিত হইয়াছিল।[1] প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালক নবজলধরক্রোড়ে বলাকাশ্রেণীর শ্বেতপক্ষবিস্তারপূর্বক সুন্দর স্বাধীন পরিভ্রমণ দেখিয়া এতদূর তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহার নিজ শরীরের ও জাগতিক অন্য সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ হইয়াছিল এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে প্রান্তর-পথে পড়িয়া গিয়াছিল। বয়স্যগণ তাহার ঐরূপ অবস্থা দর্শনে ভীত ও বিপন্ন হইয়া তাহার জনক-জননীকে সংবাদ প্রদান করে এবং তাহাকে ধরাধরি করিয়া প্রান্তর হইতে বাটীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চেতনালাভের কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সে আপনাকে পূর্বের

ন্যায় সুস্থ বোধ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী যে এই ঘটনায় বিষম ভাবিত হইয়াছিলেন এবং আর যাহাতে তাহার ঐরূপ অবস্থা না হয়, সেজন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। ফলতঃ তাঁহারা উহাতে বালকের মূর্চ্ছারূপ বিষম ব্যাধির সূচনা অবলোকন করিয়া ঔষধাদি-প্রয়োগে এবং শান্তিস্বস্ত্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বালক গদাধর কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ ঘটনাসম্বন্ধে পুনঃপুনঃ বলিয়াছিল, তাহার মন এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব ভাবে লীন হইয়াছিল বলিয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং বাহিরে অন্যরূপ দেখিলেও তাহার ভিতরে সংজ্ঞা এবং একপ্রকার অপূর্ব আনন্দের বোধ ছিল। সে যাহা হউক, তাহার ঐরূপ অবস্থা তখন আর না হওয়াতে এবং তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম না দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভাবিয়াছিলেন, উহা কোনরূপ বায়ুর প্রকোপে সাময়িক উপস্থিত হইয়াছিল; এবং শ্রীমতী চন্দ্রা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন, উপদেবতার নজর লাগিয়া তাহার ঐরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ঘটনার জন্য তাঁহারা বালককে পাঠশালায় কিছুকাল যাইতে দেন নাই। বালক তাহাতে প্রতিবেশিগণের গৃহে এবং গ্রামের সর্বত্র যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

রামচাঁদের বাটীতে ৺দুর্গোৎসব

ঐরূপে বালকের সপ্তম বর্ষের অর্ধেক কাল অতীত হইয়া ক্রমে সন ১২৪৯ সালের শারদীয়া মহাপূজার সময় উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কৃতী ভাগিনেয় রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। কর্মস্থল বলিয়া মেদিনীপুরে বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত করিলেও সেলামপুর নামক গ্রামই তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল; এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঐ স্থানেই বাস করিত। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ ঐ গ্রামে প্রতিবৎসর শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। হৃদয়রামের নিকট শুনিয়াছি, পূজার সময় রামচাঁদের সেলামপুরের ভবন অষ্টাহকাল গীতবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত এবং ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিতবিদায়, দরিদ্রভোজন ও তাহাদিগকে বস্ত্রদান প্রভৃতি কার্যে তথায় আনন্দের স্রোত ঐকালে নিরন্তর প্রবাহিত হইত। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ এতদুপলক্ষে তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাতুলকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া এই সময়ে কিছুকাল তাঁহার সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। বর্তমান বৎসরেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ রামচাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ যথাসময়ে প্রাপ্ত হইলেন।

ক্ষুদিরাম ও রামকুমারের রামচাঁদের বাটীতে গমন

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এখন অষ্টষষ্টিতমবর্ষ প্রায় অতিক্রম করিতে বসিয়াছেন এবং কিছুকাল পূর্ব হইতে মধ্যে মধ্যে অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সুদৃঢ় শরীর এখন বলহীন হইয়াছিল। সেজন্য প্রিয় ভাগিনেয় রামচাঁদের সাদরাহ্বানে তাঁহার ভবনে যাইতে ইচ্ছা হইলেও তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নিজ দরিদ্র কুটির এবং পরিবারবর্গকে, বিশেষতঃ গদাধরকে কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেও তিনি অন্তরে একটা কারণশূন্য অথচ প্রবল অনিচ্ছা অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, শরীর যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এ বৎসর না যাইলে আর কখনও যাইতে পারিবেন কিনা তাহা কে বলিতে পারে? অতএব স্থির করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পরক্ষণে নিশ্চয় করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইলে শ্রীমতী চন্দ্রা বিশেষ উদ্বিগ্না থাকিবেন। অগত্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের সহিত যাইয়া পূজার কয়টা দিন রামচাঁদের নিকটে কাটাইয়া আসিবেন, ইহাই স্থির করিলেন এবং রঘুবীরকে প্রণামপূর্বক সকলের নিকট বিদায়গ্রহণ এবং গদাধরের মুখচুম্বন করিয়া তিনি পূজার কিছুদিন পূর্বে সেলামপুর যাত্রা করিলেন। রামচাঁদ পূজার্হ মাতুল ও ভ্রাতা রামকুমারকে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন।

ক্ষুদিরামের ব্যাধি ও দেহত্যাগ

এখানে পৌঁছিবার পরেই কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের গ্রহণীরোগ পুনরায় দেখা দিল এবং তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী দিন মহানন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু নবমীর দিনে আনন্দের হাটে নিরানন্দ উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ব্যাধি প্রবলভাব ধারণ করিল। রামচাঁদ উপযুক্ত বৈদ্যগণ আনিয়া এবং ভগ্নী হেমাঙ্গিনী ও রামকুমারের সাহায্যে সযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব হইতে সঞ্চিত রোগের উপশম হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নবমীর দিন ও রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া যাইয়া হিন্দুর বিশেষ পবিত্র সম্মেলনের দিন বিজয়াদশমী সমাগত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম অদ্য এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

ক্রমে অপরাহ্ন সমাগত হইলে রামচাঁদ প্রতিমা বিসর্জনপূর্বক সত্বর মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিতপ্রায়। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম অনেকক্ষণ হইতে নির্বাক হইয়া ঐরূপ জ্ঞানশূন্যের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন রামচাঁদ অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মামা, তুমি যে সর্বদা ‘রঘুবীর, রঘুবীর’ বলিয়া থাক, এখন বলিতেছ না কেন?” ঐ নাম শ্রবণ করিয়া সহসা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “কে, রামচাঁদ? প্রতিমাবিসর্জন করিয়া আসিলে। তবে আমাকে একবার বসাইয়া দাও।” অনন্তর রামচাঁদ, হেমাঙ্গিনী ও রামকুমার তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অতি সন্তর্পণে শয্যায় উপবেশন করাইয়া দিবামাত্র তিনি গম্ভীরস্বরে তিনবার ৺রঘুবীরের নামোচ্চারণপূর্বক দেহত্যাগ করিলেন। বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিলিত হইল—৺রঘুবীর ভক্তের পৃথক জীবনবিন্দু নিজ অনন্ত জীবনে সম্মিলিত করিয়া তাহাকে অমর ও পূর্ণ শান্তির অধিকারী করিলেন! পরে গভীর নিশীথে উচ্চ সঙ্কীর্তনে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেহ নদীকূলে আনীত হইলে উহাতে অগ্নিসংস্কার করা হইল। পরদিন ঐ সংবাদ অগ্রসর হইয়া কামারপুকুরের আনন্দধাম নিরানন্দে পূর্ণ করিল।

অনন্তর অশৌচান্তে শ্রীযুক্ত রামকুমার শাস্ত্রবিধানে বৃষোত্সর্গ এবং বহু ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ করিলেন। শুনা যায়, মাতুলের শ্রাদ্ধক্রিয়ায় শ্রীযুক্ত রামচাঁদ পাঁচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

---

[1] ঠাকুর এই ঘটনাসম্বন্ধে নিজমুখে যেরূপ বলিয়াছিলেন তজ্জন্য ‘সাধকভাব, দ্বিতীয় অধ্যায়’ দ্রষ্টব্য।

১.৯. সপ্তম অধ্যায়: গদাধরের কৈশোরকাল

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে তৎপরিবারবর্গের জীবনে যে-সকল পরিবর্তন উপস্থিত হইল

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেহাবসানে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইল। বিধাতার বিধানে শ্রীমতী চন্দ্রা দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর সুখে দুঃখে তাঁহাকে জীবনসহচররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে হারাইয়া তিনি যে এখন জগৎ শূন্য দেখিবেন এবং প্রাণে একটা চিরস্থায়ী অভাব প্রতিক্ষণ অনুভব করিবেন, ইহা বলিতে হইবে না। সুতরাং শ্রীশ্রীরঘুবীরের পাদপদ্মে শরণগ্রহণে চিরাভ্যস্ত তাঁহার মনের গতি এখন সংসার ছাড়িয়া সেইদিকেই নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল। কিন্তু মন ছাড়িতে চাহিলেও যতদিন না কাল পূর্ণ হয়, ততদিন সংসার তাঁহাকে ছাড়িবে কেন? সাত বৎসরের পুত্র গদাধর এবং চারি বৎসরের কন্যা সর্বমঙ্গলার চিন্তার ভিতর দিয়া প্রবেশলাভ করিয়া আবার সংসার তাঁহাকে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। সুতরাং ৺রঘুবীরের সেবায় এবং কনিষ্ঠ পুত্রকন্যার পালনে নিযুক্তা থাকিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দুঃখের দিন কোনরূপে কাটিতে লাগিল।

অন্যদিকে পিতৃবৎসল রামকুমারের স্কন্ধে এখন সংসারের সমগ্র ভার পতিত হওয়ায় তাঁহার বৃথা শোকে কালক্ষেপ করিবার অবসর রহিল না। শোকসন্তপ্তা জননী এবং তরুণবয়স্ক ভ্রাতা ও ভগ্নী যাহাতে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট না পায়, অষ্টাদশবর্ষীয় মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যাহাতে স্মৃতি ও জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপার্জনক্ষম হইয়া সংসারে সাহায্য করিতে পারে, স্বয়ং যাহাতে পূর্বাপেক্ষা আয়বৃদ্ধি করিয়া পারিবারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারেন—ঐরূপ শত চিন্তা ও কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার এখন দিন যাইতে লাগিল। তাঁহার কর্মকুশলা গৃহিণীও চন্দ্রাদেবীকে অসমর্থা দেখিয়া পরিবারবর্গের আহারাদি এবং অন্যান্য গৃহকর্মের বন্দোবস্তের অধিকাংশ ভার গ্রহণ করিলেন।

ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ জীবনে যত অভাব আনয়ন করে এত বোধ হয় অন্য কোন ঘটনা করে না। মাতার আদরযত্নই শৈশবে প্রধান অবলম্বন থাকে, সেজন্য পিতার দেহান্ত হইলেও শিশু তাঁহার অভাব তখন উপলব্ধি করে না। কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষের সহিত কৈশোরে উপস্থিত হইয়া সেই শিশু যখন পিতার অমূল্য ভালবাসার দিন দিন পরিচয়লাভ করিতে থাকে, স্নেহময়ী জননী তাহার যে-সকল অভাব পূর্ণ করিতে অসমর্থা, পিতার দ্বারা সেই সকল অভাব মোচিত হইয়া তাহার হৃদয় যখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, সে-সময়ে পিতৃবিয়োগ উপস্থিত হইলে তাহার জীবনে অভাববোধের পরিসীমা থাকে না। পিতৃবিয়োগে গদাধরের ঐরূপ হইয়াছিল। প্রতিদিন নানা ক্ষুদ্র ঘটনা তাহাকে পিতার অভাব স্মরণ করাইয়া তাহার অন্তরের অন্তর বিষাদের গাঢ় কালিমায় সর্বদা রঞ্জিত করিয়া রাখিত। কিন্তু তাহার হৃদয় ও বুদ্ধি এই বয়সেই অন্যাপেক্ষা অধিক পরিপক্ক হওয়ায় মাতার দিকে চাহিয়া সে উহা বাহিরে কখনও প্রকাশ করিত না। সকলে দেখিত, বালক পূর্বের ন্যায় সদানন্দে হাস্য-কৌতুকাদিতে কালযাপন করিতেছে। ভূতির খালের শ্মশান, মানিকরাজার আম্রকানন প্রভৃতি গ্রামের জনশূন্য স্থানসকলে তাহাকে কখন কখন একাকী বিচরণ করিতে দেখিলেও বালসুলভ চপলতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে সে তথায় উপস্থিত হইয়াছে, একথা কাহারও মনে উদয় হইত না। বালক কিন্তু এখন হইতে চিন্তাশীল ও নির্জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাহার চিন্তার বিষয় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

চন্দ্রাদেবীর প্রতি গদাধরের বর্তমান আচরণ

সমসমান অভাববোধই মানবকে সংসারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সেইজন্যই বোধ হয় বালক তাহার মাতার প্রতি এখন একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। সে পূর্বাপেক্ষা অনেক সময় এখন তাঁহার নিকটে থাকিতে এবং দেবসেবা ও গৃহকর্মাদিতে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে নিকটে থাকিলে জননী নিজ জীবনের অভাববোধ যে অনেকটা ভুলিয়া থাকেন, একথা লক্ষ্য করিতে বালকের বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু মাতার প্রতি বালকের আচরণ এখন কিছু ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল। কারণ, পিতার মৃত্যুর পর বালক কোন বিষয়লাভের জন্য চন্দ্রাদেবীকে পূর্বের ন্যায় আবদার করিয়া কখনও ধরিত না। সে বুঝিত, জননী ঐ বিষয়-দানে অসমর্থা হইলে তাঁহার শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করাইবে। ফলতঃ, পিতৃবিয়োগে মাতাকে সর্বদা রক্ষা করিবার ভাব তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল।

গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিলন

গদাধর পাঠশালায় যাইয়া পূর্বের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকিল, কিন্তু পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান শ্রবণ করা এবং দেব-দেবীর মূর্তিসকল গঠন করা তাহার নিকট এখন অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। পিতার অভাববোধ ঐ সকল বিষয়ের আনুকূল্যে অনেকাংশে বিস্মৃত হইতে পারা যায় দেখিয়াই বোধ হয় সে উহাদিগকে এখন বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়াছিল। বালকের অসাধারণ স্বভাব তাহাকে এইকালে অন্য এক অভিনব বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। গ্রামের অগ্নিকোণে পুরী যাইবার পথের উপর জমিদার লাহাবাবুরা যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৺জগন্নাথদর্শনে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার কালে সাধু-বৈরাগীরা অনেক সময় উহাতে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। গদাধর সংসারের অনিত্যতার কথা ইতিপূর্বে শ্রবণ করিয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুতে ঐ বিষয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়ও এখন লাভ করিয়াছিল। সাধু-বৈরাগীরা অনিত্য সংসার পরিত্যাগপূর্বক শ্রীভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কালযাপন করেন এবং সাধুসঙ্গ মানবকে চরম শান্তিদানে কৃতার্থ করে, পুরাণমুখে একথা জানিয়া বালক সাধুদিগের সহিত পরিচিত হইবার আশায় উক্ত পান্থনিবাসে এখন হইতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ধুনিমধ্যগত পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া তাঁহারা যেভাবে ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হন, ভিক্ষালব্ধ সামান্য আহার নিজ ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্বক যেভাবে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে প্রসাদগ্রহণ করেন, ব্যাধির প্রবল প্রকোপে পড়িলে যেভাবে তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষী থাকিয়া উহা অকাতরে সহ্য করিতে চেষ্টা করেন, আপনার বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যও তাঁহারা যেভাবে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করিতে পরাঙ্মুখ হন, আবার তাঁহাদিগের ন্যায় বেশভূষাকারী ভণ্ড ব্যক্তিগণ যেভাবে সর্বপ্রকার সদাচারের বিপরীতাচরণ করিয়া স্বার্থসুখসাধনের নিমিত্ত জীবনধারণ করে—ঐসমস্ত বিষয় বালকের এখন অবসরকালে লক্ষ্যের বিষয় হইল। ক্রমে সে যথার্থ সাধুগণকে দেখিলে রন্ধনাদির জন্য কাষ্ঠসংগ্রহ, পানীয় জল আনয়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যে সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মধুর আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে ভগবদ্ভজন শিখাইতে, নানাভাবে সদুপদেশ প্রদান করিতে এবং প্রসাদী ভিক্ষান্নের কিয়দংশ তাহাকে দিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশ্য যেসকল সাধু পান্থনিবাসে কোন কারণে অধিককাল বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সহিতই বালক ঐভাবে মিশিতে সমর্থ হইত।

সাধুদিগের সহিত মিলনে চন্দ্রাদেবীর আশঙ্কা ও তন্নিরসন

গদাধরের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কয়েকজন সাধু অত্যধিক পথশ্রমনিবারণের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে ঐরূপে অধিককাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের সহিত পূর্বোক্তভাবে মিলিত হইয়া শীঘ্রই তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের

সহিত তাহার ঐরূপে মিলিত হইবার কথা প্রথম প্রথম কেহই জানিতে পারিল না, কিন্তু বালক যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অধিককাল কাটাইতে লাগিল, তখন ঐ কথা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। কারণ, কোন কোন দিন সে তাঁহাদিগের নিকটে প্রচুর আহার করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আর কিছুই খাইল না এবং চন্দ্রাদেবী কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে সমস্ত কথা নিবেদন করিল। শ্রীমতী চন্দ্রা উহাতে প্রথম প্রথম উদ্বিগ্না হইলেন না, বালকের প্রতি সাধুগণের প্রসন্নতা আশীর্বাদস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু বালক যখন পরে কোনদিন বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া, কোনদিন তিলক ধারণ, আবার কোনদিন বা নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া সাধুদিগের ন্যায় কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়া গৃহে ফিরিয়া 'মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন, দেখ' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন চন্দ্রাদেবীর মন বিষম উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ভাবিলেন, সাধুরা তাঁহার পুত্রকে কোনও দিন ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না তো? উক্ত আশঙ্কার কথা গদাধরকে বলিয়া তিনি একদিন নয়নাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বালক উহাতে তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বস্তা করিয়াও শান্ত করিতে পারিল না। তখন সাধুদিগের নিকটে আর কখন যাইবে না বলিয়া সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল এবং জননীকে ঐকথা বলিয়া নিশ্চিন্তা করিল। অনন্তর পূর্বোক্ত সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে গদাধর শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাধুদিগের নিকটে উপস্থিত হইল এবং ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে জননীর আশঙ্কার কথা নিবেদন করিল। তাঁহারা তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে বালকের সহিত আগমনপূর্বক তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলেন যে, গদাধরকে ঐরূপ সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প তাঁহাদিগের মনে কখনও উদিত হয় নাই এবং পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে ঐরূপ অল্পবয়স্ক বালককে সঙ্গে লওয়া তাঁহারা অপহরণরূপ সাধুবিগর্হিত বিষম অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। চন্দ্রাদেবীর মনে তাহাতে পূর্বাশঙ্কার ছায়ামাত্র রহিল না এবং সাধুদিগের প্রার্থনায় তিনি বালককে তাঁহাদিগের নিকটে পূর্বের ন্যায় যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

গদাধরের দ্বিতীয়বার ভাবসমাধি

এইকালের অন্য একটি ঘটনাতেও শ্রীমতী চন্দ্রা গদাধরের জন্য বিষম চিন্তিতা হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনা সহসা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলে ধারণা করিলেও বুঝা যায়, বালকের ভাবপ্রবণতা এবং চিন্তাশীলতা প্রবৃদ্ধ হইয়াই উহাকে আনয়ন করিয়াছিল। কামারপুকুরের একক্রোশ আন্দাজ উত্তরে অবস্থিত আনুড় নামক গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা দেবী ৺বিশালাক্ষীকে একদিন দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যে সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ধর্মদাস লাহার পূতস্বভাবা কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী সেদিন বালকের ঐরূপ অবস্থা ভাবাবেশে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রাদেবী কিন্তু ঐকথা বিশ্বাস না করিয়া উহা বায়ুরোগ হইতে বা অন্য কোন কারণে হইয়াছে বলিয়া চিন্তিতা হইয়াছিলেন।[1] বালক কিন্তু এবারও পূর্বের ন্যায় বলিয়াছিল যে, ৺দেবীর চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মন লয় হইয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থার উদয় হইয়াছিল।

গদাধরের সেঙাত গয়াবিষ্ণু

ঐরূপে দুই বৎসরের অধিককাল অপগত হইল এবং বালক ক্রমে পিতার অভাব ভুলিয়া নিজ দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখে ব্যাপৃত থাকিতে অভ্যস্ত হইল। গদাধরের পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার পুত্র গয়াবিষ্ণুর সহিত বালকের এইকালে সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। একত্র পাঠ ও বিহারে বালকদ্বয় পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া ক্রমে পরস্পরকে সেঙাত বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল ও প্রতিদিন অনেক সময় একত্র কাটাইতে লাগিল এবং পল্লীবাসিনী রমণীগণ গদাধরকে পূর্বের ন্যায় স্নেহে বাটীতে আহ্বান ও ভোজন করাইবার কালে সে এখন নিজ সেঙাতকে সঙ্গে লইতে কখন ভুলিত না। বালকের

ধাত্রী কামারকন্যা ধনী মিষ্টান্ন-মোদকাদি সযত্নে প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিলে সে সেঙাতকে উহার অংশ প্রদান না করিয়া কখনও ভোজন করিত না। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত ধর্মদাস এবং গদাধরের অভিভাবকেরা বালকদ্বয়ের মধ্যে ঐরূপ সখ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

গদাধরের উপনয়নকালের বৃত্তান্ত

সে যাহা হউক, গদাধর নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত রামকুমার এখন তাহার উপনয়নের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কামারকন্যা ধনী ইতিপূর্বে এক সময়ে বালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন উপনয়নকালে তাহার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করে। বালকও তাহাতে তাহার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। দরিদ্রা ধনী তাহাতে বালকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদবধি যথাসাধ্য অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া সাগ্রহে ঐকালের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই কাল উপস্থিত দেখিয়া গদাধর এখন নিজ অগ্রজকে ঐকথা নিবেদন করিল। কিন্তু বংশে কখনও ঐরূপ প্রথার অনুষ্ঠান না হওয়ায় শ্রীযুক্ত রামকুমার উহাতে আপত্তি করিয়া বসিলেন। বালকও নিজ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐ বিষয়ে বিষম জেদ করিতে লাগিল। সে বলিল, ঐরূপ না করিলে তাহাকে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্রধারণে কখন অধিকারী হইতে পারে না। উপনয়নের কাল সন্নিকট দেখিয়া ইতিপূর্বেই সকল বিষয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল, বালকের পূর্বোক্ত জেদে ঐ কর্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে ঐ কথা শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিতে যত্নপর হইয়া তিনি শ্রীযুক্ত রামকুমারকে বলিলেন, ঐরূপ অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের বংশে ইতিপূর্বে না হইলেও উহা অন্যত্র বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ-পরিবারে দেখা গিয়া থাকে। অতএব উহাতে তাঁহাদিগের যখন নিন্দাভাগী হইতে হইবে না, তখন বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য ঐরূপ করিতে দোষ নাই। প্রবীণ পিতৃসুহৃৎ ধর্মদাসের কথায় তখন রামকুমার প্রভৃতি ঐ বিষয়ে আর আপত্তি করিলেন না এবং গদাধর হৃষ্টচিত্তে যথাবিধানে উপবীতধারণ করিয়া সন্ধ্যাপূজাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্যে মনোনিবেশ করিল। কামারকন্যা ধনীও তখন বালকের সহিত ঐভাবে সম্বদ্ধা হইয়া আপনার জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। উহার স্বল্পকাল পরেই বালক দশম বর্ষে পদার্পণ করিল।

পণ্ডিতসভায় গদাধরের প্রশ্ন-সমাধান

উপনয়ন হইবার কিছুকাল পরে একটি ঘটনায় গদাধরের অসাধারণ দিব্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পল্লীবাসী সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছিল।[2] গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটীতে কোনও বিশেষ শ্রাদ্ধবাসরে এক মহতী পণ্ডিতসভা আহূত হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণ ধর্মবিষয়ক কোন জটিল প্রশ্নের সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না। বালক গদাধর ঐসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের এমন সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছিল যে পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

গদাধরের ধর্মপ্রবৃত্তির পরিণতি ও তৃতীয়বার ভাবসমাধি

সে যাহা হউক, উপনয়ন হইবার পরে গদাধরের ভাবপ্রবণ হৃদয় নিজ প্রকৃতির অনুকূল অন্য এক বিষয় অবলম্বনের অবসর পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিল। পিতাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জীবন্ত বিগ্রহ ৺রঘুবীর কিরূপে কামারপুকুরের ভবনে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শুভাগমনের দিবস হইতে লক্ষ্মীজলার ক্ষুদ্র জমিখণ্ডে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সংসারের অভাব দূরীভূত হইয়াছিল এবং করুণাময়ী চন্দ্রাদেবী অতিথি-অভ্যাগতদিগকেও নিত্য অন্নদানে সমর্থা হইয়াছিলেন—ঐসকল কথা শুনিয়া বালক পূর্ব হইতেই উক্ত গৃহদেবতাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার

চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। সেই দেবতাকে স্পর্শ ও পূজা করিবার অধিকার এখন হইতে প্রাপ্ত হইয়া বালকের হৃদয় নবানুরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া সে এখন নিত্য তাঁহার পূজা ও ধ্যানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিল এবং যাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া পিতার ন্যায় তাহাকেও সময়ে সময়ে দর্শন ও আদেশ-দানে কৃতার্থ করেন, তজ্জন্য বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রামেশ্বর শিব এবং ৺শীতলামাতাও বালকের ঐ সেবার অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ঐরূপ সেবা পূজার ফলও উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। বালকের পূত হৃদয় উহাতে একাগ্র হইয়া স্বল্পকালেই তাহাকে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির অধিকারী করিল এবং ঐ সমাধিসহায়ে তাহার জীবনে নানা দিব্যদর্শনও সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপ সমাধি ও দর্শনের বিকাশ এই বৎসর শিবরাত্রিকালে তাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল।[3] বালক সেদিন যথারীতি উপবাসী থাকিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছিল। তাহার বন্ধু গয়াবিষ্ণু এবং অন্য কয়েকজন বয়স্যও সেদিন ঐ উপলক্ষে উপবাসী ছিল এবং প্রতিবেশী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিবমহিমাসূচক যাত্রার অভিনয় হইবে জানিয়া উহা শুনিয়া রাত্রিজাগরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। প্রথম প্রহরের পূজা সমাপ্ত করিয়া গদাধর যখন তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল, তখন সহসা তাহার বয়স্যগণ আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, পাইনদের বাটীতে তাহাকে শিব সাজিয়া কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। কারণ, যাত্রার দলে যে শিব সাজিত, সে পীড়িত হইয়া ঐ ভূমিকাগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। বালক উহাতে পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেও তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিলে তাহাকে সর্বক্ষণ শিবচিন্তাই করিতে হইবে, উহা পূজা করা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অধিকন্তু ঐরূপ না করিলে কত লোকের আনন্দের হানি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত; তাহারা সকলে উপবাসী রহিয়াছে এবং ঐরূপে রাত্রিজাগরণে ব্রত পূর্ণ করিবে মনস্থ করিয়াছে। গদাধর অগত্যা সম্মত হইয়া শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসরে নামিয়াছিল। কিন্তু জটা, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি-ভূষিত হইয়া সে শিবের চিন্তায় এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার কিছুমাত্র বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। পরে বহুক্ষণ অতীত হইলেও তাহার চেতনা হইল না দেখিয়া সে রাত্রির মত যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

গদাধরের পুনঃপুনঃ ভাবসমাধি

এখন হইতে গদাধরের ঐরূপ সমাধি মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। ধ্যান করিবার কালে এবং দেবদেবীর মহিমাসূচক সঙ্গীতাদি শুনিতে শুনিতে সে এখন হইতে তন্ময় হইয়া যাইত এবং তাহার চিত্ত স্বল্প বা অধিক ক্ষণের জন্য নিজাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্বিষয়সকল-গ্রহণে বিরত থাকিত। ঐ তন্ময়তা যেদিন প্রগাঢ় হইত, সেই দিনই তাহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইয়া সে জড়ের ন্যায় কিছুকাল অবস্থান করিত। ঐ অবস্থানিবৃত্তির পরে কিন্তু সে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিত, যে দেব অথবা দেবীর ধ্যান বা সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিতেছিল, তাঁহার সম্বন্ধে অন্তরে কোনরূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া সে আনন্দিত হইয়াছে। চন্দ্রাদেবীপ্রমুখ পরিবারস্থ সকলে উহাতে অনেক দিন পর্যন্ত সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে বালকের স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র হানি হইতে না দেখিয়া এবং তাহাকে সর্বকর্মকুশল হইয়া সদানন্দে কাল কাটাইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের ঐ আশঙ্কা ক্রমে অপগত হইয়াছিল। বারংবার ঐরূপ অবস্থার উদয় হওয়ায় বালকেরও ক্রমে উহা অভ্যস্ত ও প্রায় ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তাহার সূক্ষ্ম বিষয়সকলে দৃষ্টি প্রসারিত ও দেবদেবীবিষয়ক নানা তত্ত্ব উপলব্ধ হওয়ায় উহার আগমনে সে আনন্দিত ভিন্ন কখনও শঙ্কিত হইত না। সে যাহা হউক, বালকের ধর্মপ্রবৃত্তি এখন হইতে বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সে হরিবাসর, শিবের ও মনসার গাজন, ধর্মপূজা প্রভৃতি গ্রামের যেখানে যে ধর্মানুষ্ঠান হইতে লাগিল, সেখানেই উপস্থিত হইয়া সর্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে লাগিল। বালকের মহদুদার ধর্মপ্রকৃতি তাহাকে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষশূন্য করিয়া তাঁহাদিগকে এখন হইতে আপনার করিয়া লইল। গ্রামের প্রচলিত প্রথা তাহাকে ঐ বিষয়ে

সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কারণ বিষ্ণুপাসক, শিবভক্ত, ধর্মপূজক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অন্য গ্রামসকলের ন্যায় না হইয়া এখানে পরস্পরের প্রতি দ্বেষশূন্য হইয়া বিশেষ সদ্ভাবে বসবাস করিত।

গদাধরের বিদ্যার্জনে উদাসীনতার কারণ

ঐরূপে ধর্মপ্রবৃত্তির পরিণতি হইলেও কিন্তু গদাধরের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ এখন প্রবৃদ্ধ হয় নাই। পণ্ডিত ও ভট্টাচার্যাদি উপাধিভূষিত ব্যক্তিসকলের ঐহিক ভোগসুখ ও ধনলালসা দেখিয়া সে বরং তাঁহাদিগের ন্যায় বিদ্যার্জনে দিন দিন উদাসীন হইয়াছিল। কারণ, বালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এখন সকল ব্যক্তির কার্যের উদ্দেশ্যনিরূপণে প্রথমেই অগ্রসর করিত এবং তাঁহার পিতার বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি, সত্য, সদাচার ও ধর্মপরায়ণতাদি গুণসকলকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদিগের আচরণের মূল্যনির্দেশে প্রবৃত্ত করিত। ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বালক সংসারে প্রায় সকল ব্যক্তিরই অন্যরূপ উদ্দেশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আবার অনিত্য সংসারকে নিত্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা সর্বদা দুঃখে মুহ্যমান হয় দেখিয়া সে ততোধিক বিমর্ষও হইয়াছিল। ঐরূপ দেখিয়া শুনিয়া ভিন্নভাবে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে যে তাহার মনে সঙ্কল্পের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। পাঠক হয়তো পূর্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া বলিবেন, একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচার-শক্তির এতদূর বিকাশ হওয়া কি সম্ভবপর? উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাধারণ বালকসকলের ঐরূপ হয় না সত্য, কিন্তু গদাধর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিল না। অসাধারণ প্রতিভা, মেধা ও মানসিক সংস্কারসমূহ লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং অল্প বয়স হইলেও তাহার পক্ষে ঐরূপ কার্য বিচিত্র নহে। সেজন্য ঐরূপ হওয়া আমাদিগের নিকটে যেরূপই প্রতীয়মান হউক না কেন, আমরা অনুসন্ধানে ঘটনা যেরূপ জানিয়াছি, সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে উহা তদ্রূপই বলিয়া যাইতে হইবে।

গদাধরের শিক্ষা এখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল

সে যাহা হউক, প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসে ক্রমশঃ উদাসীন হইতে থাকিলেও গদাধর এখনও পূর্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে পাঠশালায় যাইতেছিল এবং মাতৃভাষায় লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থসকল পড়িতে এবং লিখিতে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থসকল সে এখন ভক্তির সহিত এমন সুন্দর ভাবে পাঠ করিত যে, লোকে তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইত। গ্রামের সরলচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেজন্য তাহার মুখে ঐসকল গ্রন্থ শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। বালকও তাহাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনে কখনও পরাঙ্‌মুখ হইত না। ঐরূপে সীতানাথ পাইন, মধু যুগী প্রভৃতি অনেকে ঐজন্য তাহাকে নিজ নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া তাহার মুখে প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবোপাখ্যান অথবা রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে অন্য কোন উপাখ্যান ভক্তিভরে শ্রবণ করিত।

রামায়ণ-মহাভারতাদি ভিন্ন কামারপুকুরে এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ দেব-দেবীদিগের প্রকট কাহিনীসমূহ গ্রাম্য কবিদিগের দ্বারা সরল পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত আছে। ঐরূপে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রকট হইবার কথা, যোগাদ্যার পালা, বন-বিষ্ণুপুরের ৺মদনমোহনজীর উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক দেব-দেবীর অলৌকিক চরিত্র এবং সাধুভক্তদিগের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিবার বৃত্তান্ত সময়ে সময়ে গদাধরের শ্রবণগোচর হইত। বালক নিজ শ্রুতিধরত্বগুণে ঐসকল শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিত এবং ঐরূপ উপাখ্যানের মুদ্রিত গ্রন্থ বা পুঁথি পাইলে কখন কখন উহা স্বহস্তে লিখিয়াও লইত। গদাধরের স্বহস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা প্রভৃতি আমরা কামারপুকুরের বাটীতে অনুসন্ধানে দেখিতে পাইয়া ঐ বিষয়ে জানিতে পারিয়াছিলাম। ঐসকল উপাখ্যানও যে বালক অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রামের সরলচিত্ত নরনারীর নিকটে এইকালে বহুবার অধ্যয়ন ও আবৃত্তি করিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গণিতশাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে ঐ বিষয়েও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠাকিয়া পর্যন্ত এবং পাটীগণিতে তেরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সামান্য গুণ-ভাগ পর্যন্ত তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু দশম বর্ষে উপনীত হইয়া ধ্যানের পরিণতিতে যখন তাহার মধ্যে মধ্যে পূর্বোক্তভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন তাহার অগ্রজ রামকুমারপ্রমুখ বাটীর সকলে তাহার বায়ুরোগ হইয়াছে ভাবিয়া তাহাকে যখন ইচ্ছা পাঠশালায় যাইতে এবং যাহা ইচ্ছা শিখিতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐজন্য কোন বিষয়ে তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না দেখিলেও শিক্ষক উহার জন্য তাহাকে কখনও পীড়ন করেন নাই। সুতরাং গদাধরের পাঠশালার শিক্ষা যে এখন হইতে বিশেষ অগ্রসর হইল না, একথা বলিতে হইবে না।

রামেশ্বরের ও সর্বমঙ্গলার বিবাহ

ঐরূপে দুই বৎসরকাল অতীত হইল এবং গদাধর ক্রমে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন দ্বাবিংশতি বর্ষে এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা নবমে পদার্পণ করিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার রামেশ্বরকে বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কামারপুকুরের নিকটবর্তী গৌরহাটি নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং রামসদয়কে নিজ ভগিনী সর্বমঙ্গলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। ঐরূপে রামেশ্বরের পরিবর্তে বিবাহসম্বন্ধ স্থির হওয়ায় কন্যাপক্ষীয়দিগকে পণ দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমারকে ব্যস্ত হইতে হইল না। রামকুমারের পারিবারিক জীবনে এই সময়ে অন্য একটি বিশেষ ঘটনাও উপস্থিত হইয়াছিল। যৌবনের অবসানেও তাঁহার সহধর্মিণী গর্ভধারণ না করায় সকলে তাঁহাকে বন্ধ্যা বলিয়া এতকাল নিরূপণ করিয়াছিল। তাঁহাকে এখন গর্ভবতী হইতে দেখিয়া পরিবারবর্গের মনে আনন্দ ও শঙ্কার যুগপৎ উদয় হইল। কারণ, গর্ভধারণ করিলেই তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইবে, একথা তাঁহাদিগের কেহ কেহ ইতিপূর্বে রামকুমারের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গর্ভবতী হইয়া রামকুমার-পত্নীর স্বভাবের পরিবর্তন

সে যাহা হউক, পত্নীর গর্ভধারণের কাল হইতে শ্রীযুক্ত রামকুমারের ভাগ্যচক্রে বিশেষ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। যে-সকল উপায়ে তিনি এতদিন বেশ দুপয়সা অর্জন করিতেছিলেন, সে-সকলে এখন আর পূর্বের ন্যায় অর্থাগম হইতে লাগিল না এবং তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যও এখন হইতে ভগ্ন হওয়ায় তিনি আর পূর্বের ন্যায় কর্মঠ রহিলেন না। তাঁহার পত্নীর আচরণসকলও এখন যেন ভিন্নাকার ধারণ করিল। তাঁহার পূজ্যপাদ পিতার সময় হইতে সংসারে নিয়ম প্রবর্তিত ছিল যে, অনুপবীত বালক ও পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ কখনও ৺রঘুবীরের পূজার পূর্বে জলগ্রহণ করিবে না। তাঁহার পত্নী এখন ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া বাটীর অন্য সকলে ঐ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সামান্য সামান্য বিষয়সকল অবলম্বন করিয়া তিনি পরিবারস্থ সকলের সহিত বিবাদ ও মনোমালিন্য উপস্থিত করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী ও নিজ স্বামী রামকুমারের কথাতেও ঐরূপ বিপরীতাচরণসকল হইতে নিরস্তা হইলেন না। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বভাবের পরিবর্তন হয় ভাবিয়া তাঁহারা ঐসকল আচরণের বিরুদ্ধে আর কিছু না বলিলেও কামারপুকুরের ধর্মের সংসারে এখন ঐরূপে শান্তির পরিবর্তে অনেক সময়ে অশান্তির উদয় হইতে থাকিল।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থার পরিবর্তন

আবার শ্রীযুক্ত রামকুমারের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন কৃতবিদ্য হইলেও বিশেষ উপার্জনক্ষম হইয়া উঠিলেন না। সুতরাং পরিবারবর্গের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত আয়ের হ্রাস হইয়া সংসারে পূর্বের ন্যায় সচ্ছলতা রহিল না। শ্রীযুক্ত রামকুমার ঐজন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত

থাকিয়াও ঐ বিষয়ের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। কে যেন ঐসকল উপায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদিগকে ফলবান হইতে দিল না! ঐরূপে চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া রামকুমারের জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল এবং দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া ক্রমে তাঁহার পত্নীর প্রসবকাল নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া তিনি নিজ পূর্বদর্শন স্মরণপূর্বক অধিকতর বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন।

রামকুমার-পত্নীর পুত্র-প্রসবান্তে মৃত্যু

ক্রমে ঐ কাল সত্য সত্যই উপস্থিত হইল এবং শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহধর্মিণী সন ১২৫৫ সালের কোন সময়ে এক পরম রূপবান তনয় প্রসবান্তে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সূতিকাগৃহেই স্বর্গারোহণ করিলেন। রামকুমারের দরিদ্র সংসারে ঐ ঘটনায় শোকের নিবিড় যবনিকা পুনরায় নিপতিত হইল।

---

[1] এই ঘটনার সবিস্তার বৃত্তান্তের জন্য 'সাধকভাব – ২য় অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।
[2] এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'গুরুভাব, পূর্বার্ধ – ৪র্থ অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।
[3] 'সাধকভাব' দ্বিতীয় আধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

১.১০. অষ্টম অধ্যায়: যৌবনের প্রারম্ভে

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা

পত্নী পরলোকে গমন করিলেন, কিন্তু রামকুমারের দুঃখ দুর্দিনের অবসান হইল না। বিদায়-আদায় কমিয়া যাওয়ায় অর্থের অভাবে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। লক্ষ্মীজলার জমিখণ্ডে পর্যাপ্ত ধান্য এখনও উৎপন্ন হইলেও বস্ত্রাদি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থসকলের অভাব সংসারে প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তদুপরি তাঁহার বৃদ্ধা মাতার ও মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের জন্য এখন নিত্য দুগ্ধের প্রয়োজন। সুতরাং ঋণ করিয়া ঐসকল প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল এবং ঋণজালের প্রতিদিন বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। অশেষ চিন্তা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও রামকুমার উহার প্রতিরোধে অসমর্থ হইলেন। তখন বন্ধুবর্গের পরামর্শে অন্যত্র গমন করিলে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত মনও উহাতে সাহ্লাদে সম্মতিদান করিল। কারণ, প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল যাঁহাকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া সংসার পাতিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি যে গৃহের সর্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গৃহ হইতে দূরে থাকিলেই এখন শান্তিলাভের সম্ভাবনা। সুতরাং কলিকাতা বা বর্ধমান কোথায় যাইলে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা, এই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল প্রথমোক্ত স্থানে যাওয়াই কর্তব্য; কারণ, সিহড়গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেশড়ার রামধন ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার পরিচিত অনেক ব্যক্তি কলিকাতায় যাইয়া উপার্জনের সুবিধালাভ করিয়া নিজ নিজ সংসারের বেশ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছে—একথা তাঁহার বন্ধুগণ নির্দেশ করিতে লাগিলেন। ঐসকল ব্যক্তি যে তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলে অনেকাংশে হীন, একথাও তাঁহারা তাঁহাকে বলিতে ভুলিলেন না। সুতরাং পত্নীবিয়োগের স্বল্পকাল পরেই শ্রীযুক্ত রামকুমার রামেশ্বরের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং ঝামাপুকুর নামক পল্লীর ভিতর টোল খুলিয়া ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে নিযুক্ত হইলেন।

রামকুমার–পত্নীর মৃত্যুতে পারিবারিক পরিবর্তন

রামকুমারের পত্নীর মৃত্যুতে কামারপুকুরের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্তন উপস্থিত হইল। শ্রীমতী চন্দ্রা ঐ ঘটনায় গৃহকর্মের সমস্ত ভার পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের লালনপালনের ভারও ঐদিন হইতে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। তাঁহার মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের পত্নী তাঁহাকে ঐসকল কর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল; কিন্তু সে তখনও নিতান্ত বালিকা, তাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ৺রঘুবীরের

সেবা, অক্ষয়ের লালনপালন এবং রন্ধনাদি গৃহকর্ম সকলই তাঁহাকে এখন করিতে হইত। ঐসকল কর্ম সম্পন্ন করিতে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, বিশ্রামের জন্য তিলার্ধ অবসর থাকিত না। আটান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে সংসারের সমস্ত ভার ঐরূপে স্কন্ধে লওয়া সুখসাধ্য না হইলেও শ্রীশ্রীরঘুবীরের ঐরূপ ইচ্ছা বুঝিয়া চন্দ্রাদেবী উহা বিনা অভিযোগে বহন করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বরের কথা

অন্যদিকে সংসারের আয়ব্যয়ের ভার শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের উপর এখন হইতে নিপতিত হওয়ায় তিনি কিরূপে উপার্জন করিয়া পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন; কিন্তু কৃতবিদ্য হইলেও তিনি কোনকালে বিশেষ উপার্জনক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা শ্রবণ করি নাই। তদুপরি পরিব্রাজক সাধু ও সাধকগণকে দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেককাল অতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অভাব দেখিলে উহা মোচন করিতে অনেক সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং আয়-বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার দ্বারা সংসারের ঋণ-পরিশোধ অথবা বিশেষ সচ্ছলতা সম্পাদিত হইল না। কারণ, সংসারী হইলেও তিনি সঞ্চয়ী হইতে পারিলেন না এবং সময়ে সময়ে আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া '৺রঘুবীর কোনরূপে চালাইয়া দিবেন' ভাবিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

গদাধরের সম্বন্ধে রামেশ্বরের চিন্তা

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলেও শ্রীযুক্ত রামেশ্বর তাহার শিক্ষাদি অগ্রসর হইতেছে কি-না, তদ্বিষয়ে কোনকালে লক্ষ্য করিতেন না। কারণ, একে ঐরূপ করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল, তদুপরি অর্থচিন্তায় তাঁহাকে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। সুতরাং ঐ বিষয় লক্ষ্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা ও সময় উভয় বস্তুরই এখন অভাব হইয়াছিল। আবার এই অল্প বয়সেই বালকের ধর্মপ্রবৃত্তির অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি তাহাকে সুপথে ভিন্ন কখনও কুপথে পরিচালিত করিবে না। পল্লীর নরনারীসকলকে তাহার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং তাহাকে পরমাত্মীয়বোধে ভালবাসিতে দেখিয়া তাঁহার ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তিনি বুঝিতেন বিশেষ সৎ ও উদারচরিত্র না হইলে কেহ কখন সংসারে সকল ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। সেজন্য বালকের সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনাপূর্বক তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিত এবং তিনি সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সুতরাং রামকুমারের কলিকাতায় গমনকালে গদাধর ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া একপ্রকার অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়িল এবং তাহার উন্নত প্রকৃতি তাহাকে যেদিকে ফিরাইতে লাগিল, সে এখন অবাধে সে-পথেই চলিতে লাগিল।

গদাধরের মনের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকলাপ

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি গদাধরের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এই অল্প বয়সেই প্রত্যেক ব্যক্তির ও কার্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে শিখাইয়াছিল। সুতরাং অর্থলাভে সহায়তা হইবে বলিয়াই যে পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসে এবং টোলে উপাধি-ভূষিত হইতে লোকে সচেষ্ট হয়, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। আবার, অশেষ আয়াস স্বীকারপূর্বক সেই অর্থ উপার্জন ও উহার দ্বারা সাংসারিক ভোগসুখ লাভ করিয়া লোকে তাহার পিতার ন্যায় সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবল এবং ধর্মলাভে সক্ষম হয় না, ইহাও সে দিন দিন দেখিতে পাইতেছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ স্বার্থসুখে অন্ধ হইয়া বিষয়সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদ ও মামলা-মকদ্দমা উত্থাপনপূর্বক গৃহ ও ক্ষেত্রাদিতে দড়ি ফেলিয়া 'এই দিকটা আমার, ঐ দিকটা উহার' ইত্যাদি অদ্য নিরূপণ করিয়া লইয়া কয়েক দিন ঐ বিষয় ভোগ করিতে না করিতেই শমনসদনে চলিয়া যাইল—ঐরূপ দৃষ্টান্তসকল কখনও কখনও অবলোকন করিয়া বালক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, অর্থ ও ভোগলালসা মানবজীবনের অনেক অনর্থ উপস্থিত করে। সুতরাং অর্থকরী বিদ্যার্জনে সে যে এখন দিন দিন উদাসীন হইবে এবং পিতার ন্যায় 'মোটা-ভাত-কাপড়ে' সন্তুষ্ট থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতিলাভকে মনুষ্য-জীবনের সারোদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিবে, ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্য বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমে গদাধর পাঠশালায় প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে যাইলেও ৺রঘুবীরের সেবাপূজায় ও

গৃহকর্মে সাহায্যদানপূর্বক মাতার পরিশ্রমের লাঘব করিয়া এখন হইতে তাহার অধিককাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। ঐসকল বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত তাহাকে এখন প্রায়ই বাটীতে থাকিতে হইত।

পল্লীরমণীগণের নিকটে গদাধরের পাঠ ও সঙ্কীর্তনাদি

গদাধর ঐরূপে বাটীতে অধিককাল অতিবাহিত করায় পল্লীরমণীগণের তাহার সহিত মিলিত হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, গৃহকর্ম সমাপন করিয়া তাঁহাদিগের অনেকে অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং বালককে তথায় দেখিতে পাইয়া কখনও গান করিতে এবং কখনও ধর্মোপাখ্যানসকল পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐসকল অনুরোধ যথাসাধ্য পালন করিতে যত্নপর হইত। চন্দ্রাদেবীকে গৃহকর্মে সাহায্য করিবার জন্য তাহার অবসরের অভাব দেখিলে তাঁহারা আবার সকলে মিলিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার কর্মসকল করিয়া দিয়া তাহার মুখে পুরাণকথা ও সঙ্গীতাদি শুনিবার অবসর করিয়া লইতেন। ঐরূপে তাঁহাদের নিকটে কিছুক্ষণ পাঠ ও সঙ্গীত করা গদাধরের নিত্যকর্মের মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীগণও উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, উহা অধিকক্ষণ শুনিবার আশায় তাঁহারা এখন হইতে নিজ নিজ গৃহকর্মসকল শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিয়া চন্দ্রাদেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

গদাধর ইঁহাদের নিকটে সুদ্ধ পুরাণপাঠমাত্রই করিত না, কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ইঁহাদিগের আনন্দ সম্পাদন করিত। গ্রামে ঐ সময়ে তিনদল যাত্রা, একদল বাউল এবং দুই-এক দল কবি ছিল। তদ্ভিন্ন বহু বৈষ্ণব এখানে বসতি করায় অনেক গৃহেই প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগবতপাঠ ও সঙ্কীর্তনাদি হইত। বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করায় এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় ঐসকল দলের পালা, গান ও সঙ্কীর্তনসকল গদাধরের আয়ত্ত ছিল। সেজন্য রমণীগণের আনন্দবর্ধন করিতে সে কোনদিন যাত্রার পালা, কোন দিন বাউলের গীতাবলী, কোনদিন কবি এবং কোনদিন বা সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিত। যাত্রার পালা বলিবার কালে সে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভূমিকায় কথাসকল উচ্চারণপূর্বক একাকীই সকল চরিত্রের অভিনয় করিত। আবার নিজ জননী বা রমণীগণের মধ্যে কাহাকেও কোনদিন বিমর্ষ দেখিলে সে ঐসকল যাত্রার সঙের পালা অথবা সকলের পরিচিত গ্রামের কোন ব্যক্তির বিচিত্র আচরণ ও হাবভাবের এমন স্বাভাবিক অনুকরণ করিত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্য ও কৌতুকের তরঙ্গ ছুটিত।

পল্লীরমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস

সে যাহা হউক, গদাধর ঐরূপে ইঁহাদিগের হৃদয়ে ক্রমে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বালকের জন্মগ্রহণকালে তাহার জনক-জননী যে-সকল অদ্‌ভুত স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সে সকলের কথা ইঁহারা ইতিপূর্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার দেবদেবীর ভাবাবেশে সময়ে সময়ে তাহার যেরূপ অদৃষ্টপূর্ব অবস্থান্তর উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার জ্বলন্ত দেবভক্তি, তন্ময় হইয়া পুরাণপাঠ, মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত এবং তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় সরল উদার আচরণ যে তাঁহাদিগের কোমল হৃদয়ে এমন অপূর্ব ভক্তি-ভালবাসার উদয় করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা শুনিয়াছি, ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ীপ্রমুখ বর্ষীয়সী রমণীগণ বালকের ভিতরে বালগোপালের দিব্য প্রকাশ অনুভব করিয়া তাহাকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন এবং তদপেক্ষা স্বল্পবয়স্কা রমণীগণ তাহাকে ঐরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত সখ্যভাবে সম্বদ্ধা হইয়াছিলেন। রমণীগণের অনেকেই বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সরল কবিতাময় বিশ্বাসই তাঁহাদিগের ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল; সুতরাং অশেষগুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালককে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। সে যাহা হউক, ঐরূপ বিশ্বাসে তাঁহারা এখন গদাধরের সহিত মিলিতা হইয়া তাহাকে নিঃসঙ্কোচে আপনাপন মনের কথা খুলিয়া বলিতেন এবং অনেক বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা

করিতেন। গদাধরও তাঁহাদিগের সহিত এমনভাবে মিলিত হইত যে, অনেক সময়ে তাহাকে তাঁহাদিগের রমণী বলিয়া মনে হইত।[1]

রমণীবেশে গদাধর

গদাধর কখন কখন রমণীর বেশভূষা ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিশেষ বিশেষ নারীচরিত্রের অভিনয় করিত। ঐরূপে শ্রীমতী রাধারানীর অথবা তাঁহার প্রধানা সখী বৃন্দার ভূমিকা গ্রহণ করিবার কালে তাঁহারা তাহাকে অনেক সময় রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হইতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ অনুরোধ রক্ষা করিত। ঐ সময়ে তাহার হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলন প্রভৃতি অবিকল নারীর ন্যায় হইত। রমণীগণ উহা দেখিয়া বলিতেন, নারী সাজিলে গদাধরকে পুরুষ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না। উহাতে বুঝিতে পারা যায়, বালক নারীগণের প্রত্যেক কার্য কত তন্ন তন্ন করিয়া ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছিল। রঙ্গপ্রিয় বালক এই সময়ে কোন কোন দিন রমণীর ন্যায় বেশভূষা করিয়া কক্ষে কলসী ধারণপূর্বক পুরুষদিগের সম্মুখ দিয়া হালদারপুকুরে জল আনয়নে গমন করিয়াছিল এবং কেহই তাহাকে ঐ বেশে চিনিতে পারে নাই।

সীতানাথ পাইনের পরিবারবর্গের সহিত গদাধরের সৌহৃদ্য

গ্রামের ধনী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সীতানাথের সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল এবং কন্যাগণ বিবাহের পরেও সীতানাথের ভবনে একান্নে অবস্থান করিতেছিল। শুনা যায়, সীতানাথের বহু গোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন দশখানি শিলে বাটনা বাটা হইত, রন্ধনকার্যে এত মসলার প্রয়োজন হইত! তদ্ভিন্ন সীতানাথের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের অনেকে আবার তাঁহার বাটীর পার্শ্বে বাটী করিয়া বাস করিয়াছিল। সেজন্য কামারপুকুরের এই অংশ বণিকপল্লী নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং উহা ক্ষুদিরামের বাটীর সন্নিকটে থাকায় বণিক রমণীগণের অনেকে চন্দ্রাদেবীর নিকটে অবসরকালে উপস্থিত হইতেন, বিশেষতঃ, আবার সীতানাথের স্ত্রী ও কন্যাগণ। সুতরাং গদাধরের সহিত ইঁহাদের এখন বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ইঁহারা বালককে অনেক সময়ে নিজ ভবনে লইয়া যাইতেন এবং রমণী সাজিয়া পূর্বোক্তভাবে অভিনয়াদি করিতে অনুরোধ করিতেন। অভিভাবকগণের নিষেধে তাঁহাদিগের আত্মীয়া রমণীগণের অনেকে তাঁহাদিগের বাটী ভিন্ন অন্যত্র যাইতে পারিতেন না এবং সেজন্য গদাধরের পাঠ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বালককে ঐরূপে নিজ ভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেন। ঐরূপে যাঁহারা চন্দ্রাদেবীর নিকটে যাইতেন না, বণিকপল্লীর ভিতরে এমন অনেক রমণীও গদাধরের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সে সীতানাথের ভবনে উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকমুখে সংবাদ পাইয়া তথায় আগমনপূর্বক তাহার পাঠশ্রবণে ও অভিনয়াদিদর্শনে আনন্দ উপভোগ করিতেন। বাটীর কর্তা সীতানাথ গদাধরকে বিশেষরূপে ভালবাসিতেন এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য পুরুষেরাও তাহার সদ্‌গুণসকলের সহিত পরিচিত ছিলেন। সেজন্য তাঁহাদিগের রমণীগণ তাহার নিকটে ঐরূপে সঙ্গীত-সঙ্কীর্তনাদি শ্রবণ করেন জানিয়াও তাঁহারা উহাতে আপত্তি করিতেন না।

বণিকপল্লীর দুর্গাদাস পাইন নামক এক ব্যক্তি কেবল ঐ বিষয়ে আপত্তি করিতেন এবং গদাধরকে স্বয়ং শ্রদ্ধা ভক্তি করিলেও অন্দরের কঠোর অবরোধপ্রথা কাহারও জন্য কোন কালে শিথিল হইতে দিতেন না। তাঁহার অন্তঃপুরের কথা কেহ জানিতে সক্ষম নহে এবং তাঁহার বাটীর রমণীগণকে কেহ কখনও অবলোকন করে নাই বলিয়া তিনি সীতানাথ-প্রমুখ তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট সময়ে সময়ে অহঙ্কারও করিতেন। ফলতঃ, সীতানাথ-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার ন্যায় কঠোর অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হীন জ্ঞান করিতেন।

দুর্গাদাস পাইনের অহঙ্কার চূর্ণ হওয়া

দুর্গাদাস একদিন তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকটে ঐরূপে অহঙ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে গদাধর তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় শ্রবণপূর্বক বলিল, "অবরোধ-প্রথার দ্বারা রমণীগণকে কখন কি রক্ষা করা যায়? সৎশিক্ষা ও দেবভক্তি-প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিতা হন; ইচ্ছা করিলে

আমি তোমার অন্দরের সকলকে দেখিতে ও সমস্ত কথা জানিতে পারি।" দুর্গাদাস তাহাতে অধিকতর অহঙ্কৃত হইয়া বলিলেন, "কেমন জানিতে পার, জান দেখি?" গদাধরও তাহাতে 'আচ্ছা দেখা যাইবে' বলিয়া সেদিন চলিয়া আসিল। পরে একদিন অপরাহ্নে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বালক মোটা মলিন একখানি শাড়ি ও রূপার পৈঁছা প্রভৃতি পরিয়া দরিদ্রা তন্তুবায়-রমণীর ন্যায় বেশধারণপূর্বক একটি চুবড়ি কক্ষে লইয়া ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাটের দিক হইতে দুর্গাদাসের ভবন-সম্মুখে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস বন্ধুবর্গের সহিত তখন বহির্বাটীতেই বসিয়াছিলেন। রমণীবেশধারী গদাধর তাঁহাকে তন্তুবায়-রমণী গ্রামান্তর হইতে হাটে সূতা বেচিতে আসিয়া সঙ্গিনীগণ ফেলিয়া যাওয়ায় বিপন্না বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিল। দুর্গাদাস তাহাতে তাহার কোন্ গ্রামে বাস ইত্যাদি দুই-একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তরশ্রবণানন্তর বলিলেন, "আচ্ছা, অন্দরে স্ত্রীলোকদিগের নিকটে যাইয়া আশ্রয় লও।" গদাধর তাহাতে তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল এবং রমণীগণকে পূর্বের ন্যায় আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক নানাবিধ বাক্যালাপে পরিতুষ্টা করিল। তাহার স্বল্প বয়স দেখিয়া এবং মধুর বাক্যে প্রসন্ন হইয়া দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরা তাহাকে থাকিতে দিলেন এবং তাহার বিশ্রামের স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া জলযোগ করিবার জন্য মুড়ি-মুড়কি প্রভৃতি প্রদান করিলেন। গদাধর তখন নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে করিতে অন্দরের সকল ঘর ও প্রত্যেক রমণীকে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের বাক্যালাপে মধ্যে মধ্যে যোগদান এবং প্রশ্নাদি করিতেও সে ভুলিল না। ঐরূপে প্রায় এক প্রহর রাত্রি অতীত হইল। এদিকে এত রাত্রি হইলেও সে গৃহে ফিরিল না দেখিয়া চন্দ্রাদেবী রামেশ্বরকে তাহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং বণিকপল্লীতে সে প্রায় যাইয়া থাকে জানিয়া তাহাকে তথায় অন্বেষণ করিতে বলিয়া দিলেন। রামেশ্বর সেজন্য প্রথমে সীতানাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, বালক তথায় আসে নাই। অনন্তর দুর্গাদাসের ভবনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর শুনিতে পাইয়া গদাধর অধিক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া দুর্গাদাসের অন্দর হইতে 'দাদা, যাচ্ছি গো' বলিয়া উত্তর দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তখন সকল কথা বুঝিলেন এবং বালক তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে অপ্রতিভ ও কিছু রুষ্ট হইলেও পরক্ষণেই তাহার দরিদ্রা তন্তুবায়-রমণীর বেশ ও চালচলনের অনুকরণ কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। সীতানাথ প্রমুখ দুর্গাদাসের আত্মীয়েরা পরদিন ঐ কথা জানিতে পারিয়া গদাধরের নিকটে তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এখন হইতে সীতানাথের ভবনে বালক উপস্থিত হইলে দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরাও তাহার নিকটে আসিতে লাগিলেন।

বণিকপল্লীর রমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস

সীতানাথের পরিবারবর্গ এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য রমণীগণ ক্রমে গদাধরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের নিকটে কিছুদিন না আসিলেই তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। সীতানাথের ভবনে পাঠ ও সঙ্গীতাদি করিবার কালে গদাধরের কখন কখন ভাবাবেশ উপস্থিত হইত। তদ্দর্শনে রমণীগণের তাহার প্রতি ভক্তি বিশেষ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপ ভাবসমাধিকালে তাঁহাদিগের অনেকে বালককে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন এবং অভিনয়কালে তাহার সহায়তা হইবে বলিয়া তাঁহারা একটি সুবর্ণনির্মিত মুরলী এবং স্ত্রী ও পুরুষ-চরিত্রের অভিনয়-উপযোগী বিবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ধর্মপ্রবণ, পূতস্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুত্পন্নমতি এবং সপ্রেম, সরল ও অমায়িক ব্যবহারে গদাধর পল্লীরমণীগণের উপরে এইকালে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ আমরা তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মুখে সময়ে সময়ে শুনিবার অবসর লাভ করিয়াছিলাম। সন

১২৯৯ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রমুখ আমরা কয়েকজন কামারপুকুরদর্শনে গমন করিয়া সীতানাথ পাইনের কন্যা শ্রীমতী রুক্মিণীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স তখন আন্দাজ ষাট বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গদাধরের পূর্বোক্ত প্রভাব সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার এখানে উল্লেখ করিলে পাঠকের ঐ বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। শ্রীমতী রুক্মিণী বলিয়াছিলেন –

গদাধরের সম্বন্ধে শ্রীমতী রুক্মিণীর কথা

"আমাদের বাড়ী এখান হইতে একটু উত্তরে–ঐ দেখা যাইতেছে। আজকাল আমাদের বাড়ীর ভগ্নাবস্থা, পরিবারবর্গ একরূপ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমার বয়স যখন সতর-আঠার বৎসর ছিল, তখন বাড়ীটি দেখিলে লক্ষ্মীমন্তের বাড়ী বলিয়া বোধ হইত। আমার পিতার নাম ৺সীতানাথ পাইন। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো সকলকে ধরিয়া সর্বসুদ্ধ আমরা সতর-আঠারটি ভগ্নী ছিলাম এবং বয়সে পরস্পরে দুই-পাঁচ বৎসরের ছোট-বড় হইলেও ঐকালে সকলে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। গদাধর বাল্যকাল হইতে আমাদিগের সহিত একত্রে খেলা-ধুলা করিতেন। সেজন্য আমাদিগের সহিত তাঁহার খুব ভাব ছিল। আমরা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি আমাদের বাড়ীতে যাইতেন এবং ঐরূপে তিনি বড় হইবার পরেও আমাদিগের বাড়ীর অন্দরে যাতায়াত করিতেন। বাবা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন–আপন ইষ্টের মত দেখিতেন ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। পাড়ায় কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, 'তোমার বাড়ীতে অতগুলি যুবতী কন্যা রহিয়াছে, গদাধরও এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে এখনও অত বাড়ীর ভিতরে যাইতে দাও কেন?' বাবা তাহাতে বলিতেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি গদাধরকে খুব চিনি।' তাহারা সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিত না। গদাধর বাড়ীর অন্দরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণকথা বলিতেন, কত রঙ্গ-পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় প্রতিদিন ঐসকল শুনিতে শুনিতে আনন্দে গৃহকর্মসকল করিতাম। তিনি যখন আমাদের নিকটে থাকিতেন, তখন কত আনন্দে যে সময় কাটিয়া যাইত তাহা এক মুখে আর কি বলিব! যেদিন তিনি না আসিতেন, সেদিন তাঁহার অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া আমাদিগের মন ছটফট করিত। সেদিন যতক্ষণ না আমাদিগের কেহ জল আনিবার বা অন্য কোন কর্মের দোহাই দিয়া বামুন-মার (চন্দ্রাদেবীর) সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিত, ততক্ষণ আমাদিগের কাহারও প্রাণে শান্তি থাকিত না। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি আমাদের অমৃতের ন্যায় বোধ হইত। সেজন্য তিনি যেদিন আমাদিগের বাড়ীতে না আসিতেন, সেদিন তাঁহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাটাইতাম।"

পল্লীর পুরুষসকলের গদাধরের প্রতি অনুরক্তি

কেবলমাত্র রমণীগণের সহিত ঐরূপে মিলিত হইয়াই গদাধর ক্ষান্ত ছিল না। কিন্তু তাহার সর্বতোমুখী উদ্ভাবনী শক্তি এবং সকলের সহিত প্রেমপূর্ণ আচরণ তাহাকে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সহিত মিলিত করিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের বৃদ্ধ ও যুবকবৃন্দ যে-সকল স্থলে মিলিত হইয়া ভাগবতাদি পুরাণপাঠ বা সঙ্গীত-সঙ্কীর্তনাদিতে আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার সকল স্থলেই তাহার যাতায়াত ছিল। বালক ঐসকল স্থলের যেখানে যেদিন উপস্থিত থাকিত, সেখানে সেদিন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইত। কারণ, তাহার ন্যায় পাঠ ও ধর্মতত্ত্বসকলের ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে সক্ষম ছিল না। সঙ্কীর্তনকালে তাহার ন্যায় ভাবোন্মত্ততা, তাহার ন্যায় নূতন নূতন ভাবপূর্ণ আখর দিবার শক্তি এবং তাহার ন্যায় মধুর কণ্ঠ ও রমণীয় নৃত্য আর কাহারও ছিল না। আবার রঙ্গপরিহাসস্থলে তাহার ন্যায় সঙ্ দিতে, তাহার ন্যায় নরনারীর সকলপ্রকার আচরণ অনুকরণ করিতে এবং তাহার ন্যায় নূতন নূতন গল্প ও গান যথাস্থলে অপূর্বভাবে লাগাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে অন্য কেহ সমর্থ হইত না। সুতরাং যুবক ও বৃদ্ধেরা সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। বালকও সেইজন্য কোনদিন এক স্থলে, কোনদিন অন্য স্থলে তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দবর্ধন করিত।

আবার এই বয়সেই বালক পরিণতবয়স্কের ন্যায় বুদ্ধিধারণ করায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ সাংসারিক সমস্যাসকলের সমাধানের জন্য তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ধার্মিক ব্যক্তিগণ ঐরূপে তাহার পূতস্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া এবং ভগবৎ-নাম ও কীর্তনে তাহার ভাবসমাধি হইতে দেখিয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণপূর্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন।[2] কেবল ভণ্ড ও ধূর্তেরা তাহাকে দেখিতে পারিত না। কারণ, গদাধরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহাদিগের উপরের মোহনীয় আবরণ ভেদ করিয়া গোপনীয় উদ্দেশ্যসকল ধরিয়া ফেলিত এবং সত্যনিষ্ঠ, স্পষ্টবাদী বালক অনেক সময়ে উহা সকলের নিকট কীর্তন করিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিত। সুদ্ধ তাহাই নহে, রঙ্গপ্রিয় গদাধর অনেক সময়ে অপরের নিকটে তাহাদিগের কপটাচরণের অনুকরণ করিয়াও বেড়াইত। উহার জন্য মনে মনে কুপিত হইলেও সকলের প্রিয়, নির্ভীক বালকের তাহারা কিছুই করিতে পারিত না। সেজন্য অনেক সময়ে শরণাগত হইয়া তাহাদিগকে গদাধরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইত। কারণ শরণাগতের উপর বালকের অশেষ করুণা সর্বদা পরিলক্ষিত হইত।

গদাধরের অর্থকরী বিদ্যার্জনে উদাসীনতার কারণ

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, গদাধর এখনও প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে পাঠশালায় উপস্থিত হইত এবং বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমই তাহার ঐরূপ করিবার কারণ ছিল। বাস্তবিক চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা এত অবধি প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিকটে উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন এখন হইতেই অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবন অন্য কার্যের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং ধর্মসাক্ষাৎকার করিতে তাহাকে তাহার সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ের অস্পষ্ট ছায়া তাহার মনে অনেক সময়ে উদিত হইত, কিন্তু উহা এখনও পূর্ণাবয়ব না হওয়ায় সে উহাকে সকল সময়ে ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু নিজ জীবন ভবিষ্যতে কিভাবে পরিচালিত করিবে, একথা তাহার মনে যখনই উদিত হইত, তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে তখনই ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহার কল্পনাপটে গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালব্ধ ভোজন এবং নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিত। তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় কিন্তু তাহাকে পরক্ষণেই মাতা ও ভ্রাতাদিগের সাংসারিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে ঐ পথে গমনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে এবং নিজ পিতার ন্যায় নির্ভরশীল হইয়া সংসারে থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উত্তেজিত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয় তাহাকে ভিন্ন পথ নির্দেশ করায় সে 'যাহা করেন রঘুবীর' ভাবিয়া ঈশ্বরের আদেশলাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। কারণ, বালকের প্রেমপূর্ণ হৃদয় একান্ত আপনার বলিয়া তাঁহাকেই ইতিপূর্বে অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং যথাকালে তিনিই ঐ প্রশ্ন সমাধান করিয়া দিবেন ভাবিয়া সে এখন অনেক সময়ে আপনাকে শান্ত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বস্থলে তাহার বিশুদ্ধ হৃদয়ই পরিশেষে জয়লাভ করিত এবং উহার প্রেরণাতেই সে এখন সর্ব কর্ম সম্পাদন করিতেছিল।

গদাধরের হৃদয়ের প্রেরণা

অসাধারণ সহানুভূতিসম্পন্ন গদাধরের বিশুদ্ধ হৃদয় তাহাকে এখন হইতে অন্য এক বিষয়ও সময়ে সময়ে উপলব্ধি করাইতেছিল। পুরাণপাঠে ও সঙ্কীর্তনাদিসহায়ে উহা তাহাকে গ্রামের নরনারীসকলের সহিত ইতিপূর্বে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে এত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছিল যে, তাহাদিগের জীবনের সুখ-দুঃখাদি সে এখন হইতে সর্বতোভাবে আপনার বলিয়া অনুভব করিতেছিল। সুতরাং তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে এইকালে যখনই সংসার-পরিত্যাগে ইঙ্গিত করিত, তাহার হৃদয় তাহাকে তখনই ঐসকল নরনারীর সরল প্রেমপূর্ণ আচরণের এবং তাহার প্রতি অসীম বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে এমনভাবে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে বলিত, যদ্দর্শনে তাহারা সকলে নিজ নিজ জীবনে পরিচালিত করিবার উচ্চাদর্শলাভে কৃতার্থ হইতে পারে এবং তাহার সহিত তাহাদিগের বর্তমান সম্বন্ধ যাহাতে সুগভীর

পারমার্থিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত অবিনশ্বর হইতে পারে। বালকের স্বার্থগন্ধশূন্য হৃদয় তাহাকে ঐ বিষয়ের স্পষ্ট আভাস প্রদানপূর্বক ঐজন্য বলিতেছিল, 'আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা–সে তো স্বার্থপরতা; যাহাতে ইহারা সকলে উপকৃত হয়, এমন কিছু কর।'

গদাধরের পাঠশালাপরিত্যাগ ও বয়স্যদিগের সহিত অভিনয়

পাঠশালায় এবং পরে টোলে বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে কিন্তু গদাধরের হৃদয় ও বুদ্ধি এখন মুক্তকণ্ঠে এক কথাই বলিতেছিল, কিন্তু সহসা পাঠশালা পরিত্যাগ করিলে বয়স্যগণ তাহার সঙ্গলাভে অনেকাংশে বঞ্চিত হইবে বলিয়া সে ঐ কার্য কখনও করিতে পারিতেছিল না। কারণ, গয়াবিষ্ণু-প্রমুখ বালকের সমবয়স্ক সকলে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং তাহার অসাধারণ বুদ্ধি ও অসীম সাহস তাহাকে এখানেও দলপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময়ে একটি ঘটনায় বালক অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। গদাধরের অভিনয় করিবার শক্তি দেখিয়া তাহার কয়েকজন বয়স্য এখন একটি যাত্রার দল খুলিবার প্রস্তাব একদিন উত্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানের ভার গদাধরকে লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাধরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইল; কিন্তু অভিভাবকগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন্ স্থানে তাহারা ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবে, তদ্বিষয়ে বালকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িল। গদাধরের উদ্ভাবনী শক্তি তখন তাহাদিগকে মানিকরাজার আম্রকানন দেখাইয়া দিল এবং স্থির হইল, পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা প্রতিদিন সকলে নির্দিষ্ট সময়ে ঐস্থানে উপস্থিত হইবে।

সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্যে পরিণত হইল এবং গদাধরের শিক্ষায় বালকগণ স্বল্প সময়ের ভিতরেই আপন আপন ভূমিকা ও গানসকল কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রাভিনয়ে আম্রকানন মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশ্য ঐসকল যাত্রাভিনয়ের সকল অঙ্গই গদাধরকে নিজ উদ্ভাবনী শক্তিবলে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইত এবং উহাদিগের প্রধান চরিত্রের ভূমিকাসকল তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইত। যাহাই হউক, যাত্রার দল একপ্রকার মন্দ গঠিত হইল না দেখিয়া বালকেরা পরম আনন্দলাভ করিয়াছিল এবং শুনা যায়, আম্রকাননে অভিনয়কালেও গদাধরের সময়ে সময়ে ভাবসমাধি উপস্থিত হইয়াছিল।

গদাধরের চিত্রবিদ্যা ও মূর্তিগঠনে উন্নতি

সঙ্কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ে গদাধরের অনেক কাল অতিবাহিত হওয়ায় তাহার চিত্রবিদ্যা এখন আর অধিক অগ্রসর হইতে পায় নাই। তবে শুনা যায়, গৌরহাটি গ্রামে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্বমঙ্গলাকে বালক এই সময়ে একদিন দেখিতে গিয়াছিল এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার ভগিনী প্রসন্নমুখে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে। উহা দেখিয়া সে অল্পদিন পরে তাহার ভগিনী ও তৎস্বামীর ঐভাবের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, পরিবারস্থ সকলে উহাতে চিত্রগত প্রতিমূর্তিদ্বয়ের সহিত শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা ও তৎস্বামীর নিকট-সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

দেবদেবীর মূর্তিসকল-সংগঠনে কিন্তু গদাধর বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, তাহার ধর্মপ্রবণ প্রকৃতি তাহাকে ঐসকল মূর্তি গঠনপূর্বক বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে যথাবিধি পূজা করিতে অনেক সময়ে প্রযুক্ত করিত।

সে যাহা হউক, পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া গদাধর নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় পূর্বোক্ত কার্যসকলে নিযুক্ত থাকিয়া এবং চন্দ্রাদেবীকে গৃহকর্মে সাহায্য করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ও তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে অনেক সময় নিযুক্ত রাখিত। কারণ চন্দ্রাদেবীকে গৃহকর্মের অবসর দিবার জন্য ঐ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করা এবং নানাভাবে খেলা দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা এখন তাহার নিত্যকর্মসকলের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। ঐরূপে তিন বৎসরের অধিককাল অতীত হইয়া গদাধর ক্রমে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। ঐ সময় তিন বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত রামকুমারের কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারও উপার্জনের পূর্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছিল।

গদাধরের সম্বন্ধে রামকুমারের চিন্তা ও তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন

কলিকাতায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও শ্রীযুক্ত রামকুমার বৎসরান্তে একবার কয়েক পক্ষের জন্য কামারপুকুরে আগমনপূর্বক জননী ও ভ্রাতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধান করিতেন। গদাধরের বিদ্যার্জনে উদাসীনতা ঐ অবসরে লক্ষ্য করিয়া তিনি এখন চিন্তিত হইয়াছিলেন। সে যেভাবে বর্তমানে কাল কাটাইয়া থাকে, তিনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান লইলেন এবং মাতা ও মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় নিজ সমীপে রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া নিরূপণ করিলেন। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত টোলের গৃহকর্মও অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; সেজন্য ঐসকল বিষয়ে সাহায্য করিতে একজন লোকের অভাবও তিনি ঐসময়ে বোধ করিতেছিলেন। অতএব স্থির হইল যে, গদাধর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে ঐসকল বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য দান করিবে এবং অন্যান্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহারই নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিবে। গদাধরের নিকটে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পিতৃতুল্য অগ্রজকে সাহায্য করিতে হইবে জানিতে পারিয়া সে কলিকাতা-গমনে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীযুক্ত রামকুমার ও গদাধর ৺রঘুবীরকে প্রণামপূর্বক চন্দ্রাদেবীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। কামারপুকুরের আনন্দের হাট কিছুকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যাইল এবং শ্রীমতী চন্দ্রা ও গদাধরের প্রতি অনুরক্ত নরনারীসকলে তাহার মধুময় স্মৃতি ও ভাবী উন্নতির চিন্তা করিয়া কোনরূপে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কলিকাতায় আগমন করিবার পরে শ্রীযুক্ত গদাধর যে-সকল অলৌকিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, পাঠক সে-সকল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের ‘সাধকভাব’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে পূর্বকথা ও বাল্যজীবন পর্ব সম্পূর্ণ।

---

[1] সম্পূর্ণরূপে রমণীগণের ন্যায় হইবার বাসনা শ্রীযুক্ত গদাধরের প্রাণে এই কালে কত প্রবল হইয়াছিল, তাহা ‘সাধকভাব’– চতুর্দশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ কথা হইতে পাঠক সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

[2] শুনা যায়, শ্রীনিবাস শাঁখারী প্রমুখ কয়েকজন যুবক শ্রীযুক্ত গদাধরকে এখন হইতে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিত।

পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়-নিরূপক তালিকা

সাল	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১১৮১	১৭৭৫	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের জন্ম।
১১৯৭	১৭৯১	শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর জন্ম।
১২০৫	১৭৯৯	শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বিবাহ - ক্ষুদিরামের বয়স ২৪ বৎসর ও চন্দ্রাদেবীর বয়স ৮ বৎসর। সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু।
১২১১	১৮০৫	শ্রীযুক্ত রামকুমারের জন্ম। অতএব রামকুমার ঠাকুরের অপেক্ষা ৩১ বৎসরের বড়।
১২১৬	১৮১০	শ্রীমতী কাত্যায়নীর জন্ম।
১২২০	১৮১৪	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আসিয়া বাস করা। তখন ক্ষুদিরামের বয়স ৩৯ বৎসর।
১২২৬	১৮২০	রামকুমারের ও কাত্যায়নীর বিবাহ।
১২৩০	১৮২৪	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ৺রামেশ্বর-যাত্রা।
১২৩২	১৮২৬	শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের জন্ম। অতএব তিনি ঠাকুরের অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড়।
১২৪০	১৮৩৪	২৪ বৎসর বয়সে কাত্যায়নীর শরীরে ভূতাবেশ।
১২৪১	১৮৩৫	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ৺গয়াদর্শন। তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর।
১২৪২	১৮৩৬	৬ই ফাল্গুন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম ব্রাহ্মমুহূর্তে।
১২৪৫	১৮৩৯	সর্বমঙ্গলার জন্ম।
১২৪৯	১৮৪২	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ, ৬৮ বৎসর বয়সে। তখন ঠাকুরের বয়স ৭ বৎসর।
১২৫৪	১৮৪৮	রামেশ্বর ও সর্বমঙ্গলার বিবাহ।
১২৫৫	১৮৪৯	শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের জন্মান্তে ৩৬ বৎসর বয়সে তৎপত্নীর মৃত্যু। তখন রামকুমারের বয়স ৪৪ বৎসর।
১২৫৬	১৮৫০	শ্রীযুক্ত রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা।
১২৫৯	১৮৫৩	ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন ও ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে বাস।
১২৬২	১৮৫৫	দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠা।
১২৬৩	১৮৫৭	শ্রীযুক্ত রামকুমারের মৃত্যু (৫২ বৎসর বয়সে)।

২.১. ভূমিকা

সাধকভাব

গ্রন্থ-পরিচয়

ঈশ্বরেচ্ছায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সাধকভাবের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে আমরা তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সাধনানুরাগ এবং সাধনতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, কিন্তু সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের সকল প্রধান ঘটনাগুলির সময় নিরূপণপূর্বক ধারাবাহিকভাবে পাঠককে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব সাধকভাবকে ঠাকুরের সাধকজীবনের এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যসকল তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্বকাল পর্যন্ত জীবনের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া আমরা ঠাকুরের জীবনের সকল ঘটনার সময় নিরূপণ করিতে পারিব কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। ঠাকুর তাঁহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমাদিগের অনেকের নিকটে বলিলেও, উহাদিগের সময় নিরূপণ করিয়া ধারাবাহিকভাবে কাহারও নিকটে বলেন নাই। তজ্জন্য তাঁহার ভক্তসকলের মনে তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথাসকল দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার কৃপায় এখন অনেকগুলি ঘটনার যথার্থ সময়নিরূপণে সমর্থ হইয়াছি।

ঠাকুরের জন্ম-সাল লইয়া এতকাল পর্যন্ত গণ্ডগোল চলিয়া আসিতেছিল। কারণ, ঠাকুর আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছিলেন, তাঁহার যথার্থ জন্মপত্রিকাখানি হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে যেখানি করা হইয়াছিল, সেখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। একশত বৎসরেরও অধিককালের পঞ্জিকাসকল সন্ধানপূর্বক আমরা এখন ঐ বিরোধ মীমাংসা করিতেও সক্ষম হইয়াছি এবং ঐজন্য ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলির সময় নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছে। ঠাকুরের ৺ষোড়শীপূজা সম্বন্ধে সত্য ঘটনা কাহারও এতদিন জানা ছিল না। বর্তমান গ্রন্থপাঠে পাঠকের ঐ ঘটনা বুঝা সহজ হইবে।

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থখানি লোককল্যাণ সাধন করুক, ইহাই কেবল তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। ইতি -

প্রণত

গ্রন্থকার

২.২. অবতরণিকা: সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন

আচার্যদিগের সাধকভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, লোকগুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ভিন্ন অবতারপুরুষসকলের জীবনে সাধকভাবের কার্যকলাপ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনে সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা-নিরাশা, ভয়-বিস্ময়, আনন্দ-ব্যাকুলতার তরঙ্গে পড়িয়া তাঁহারা কখনও উল্লসিত এবং কখনও মুহ্যমান হইয়াছিলেন—অথচ নিজ গন্তব্যলক্ষ্যে নিয়ত স্থির দৃষ্টি রাখিতে বিস্মৃত হন নাই, তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা তাঁহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না। অথবা, জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্যকলাপের সহিত তাঁহাদিগের বাল্যাদি কালের শিক্ষা, উদ্যম ও কার্যকলাপের একটা স্বাভাবিক পূর্বাপর কার্যকারণসম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে –

বৃন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্মপ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। ঈশার মহদুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বের কথা দুটি একটা মাত্রই জানিতে পারা যায়। আচার্য শঙ্করের দিগ্বিজয়কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। এইরূপ, অন্যত্র সর্বত্র।

তাঁহারা কোনকালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, এ কথা ভক্তমানব ভাবিতে চাহে না

ঐরূপ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির আতিশয্যেই বোধ হয় ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই তাঁহারা বোধ হয় ঐ সকল কথা লোকনয়নের অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে—মহাপুরুষচরিত্রের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মহান ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ঐ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক উদ্যম করিয়াছেন, তাহা ততটা করিবে না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্বদা পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে যে নরসুলভ দুর্বলতা, দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোন কালে কিছুমাত্র বর্তমান ছিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহ্বরে তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে সর্বদা প্রয়াসী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়স্কের বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, নিজ ঐশ্বরিক স্বরূপে সর্বসাধারণকে ধরা না দিবার জন্যই অবতারপুরুষেরা সাধনভজনাদি মানসিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি, দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়ের মিথ্যা ভান করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে ঐরূপে মিথ্যা ভান বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

ঐরূপ ভাবিলে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, একথা যুক্তিযুক্ত নহে

নিজ দুর্বলতার জন্যই ভক্ত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার ভক্তির হানি হয় বলিয়াই বোধ হয় তিনি নরসুলভ চেষ্টা ও উদ্দেশ্যাদি অবতারপুরুষে আরোপ করিতে চাহেন না। অতএব, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে ঐরূপ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্বর্যবিরহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক্ক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগকালে গভীর ভাব ধারণ করিলে, ঐরূপ ঐশ্বর্যচিন্তা ভক্তিপথের

অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্নে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ঐ কথা বারংবার বলিয়াছেন। দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতিনিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে নিজ বালকবোধেই লালন-তাড়নাদি করিতেছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও তাঁহাতে কান্তভাব ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

ঠাকুরের উপদেশ—ঐশ্বর্য-উপলব্ধিতে 'তুমি-আমি'-ভাবে ভালবাসা থাকে না, কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না

ভগবানের শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়ক কোনরূপ দর্শনাদিলাভের জন্য আগ্রহাতিশয় জানাইলে ঠাকুর সেজন্য তাঁহার ভক্তদিগকে অনেক সময় বলিতেন, "ওগো, ঐরূপ দর্শন করতে চাওয়াটা ভাল নয়; ঐশ্বর্য দেখলে ভয় আসবে; খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় (ঈশ্বরের সহিত) 'তুমি আমি'-ভাব, এটা আর থাকবে না।" কত সময়েই না আমরা তখন ক্ষুণ্নমনে ভাবিয়াছি, ঠাকুর কৃপা করিয়া ঐরূপ দর্শনাদিলাভ করাইয়া দিবেন না বলিয়াই আমাদিগকে ঐরূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন। সাহসে নির্ভর করিয়া কোনও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলিত, "আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাকে ঐরূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন", ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্রভাবে বলিতেন, "আমি কি কিছু করিয়া দিতে পারি রে—মার যা ইচ্ছা তাই হয়।" ঐরূপ বলিলেও যদি সে ক্ষান্ত না হইয়া বলিত, "আপনার ইচ্ছা হইলেই মা'র ইচ্ছা হইবে", ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "আমি তো মনে করি রে, তোদের সকলের সব রকম অবস্থা, সব রকম দর্শন হোক, কিন্তু তা হয় কই?" উহাতেও ভক্ত যদি ক্ষান্ত না হইয়া বিশ্বাসের জেদ চালাইতে থাকিত, তাহা হইলে ঠাকুর তাহাতে আর কিছু না বলিয়া স্নেহপূর্ণ দর্শন ও মৃদুমন্দ হাস্যের দ্বারা তাহার প্রতি নিজ ভালবাসার পরিচয়মাত্র দিয়া নীরব থাকিতেন; অথবা বলিতেন, "কি বলব বাবু, মা'র যা ইচ্ছা তাই হোক।" ঐরূপ নির্বন্ধাতিশয়ে পড়িয়াও কিন্তু ঠাকুর তাহার ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া তাহার ভাব নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহাকে বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, "কারও ভাব নষ্ট করতে নেই রে, কারও ভাব নষ্ট করতে নেই।"

ভাব নষ্ট করা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির কথা

প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কথাটি যখন পাড়া গিয়াছে, তখন একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়া ভাল। ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরের শরীর-মনে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কালে ঐ ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া প্রভূত লোককল্যাণ সাধন করিবেন—ঠাকুর এ কথা আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারী সংসারে বিরল—প্রথম হইতে ঠাকুর ঐ কথা সম্যক্ বুঝিয়া বেদান্তোক্ত অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ দিয়া তাঁহার চরিত্র ও ধর্মজীবন একভাবে গঠিত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত স্বামীজীর নিকট বেদান্তের 'সোঽহং' ভাবের উপাসনাটা তখন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে তদনুশীলন করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। স্বামীজী বলিতেন, "দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর অপর সকলকে যাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তক আমায় পড়িতে দিতেন। অন্যান্য পুস্তকের সহিত তাঁহার ঘরে একখানি 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেহ সেখানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুর তাহাকে ঐ পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া 'মুক্তি ও তাহার সাধন', 'ভগবদ্গীতা' বা কোন পুরাণগ্রন্থ পড়িবার জন্য দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার নিকট যাইলেই ঐ 'অষ্টাবক্র-সংহিতা'খানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন। অথবা অদ্বৈতভাবপূর্ণ

‘অধ্যাত্মরামায়ণের’ কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। যদি বলিতাম–ও বই পড়ে কি হবে? আমি ভগবান, একথা মনে করাও পাপ। ঐ পাপকথা এই পুস্তকে লেখা আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত। ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে বলিতেন, ‘আমি কি তোকে পড়তে বলছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বলছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে তো আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান।’ কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত।”

স্বামীজীকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর তাঁহার অন্যান্য বালকদিগকে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধা ভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া–অন্য নানাভাবে ধর্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন। এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালকভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন-উপবেশন, আহার-বিহার, ধর্মচর্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহে ভক্তদিগের ধর্মজীবন-গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন–বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের। আবার স্বামীজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তামাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না। নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কিভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই তখন ঠাকুরের এইরূপ আচরণে ভাবিতেছিলেন, নিজ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ঠাকুর গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভান করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন–ঐ কার্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ববৎ সুস্থ হইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন, ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবার মত সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ ধারণা সকল সময়ে রাখিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

সাধনবলে স্বামীজীর ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্মশক্তি-সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব করিলেও, কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য এপর্যন্ত নির্ধারণ করেন নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়া বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইয়া, তিনি তর্কযুক্তিসহায়ে ঐ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন বিষম গণ্ডগোল চলিতেছিল। কারণ স্বামীজীর স্বভাবই ছিল, যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তখনি তাহা হাঁকিয়া ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে অপরকে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও অধিকারিভেদে নানা আকার ধারণ করে–বালক স্বামীজী তাহা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক ভক্তদিগের মধ্যে তিন চারিজন স্বামীজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে। পূজা ও জাগরণে রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয়, এজন্য বসতবাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূর পূর্বে অবস্থিত রন্ধনশালার জন্য নির্মিত একটি গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটাপটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছেন।

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত তামাকু

সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজীর ভিতর সহসা পূর্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অদ্য কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন, "আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাকত।" ইতিমধ্যে তামাকু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বালক দেখিল, স্বামীজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক মিনিটকাল ঐভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "ব্যস্, হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি?"

অ। ব্যাটারি (electric battery) ধরলে যেমন কি একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল।

অপর ব্যক্তি অভেদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীজীকে স্পর্শ করে তোমার হাত আপনা আপনি ঐরূপ কাঁপছিল?"

অ। হাঁ, স্থির করে রাখতে চেষ্টা করেও রাখতে পারছিলুম না।

ঐ সম্বন্ধে অন্য কোন কথাবার্তা তখন আর হইল না, স্বামীজী তামাকু খাইলেন। পরে সকলে দুই-প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অভেদানন্দ ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। উপস্থিত সকলের মনে হইল, স্বামীজীকে ইতিপূর্বে স্পর্শ করার ফলেই তাহার এখন ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামীজীও তাহার ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইলেন।

রাত্রি চারিটার সময় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে বলিলেন, "ঠাকুর ডাকিতেছেন।" শুনিয়াই স্বামীজী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন।

স্বামীজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "কি রে? একটু জমতে না জমতেই খরচ? আগে নিজের ভিতর ভাল করে জমতে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে, তা বুঝতে পারবি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা করলি বল দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল!—ছয় মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল! যা হবার হয়েছে, এখন হতে হঠাৎ অমনটা আর করিস্ নি। যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।"

স্বামীজী বলিতেন, "আমি তো একেবারে অবাক্। পূজার সময় নীচে আমরা যা যা করেছি, ঠাকুর সমস্ত জানতে পেরেছেন! কি করি—তাঁর ঐরূপ ভর্ৎসনায় চুপ করে রইলুম।"

ফলে দেখা গেল অভেদানন্দ যে ভাবসহায়ে পূর্বে ধর্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার তো একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠানসকল করিয়া ফেলিতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অদ্বৈতভাবের উপদেশ করিতে ও সস্নেহে তাহার ঐরূপ কার্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অভেদানন্দের ঐ ভাব-প্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্যানুষ্ঠানে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া, ঠাকুরের শরীরত্যাগের বহুকাল পরে সাধিত হইয়াছিল।

নরলীলায় সমস্ত কার্য সাধারণ নরের ন্যায় হয়

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতার-পুরুষকৃত চেষ্টাসকলকে মিথ্যা ভান বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন, ঐ শ্রেণীর ভক্তদিগকে আমাদিগের বক্তব্য যে, ঠাকুরকে তাঁহাদিগের ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। বরং অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'নরলীলায় সমস্ত কার্যই সাধারণ নরের ন্যায় হয়; নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্বলাভ করিতে হয়।' জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও ঐ কথা বলে এবং যুক্তিসহায়ে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐরূপ না হইলে জীবের প্রতি কৃপায় ঈশ্বরকৃত নরবপু ধারণের কোন সার্থকতা থাকে না।

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার ভিতর আমরা দুই ভাবের কথা দেখিতে পাই। তাঁহার কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, "(আমি) ভাত রেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা", "ছাঁচ তৈয়ারী হয়েছে, তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে ফ্যাল ও গড়ে তোল", "কিছুই যদি না পারবি তো আমার উপর বকল্‌মা দে" ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, "এক এক করে সব বাসনা ত্যাগ কর, তবে তো হবে", "ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক্", "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ডাক্", "আমি ষোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) কর" ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয়, ঠাকুরের ঐ দুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধনের কোনটা ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর[1] সহিত মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্ছে ও হবে। মানুষ ঐ কথা শেষকালে বুঝতে পারে। তবে কি জানিস্, যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে–গরুটা খোঁটার এক হাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়িগাছটা যত লম্বা ততদূরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে–মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জানবি। গরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বসুক, দাঁড়াক বা ঘুরে বেড়াক–মনে করেই মানুষ তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক, বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে করছে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্, তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে, তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।"

কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মহাশয়, সাধনভজন করাতে তো মানুষের হাত নাই? সকলেই তো বলিতে পারে–আমি যাহা কিছু করিতেছি, সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি?"

ঠাকুর–মুখে শুধু বললে কি হবে রে? কাঁটা নেই, খোঁচা নেই, মুখে বললে কি হবে। কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠতে হবে। সাধনভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাকত, তবে তো সকলেই তা করতে পারত–তা পারে না কেন? তবে কি জানিস, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক ঠিক ব্যবহার না করলে তিনি আর অধিক দেন না। ঐজন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম করে তবে ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হতে হয়। ঐরূপ করলে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়।

কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উদ্যম করতেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন–

ঐ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু ও নারদ-সংবাদ

"গোলোক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ দেন যে, তাকে নরকভোগ করতে হবে। নারদ ভেবে আকুল। নানারূপে স্তবস্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বললে–আচ্ছা ঠাকুর, নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই বা আছে, আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, কৃপা করে আমাকে বলুন। বিষ্ণু তখন ভূঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক।' নারদ বললে, 'বটে? তবে আমার এই নরকভোগ হ'ল'–বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করলে। বিষ্ণু হাসতে হাসতে বললেন, 'সে কি? তোমার নরকভোগ হল কই?' নারদ বললে, 'কেন ঠাকুর, তোমারই সৃজন তো স্বর্গ নরক! তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বললে–এই নরক, তখন ঐ স্থানটা সত্যসত্যই নরক হল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরকভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বললে কি না! বিষ্ণুও তাই 'তথাস্তু' বললেন। নারদকে কিন্তু তাঁর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে ঐ আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হল, (ঐ উদ্যমটুকু করে) তবে তার ভোগ কাটল।"–এইরূপে কৃপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের স্থান আছে, তাহা ঠাকুর ঐ গল্পটি সহায়ে কখনও কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

মানবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিয়া অবতারপুরুষের মুক্তির পথ আবিষ্কার করা

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়। আমাদিগেরই ন্যায় উদ্যম করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয় এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয়, ততদিন তাঁহাদিগের অন্তরে নিজ দেবস্বরূপের আভাস কখনও কখনও অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে 'বহুজনহিতায়' মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আঁধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাতড়াইতে হয়। তবে স্বার্থসুখচেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদের ভিতরে না থাকায় তাঁহারা জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবন-সমস্যার সমাধানকরতঃ লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন।

মানব বলিয়া না ভাবিলে অবতারপুরুষের জীবন ও চেষ্টার অর্থ পাওয়া যায় না

নরের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় এবং ঐজন্যই আমরা তাঁহার মানবভাবসকল সর্বদা পুরোবর্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাঁহাকে না ভাবিলে, তাঁহার সাধনকালের অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টাদির কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে, যিনি নিত্য পূর্ণ, তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা 'লোকদেখানো' ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার উদ্যম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।

বদ্ধমানব মানবভাবে মাত্রই বুঝিতে পারে

ঠাকুরের কৃপালাভের প্রত্যাশী হইলেও আমাদিগকে তাঁহাকে আমাদিগেরই ন্যায় মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, ঠাকুর আমাদিগের দুঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই তো

আমাদিগের দুঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন। অতএব যেদিক দিয়াই দেখ, তাঁহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বাস্তবিক, যতদিন না আমরা সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্গুণ দেব-স্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, ততদিন পর্যন্ত জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতারদিগকে মানবভাবাপন্ন বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" কথাটি ঐরূপ বাস্তবিকই সত্য। তুমি যদি স্বয়ং সমাধিবলে নির্বিকল্প ভূমিতে পৌঁছাইতে পারিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, যদি তাহা না পারিয়া থাক, তবে তোমার পূজা উক্ত দেবভূমিতে উঠিবার ও যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেষ্টামাত্রেই পর্যবসিত হইবে এবং জগৎকারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানব বলিয়াই তোমার স্বতঃ ধারণা হইতে থাকিবে।

ঐজন্য মানবের প্রতি করুণায় ঈশ্বরের মানবদেহধারণ, সুতরাং মানব ভাবিয়া অবতারপুরুষের জীবনালোচনাই কল্যাণকর

দেবত্বে আরূঢ় হইয়া ঐরূপে ঈশ্বরের মায়াতীত দেবস্বরূপের যথার্থ পূজা করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্বল অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত। সেইজন্য আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের পূজাগ্রহণ করিবার জন্যই ঈশ্বরের মানবভূমিতে অবতরণ—মানবীয় ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া দেবমানব-রূপধারণ। পূর্ব পূর্ব যুগাবির্ভূত দেবমানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধনকালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের অনেক সুবিধা আছে, কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় সে সকলের জ্বলন্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আবার, আমরা তাঁহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্বেই তাঁহার সাধকজীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর লোকসকলের চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অনেকে তখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সাধনতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আবৃত্তি করিয়া লওয়া ভাল। অতএব ঐ বিষয়ে আমরা এখন কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

---

[1] স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে ইঁহার শরীরত্যাগ হয়।

২.৩. প্রথম অধ্যায়: সাধক ও সাধনা

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হয়তো একথায় বলিবেন, ভারত তো চিরকাল কোনও-না-কোনও ভাবে ধর্মসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে, তবে ঐ কথা আবার পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন্ দেশের কোন্ জাতি এতদূর করিয়াছে? কোন্ দেশে ব্রহ্মজ্ঞ অবতার-পুরুষসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিষয়ের মূলসূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

সাধনা সম্বন্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণা

কথা সত্য হইলেও ঐরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধনা সম্বন্ধে অনেকস্থলে জনসাধারণের একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া তাহারা অনেক সময় কেবলমাত্র শারীরিক কঠোরতায়, দুষ্প্রাপ্য বস্তুসকলের সংযোগে স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধে এবং এমন কি, অসম্বদ্ধ মনের বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কুসংস্কার এবং কু-অভ্যাসে বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণাপূর্বক সকলের পক্ষেই ঐ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া অনেকস্থলে প্রচারিত হইতেছে। বৈরাগ্যবান না হইয়া—সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদিভোগের জন্য সমভাবে লালায়িত থাকিয়া মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রৌষধি-বশীভূত সর্পের ন্যায় নিজ কর্তৃত্বাধীন করিতে পারা যায়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ভারতের ঋষিমহাপুরুষগণ সাধনাসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষেপে আলোচনা এখানে বিষয়বিরুদ্ধ হইবে না।

সাধনার চরম ফল সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন

ঠাকুর বলিতেন, "সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা"—সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়। হিন্দুর সর্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎ ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন, জগতে স্থূল-সূক্ষ্ম, চেতন-অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটি, পাথর, মানুষ, পশু, গাছপালা, জীব-জানোয়ার, দেব-উপদেব—সকলই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মবস্তুকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে লইয়া তোমার সকলপ্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সহিত তুমি ঐরূপ করিতেছ। কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে সন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ঐসকল নিরসনে শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটি পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা।

ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয় না—অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায় না

প্রশ্ন। ঐ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন?

উত্তর। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ ভ্রম দূরীভূত হয়, ততক্ষণ কেমন করিয়া ঐ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিয়া থাকি। পূর্বোক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা, ঐরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি এবং কবে হইতেই বা আমাদের এই ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল?

উ। ভ্রমের কারণ সর্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও তাহাই—অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছ, ততক্ষণ উহা জানিবার চেষ্টা বৃথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই উহাকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়। বলিতে পার—স্বপ্ন দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ ধারণা থাকিতে দেখা যায়। সেখানেও জাগ্রদবস্থার স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্মৃতি ঐরূপে হইতে দেখা যায়।

প্র। তবে উপায়?

উ। উপায়—ঐ অজ্ঞান দূর কর। ঐ ভ্রম বা অজ্ঞান যে দূর করা যায়, তাহা তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূর্ব পূর্ব ঋষিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া দূর করিতে হইবে বলিয়া গিয়াছেন।

জগৎকে ঋষিগণ যেরূপ দেখিয়াছেন তাহাই সত্য।—উহার কারণ

প্র। আচ্ছা, কিন্তু ঐ উপায় জানিবার পূর্বে আরও দুই-একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা এত লোকে যাহা দেখিতেছি, প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্পসংখ্যক ঋষিরা যাহা বা যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই ভুল?

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে, তাহাই যে সর্বদা সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি, কারণ ঐ প্রত্যক্ষসহায়ে তাঁহারা সর্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকারে ভয়শূন্য ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিতমৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একটা উদ্দেশ্যেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যথার্থ জ্ঞান মানবমনে সর্বদা সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্‌ভুত উদারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে; ঋষিদিগের জীবনে ঐরূপ অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি এবং তাঁহাদিগের পদানুসরণে চলিয়া, যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদিগের ভিতরে ঐ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই।

অনেকের একরূপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কখন সত্য হয় না

প্র। আচ্ছা, কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রকারের হইল কিরূপে? আমি যেটাকে পশু বলিয়া বুঝি, তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ বলিয়া বুঝ না; এইরূপ, সকল বিষয়েই। এত লোকের ঐরূপে সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার ভুল হওয়া অল্প আশ্চর্যের কথা নহে! পাঁচজনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণা করিলেও অপর পাঁচজনের ঐ বিষয়ে সত্যদৃষ্টি থাকে, সর্বত্র এইরূপই তো দেখা যায়। এখানে কিন্তু ঐ নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্য তোমার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনা বিদ্যমান বলিয়াই মানবসাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে–বিরাট মন কিন্তু ঐজন্য ভ্রমে আবদ্ধ নহে

উ। অল্পসংখ্যক ঋষিদিগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব প্রশ্নেই এ বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সকলের একপ্রকারে ভ্রম হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন–এক অসীম অনন্ত সমষ্টি-মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। তোমার, আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টিমন ঐ বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে ঐ একই প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। এজন্যই আমরা প্রত্যেক পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। ঐজন্যই আবার যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্বপ্রকার ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে, সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাটমনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া পড়েন না। কারণ, সর্বদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত জগৎকল্পনার ভিতরে ও বাহিরে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ঠাকুর যেমন বলিতেন, "সাপের মুখে বিষ রয়েছে, সাপ ঐ মুখ দিয়ে নিত্য আহারাদি করছে, সাপের তাতে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায়, ঐ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!"

জগৎরূপ কল্পনা দেশকালের বাহিরে বর্তমান।– প্রকৃতি অনাদি

অতএব শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা গেল, বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভূত জগৎটা একভাবে আমাদেরও মনঃকল্পিত। কারণ, আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন সমষ্টিভূত বিশ্বমনের সহিত শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। আবার ঐ জগৎরূপ কল্পনা যে এককালে বিশ্ব-মনে ছিল না, পরে আরম্ভ হইল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ পদার্থদ্বয়–যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে না–জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত বস্তু অথবা ঐ কল্পনার সহিত উহারা অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিদ্যমান। স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাদি শাস্ত্র যে কেন সৃজনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। জগৎটা যদি মনঃকল্পিতই হয় এবং ঐ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎরূপ কল্পনাটা তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন বহুকাল ধরিয়া ঐ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ় ধারণা করিয়া রহিয়াছে এবং জগৎরূপ কল্পনার অতীত অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ দর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া জগৎটা যে মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র, এ কথা এককালে ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে সর্বদা সক্ষম হই।

দেশকালাতীত জগৎকারণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টাই সাধনা

এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন নামরূপ, দেশ-কাল, মন-বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ঐ পরিচয় পাইবার চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র 'সাধন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এবং ঐ চেষ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিদ্যমান, তাঁহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

‘নেতি, নেতি’ ও ‘ইতি, ইতি’ সাধনপথ

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের পূর্বোক্ত চেষ্টা দুইটি প্রধান পথে এতকাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম, শাস্ত্র যাহাকে ‘নেতি, নেতি’ বা জ্ঞানমার্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয়, যাহা ‘ইতি, ইতি’ বা ভক্তিমার্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের সাধক চরমলক্ষ্যের কথা প্রথম হইতেই হৃদয়ে ধারণা ও সর্বদা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞাতসারে তদভিমুখে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপস্থিত হইবেন, তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে, তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানী উহা প্রথম হইতেই সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়িয়া কতক রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ তত্ত্বে উপস্থিত হন। জগৎসম্বন্ধে উল্লিখিত স্বার্থপর, ভোগসুখৈকলক্ষ্য সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাস্ত্র ‘বৈরাগ্য’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

নিত্যপরিবর্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতা-জ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ত্যাগ করিয়া ‘নেতি, নেতি’ মার্গে জগৎকারণের অনুসন্ধান করা প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সেজন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্ পরিপুষ্টি হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

‘নেতি, নেতি’ পথের লক্ষ্য—‘আমি কোন্ পদার্থ’ তদ্বিষয়ে সন্ধান করা

‘নেতি, নেতি’—নিত্যস্বরূপ জগৎকারণ ‘ইহা নহে, উহা নহে’ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্পকালেই যে অন্তর্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদ্ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিয়াছিল, বাহিরের অন্য বস্তুসকল অপেক্ষা তাহার নিজ দেহমনই তাহাকে সর্বাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অতএব, দেহ-মনাবলম্বনে জগৎকারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে উহার সন্ধান শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা। আবার “হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাঁড়িটা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না”; তদ্রূপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার অন্বেষণ পাওয়া যাইবে। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট ‘আমি কোন্ পদার্থ’, এ বিষয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

নির্বিকল্প সমাধি

পূর্বে বলিয়াছি, জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়বিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। ঐ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানবমন সর্ববৃত্তিরহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। ঐরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র ‘নির্বিকল্প’ সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানপথের সাধক ‘আমি বাস্তবিক কোন্ পদার্থ’, এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া কিরূপে নির্বিকল্প সমাধিতে উপস্থিত হন এবং ঐ কালে তাঁহার কীদৃশ অনুভব হইয়া থাকে, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।[1] অতএব ভক্তিপথের পথিক ঐ সমাধির অনুভবে কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, পাঠককে এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্তব্য।

‘ইতি, ইতি’ পথে নির্বিকল্প সমাধিলাভের বিবরণ

ভক্তিমার্গকে ‘ইতি, ইতি’-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দেশ করিয়াছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগৎরূপ কার্য সত্য ও বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ব বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাকে তিনি দূর-পরিহার করেন। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বরের কোন এক রূপের[2] প্রতি অনুরাগে ও ধ্যানে তন্ময় হওয়া এবং তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্বকার্যানুষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে।

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায়, এইবার আমরা তাহার অনুশীলন করিব। পূর্বে বলিয়াছি, ভক্ত ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারই চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম ধ্যান করিবার কালে, তিনি ঐ ইষ্টমূর্তির সর্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানসনয়নের সম্মুখে আনিতে পারেন না; কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; উহাও আবার দর্শনমাত্রেই যেন লয় হইয়া যায়, সম্মুখে স্থিরভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলে ঐ মূর্তির সর্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানসচক্ষের সম্মুখে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। ধ্যান ক্রমে গভীরতর হইলে ঐ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয়, ততক্ষণ স্থিরভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে ঐ মূর্তির চলা-ফেরা, হাসা, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্যন্তও ভক্তের উপলব্ধি হয়। তখন ঐ মূর্তিকে সর্বপ্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্ত চক্ষু মুদ্রিত বা উন্মীলিত করিয়া ধ্যান করুন না কেন, ঐ মূর্তির ঐ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। পরে, ‘আমার ইষ্টই ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করিয়াছেন’—এই বিশ্বাসের ফলে ভক্ত-সাধক আপন ইষ্টমূর্তি হইতে নানাবিধ দিব্যরূপসকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন—“যে ব্যক্তি একটি রূপ ঐ প্রকার জীবন্তভাবে দর্শন করিয়াছে, তাহার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়।”

ইতিপূর্বে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা বুঝিতে পারি। ঐরূপ জীবন্ত মূর্তিসকলের দর্শনলাভ যাঁহার ভাগ্যে উপস্থিত হয়, তাঁহার নিকট জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থসকলের ন্যায়, ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাজ্যগত ঐ সকল মূর্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে থাকে। ঐরূপে বাহ্য জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাস্তিত্ববোধ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাঁহার মনে বাহ্য জগৎটাকে মনঃকল্পিত বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অনুভব ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, সেই সময়ের জন্য তাঁহার বাহ্য জগতের অনুভব ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের ঐ অবস্থাকেই শাস্ত্র সবিকল্প সমাধি নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সমাধিকালে মানসিক শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ্য জগতের বিলয় হইলেও ভাবরাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা নিত্য যেরূপ সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, আপন ইষ্টমূর্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন ঠিক তদ্রূপ অনুভব করিতে থাকেন। কেবলমাত্র ইষ্টমূর্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার মনে তখন যত কিছু সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে। এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের মনে ঐ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্য শাস্ত্র তাঁহার ঐ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন।

এইরূপে ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিষয়বিশেষের চিন্তায় ভক্তের মনে স্থূল বাহ্য জগতের এবং এক ভাবের প্রাবল্যে অন্য ভাবসকলের বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, সমাধির নির্বিকল্পভূমিলাভ তাঁহার নিকট অধিক দূরবর্তী নহে। জগতের বহুকালাভ্যস্ত অস্তিত্বজ্ঞান যিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে, একথা বলিতে হইবে না। মনকে এককালে নির্বিকল্প করিতে পারিলে ঈশ্বরসম্ভোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই তাঁহার সমগ্র মন

ঐদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুরু ও ঈশ্বরকৃপায় তিনি অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্বক চিরশান্তির অধিকারী হন। অথবা বলা যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইষ্টপ্রেমই তাঁহাকে ঐ ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণায় তিনি আপন ইষ্টের সহিত তখন একত্বানুভব করেন।

অবতারপুরুষে দেব ও মানব উভয় ভাব বিদ্যমান থাকায় সাধনকালে তাঁহাদিগকে সিদ্ধের ন্যায় প্রতীত হয়–দেব ও মানব উভয়ভাবে তাঁহাদিগের জীবনালোচনা আবশ্যক

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার ঐরূপ ক্রম শাস্ত্রনির্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব, উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধনকালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তি-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে ঐরূপ হইয়া থাকে; অথবা ভিতরের দেবভাব তাঁহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায়, উহা তাঁহাদিগের মানবভাবের বহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃপ্রকাশিত হয়–মীমাংসা যাহাই হউক না কেন ঐরূপ ঘটনা কিন্তু অবতারপুরুষসকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে দুর্ভেদ্য জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল রহস্যের কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, একথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতারচরিত্রের মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল–সন্দেহশীল বর্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব। বলা বাহুল্য, দেবমানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতারচরিত্র ঐরূপে দেখিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।

---

[1] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় দেখ।

[2] ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি। কারণ আকাররহিত সর্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বের ধ্যান করিতে যাইলে আকাশ, জল, বায়ু, তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের সদৃশ পদার্থবিশেষই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে।

২.৪. দ্বিতীয় অধ্যায়: অবতারজীবনে সাধকভাব

ঠাকুরে দেব ও মানবভাবের মিলন

পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি, ততই তাঁহাতে দেব ও মানব, উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মেলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামঞ্জস্যে ঐরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একাধারে বর্তমানতা যে সম্ভবপর, একথা তাঁহাকে না দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত না। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদিগের ধারণা তিনি দেবমানব–পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বৃথা ভান করেন নাই এবং মানবভাব তিনি লোকহিতায় যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, দেখিয়াছি বলিয়াই একথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব পূর্ব যুগের সকল অবতারপুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।

সকল অবতারপুরুষেই ঐরূপ

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অবতারপুরুষসকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা আলোচনা করিতে যাইলেই আমরা ঐরূপ দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, তাঁহারা কখন আমাদের ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন–আবার কখন বা উচ্চ ভাব-ভূমিতে বিচরণপূর্বক আমাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন!–তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ করাইতেছে। আশৈশবই ঐরূপ। তবে, শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাঁহাদিগের নিজস্ব এবং অন্তরেই অবস্থিত, একথা তাঁহারা অনেক সময়ে বুঝিতে পারেন না; অথবা ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে উচ্চভাব-ভূমিতে আরোহণপূর্বক দিব্যভাবসহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে এবং তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ শক্তির অস্তিত্ব জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিতে করিতে উহার সহিত সম্যক্রূপে পরিচিত হইবার প্রবল বাসনা তাঁহাদের মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই তাঁহাদিগকে অলৌকিক অনুরাগসম্পন্ন করিয়া সাধনে নিযুক্ত করে।

অবতারপুরুষে স্বার্থসুখের বাসনা থাকে না

তাঁহাদিগের ঐরূপ বাসনায় স্বার্থপরতার নামগন্ধ থাকে না। ঐহিক বা পারলৌকিক কোনপ্রকার ভোগসুখলাভের প্রেরণা তো দূরের কথা, পৃথিবীস্থ অপর অপর সকল ব্যক্তির যাহা হইবার হউক, আমি মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি–এইরূপ ভাব পর্যন্ত তাঁহাদিগের ঐ বাসনায় দেখা যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্যশক্তির নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্যভাবসকল অনুভব করিতেছেন এবং স্থূল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় ভাবরাজ্যগত সকল বিষয়ে সমসমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই শক্তি কি বাস্তবিকই জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনা-বিজৃম্ভিত, তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁহাদিগের ঐ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অনুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষসকলের তুলনা করিয়া একথা তাঁহাদিগের স্বল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতস্থ বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অপরে তদ্রূপ করিতেছে না–ভাবরাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।

তাঁহাদিগের করুণা ও পরার্থে সাধনভজন

শুধু তাহাই নহে। পূর্বোক্ত তুলনায় তাঁহাদের আর একটি কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য দুই ভূমি হইতে জগৎটাকে দুইভাবে দেখিতে পান বলিয়াই দুই দিনের নশ্বর জীবনে আপাত-মনোরম রূপরসাদি তাঁহাদিগকে মানবসাধারণের ন্যায় প্রলোভিত করিতে পারে না এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল সংসারের নানা অবস্থাবিপর্যয়ে অশান্তি ও নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়া তাঁহাদিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত শক্তিকে সম্যক্প্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ ও উচ্চতর ভাব-ভূমিসকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন এবং আপামর সাধারণকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, সাধনা ও করুণার দুইটি প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগের জীবনে নিরন্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। মানবসাধারণের সহিত আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় ঐ করুণা তাঁহাদিগের অন্তরে শতধারে বর্ধিত হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপেই যে উহার উৎপত্তি হয়, একথা বলা যায় না। উহা সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সংসারে জন্মিয়া থাকেন। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ কর -

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত–'তিন বন্ধুর আনন্দকানন-দর্শন' সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প

"তিন বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখলে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা–তার ভিতর থেকে গানবাজনার মধুর আওয়াজ আসছে। শুনে ইচ্ছে হোলো, ভিতরে কি হচ্ছে দেখবে। চারিদিকে ঘুরে দেখলে, ভিতরে ঢোকবার একটিও দরজা নেই। কি করে?—একজন কোনরকমে একটা মই যোগাড় করে পাঁচিলের ওপরে উঠতে লাগলো ও অপর দুইজন নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটি পাঁচিলের ওপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাহা করে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়লো–কি যে ভিতরে দেখলে তা নীচের দুজনকে বলবার জন্য একটুও অপেক্ষা করতে পারলে না। তারা ভাবলে–বাঃ–বন্ধু তো বেশ, একবার বললেও না কি দেখলে!–যা হোক, দেখতে হোলো। আর একজন ঐ মই বেয়ে উঠতে লাগলো। উপরে উঠে সেও প্রথম লোকটির মত হাহা করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো। তৃতীয় লোকটি তখন কি করে–ঐ মই বেয়ে উপরে উঠলো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখতে পেলে। দেখে প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হোলো সেও ওতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে–কিন্তু আমি যদি এখনি ওতে যোগদান করি, তাহলে বাইরের অপর দশজনে তো জানতে পারবে না এখানে এমন আনন্দ-উপভোগের জায়গা আছে; একলা এই আনন্দটা ভোগ করবো? ঐ ভেবে সে জোর করে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেবে এলো ও দুচোখে যাকেই দেখতে পেলে তাকেই হেঁকে বলতে লাগলো–'ওহে, এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে ভোগ করি!' ঐরূপে বহু ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সেও ওতে যোগ দিলে।" এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির মনে দশজনকে সঙ্গে লইয়া আনন্দোপভোগের ইচ্ছার কারণ যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তদ্রূপ অবতারপুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিদ্যমান থাকে, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না।

অবতারপুরুষদিগকে সাধারণ মানবের ন্যায় সংযম-অভ্যাস করিতে হয়

পূর্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হয়তো স্থির করিবেন, অবতারপুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্বার ইন্দ্রিয়সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেইজন্য সংসারের রূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমরা বলি–তাহা নহে, ঐ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হয়।

মনের অনন্ত বাসনা

মানব-মনের স্বভাব সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি দেখিতে পাইয়াছেন স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনন্ত বাসনাস্তরসমূহ উহার ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে, একটিকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ, তবে আর একটি আসিয়া তোমার পথরোধ করিল; সেটিকে পরাজিত করিলে তো আর একটি আসিল; স্থূলকে পরাজিত করিলে তো সূক্ষ্ম আসিল; তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে তো সূক্ষ্মতর বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইল। কাম যদি ছাড়িলে তো কাঞ্চন আসিল; স্থূলভাবে কাম-কাঞ্চনগ্রহণে বিরত হইলে তো সৌন্দর্যানুরাগ, লোকৈষণা, মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত হইল; অথবা মায়িক সম্বন্ধসকল যত্নপূর্বক পরিহার করিলে তো আলস্য বা করুণাকারে মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল!

বাসনাত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণা

মনের ঐরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বাসনাজাল হইতে দূরে থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক করিতেন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী[1] ও চিন্তা পর্যন্ত সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি ঐ বিষয় আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্তদিগের ন্যায় স্ত্রী-ভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারংবার বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাঁহার এক দিনের ঐরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঐ বিষয়ে স্ত্রীভক্তদিগকে উপদেশ

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে-কেহই যাইতেন, সকলেই তাঁহার অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং সুবিধা পাইলেই পুনরায় তাঁহার পুণ্যদর্শন-লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। ঐরূপে তাঁহারা যে নিজেই তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইয়া তাহারাও যাহাতে তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিতা জনৈকা ঐরূপে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেয়ী ভগ্নী ও তাঁহার স্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় ও কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান হওয়াই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, এই বিষয়ে কথা পাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন –

"ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড–হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নেই, তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে!–সেও বিড়ালের মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে, আর বলবে, 'মাছ দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি?'

"হয়তো, বড় বনেদি ঘর। পতি-পুত্তুর সব মরে গেল–কেউ নেই–রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!–তাদের মরণ নেই! বাড়ীর এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে–তার সঙ্গে দু-চারগাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে, রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধছে ও সংসার করচে! কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক না–তার তো সময় হয়েছে। তা হবে না!

"হয়তো বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল–কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়–ভাইয়ের ঘরে গিন্নী হোল! মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে হাত নেড়ে গিন্নীপনা কচ্চেন–সর্বনাশীকে দেখলে পাড়াসুদ্ধু লোক ডরায়! আর বলে বেড়াচ্চেন–'আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না!'–মর মাগি, তোর কি হোলো তা দ্যাখ–তা না!"

এক রহস্যের কথা—আমাদের পরিচিতা রমণীর ভগ্নীর ঠাকুরঝি—যিনি অদ্য প্রথমবার ঠাকুরের দর্শনলাভ করিলেন, ভ্রাতার ঘরে গৃহিণী-ভগ্নীদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন। ঠাকুরকে কেহই সেকথা ইতিপূর্বে বলে নাই। কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানবমনে অনন্ত বাসনান্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, কথাগুলি ঐ স্ত্রীলোকটির অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া আমাদের পরিচিতা রমণীর ভগ্নী তাঁহার গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"ও ভাই, আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়?—ঠাকুরঝি কি মনে করবে!" পরিচিতা বলিলেন, "তা কি করবো, ওঁর ইচ্ছা, ওঁকে আর তো কেউ শিখিয়ে দেয়নি?"

অবতারপুরুষদিগের সূক্ষ্ম বাসনার সহিত সংগ্রাম

মানবপ্রকৃতির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহার মন যত উচ্চে উঠে, সূক্ষ্ম বাসনারাজি তাহাকে তত তীব্র যাতনা অনুভব করায়। চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐরূপ কার্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না; কিন্তু উদার উচ্চ অন্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়। অবতারপুরুষসকলকে আজীবন স্থূলভাবে বিষয়গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও, অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম যে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উহাদিগের মূর্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত-সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাঁহারা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইতে তাঁহাদিগের সংগ্রামকে ভান কিরূপে বলিব?

অবতারপুরুষের মানবভাব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা

শাস্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়তো এখনও বলিবেন—"কিন্তু তোমার কথা মানি কিরূপে? এই দেখ, অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য শঙ্কর তাঁহার গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নরদেহধারণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব, সকল জীবের নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বর লোকানুগ্রহ করিবেন বলিয়া নিজ মায়াশক্তি দ্বারা যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন, এইরূপ পরিলক্ষিত হন।' [2] স্বয়ং আচার্যই যখন ঐকথা বলিতেছেন, তখন তোমাদের পূর্বোক্ত কথা দাঁড়ায় কিরূপে?" আমরা বলি, আচার্য ঐরূপ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের দাঁড়াইবার স্থল আছে। আচার্যের ঐকথা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন ভান বলিতেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার, আমার এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে ভান বলিতেছেন। সমস্ত জগৎটাকেই তিনি ব্রহ্মবস্তুর উপরে মিথ্যা ভান বলিতেছেন বা উহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতেছেন না। [3] অতএব তাঁহার ঐ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে। অবতারের দেহধারণ ও সুখদুঃখাদি অনুভবগুলিকে মিথ্যা ভান বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয়গুলিকে সত্য বলিব, এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে অবতারপুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত কথায় আমরা অন্যায় কিছু বলি নাই।

ঐ কথার অন্যভাবে আলোচনা

কথাটির আর একভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। অদ্বৈতভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎ সম্বন্ধে দুইপ্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হয়—শাস্ত্র এই কথা বলেন। প্রথমটিতে আরোহণ করিয়া জগৎরূপ পদার্থটি কতদূর সত্য বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয়, উহা নাই বা কোনও কালে ছিল না—'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই; আর দ্বিতীয় বা দ্বৈতভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা

নামরূপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্তমান বলিয়া বোধ হয়, যেমন আমাদিগের ন্যায় মানবসাধারণের সর্বক্ষণ হইতেছে। দেহস্থ থাকিয়াও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান জীবনে অনেক সময় হওয়ায় নিম্নের দ্বৈতভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বপ্নসন্দর্শনকালে যেমন উহাকে এককালে মিথ্যা বলা যায় না, জীবন্মুক্ত ও অবতারপুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইরূপ এককালে মিথ্যা বলা চলে না।

উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি

জগৎরূপ পদার্থটাকে পূর্বোক্ত দুই ভূমি হইতে যেমন দুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তিবিশেষকেও ঐরূপে দুই ভাবভূমি হইতে দুইপ্রকারে দেখা গিয়া থাকে। দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ মানব এবং পূর্ণ অদ্বৈতভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ অদ্বৈতভূমি ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্বে মানব-মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাবভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে উঠিবার কালে জগৎ ও তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব ধারণা নানারূপে পরিবর্তিত হইতে থাকে। যথা—জগৎটাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়; অথবা ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পৃথক, অদৃষ্টপূর্বশক্তিশালী, মনোময় বা দিব্য জ্যোতির্ময় ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে!

অবতারপুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চভাবে উঠিয়া তাঁহাদিগকে মানবভাব-পরিশূন্য দেখে

অবতারপুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পূর্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহাদিগের বিচিত্র শক্তিপ্রভাবেই ঐ প্রকার আরোহণসামর্থ্য উপস্থিত হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঐ সকল উচ্চভূমি হইতে তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত-সাধক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসেন যে, বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তাঁহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে পায়, তাহা তাঁহারা মিথ্যা ভান করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত-সাধকের প্রথমে ঈশ্বরের ভক্তসকলের সম্বন্ধে এবং পরে ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

অবতারপুরুষদিগের মনের ক্রমোন্নতি—জীব ও অবতারের শক্তির প্রভেদ

পূর্বে বলিয়াছি, মনের উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাবরাজ্যে দৃষ্ট বিষয়সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় দৃঢ় অস্তিত্বানুভব, অবতারপুরুষসকলের জীবনে শৈশবকাল হইতে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে, দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐরূপ দর্শন তাঁহাদিগের জীবনে বারংবার যত উপস্থিত হইতে থাকে, তত তাঁহারা স্থূল, বাহ্য জগতের অপেক্ষা ভাবরাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক বিশ্বাসবান্ হইয়া পড়েন। পরিশেষে, সর্বোচ্চ অদ্বৈতভাবভূমিতে উঠিয়া যে একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু হইতে নানা নামরূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে, তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে অবতারপুরুষেরা অতি স্বল্পকালে যে সত্যে উপনীত হন, তাহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়। অথবা, স্বয়ং স্বল্পকালে অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর

অবতারপুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর—“জীব ও অবতারে শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।”

অবতার—দেবমানব, সর্বজ্ঞ

অদ্বৈতভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎকারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়া অবতারপুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিম্নভূমিতে অবরোহণ করেন, তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানবমাত্র থাকিলেও তাঁহারা যথার্থই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা জগৎ ও তৎকারণ, উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় বাহ্যান্তর জগৎটার ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব সর্বদা সর্বত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া মনে অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় নিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহারা সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মানব আমরা তখনই তাঁহাদিগের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষপূর্বক তাঁহাদিগের অভয় শরণ গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাঁহাদিগের অপার করুণায় পুনরায় একথা হৃদয়ঙ্গম করি যে—বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া বাহ্যজগতে পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, বা জগৎকারণের অনুসন্ধান ও শান্তিলাভ কখনই সফল হইবার নহে।

বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় জগৎকারণের জ্ঞানলাভ অসম্ভব

পাশ্চাত্যবিদ্যা-পারদর্শী পাঠক আমাদিগের পূর্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বলিবেন—বাহ্যজগতের বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে মানবের জ্ঞান আজকাল কতদূর উন্নত হইয়াছে ও নিত্য হইতেছে, তাহা যে দেখিয়াছে সে ঐরূপ কথা কখনই বলিতে পারে না। উত্তরে আমরা বলি—জড়বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির কথা সত্য হইলেও উহার সহায়ে পূর্ণসত্যলাভ আমাদিগের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ, যে বিজ্ঞান জগৎকারণকে জড় অথবা আমাদিগের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের বস্তু বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা দিতেছে, তাহার উন্নতি দ্বারা আমরা ক্রমশঃ বহির্মুখ হইয়া অধিক পরিমাণে রূপরসাদি-ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিতেছি। অতএব, একমাত্র জড়বস্তু হইতে জগতের সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে—একথা যন্ত্রসহায়ে কোনকালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্তর-রাজ্যের বিষয়সকল আমাদিগের নিকট চিরকালই অন্ধকারাবৃত ও অপ্রমাণিত থাকিবে। ভোগবাসনাত্যাগ ও অন্তর্মুখীবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের পথ, একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে, ততদিন আমাদিগের দেশকালাতীত অখণ্ড সত্যলাভপূর্বক শান্তিলাভ সুদূরপরাহতই থাকিবে।

অবতারপুরুষদিগের আশৈশব ভাবতন্ময়ত্ব

ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া বাল্যকালে সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবার কথা সকল অবতারপুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে স্বীয় দেবত্বের পরিচয় নানা সময় নিজ পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন; বুদ্ধ বাল্যে উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া জম্বুবৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়নাকর্ষণ করিয়াছিলেন; ঈশা বন্য পক্ষীদিগকে প্রেমে আকর্ষণপূর্বক বাল্যে নিজহস্তে খাওয়াইয়াছিলেন; শঙ্কর স্বীয় মাতাকে দিব্যশক্তিপ্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া বাল্যেই সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং চৈতন্য বাল্যেই দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরপ্রেমিক হেয়-উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেই ঈশ্বরপ্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

ঠাকুরের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা

ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজমুখে শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছি, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—"ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয়[4] করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নেই, তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে-ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে; আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় একঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হুঁশ রইলো না! পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম বলতে পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।"

৮বিশালাক্ষী দর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুরের দ্বিতীয় ভাবাবেশের কথা

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আনুড় নামে গ্রাম। আনুড়ের বিষলক্ষ্মী[5] জাগ্রতা দেবী। চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর-দূরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রামবাসিগণ নানাপ্রকার কামনা পূরণের জন্য দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত করে এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবশ্য, আগন্তুক যাত্রীদিগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হয় এবং রোগশান্তির কামনাই অন্যান্য কামনা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে এখানে আকৃষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ-সম্বন্ধীয় গল্প ও গান করিতে করিতে সদ্বংশজাতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন—এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপূর্ণ এবং এখন অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার নিদর্শন, জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ইষ্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির, রাসমঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য আমাদের অনুমান, আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রিসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তরমধ্যে শূন্য অম্বরতলেই দেবীর অবস্থান, বর্ষাতপাদি হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদনমাত্র বৎসর বৎসর করিয়া দেয়। ইষ্টকনির্মিত মন্দির যে এককালে বর্তমান ছিল, তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্নস্তূপে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদিগকে উক্ত মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, দেবী স্বেচ্ছায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। বলে –

গ্রামের রাখালবালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে তাহারা এখানে আসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া বসিবে, গল্প-গান করিবে, খেলা করিবে, বনফুল তুলিয়া তাঁহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রী বা পথিকপ্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিষ্ট উপদ্রব না হইলে তিনি থাকিতে পারেন না। এক সময়ে কোন গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্টপূরণ হওয়ায় সে ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে যে-সকল দর্শনাভিলাষী আসিতে লাগিল, তাহারা দ্বারের জাফরির রন্ধ্রমধ্য দিয়া দর্শনী-প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণবালকদিগের আর পূর্বের ন্যায় ঐ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার সুবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণ্ণমনে মাকে জানাইল—মা, মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি? তোর দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর ঐ সকল কে খাইতে দিবে? সরল

কৃষাণবালকদিগের ঐ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং সেই রাত্রে মন্দির এমন ফাটিয়া গেল যে, পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অম্বরতলে আনিয়া রাখিল! তদবধি যে-কেহ পুনরায় মন্দিরনির্মাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্য নানা উপায়ে জানাইয়াছেন, ঐ কর্ম তাঁহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীরা বলে—তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরস্ত করিয়াছেন!—স্বপ্নে বলিয়াছেন, "আমি রাখালবালকদের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; মন্দিরমধ্যে আমায় আবদ্ধ করলে তোর সর্বনাশ করবো—বংশে কাকেও জীবিত রাখবো না!"

ঠাকুরের আট বৎসর বয়স—এখনও উপনয়ন হয় নাই। গ্রামের ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পূর্বোক্তরূপে ৺বিশালাক্ষী দেবীর মানত শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ পরিবারের দুই-একজন স্ত্রীলোক এবং গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্ন ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল। সকল বিষয় প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শমত চলিতে ঠাকুর মাতাঠাকুরানীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালককাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে যথার্থ গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সরলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর-দেবতার পুণ্যকথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"হ্যাঁ গদাই, তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্ দেখি? হ্যাঁ রে, সত্যিসত্যিই ঠাকুর মনে হয়!" গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন, কিন্তু কিছুই বলিতেন না; অথবা অন্য পাঁচ কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রসন্ন সে-সকল কথায় না ভুলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—"তুই যা-ই বলিস্, তুই কিন্তু মানুষ নোস্।" প্রসন্ন ৺রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজহস্তে নিত্যসেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পালপার্বনে ঐ মন্দিরে যাত্রাগান হইত। প্রসন্ন কিন্তু উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে লাগেনি—গদাই কান খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে।"—অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা।

স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাই বলিয়া বসিলেন, "আমিও যাব।" বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকেরা নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া গদাধর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোকদিগের তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তি হইল না। কারণ সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত রঙ্গরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হরণ করে? তাহার উপর এই অল্প বয়সে গদাইয়ের ঠাকুরদেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠস্থ। পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদিগের অনুরোধে তাহার দুই-চারিটা সে বলিবেই বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেদ্য দুগ্ধাদি তো তাঁহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে; তবে আর কি? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল। রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুরদেবতার গল্প গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল এবং কি অসুখ করিতেছে বলিয়া তাঁহাদিগের বারংবার সস্নেহ আহ্বানে সাড়া পর্যন্ত দিল না। পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দিগরমি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিতা হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এখন উপায়? দেবীর মানত পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা

ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়! প্রান্তরে জনমানব নাই যে সাহায্য করে। এখন উপায়? স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্না হইলেন এবং ঠাকুরদেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া বসিয়া কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় হইল–বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই তো? সরলপ্রাণ পবিত্র বালক ও স্ত্রীপুরুষের উপরেই তো দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি। প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে ঐ কথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে ৺বিশালাক্ষীর নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচারিত্র্যে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব হইতেই ছিল, সুতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন–'মা বিশালাক্ষি, প্রসন্না হও; মা, রক্ষা কর; মা বিশালাক্ষি, মুখ তুলে চাও; মা, অকূলে কূল দাও!'

আশ্চর্য! রমণীগণ কয়েকবার ঐরূপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প অল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল। তখন আশ্বাসিতা হইয়া তাঁহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও মাতৃসম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।[6]

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং আশ্চর্যের বিষয়, ইতিপূর্বের ঐরূপ অবস্থার জন্য তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা দুর্বলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তখন তাঁহাকে লইয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌-চিত্তে ৺দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের মাতার নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে ভীতা হইয়া গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা দিলেন এবং বিশালাক্ষীর উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহারও বিশেষ পূজা অঙ্গীকার করিলেন।

শিবরাত্রিকালে শিব সাজিয়া ঠাকুরের তৃতীয় ভাবাবেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আর একটি ঘটনা বাল্যকাল হইতে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে মধ্যে মধ্যে আরূঢ় হওয়ার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল –

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দ্দূরে একঘর সুবর্ণবণিক বাস করিত। পাইনরা যে তখন বিশেষ শ্রীমান ছিল, তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত ইষ্টকনির্মিত শিবমন্দিরে এখনও পাওয়া যায়। এ পরিবারের দুই-একজন মাত্র এখনও বাঁচিয়া আছে এবং ঘরদ্বার ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, পাইনদের তখন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ছিল, বাটীতে লোক ধরিত না এবং জমিজেরাত, চাষবাস, গরুলাঙ্গলও যেমন ছিল, নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ দুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদারদের মত ধনাঢ্য ছিল না, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-শ্রেণীভুক্ত ছিল।

পাইনদের কর্তা বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের বসতবাটীটি ইষ্টকনির্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই, বরাবর মাঠকোঠাতেই[7] বাস করিতেন; দেবালয়টি কিন্তু ইষ্টক পোড়াইয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সুন্দরভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন। কর্তার নাম সীতানাথ ছিল। তাঁহার সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল; এবং বিবাহিতা হইলেও কন্যাগুলি, কি কারণে বলিতে পারি না, সর্বদা পিত্রালয়েই বাস করিত। শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ-বার বৎসর বয়স, তখন উহাদের সর্বকনিষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাগুলি সকলেই রূপবতী ও দেবদ্বিজ-ভক্তিপরায়ণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ স্নেহ করিত। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্মনিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন এবং পাইনদের বাটীতে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া অনেক

লীলার কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান ঘটনাটি কিন্তু আমরা ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম।

কামারপুকুরে বিষ্ণুভক্তি ও শিবভক্তি পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি না করিয়া বেশ পাশাপাশি চলিত বলিয়া বোধ হয়। এখনও শিবের গাজনের ন্যায় বৎসর বৎসর বিষ্ণুর চব্বিশপ্রহরী নামসংকীর্তন সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে; তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের সংখ্যা বিষ্ণুমন্দিরাপেক্ষা অধিক। সুবর্ণবণিকদিগের ভিতর অনেকেই গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া থাকে; নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্ধারণ দত্তকে দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার পর হইতে ঐ জাতির ভিতর বৈষ্ণব মত বিশেষ প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনরা কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই ভক্ত ছিল। বৃদ্ধ কর্তা পাইন একদিকে যেমন ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম করিতেন, অন্যদিকে তেমনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর শিবরাত্রিব্রত পালন করিতেন। রাত্রিজাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রাগানের বন্দোবস্ত হইত।

একবার ঐরূপে শিবরাত্রি-ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্তী গ্রামেরই দল শিবমহিমাসূচক পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল, যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়া থাকে, তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইয়াছে, শিব সাজিবার লোক বহু সন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না। অধিকারী হতাশ হইয়া অদ্যকার নিমিত্ত যাত্রা বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন উপায়? শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ কেমন করিয়া হয়? বৃদ্ধেরা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, শিব সাজিবার লোক দিলে তিনি অদ্য রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কি-না। উত্তর আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রাম পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জুড়িল, শিব সাজিতে কাহাকে অনুরোধ করা যায়। স্থির হইল, গদাইয়ের বয়স অল্প হইলেও সে অনেক শিবের গান জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবেও ভাল, তাহাকেই বলা যাক। তবে শিব সাজিয়া একটু আধটু কথাবার্তা কহা, তাহা অধিকারী স্বয়ং কৌশলে চালাইয়া লইবে। গদাধরকে বলা হইল, সকলের আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঐ কার্যে সম্মত হইলেন। পূর্বনির্ধারিত কথামত রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিল।

গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য থাকায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা ও ঠাকুর উভয়ে 'সেঙাত' পাতাইয়াছিলেন। 'সেঙাত' শিব সাজিবেন জানিয়া গয়াবিষ্ণু ও তাঁহার দলবল মিলিয়া ঠাকুরের অনুরূপ বেশভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে জনৈক পথপ্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসরের দিকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মনাভাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভূতিমণ্ডিত বেশ, সেই ধীরস্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল অবস্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখিয়া লোকে আনন্দে ও বিস্ময়ে মোহিত হইয়া পল্লীগ্রামের প্রথামত সহসা উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্য অধিকারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্তু পরস্পরে ইশারা ও গা ঠেলিয়া 'বাহবা, বাহবা', 'গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে', 'ছোঁড়া শিবের পালাটা এত সুন্দর করতে পারবে তা কিন্তু ভাবিনি', 'ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা যাত্রার দল করলে হয়' ইত্যাদি নানা কথা অনুচ্চস্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই একইভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাঁহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু পতিত হইতেছে। এইরূপ কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও স্থানপরিবর্তন বা বলাকহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী ও পল্লীর বৃদ্ধ দুই-একজন বালকের নিকটে

গিয়া দেখেন, তাহার হস্ত-পদ অসাড়–বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য। তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল–জল, চোখে মুখে জল দাও; কেহ বলিল–বাতাস কর; কেহ বলিল–শিবের ভর হয়েছে, নাম কর; আবার কেহ বলিল–ছোঁড়াটা রসভঙ্গ করলে, যাত্রাটা আর শোনা হল না দেখচি! যাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাধরকে কাঁধে লইয়া কয়েকজন কোনরূপে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। শুনিয়াছি সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।[৪]

[1] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়, এবং ২য় অধ্যায়, দেখ ।

[2] “স চ ভগবান্ ... অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে।” – গীতা – শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা।

[3] শারীরকভাষ্যে অধ্যাসনিরূপণ দেখ।

[4] চুবড়ি।

[5] উক্ত দেবীর নাম বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী, তাহা স্থির করা কঠিন। প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে মনসাদেবীর অন্য নাম বিষহরি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষহরি শব্দটি বিষলক্ষ্মীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসামঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসাদেবীর রূপবর্ণনায় বিশালাক্ষী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। অতএব মনসাদেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্যত্র অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। কামারপুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে আমরা উক্ত দেবীর একটি সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দির, পুষ্করিণী, বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল, এখানে পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

[6] কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্ত্রীলোকেরা বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেদ্যাদি বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন।

[7] বাঁশ, কাঠ, খড় ও মৃত্তিকাসহায়ে নির্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে ‘মাঠকোঠা’ বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না।

[8] কেহ কেহ বলেন, তিনি তিনদিন সমভাবে ঐ অবস্থায় ছিলেন।

২.৫. তৃতীয় অধ্যায়: সাধকভাবের প্রথম বিকাশ

ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাবতন্ময়তার পরিচায়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত

ভাবতন্ময়তা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া যায়। ছোটখাট অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি।

যেমন—গ্রামের কুম্ভকার শিবদুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা গড়িতেছে, বয়স্যবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া মূর্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিলেন, "এ কি হইয়াছে? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয়? এইভাবে আঁকিতে হয়"—বলিয়া যেভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা, অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ হইয়া মূর্তিগুলিকে জীবন্ত দেবভাবসম্পন্ন করিয়া তুলিবে, তাহাকে তদ্বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। বালক গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া তাহা ভাবিতে থাকিল এবং ঐ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

যেমন—ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্যদিগের সহিত কোন দেববিশেষের পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে ঐ মূর্তি এমন সুন্দরভাবে গড়িলেন ও আঁকিলেন যে, লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ কুম্ভকার বা পটুয়ার কার্য বলিয়া স্থির করিল।

যেমন—অযাচিত অতর্কিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন, যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহজাল মিটিয়া যাইয়া সে তাহার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভপূর্বক স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা কি করুণায় তাহাকে ঐরূপে পথ দেখাইলেন!

যেমন—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছে না, বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন।[1]

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনার ছয় প্রকার শ্রেণীনির্দেশ

ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐরূপ যে-সকল অদ্ভুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি, তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যশক্তিপ্রকাশের পরিচায়ক, তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঐরূপ হইলেও অপর সকলগুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। পূর্বোক্ত সকল শ্রেণীর সকল ঘটনার ভিতরেই কিন্তু তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতারূপ উপাদানে তাঁহার মন যেন স্বভাবতঃ নির্মিত হইয়াছে, এবং সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাত উহাতে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস, রঙ্গরস, প্রেম বা করুণারূপ আকারে তরঙ্গসমূহের উদয় করিতেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারিবেন।

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত

পল্লীতে রাম বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছে, অন্যান্য লোকের সহিত বালক গদাধরও তাহা শুনিয়াছে; ঐসকল পবিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয় ভুলিয়া পরদিন যে যাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে, কিন্তু বালক গদাইয়ের মনে উহা যে ভাবতরঙ্গ তুলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই; বালক ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দোপভোগের জন্য বয়স্যবর্গকে সমীপস্থ আম্রকাননে একত্র করিয়াছে

এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা যথাসম্ভব আয়ত্ত করাইয়া এবং আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া উহার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরল কৃষাণ পার্শ্বের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের ঐরূপ ক্রীড়াদর্শনে মুগ্ধহৃদয়ে ভাবিতেছে–একবারমাত্র শুনিয়া পালাটির প্রায় সমগ্র কথা ও গানগুলি উহারা এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে?

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত

উপনয়নকালে বালক আত্মীয়স্বজন ও সমাজপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল–কর্মকারজাতীয়া ধনী নাম্নী কামিনীকে ভিক্ষামাতাস্বরূপে বরণ করিবে! [2]অথবা ধনীর স্নেহ-ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথা ভুলিয়া ঐ নীচজাতীয়া রমণীর স্বহস্ত-পক্ক ব্যঞ্জনাদি কাড়িয়া খাইল! ধনীর ভীতিপ্রসূত সাগ্রহ নিষেধ বালককে ঐ কার্য হইতে বিরত করিতে পারিল না।

অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত

বিভূতিমণ্ডিত জটাধারী নাগা-ফকির দেখিলে শহর বা পল্লীগ্রামের বালকদিগের হৃদয়ে সর্বদা ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐরূপ ফকিরেরা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা সুযোগ পাইলে বলপ্রয়োগে দূরদেশে লইয়া যাইয়া দলপুষ্টি করে, এরূপ কিংবদন্তী বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণপ্রান্তে ৺পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে, সেই পথ দিয়া তখন নিত্য ঐরূপ সাধু-ফকির, বৈরাগী-বাবাজীর দল যাওয়া-আসা করিত এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহার্য সংগ্রহপূর্বক দুই-একদিন বিশ্রাম করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইত। কিংবদন্তীতে ভীত হইয়া বয়স্যগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। ফকিরের দল দেখিলেই সে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও সেবায় তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন কোন দিন দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়াও বালক বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদিগের ন্যায় বেশধারণের জন্য বালক একদিন সর্বাঙ্গে তিলকচিহ্ন এবং পিতামাতা-প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্বাসরূপে ধারণপূর্বক জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল।

রঙ্গরসপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে জানিত না। ঐ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা হইলে তাহারা পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ বা স্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্বক পদ ধৌত করিবার জল, নূতন হুঁকায় তামাকু এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জন্য উত্তম আসন বা তদভাবে নূতন একখানি মাদুর প্রদান করিত। ঐরূপে সম্মানিত হইয়া সে ব্যক্তি ঐকালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদের নিকটে কিরূপে উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কতপ্রকার বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও সুরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ্ণবিচারসম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিয় বালক তাহা লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের নিকট গম্ভীরভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাস্যকৌতুকের রোল ছুটাইয়া দিত।

ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন

ঠাকুরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ মন যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ হৃদয় ঈশ্বরের

উপর, আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্যে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ তো দূরের কথা—সঙ্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র গন্ধও যে-সকল ভাবে অনুভূত হইবে, কখনই তাহাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা, প্রেম ও করুণাই কেবল উহাকে সর্বকাল সর্ববিষয়ে নিয়মিত করিবে। ঐ সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্যের অন্তরের কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে ঐরূপ হৃদয়-মনকে কখনও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের অন্তর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধকজীবনের অলৌকিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

সাধকভাবের প্রথম প্রকাশ—'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা শিখিব না, যাহাতে যথার্থ জ্ঞান হয়, সেই বিদ্যা শিখিব'

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের প্রথম বিশেষ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তিনি যখন কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে—যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়!" তাঁহার বয়স তখন সতের বৎসর হইবে এবং গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা অগ্রসর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া অভিভাবকেরা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমারের টোলে বাসকালে ঠাকুরের আচরণ

ঝামাপুকুরে ৺দিগম্বর মিত্রের বাটীর সমীপে জ্যোতিষ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠ অগ্রজ টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্বোক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটি বর্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক ছাত্রগণকে পাঠদান করিতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, সুতরাং অপরের গৃহে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা গমনপূর্বক দেবসেবা যথারীতি সম্পন্ন করা স্বল্পকালেই তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ সহসা তিনি উহা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপস্বত্ব হইত, তাহা অল্প এবং দিন দিন হ্রাস ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না; এরূপ অবস্থায় দেবসেবার পারিশ্রমিক-স্বরূপে যাহা পাইতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? পরিশেষে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনাইয়া তাহার উপর উক্ত দেবসেবার ভার অর্পণপূর্বক তিনি অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

গদাধর এখানে আসিয়া অবধি নিজ মনোমত কর্ম পাইয়া উহা সানন্দে সমাপনপূর্বক অগ্রজের সেবা ও তাঁহার নিকটে কিছু কিছু পাঠাভ্যাস করিতেন। গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক অল্পকালেই যজমান-পরিবারবর্গের সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীগণ তাঁহার কর্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ ও দেবভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেন এবং তাঁহার দ্বারা ছোটখাট 'ফাইফরমাশ' করাইয়া লইতে এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠে ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও বালকের একটি আপনার দল বিনা চেষ্টায় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। সুতরাং, এখানে আসিয়াও বালকের বিদ্যাশিক্ষার যে বড় একটা সুবিধা হইতেছিল না, একথা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্বোক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াও রামকুমার ভ্রাতাকে সহসা কিছু বলিতে পারেন নাই। কারণ, একে তো মাতার প্রিয় কনিষ্ঠকে তাঁহার স্নেহসুখে বঞ্চিত করিয়া একপ্রকার নিজের সুবিধার জন্যই দূরে আনিয়াছেন, তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাঁহাকে আগ্রহপূর্বক বাটীতে

আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, এই অবস্থায় যাইতে নিষেধ করিয়া বালকের আনন্দে বিঘ্নোৎপাদন করা কি যুক্তিযুক্ত? ঐরূপ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাসতুল্য অসহ্য হইয়া উঠিবে না? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না; কামারপুকুরের নিকটবর্তী গ্রামান্তরে কোন মহোপাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই তো চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিত। ঐরূপ চিন্তার বশবর্তী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্তব্যজ্ঞানের প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্য মৃদু তিরস্কার করিলেন। কারণ সরল, সর্বদা আত্মহারা বালককে পরে তো সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়া চলিতে না শিখে, তবে ভবিষ্যতে কি আর ঐরূপ করিতে পারিবে? অতএব ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতা, উভয়ই রামকুমারকে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল।

নিজ ভ্রাতার মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে রামকুমারের অনভিজ্ঞতা

কিন্তু স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়া শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক যে এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে এবং দুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগসুখলাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনের অন্য উদ্দেশ্য নির্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং, তিরস্কারে বিচলিত না হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্বোক্তরূপে খুলিয়া বলিল, তখন তিনি বালকের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, মাতাপিতার বহু আদরের বালক জীবনে এই প্রথম তিরস্কৃত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে এরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে সেদিন অনেক চেষ্টা পাইল, অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না, একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, কিন্তু বালকের সে কথা শুনে কে? বালক তো বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোন দিন আমরা স্বার্থচেষ্টায় পরাঙ্‌মুখ দেখি, তবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি–তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

বালকের ঐ সকল কথা রামকুমার সেদিন বুঝিলেন না। অধিকন্তু ভালবাসার পাত্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণে আমরা যেমন অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্বাপেক্ষা শতগুণে আদরযত্ন করিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার প্রতিকার্যে ব্যবহার এখন কিছুকাল ঐরূপ হইয়া উঠিল। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য এখন হইতে যে অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কার্য দেখিয়া বিশেষরূপে পাইয়া থাকি।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থা

পূর্বোক্ত ঘটনার পরের দুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার অগ্রজের জীবনে পরিবর্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অগ্রজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল এবং নানাভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ বিষয়ের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছিলেন না। টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কার্য স্বীকার করিবেন কি না, তদ্বিষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাঁহার মনোমধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একথা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন যে, সংসারযাত্রানির্বাহের অন্য উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা অনর্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবেন? যজন, যাজন ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কার্যই তো শিখেন নাই, এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবেন, সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায়? আবার, ঐরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অর্থোপার্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিত্যক্রিয়া ও পূজাদি সম্পন্ন

করিবার অবসরলাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও নিশ্চয়। সামান্যে সন্তুষ্ট সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উদ্যমী পুরুষ ছিলেন না। সুতরাং ‘যাহা করেন ৵রঘুবীর’ ভাবিয়া পূর্বোক্ত চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এতকাল করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই ভগ্নহৃদয়ে করিয়া যাইতেছিলেন। সে যাহা হউক, ঐরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

[1] ‘গুরুভাব’ – পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়,

[2] ‘গুরুভাব’ – পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়,

২.৬. চতুর্থ অধ্যায়: দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খুলিবার কারণ ও সময়নিরূপণ

সন ১২৫৬ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব অনটন ঐ কালের কিছু পূর্ব হইতে তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছিল এবং তাঁহার পত্নী একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রসবান্তে তখন মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিলেন। কথিত আছে, সাধক রামকুমার তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর কথা পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন, "ও (তাঁহার পত্নী) এবার আর বাঁচিবে না।" ঠাকুর তখন চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সমৃদ্ধিশালী কলিকাতায় নানা ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের বাস; শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়াকলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলের ছাত্রদিগকে বিদ্যালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে সুপণ্ডিত বলিয়া একবার খ্যাতিলাভ করিতে পারিলে সংসারের আয়ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে আর চিন্তান্বিত হইতে হইবে না–বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়া রামকুমার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পত্নী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্তন ও অভাব অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিবেন, এই ধারণাও তাঁহাকে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। যাহা হউক, ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইবার আন্দাজ তিন-চারি বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে যেজন্য কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যেভাবে তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী জানিতে হইলে অতঃপর আমাদিগকে অন্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের সুবিধার জন্য ছাতুবাবুর দলভুক্ত হইয়া তাঁহার অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নপর ছিলেন, তখন কলিকাতার অন্যত্র একস্থলে এক সুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় যে ঘটনাপরম্পরার উদয় হইতেছিল, তাহাতেই এখন পাঠককে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

রাণী রাসমণি

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। ক্রমশঃ চারিটি কন্যার মাতা হইয়া রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; এবং তদবধি স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি স্বল্পকালমধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিষয়কর্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস, ওজস্বিতা[1] এবং দরিদ্রদিগের প্রতি নিরন্তর সহানুভূতি,[2]তাঁহার অজস্র দান, অকাতর অন্নব্যয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক নিজ গুণ ও কর্মে এই রমণী তখন আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতরনির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ ও সন্তানসন্ততি হইয়াছে; এবং একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া রাণীর তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু হওয়ায় প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ঘটনায় পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ছিন্নহৃদয় পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি কন্যার সন্তানসন্ততিগণ এখনও বর্তমান।

পাঠকের অবগতির জন্য রাণী রাসমণির বংশতালিকা 'শ্রীদক্ষিণেশ্বর' নামক পুস্তিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি –

রানীর দেবীভক্তি

অশেষগুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষোদিত ছিল–‘কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী’। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, তেজস্বিনী রাণীর দেবীভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত।

রাণী রাসমণির ৺কাশী যাইবার উদ্যোগকালে প্রত্যাদেশলাভ

৺কাশীধামে গমনপূর্বক শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণামাতাকে দর্শন ও বিশেষভাবে পূজা করিবার বাসনা রাণীর হৃদয়ে বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনা যায়, প্রভূত অর্থ তিনি ঐজন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিজ স্কন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন ঐ বাসনা ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃগণ, বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠায় রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকল বিষয় স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন–কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব।[3] ভক্তিপরায়ণা রাণী ঐরূপ আদেশলাভে বিশেষ পরিতৃপ্তা হইলেন এবং কাশীযাত্রা স্থগিত রাখিয়া সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্যে নিয়োজিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

রাণীর দেবীমন্দির নির্মাণ

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রাণীর বহুকালসঞ্চিত ভক্তি এই সময়ে সাকার মূর্তিপরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড[4] ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্ন-পরিশোভিত সুবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন হইতে আরব্ধ হইয়া ১২৬২ সালেও উক্ত দেবালয় সম্যক্ নির্মিত হইয়া উঠে নাই দেখিয়া রাণী ভাবিয়াছিলেন, জীবন অনিশ্চিত, মন্দিরনির্মাণে বহুকাল ব্যয় করিলে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প হয়তো নিজ জীবনকালে কার্যে পরিণত হইয়া উঠিবে না। এরূপ আলোচনা করিয়া সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উহার পূর্বের কয়েকটি কথা পাঠকের জানা আবশ্যক।

রাণীর ৺দেবীর অন্নভোগ দিবার বাসনা

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসেই হউক–কারণ, ভক্তেরা নিজ ইষ্টদেবতাকে সর্বদা আত্মবৎ সেবা করিতে ভালবাসেন–শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নভোগ দিবার জন্য রাণীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ভাবিয়াছিলেন–মন্দিরাদি মনের মত নির্মিত হইয়াছে, সেবা চলিবার জন্য সম্পত্তিও যথেষ্ট দিতেছি, কিন্তু এতটা করিয়াও যদি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি তবে সকলই বৃথা। লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু লোকের ঐরূপ কথায় কি আসে যায়? হে জগদম্বে, অন্তঃসারহীন নামযশমাত্র দিয়া আমাকে এ বিষয়ে ফিরাইও না। তুমি এখানে নিত্য প্রকাশিতা থাক এবং কৃপা করিয়া দাসীর প্রাণের কামনা পূর্ণ কর।

পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাগ্রহণে ঐ বাসনাপূরণের অন্তরায়

রাণী দেখিলেন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদান করিবার পথে প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নতুবা তাঁহার প্রাণ তো একবারও বলে না যে, অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা গ্রহণ করিবেন না–হৃদয় তো ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন সঙ্কুচিত হয় না! তবে এই বিপরীত প্রথার প্রচলন হইয়াছে কেন? শাস্ত্রকার কি প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা, স্বার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? প্রাণের পবিত্রাকাঙ্ক্ষার অনুসরণপূর্বক প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না–তবে উপায়? তিনি অন্নভোগপ্রদানের নিমিত্ত নানা স্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাসকল আনাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন না।

রামকুমারের ব্যবস্থাদান

ঐরূপে মন্দিরনির্মাণ ও মূর্তিগঠন সম্পূর্ণ হইলেও রাণীর পূর্বোক্ত সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা যাইল না। পণ্ডিতগণের নিকট বারংবার প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাঁহার আশা যখন ঐ বিষয়ে প্রায় নির্মূলিতা হইয়াছিল, তখন ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে এক দিবস ব্যবস্থা আসিল–প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাণী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদগ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।

মন্দিরোৎসর্গ সম্বন্ধে রাণীর সঙ্কল্প

ঐরূপ ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ে আশা আবার মুকুলিতা হইয়া উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীর পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন। রামকুমার ভট্টাচার্যের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য করিতে তাঁহাকে দৃঢ়সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অপরাপর পণ্ডিতগণ 'কার্যটি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ', 'ঐরূপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা ঐস্থানে প্রসাদাদি গ্রহণ করিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা পরোক্ষে বলিলেও উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে, একথা বলিতে সাহসী হইলেন না।

রামকুমারের উদারতা

ভট্টাচার্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া দেখিলে তখনকার কালে রামকুমারের ঐরূপ ব্যবস্থাদান সামান্য উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মন তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, উহার বাহিরে যাইয়া শাস্ত্রশাসনের ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাপ্রদান করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন; ফলে অনেকস্থলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে লোকের মনে প্রবৃত্তির উদয় হইত।

রাণী রাসমণির উপযুক্ত পূজকের অন্বেষণ

সে যাহা হউক, রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধ ঐখানেই সমাপ্ত হইল না। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরুবংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন দেবালয়ের কার্যভার যাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্পিত হয়, তদ্বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও আবার প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ ঐকালে প্রণাম পর্যন্ত করিয়া ঐসকল মূর্তির মর্যাদা রক্ষা

করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহারা শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই রাণীর দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতী হইতে সহসা স্বীকৃত হইলেন না। উহাতেও কিন্তু হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হার বৃদ্ধিপূর্বক পূজকের জন্য নানাস্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাণীর কর্মচারী সিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূজক দিবার ভারগ্রহণ

ঠাকুরের ভগিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। তথায় অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[5] নামক গ্রামের এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে কর্ম করিতেন। দুপয়সা লাভ হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন রাণীর দেবালয়ের জন্য পূজক, পাচক প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্রাহ্মণ কর্মচারী যোগাড় করিয়া দিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর দেবালয়ে চাকরি স্বীকার করাটা দূষণীয় নহে, ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইবার জন্য মহেশ উক্ত বন্দোবস্তের ভার গ্রহণপূর্বক সর্বাগ্রে নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজকপদে মনোনীত করিলেন। ঐরূপে নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে রাণীর কার্যে নিযুক্ত করায় অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্মচারিসকলের যোগাড় করা তাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নানা প্রযত্নেও তিনি শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর মন্দিরের জন্য সুযোগ্য পূজক যোগাড় করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

রাণীর রামকুমারকে পূজকের পদগ্রহণে অনুরোধ

রামকুমার ভট্টাচার্যের সহিত মহেশ পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। গ্রামসম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটা সুবাদও পাতান ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামকুমার যে একজন ভক্তিমান সাধক এবং স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, একথা মহেশের অবিদিত ছিল না। তাঁহার সাংসারিক অভাব অনটনের কথাও মহেশ কিছু কিছু জানিতেন। সেজন্য শ্রীশ্রীকালিকামাতার পূজক নির্বাচন করিতে যাইয়া তাঁহার দৃষ্টি এখন রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অশূদ্রযাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি দুই-একজনের বাটীতে পূজক পদ কখন কখন গ্রহণ করিলেও কৈবর্তজাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইবেন?—বিশেষ সন্দেহ! যাহা হউক, ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার দিন সন্নিকট, সুযোগ্য লোকও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার ঐ বিষয়ে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঐ বিষয়ে সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য সুসম্পন্ন করেন, তজ্জন্য অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূর্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূজকপদে ব্রতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি এবং আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভমুহূর্তে ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।"

রাণীর ঐ প্রকার অনুরোধপত্র লইয়া মহেশ রামকুমারের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্যন্ত পূজকের আসনগ্রহণে স্বীকৃত করাইলেন। ঐরূপে লোভপরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার নির্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে[6] আগমন করেন এবং পরে রাণী ও মথুরবাবুর অনুনয়-

বিনয়ে সুযোগ্য পূজকের অভাব দেখিয়া ঐ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; দেবীভক্ত রামকুমার ঐ বিষয়ে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ঐ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কি-না কে বলিতে পারে।

রাণীর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা

সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা করিলেন! শুনা যায়, 'দীয়তাং ভূজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ উপলক্ষ্যে সমাগত হইয়া ঐদিনে প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপে এক একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, দেবালয়নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,০০০ মুদ্রার বিনিময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা ক্রয় করিয়া দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ

কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য রামকুমার ঐদিন সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে রন্ধনকরতঃ আপন অভীষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার স্বয়ং ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অন্নভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। তিনিই এখন ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য করিবেন, একথা নিতান্তই অযুক্তিকর। ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐরূপ কথা শুনি নাই। অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদী নৈবেদ্যান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ আনন্দোত্সবে সম্পূর্ণহৃদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা রক্ষাপূর্বক সন্ধ্যাগমে নিকটবর্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

কালীবাটীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন–রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় একশতখানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে স্বপ্নে ৺দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

বলিতেন–রাণী প্রথমে 'গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল'–এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন।[7] কারণ, 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ, রাণী প্রভূত অর্থদানে স্বীকৃত হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না। রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্বকূলে এই স্থানটি ক্রয় করেন।

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটি মনোনীত করিলেন, উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙা ও গাজিসাহেবের পীরের স্থান ছিল; স্থানটির কূর্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল; ঐরূপ কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দিষ্ট; অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন ঐ স্থানটি মনোনীত করেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট অন্যান্য প্রশস্ত দিবসে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণু-পর্বাহে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন—দেবীমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন; মন্দির ও দেবীমূর্তি নির্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভদিবসের নির্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল; এমন সময় যে-কোন কারণেই হউক, ঐ মূর্তি ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর।' ঐরূপ প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই রাণী দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নানযাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিবসে ঐ কার্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করেন।

তদ্ভিন্ন দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত সকল কথাই আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদানের ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্য রামকুমারের ধর্মপত্রানুষ্ঠানের কথা দুইটি আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজকপদ গ্রহণ করা যে ভট্টাচার্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না, তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। ঐ কথার অনুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার তখনও ঐ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ৺দেবীকে অন্নভোগ প্রদানের বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার পর তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। ঐদিন দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই বা কোনরূপ অন্যায়, অশাস্ত্রীয় কার্য করিতেছেন এরূপ মনে করেন নাই, তাহা কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়।

প্রতিষ্ঠার পরদিন প্রত্যূষে ঠাকুর অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্য এবং প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে-সকল কার্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কৌতূহলপরবশ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সেদিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না শুনিয়া তিনি ভোজনকালে পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ-সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্যসমাপনান্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার ফিরিলেন না, তখন মনে নানাপ্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূদ্রযাজিত্বের এবং অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ কার্য হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও যুক্তিসহকারে নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেষে ধর্মপত্রানুষ্ঠানরূপ[৪] সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

শুনা যায়, ধর্মপত্রে উঠিয়াছিল—"রামকুমার পূজকের পদগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা

ধর্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, চতুষ্পাঠী তো এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন! ঝামাপুকুরে ঐদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর ঐ বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন এবং রামকুমার তাঁহাকে ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; বলিলেন—"দেবালয়, গঙ্গাজলে রান্না, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে, ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে না।" ঠাকুরের কিন্তু ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর; গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা তো মান?" আহার-সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্তর্নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে যুক্তিসহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্বে যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইলেন এবং ঐপ্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি

বাস্তবিক, আমরা আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গার প্রতি গভীর ভক্তি করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন—নিত্য-শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি। গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূতবাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে, ততদূর পর্যন্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বরভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে তো ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, 'একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়।' ঈশ্বরবিমুখ, বিষয়াসক্ত মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে বসিয়া বিষয়চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটীশোভিত উদ্যান, সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিত্তে বাস করিয়া মনের পূর্বোক্ত কিংকর্তব্যভাব দূরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন।

অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ

ঠাকুরের আহারসম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা আমাদের ন্যায় মানবের অন্তরেই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া ইহাই কি বলিতে চাও যে ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? উত্তরে বলিতে হয়, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দুইটি এক বস্তু নহে। অহঙ্কারেই প্রথমটির জন্ম এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে, তাহাকেই সর্বোচ্চ

জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডি টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি—উহার উদয়ে মানব নিজ অহঙ্কারকে খর্ব করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চ উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্বোক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রশাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই, তবেই কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইয়া পরম শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে—নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যের উদারতায় পৌঁছিতে হইবে—শাসন, নিয়ম অনুসরণ করিয়াই শাসনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান দেখিয়া কেহ কেহ হয়তো বলিয়া বসিবেন, তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলা কেন, মানুষ বলিলেই তো হয়? আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও, তবে তাঁহার ঐরূপ অসম্পূর্ণতাগুলি চাপিয়া ঢাকিয়া বলাই ভাল, নতুবা তোমাদিগের অভীষ্ট সহজে সংসিদ্ধ হইবে না। আমরা বলি—ভ্রাতঃ, আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই; আবার যখন তাঁহার অহেতুক কৃপায় ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, মানবদেহধারণ করিতে গেলে ঐ দেহের অসম্পূর্ণতাগুলির ন্যায় মানবমনের ত্রুটিগুলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, "স্বর্ণাদি ধাতুতে খাদ না মিলাইলে যেমন গড়ন হয় না, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত রজঃ এবং তমোগুণের মলিনতা কিছুমাত্র মিলিত না হইলে কোন প্রকার দেহ-মন গঠিত হওয়া অসম্ভব।" নিজ জীবনের ঐসকল অসম্পূর্ণতার কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে তিনি কখন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, অথচ স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন—"পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছেন; তবে এবার গুপ্তভাবে আসা—রাজা যেমন ছদ্মবেশে শহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার।" অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু জানা আছে, সকল কথাই আমরা বলিয়া যাইব। হে পাঠক, তুমি উহার যতদূর বিশ্বাস ও গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বুঝিবে, ততটা মাত্র লইয়া অবশিষ্টের জন্য আমাদিগকে যথা ইচ্ছা নিন্দা তিরস্কার করিলেও আমরা দুঃখিত হইব না।

[1] শুনা যায়, রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীর নিকট পূর্বে ইংরাজ সৈনিকদিগের একটি ব্যারাক বা আড্ডা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্যপানে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা একদিন রাণীর দ্বাররক্ষকদিগকে বলপ্রয়োগে বশীভূত করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। রাণীর জামাতা মথুরবাবুপ্রমুখ পুরুষেরা তখন কার্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

[2] কথিত আছে, গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরদিগের উপর ইংরাজ রাজসরকার একবার কর বসাইয়াছিলেন। ঐ ধীবরদিগের অনেকে রাণীর জমিদারিতে বাস করিত। করের দায়ে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা রাণীর নিকট আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা নিবেদন করে। রাণী শুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন এবং বহু অর্থ দিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার ইজারা লইলেন। সরকার বাহাদুর রাণী মৎস্য ব্যবসায় করিবেন ভাবিয়া উক্ত অধিকার প্রদান করিবামাত্র

গঙ্গার কয়েক স্থল এক কূল হইতে অন্য কূল পর্যন্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে, ইংরাজদের জলযানসমূহের নদীমধ্যে প্রবেশপথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইল। তাঁহারা তখন রাণীর ঐ কার্যের প্রতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি অনেক অর্থব্যয়ে নদীতে মৎস্য ধরিবার অধিকার আপনাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি, সেই অধিকার-সূত্রেই ঐরূপ করিয়াছি। ঐরূপ করিবার কারণ, নদীমধ্য দিয়া জলযানাদি নিরন্তর গমনাগমন করিলে মৎস্যসকল অন্যত্র পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে; অতএব নদীগর্ভ শৃঙ্খলমুক্ত কেমন করিয়া করিব। তবে যদি আপনারা নদীতে মৎস্য ধরিবার নূতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন, তবে আমিও আমার অধিকারস্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা আছি। নতুবা ঐ বিষয় লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাদুরকে আমার ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইতে হইবে।" শুনা যায়, রাণীর ঐরূপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী ঐরূপ করিতেছেন, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরকার বাহাদুর ঐ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়া দেন এবং ধীবরেরা পূর্বের ন্যায় বিনা করে যথা ইচ্ছা মৎস্য ধরিয়া রাণীকে আশীর্বাদ করিতে থাকে।

লোকহিতকর কার্যে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। "সোনাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার; কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষু-নিবাস; হালিসহরে জাহ্নবীতীরে ঘাট ও সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কিছুদূর পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থযাত্রা করিয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন।" তদ্ভিন্ন মকিমপুর জমিদারির প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা এবং দশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে টোনায় খাল খনন করাইয়া মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগবিধান করা প্রভৃতি নানা সৎকার্য রাণী রাসমণির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

[3] কেহ কেহ বলেন, যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নৌকার উপর রাত্রিবাস করিবার কালে ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

[4] কালীবাটীর জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর–দানপত্রে লেখা আছে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমি কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরেজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

[5] কেহ কেহ বলেন, এই বংশীয়েরা কোন সময়ে 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[6] দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীযুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা ঠাকুরের অনুগত ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রামের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য কিন্তু ঐ সম্বন্ধে অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন – কামারপুকুরের নিকটবর্তী দেশড়া নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী রাসমণির কর্মচারী ছিলেন। কার্যদক্ষতায় ইনি রাণীর সুনয়নে পড়িয়া ক্রমে তাঁহার দেওয়ান পর্যন্ত হইয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার সময় ইনি শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায় বিদায় লইতে আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেন। রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়া রামধনকে বলেন, "রাণী কৈবর্তজাতীয়া, আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ করিলে 'একঘরে' হইতে হইবে।" রামধন তাহাতে তাঁহাকে খাতা দেখাইয়া বলেন, "কেন? এই দেখ, কত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাহারা সকলে খাইবে ও রাণীর বিদায় গ্রহণ করিবে।" রামকুমার তাহাতে বিদায়গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণকথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল। রাত্রিকালেও ঐরূপ আনন্দের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন – "ঐ সময় দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।"

পূর্বোক্ত আনন্দোৎসব দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও মহেশ উভয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক পূজকের পদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

[7] বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

[8] পল্লীগ্রামে রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে মীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার ঐ বিষয়ে কি অভীপ্সিত, জানিবার জন্য ধর্মপত্রের অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া ঐ বিষয়ে আর যুক্তিতর্ক না করিয়া তদনুরূপ কার্য করিয়া থাকে। ধর্মপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় –

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে 'হাঁ' 'না' লিখিয়া একটি ঘটিতে রাখিয়া কোন শিশুকে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু 'হাঁ' লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাহাকে ঐ কার্য করিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য, বিপরীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা দেবতার অভিপ্রায় অন্যরূপ বুঝে। ধর্মপত্রের অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয়বিভাগাদিও হইয়া থাকে। যেমন, পিতার চারি সন্তান পূর্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে পৃথক হইবার সঙ্কল্প করিয়া বিষয়বিভাগ করিতে যাইয়া উহার কোন্ অংশ কে লইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, গ্রামের কয়েকজন নিঃস্বার্থ ধার্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তাঁহারা তখন স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি যতদূর সম্ভব সমান চারিভাগে বিভাগ করতঃ কোন্ ভ্রাতার ভাগ্যে কোন্ ভাগটি পড়িবে, তাহা ধর্মপত্রের দ্বারা মীমাংসা করিয়া থাকেন। ঐ সময়েও প্রায় পূর্বের ন্যায় অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম লিখিয়া কেহ না দেখিতে পায় এরূপভাবে মুড়িয়া একটি ঘটির ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ 'ক' 'খ' ইত্যাদি চিহ্নে নির্দিষ্ট ও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য একটি পাত্রে পূর্ববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর দুইজন শিশুকে ডাকিয়া একজনকে একটি পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগজখণ্ডগুলি তুলিতে বলা হয়। অনন্তর কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটি উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়।

২.৭. পঞ্চম অধ্যায়: পূজকের পদগ্রহণ

প্রথম দর্শন হইতে মথুরবাবুর ঠাকুরের প্রতি আচরণ ও সঙ্কল্প

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরবাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে মানবহৃদয়ে একটা প্রীতির আকর্ষণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্বজন্মকৃত সম্বন্ধের সংস্কার হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুরবাবুর মনে এখন যে ঐরূপ একটা অনির্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, একথা পরবর্তী কালে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সুদৃঢ় প্রেমসম্বন্ধ দেখিয়া আমরা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারি।

দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে একমাস কাল পর্যন্ত ঠাকুর কি করা কর্তব্য, নিশ্চয় করিতে না পারিয়া অগ্রজের অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মথুরবাবু ইতিমধ্যে তাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্যের নিকট ঐ বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রামকুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আনুপূর্বিক নিবেদন করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু মথুর সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। ঐরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি ঐ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে অবসরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ব্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পিতৃস্বস্রীয়া ভগিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে কর্মের অনুসন্ধানে বর্ধমান শহরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে প্রদান করিতেছি –

হৃদয়ের বয়স তখন ষোল বৎসর। যুবক ঐ স্থানে নিজ গ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। সে এখন লোকমুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা রাণী রাসমণির নব দেবালয়ে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে অভিপ্রায়সিদ্ধির সুযোগ হইতে পারে। কালবিলম্ব না করিয়া হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে সুপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তথায় আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে সুশ্রী সুপুরুষ ছিল। তাহার শরীর যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রূপ উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায়সকলের উদ্ভাবনপূর্বক উহা অতিক্রম করিতে হৃদয় পারদর্শী ছিল। নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে সে সত্য সত্যই ভালবাসিত এবং তাঁহাকে সুখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টস্বীকারে কুণ্ঠিত হইত না।

সর্বদা অনলস হৃদয়ের অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গ ছিল না। ঐজন্য সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথার আমরা যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব, তাহার জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে এবং কখন কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হইত। ঠাকুরের ন্যায় আহার, বিহার প্রভৃতি সর্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদাসীন, সর্বদা চিন্তাশীল,

স্বার্থগন্ধশূন্য ভাবুকজীবনের গঠনকালে হৃদয়ের ন্যায় একজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী উদ্যমশীল কর্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদম্বা কি সেইজন্য ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন? ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে তাঁহার শরীররক্ষা অসম্ভব হইত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জন্য নিত্যসংযুক্ত—এবং তজ্জন্যই সে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া চিরকালের নিমিত্ত আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছে।

হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। সহচররূপে তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে বাস যে এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। তিনি এখন হইতে ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্যই তাঁহার সহিত একত্রে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। চিরকাল বালকভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, সাধারণ নয়নে নিষ্কারণ চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ না করিয়া সর্বদা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন ও সহানুভূতি করায়, হৃদয় এখন হইতে তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা

হৃদয় আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছে—"এই সময় হইতে আমি ঠাকুরের প্রতি একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ হইত। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মধ্যাহ্নে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে পৃথক হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতাম। তাঁহার রন্ধনাদির সমস্ত যোগাড় আমি করিয়া দিয়া যাইতাম এবং অনেক সময়ে প্রসাদও পাইতাম। ঐরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও কিন্তু তিনি মনে শান্তি পাইতেন না—আহার সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা তখন এত প্রবল ছিল। মধ্যাহ্নে ঐরূপ রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু তিনি আমাদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি, ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'মা, আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি!'"

ঠাকুর কখন কখন নিজমুখে আমাদিগকে এই সময়ের কথা এইরূপে বলিয়াছেন, "কৈবর্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে ঐজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং অবশিষ্ট গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে।" তবে ঐরূপে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। আমাদের ধারণা, কালীবাটীতে পূজকের পদে ঠাকুর যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন, ততদিনই ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐ পদে ব্রতী হওয়া দেবালয়প্রতিষ্ঠার দুই তিন মাস পরেই হইয়াছিল।

ঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে যাহা হৃদয় বুঝিতে পারিত না

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন, একথা হৃদয় বুঝিত। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। উহা ইহাই,—জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন সে কোন বিষয়ে সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর যখন একটু শয়ন করিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে আরাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইতেন। অনেক খুঁজিয়াও সে তখন তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্টা গত হইলে তিনি যখন ফিরিতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'এইখানেই ছিলাম।' কোন কোন দিন সন্ধান করিতে

যাইয়া সে তাঁহাকে পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতে দেখিয়া ভাবিত, তিনি শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

ঠাকুরের গঠিত শিবমূর্তিদর্শনে মথুরের প্রশংসা

হৃদয় বলিত, 'এই সময়ে একদিন মূর্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়।' আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে তিনি কখন কখন ঐরূপ করিতেন। ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটি শিবমূর্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া নিকটে আসিয়া ঐ মূর্তিটি দেখিতে পাইলেন। বৃহৎ না হইলেও মূর্তিটি সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বাজারে ঐরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্তি যে পাওয়া যায় না, ইহা তিনি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মূর্তি কোথায় পাইলে, কে গড়িয়াছে?" হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্তি সুন্দরভাবে জুড়িতে জানেন—একথা জানিতে পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্তিটি তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হৃদয়ও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মূর্তিটি লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। মূর্তিটি হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। রাণীও উহা দেখিয়া নির্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।[1] ঠাকুরকে দেবালয়ের কার্যে নিযুক্ত করিতে মথুরের ইতিপূর্বেই ইচ্ছা হইয়াছিল, এখন তাঁহার এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া ঐ ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইল। তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর ইতিপূর্বে অগ্রজের নিকট শুনিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহারও চাকরি করিব না—এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকায় তিনি ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুর

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে না পড়িয়া কেহ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন[2] একসময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, "সে মরিয়াছে শুনিলে আমার যত না কষ্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে!" পরে কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন, সে তাহার অসহায়া বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ-নির্বাহের জন্য চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন তিনি সস্নেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, "তাতে দোষ নেই, ঐজন্য চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ করবে না; কিন্তু মার জন্য না হয়ে যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি করতে যেতিস, তাহলে তোকে আর স্পর্শ করতে পারতুম না। তাই তো বলি, আমার নিরঞ্জনে এতটুকু অঞ্জন (কাল দাগ) নেই, তার ঐরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?"

নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বসিল, "মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু চাকরি না করিলে সংসারপোষণ করিব কিরূপে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যে করবে, করুক না; আমি তো সকলকে চাকরি করতে নিষেধ করছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অন্যান্য বালক ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের ঐ কথা বলছি; এদের কথা আলাদা।" ঠাকুর তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্যভাবে গড়িতেছিলেন এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্য হয় না, এইরূপ ধারণা ছিল বলিয়াই যে তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।

চাকরি করিতে বলিবে বলিয়া ঠাকুরের মথুরের নিকট যাইতে সঙ্কোচ

অগ্রজের নিকট হইতে মথুরবাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া যতটা পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়মনোবাক্যে সত্য ও ধর্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কষ্ট দিতে চিরকাল কুণ্ঠিত হইতেন। আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাখিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিকভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ছিল। অতএব দেবালয়ে পূজকপদ গ্রহণ করিবেন কি-না, এই প্রশ্নের যাহা হয় একটা মীমাংসায় স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্বে মথুরবাবু তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাখ্যানপূর্বক তাঁহার মনে কষ্ট দিতে হইবে—এই আশঙ্কাই যে ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ, তিনি তখন একজন নগণ্য যুবকমাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণহস্তস্বরূপ মথুর মহামাননীয় ব্যক্তি; এ অবস্থায় মথুরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাটা তাঁহার পক্ষে বালসুলভ চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে অবস্থান করাটা তাঁহার নিকট তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটিও লুক্কায়িত ছিল না। কোনরূপ গুরুতর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্বের ন্যায় আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন যে এখন আর পূর্বের ন্যায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা অতঃপর ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুরের পূজকের পদগ্রহণ

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই একদিন হইয়া বসিল। মথুরবাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু দূরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে মথুরবাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।" ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"যাইলেই আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে।" হৃদয় বলিল, "তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে কার্যে নিযুক্ত হওয়া তো ভাল বই মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ?"

ঠাকুর—"আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এখানে পূজা করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে, সে বড় হাঙ্গামার কথা; আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না। তবে যদি তুমি ঐ কার্যের ভার লইয়া এখানে থাক, তাহা হইলে আমার পূজা করিতে আপত্তি নাই।"

হৃদয় এখানে চাকরির অন্বেষণেই আসিয়াছিল। সুতরাং ঠাকুরের ঐকথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তখন মথুরবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা দেবালয়ে কর্ম স্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া ঐ দিন হইতে তাঁহাকে কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে এবং হৃদয়কে রামকুমার ও তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত করিলেন। মথুরবাবুর অনুরোধে ভ্রাতাকে ঐরূপে কার্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া রামকুমার নিশ্চিন্ত হইলেন।

৺গোবিন্দজীর বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া

দেবালয়প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্বোক্ত ঘটনাবলী হইয়া গেল। ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস উপস্থিত। পূর্বদিনে মন্দিরে জন্মাষ্টমীকৃত্য যথাযথ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব। মধ্যাহ্নে ৶রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৶রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া ৶গোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় সহসা পড়িয়া গেলেন; বিগ্রহের একটি পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। নানা পণ্ডিতের মতামত লইবার পরে ঠাকুরের পরামর্শে বিগ্রহের ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল।[3] ভগবৎপ্রেমে ঠাকুরকে ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতে দর্শন এবং কোন কোন বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হইতে শ্রবণ করিয়াই মথুরবাবু ভগ্নবিগ্রহপরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ভগ্নবিগ্রহসম্বন্ধে মথুরবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ভাব ভঙ্গ হইলে বলিয়াছিলেন, বিগ্রহমূর্তি-পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথা মথুরবাবুর অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকেই এখন ঐ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি উহা এমন সুন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও ঐ মূর্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল, একথা এখনও বুঝিতে পারা যায় না।

৶রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ ঐরূপে ভগ্ন হইলে অঙ্গহীন বিগ্রহে পূজা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহা হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্মচ্যুত হইলেন এবং ৶রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার তদবধি ঠাকুরের উপরে ন্যস্ত হইল। হৃদয়ও এখন হইতে পূজাকালে শ্রীশ্রীকালীমাতার বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহায্য করিতে লাগিল।

ভগ্নবিগ্রহের পূজা সম্বন্ধে ঠাকুর জয়নারায়ণবাবুকে যাহা বলেন

বিগ্রহভঙ্গপ্রসঙ্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটি কথার উল্লেখ করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, বরাহনগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমিদার ৶রতন রায়ের ঘাট বিদ্যমান। ঐ ঘাটের নিকটে একটি ঠাকুরবাটী আছে। উহাতে ৶দশমহাবিদ্যামূর্তি প্রতিষ্ঠিতা। পূর্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধনকালে উহা হীনদশাপন্ন হইয়াছিল। মথুরবাবু যখন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেছেন, তখন তিনি এক সময়ে তাঁহার সহিত উক্ত দেবালয় দর্শন করিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়া ভোগের জন্য দুই মণ চাউল ও দুইটি করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি এখানে তিনি মধ্যে মধ্যে ৶দশমহাবিদ্যা দর্শন করিতে আসিতেন। একদিন ঐরূপে দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে ঠাকুর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত স্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্বপরিচয় থাকায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলেন। জয়নারায়ণবাবু তাঁহাকে নমস্কার ও সাদরাহ্বানপূর্বক সঙ্গীসকলকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালীবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, ওখানকার ৶গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?" ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখনও ভাঙ্গা হন?" জয়নারায়ণবাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথা উঠিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ঠাকুর ঐরূপে ঐ প্রসঙ্গ পালটাইয়া দেন এবং প্রসঙ্গান্তরের উত্থাপন করিয়া সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বলিলেন! সুবুদ্ধিসম্পন্ন জয়নারায়ণবাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ প্রশ্নসকল করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল; যে দেখিত সে মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান!—সে গান যে একবার শুনিত, সে কখন ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদী কালোয়াতী ঢং-ঢাং কিছুই ছিল না; ছিল কেবল গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণ, একথা যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে—একথা ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, তখন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গীতটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল -

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।

সাধ করে জিব্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥

জেনেছি জেনেছি তারা,

তারা কি তোর এমনি ধারা।

তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে॥

ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান গাহিবার সময় তিনি গীতোক্ত ভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন, একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তিনি যথার্থই ভাবিতেন, এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।

প্রথম পূজাকালে ঠাকুরের দর্শন

হৃদয় বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত; এবং যখন পূজা করিতেন, তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিতেন যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলেও তিনি উহা আদৌ শুনিতে পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজদেহে উজ্জ্বলবর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিকই দেখিতেন—সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নামার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং শরীরের যে যে অংশকে ঐ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন, সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে! আবার পূজা-পদ্ধতির বিধানানুসারে যখন "রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য"—অর্থাৎ, রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্বক পূজক আপনার চতুর্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি কথার উচ্চারণ করিতেন, তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিদ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ববিধ বিঘ্নের হস্ত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। হৃদয় বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজপুঞ্জিত শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন!

ঠাকুরকে কার্যদক্ষ করিবার জন্য রামকুমারের শিক্ষাদান

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি আত্মীয়গণের ভরণপোষণ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও অন্য এক বিষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ, দেখিতেন, এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের নির্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন উদাসীন ভাব! সংসারে যাহাতে উন্নতি হইবে এরূপ কোন কাজেই যেন তাঁহার আঁট দেখিতে পাইতেন না। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে, পঞ্চবটীমূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা পঞ্চবটীর চতুর্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহুক্ষণ পরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। রামকুমার প্রথম প্রথম ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাতার নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে এবং ঐ বিষয় সদা সর্বদা চিন্তা করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও সে যখন গৃহে ফিরিবার কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন কখন তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার বয়স হইয়াছে, শরীরও দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে, কবে পরমায়ু ফুরাইবে কে বলিতে পারে?—এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করিয়া, তাঁহার অবর্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দু’ পয়সা উপার্জন করিয়া সংসারনির্বাহ করিতে পারে এমন ভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া একান্ত কর্তব্য। সুতরাং মথুরবাবু যখন বালককে দেবালয়ে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে রামকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন এবং উহার কিছুকাল পরে যখন বালক মথুরবাবুর অনুরোধে প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিল, তখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালিকামাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঐরূপে দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের যাহা শিক্ষা করা কর্তব্য, তাহা অচিরে শিখিয়া লইলেন; এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে শুনিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট ঠাকুরের শাক্তীদীক্ষা-গ্রহণ

শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে তাঁহার গতায়াত ছিল এবং মথুরবাবু-প্রমুখ সকলের সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিল বলিয়া বোধ হয়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাঁহাকে তাঁহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্যের সহিত ইনি পূর্ব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইঁহার নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

রামকুমারের মৃত্যু

রামকুমারের শরীর এখন হইতে অপটু হওয়াতেই হউক, অথবা ঠাকুরকে ঐ কার্যে অভ্যস্ত করাইবার জন্যই হউক, তিনি এই সময়ে স্বল্পায়াসসাধ্য ৺রাধাগোবিন্দজীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে এবং শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকার্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু ঐ কথা শ্রবণ করিয়া এবং ঠাকুর এখন ৺দেবীপূজায় পারদর্শী হইয়াছেন জানিয়া রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পূজকরূপে নিযুক্ত থাকিলেন। বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় কালীঘরের গুরুতর কার্যভার বহন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না–একথা বুঝিয়াই মথুরবাবু ঐরূপে পূজকের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। রামকুমারও ঐরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠকে ৺দেবীর পূজা ও সেবাকার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে শিক্ষাদানপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইহার

কিছুকাল পরে তিনি মথুরবাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। গৃহে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতে করিতে কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত শ্যামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য কার্যোপলক্ষে গমন করিতে হয় এবং তথায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামকুমার ভট্টাচার্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীরত্যাগ হইয়াছিল।

[1] কেহ কেহ বলেন, এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং মথুর উহা রাণী রাসমণিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন – "যেরূপ উপযুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে ৺দেবী শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।"

[2] স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

[3] এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'গুরুভাব, পূর্বার্ধ' – ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২.৮. ষষ্ঠ অধ্যায়: ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন

ঠাকুরের এই কালের আচরণ

অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং বাল্যকাল হইতে তিনি জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ রামকুমারের স্নেহেই পালিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেক্ষা রামকুমার একত্রিশ বৎসর বড় ছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়দংশ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পিতৃতুল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। কে বলিবে, ঐ ঘটনা তাঁহার শুদ্ধ মনে সংসারের অনিত্যতা-সম্বন্ধীয় ধারণা দৃঢ় করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানল কতদূর প্রবুদ্ধ করিয়াছিল? দেখা যায়, এই সময় হইতে তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশপূর্বক মানব তাঁহার দর্শনলাভে বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কি না, তদ্বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূজান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে বসিয়া এই সময়ে তিনি তন্মনস্কভাবে দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত-প্রমুখ ভক্তগণরচিত সঙ্গীতসকল ৺দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। বৃথা বাক্যালাপ করিয়া তিনি এখন তিলমাত্র সময় অপব্যয় করিতেন না এবং রাত্রে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইলে লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার ধ্যানে কালযাপন করিতেন।

হৃদয়ের তদ্দর্শনে চিন্তা ও সঙ্কল্প

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের প্রীতিকর হইত না। কিন্তু সে কি করিবে? বাল্যকাল হইতে তিনি যখন যাহা ধরিয়াছেন, তখনি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই—একথা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু দিন দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল হইতেছে দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। রাত্রে নিদ্রা না যাইয়া শয্যাত্যাগপূর্বক তিনি পঞ্চবটীতে চলিয়া যান, একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় এই সময়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর তাঁহার পূর্ববৎ আহার ছিল না, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল, ঐ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে।

ঐ সময়ে পঞ্চবটী প্রদেশের অবস্থা

পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল না; নীচু জমি, খানাখন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বুনো গাছগাছড়ার মধ্যে একটি ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। একে কবরডাঙ্গা, তাহার উপর জঙ্গল, সেজন্য দিবাভাগেও কেহ ঐ স্থানে বড় একটা যাইত না। যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর রাত্রে? ভূতের ভয়ে কেহ ঐ দিক মাড়াইত না। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত আমলকী বৃক্ষটি নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যানধারণা করিতেন।

হৃদয়ের প্রশ্ন,—'রাত্রে জঙ্গলে যাইয়া কি কর?'

রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে হৃদয় একদিন অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল এবং তাঁহাকে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্যন্ত আশেপাশে ঢিল ছুঁড়িতে থাকিল। তিনি তাহাতেও ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন অবসরকালে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জঙ্গলের ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি?" ঠাকুর বলিলেন, "ঐ স্থানে একটা আমলকী গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া

ধ্যান করি; শাস্ত্রে বলে, আমলকী গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধ্যান করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।”

ঠাকুরকে হৃদয়ের ভয় দেখাইবার চেষ্টা

ঐ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্বোক্ত আমলকী বৃক্ষের তলায় ধ্যানধারণা করিতে বসিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা হৃদয়ের কর্ম বুঝিয়াও তিনি তাহাকে কিছুই বলিলেন না।

হৃদয়কে ঠাকুরের বলা–‘পাশমুক্ত হইয়া ধ্যান করিতে হয়’

হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সুখাসীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল, ‘মামা কি পাগল হইল নাকি? এরূপ তো পাগলেই করে; ধ্যান করিবে, কর; কিন্তু এরূপ উলঙ্গ হইয়া কেন?’ ঐরূপ ভাবিয়া সে সহসা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “এ কি হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?” কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ঠাকুরের চৈতন্য হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া বলিলেন, “তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়; জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান–এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে; পৈতেগাছটাও ‘আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়’–এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাকতে হলে ঐসব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়, তাই ঐসব খুলে রেখেছি, ধ্যান করা শেষ হলে ফিরিবার সময় আবার পরব।” হৃদয় ঐরূপ কথা পূর্বে আর কখন শুনে নাই, সুতরাং অবাক হইয়া রহিল এবং উত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্বে সে ভাবিয়াছিল মাতুলকে অনেক কথা অদ্য বুঝাইয়া বলিবে ও তিরস্কার করিবে–তাহার কিছুই করা হইল না।

শরীর ও মন উভয়ের দ্বারা ঠাকুরের জাত্যভিমাননাশের, ‘সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন’ হইবার এবং সর্বজীবে শিবজ্ঞানলাভের জন্য অনুষ্ঠান

পূর্বোক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, উহা জানা থাকিলে ঠাকুরের জীবনের পরবর্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিলাম, অষ্টপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; কিন্তু স্থূলভাবেও ঐ সকলকে যতদূর ত্যাগ করা যাইতে পারে, তাহা করিয়াছিলেন। পরজীবনে অন্য সকল বিষয়েও তাঁহাকে ঐরূপ করিতে আমরা দেখিতে পাই। যথা –

অভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্য তিনি, অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া সর্বথা পরিহার করে, সে স্থান বহু প্রযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

‘সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন’ না হইলে অর্থাৎ ইতরসাধারণের নিকট বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তরসকলকে উপলখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে না পারিলে, মানবমন শারীরিক ভোগসুখেচ্ছা হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না এবং যোগারূঢ় হইতে পারে না–একথা শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র হস্তে গ্রহণ করিয়া বারংবার ‘টাকা মাটি, মাটি টাকা’ বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সর্বজীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন তিনি দেবতার প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট

পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্বক স্বহস্তে মার্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা ঐরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম

ঐরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে প্রতিকূল বিষয়সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু স্থূলভাবে ঐ সকলকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা নিজ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গকে ঐ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে তিনি উহাদিগকে বলপূর্বক নিয়োজিত করিতেন। দেখা যায়, ঐরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনের পূর্ব সংস্কারসকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং তদ্বিপরীত নবীন সংস্কারসকলকে উহা এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করিত যে, কখনই সে আর অন্য ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য করিতে পারিত না। ঐরূপে কোন নবীন ভাব মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদিসহায়ে কার্যে কিঞ্চিন্মাত্রও যতক্ষণ না অনুষ্ঠিত হইত, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিষয়ের যথাযথ ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না।

ঐ ক্রম সম্বন্ধে ‘মনঃকল্পিত সাধনপথ’ বলিয়া আপত্তি ও তাহার মীমাংসা

পূর্ব সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাঙ্‌মুখ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার ঐরূপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়া বসিয়াছেন–“অপবিত্র কদর্য স্থান পরিষ্কৃত করা, ‘টাকা মাটি, মাটি টাকা’ বলিয়া মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ডসকল গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাঁহার নিজ মনঃকল্পিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মনের উপর যে কর্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্রই তদপেক্ষা সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে।” [1] উত্তরে বলিতে হয়–উত্তম কথা, কিন্তু ঐরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানসকল না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষয় ত্যাগ-করা-রূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয়জন লোক এ পর্যন্ত পূর্ণভাবে রূপরসাদি বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হইয়া ষোল আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহা কখনই হইবার নহে। মন একরূপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে, এবং শরীর ঐ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্যানুষ্ঠান করিয়া অন্য পথে চলিবে–এই প্রকারে কোন মহৎ কার্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ তো দূরের কথা! কিন্তু রূপরসাদিভোগলোলুপ মানব ঐ কথা বোঝে না। কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও সে পূর্বসংস্কারবশে নিজ শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, ‘শরীর যেরূপ কার্য করুক না কেন, মনে তো আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি!’ যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়া সে আপনাকে আপনি ঐরূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু আলোকান্ধকারের ন্যায় যোগ ও ভোগরূপ দুই পদার্থ কখনো একত্রে থাকিতে পারে না। কাম-কাঞ্চনময় সংসার ও ঈশ্বরের সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, এরূপ সহজ পথের আবিষ্কার আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই।[2] শাস্ত্র সেজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেছেন, ‘যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও ঐরূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইবেন।’ ঋষিগণ সেজন্যই বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত তপস্যাসহায়ে–‘তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ’–মানব কখনো আত্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয় না। যুক্তির বলে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণে মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়–‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়’।

ঠাকুর এই সময়ে যেভাবে পূজাদি করিতেন

আমরা বলিয়াছি, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছিলেন, তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজাসমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করানো তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন—রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন; জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে।" ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং উহাতে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া তিনি ৺দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা, ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল।

দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্ট কালও এই সময় হইতে তাঁহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়তো দুইঘণ্টা কাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন; অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়তো বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যূষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া ৺দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন! আবার অপরাহ্নে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াও তাঁহাকে আরাত্রিকাদি কর্মসম্পাদনের সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল না!—এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

ঠাকুরের এই কালের পূজাদি কার্য সম্বন্ধে মথুর প্রমুখ সকলে যাহা ভাবিত

ঐরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জনসাধারণের দৃষ্টি যে এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা বেশ বুঝা যায়। সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া থাকে, তাহা ছাড়িয়া নূতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রূপ-পরিহাসাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তাসহকারে নিজ গন্তব্যপথে যত অগ্রসর হয়, ততই সাধারণের মনে পূর্বোক্ত ভাব পরিবর্তিত হইয়া উহার স্থলে শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকুরের এই সময়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঐরূপ হইয়াছিল। কিছুদিন ঐরূপে পূজা করিতে না করিতে তিনি প্রথমে অনেকের বিদ্রূপভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুরবাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রানী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "অদ্‌ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৺দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন!" লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোনদিন নিজ গন্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম একভাবেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে ধাবিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে সকল বিকার উপস্থিত হয়

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের ঐ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানাপ্রকার বাহ্য লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ 'কি করিব,

কেমনে পাইব', এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যানপূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের বিবরণ–ঠাকুরের ঐ সময়ের ব্যাকুলতা

তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, "মা, এত যে ডাকছি; তার কিছুই তুই কি শুনছিস না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?" তিনি বলিতেন –

"মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; জলশূন্য করিবার জন্য লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে! মার দেখা বোধ হয় কোনকালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূত জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম!"

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন, "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল–কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!–যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!" ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-ঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি? ঠাকুর কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা, মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। ক্রন্দনাদি বাহ্যলক্ষণে সকল সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত এবং কখনো কখনো এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে 'মা, আমায় কৃপা কর, দেখা দে' বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারিপার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত! ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। বলিতেন, "চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম, মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি!–দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!"

[1] ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত – "Personal Reminiscences of Ramakrishna Paramahamsa." Vide 'Modern Review' for November, 1910.

[2] Ye cannot serve God and Mammon together. – Holy Bible

২.৯. সপ্তম অধ্যায়: সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের আনন্দে ঠাকুর কয়েক দিনের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেন। পূজাদি মন্দিরের কার্যসকল নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় উহা অন্য এক ব্রাহ্মণের সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাতুল বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিল। ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নিযুক্ত এক সুযোগ্য বৈদ্যের সহিত ইতঃপূর্বে কোন সূত্রে তাহার পরিচয় হইয়াছিল; হৃদয় এখন তাঁহারই দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল এবং রোগের শীঘ্র উপশমের সম্ভাবনা না দেখিয়া কামারপুকুরে সংবাদ পাঠাইল।

ঠাকুরের ঐ সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি

ভগবদ্দর্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে অস্থির বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া না পড়িতেন, সেদিন পূর্বের ন্যায় পূজা করিতে অগ্রসর হইতেন। পূজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে ঐ সময়ে তাঁহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত হইত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে কখনো কখনো কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। "মার নাট-মন্দিরের ছাদের আলিসায় যে ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাঁহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, 'ঐরূপ স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়া মার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম, শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে ঊর্ধ্বে খটখট করিয়া শব্দ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে—কে যেন ভিতরে ঐ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে। যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্তন করিয়া লইব অথবা ইচ্ছামাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিব বা অন্য কর্মে নিযুক্ত হইব, তাহার সামর্থ্য থাকিত না! পূর্ববৎ খটখট শব্দ করিয়া—এবার উপরের দিক হইতে পা পর্যন্ত—ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত, ততক্ষণ কে যেন একভাবে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত! ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম; কখনো বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিঃতে চতুর্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখনো বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-তরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম; আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না; সুতরাং মার (৺জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম—'মা, আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করলে তোকে পাওয়া যায়, তুই-ই তাহা আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে কে আর আমাকে শিখাবে, মা; তুই ছাড়া আমার গতি বা সহায় আর কেহই যে নাই!' একমনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিতাম!"

প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টায় ও ভাবে কিরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হয়

ঠাকুরের পূজাধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই অদ্‌ভুত তন্ময়ভাব, শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া সেই বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধুর্যই অপরকে বুঝানো কঠিন। প্রবীণের গাম্ভীর্য, পুরুষকার-অবলম্বনে দেশকালপাত্রভেদে বিধিনিষেধ মানিয়া চলা অথবা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই উহাতে লক্ষিত হইত না। দেখিলে মনে হইত, 'মা, তোর শরণাগত বালককে যাহা বলিতে ও করিতে হইবে, তাহা তুই-ই বলা ও করা'—সর্বান্তঃকরণে ঐরূপ ভাব আশ্রয়পূর্বক ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া এককালে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যত কিছু কার্য এখন করিতেছেন। উহাতে মানবসাধারণের বিশ্বাস ও কার্যকলাপের সহিত তাঁহার ব্যবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়া, নানা লোকে নানা কথা প্রথম অস্‌ফুট জল্পনায়, পরে উচ্চস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ হইলে কি হইবে? জগদম্বার বালক এখন

তাঁহারই অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে যাহা করিবার করিতেছিল, ক্ষুব্ধ সংসারের বৃথা কোলাহল তাহার কর্ণে এখন কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতেছিল না! সে এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিল না। বহির্জগৎ এখন তাহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; চেষ্টা করিয়াও উহাতে সে আর পূর্বের ন্যায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিল না এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘন মূর্তিই এখন তাহার নিকটে একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

ঠাকুরের ইতিপূর্বের পূজা দর্শনাদির সহিত এই সময়ের ঐ সকলের প্রভেদ

পূজাধ্যানাদি করিতে বসিয়া ঠাকুর ইতঃপূর্বে কোনদিন দেখিতেন মার হাতখানি, বা কমলোজ্জ্বল পাখানি, বা 'সৌম্যাৎসৌম্য' হাস্যদীপ্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রমুখখানি–এখন পূজাধ্যানকাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন সর্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস না' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেছেন।

পূর্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মার নয়ন হইতে অপূর্ব জ্যোতিঃরশ্মি লকলক করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্যসমুদয় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে! এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়া দিবামাত্র এবং কখনো কখনো দিবার পূর্বেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা 'রোস্, রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস', বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রেই নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন।

পূর্বে ধ্যানপূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী মূর্তিতে এক জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে–এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন, যাঁহার চৈতন্যে সমগ্র জগৎ সচেতন হইয়া রহিয়াছে, তিনিই চিদ্ঘন মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়া তথায় সর্বদা বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন, "নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্যসত্যই নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দিরদেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনো পতিত হইতে দেখি নাই। আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজর পরিয়া বালিকার মতো আনন্দিতা হইয়া ঝমঝম শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপরতলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্যসত্যই মা মন্দিরের দ্বিতলের বারাণ্ডায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখনো কলিকাতা এবং কখনো গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।"

ঠাকুরের এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা

হৃদয় বলিত, "ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন তো কথাই নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইয়া গা 'ছমছম' করিত। পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতাম, তাহাতে বিস্ময়ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইত। বাহিরে আসিয়া কিন্তু মনে সন্দেহ হইত। ভাবিতাম, মামা কি সত্যসত্যই পাগল হইলেন? নতুবা পূজাকালে এরূপ ব্যবহার করেন কেন? রানীমাতা ও মথুরবাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, ভাবিয়া বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্তু ঐরূপ কথা একবারও মনে আসিত না এবং বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না; একটা অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিত এবং তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান অনুভব করিতাম। অগত্যা নীরবে তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতাম। মনে কিন্তু হইত, মামা ঐরূপে কোনদিন একটা কাণ্ড না বাধাইয়া বসেন!"

পূজাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের যেসকল চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়, ভয় ও ভক্তি যুগপৎ উপস্থিত হইত, তৎসম্বন্ধে সে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিল –

"দেখিতাম, জবাবিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া মামা প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ, এমনকি নিজ পদ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

"দেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর, গান, পরিহাস বা কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমূর্তির হাত ধরিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন!

"দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগনিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং থালা হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন–'খা, মা খা! বেশ করে খা!' পরে হয়তো বলিলেন, 'আমি খাব? আচ্ছা, খাচ্ছি!'–এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি তো খেয়েছি, এইবার তুই খা!'

"একদিন দেখি, ভোগনিবেদন করিবার সময় একটা বিড়ালকে কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মামা 'খাবি মা খাবি মা' বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন!

"দেখিতাম, রাত্রে এক একদিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া–'মা মা আমাকে কাছে শুতে বলচিস– আচ্ছা, শুচ্ছি' বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন।

"আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে, বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল না।

"প্রত্যূষে উঠিয়া মা কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনো তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর-আবদার, রঙ্গ-পরিহাসাদি করিতেছেন।

"আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই! যখনি জাগিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি তিনি ঐরূপে ভাবের ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।"

ঠাকুরের রাগাত্মিকা পূজা দেখিয়া কালীবাটীর খাজাঞ্চীপ্রমুখ কর্মচারীদিগের জল্পনা ও মথুরবাবুর নিকট সংবাদপ্রেরণ

হৃদয় বলিত, ঠাকুরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মনে আশঙ্কা হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া কি করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে পরামর্শ লইবার তাহার উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে উহা ঠাকুরবাটীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ করে এবং তাহারা শুনিয়া ঐকথা বাবুদের কানে তুলিয়া তাহার মাতুলের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন যখন ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন ঐকথা আর কেমনে চাপা যাইবে? অন্য কেহ কেহ তাহার ন্যায় পূজাকালে কালীঘরে আসিয়া ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইয়া খাজাঞ্চীপ্রমুখ কর্মচারীদিগের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা ঐকথা শুনিয়া কালীঘরে আসিয়া স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ঠাকুরের দেবতাবিষ্টের ন্যায় আকার, অসঙ্কোচ ব্যবহার ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সহসা তাঁহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ করিতে পারিল না। দপ্তরখানায় ফিরিয়া আসিয়া সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল–হয় ভট্টাচার্য পাগল হইয়াছেন, নাহয়তো তাঁহাতে উপদেবতার আবেশ হইয়াছে! নতুবা পূজাকালে কেহ কখনো ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না; যাহাই হউক, ৺দেবীর পূজা, ভোগরাগাদি কিছুই হইতেছে না; তিনি সকল নষ্ট করিয়াছেন; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদপ্রেরণ কর্তব্য।

মথুরবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি শীঘ্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে যথাবিধান করিবেন। যদবধি তাহা না করিতেছেন, তদবধি ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবে পূজাদি করিতেছেন, সেইভাবেই করুন; তদ্বিষয়ে কেহ বাধা দিবে না। মথুরবাবুর ঐরূপ পত্র পাইয়া সকলে তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল এবং 'এইবারেই ভট্টাচার্য

পদচ্যুত হইল, বাবু আসিয়াই তাঁহাকে দূর করিবেন–দেবতার নিকট অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল', ইত্যাদি নানা জল্পনা তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

ঠাকুরের পূজা দেখিতে মথুরবাবুর আগমন ও তদ্বিষয়ে ধারণা

মথুরবাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন পূজাকালে সহসা আসিয়া কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। ভাববিভোর ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। পূজাকালে মাকে লইয়াই তিনি নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আসিতেছে, যাইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। শ্রীযুক্ত মথুরামোহন ঐ বিষয়টি আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন। পরে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট তাঁহার বালকের ন্যায় আবদার, অনুরোধ প্রভৃতি দেখিয়া উহা যে ঐকান্তিক প্রেমভক্তি-প্রসূত, তাহাও বুঝিলেন। তাঁহার মনে হইল, ঐরূপ অকপট ভক্তিবিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায় তো কিসে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে? পূজা করিতে করিতে ভট্টাচার্যের কখনো গলদশ্রুধারা, কখনো অকপট উদ্দাম উল্লাস এবং কখনো বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচলতা ও বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত একটা অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জমজম করিতেছে! তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল ভট্টাচার্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন। অনন্তর ভক্তিপূতচিত্তে সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাঁহার অপূর্ব পূজককে দূর হইতে বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনের পর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, এতদিনের পর শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্যসত্যই এখানে আবির্ভূতা হইলেন, এতদিনে মার পূজা ঠিক ঠিক সম্পন্ন হইল।" কর্মচারীদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সেদিন বাটীতে ফিরিলেন। পরদিন মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর উপর তাঁহার নিয়োগ আসিল, 'ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না।' [1]

প্রবল ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকুরের রাগাত্মিকা ভক্তিলাভ–ঐ ভক্তির ফল

পূর্বোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা অতিক্রম করিয়া ঠাকুরের মন এখন অহেতুক প্রেমভক্তির উচ্চমার্গে প্রবলবেগে ধাবিত হইয়াছিল। এমন সরল স্বাভাবিকভাবে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল যে, অপরের কথা দূরে থাকুক, তিনি নিজেও ঐ কথা তখনো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিয়াছিলেন যে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসার প্রবল প্রেরণায় তিনি ঐরূপ চেষ্টাদি না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না–কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া ঐরূপ করাইতেছে! ঐজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 'আমার এ কি প্রকার অবস্থা হইতেছে? আমি ঠিক পথে চলিতেছি তো?' ঐজন্য দেখা যায়, তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জানাইতেছেন–'মা, আমার এইরূপ অবস্থা কেন হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুই আমাকে যাহা করিবার করাইয়া ও যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেখা দে! সর্বদা আমার হাত ধরিয়া থাক!' কাম, কাঞ্চন, মান, যশ, পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্বর্য হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্মাতাকে ঐকথা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও তাঁহাকে তাঁহার হস্ত ধরিয়া সর্ববিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধকজীবনের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তখনি ঐসকল বস্তু ও ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তির চরম সীমায় স্বাভাবিক সহজভাবে আরূঢ় করাইয়াছিলেন। গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন –

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

– গীতা, ৯।২২

– যে-সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাসনা করিয়া আমার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া থাকে– শরীরধারণোপযোগী আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্যও চিন্তা না করিয়া সম্পূর্ণ মন আমাতে অর্পণ

করে–প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আমি (অযাচিত হইয়াও) তাহাদিগের নিকট আনয়ন করিয়া থাকি। গীতার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে বর্ণে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের জীবন যত আলোচনা করিব তত সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব। কামকাঞ্চনৈকলক্ষ্য স্বার্থপর বর্তমান যুগে শ্রীভগবানের ঐ প্রতিজ্ঞার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে পুনঃ প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যুগে যুগে সাধকেরা 'সব ছোড়ে সব পাওয়ে'–শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিলে প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের জন্য সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না–একথা মানবকে উপদেশ দিয়া আসিলেও দুর্বলহৃদয় বিষয়াবদ্ধ মানব তাহা বর্তমান যুগে আবার পূর্ণভাবে না দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল না। সেজন্য সম্পূর্ণরূপে অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার শাস্ত্রীয় ঐ বাক্যের সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয়! হে মানব, পূতচিত্তে একথা শ্রবণ করিয়া ত্যাগের পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হও।

ঠাকুরের কথা–রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তির পূর্ণপ্রভাব কেবল অবতারপুরুষদিগের শরীর-মন ধারণ করিতে সমর্থ

ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতর্কিতভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চাপিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও সফল হওয়া যায় না। মানবসাধারণের জড় দেহ উহার প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া এককালে ভাঙিয়া চুরিয়া যায়। ঐরূপে অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পূর্ণ জ্ঞান বা পূর্ণা ভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতারপ্রথিত মহাপুরুষদিগের শরীরসকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্যন্ত দেখা গিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সেজন্য তাঁহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহবান বলিয়া বারংবার নির্দেশ করিয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্বগুণরূপ উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন করেন বলিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। ঐরূপ শরীরধারণ করিয়াও তাঁহাদিগের উহাদিগের প্রবল বেগে অনেক সময় মুহ্যমান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গ-সঞ্চরণশীল অবতারপুরুষদিগকে। ভাব-ভক্তির প্রাবল্যে ঈশা ও শ্রীচৈতন্যের শরীরের অঙ্গগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়া, ঘর্মের ন্যায় শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি শাস্ত্রনিবদ্ধ কথাতে উহা বুঝিতে পারা যায়। ঐসকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহায়েই তাঁহাদিগের শরীর ভক্তিপ্রসূত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসে। পরে, ঐ বেগ ধারণে উহা ক্রমে যত অভ্যস্ত হয়, ঐ বিকৃতিসকলও তখন আর উহাতে পূর্বের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় না।

ঐ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরের শারীরিক বিকার ও তজ্জনিত কষ্ট, যথা গাত্রদাহ–প্রথম গাত্রদাহ, পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে; দ্বিতীয়, প্রথম দর্শনলাভের পর ঈশ্বরবিরহে; তৃতীয় মধুরভাব-সাধনকালে

ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানাপ্রকার অদ্ভুত বিকারপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল। সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার গাত্রদাহের কথা আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। উহার বৃদ্ধিতে তাঁহাকে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমাদের নিকট অনেক সময় উহার কারণ এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন–"সন্ধ্যা-পূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যখন ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম, তখন কে জানিত, শরীরে সত্যসত্যই পাপপুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায়! সাধনার প্রারম্ভ হইতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইল; ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ হইল! ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। নানা কবিরাজী তেল মাখা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি, সহসা দেখি কি মিসকালো রঙ, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল। পরক্ষণে দেখি কি–আর একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ

গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া ঐরূপে (শরীরের) ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্বোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণপূর্বক নিহত করিল এবং ঐদিন হইতে গাত্রদাহ কমিয়া গেল! ঐ ঘটনার পূর্বে ছয় মাস কাল গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইয়াছিলাম।”

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপপুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে গাত্রদাহ নিবারিত হইলেও অল্পকাল পরেই উহা আবার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাগমার্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাদিতে নিযুক্ত। ক্রমে উহা এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ভিজা গামছা মাথায় দিয়া তিন-চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকিয়াও তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া ঐ গাত্রদাহ, শ্রীভগবানের পূর্ণদর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনা-প্রসূত বলিয়া নির্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ উপায়ে উহা নিবারণ করেন, সে-সকল কথা আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।[2] উহার পরে ঠাকুর মধুরভাব সাধন করিবার কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীড়িত হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, “বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর ঐকালে সেইরূপ অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন। মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া উহা তাঁহাকে বহুকাল পর্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসতনিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত রামকানাই ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ইষ্টকবচ অঙ্গে ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কবচধারণের পরে তিনি ঐরূপ দাহে আর কখনো কষ্ট পান নাই।”

পূজা করিতে করিতে বিষয়কর্মের চিন্তার জন্য রাণী রাসমণিকে ঠাকুরের দণ্ডপ্রদান

ঠাকুরের ঐরূপ অদ্‌ভুত পূজা দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন রানীমাতাকে শুনাইলেন। ভক্তিমতী রানী উহা শুনিয়া বিশেষ পুলকিতা হইলেন। ভট্টাচার্যের মুখনিঃসৃত ভক্তিমাখা সঙ্গীত শ্রবণে তিনি তাঁহার প্রতি ইতঃপূর্বেই স্নেহপরায়ণা ছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-ভগ্নকালে তাঁহার ভাবাবেশ ও ভক্তিপূত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।[3] অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভ যে ঠাকুরের ন্যায় পবিত্রহৃদয়ের পক্ষে সম্ভবপর, একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্তু এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে রানী ও মথুরবাবুর ঐ বিশ্বাস বিচলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছিল। রানী একদিন মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিবার কালে তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্মসম্পর্কীয় একটি মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন। ঠাকুর তখন ঐস্থানে বসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া ‘এখানেও ঐ চিন্তা!’ বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাতপূর্বক ঐ চিন্তা হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষাপ্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপাপাত্রী সাধিকা রানী উহাতে নিজ মনের দুর্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি।

ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্যপূজা ত্যাগ–এইকালে তাঁহার অবস্থা

শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে লইয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ ও আনন্দোল্লাস উহার অল্পদিন পরে এত বর্ধিত হইয়া উঠিল যে, দেবীসেবার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যকলাপ কোনরূপে নির্বাহ করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে বৈধী কর্মের ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঠাকুর বলিতেন, “যেমন গৃহস্থের বধূর যে পর্যন্ত গর্ভ না হয়, ততদিন তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে সকল জিনিস খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়, গর্ভ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একটু আধটু বাছবিচার আরম্ভ হয়; পরে গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয়া দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসন্নপ্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কার্যই করিতে দেওয়া হয় না; পরে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন ঐ সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে।” শ্রীশ্রীজগদম্বার বাহ্যপূজা ও সেবাদি-ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক ঐরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া আসিয়াছিল। পূজা ও সেবার কালাকালবিচার তাঁহার

এখন লোপ হইয়াছিল। ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর থাকিয়া তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার যখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত, তখন সেইরূপই করিতেন। যথা—পূজা না করিয়াই হয়তো ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন! অথবা ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার পৃথক অস্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া দেবীপূজার নিমিত্ত আনীত পুষ্প-চন্দনাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়া বসিলেন! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শনেই যে ঠাকুরের এই কালের কার্যকলাপ ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার নিকটে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি যে, ঐ তন্ময়তার অল্পমাত্র হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইতেন তো এমন ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত যে, আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতেন! শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ছটফট করিত। আছাড় খাইয়া পড়িয়া সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্য হইত না। জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, কখনো কখনো তাহারও জ্ঞান থাকিত না। পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন পাইয়া ঐ ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতি ও উল্লাসে পূর্ণ হইত—তিনি যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন!

পূজাত্যাগ সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা এবং ঠাকুরের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ

ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থালাভের পূর্ব পর্যন্ত মথুরবাবু তাঁহার দ্বারা পূজাকার্য কোনরূপে চালাইয়া লইতেছিলেন; এখন আর তদ্রূপ করা অসম্ভব বুঝিয়া পূজাকার্যের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। হৃদয় বলিত, “মথুরবাবুর ঐরূপ সঙ্কল্পের একটি কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। পূজাসন হইতে সহসা উত্থিত হইয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুর একদিন মথুরবাবু ও আমাকে মন্দিরমধ্যে দেখিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া পূজাসনে বসাইয়া মথুরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘আজ হইতে হৃদয় পূজা করিবে; মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করিবেন।’ বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।” হৃদয়ের ঐ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না, তবে বর্তমান অবস্থায় ঠাকুরের নিত্য পূজাদি করা যে অসম্ভব, একথা মথুরের বুঝিতে বাকি ছিল না।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎসা

প্রথমদর্শনকাল হইতে মথুরবাবুর মন ঠাকুরের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি সকলপ্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়িতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহাতে অদ্ভুত গুণরাশির যত পরিচয় পাইতেছিলেন, ততই মুগ্ধ হইয়া তিনি আবশ্যকমত তাঁহার সেবা এবং অপরের অযথা অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যেমন—ঠাকুরের বায়ুপ্রবণ ধাত জানিয়া মথুর নিত্য মিছরির শরবত-পানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; রাগানুগা ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুর অদৃষ্টপূর্ব প্রণালীতে পূজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; ঐরূপ আরও কয়েকটি কথার আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।[4] কিন্তু রানী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর যেদিন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে মথুর সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, ঐ ঘটনায় তিনি তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ অনুমান করিয়াছিলেন। কারণ, এই সময়ে তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ঐরূপে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু নিজ মনকে সুসংযত রাখিয়া যাহাতে ঠাকুর সাধনায় অগ্রসর হন, তর্কযুক্তিসহায়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাল জবাফুলের গাছে শ্বেত জবা প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া কিরূপে তিনি এখন পরাজয় স্বীকারপূর্বক সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বশীভূত হইয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।[5]

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৺দেবীসেবা ঠাকুরের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া মথুরবাবু এখন অন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে কর্মান্বেষণে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকেই তিনি ঠাকুরের আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ৺দেবীপূজায় নিযুক্ত করিলেন। সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

হলধারীর আগমন

রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। হলধারী সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী সাধক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্ম-রামায়ণাদি গ্রন্থসকল তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। ৺বিষ্ণুপূজায় তাঁহার অধিক প্রীতি থাকিলেও ৺শক্তির উপর তাঁহার দ্বেষ ছিল না। সেজন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াও তিনি মথুরবাবুর অনুরোধে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। মথুরবাবুকে বলিয়া তিনি সিধা লইয়া নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মথুরবাবু তাহাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় তো ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাইতেছে?" বুদ্ধিমান হলধারী তাহাতে বলেন, "আমার ভ্রাতার আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা; তাহার কিছুতেই দোষ নাই; আমার ঐরূপ অবস্থা হয় নাই, সুতরাং নিষ্ঠাভঙ্গে দোষ হইবে।" মথুরবাবু তাঁহার ঐরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হন এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে নিত্য স্বপাকে ভোজন করিতেন।

শাক্তদ্বেষী না হইলেও হলধারীর ৺দেবীকে পশুবলিপ্রদানে প্রবৃত্তি হইত না। পর্বকালে ৺জগদম্বাকে পশুবলিপ্রদান করার বিধি ঠাকুরবাটীতে প্রচলিত থাকায় ঐসকল দিবসে তিনি আনন্দে পূজা করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, প্রায় এক মাস ঐরূপে ক্ষুণ্নমনে পূজা করিবার পরে হলধারী এক দিবস সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন ৺দেবী ভয়ঙ্করী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমার পূজা তোকে করিতে হইবে না; করিলে সেবাপরাধে তোর সন্তানের মৃত্যু হইবে।" শুনা যায়, মাথার খেয়াল মনে করিয়া তিনি ঐ আদেশ প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন সত্য সত্যই উপস্থিত হইল, তখন ঠাকুরের নিকট ঐ বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়া তিনি ৺দেবীপূজায় বিরত হইয়াছিলেন। সেজন্য এখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা এবং হৃদয় ৺দেবীপূজা করিতে থাকেন। ঘটনাটি আমরা হৃদয়ের ভ্রাতা শ্রীযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম।

[1] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
[2] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়।
[3] ঐ গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৫ম অধ্যায়।
[4] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
[5] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

২.১০. অষ্টম অধ্যায়: প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা

সাধনকালে সময়নিরূপণ

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে তিনি আমাদিগকে ঐ কাল সম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ কালের ঘটনাবলীর যথাযথ সময় নির্দেশ করা অসম্ভব হইবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল নিরন্তর নানা মতের সাধনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। রানী রাসমণির মন্দিরসংক্রান্ত দেবোত্তর-দানপত্র-দর্শনে সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজী ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭৩ সাল পর্যন্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা সুনিশ্চিত। উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐসকল স্থলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি কখনো কখনো কিছুকালের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইব।

ঐ কালের তিনটি প্রধান বিভাগ

পূর্বোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম, ১২৬২ হইতে ১২৬৫, চারি বৎসর–যে কালের প্রধান প্রধান কথার ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, ১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্যন্ত, চারি বৎসর–যে সময়ের শেষ দুই বৎসরাধিক কাল ঠাকুর ব্রাহ্মণীর নির্দেশে গোকুলব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত চৌষট্টিখানা প্রধানতন্ত্র-নির্দিষ্ট সাধনসকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয়, ১২৭০ হইতে ১২৭৩ পর্যন্ত চারি বৎসর–যে কালে তিনি 'জটাধারী' নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন। বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, আচার্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক সমাধির নির্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিকট হইতে ইসলামী ধর্মে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; উক্ত দ্বাদশ বৎসরের ভিতরেই তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের এবং কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সাধনমার্গের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মতের সহিতই তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ ঐসকল পথের সাধকবর্গের তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের জন্য আগমনে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরের সাধনকালকে পূর্বোক্তরূপে তিনভাগে ভাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তিন ভাগের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত তাঁহার সাধনকালের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি

আমরা দেখিয়াছি–সাধনকালের প্রথমভাগে ঠাকুর বাহিরের সহায়ের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য অন্তরের ব্যাকুলতাই ঐ কালে তাঁহার একমাত্র সহায় হইয়াছিল। উহাই প্রবল হইয়া অচিরকালমধ্যে তাঁহার শরীর-মনে অশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। উপাস্যের প্রতি অসীম ভালবাসা আনয়নপূর্বক উহাই তাঁহাকে বৈধী ভক্তির নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করাইয়া ক্রমে রাগানুগা ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধনী করিয়া যোগবিভূতিসম্পন্নও করিয়া তুলিয়াছিল।

ঐ কালে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনলাভ হইবার পরে ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে হইয়াছিল–গুরূপদেশ, শাস্ত্রবাক্য ও নিজকৃত প্রত্যক্ষের একতাদর্শনে শান্তিলাভ

পাঠক হয়তো বলিবেন, "তবে আর বাকি রহিল কি? ঐ কালেই তো ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তবে পরে আবার সাধন কেন?" উত্তরে বলিতে হয়–একভাবে ঐ কথা যথার্থ হইলেও পরবর্তী কালে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অন্য প্রয়োজন

ছিল। ঠাকুর বলিতেন, "বৃক্ষ ও লতাসকলের সাধারণ নিয়মে আগে ফুল, পরে ফল হইয়া থাকে; উহাদের কোন কোনটি কিন্তু এমন আছে, যাহাদিগের আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখা দেয়।" সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরূপভাবে হইয়াছিল। এজন্য পাঠকের পূর্বোক্ত কথাটা আমরা একভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথমভাগে তাঁহার অদ্‌ভুত প্রত্যক্ষ ও জগদম্বার দর্শনাদি উপস্থিত হইলেও ঐসকলকে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐসকলের সত্যতা এবং উহাদিগের চরম সীমা সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতাসহায়ে যাহা তিনি ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই আবার পূর্বোক্ত কারণে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—গুরুমুখে শ্রুত, অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভবসকল যতক্ষণ না মিলাইয়া সমসমান বলিয়া দেখিতে পায়, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ঐ তিনটি বিষয়কে মিলাইয়া এক বলিয়া দেখিতে পাইবামাত্র সে সর্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামীর ঐরূপ হইবার কথা

পূর্বোক্ত কথার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন-ঘটনা নির্দেশ করিতে পারি। মায়ারহিত শুকের জীবনে জন্মাবধি নানাপ্রকার দিব্য দর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার ঐরূপ হয়, তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিতেন না। মহামতি ব্যাসের নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া শুক একদিন পিতাকে বলিলেন, "শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আমি আজন্ম অনুভব করিতেছি; তথাপি আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি কিনা, তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছি না। অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন, তাহা আমাকে বলুন।" ব্যাস ভাবিলেন শুককে আমি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্য সম্বন্ধে সতত উপদেশ দিয়াছি, তথাপি তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হয় নাই; সে মনে করিতেছে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে সে সংসারত্যাগ করিবে ভাবিয়া স্নেহের বশবর্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে আমি তাহাকে সকল কথা বলি নাই। সুতরাং অন্য কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার ঐ বিষয় শ্রবণ করা কর্তব্য। ঐরূপ চিন্তাপূর্বক ব্যাস বলিলেন, "আমি তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই। তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও।" শুক পিতার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্বে মিথিলা গমন করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয় শুনিয়া গুরূপদেশ, শাস্ত্রবাক্য ও নিজ জীবনানুভবের ঐক্য দেখিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সাধনার অন্য কারণ—স্বার্থে নহে, পরার্থে

পূর্বোক্ত কারণ ভিন্ন ঠাকুরের পরবর্তী কালে সাধনার অন্য গভীর কারণসমূহও ছিল। ঐসকলের উল্লেখমাত্রই আমরা এখানে করিতে পারিব। শান্তিলাভ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইবেন, কেবলমাত্র ইহাই ঠাকুরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীরপরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সেইজন্যই পরস্পরবিবদমান ধর্মমতসকলের অনুষ্ঠান করিয়া সত্যাসত্য-নির্ধারণের অদ্‌ভুত প্রয়াস তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের আচার্যপদবী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে সকলপ্রকার ধর্মমতের সাধনার ও তাহাদিগের চরমোদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে তাঁহার ন্যায় নিরক্ষর পুরুষের জীবনে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থাসকলের উদয় করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরের দ্বারা বর্তমান যুগে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরানাদি সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইজন্যও স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরে তাঁহার সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিতসকলকে

যথাকালে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নপূর্বক যাবতীয় ধর্মমতের সাধনানুষ্ঠানের শাস্ত্রসকল শ্রবণ করিবার অধিকার যে জগন্মাতা ঠাকুরকে পূর্বোক্ত প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহার অদ্‌ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

যথার্থ ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ–ঠাকুরের জীবনে উক্ত ব্যাকুলতা কতদূর উপস্থিত হইয়াছিল

পূর্বে বলিয়াছি, সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বরদর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল। এমন কোন লোক ঐ সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন নাই, যিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পথে সুচালিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইবেন। সুতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তখন তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শনলাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আবশ্যক, তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে ঐ কথা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল; এবং শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, “শরীরসংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে, কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত! ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময় চলিয়া যাইত, তাহার হুঁশই থাকিত না! পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত, তখন মনে পড়িত–দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া ‘মা, এখনো দেখা দিলি না’ বলিয়া চিৎকার ও ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। লোকে বলিত, ‘পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে, তাই অত কাঁদিতেছে’।” আমরা যখন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের পূর্বোক্ত কথাসকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, “লোকে স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল? অথচ বলে, ‘তাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না!’ ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুক দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন!” কথাগুলি আমাদের মর্মে মর্মে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ জীবনে ঐ কথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহা বলিতে পারিতেছেন।

মহাবীরের পদানুগ হইয়া ঠাকুরের দাস্যভক্তিসাধনা

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৺জগদম্বার দর্শনমাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাবমুখে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভের পর নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। হনুমানের ন্যায় অনন্যভক্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্যভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তিনি এখন আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছুদিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এই সময়ে তিনি ঐ আদর্শে এতদূর

তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "ঐ সময়ে আহারবিহারাদি সকল কার্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত–ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনি হইয়া পড়িত! পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মতো করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না–তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম এবং নিরন্তর 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীরস্বরে চিৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন সর্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।" [1] শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনো ঐরূপ আছে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না, মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।"

দাস্যভক্তি-সাধনকালে শ্রীশ্রীসীতাদেবীর দর্শনলাভ বিবরণ

দাস্যভক্তি-সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব তাঁহার ইতঃপূর্বের দর্শন-প্রত্যক্ষাদি হইতে এত নূতন ধরণের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্বক্ষণ জাগরূক ছিল। তিনি বলিতেন, "এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসিয়া আছি–ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়াছিলাম–এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, মূর্তিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের ন্যায় ত্রিনয়নসম্পন্না নহে। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীরভাব দেবীমূর্তিসকলেও সচরাচর দেখা যায় না! প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মোহিত করিয়া ঐ দেবী-মানবী ধীর ও মন্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?'—এমন সময়ে একটি হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ্ শব্দ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল, 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তখন 'মা' 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন!–আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যান-চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতঃপূর্বে আর হয় নাই। জনম-দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি!"

ঠাকুরের স্বহস্তে পঞ্চবটীরোপণ

তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঠাকুর এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নূতন একটি পঞ্চবটী[2] স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করেন। হৃদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্তী হাঁসপুকুর নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি তখন ঝালানো হইয়াছে এবং পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিম্ন জমিখণ্ড ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করানো হওয়ায় ঠাকুর ইতঃপূর্বে যে আমলকী বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করিতেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অনন্তর এখন যেখানে সাধনকুটির আছে, তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বট, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা পুঁতিয়া সমগ্র স্থানটিকে বেষ্টন করাইয়া লইলেন। গরু-ছাগলের হস্ত হইতে ঐসকল চারাগাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে অদ্ভুত উপায়ে তিনি 'ভর্তাভারী' নামক ঠাকুরবাটীর উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে ঐ স্থানে বেড়া লাগাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।[3] ঠাকুরের যত্নে এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতা গাছগুলি অতি

শীঘ্রই এত বড় ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন, তখন ঐ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিরা তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

ঠাকুরের হঠযোগ-অভ্যাস

কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পরে গঙ্গাসাগর ও ৺জগন্নাথ-দর্শনপ্রয়াসী পথিক-সাধুকুল ঐ তীর্থদ্বয়ে যাইবার কালে কয়েক দিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্না রানীর আতিথ্যগ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন।[4] ঠাকুর বলিতেন ঐরূপে অনেক সাধক ও সিদ্ধপুরুষেরা এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। হলধারীসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। হঠযোগোক্ত ক্রিয়াসকল স্বয়ং অভ্যাসপূর্বক উহাদিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে ঐসকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের জানা আছে, ঐ বিষয়ে উপদেশলাভের জন্য কেহ কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তর পাইয়াছেন—"ও-সকল সাধন একালের পক্ষে নয়। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ; এখন হঠযোগ অভ্যাসপূর্বক শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগসহায়ে ঈশ্বরকে ডাকিবে, তাহার সময় কোথায়? হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিতে হয় এবং আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইয়া কঠোর নিয়মসকল রক্ষা করিতে হয়। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত এবং অনেক সময় সাধকের মৃত্যুও হইয়া থাকে। সেজন্য ঐসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। মনোনিরোধের জন্যই তো প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি করিয়া বায়ুনিরোধ করা। ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই স্বতোনিরুদ্ধ হইয়া আসিবে। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়া ভগবান কৃপা করিয়া তাহার জন্য ঈশ্বরলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা চব্বিশ ঘণ্টামাত্র কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে তিনি তাহাকে এককালে দেখা দিবেনই দিবেন।"

হলধারীর অভিশাপ

লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ভারতের বর্তমানকালে স্মৃত্যনুসারী সাধক-ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ঐরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া-প্রেমসাধনরূপ পথে ধাবিত হন।[5] বৈষ্ণবমতে প্রীতিসম্পন্ন হলধারীও ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত হইবার কিছুকাল পরে গোপনে পূর্বোক্ত সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। লোকে ঐ কথা জানিতে পারিয়া কানাকানি করিতে থাকে; কিন্তু হলধারী বাক্-সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি থাকায় কোপে পড়িবার আশঙ্কায় তাঁহার সম্মুখে ঐ কথা আলোচনা বা হাস্য-পরিহাসাদি করিতে সহসা কেহ সাহসী হইত না। অগ্রজের সম্বন্ধে ঐকথা ক্রমে ঠাকুর জানিতে পারিলেন এবং ভিতরে ভিতরে জল্পনা করিয়া লোকে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। হলধারী তাহাতে তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারের বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্বক সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে অবজ্ঞা করিলি? তোর মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে!" ঠাকুর তাঁহাকে নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে কোন কথা শ্রবণ করিলেন না।

উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন রাত্রি ৮।৯টা আন্দাজ সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড়সড় করিয়া মুখ দিয়া সত্যসত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন, "সিমপাতার রসের মতো তার মিসকালো রং—এত গাঢ় যে, কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মতো ঝুলিতে লাগিল। মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন

মন্দিরে সেবার কাজ সারিতেছিল; ঐ সংবাদে সেও শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে বলিলাম, ‘দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা করলে, দেখ দেখি!’ আমার কাতরতা দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

“ঠাকুরবাড়িতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু আসিয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তিনিও আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং রক্তের রং ও মুখের ভিতরে যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—‘ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও ঐরূপ হইতেছিল। সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল, ইহাতে বড়ই ভাল হইল; কারণ, জড়সমাধি হইলে উহা কিছুতেই ভাঙিত না। তোমার শরীরটার দ্বারা ৺জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য আছে; তাই তিনি তোমাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন!’ সাধুর ঐ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।” ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ ঐরূপে কাকতালীয়ের ন্যায় সফলতা দেখাইয়া বরে পরিণত হইয়াছিল।

ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের কথা

হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল। পূর্বে বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতাত-পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজাকার্যে ব্রতী হন এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল পর্যন্ত ঐ কার্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীয় চারি বৎসর এবং তাহার পরেও দুই বৎসরের অধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ নিষ্ঠাচারসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পরিধানের কাপড়, পৈতা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইয়াছেন। হৃদয় বলিত—“তিনি কখনো কখনো আমাকে বলিতেন, ‘হৃদু, উনি কাপড় ফেলিয়া দেন, পৈতা ফেলিয়া দেন, এটা বড় দোষের কথা; কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কিনা সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান! এমন কি উচ্চাবস্থা হইয়াছে, যাহাতে উনি ঐরূপ করিতে পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা একটু শোনেন, তোমার উচিত যাহাতে উনি ঐরূপ না করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা; এমনকি বাঁধিয়া রাখিয়াও উঁহাকে যদি তুমি ঐরূপ কার্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও করা উচিত।’”

আবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেমধারা, ভগবৎনামগুণশ্রবণে অদ্‌ভুত উল্লাস ও ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের ঐসকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, নতুবা সাধারণ মানুষের কখনো তো ঐরূপ হইতে দেখা যায় না। ভাবিয়া হলধারী আবার কখনো কখনো হৃদয়কে বলিতেন, “হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উঁহার ভিতরে কোনরূপ আশ্চর্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উঁহার কখনো সেবা করিতে না।”

নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিয়াই হলধারীর উচ্চ ধারণার লোপ

ঐরূপে হলধারীর মন সর্বদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারিত না। ঠাকুর বলিতেন, “আমার পূজা দেখিয়া মোহিত হইয়া হলধারী কতদিন বলিয়াছে, ‘রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।’ তাতে কখনো কখনো আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, ‘দেখ, আবার যেন গোলমাল হয়ে না যায়!’ সে বলিত, ‘এবার আর তোর ফাঁকি দিবার যো নাই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।’ শুনিয়া বলিতাম, ‘আচ্ছা, দেখা যাবে।’ অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া হলধারী যখন শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা বা অধ্যাত্মরামায়ণাদি শাস্ত্র বিচার করিতে বসিত, তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে অন্য লোক হইয়া যাইত। আমি

তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়ছ, সে-সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝতে পারি।' শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত, 'হ্যাঁ, তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি!' আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া), 'সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে, সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বললে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐ কথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত, 'যা যা মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস, তাই ঐরূপ ভাবিস।' হাসিয়া বলিতাম, 'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না'—কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধদিন নয়, অনেকদিন হইয়াছিল। পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত্র ত্যাগপূর্বক বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের ন্যায় তদবস্থায় মূত্রত্যাগ করিতেছি—সেইদিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থিরনিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে!"

৺কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাকুরের হলধারীকে শিক্ষাদান

হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি ৺কালীমূর্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে ঐ কথা বলিয়াও ফেলেন, "তামসী মূর্তির উপাসনায় কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর কেন?" ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া তখন তাঁহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইষ্টনিন্দাশ্রবণে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি সত্যই ঐরূপ?" অনন্তর ৺জগদম্বার মুখে ঐ বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী!" ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল! তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐ কথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলিপ্রদান করিলেন! উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, এই তুমি বল রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে পূজা করিলে যে?" হলধারী বলিলেন, "কি জানি, হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রকাশ দেখিতে পাইলাম! কালীমন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই, তখনই আমাকে ঐরূপ করিয়া দেয়! এ এক চমৎকার ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না!"

কাঙ্গালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া হলধারীর ঠাকুরকে ভর্ৎসনা ও ঠাকুরের উত্তর

ঐরূপে হলধারী ঠাকুরের ভিতর বারংবার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিলেই পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া 'পুনর্মূষিকত্ব' প্রাপ্ত হইতেন। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে বাহ্যশৌচ, সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞান যে বিশেষ কাজে লাগে না এবং মানবকে সত্য তত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না, হলধারীর পূর্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙালীদিগকে নারায়ণজ্ঞান করিয়া ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোর ছেলেমেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয়, তাহা দেখিব!" জ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে রে শালা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার সময় তুই না বলিস, জগৎ মিথ্যা ও সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হয়? তুই বুঝি ভাবিস, আমি তোর মতো জগৎ মিথ্যা বলব, অথচ ছেলেমেয়ের বাপ হব! ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!"

হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার পুনর্দর্শন ও প্রত্যাদেশ-লাভ–'ভাবমুখে থাক্'

বালকস্বভাব ঠাকুর আবার কখনো কখনো হলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়া ইতিকর্তব্যতা-বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি হয় সে-সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়াছি, আদেশ পাইয়াছি, সে সমস্ত ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম–'মা, নিরক্ষর মুখ্খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়?'–সে কান্নার তোড় (বেগ) আর থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি সহসা মেঝে হইতে কুয়াসার মতো ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তারপর দেখি, তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! ঐ মূর্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন–'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্!'–তিনবার মাত্র ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঐ মূর্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মতো ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল! ঐরূপ দেখিয়া সেবার শান্ত হইলাম।" ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "হলধারীর কথায় ঐরূপ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল; সেবার পূজা করিতে করিতে মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম; মা ঐ সময়ে 'রতির মা' নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ভাবমুখে থাক্'!" আবার পরিব্রাজকাচার্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয়মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্বিকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন, তখনো ঐ কালের অন্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন–'তুই ভাবমুখে থাক্'!

হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং পিশাচবৎ আচারবান পূর্ণজ্ঞানী সাধুর, ব্রাহ্মণীর, জটাধারী-নামক রামায়েৎ সাধুর, ও শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, হলধারী শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে কখনো কখনো অধ্যাত্মরামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। অতএব হলধারী-সংক্রান্ত ঘটনাগুলি পূর্বোক্ত সাত বৎসরের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। বলিবার সুবিধার জন্য আমরা ঐ সকল পাঠককে একত্রে বলিয়া লইলাম।

ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম, তাহাতে একথা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, কালীবাটীর জনসাধারণের নয়নে তিনি এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও মস্তিষ্কের বিকার বা ব্যাধিপ্রসূত সাধারণ উন্মাদাবস্থা তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বরদর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তিনি ঐ কালে আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না! অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালাময়ী ঐরূপ ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরন্তর ধারণপূর্বক সাধারণ বিষয়সকলে সাধারণের ন্যায় যোগদানে সক্ষম হইতেছিলেন না বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা ঐরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের তীব্র বেদনা মানবের স্বাভাবিক সহ্যগুণকে যখন অতিক্রম করে, কেহই তখন মুখে একপ্রকার এবং ভিতরে অন্যপ্রকার ভাব রাখিয়া সংসারে সকলের সহিত একযোগে চলিতে পারে না। বলিতে পার, সহ্যগুণের সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেহ অল্প সুখদুঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহ বা তদুভয়ের গভীর বেগ হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে; অতএব ঠাকুরের সহ্যগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে? উত্তরে বলিতে পারা যায়, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর

অনুধাবন করিলেই উহা যে অসাধারণ ছিল, একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে; দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল অর্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাকিয়া যিনি স্থির থাকিতে পারেন, অতুল সম্পত্তি বারংবার পদে আসিয়া পড়িলে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহা ততোধিকবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—ঐরূপ কত কথাই না বলিতে পারা যায়—তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্যের কথা কি আবার বলিতে হইবে?

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঐ অবস্থাকে ব্যাধিজনিত ভাবিয়াছিল, সাধকেরা নহে

এই কালের ঘটনাবলীর অনুধাবনে দেখিতে পাওয়া যায়, কামকাঞ্চনোন্মত্ত বদ্ধ জীবের চক্ষেই তাঁহার পূর্বোক্ত অবস্থা ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। দেখা যায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে কল্পনাযুক্তিসহায়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিকভাবেও নির্ধারণ করিতে পারে, এমন কোন লোক ঐ কালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কারণ ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঠাকুরবাটীর মূর্খ লুব্ধ কর্মচারিগণ ঠাকুরের এই কালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহা প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে সমাগত সিদ্ধ ও সাধকগণ তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে এই কালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঐ বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ। ঠাকুরের নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, তাঁহারা তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্বন্ধে সর্বদা অতি উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন।

এই কালের কার্যকলাপ দেখিয়া ঠাকুরকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা চলে না

পরবর্তী কালের কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইব, ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় ঠাকুর যতক্ষণ না এককালে দেহবোধরহিত হইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত, তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন। পাঁচজনে বলিল, তাঁহার চিকিৎসা করানো হউক, তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন; কামারপুকুরে তাঁহার মাতার নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতে সম্মত হইলেন; বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না!—এরূপাবস্থায় উন্মত্তের কার্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাদির কেমন করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে?

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দিব্যোন্মাদ-অবস্থালাভের কাল হইতে ঠাকুর বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারসকল হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে যত্নবান হইলেও বহু লোক একত্র হইয়া যেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পূজাকীর্তনাদি করিতেছে, সেখানে যাইতে এবং তাহাদিগের সহিত যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বরাহনগরে ৺দশমহাবিদ্যাদর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ কথা বেশ বুঝা যায়। ঐসকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তাঁহার কখনো কখনো দর্শন-সম্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে আমরা অল্প অল্প যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, ঐসকল সাধকও তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

১২৬৫ সালে পানিহাটির মহোৎসবে বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ও ধারণা

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে (ইংরাজী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) পানিহাটি মহোৎসবদর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে পারি। উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণকে তিনি ঐদিন প্রথম দেখিয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, ঐ দিবস পানিহাটিতে গমন করিয়া তিনি শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করেন। বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিড়া,

মুড়কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার, উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিবার কালে তিনি পুনরায় দর্শনলাভের জন্য রানী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; এবং তিনি তখনো উৎসবক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার তিন-চারি বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে-সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।[6]

ঠাকুরের এই কালের অন্যান্য সাধন–'টাকা মাটি, মাটি টাকা'; অশুচিস্থান পরিষ্কার; চন্দন-বিষ্ঠায় সমজ্ঞান

এই চারি বৎসরের ভিতরেই আবার ঠাকুর মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দূর করিবার জন্য কয়েক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসদ্বিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করা যে ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে, সে মৃত্তিকার ন্যায় কাঞ্চন হইতেও ঐ বিষয়ে কোন সহায়তা লাভ করে না। সুতরাং তাঁহার নিকটে মৃত্তিকা ও কাঞ্চন উভয়ের সমান মূল্য। ঐ কথা দৃঢ় ধারণার জন্য তিনি বারংবার 'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা' বলিতে বলিতে কাঞ্চন লাভ করিবার বাসনার সহিত হস্তস্থিত মৃত্তিকা ও মুদ্রাসকল গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিয়াছিলেন। ঐরূপে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ ও অংশরূপে ধারণার জন্য কাঙালীদের ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণপূর্বক ভোজনস্থান পরিষ্কার করা–সকলের ঘৃণার পাত্র মেথর অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন, একথা ধারণাপূর্বক মন হইতে অভিমান অহঙ্কার পরিহারের জন্য অশুচি স্থান ধৌত করা–চন্দন হইতে বিষ্ঠা পর্যন্ত সকল পদার্থ পঞ্চভূতের বিকারপ্রসূত জানিয়া হেয়োপাদেয়জ্ঞান দূর করিবার জন্য জিহ্বার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা নির্বিকারচিত্তে স্পর্শ করা প্রভৃতি যে-সকল অশ্রুতপূর্ব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই কালে সাধিত হইয়াছিল। প্রথম চারি বৎসরের ঐসকল সাধন ও দর্শনের কথা অনুধাবন করিলে ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার মনে কি অসাধারণ আগ্রহ ঐকালে আধিপত্য করিয়াছিল এবং কি অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐসঙ্গে একথাও নিশ্চয় ধারণা হয় যে, অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সাহায্য না পাইয়া একমাত্র ব্যাকুলতাসহায়ে তিনি ঐকালের ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণদর্শনলাভপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং সাধনার চরম ফল করগত করিয়া গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ অপূর্ব প্রত্যক্ষসকল মিলাইতেই পরবর্তিকালে অগ্রসর হইয়াছিলেন!

পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দাঁড়ায়–ঠাকুরের মনের এই কালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত:

(১) সূক্ষ্মদেহে কীর্তনানন্দ

নিরন্তর ত্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূর্বক সাধক যখন নিজ মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া পবিত্র হয়, ঠাকুর বলিতেন, ঐ মনই তখন তাহার গুরু হইয়া থাকে। ঐরূপ শুদ্ধ মনে যে-সকল ভাবতরঙ্গ উঠিতে থাকে, সে-সকল বিপথগামী করা দূরে থাকুক, তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের আজন্ম পরিশুদ্ধ মন গুরুর ন্যায় পথ প্রদর্শন করিয়া সাধনার প্রথম চারি বৎসরেই তাঁহাকে ঈশ্বরলাভবিষয়ে সিদ্ধকাম করিয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, উহা তাঁহাকে ঐকালে কোন্ কার্য করিতে হইবে এবং কোনটি হইতে বিরত থাকিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক পৃথক এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয় প্রদর্শনপূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কৃতকার্যের ফলাফল জানাইয়া দিত! ঐ কালে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিতেন, শাণিতত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী দেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে

বলিতেছেন, "অন্য চিন্তাসকল পরিত্যাগপূর্বক ইষ্টচিন্তা যদি না করিবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!" অন্য এক সময়ে দেখিয়াছিলেন—ভোগবাসনাময় পাপপুরুষ শরীরমধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, ঐ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন! দূরস্থ দেবদেবীর মূর্তিদর্শনে অথবা কীর্তনাদিশ্রবণে অভিলাষী হইয়া ঐ সন্ন্যাসী যুবক কখনো কখনো ঐরূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ময় পথে ঐসকল স্থানে গমন করিতেন এবং কিয়ৎকাল আনন্দ উপভোগপূর্বক পুনরায় পূর্বোক্ত জ্যোতির্ময় বর্ত্ম-অবলম্বনে আসিয়া তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন!—ঐরূপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

(২) নিজ শরীরের ভিতরে যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন ও উপদেশ-লাভ

সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধ্যগত ঐ যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সকল কার্যের মীমাংসাস্থলে তাঁহার পরামর্শমতো চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সাধকজীবনের অপূর্ব অনুভব-প্রত্যক্ষাদির প্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি একদিন ঐ বিষয় আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বলিয়াছিলেন: "আমারই ন্যায় দেখিতে এক যুবক সন্ন্যাসিমূর্তি ভিতর হইতে যখন তখন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিত। সে ঐরূপে বাহিরে আসিলে কখনো সামান্য বাহ্যজ্ঞান থাকিত এবং কখনো বা উহা এককালে হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে এবং শুনিতে পাইতাম! তাহার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, সেইসকল তত্ত্বকথাই ব্রাহ্মণী, ন্যাংটা (শ্রীমৎ তোতাপুরী) প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম, তাহাই তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, শাস্ত্রবিধির মান্য রক্ষা করাইবার জন্যই তাঁহারা গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা ন্যাংটা প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

(৩) সিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন—উক্ত দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মীমাংসা

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ঐ বিষয়ক আর একটি অপূর্ব দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। শিবিকারোহণে কামারপুকুর হইতে সিহড় গ্রামে হৃদয়ের বাটীতে যাইবার কালে তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হয়। উহারই কথা এখন পাঠককে বলিব—সুনীল অম্বরতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, বিহগকূজিত শীতলছায়াময় অশ্বত্থবটবৃক্ষরাজি এবং মধুগন্ধ-কুসুম-ভূষিত তরুলতা প্রভৃতি অবলোকনপূর্বক প্রফুল্লমনে যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটি কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালক সহসা বহির্গত হইয়া বনপুষ্পাদির অন্বেষণে কখনো প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন, আবার কখনো বা শিবিকার সন্নিকটে আগমনপূর্বক হাস্য, পরিহাস, কথোপকথনাদি নানা চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপ আনন্দে বিহার করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিবস ঠাকুরের নিকটে ঐ দর্শনের বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি ঠিক দেখিয়াছ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন! সেইজন্যই তোমার ঐরূপ দর্শন হইয়াছিল।" হৃদয় বলিত, ঐকথা বলিয়া ব্রাহ্মণী চৈতন্য-ভাগবত হইতে নিম্নের শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন –

অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥
অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

উক্ত দর্শন হইতে যাহা বুঝিতে পারা যায়

আমরা এক দিবস তাঁহাকে ঐ দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐরূপ দেখিয়াছিলাম সত্য। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছিল, একথাও সত্য। কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলি, বল?" যাহা হউক, ঐসকল দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হয়, তিনি এই সময় হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, বহু প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীতে সুপরিচিত কোন আত্মা তাঁহার শরীরমনে আমিত্বাভিমান লইয়া প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছে! ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে যে অলৌকিক আভাস তিনি এখন পাইতেছিলেন, তাহাই কালে সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল–যিনি পূর্ব পূর্ব যুগে ধর্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্মাদর্শদানের জন্য নূতন শরীর পরিগ্রহপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, "যে রাম, যে কৃষ্ণ হইয়াছিল, সে-ই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছে–রাজা যেমন কখনো কখনো ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বহির্গত হয়, সেইরূপ গুপ্তভাবে সে এইবার পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে!"

ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখন মিথ্যা হয় নাই

পূর্বোক্ত দর্শনটির সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে ঠাকুর ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দর্শনটির কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার এই কালের অপর দর্শনসমূহের সত্যতাসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। কারণ, ঐরূপ দর্শনাদি আমাদের সময়ে ঠাকুরের জীবনে নিত্য উপস্থিত হইত এবং তাঁহার ইংরাজীশিক্ষিত সন্দেহশীল শিষ্যবর্গ ঐসকল পরীক্ষা করিতে যাইয়া প্রতিদিন পরাজিত ও স্তম্ভিত হইত। ঐ বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ[7] 'লীলাপ্রসঙ্গে'র অন্যত্র থাকিলেও পাঠকের তৃপ্তির জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত–১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্রের বাটীতে ৺দুর্গাপূজাকালে ঠাকুরের দর্শন-বিবরণ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৺শারদীয় পূজা-মহোৎসবে কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে, সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে বিশেষরূপে অনুভূত হইলেও উহার বাহ্যপ্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাহাদের আনন্দোল্লাস তাঁহার শরীরই এখন অসুস্থ–ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটি দ্বিতল বাটী[৪] ভাড়া করিয়া প্রায় মাসাবধি হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ব্যাধির উপশম এ পর্যন্ত কিছুমাত্র হয় নাই, উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমনপূর্বক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছে এবং যুবক-ছাত্র ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অন্য সময়ে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে; আবশ্যক বুঝিয়া কেহ কেহ তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এখানেই কাটাইতেছে।

অধিক কথা কহিলে এবং বারংবার সমাধিস্থ হইলে শরীরের রক্তপ্রবাহ ঊর্ধ্বে প্রবাহিত হইয়া ক্ষতস্থানটিকে নিরন্তর আঘাতপূর্বক রোগের উপশম হইতে দিবে না, চিকিৎসক ঐজন্য ঠাকুরকে ঐ উভয় বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিলেও ভ্রমক্রমে তিনি বারংবার উহার বিপরীত কার্য করিয়া বসিতেছেন। কারণ 'হাড়মাসের খাঁচা' বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীর হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সাধারণ মানবের ন্যায় তাহাকে পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইতেছেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠিলেই শরীর ও শরীররক্ষার কথা ভুলিয়া পূর্বের ন্যায় উহাতে যোগদানপূর্বক বারংবার সমাধিস্থ

হইয়া পড়িতেছেন! ইতঃপূর্বে তাঁহার দর্শন পায় নাই এইরূপ অনেক ব্যক্তিও উপস্থিত হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথসকল নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐ কার্যে তাঁহার নিরন্তর উৎসাহ-আনন্দ দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন; কেহ কেহ আবার নবাগত ব্যক্তিসকলকে কৃপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্মভাবপ্রচারের নিমিত্ত ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ উপায় কিছুকালের জন্য অবলম্বন করিয়াছেন—এইরূপ মত প্রকাশপূর্বক সকলকে নিঃশঙ্ক করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্ণে প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন যে, তন্ময় হইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইলেও বিদায়গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঐসকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখনো কখনো তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন, "আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে; তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত কোন কথা কহিও না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না; তোমার কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না—তোমার কাছে আসিলেই সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া দুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে পারি না; জানিতেই পারি না কোন্ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল! সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহিও না; কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।" (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্য)।

ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—যাঁহাকে তিনি কখনো কখনো 'সুরেশ মিত্র' বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্বে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু একবার বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় অনেক দিন বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্যন্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই; আবার কেহ ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অপর সকলে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ দৈববিঘ্নের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। বাটীর সকলে নানা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে এ বৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতাবশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজার অল্পদিন পূর্বে দুই-একজন পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনিই ঐজন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটীর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সপ্তমীপূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তারবাবুর অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিলেন। সেই দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারকে সঙ্গীতের ভাবার্থ মৃদুস্বরে বুঝাইয়া দিতে এবং কখনো বা অল্পক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন।

ঐরূপে প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জমজম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে-সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি স্বামীজীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিলেন, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেইজন্য ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! সন্ধিক্ষণের কথা না জানিয়া সহসা এই

সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ন হওয়া অল্প বিচিত্র নহে!' প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায়গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে সমাধিকালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বলিতে লাগিলেন– "এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা', 'মা' বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।"

অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে ঠাকুর যে স্থানে বলিয়াছিলেন, সে স্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং তাঁহার যখন সমাধি হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে 'মা', 'মা' বলিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্যঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন!

রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু ভ্রমধারণাবশতঃ ঠাকুরকে যেভাবে পরীক্ষা করেন

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের কোন সময়ে রানী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরামোহন ভাবিয়াছিলেন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের জন্য ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্যভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তাঁহারা লছমীবাই-প্রমুখ হাবভাবসম্পন্না সুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার-পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐসকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা', 'মা' বলিতে বলিতে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মাঙ্গের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল! ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাঁহার বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া ঐসকল নারীর হৃদয়ে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যভঙ্গে প্রলোভিত করিতে যাইয়া অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজলনয়নে তাঁহার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাঁহাকে বারংবার প্রণামপূর্বক তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিয়াছিল।

[1] Enlargement of the Coccyx.

[2] অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী–অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা॥
অশোকং বহ্নিদিক্‌স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরী।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥
ইতি – স্কন্দপুরাণ

[3] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

[4] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

[5] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, প্রথম অধ্যায়।

[6] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, প্রথম অধ্যায়।

[7] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।

[8] গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাটী।

২.১১. নবম অধ্যায়: বিবাহ ও পুনরাগমন

ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন

এদিকে ঠাকুর পূজাকার্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ কামারপুকুরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পৌঁছিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে বায়ুরোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং শ্রীযুত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটিমাত্র দুর্ঘটনায় উহার পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের দুঃখ চারিদিক হইতে উপর্যুপরি আসিয়া তাহার জীবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে—ইঁহাদিগের জীবনে এখন ঐরূপ হইল। গদাধর চন্দ্রাদেবীর পরিণত বয়সে প্রাপ্ত আদরের কনিষ্ঠ পুত্র-সন্তান ছিলেন। সুতরাং শোকে দুঃখে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার উদাসীন, চঞ্চল ভাব ও 'মা', 'মা' রবে কাতর ক্রন্দনে নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া প্রতিকারের নানারূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঔষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তখন সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন বা কার্তিক মাস হইবে।

ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আত্মীয়দিগের ধারণা

বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর সময়ে সময়ে পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ থাকিলেও মধ্যে মধ্যে 'মা', 'মা' রবে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন এবং কখনো কখনো ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। তাঁহার চালচলন-ব্যবহারাদি কখনো সাধারণ মানবের ন্যায় এবং কখনো উহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইত। ঐ কারণে এখন তাঁহাতে সত্য, সরলতা, দেব ও মাতৃভক্তি এবং বয়স্য-প্রেমের একদিকে যেমন প্রকাশ দেখা যাইত, অপর দিকে তেমনি সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীনতা, সাধারণের অপরিচিত বিষয়বিশেষ লাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়শূন্য হৃদয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দাম চেষ্টা সতত লক্ষিত হইত। লোকের মনে উহাতে তাঁহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন।

ওঝা আনাইয়া চণ্ড নামান

ঠাকুরের মাতা সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণে পূর্বোক্ত কথা ইতঃপূর্বে কখনো কখনো উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও ঐরূপ আলোচনা করিতেছে শুনিয়া তিনি পুত্রের কল্যাণের জন্য ওঝা আনাইতে মনোনীত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল; বলিল, যদি ভূত হয় তো পলাইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুই হইল না! পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামাইল। চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণপূর্বক প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বলিল, 'উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি হয় নাই!'—পরে সকলের সমক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপারি খাও কেন? অধিক সুপারি খাইলে কামবৃদ্ধি হয়!' ইতঃপূর্বে সত্যই আমি সুপারি খাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং যখন তখন খাইতাম; চণ্ডের কথাতে উহা তদবধি ত্যাগ করিলাম!" ঠাকুরের বয়স তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়বর্গের কথা

কামারপুকুরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার অদ্ভুত দর্শনাদি বারংবার লাভ করিয়াই তিনি এখন শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের অনেক কথা আমরা তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি। তাহাতেই আমাদিগের মনে ঐরূপ ধারণা হইয়াছে। অতঃপর ঐসকল কথা আমরা পাঠককে বলিব।

ঐ কালে ঠাকুরের যোগ বিভূতির কথা

কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত 'ভূতির খাল' এবং 'বুধুই মোড়ল' নামক শ্মশানদ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেক ভাগ তিনি একাকী অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাশের কথাও তাঁহার আত্মীয়েরা এই কালে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নিকটে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত শ্মশানদ্বয়ে অবস্থিত শিবা এবং উপদেবতাদিগকে তিনি এই সময়ে

মধ্যে মধ্যে বলি প্রদান করিতেন। নূতন হাঁড়িতে মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণপূর্বক ঐ স্থানদ্বয়ে গমন করিয়া বলি নিবেদন করিবামাত্র শিবাসমূহ দলে দলে চারিদিক হইতে আসিয়া উহা খাইয়া ফেলিত এবং উপদেবতাদিগকে নিবেদিত আহার্যপূর্ণ হাঁড়িসকল বায়ুভরে ঊর্ধ্বে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত! ঐসকল উপদেবতাকে তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে কোন কোন দিন গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বর শ্মশানের নিকটে যাইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুর উহাতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, "যাচ্চি গো, দাদা; তুমি এদিকে আর অগ্রসর হইও না, তাহা হইলে ইহারা (উপদেবতারা) তোমার অপকার করিবে।" ভূতির খালের পার্শ্বস্থ শ্মশানে তিনি এই সময়ে একটি বিল্ববৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল, তাহার তলে বসিয়া অনেক সময় জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়বর্গের ঐসকল কথায় বুঝিতে পারা যায়, জগদম্বার দর্শনলালসায় তিনি ইতঃপূর্বে যে বিষম অভাব প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কতকগুলি অপূর্ব দর্শন ও উপলব্ধিদ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহার এই কালের জীবনালোচনা করিয়া মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার অসি-মুণ্ডধরা বরাভয়করা সাধকানুগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মূর্তির দর্শন তিনি এখন প্রায় সর্বদা লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যখন যাহা প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার উত্তর পাইয়া তদনুযায়ী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতে তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাধামাত্রশূন্য নিরন্তর দর্শন তাঁহার ভাগ্যে অচিরে উপস্থিত হইবে।

ভবিষ্যৎ-দর্শনরূপ বিভূতির প্রকাশও এই কালে ঠাকুরের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয়রাম এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা ঐ কথার ইঙ্গিত কখনো কখনো পাইয়াছি। নিম্নলিখিত ঘটনাবলী হইতে পাঠক উহা বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আত্মীয়বর্গের বিবাহদানের সঙ্কল্প

ঠাকুরের ব্যবহার ও কার্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার মাতা প্রভৃতির ধারণা হইয়াছিল, দৈবকৃপায় তাঁহার বায়ুরোগের এখন অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করেন এবং প্রায় সকল বিষয়ে জনসাধারণের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। সর্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়া থাকা, শ্মশানে বিচরণ করা, পরিধেয় বসন ত্যাগপূর্বক কখনো কখনো ধ্যানপূজাদির অনুষ্ঠান এবং ঐ বিষয়ে কাহারও নিষেধ না মানা প্রভৃতি কয়েকটি ব্যবহার অনন্যসাধারণ হইলেও, তিনি চিরকাল করিতেন বলিয়া ঐসকলে তাঁহারা বায়ুরোগের পরিচয় পাইবার কারণ দেখেন নাই। কিন্তু সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা এবং নিরন্তর উন্মনা ভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা এখনো বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পূর্বোক্ত ভাবটা যতদিন না প্রশমিত হইতেছে, ততদিন বায়ুরোগে পুনরাক্রান্ত হইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—একথা তাঁহাদের মনে পুনঃপুনঃ উদিত হইত। উহার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ এখন উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার পরামর্শ স্থির করিলেন। কারণ, সদ্বংশীয়া সুশীলা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে তাঁহার মন নানা বিষয়ে সঞ্চরণ না করিয়া নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধনেই রত থাকিবে।

গদাধরের বিবাহে সম্মতিদানের কথা

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর-আপত্তি করে, এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর গদাধরের কিন্তু ঐ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালকবালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয়া থাকে তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে নিবেদন করিয়া ঐ বিষয়ে কিংকর্তব্য জানিয়াই কি তিনি আনন্দপ্রকাশ

করিয়াছিলেন, অথবা বালকের ন্যায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও চিন্তারাহিত্যই তাঁহার ঐরূপ করিবার কারণ? পাঠক দেখিতে পাইবেন, আমরা ঐ সম্বন্ধে অন্যত্র যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। [1]

বিবাহের জন্য ঠাকুরের পাত্রীনির্বাচন

যাহা হউক, চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। যে কয়েকটি পাওয়া গেল, তাহাদের পিতামাতা অত্যধিক পণ যাচ্ঞা করায় রামেশ্বর ঐসকল স্থানে ভ্রাতার বিবাহ দিতে সাহস করিলেন না। ঐরূপে বহু অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন, তখন ভাবাবিষ্ট হইয়া গদাধর এক দিবস তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"অন্যত্র অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া রক্ষিতা আছে!" [2]

বিবাহ

ঐ কথায় বিশ্বাস না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা ঐ স্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহা হউক পাত্রী কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঐরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ধানলাভে চন্দ্রাদেবী ঐ স্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন এবং অল্পদিনেই সকল বিষয়ের কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল। অনন্তর শুভদিনে শুভমুহূর্তে শ্রীযুত রামেশ্বর কামারপুকুরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

বিবাহের পরে শ্রীমতী চন্দ্রমণি এবং ঠাকুরের আচরণ

গদাধরের বিবাহ দিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমণি অনেকটা নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন। বিবাহবিষয়ে তাঁহার নিয়োগ পুত্রকে সম্পন্ন করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেবতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। উন্মনা পুত্র গৃহে ফিরিল, সদ্বংশীয়া পাত্রী জুটিল, অর্থের অনটনও অচিন্তনীয়ভাবে পূর্ণ হইল; অতএব দৈব অনুকূল নহেন, একথা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? সুতরাং সরলহৃদয়া ধর্মপরায়ণা চন্দ্রাদেবী যে এখন কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রমরক্ষা করিবার জন্য জমিদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, কয়েক দিন পরে ঐগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্যচিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, "আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল?" চন্দ্রাদেবী তাহাতে সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন, "মা! গদাধর তোমাকে ঐসকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কারসকল ইহার পর কত দিবে!" এইখানেই কিন্তু ঐ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার খুল্লতাত তাহাকে ঐদিন দেখিতে আসিয়া ঐকথা জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্বক ঐদিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতার মনে ঐ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গদাধর তাঁহার ঐ দুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "উহারা এখন যাহাই বলুক ও করুক না, বিবাহ তো আর ফিরিবে না!"

ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন

বিবাহের পর ঠাকুর প্রায় এক বৎসর সাত মাস কাল কামারপুকুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়া কলিকাতায় ফিরিলে পুনরায় তাঁহার বায়ুরোগ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। যাহা হউক, সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথানুসারে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে গমনপূর্বক শুভদিন দেখিয়া পত্নীর সহিত একত্রে কামারপুকুরে আগমন করিতে হইয়াছিল। ঐরূপে 'জোড়ে' আসিবার অনতিকাল পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মাতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে কামারপুকুরে আরও কিছুকাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব-অনটনের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। ঐ কারণে তাঁহাদিগের কথা না শুনিয়া তিনি কালীবাটীতে ফিরিয়া পূর্ববৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দিব্যোন্মাদ অবস্থা

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েকদিন পূজা করিতে না করিতেই তাঁহার মন ঐ কার্যে এত তন্ময় হইয়া যাইল যে, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, অনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের সকল কথা তাঁহার মনের এক নিভৃত কোণে চাপা পড়িয়া গেল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকল সময়ে সকলের মধ্যে কিরূপে দেখিতে পাইবেন—এই বিষয়ই উহার সকল স্থল অধিকার করিয়া বসিল। দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাঁহার বক্ষ পুনরায় সর্বক্ষণ আরক্তিম ভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নয়নকোণ হইতে নিদ্রা যেন দূরে কোথায় অপসৃত হইল! তবে, শারীরিক ও মানসিক ঐপ্রকার অবস্থা ইতঃপূর্বে একবার অনুভব করায় তিনি উহাতে পূর্বের ন্যায় এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুরবাবুর নির্দেশে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ ঠাকুরের বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা ও গাত্রদাহাদি রোগের উপশমের জন্য এই কালে নানাপ্রকার ঔষধ ও তৈল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না পাইলেও, হৃদয় নিরাশ না হইয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের কলিকাতাস্থ ভবনে উপস্থিত হইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন ঐরূপে গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং বিশেষরূপে পরীক্ষাপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূর্ববঙ্গীয় অন্য একজন বৈদ্যও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোগের লক্ষণসকল শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগজ ব্যাধি; ঔষধে সারিবার নহে।' [3] ঐ বৈদ্যই ব্যাধির ন্যায় প্রতীয়মান আমার শারীরিক বিকারসমূহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখন তাঁহার কথায় আস্থা প্রদান করে নাই।" ঐরূপে মথুরবাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধুবর্গ তাঁহার অসাধারণ ব্যাধির জন্য চিন্তান্বিত হইয়া নানারূপে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম হয় নাই।

চন্দ্রাদেবীর হত্যাদান

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌঁছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ৺মহাদেবের নিকট হত্যা দিবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের 'বুড়ো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাঁহারই মন্দিরপ্রান্তে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। 'মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে'—তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং ঐ স্থানে গমনপূর্বক পুনরায় প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইতঃপূর্বে কামনাপূরণের জন্য কেহ হত্যা দিত না। প্রত্যাদিষ্টা বৃদ্ধা উহা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দুই-তিন দিন পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জ্বলজ্জটাসুশোভিত বাঘাম্বরপরিহিত রজতদলিতকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানপূর্বক বলিতেছেন—'ভয় নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, ঐশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে!' ধর্মপরায়ণা বৃদ্ধা ঐরূপ দেবাদেশলাভে আশ্বস্তা হইয়া ভক্তিপূতচিত্তে

শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা দিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুত্রের মানসিক বিকার শান্তির জন্য কুলদেবতা ৺রঘুবীর ও ৺শীতলামাতার একমনে সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি অনেক নরনারী প্রতি বৎসর হত্যা দিয়া সফলকাম হইতেছে।

ঠাকুরের এই কালের অবস্থা

ঠাকুর তাঁহার এই কালের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আমাদিগকে কত সময় বলিয়াছেন—"আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর-মনে ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক, উহার এক-চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীরত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ মার কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না! কত কাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে, এ কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু-আধটু দৃষ্টি পড়িত, তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কিনা। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত। ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হলো? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা হবার হকগে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িসনি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই!' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্‌ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম!"

মথুরবাবুর ঠাকুরকে শিব-কালীরূপে দর্শন

শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুরবাবু এই সময়ে একদিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্‌ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্তি সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।[4] ঐ দিন হইতে তিনি যেন দৈবশক্তিপ্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সর্বদা ভক্তিবিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐরূপ অঘটন-ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আনুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা তাঁহাদিগের উভয়কে অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদী, জড়বাদী ও নাস্তিক্যপ্রবণ বর্তমান যুগে ধর্মগ্লানি দূর করিয়া জীবন্ত অধ্যাত্মশক্তি-সংক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীরমনরূপ যন্ত্রটিকে শ্রীশ্রীজগদম্বা কত যত্নে ও কি অদ্‌ভুত উপায়-অবলম্বনে নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐরূপ ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

[1] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।

[2] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।

[3] কেহ কেহ বলেন, ৺গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদই ঠাকুরকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

[4] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

২.১২. দশম অধ্যায়: ভৈরবী-ব্রাহ্মণী-সমাগম

রাণী রাসমণির সাংঘাতিক পীড়া

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে ঠাকুরের জীবনে দুইটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়। ঘটনা দুইটি তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। সেজন্য উহাদের কথা আমাদিগের আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে রানী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, রানী ঐ সময়ে একদিন সহসা পড়িয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া উক্ত রোগের সঞ্চার করে। ব্যাধি স্বল্পকালমধ্যে সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিয়াছিল।

রাণীর দিনাজপুরের সম্পত্তি দেবোত্তর করা ও মৃত্যু

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, সন ১২৬২ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের ৩১ তারিখ বৃহস্পতিবার রানী দক্ষিণেশ্বরে দেবী-প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরবাটীর ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি ঐ বৎসর ১৪ ভাদ্র, ইংরাজী ২৯ আগস্ট তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারি দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।[1] কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প থাকিলেও এতদিন তিনি ঐ সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দেবোত্তরে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া উহা করিবার জন্য তিনি এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রানীর চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয় শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা দাসীই উপস্থিত ছিলেন। দানপত্র সম্পন্ন করিবার কালে তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উক্ত সম্পত্তির অযথা নিয়োগের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার মানসে নিজ কন্যাদ্বয়কে দেবোত্তর করিবার সম্মতি প্রদানপূর্বক ভিন্ন এক অঙ্গীকারপত্র সহি করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বা উক্ত পত্রে সহি প্রদান করিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি বহু অনুরোধেও উহাতে সহি দিলেন না। সেজন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রানী শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া রানী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে দেবোত্তর-দানপত্রে সহি করিলেন[2] এবং ঐ কার্য সমাধা করিবার পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাত্রিকালে শরীরত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

শরীররক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন

ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্বে রানী রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা রহিয়াছে দেখিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোশনাই আর ভাল লাগছে না, এখন আমার মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "মা, এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না–কি হবে, মা?" ঐ কথার উত্তরপ্রদান করিয়াই যেন শিবাকুল ঐ সময়ে চারিদিক হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রানী শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশঙ্কা করেন তাহাই হইতে বসিয়াছে

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রানী রাসমণির দৌহিত্রগণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদ-বিসংবাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়–তীক্ষ্নদৃষ্টিসম্পন্না রানী তাঁহার প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে না বলিয়া কেন এত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিন্তার যন্ত্রণা মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট তীব্রতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজপত্রে দেখা যায়, ঐসকল মকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে।[3] কে বলিবে, রানী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীর্তি ঐ বিবাদের ফলে নামমাত্রে পর্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না!

মথুরবাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার বন্দোবস্ত

রানীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্যপরিচালনায় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার কাল হইতে তিনি কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ব্যয় বুঝিয়া লইয়া রানীর ইচ্ছামত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুতরাং রানীর মৃত্যুর পরে তিনিই দেবসেবা-সংক্রান্ত সকল কার্য পূর্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র প্রভাবে দেবতাভক্তি মথুরামোহনের অন্তরে বিশেষ অধিকার বিস্তার করায় দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা রানীর মৃত্যুতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

মথুরবাবুর উন্নতি ও আধিপত্য ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্য

ঠাকুরের সহিত মথুরবাবুর বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতঃপূর্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি; অতএব এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুরের জীবনে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে রানী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও কালীবাটী-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্যলাভরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, ভক্তিমান মথুর তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনে হয়, মথুরের উক্ত আধিপত্যলাভ যেন ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ দেখা যায়, দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করাই এখন হইতে তাঁহার নিকটে সর্বপ্রধান কার্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল সমভাবে এক বিষয়ে বিশ্বাসী থাকিয়া উচ্চভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভবপর হয়। অতএব রানীর বিপুল বিষয়ে একাধিপত্যলাভপূর্বক বিপথগামী না হইয়া মথুরামোহন যে ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখন হইতে দীর্ঘ একাদশ বৎসরকাল তাঁহার সেবায় আপনাকে সমভাবে নিযুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পরম ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতরসাধারণের ও মথুরের ধারণা

ঈশ্বরসাধক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার অসাধারণ উচ্চতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে পারে নাই। মানবসাধারণ তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কারণ, তাহারা দেখিয়াছিল, তিনি সর্বপ্রকার পার্থিব ভোগসুখলাভে পরাঙ্মুখ হইয়া তাহাদিগের বুদ্ধির অগোচর একটা অনির্দিষ্ট ভাবে বিভোর থাকিয়া কখনো 'হরি', কখনো 'রাম', এবং কখনো বা 'কালী', 'কালী' বলিয়া দিন কাটাইয়া দেন! আবার রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া কত লোক ধনী হইয়া যাইল, তিনি কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সুনয়নে পড়িয়াও আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য উন্মাদ ভিন্ন অপর কি হইবেন? একথা কিন্তু সকলে বুঝিয়াছিল যে, সাংসারিক সকল বিষয়ে অকর্মণ্য হইলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপূর্ব চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে, সুললিত বাক্যবিন্যাসে এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে তাহারা যে-সকল ধনী মানী পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সেইসকল লোকের সম্মুখে ইনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া উপস্থিত হন এবং অচিরে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠেন! ইতরসাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুরবাবু কিন্তু এখন অন্যরূপ ভাবিতেন। মথুরামোহন বলিতেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।"

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন

রানী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটি বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপর এই কালে বিচিত্র পুষ্পকানন ছিল। সযত্ন-রক্ষিত ঐ উদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্পসম্ভারে ভূষিত হইয়া বৃক্ষলতাদি তখন বিচিত্র শোভা বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা না করিলেও ঠাকুর এই সময়ে নিত্য ঐ কাননে পুষ্পচয়ন করিতেন এবং

মাল্যরচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনি-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য একটি বাঁধাঘাট ও নহবতখানা অদ্যাপি বর্তমান। বাঁধাঘাটটির উপরে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায় লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দেশ করিত।

ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং গৈরিকবস্ত্রপরিহিতা আলুলায়িত-দীর্ঘকেশা ভৈরবীবেশধারিণী এক সুন্দরী রমণী উহা হইতে অবতরণপূর্বক দক্ষিণেশ্বর ঘাটের চাঁদনির দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রৌঢ়া হইলেও যৌবনের সৌন্দর্যাভাস তাঁহার শরীরকে তখনো ত্যাগ করে নাই। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি ছিল। নিকট আত্মীয়কে দেখিলে লোকে যেরূপ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে চাঁদনি হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশে ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার নাম করিয়া বলিলেই আসিবে।" হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক হইয়াছিল। কারণ তাঁহাকে ঐরূপ আচরণ করিতে সে ইতঃপূর্বে কখনো দেখে নাই।

উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া হৃদয় চাঁদনিতে যাইয়া দেখিল ভৈরবী ঐ স্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন। সে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ কথা শুনিয়া ভৈরবী কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া সে অধিকতর বিস্মিত হইল।

প্রথম দর্শনে ভৈরবী ঠাকুরকে যাহা বলেন

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং সজলনয়নে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, এতদিনে দেখা পাইলাম!" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে, মা?" ভৈরবী বলিলেন, "তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, একথা ৶জগদম্বার কৃপায় পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুই জনের দেখা পূর্ব (বঙ্গ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।"

ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমালাপ

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বালক যেমন অন্তরের কথা জননীর নিকটে সানন্দে প্রকাশ করে, সেইরূপ নিজ অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা, শারীরিক বিকার প্রভৃতি জীবনে নিত্য অনুভূত বিষয়সকল তাঁহাকে বলিতে বলিতে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হ্যাঁগা, আমার এসকল কি হয়? আমি কি সত্যই পাগল হইলাম? জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়া সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হইল?" ভৈরবী তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখনো উত্তেজিতা, কখনো উল্লসিতা, এবং কখনো করুণার্দ্রহৃদয় হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানের জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার ইহা পাগলামি নয়, তোমার মহাভাব হইয়াছে, সেইজন্যই ঐরূপ অবস্থাসকল হইয়াছে ও হইতেছে। তোমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? সেইজন্য ঐ প্রকার বলে। ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছিল শ্রীমতী রাধারানীর; ঐ প্রকার হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর! এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার নিকটে যে-সকল পুঁথি আছে, তাহা হইতে আমি পড়িয়া দেখাইব, ঈশ্বরকে যাঁহারা একমনে ডাকিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই ঐরূপ অবস্থাসকল হইয়াছে ও হয়।" ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরূপে পরমাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর দেবীর প্রসাদী ফলমূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্রস্বরূপে তাঁহাকে পূর্বে না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া স্বয়ং ঐসকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীরশিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা, চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

পঞ্চবটীতে ভৈরবীর অপূর্ব দর্শন

রন্ধন শেষ হইলে ৺রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইয়া অভূতপূর্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঠাকুর ঐ সময়ে প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া অর্ধবাহ্য অবস্থায় সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দৈবশক্তিবলে পূর্ণাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণী-নিবেদিত খাদ্যসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐপ্রকার কার্যকলাপ নিজ দর্শনের সহিত মিলাইয়া পাইয়া আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিলেন এবং নিজকৃত কার্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, "কে জানে বাপু, আত্মহারা হইয়া কেন এইরূপ কার্যসকল করিয়া বসি!" ব্রাহ্মণী তখন জননীর ন্যায় তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, "বেশ করিয়াছ, বাবা; ঐরূপ কার্য তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে যিনি আছেন তিনি করিয়াছেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, কে ঐরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি, আর আমার পূর্বের বাহ্যপূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা এতদিনে সার্থক হইয়াছে!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া দেবপ্রসাদস্বরূপে উক্ত ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৺রঘুবীরের জীবন্ত দর্শনলাভপূর্বক প্রেমগদ্‌গদচিত্তে বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালপূজিত নিজ রঘুবীরশিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিলেন।

পঞ্চবটীতে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর এবং ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের প্রতি অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়া সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে দিনের পর দিন কোথা দিয়া যাইতে লাগিল, উভয়ের মধ্যে কাহারও তাহা অনুভবে আসিল না! নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসম্বন্ধীয় রহস্যকথাসকল অকপটে বলিয়া ঠাকুর নিত্য নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভৈরবী তন্ত্রশাস্ত্র হইতে ঐসকলের সমাধান করিয়া অথবা ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগে অবতারপুরুষদিগের দেহমনে কিরূপ লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়, ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে তদ্বিষয় পাঠ করিয়া ঠাকুরের সংশয়সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীতে ঐরূপে কয়েক দিবস দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল।

ভৈরবীর দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থানের কারণ

ছয়-সাত দিন ঐরূপে কাটিবার পরে ঠাকুরের মনে হইল ব্রাহ্মণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কামকাঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে না পারিয়া পবিত্রা রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা রটনার অবসর পাইবে। ব্রাহ্মণীকে উহা বলিবামাত্র তিনি ঐ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং গ্রামমধ্যে নিকটে কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছুকালের জন্য আসিয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া যাইবার সঙ্কল্প স্থিরপূর্বক কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

কালীবাটীর উত্তরে ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর-গ্রামস্থ দেবমণ্ডলের ঘাটে আসিয়া ব্রাহ্মণী বাস করিতে লাগিলেন[4] এবং গ্রামমধ্যে পরিভ্রমণপূর্বক রমণীগণের সহিত আলাপ করিয়া স্বল্পদিনেই তাহাদিগের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এখানে তাঁহার বাস ও ভিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ অসুবিধা রহিল না এবং লোকনিন্দার ভয়ে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভে তাঁহাকে একদিনের জন্যও

বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত কথাবার্তায় কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং গ্রামস্থ রমণীগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহপূর্বক মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।[5]

ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিয়া ধারণা কিরূপে হয়

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীর ইতঃপূর্বে মনে হইয়াছিল, অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেমেই তাঁহার অলৌকিক দর্শন ও অবস্থাসকল উপস্থিত হইয়াছে। এখন ভগবদালাপে, তাঁহার ভাবসমাধিতে মুহুর্মুহুঃ বাহ্যচৈতন্যলোপ ও কীর্তনে পরমানন্দ দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল–ইনি কখনই সামান্য সাধক নহেন। চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতাদি গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীরধারণপূর্বক আগমনের যে-সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর স্মৃতিপথে সেই সকল কথা পুনঃপুনঃ উদিত হইতে লাগিল। বিদুষী ব্রাহ্মণী ঐসকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সেই সকলের সহিত ঠাকুরের আচার-ব্যবহার ও অলৌকিক প্রত্যক্ষাদি মিলাইয়া সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার ঈশ্বর-বিরহ-বিধুর শ্রীচৈতন্যদেবের গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে স্রুক্‌চন্দনাদি যে-সকল পদার্থের ব্যবহারে উহা প্রশমিত হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহ প্রশমনের জন্য ঐ-সকলের প্রয়োগ করিয়া তিনি তদ্রূপ ফল পাইলেন।[6] সুতরাং তাঁহার মনে এখন হইতে দৃঢ় ধারণা হইল, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সিহড় গ্রামে যাইবার কালে ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবয়স্ক দুই জনকে যেরূপ বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতঃপূর্বে বলিয়াছি।[7] ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাসবর্তিনী হইয়া বলিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব!"

উদাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না, প্রাণ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা প্রকাশে লোকের নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইতে হইবে, এ আশঙ্কা রাখিতেন না। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা তিনি সকলের সম্মুখে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হয়েন নাই। শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুরবাবুর সহিত বসিয়াছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরামোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে-সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে। তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিনি যাহাই বলুন না, বাবা, অবতার তো আর দশটির অধিক নাই? সুতরাং তাঁহার কথা সত্য হইবে কেমন করিয়া? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হইয়াছে, এ কথা সত্য।"

মথুরের সম্মুখে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি?" ঠাকুর স্বীকার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন–ব্রাহ্মণী কোথা হইতে এক থালা মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরানী যশোদা যেভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেইভাবে তন্ময় হইয়া অন্যমনে তাঁহাদিগের দিকে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুরবাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি যত্নপূর্বক আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নের থালাটি প্রদান করিলেন। তখন মথুরবাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো! তুমি আমাকে যাহা বল সেই সব কথা আজ ইঁহাকে বলিতেছিলাম, ইনি বলিলেন, 'অবতার তো দশটি ছাড়া আর নাই'।" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয়

অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, “কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা বলিবার পরে ভগবান ব্যাস শ্রীহরির অসংখ্য বার অবতীর্ণ হইবার কথা বলিয়াছেন তো? বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার শরীর-মনে প্রকাশিত লক্ষণসকলের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।” ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজপক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মথুরামোহন নীরব রহিলেন।

পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কারণ

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর সকলেই জানিতে পারিল এবং উহা লইয়া একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। উহার ফলাফল আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।[৪] ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে সহসা দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষসকলে কিরূপ মতামত প্রদান করেন, তাহা জানিতে উৎসুক হইয়া তিনি বালকের ন্যায় মথুরামোহনকে ঐ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ অনুরোধের ফলেই বৈষ্ণবচরণপ্রমুখ পণ্ডিতসকলের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকটে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি।[9]

[1] Plaint in High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of Endowment executed by Rani Rasmani – “According to my late husband’s desire *** I on 18th Jaistha, 1262 B.S. (31st May, 1855) established and consecrated the Thakurs ..and for purpose of carrying on the Sheba purchased three lots of Zemindaris in District Dinajpur on 14th Bhadra, 1262 B.S. (29 August, 1855) for Rs. 2,26,000.”

[2] The Deed of Endowment, dated 18 February, 1861 was executed by Rani Rasmani; she acknowledged her execution of the same before J. F. Watkins, Solicitor, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 47 of 1867, Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni and in the High Court Suit No. 308 of 1872, Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No. 308) was revived after contest on 19 July, 1888.

[3] Debt due on mortgage by the Estate is Rs. 50,000; interest payable quarterly is Rs. 876-0-0; Costs of the Referee already stated amount to Rs. 20,000, as yet untaxed.

[4] হৃদয় বলিত, দেবমণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই ব্রাহ্মণীকে প্রদানপূর্বক মণ্ডলদের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। তথায় যাইবামাত্র ৺নবীনচন্দ্র নিয়োগীর ধর্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং ঘাটের চাঁদনিতে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার অনুমতিসহ একখানি তক্তপোশ, চাল, ডাল, ঘি ও অন্যান্য ভোজনসামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।

[5] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়।

[6] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়।

[7] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়।

[8] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় এবং উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়।

[9] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়।

২.১৩. একাদশ অধ্যায়: ঠাকুরের তন্ত্রসাধন

সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টি ব্রাহ্মণীকে ঠাকুরের অবস্থা যথাযথরূপে বুঝাইয়াছিল

কেবলমাত্র তর্কযুক্তিসহায়ে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্থির করেন নাই। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ তিন ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দর্শন করিবার বহু পূর্বে তিনি ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নপূর্বক স্বল্প পরিচয়েই ঠাকুরকে ঐরূপে বুঝিতে সহায়তা করিয়াছিল। আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত তিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে ঠাকুরকে কিভাবে কতদূর সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টাতেই তিনি এখন কালক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রপথাবলম্বনে সাধনসকলের অনুষ্ঠানপূর্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ প্রসন্নতার অধিকারী হইয়া ঠাকুর যাহাতে দিব্য ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইয়াছিলেন।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর তন্ত্রসাধন করিতে বলিবার কারণ

গুরু-পরম্পরাগত শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনপথ অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র অনুরাগ-সহায়ে ঈশ্বরদর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই ঠাকুর নিজ উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিতেছেন না, প্রবীণা সাধিকা ব্রাহ্মণীর একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। নিজ অপূর্ব প্রত্যক্ষসকলকে মস্তিষ্কবিকৃতির ফল বলিয়া এবং শারীরিক বিকারসমূহ ব্যাধির জন্য উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যে সন্দেহ ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে মুহ্যমান করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে নির্মুক্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণী এখন তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গ অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কারণ সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া এবং অনুষ্ঠানসহায়ে স্বয়ং ঐরূপ ফলসমূহ লাভ করিয়া তাঁহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, সাধনাসহায়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ উচ্চতর ভূমিসমূহে যত আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের উপলব্ধি হয়। ফলে ইহা দাঁড়াইবে যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি ঐ সকলকে সত্য ও অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র ঐজন্য সাধককে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ জীবনের অনুভবসকলকে মিলাইয়া অনুরূপ হইল কিনা, দেখিতে বলিয়াছেন।

অবতার বলিয়া বুঝিয়াও ব্রাহ্মণী কিরূপে ঠাকুরকে সাধনায় সহায়তা করিয়াছিলেন

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতারপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া ব্রাহ্মণী কোন্ যুক্তিবলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে উদ্যত হইলেন? ঐশমহিমাসম্পন্ন অবতারপুরুষকে সর্বতোভাবে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার অনাবশ্যকতা সর্বদা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐপ্রকার মহিমা বা ঐশ্বর্যজ্ঞান ব্রাহ্মণীর মনে সর্বদা সমুদিত থাকিলে তাঁহার মানসিক ভাব বোধ হয় ঐরূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতে ব্রাহ্মণী অপত্যনির্বিশেষে ঠাকুরকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং ঐশ্বর্যজ্ঞান ভুলাইয়া প্রিয়তমের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত করাইতে ভালবাসার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে নাই। অতএব বুঝা যায়, অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। দেব-মানব, অবতারপুরুষসকলের জীবনালোচনায় আমরা সর্বত্র ঐরূপ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাদিগের অলৌকিক ঐশ্বর্যজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইলেও পরক্ষণে উহা ভুলিয়া যাইতেছেন এবং প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অন্য সাধারণের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞানে তাঁহাদের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত হইতেছেন! অতএব অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রকাশ-দর্শনে সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের

অকৃত্রিম ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা ব্রাহ্মণীর হৃদয়নিহিত কোমলকঠোর মাতৃস্নেহকে উদ্বেলিত করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে এবং ঠাকুরকে সুখী করিবার জন্য সকল বিষয়ে সহায়তা করিতে সতত অগ্রসর করিত।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর সর্ব তপস্যার ফলপ্রদানের জন্য ব্যস্ততা

যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ স্বতঃ উদিত হয়। সুতরাং ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধিকারীকে শিক্ষাদানের অবসর পাইয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম বাৎসল্যভাব—অতএব এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী তাঁহার আজীবন স্বাধ্যায় ও তপস্যার ফল স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে অনুভব করাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

৺জগদম্বার অনুজ্ঞালাভে ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অনুষ্ঠান—তাঁহার সাধনাগ্রহের পরিমাণ

তন্ত্রোক্ত সাধনসকল অনুষ্ঠানের পূর্বে ঠাকুর ঐ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জিজ্ঞাসাপূর্বক তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—এ কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে কখনো কখনো শ্রবণ করিয়াছি। অতএব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই; সাধনপ্রসূত যোগদৃষ্টিপ্রভাবেও তিনি এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন—শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন ঐরূপে ব্রাহ্মণীনির্দিষ্ট সাধনপথে এখন পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইয়াছিল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব করা আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ পার্থিব নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও একলক্ষ্যতা কোথায়? অন্তঃসমুদ্রের ঊর্মিমালার বিচিত্র রঙ্গভঙ্গে ভাসমান না থাকিয়া উহার তলস্পর্শ করিবার জন্য সর্বস্ব ছাড়িয়া নিমগ্ন হইবার অসীম সাহস আমাদিগের কোথায়? 'একেবারে ডুবিয়া যা', 'আপনাতে আপনি ডুবিয়া যা' বলিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার যেভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থের এবং নিজ শরীরের প্রতি মায়ামমতা উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিকতার গভীর গর্ভে ডুবিয়া যাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা, দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও তাঁহার ঐ ভাবের বিরাম হইত না, তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না! হইবেই বা কেন? শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে যথার্থই আছেন এবং সর্বস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর—এ কথায় কি আমরা ঠাকুরের ন্যায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি?

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন; তৎকালে আমরা যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা পাঠককে কতদূর বুঝাইতে সমর্থ হইব বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটির এখানে উল্লেখ করিব।

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকালের আগ্রহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন

ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্ধারিত টাকা (ফি) জমা দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে, নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় শহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, আহারনিদ্রা ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময় হইতে দিবারাত্র ধ্যান, জপ, ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্রকঠোর ভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন-চারি মাসের অন্তেই নির্বিকল্প-সমাধিসুখ প্রথম

অনুভব করিলেন—ঐ সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুর তখন পরমানন্দে স্বামীজীর ঐরূপ অপূর্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও সাধনোৎসাহের ভূয়সী প্রশংসা নিত্য করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন ঠাকুর নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামীজীর ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রের অনুরাগ উৎসাহ অতি অদ্‌ভুত, (আপনাকে দেখাইয়া) এখানে তখন (সাধনকালে) উহাদের যে তোড় (বেগ) আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহা যৎসামান্য—ইহা তাহার সিকিও হইবে না।" ঠাকুরের ঐ কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, হে পাঠক, পার তো কল্পনাসহায়ে তাহা অনুভব কর।

পঞ্চমুণ্ডাসন-নির্মাণ ও চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধনের অনুষ্ঠান

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সর্বস্ব ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্মকুশলা ব্রাহ্মণী তান্ত্রিকক্রিয়োপযোগী পদার্থসকলের সংগ্রহপূর্বক উহাদিগের প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস করিতে লাগিলেন। মনুষ্য প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণীর মস্তক-কঙ্কাল[1] গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযত্নে সমাহৃত হইয়া ঠাকুরবাটীর উদ্যানে উত্তর সীমান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনানুকূল দুইটি বেদিকা[2] নির্মিত হইল এবং প্রয়োজন মতো ঐ মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল। কয়েক মাস দিবারাত্র কোথা দিয়া আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এই অদ্‌ভুত সাধক ও উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল না। ঠাকুর বলিতেন,[3] "ব্রাহ্মণী দিবাভাগে দূরে নানা স্থানে পরিভ্রমণপূর্বক তন্ত্রনির্দিষ্ট দুষ্প্রাপ্য পদার্থসকল সংগ্রহ করিত। রাত্রিকালে বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আমাকে আহ্বান করিত এবং ঐসকল পদার্থের সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া জপধ্যানে নিমগ্ন হইতে বলিত। কিন্তু পূজান্তে জপ প্রায়ই করিতে পারিতাম না, মন এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িত যে, মালা ফিরাইতে যাইয়া সমাধিস্থ হইতাম এবং ঐ ক্রিয়ার শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম। ঐরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্‌ভুত অদ্‌ভুত সব কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল। কঠিন কঠিন সাধন—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

স্ত্রীমূর্তিতে দেবীজ্ঞানসিদ্ধি

"একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী নিশাভাগে কোথা হইতে এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং পূজার আয়োজন করিয়া ৺দেবীর আসনে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া উপবেশন করাইয়া আমাকে বলিতেছে, 'বাবা, ইঁহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর!' পূজা সাঙ্গ হইলে বলিল, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে ইঁহার ক্রোড়ে বসিয়া তন্ময়চিত্তে জপ কর!' তখন আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া মাকে (শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে) বলিলাম, 'মা, তোর শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস? দুর্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?' ঐরূপ বলিবামাত্র দিব্যবলে হৃদয় পূর্ণ হইল এবং দেবতাবিষ্টের ন্যায় কি করিতেছি সম্যক না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম! অনন্তর যখন জ্ঞান হইল তখন ব্রাহ্মণী বলিল, 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে, বাবা; অপরে কষ্টে ধৈর্যধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ!' শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম।

ঘৃণাত্যাগ

"আর একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিল। তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘৃণার উদয় হইল না।

"কিন্তু যেদিন সে (ব্রাহ্মণী) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সেদিন ঘৃণায় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা কি কখনো করা যায়?' শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি!'–বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া 'ঘৃণা করিতে নাই' বলিয়া পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ডচণ্ডিকামূর্তির উদ্দীপনা হইয়া গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। তখন ব্রাহ্মণী উহা মুখে প্রদান করিলেও ঘৃণার উদয় হইল না।

আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ, কুলাগারপূজা এবং তন্ত্রোক্ত সাধনকালে ঠাকুরের আচরণ

"ঐরূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাহ্মণী কত প্রকারের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না। তবে মনে আছে, যেদিন সুরতক্রিয়াসক্ত নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্বক শিবশক্তির লীলাবিলাসজ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন বাহ্যচৈতন্য লাভের পর ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল, 'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন!' উহার কিছুকাল পরে একজন ভৈরবীকে পাঁচসিকা দক্ষিণাদানে প্রসন্না করিয়া তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্বজনসমক্ষে কুলাগার-পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্রূপ বিন্দুমাত্র 'কারণ' গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতাম এবং 'যোনি'-শব্দ শ্রবণমাত্রেই জগদ্-যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতাম!"

শ্রীশ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া একটি পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াছিলেন। সিদ্ধ জ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্রীগণপতিদেবের হৃদয়ে ঐরূপ মাতৃজ্ঞান কিরূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গল্পটি তাহারই বিবরণ। মদস্রাবিগজতুণ্ডাস্ফালিতবদন লম্বোদর দেবতাটির উপর ইতঃপূর্বে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার বড় একটা আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে উহা শুনিয়া পর্যন্ত ধারণা হইয়াছে, শ্রীশ্রীগণপতি বাস্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য।

কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানা স্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।" মাতৃভক্ত গণেশ ঐ কথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলিলেন, "সে কি কথা, মা! আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোন দুষ্কর্ম করিয়াছি বলিয়াও তো স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে ঐরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে?" জগন্ময়ী শ্রীশ্রীদেবী তখন বালককে বলিলেন, "ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি না?" গণেশ বলিলেন, "তাহা করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।" যাহার বিড়াল সে-ই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্বক বলিলেন, "তাহা নহে, বাবা, তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আমার এই শরীরকে কেহ প্রহার করে নাই, কিন্তু আমিই মার্জারাদি যাবতীয়

প্রাণিরূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ করিও না, কিন্তু অদ্যাবধি একথা স্মরণ রাখিও, স্ত্রীমূর্তিবিশিষ্ট জীবসকল আমার অংশে উদ্‌ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্তিধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই।” গণেশ মাতার ঐ কথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে শ্রীশ্রীগণেশ চিরকাল ব্রহ্মচারী হইয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্বদা ধারণা করিয়া থাকায় জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।

গণেশ ও কার্তিকের জগৎপরিভ্রমণবিষয়ক গল্প

পূর্বোক্ত গল্পটি বলিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমাসূচক নিম্নলিখিত কাহিনীটিও বলিয়াছিলেন: কোন সময় শ্রীশ্রীপার্বতীদেবী নিজ বহুমূল্য রত্নমালা দেখাইয়া গণেশ ও কার্তিককে বলেন যে, চতুর্দশভুবনান্বিত জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকে আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। শিখিবাহন কার্তিকেয় অগ্রজের লম্বোদর স্থূল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন মূষিকের মন্দগতি স্মরণ করিয়া বিদ্রূপহাস্য হাসিলেন এবং ‘রত্নমালা আমারই হইয়াছে’ স্থির করিয়া ময়ূরারোহণে জগৎ-পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্তিক চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে শ্রীশ্রীহরপার্বতীর শরীরে অবস্থিত দেখিয়া ধীরপদে তাঁহাদিগকে পরিক্রমণ ও বন্দনা করতঃ নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর কার্তিক ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীপার্বতীদেবী প্রসাদী রত্নমালা গণপতির প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশপূর্বক তাঁহার গলদেশে উহা সস্নেহে লম্বিতা করিলেন।

ঐরূপে শ্রীশ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, “আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব; সেইজন্য বিবাহিতা স্ত্রীর ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার মাতৃমূর্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া পূজা ও পাদবন্দনা করিয়াছিলাম।”

তন্ত্রসাধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব

রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তন্ত্রোক্ত বীরভাবে সাধনসকল অনুষ্ঠান করিবার কথা আমরা কোন যুগে কোন সাধকের সম্বন্ধে শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া সাধকমাত্রেই একাল পর্যন্ত শক্তিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরাচারী সাধকবর্গের মনে ঐ কারণে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে, শক্তিগ্রহণ না করিলে সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতালাভ একান্ত অসম্ভব। নিজ পাশব প্রবৃত্তির এবং ঐ ধারণার বশবর্তী হইয়া সাধকেরা কখনো কখনো পরকীয়া শক্তিগ্রহণেও বিরত থাকেন না। লোকে ঐজন্য তন্ত্রশাস্ত্রনির্দিষ্ট বীরাচারমতের নিন্দা করিয়া থাকে।

ঐ বিশেষত্ব ৺জগদম্বার অভিপ্রেত

যুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজ সম্বন্ধে একথা আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন, আজীবন তিনি কখনো স্বপ্নেও স্ত্রীগ্রহণ করেন নাই। অতএব আজন্ম মাতৃভাবাবলম্বী ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে শ্রীশ্রীজগদম্বার গূঢ় অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

শক্তি গ্রহণ না করিয়া ঠাকুরের সিদ্ধিলাভে যাহা প্রমাণিত হয়

ঠাকুর বলিতেন, সাধনসকলের কোনটিতে সাফল্যলাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই। ‘সাধনবিশেষ গ্রহণ করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ধরিয়া বসিলে তিন দিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম।’ শক্তিগ্রহণ না করিয়া বীরাচারের সাধনকালে তাঁহার ঐরূপে স্বল্পকালে সাফল্যলাভ করাতে একথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পঞ্চ’ম’কার বা স্ত্রীগ্রহণ ঐসকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন দুর্বল প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে। সাধক ঐরূপ করিয়া বসিলেও যে তন্ত্র

তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে কালে সে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, একথার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ শাস্ত্রের পরম কারুণিকত্বই উপলব্ধ হয়।

তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানসকলের উদ্দেশ্য

অতএব রূপরসাদি যে-সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযমসহায়ে বারংবার উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই-সকলকে ঈশ্বরের মূর্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানোই তান্ত্রিক ক্রিয়াসকলের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম ও সর্বভূতে ঈশ্বরধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বনপূর্বক তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে, নতুবা নহে—একথা লোকে কালধর্মে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়াসকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রই দায়ী স্থির করিয়া সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এইসকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুল কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাহার নির্দেশ লাভপূর্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অন্য কারণ

ঠাকুর এই সময়ে তন্ত্রোক্ত রহস্যসাধনসমূহের অনুষ্ঠান কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কাল একাদিক্রমে করিলেও, উহাদিগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখনো বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সাধনপথে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐ সকল কথার অল্পবিস্তর আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া বিরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠানপূর্বক অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে উত্তর কালে সমীপাগত নানা বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর করাইয়া দিতে পারিবেন না বলিয়াই যে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুরকে এ সময় এই পথের সহিত সম্যক পরিচিত করাইয়াছিলেন—এ কথা বুঝিতে পারা যায়। শরণাগত ভক্তদিগকে কিভাবে কতরূপে তিনি সাধনপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস আমরা অন্যত্র[4] প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমাদের পূর্বোক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের দর্শন ও অনুভবসমূহ

সাধনক্রিয়াসকল পূর্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার তন্ত্রোক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন ও অনুভবের কথা আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমরা এখন উহাদিগের কয়েকটি পাঠককে বলিব।

শিবানীর উচ্ছিষ্টগ্রহণ

তিনি বলিতেন, তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাঁহার পূর্ব স্বভাবের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন শুনিয়া এবং কুক্কুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া তিনি ঐ কালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন। মনে কোনরূপ দ্বিধা হইত না।

আপনাকে জ্ঞানাগ্নিব্যাপ্ত দর্শন

শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ আহুতি প্রদান করিয়া তিনি ঐ কালে আপনাকে অন্তরে বাহিরে জ্ঞানাগ্নি-পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন।

কুণ্ডলিনী-জাগরণ-দর্শন

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া মস্তকে উঠিবার কালে মূলাধারাদি সহস্রার পর্যন্ত পদ্মসকল ঊর্ধ্বমুখ ও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হইতেছে[5]—এ বিষয়ে ঠাকুর এই সময়ে প্রত্যক্ষ

করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—এক জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষমূর্তি সুষুম্নার মধ্য দিয়া ঐ সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে প্রস্‌ফুটিত করাইয়া দিতেছেন।

ব্রহ্মযোনিদর্শন

স্বামী বিবেকানন্দের এক কালে ধ্যান করিতে বসিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ময় একটি ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত হইত এবং ঐ ত্রিকোণকে জীবন্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে এ বিষয়ে বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "বেশ, বেশ, তোর ব্রহ্মযোনিদর্শন হইয়াছে। বিল্বমূলে সাধনকালে আমিও ঐরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম।"

অনাহতধ্বনি-শ্রবণ

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক পৃথক যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতি মুহূর্তে জগতের সর্বত্র স্বতঃ উদিত হইতেছে—এ বিষয় ঠাকুর এই কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন, এই কালে তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগের ধ্বনিসকলের যথাযথ অর্থবোধ করিতে পারিতেন—এ কথা তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন।

কুলাগারে ৺দেবীদর্শন

স্ত্রীযোনির মধ্যে তিনি এই কালে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছিলেন।

অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ঠাকুরের কথা

এই কালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভূতির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় হৃদয়ের পরামর্শে ঐসকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট একদিন জানিতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন, উহারা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হেয় ও সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তিনি বলিতেন, ঐরূপ দর্শন করা পর্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে তাঁহার ঘৃণার উদয় হয়।

ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিকালের অনুভবপ্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটীতলে নির্জনে একদিন আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি ঐসকলের কখনো প্রয়োগ করিব না, একথা বহু পূর্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি—উহাদিগের প্রয়োগ করিবার আমার কোনরূপ আবশ্যকতাও দেখি না; তোকে ধর্মপ্রচারাদি অনেক কার্য করিতে হইবে, তোকেই ঐসকল দান করিব স্থির করিয়াছি—গ্রহণ কর।" স্বামীজী তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, ঐসকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি?" পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্মপ্রচারাদি কার্যে কিছুদূর পর্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে না, তখন তিনি ঐসকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামীজী বলিতেন, তাঁহার ঐ আচরণে ঠাকুর তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

মোহিনীমায়া-দর্শন

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনীমায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছা মনে সমুদিত হওয়ায় ঠাকুর এই কালে দর্শন করিয়াছিলেন—এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া ধীর-পদবিক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন; ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখিলেন, ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া তাহাকে কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া ঐ শিশুকে গ্রাস করিয়া পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।

ষোড়শীমূর্তির সৌন্দর্য

পূর্বোক্ত দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুর এই কালে দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্যন্ত কত যে দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উঁহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি তাঁহাকে নানাভাবে উপদেশপ্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মূর্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্ব সুরূপা হইলেও শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা ষোড়শীমূর্তির সৌন্দর্যের সহিত তাঁহাদিগের রূপের তুলনা হয় না—এ কথা আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন—"ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্তির অঙ্গ হইতে রূপ-

সৌন্দর্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম।” এতদ্ভিন্ন ভৈরবাদি নানা দেবমূর্তিসকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধনকাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছে।

তন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধরাহিত্য ও বালকভাব-প্রাপ্তি

তন্ত্রোক্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের সুষুম্নাদ্বার পূর্ণভাবে উন্মোচিত হইয়া তাঁহার বালকবৎ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এই কালের শেষভাগ হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি চেষ্টা করিলেও অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। ঐসকল কখন যে কোথায় পড়িয়া যাইত, তাহা জানিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত নিবিষ্ট থাকা বশতঃ তাঁহার শরীরবোধ না থাকাই যে উহার হেতু, তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূর্বক তিনি যে কখনো ঐরূপ করেন নাই বা অন্যত্র দৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই–একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেক বার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, ঐসকল সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহাপবিত্র বস্তুসকলের সহিত তুল্য দেখিতেন। বলিতেন–“তুলসী ও সজিনাগাছের পত্র সমভাবে পবিত্র বোধ হইত।”

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি

এই কাল হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক বৎসর পর্যন্ত ঠাকুরের অঙ্গকান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে তিনি সর্বদা সর্বত্র লোক-নয়নের আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরভিমান চিত্তে উহাতে এত বিরক্তির উদয় হইত যে তিনি উক্ত দিব্যকান্তি পরিহারের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন–“মা, আমার এ বাহ্য রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর!” তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনা কালে পূর্ণ হইয়াছিল, এ কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।[6]

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশ ছিলেন

তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তদ্রূপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ না করিলে ব্রাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, এ কথার আভাস আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।[7] ব্রাহ্মণীর নাম যোগেশ্বরী ছিল এবং ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

তন্ত্রসাধনপ্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, উত্তরকালে বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্মলাভের জন্য উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। পরম অনুগত শ্রীযুক্ত মথুর ও হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, “বেশ তো বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব!”

[1] ইদানীং শৃণু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥ ৫১
নর-মহিষ-মার্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ॥ ৫২
শিবাসর্পসারমেয়বৃষভাণাং মহেশ্বরী।
নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতম্॥ ৫৩
অথবা পরমেশানি নরাণাং পঞ্চমুণ্ডকান্।

তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈব চ॥ ৫৪
নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরি।
নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্বা প্রোথয়িত্বা ধরাতলে॥ ৫৫
বিতস্তিপ্রমিতাং বেদীং তস্যোপরি প্রকল্পয়েৎ।
আয়ামপ্রস্থতো দেবী চতুর্হস্তৌ সমাচরেৎ॥ ৫৬
– যোগিনীতন্ত্রম্ – পঞ্চমপটলঃ

[2] সচরাচর পঞ্চমুণ্ডসংযুক্ত একটি বেদিকা নির্মাণ করিয়া সাধকেরা জপধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; ঠাকুর কিন্তু দুইটি মুণ্ডাসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিল্বমূলের বেদিকার নিম্নে তিনটি নরমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটীতলস্থ বেদিকায় পঞ্চপ্রকার জীবের পাঁচটি মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে তিনি মুণ্ডকঙ্কালসকল গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপপূর্বক আসনদ্বয় ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধনায় ত্রিমুণ্ডাসন প্রশস্ততর বলিয়া হউক অথবা বিল্বমূল তৎকালে অধিকতর নির্জন থাকায় বিশেষ ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠানের সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক, দুইটি আসন নির্মিত হইয়াছিল। বিল্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানীরবারুদখানা বিদ্যমান থাকায়, হোমাদির জন্য তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অসুবিধা হওয়ায় দুইটি মুণ্ডাসন নির্মিত হইয়াছিল, এরূপও হইতে পারে।

[3] ঠাকুরের শ্রীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই এখানে সম্বদ্ধভাবে দেওয়া গেল।

[4] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ১ম ও ২য় অধ্যায়।

[5] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়।

[6] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

[7] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়।

২.১৪. দ্বাদশ অধ্যায়: জটাধারী ও বাৎসল্যভাব-সাধন

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুরের অনুভব ও আচরণ

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে পুণ্যবতী রানী রাসমণির দেহত্যাগের পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, ঐ কালের প্রারম্ভ হইতে মথুরবাবু ঠাকুরের সেবাধিকার পূর্ণভাবে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঐ কালের পূর্বে মথুর বারংবার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরানুরাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁহাতে মধ্যে মধ্যে উন্মত্ততারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় কি না, তদ্বিষয়ে তিনি তখনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তন্ত্রসাধনকালে তাঁহার মন হইতে ঐ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অলৌকিক বিভূতিসকলের বারংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া এই কালে তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার সেবা লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ব বিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্যাদা ও গৌরব-সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। মথুরামোহন তখন যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে আপনাকে বিশেষভাবে দৈবসহায়বান বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের সাধনানুকূল দ্রব্যসমূহের সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায় মতো দেবসেবা ও অন্যান্য সৎকর্মে মথুরের এই কালে বহুল অর্থব্যয় করা বিচিত্র নহে।

সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ব বিষয়ে উৎসাহ, সাহস ও বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে অপূর্ব উৎসাহ ও বলসঞ্চার অনুভব করেন, মথুরের অনুভূতি এখন তাদৃশী হইয়াছিল। তবে রজোগুণী সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্যসকলের অনুষ্ঠানমাত্র করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গূঢ় রহস্যসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হইত না। ঐরূপ না হইলেও কিন্তু মথুরের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল-পরকালের সম্বল এবং তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্যাদালাভের মূলীভূত কারণ।

মথুরের অন্নমেরুব্রতানুষ্ঠান

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালানুষ্ঠিত কার্যে পাইয়া থাকি। 'রানী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত'-শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এই কালে (সন ১২৭০ সালে) বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরুব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, এই ব্রতকালে প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মণ চাউল ও সহস্র মণ তিল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দান করা হইয়াছিল এবং 'সহচরী'-নাম্নী প্রসিদ্ধা গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান ও যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী কিছুকালের জন্য উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ঐসকল গায়ক-গায়িকার ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত-শ্রবণে তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুত মথুর ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপক-স্বরূপে নির্ধারিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ

পূর্বোক্ত ব্রতানুষ্ঠানের স্বল্পকাল পূর্বে ঠাকুর বর্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের গভীর পাণ্ডিত্য ও নিরভিমানিতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, অন্নমেরুব্রতকালে আহূত পণ্ডিতসভাতে পদ্মলোচনকে আনয়ন ও দানগ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীযুত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তির কথা জানিতে পারিয়া মথুর উক্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিতে হৃদয়রামকে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন

নানা কারণে মথুরের ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন পণ্ডিতের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র সবিস্তার বলিয়াছি।[1]

ঠাকুরের বৈষ্ণবমতের সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইবার কারণ

তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণব মতের সাধনসকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।[2] ঐরূপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম–ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন এবং ঐ ভাবসকলের অন্যতমকে আশ্রয়পূর্বক তন্ময় চিত্তে অনেক কাল অবস্থান করিতেন। নন্দরানী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে বালগোপাল জ্ঞানে ভোজন করাইবার কথা আমরা তাঁহার সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। অতএব বৈষ্ণবমত-সাধনবিষয়ে ঠাকুরকে তাঁহার উৎসাহপ্রদান করা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়–বৈষ্ণবকুলসম্ভূত ঠাকুরের বৈষ্ণবভাবসাধনে অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। কামারপুকুর অঞ্চলে ঐসকল সাধন বিশেষভাবে প্রচলিত থাকায় উহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার বাল্যকাল হইতে বিশেষ সুযোগ ছিল। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ–ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক, বিক্রমশালী, সর্ববিষয়ের কারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে প্রতিভাত হইতেন এবং অন্যের প্রকাশে ললনাজনসুলভ কোমল-কঠোর-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া হৃদয় দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতেছেন এবং পরিমাণ করিতেছেন, এইরূপ দেখা যাইত। শেষোক্ত প্রকৃতির বশে তাঁহাতে কতকগুলি বিষয়ে তীব্র অনুরাগ ও অন্য কতকগুলিতে ঐরূপ বিরাগ স্বভাবতঃ উপস্থিত হইত এবং ভাবাবেশে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ভাববিহীন হইয়া ইতরসাধারণের ন্যায় কোন কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধনের পূর্বে ঠাকুরের ভিতর স্ত্রীভাবের উদয়

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য এবং কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামাদি ব্রজবালকগণের ন্যায় সখ্যভাবাবলম্বনে সাধনে স্বয়ং প্রবর্তিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রগতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শরূপে গ্রহণপূর্বক দাস্যভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমদুঃখিনী সীতার দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্বয়সাধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায় এই কালে তিনি আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখীরূপে ভাবনা করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎকালীন দেবীপূজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলস্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া ৺দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে অনেক সময়ে স্বয়ং যে পুংদেহবিশিষ্ট, একথা বিস্মৃত হইতেছেন।[3] আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাঁহাতে সময়ে সময়ে প্রকৃতিভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহার এই কালের মতো দীর্ঘকালব্যাপী আবেশ উপস্থিত হইত না। ঐরূপ হইবার আবশ্যকতাও ছিল না। কারণ, স্ত্রী-পুংপ্রকৃতিগত যাবতীয় ভাব এবং তদতীত অদ্বৈতভাবমুখে ইচ্ছামতো অবস্থান করা শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় তাঁহার তখন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণসাধনের জন্য ঐসকল ভাবের যেটিতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান করিতেছিলেন।

ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল তদ্বিষয়ের আলোচনা

ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ পরিবর্তনসকল উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃপিতামহগণ

যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদিত হয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষ গুণসম্পন্ন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্ব দৈবশক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিত্করত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে ধারণপূর্বক তাঁহাকে সর্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব ভোগ্যবস্তুসকলের কোনটি লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকিলেও ঐরূপ করা তাঁহার যে সুকঠিন হইত, একথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের মনে সংস্কারবন্ধন কত অল্প ছিল

সর্ব বিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য 'চালকলা বাঁধা' বা অর্থোপার্জন বুঝিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিলেন না—সংসারযাত্রানির্বাহে সাহায্য হইবে বলিয়া পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার অন্যোদ্দেশ্য বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ হয়, একথা বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কখনো স্ত্রীগ্রহণ করিলেন না—সঞ্চয়শীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরবান হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন—ঐরূপ অনেক কথা ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। ঐসকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যায়, ইতরসাধারণ জীবের মোহকর সংস্কারবন্ধনসকল তাঁহার মনে বাল্যাবধি কতদূর অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাতে এই কথারও স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তাঁহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, মনের পূর্বসংস্কারসকল তাঁহার সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করাইতে কখনও সমর্থ হইত না।

সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ঠাকুরের মন কিরূপ গুণসম্পন্ন ছিল

তদ্ভিন্ন আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আনুপূর্বিক আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা চিরকালের জন্য ধারণ করিয়া থাকিত। বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা, গান ও যাত্রা প্রভৃতি একবার শ্রবণ করিবার পরে বয়স্যগণকে লইয়া কামারপুকুরে গোঠে ব্রজে তিনি ঐসকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টপূর্ব সত্যানুরাগ, শ্রুতিধরত্ব ও সম্পূর্ণ ধারণারূপ দৈবী সম্পত্তিনিচয় নিজস্ব করিয়া ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেষ্টাতেও সুসাধ্য হয় না, তিনি সেই গুণসকলকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধনরাজ্যে স্বল্পকালমধ্যে তাঁহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে। সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়া অনেক সময়ে আমরা যে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তাহার কারণ তাঁহার অসামান্য মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত ও আলোচনা

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের পূর্বোক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। সাধনকালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিত্যবস্তু বিচারপূর্বক 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে মৃত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন—অমনি তৎসহ যে কাঞ্চনাসক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হইল। সাধারণে যে স্থানে গমনপূর্বক স্নানাদি না করিলে আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জনা করিলেন—অমনি তাঁহার মন জন্মগত জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল, সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমূহ অপেক্ষা তিনি কোন অংশে

বড় নহেন! জগদম্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণাপূর্বক ঠাকুর যেমন শুনিলেন, তিনিই ‘স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু’–অমনি আর কখনো স্ত্রীজাতির কাহাকেও ভোগলালসার চক্ষে দেখিয়া দাম্পত্য সুখলাভে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ঐসকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্য ধারণাশক্তি না থাকিলে তিনি ঐরূপ ফলসকল কখনো লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনের ঐসকল কথা শুনিয়া আমরা যে বিস্মিত হই অথবা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার কারণ–আমরা ঐসময়ে আমাদিগের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, ঐরূপে মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ড সহস্রবার জলে বিসর্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে না–সহস্রবার কদর্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের অভিমান ধৌত হইবে না এবং জগজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ হইয়া থাকিবার কথা আজীবন শুনিলেও কার্যকালে আমাদিগের রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের উদয় হইবে না! আমাদিগের ধারণাশক্তি পূর্বকৃত কর্মসংস্কারে নিতান্ত নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া, চেষ্টা করিয়াও আমরা এসকল বিষয়ে ঠাকুরের ন্যায় ফললাভ করিতে পারি না। সংযমরহিত, ধারণাশূন্য, পূর্বসংস্কারপ্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হই–ফলও সুতরাং তাঁহার ন্যায় লাভ করিতে পারি না।

ঠাকুরের ন্যায় অপূর্ব শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি-পাঁচ শত বৎসরেও এক আধটা আসে কি না সন্দেহ। সংযমপ্রবীণ, ধারণাকুশল, পূর্বসংস্কারনির্জীব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব অনুরাগব্যাকুলতা-তাড়িত হইয়া আট বৎসর কাল আহারনিদ্রাত্যাগপূর্বক শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শনলাভের জন্য সচেষ্ট থাকিয়া কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে কিরূপ প্রত্যক্ষসকল লাভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের মতো মনের কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব।

ঠাকুরের অনুজ্ঞায় মথুরের সাধুসেবা

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, রানী রাসমণির মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরামোহন ঐ সেবার জন্য নিয়মিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় ঠাকুরের নির্দেশে ঐ বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন। দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। কারণ ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাঁহার শিক্ষায় সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য দেখা যায়, ঠাকুর যখন এই কালে তাঁহাকে সাধুভক্তদিগকে অন্নদান ভিন্ন দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র-কম্বলাদি ও নিত্যব্যবহার্য কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্র দানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঐসকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশানুসারে বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দেন। আবার উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তাহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন।[4] সম্ভবতঃ সন ১২৬৯-৭০ সালেই মথুরামোহন ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে ঐরূপে সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ঐজন্য রানী রাসমণির কালীবাটীর অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রানী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই কালীবাটী তীর্থপর্যটনশীল সাধু-পরিব্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের স্থানবিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও এখন উহার সুনাম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকাগ্রণী সকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবাপরিচালককে আশীর্বাদপূর্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐরূপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।[5] এখানে তাহার পুনরুল্লেখ–‘জটাধারী’ নামক যে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন ও ‘শ্রীশ্রীরামলালা’ নামক শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর আগমন

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্‌ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেক বার শ্রবণ করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মূর্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। ঐ মূর্তির বহুকাল সেবায় তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এতদূর অন্তর্মুখী ও তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ঘন বালবিগ্রহ সত্য সত্যই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমে এরূপ দর্শন মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে সাধনায় তিনি যত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঐ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐরূপে বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি একপ্রকার নিত্যসহচররূপে লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর যদবলম্বনে ঐরূপ পরম সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই রামলালাবিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক্ত রাখিয়া জটাধারী ভারতের নানা তীর্থ যদৃচ্ছাক্রমে পর্যটনপূর্বক দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

রামলালা-সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে বাল-রামচন্দ্রের ভাবঘন মূর্তির সদাসর্বদা দর্শনলাভ করেন, এ কথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি একটি ধাতুময় বালবিগ্রহের সেবা অপূর্ব নিষ্ঠার সহিত সর্বক্ষণ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্যন্ত। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গূঢ় রহস্য অবধারণ করিয়াছিল। ঐজন্য প্রথম দর্শনেই তিনি জটাধারীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সাহ্লাদে প্রদানপূর্বক তাঁহার নিকটে প্রতিদিন বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্যমূর্তির দর্শন সর্বক্ষণ পাইতেন, সেই মূর্তির দর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর এখন ঐরূপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।[6] ঐরূপে জটাধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

স্ত্রীভাবের উদয়ে ঠাকুরের বাৎসল্যভাবসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে আপনাকে রমণীজ্ঞানে তন্ময় হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেছিলেন। হৃদয়ের প্রবল প্রেরণায় শ্রীশ্রীজগদম্বার নিত্যসঙ্গিনী জ্ঞানে অনেক সময় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকা, পুষ্পহারাদি রচনা করিয়া তাঁহার বেশভূষা করিয়া দেওয়া, গ্রীষ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামরব্যজন করা, মথুরকে বলিয়া নূতন নূতন অলঙ্কার নির্মাণ করাইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া এবং তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করানো প্রভৃতি কার্যে তিনি এই সময়ে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। জটাধারীর সহিত আলাপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিপ্রীতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তিনি এখন তাঁহার ভাবঘন শৈশবাবস্থার মূর্তির দর্শনলাভ করিলেন এবং প্রকৃতিভাবের প্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইল। মাতা শিশুপুত্রকে দেখিয়া যে অপূর্ব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, তিনি এখন ঐ শিশুমূর্তির প্রতি সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐ প্রেমাকর্ষণই তাঁহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইয়া কিরূপে কোথা দিয়া সময় অতীত হইতেছে, তাহা জানিতে দিত না। তাঁহার নিজ মুখে শ্রবণ করিয়াছি, ঐ উজ্জ্বল দেবশিশু মধুময় বালচেষ্টায় ভুলাইয়া তাঁহাকে সর্বক্ষণ নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রয়াস পাইত, তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সহিত যথাতথা গমনে উদ্যত হইত!

কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা—ঐরূপ করা কর্তব্য কি-না

ঠাকুরের উদ্যমশীল মন কখনো কোন কার্যের অর্ধেক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থূল কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁহার ঐরূপ স্বভাব সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় ভাববিশেষ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিলে তিনি উহার চরম সীমা পর্যন্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের অনুশীলন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়তো ভাবিয়া বসিবেন—'কিন্তু উহা কি ভাল? যখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মানবের কখনো কি কল্যাণ হইতে পারে? দুর্বল মানবের অন্তরে সু ও কু সকল প্রকার ভাবই যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের ঐ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখনো বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কেবলমাত্র সুভাবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাসস্থাপন করা মানবের কখনই কর্তব্য নহে। অতএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্বদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য।'

ঠাকুরের ন্যায় নির্ভরশীল সাধকের ভাবসংযমের আবশ্যকতা নাই—উহার কারণ

পূর্বোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও, উত্তরে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চন-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ভোগ-লোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি অতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা কখনো কর্তব্য নহে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতর-সাধারণ মানবের পক্ষে ভাবসংযমের আবশ্যকতা বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূরদৃষ্টি ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রে আছে, ঈশ্বর-কৃপায় বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংযম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদিগের মন তখন কাম-কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এককালে মুক্তিলাভ করিয়া কেবলমাত্র সুভাবসমূহের নিবাসভূমিতে পরিণত হয়। ঠাকুর বলিতেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মানবের মনে তখন তাঁহার কৃপায় কোন কুভাব মস্তকোত্তোলনপূর্বক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না; 'মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) তাহার পা কখনো বেতালে পড়িতে দেন না।' ঐরূপ অবস্থাপন্ন মানব তৎকালে অন্তরের প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলে তাহা দ্বারা কিছুমাত্র অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অপরের বিশেষ কল্যাণই সংসাধিত হয়। কারণ দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়া জগতের সমগ্র ভোগসুখাধিকারলাভকেও পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি না, অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট আমিত্বে চিরকালের মতো বিসর্জিত হওয়ায়, ঐরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থসুখান্বেষণ তখন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং বিরাট ঈশ্বরের সর্বকল্যাণকরী ইচ্ছাই ঐ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণসাধনের জন্য বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধক তখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। ফলেও দেখা যায়, তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুরের ন্যায় অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যূষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তিতর্ক না করিয়া নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশ্বাসপূর্বক অনেক সময় কার্যে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইয়া থাকি।

ঐরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াও উদ্বিগ্ন হন না—ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত

বিরাট ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে সর্বদা অভিন্ন রাখিয়া তাঁহারা মানবসাধারণের মনবুদ্ধির অবিষয়ীভূত বিষয়সকল তখন সর্বদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট মনে সূক্ষ্ম ভাবাকারে ঐসকল বিষয় পূর্ব হইতে প্রকাশিত থাকে। আবার বিরাটেচ্ছার সর্বদা সম্পূর্ণ অনুগত থাকায় তাঁহারা এতদূর স্বার্থ ও ভয়শূন্য হয়েন যে, কিভাবে কাহার দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর মন ধ্বংস হইবে, তদ্বিষয় পর্যন্ত পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়া ঐ বস্তু, ব্যক্তি ও

বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না হইয়া পরম প্রীতির সহিত ঐ কার্যসম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখ—শ্রীরামচন্দ্র জনক-তনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া তাঁহাকে বনে বিসর্জন করিলেন। আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে বর্জন করিলে নিজ লীলাসংবরণ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াও ঐ কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'যদুবংশ ধ্বংস হইবে' পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতিরোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ঐ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথবা ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও ঐ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষপত্রান্তরালে সর্বশরীর লুক্কায়িত রাখিয়া নিজ আরক্তিম চরণ-যুগল এমনভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীররক্ষা করিলেন।

মহামহিম বুদ্ধ চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণে পরিনির্বাণপ্রাপ্তির কথা পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্বীকারপূর্বক আশীর্বাদ ও সান্ত্বনার দ্বারা তাহাকে অপরের ঘৃণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আরূঢ় হইলেন! আবার স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলে তৎপ্রচারিত ধর্ম শীঘ্র কলুষিত হইবে জানিতে পারিয়াও মাতৃষ্বসা আর্যা গৌতমীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণের আদেশ করিলেন।

ঈশ্বরাবতার ঈশা 'তাঁহার শিষ্য যুদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাঁহার শরীর ধ্বংস হইবে' একথা জানিতে পারিয়াও তাহার প্রতি সমভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

ঐরূপ সাধকের মনে স্বার্থদুষ্ট বাসনার উদয় হয় না

অবতারপুরুষদিগের তো কথাই নাই, সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিয়াও আমরা ঐরূপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অবতারপুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উদ্যমশীলতার ও অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামঞ্জস্য করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বিরাটেচ্ছার অনুমোদনেই তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া উদ্যমের প্রকাশ হইয়া থাকে, নতুবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুষসকলের অন্তর্গত স্বার্থসংস্কারসমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন এমন এক পবিত্র ভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থদুষ্ট ভাবসমূহের কখনো উদয় হয় না এবং ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা নিশ্চিন্তমনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস-স্থাপনপূর্বক উহাদিগের প্রেরণায় কর্মানুষ্ঠান করিয়া দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অনুকরণীয় না হইলেও, পূর্বোক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাধককে নিজ জীবন পরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য স্বার্থবাসনাকে শাস্ত্র ভৃষ্টবীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন উৎপন্ন হইতে পারে না, পুরুষদিগের সংসারবাসনা তদ্রূপ সংযম ও জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহারা তাঁহাদিগকে আর কখনো ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে পারে না। ঠাকুর ঐ বিষয় আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়া লৌহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়া যাইলে উহার হিংসাক্ষম আকারমাত্রই বর্তমান থাকে, উহার দ্বারা হিংসাকার্য আর করা চলে না।

ঐরূপ সাধক সত্যসঙ্কল্প হন—ঠাকুরের জীবনে ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তসকল

উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বলিয়াছেন, ঐ প্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা সত্যসঙ্কল্প হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অন্তরে উদিত সঙ্কল্পসকল সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনো হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা ঋষিদিগের পূর্বোক্ত কথায় কখনো বিশ্বাসবান হইতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি,

কোনরূপ আহার্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সঙ্কুচিত হইলে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাহা ইতঃপূর্বে বাস্তবিকই দোষদুষ্ট হইয়াছে–কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত হইয়াছে, বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী–কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহজীবনে ধর্মলাভ হইবে না বলিয়া অথবা অত্যল্পমাত্র ধর্মলাভ হইবে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইলে, বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে–কাহাকেও দেখিয়া তাঁহার মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেবদেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ ভাবের বা ঐ দেবীর অনুগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে–অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বলিলে ঐ কথার বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়া তাহার জীবন এককালে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ কত কথাই না তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

জটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণপূর্বক বাৎসল্যভাব-সাধন ও সিদ্ধি

আমরা বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক সময় আপনাকে ললনাজনোচিত দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া ধারণাপূর্বক তদনুরূপ কার্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময় বাল্যরূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ও সেবাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বহুপূর্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি প্রভু ভিন্ন অন্য কোনভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্তমানে ঐ দেবতার প্রতি পূর্বোক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায় তিনি এখন গুরুমুখে যথাশাস্ত্র ঐ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণপূর্বক উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহ্লাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ঠাকুর ঐ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্তির অনুক্ষণ দিব্যদর্শনলাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে ঐ দিব্যমূর্তির অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন –

‘যো রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা!
ওহি রাম জগৎ পসেরা,
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা।’

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্বক জগদ্রূপে নিত্য-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তিনি জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক, মায়ারহিত, নির্গুণ স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্বোদ্‌ধৃত হিন্দী দোঁহাটি আমরা ঠাকুরকে অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

ঠাকুরকে জটাধারীর ‘রামলালা’-বিগ্রহ দান

শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন জটাধারী ‘রামলালা’ নামক যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতেছিলেন, তাহা ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ এখন হইতে ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিবেন বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া ঐ বিগ্রহের অপূর্ব লীলাবিলাসের কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি,[7]এজন্য তৎপ্রসঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

বৈষ্ণবমত-সাধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কতদূর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন

বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্ষলাভের জন্য ঠাকুর যখন পূর্বোক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, একথা আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে বাৎসল্যভাবে আরূঢ়া হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে গোপালরূপে দর্শনপূর্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের

নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্তিতে বাৎসল্যভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলব্ধি করিবার কালে ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোনপ্রকার সাহায্য না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে ঐসকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঠাকুরের মনে ঐসকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্ততঃ স্বীকার করিতে পারা যায়।

[1] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়।
[2] ইহা তাঁহার দ্বিতীয় বার এবং গুরূপদিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে বৈষ্ণবমত–সাধনা। ইহার পূর্বে তিনি হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রেরণায় দাস্যভক্তির সাধন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। – প্রঃ
[3] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।
[4] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়।
[5] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়।
[6] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়।
[7] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়।

২.১৫. ত্রয়োদশ অধ্যায়: মধুরভাবের সারতত্ত্ব

সাধকের কঠোর অন্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য

সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা সুকঠিন। কারণ সাধনা সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থূল মূর্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্যবস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্য দেখা যায় না, অথবা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগসুখ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে পশ্চাদ্‌পদ করিতে যেরূপ উদ্যম প্রয়োগ করে এবং বিষয়বিমুগ্ধ সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে—সেরূপ উন্মাদ উদ্যমাদির কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কারপ্রবাহ। আছে কেবল বাহ্যবস্তু বা শক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তদ্ভাবে মনের একতানতা আনয়ন করিবার ও তল্লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের সহিত সঙ্কল্পপূর্বক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল বাহ্যবিষয়সমূহ হইতে সাধকমনের ক্রমে এককালে বিমুখ হইয়া নিজাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, অন্তররাজ্যের গভীর গভীরতর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবান্তরসমূহের উপলব্ধি করা এবং পরিশেষে নিজ অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যদবলম্বনে সর্বভাবের ও অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যদাশ্রয়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মেকমেবাদ্বিতীয়ম্' বস্তুর উপলব্ধি ও তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিতি। পরে সংস্কারসমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম চিরকালের মতো যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্যন্ত যে পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্বোক্ত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিয়া সমাধি অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জগতের উপলব্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরূপে সমাধি হইতে বাহ্য জগতের উপলব্ধিতে এবং উহা হইতে সমাধি-অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃপুনঃ হইতে থাকে।

অসাধারণ সাধকদিগের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানের স্বতঃপ্রবৃত্তি—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীভুক্ত সাধক

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস আবার সৃষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটি সাধক-মনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, যাঁহাদের পূর্বোক্ত সমাধি অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থানভূমি—ইতরসাধারণ মানবের কল্যাণের জন্য কোনরূপে জোর করিয়া তাঁহারা কিছুকালের জন্য আপনাদিগকে সংসারে, বাহ্যজগৎ উপলব্ধি করিবার ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনেতিহাস আমরা যত অবগত হইব, ততই বুঝিব তাঁহার মন পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিল। তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ-আলোচনায় যদি আমাদের ঐরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে উহার জন্য লেখকের ত্রুটিই দায়ী। কারণ তিনি আমাদিগকে বারংবার বলিয়া গিয়াছেন, "ছোট ছোট এক-আধটা বাসনা জোর করিয়া রাখিয়া তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্য নিচে নামাইয়া রাখি! নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ডে মিলিত ও একীভূত হইয়া অবস্থানের দিকে।"

'শূন্য' এবং 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দিষ্ট বস্তু এক পদার্থ

সমাধিকালে উপলব্ধ অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে প্রাচীন ঋষিগণের কেহ কেহ সর্বভাবের অভাব বা 'শূন্য' বলিয়া, আবার কেহ কেহ সর্বভাবের সম্মিলনভূমি 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ সকলেই উহাকে সর্বভাবের উৎপত্তি এবং লয়ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ যাহাকে সর্বভাবের নির্বাণভূমি শূন্যবস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ভগবান শঙ্কর তাহাকেই সর্বভাবের মিলনভূমি পূর্ণবস্তু বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যগণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের কথা আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রতিপন্ন হয়।

অদ্বৈত ভাবের স্বরূপ

শূন্য বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষদ্ ও বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ উহাতে সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির সীমা অতিক্রমপূর্বক সমরস-মগ্ন হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, সসীম মানবমন আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তদাস্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ হয়, সে-সকল হইতে অদ্বৈতভাব একটি পৃথক অপার্থিব বস্তু। পৃথিবীর মানুষ ইহ-পরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগসুখে এককালে উদাসীন হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীলাভ করিলে তবেই ঐ ভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ঈশ্বর যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত ভাবসহায়ে সেই নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

শান্তাদি ভাবপঞ্চক এবং উহাদিগের সাধ্যবস্তু ঈশ্বর

অদ্বৈতভাব ও উহা দ্বারা উপলব্ধ নির্গুণব্রহ্মের কথা ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেকটিরই সাধ্যবস্তু ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম। অর্থাৎ সাধক মানব নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান, সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি ঐসকল ভাবের অন্যতমের আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হয় এবং সর্বান্তর্যামী, সর্বভাবাধার ঈশ্বরও তাহার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার ভাবপরিপুষ্টির জন্য ঐ ভাবানুরূপ তনু ধারণপূর্বক তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের নানা ভাবময় চিদ্ঘন মূর্তিধারণ এবং এমন কি, স্থূল মনুষ্যবিগ্রহে পর্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্ট পূর্ণকরণের কথা শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের স্বরূপ—উহারা জীবকে কিরূপে উন্নত করে

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব অন্য সকল মানবের সহিত যে-সকল ভাব লইয়া নিত্য সম্বদ্ধ থাকে, শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাব সেই পার্থিব ভাবসমূহেরই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিস্বরূপ। দেখা যায়, সংসারে আমরা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হইলে ইতরসকলের সহিত শ্রদ্ধাসংযুক্ত শান্ত ব্যবহার করা কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। ভক্তাচার্যগণ ঐ সম্বন্ধসকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং অধিকারিভেদে উহাদিগের অন্যতমকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ শান্তাদি পঞ্চভাবের সহিত জীব নিত্য পরিচিত থাকায় তদবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুগম হইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক ঐসকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেষাদি যে-সকল বৃত্তি তাহার মনে উদিত হইয়া থাকে, তাহাকে সংসারে ইতঃপূর্বে নানা কুকর্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরার্পিত সম্বন্ধাশ্রয়ে সেইসকল বৃত্তি তাহার মনে উত্থিত হইলেও উহাদিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখেই অগ্রসর করাইয়া দিবে। যথা—সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্রোগ কাম, তাহাকে ঈশ্বরদর্শনকামনায় নিযুক্ত রাখিবে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলের উপরই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্যবস্তু ঈশ্বরের অপূর্ব প্রেম-সৌন্দর্যের সম্ভোগলোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশ্বরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্ব ধর্মশ্রী দেখিয়া তল্লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

প্রেমই ভাবসাধনার উপায় এবং ঈশ্বরের সাকার ব্যক্তিত্বই উহার অবলম্বন

শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে জীব এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে জন্মগ্রহণপূর্বক ঐসকল ভাবের এক, দুই বা ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য নিযুক্ত হইয়া তাহাকে প্রেমে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐসকল আচার্যের অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোনপ্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরই ঐ প্রেম সর্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ দেখা যায়,

অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি মানব যতদিন না করিতে পারে, ততদিন পর্যন্ত সে ঈশ্বরের কোন না কোনপ্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পনা ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

প্রেমে ঐশ্বর্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি–উহাই ভাবসকলের পরিমাপক

প্রেমের স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে ঐশ্বর্যজ্ঞানমূলক ভেদোপলব্ধি ক্রমশঃ তিরোহিত করিয়া দেয়। ভাব-সাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন হইতেও উহা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্যজ্ঞান তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ভাবানুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র বলিয়া গণনা করিতে সর্বথা নিযুক্ত করে। দেখা যায়, ঐজন্য এই পথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তিরস্কারাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। সাধককে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যজ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাঁহার প্রেম ও মাধুর্যের উপলব্ধি করাইতে পূর্বোক্ত ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটি যতদূর সক্ষম, সেটি ততদূর উচ্চভাব বলিয়া ঐ পথে পরিগণিত হয়। শান্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য নির্ণয় করিয়া মধুরভাবকে সর্বোচ্চ পদবী-প্রদান ভক্তাচার্যগণ ঐরূপেই করিয়াছেন। নতুবা উহাদিগের প্রত্যেকটিই যে সাধককে ঈশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম, এ কথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

শান্তাদি ভাবের প্রত্যেকের সহায়ে চরম অদ্বৈতভাব-উপলব্ধি-বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শিক্ষা

ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হইয়া থাকে এবং বিরহকালে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে আপনার অস্তিত্বজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া বসে, এ কথা আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপিকাগণ ঐরূপে আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না, পরন্তু সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণার্থ শরীরত্যাগকালে ঈশাকে যে উৎকট দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া কোন কোন সাধক-সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।[1] অতএব বুঝা যাইতেছে, শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায় এবং প্রেমের প্রাবল্যে তাঁহার সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়া অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য সাধকজীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে অদ্ভুত আলোক প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টিতেই প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ অস্তিত্ব এককালে বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের দ্বারা অদ্বৈতভাবলাভবিষয়ে আপত্তি ও মীমাংসা

প্রশ্ন হইতে পারে, শান্তদাস্যাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া সর্বভাবাতীত অদ্বয়বস্তুর উপলব্ধি করিবে। কারণ অন্ততঃ দুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোনপ্রকার ভাবের উদয়, স্থিতি ও পরিপুষ্টি কুত্রাপি দেখা যায় না।

সত্য। কিন্তু কোন ভাব যত পরিপুষ্ট হয়, ততই উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল বিরোধী ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পূর্বপরিদৃষ্ট 'তুমি' (সেব্য), 'আমি' (সেবক) এবং তদুভয়ের মধ্যগত দাস্যাদি সম্বন্ধ সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র 'তুমি'-শব্দনির্দিষ্ট সেব্য বস্তুতে প্রেমে এক হইয়া অচলভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ভারতের বিশিষ্ট আচার্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই যুগপৎ 'তুমি', 'আমি' ও তদুভয়ের মধ্যগত ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করে না। উহা একক্ষণে 'তুমি'-শব্দনির্দিষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে 'আমি'-শব্দাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং ঐ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্বদা দ্রুত পরিভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিগের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন মনে হয় যেন

উহা উহাদিগকে এবং উহাদিগের মধ্যগত ঐ সম্বন্ধকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা ক্রমে পূর্বোক্ত কথা ধরিতে সক্ষম হয়। ধ্যানকালে মন ঐরূপে যত বৃত্তিহীন হয়, ততই সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, এক অদ্বয় পদার্থকে দুই দিক হইতে দুই ভাবে দেখিয়া, 'তুমি' ও 'আমি'-রূপ দুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসাধনার প্রাবল্যনির্দেশ

শান্তদাস্যাদি ভাবের প্রত্যেকটি পূর্ণ-পরিপুষ্ট হইয়া মানবমনকে পূর্বোক্তরূপে অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করাইতে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্ররূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে বুঝা যায়, এক এক যুগে ঐসকল ভাবের এক একটি মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই ঐ যুগের বিশিষ্ট সাধককুল ঈশ্বরের ও তাঁহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেখা যায়, বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগে প্রধানতঃ শান্তভাবের, ঔপনিষদিক যুগে শান্তভাবের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবের এবং দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্মসংযুক্ত দাস্যভাবের, তান্ত্রিকযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাবসম্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈষ্ণবযুগে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের পূর্ণ পরিপুষ্টি বিষয়ে ভারত এবং ভারতেতর দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরূপে অদ্বৈতভাবের সহিত শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইলেও, ভারতেতরদেশীয় ধর্মসম্প্রদায়সকলে কেবলমাত্র শান্ত, দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাবসম্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়সকলে রাজর্ষি সোলেমানের সখ্য ও মধুর-ভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও, উহারা ঐসকলের ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভিন্নার্থ কল্পনা করিয়া থাকে। মুসলমান ধর্মের সুফী-সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও মধুরভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও মুসলমান জনসাধারণ ঐরূপে ঈশ্বরোপাসনা কোরানবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। আবার ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরীর প্রতিমাবলম্বনে জগন্মাতৃত্বের পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজার ন্যায় ফলপ্রদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। ক্যাথলিক সম্প্রদায়গত মাতৃভাবের ঐ প্রবাহ ফল্গুনদীর ন্যায় অর্ধপথে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সাধকের ভাবের গভীরত্ব যাহা দেখিয়া বুঝা যায়

পূর্বে বলা হইয়াছে, কোনপ্রকার ভাবসম্বন্ধাবলম্বনে সাধকমন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়; ঐরূপ মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্বসংস্কারসমূহ ঐ পথে বাধাপ্রদান করিয়া তাহাকে ভাসাইয়া পুনরায় বহির্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ঐজন্য প্রবল পূর্বসংস্কারবিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটিমাত্র ভাবে তন্ময় হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। ঐরূপ স্থলে সে প্রথমে নিরুৎসাহ, পরে হতোদ্যম এবং তৎপরে সাধ্যবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়া বাহ্যজগতের রূপরসাদিভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্যবিষয়বিমুখতা, প্রেমাস্পদের ধ্যানে তন্ময়ত্ব এবং ভাবপ্রসূত উল্লাসই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে পরিগণিত হইয়াছে।

ঠাকুরকে সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া যাহা মনে হয়

কোন এক ভাবে তন্ময়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখনো অন্তর্নিহিত পূর্বসংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই, সাধকমনের অন্তঃসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন—কত দুঃখে মানবজীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া উপস্থিত

হয়, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বল্পকালে একের পর এক করিয়া সকল প্রকার ভাবে অদৃষ্টপূর্ব তন্ময়ত্ব লাভ করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, ঐরূপ হওয়া মনুষ্যশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

ধর্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা

ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্মবীরদিগের সাধনেতিহাস সম্যক লিপিবদ্ধ হয় নাই? কারণ তৎপাঠে দেখা যায়, তাঁহাদিগের সাধনপথে প্রবেশকালে বিষয়বৈরাগ্য ও তৎত্যাগের কথা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মানবমনের কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। দেখা যায় অন্তরের পূর্বসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সম্যক প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহারা সাধনকালে যে অপূর্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অথবা রূপক এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসহায়ে ঐ সংগ্রামের কথা এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তদ্বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির করিয়া লওয়া আমাদিগের পক্ষে এখন সুকঠিন হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তিলাভের জন্য অনেক সময় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে তিনি কিছুকাল জল বা পবনাহারপূর্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি কথা ভিন্ন বিরোধী ভাবসকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার অন্তঃসংগ্রামের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিষ্ক্রমণ ও পরে ধর্মচক্রপ্রবর্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার সাধনেতিহাস ততদূর পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য ধর্মবীরগণের ভাবেতিহাসের যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রূপ না হইয়া ঐ বিষয়ের অল্পস্বল্প কিছু পাওয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়—সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আহার সংযমপূর্বক তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল একাসনে ধ্যান-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপূর্বক 'আস্ফানক' নামক ধ্যানাভ্যাসে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তের পূর্বসংস্কারসমূহ বিনষ্ট করিতে তাঁহার মানসিক সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করিবার কালে গ্রন্থকার স্থূল বাহ্য ঘটনার ন্যায় 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

ঈশার সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত বয়সের কয়েকটি ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার ত্রিংশ বৎসরে জন নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে তাঁহার অভিষেক গ্রহণপূর্বক বিজন মরুপ্রদেশে চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যানতপস্যার কথার এবং ঐ মরুপ্রদেশে 'শয়তান'-কর্তৃক প্রলোভিত হইয়া জয়লাভপূর্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর মাত্র স্থূলশরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্যন্ত তিনি যে কি ভাবে কাল যাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই।

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ঐ কথা এবং মধুরভাবের চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব

ভগবান শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্য অনেকটা পাওয়া যাইলেও, তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

ভগবান শ্রীচৈতন্যের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যাইলেও, তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিহারাদি-অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায়

মানবসাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য যে, ধর্মবীর শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গেরা সখ্য, বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ মধুরভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ফূর্তি পর্যন্ত সাধকমনে যে যে অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, সে-সকল রূপকের ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায় ততদূর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল ঐ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটির সর্বোচ্চ পরিণতিতে সাধকমন প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অনুভবপূর্বক অদ্বয় বস্তুতে লীন হইয়া থাকে–এই চরম তত্ত্বটি তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই অথবা উহার সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করিলেও উহাকে হীনাবস্থা বলিয়া সাধককে উহা হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও অদৃষ্টপূর্ব সাধনেতিহাস বর্তমান যুগে আমাদিগকে ঐ চরম তত্ত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্মভাব যে সাধকমনকে একই লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এ বিষয় সম্যক বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা গণনায় না আনিলেও তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পূর্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা ও সমন্বয়াভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে চিরকালের জন্য নিঃসংশয়ে ঋণী হইয়াছি।

মধুরভাব ও বৈষ্ণবাচার্যগণ

পূর্বে বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথপ্রদর্শন না করিলে কখনই উহা ঈশ্বরলাভের জন্য এত লোকের অবলম্বনীয় হইয়া তাঁহাদিগকে শান্তি ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অনুষ্ঠিত হয় নাই, একথা তাঁহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইলে শ্রীবৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে যত্নশীল বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ বলিবেন, বৃন্দাবনলীলা তোমরা যেরূপ বলিতেছ সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব তোমাদের এতটা হাসি-কান্না, ভাব-মহাভাব সব যে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে! বৈষ্ণবাচার্যগণ তদুত্তরে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ বলিতেছি উহা যে তদ্রূপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার? তোমার ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয়ে উদ্ঘাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যতদিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব তোমার সন্দেহই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই কখনো তুমি ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে? নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্যলীলাকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে ঐ রহস্যলীলা চিরকাল সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাশ্যামের ঐরূপ অপূর্ব প্রেমলীলা যদি দেখিতে চাও তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কামগন্ধহীন হও এবং শ্রীমতীর সখীদিগের অন্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয়ে শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তোমাকে লইয়া ঐরূপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে।

বৃন্দাবনলীলা বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে হইবে–এ বিষয়ে ঠাকুর যাহা বলিতেন

ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহ্যঘটনারূপ অবলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন নাই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্যের উপভোগে কখনো সক্ষম হইবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ লীলার কথা সোৎসাহে বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাঁহার সমীপাগত ইংরাজীশিক্ষিত নব্যযুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ না, ধর না–ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। দেখ দেখি, গোপীরা স্বামী,

পুত্র, কুল-শীল, মান-অপমান, লজ্জা-ঘৃণা, লোকভয়, সমাজ-ভয়—সব ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল!—ঐরূপ করিতে পারিলে তবে ভগবান লাভ হয়!” আবার বলিতেন, “কামগন্ধহীন না হইলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই গোপীদের মনে কোটি কোটি রমণসুখের অধিক আনন্দ উপস্থিত হইয়া দেহবুদ্ধির লোপ হইত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাহাদের মনে উদয় হইতে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের দিব্য জ্যোতি তাহাদের শরীরকে স্পর্শ করিয়া প্রতি লোমকূপে যে তাহাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত!”

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বলেন, “আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্রীমতী রাধিকা বলিয়া কেহ কখনো ছিলেন না—কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কল্পনাকালেও ঐ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে তন্ময় হইতে হইয়াছিল, একথা তো মানিস? তাহা হইলে উক্ত সাধকই যে ঐ কালে আপনাকে ভুলিয়া রাধা হইয়াছিল এবং বৃন্দাবনলীলার অভিনয় যে ঐরূপে স্থূলভাবেও হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হয়!”

বাস্তবিক, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলা সম্বন্ধে শত সহস্র আপত্তি উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত এবং তাঁহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলম্বনে প্রকাশিত মধুরভাবসম্বন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে, চিরকালই ঐ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবানকে নিজ পতিস্বরূপে দেখিয়া তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইবে এবং ঐ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যের পুরুষজাতিকে মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত করিবার কারণ

শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারীদিগের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব একথা সহজে মনে উদিত হয় যে, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ বিসদৃশ সাধনপথ কেন লোকে প্রবর্তিত করিলেন। তদুত্তরে বলিতে হয়, যুগাবতারগণের সকল কার্য লোককল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা পূর্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্তন ঐজন্যই হইয়াছিল। সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য বহুকাল হইতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ পথে অগ্রসর করাইতেছিলেন। নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে ঐ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়া উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “হাতির বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্বণ করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুই প্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহায়ে তিনি লোককল্যাণসাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।”

তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে উহাকে উন্নীত করেন

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দেশে বজ্রযানরূপ মার্গ এবং ঐ মতের আচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন—নির্বাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হইয়া ধ্যানসহায়ে যখন মহাশূন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন ‘নিরাত্মা’ নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এবং সাধকের স্থূল শরীররূপ ভোগায়তনের উপলব্ধি তখন না থাকিলেও সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্ব ভোগসুখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্থূলবিষয়ভোগত্যাগে ভাবরাজ্যে সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখপ্রাপ্তিরূপ তাঁহাদিগের প্রচারিত মত কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থূলভোগসুখপ্রাপ্তিকে ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং

দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐসকল বিকৃত বৌদ্ধধর্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগসুখলাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল। আবার এইকালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের প্রয়াসী হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। ভগবান শ্রীচৈতন্য নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া অদ্‌ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ঐসকল সাধকের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা করিলে জীব যে সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দলাভে সত্য সত্য সমর্থ হয়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন এবং স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকট ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহাদিগকে নামজপ ও উচ্চসঙ্কীর্তনে নিযুক্ত করিলেন। ঐরূপে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুলবিকৃত বৌদ্ধসম্প্রদায়সকল তাঁহার কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃতবামাচার-অনুষ্ঠানকারীর দলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব জীবনাদর্শের অদ্‌ভুত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্য কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইবার কালে শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।[2]

মধুরভাবের স্থূল কথা

সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—এবং জগতের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশসম্ভূত—অতএব, তাঁহার স্ত্রী। সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জীব তাঁহাকে পতিরূপে সর্বান্তঃকরণে ভজনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাহার গতিমুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের স্থূল কথা। মহাভাবে সর্বভাবের একত্র সমাবেশ। প্রধানা গোপী শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবান্তর্গত অন্তর্ভাবসকলের এক, দুই বা ততোধিক ভাবস্বরূপিণী। সুতরাং ব্রজগোপিকাগণের ভাবানুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক ঐসকল অন্তর্ভাব নিজায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোত্থ মহানন্দের আভাসপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়া থাকে। ঐরূপে মহাভাবস্বরূপিণী[3] শ্রীরাধিকার ভাবানুষ্ঠানে নিজ সুখবাঞ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই এই পথে সাধকের চরম লক্ষ্য।

স্বাধীনা নায়িকার সর্বগ্রাসী প্রেম ঈশ্বরে আরোপ করিতে হইবে

সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক-নায়িকারা পরস্পরের প্রতি প্রেম, জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। ঐরূপ নায়ক-নায়িকা ঐসকলের সীমার ভিতরে অবস্থানপূর্বক নানা কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরস্পরের সুখসম্পাদনে যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকে। বিবাহিতা নায়িকা সামাজিক কঠোর নিয়মবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময় নায়কের প্রতি নিজ প্রেমসম্বন্ধ ভুলিতে বা হ্রাস করিতে সঙ্‌কুচিত হয় না; স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ। প্রেমের প্রাবল্যে ঐরূপ নায়িকা অনেক সময় ঐসকল নিয়মবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং সমাজপ্রদত্ত নিজ সামাজিক অধিকারের সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে কুণ্ঠিত হয় না। বৈষ্ণবাচার্যগণ ঐরূপ সর্বগ্রাসী প্রেমসম্বন্ধ ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন এবং বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা সেইজন্যই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বত্যাগিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমষ্টি ও অধিক

বৈষ্ণবাচার্যগণ মধুরভাবকে শান্তাদি অন্য চারিপ্রকার ভাবের সারসমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ প্রেমিকা নায়িকা ক্রীতদাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সখীর ন্যায় সর্বাবস্থায় তাঁহাকে সুপরামর্শদানপূর্বক তাঁহার আনন্দে উল্লসিতা ও দুঃখে সমবেদনাযুক্তা হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাঁহার শরীরমনের পোষণে এবং কল্যাণকামনায় নিযুক্তা থাকেন এবং ঐরূপে সর্বপ্রকারে আপনাকে ভুলিয়া প্রিয়তমের কল্যাণসাধন ও চিত্তবিনোদনপূর্বক তাঁহার মন অপূর্ব শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন! যে নায়িকা ঐরূপে প্রেমভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকে সর্বতোভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া ভক্তিগ্রন্থে নির্দিষ্টা হইয়াছেন। স্বার্থগন্ধদুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসা-শ্রেণীভুক্তা নায়িকা প্রিয়ের সুখের ন্যায় আত্মসুখের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণী-শ্রেণীভুক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে।

শ্রীচৈতন্য মধুরভাবসহায়ে কিরূপে লোককল্যাণ করিয়াছিলেন

বিষয়সুখ বিষবৎ পরিত্যাগপূর্বক জীবন নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে সাধকগণকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব তৎকালে দেশের ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ফলে তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবীন সমাজবন্ধনে আনিয়া, জাতিবহির্ভূতদিগকে ভগবদ্ভক্তরূপ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং সর্বসম্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে—সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভূত “অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার” [4] নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ শ্রীশ্রীজগৎস্বামীর তীব্র ধ্যানানুচিন্তনে পবিত্রচেতা সাধকের সত্য সত্যই উপস্থিত হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবনসহায়ে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলঙ্কারশাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকলের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, কুবাক্যসকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল এবং শান্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্যপরিহর্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ শ্রীভগবানকে আপনার করিয়া লইয়া তন্নিমিত্ত এবং তাঁহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া তাহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

বেদান্তবিৎ মধুরভাবসাধনকে যেভাবে সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বর্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুরভাব পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও বেদান্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্ধারিত হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন, ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানব-মনে দৃঢ়-সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কারসকলের জন্যই মানব এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্তে যদি সে জগৎ নাই বলিয়া ঠিক ঠিক ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্দণ্ডেই উহা তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইবে। জগৎ আছে ভাবে বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্যে স্ত্রী বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার, মানবহৃদয়ে এক ভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট। অতএব ঈশ্বরের প্রতি মধুরভাবসম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্য সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেষ্টাকে বেদান্তবিৎ অন্য কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ ‘আমি দেহী’ বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে ‘আমি পুরুষ বা স্ত্রী’ বলিয়া সংস্কারই সর্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া ‘আমি স্ত্রী’ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক-পুরুষ আপনার পুংস্ত্ব ভুলিতে সক্ষম হইবার পরে, ‘আমি স্ত্রী’ এ ভাবকেও অতি সহজে

নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই উপস্থিত হইবেন, বেদান্তবাদী দার্শনিকের চক্ষে ইহাই সর্বথা প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব সাধনের চরম লক্ষ্য

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের চরম লক্ষ্য? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্তমানে উহা অস্বীকারপূর্বক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবলাভ সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্যই বর্তমান। দেখা যায়, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসম্পাদনে সর্বদা যত্নবতী। আবার দেখা যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিতুষ্টির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই– আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অনুমিত হয়।

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের যাঁহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থসমূহের এবং শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণবকবিকুলের পূর্বরাগ, দান, মান ও মাথুর-সম্বন্ধীয় পদাবলীসকলের আলোচনা করিবেন। মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

[1] Vide Life of St. Francis of Assisi and St. Catherine of Sienna.

[2] 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ দেখ।

[3] কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃত দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ সঃ অধিরূঢ়ঃ মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোদন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। ইত্যাদি – শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ভক্তিগ্রন্থাবলী।

[4] যে চিত্তং তনুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ স্তম্ভ স্বেদঃ রোমাঞ্চস্বরভেদ বেপথুবৈবর্ণ্যাশ্রুপ্রলয়াঃ ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরসুখদা স্যুঃ। – আকরগ্রন্থ

২.১৬. চতুর্দশ অধ্যায়: ঠাকুরের মধুরভাব-সাধন

বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের ভাব-তন্ময়তার আচরণ

ঠাকুরের একাগ্র মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তাহাতে তিনি কিছুকালের জন্য তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঐ ভাব তখন তাঁহার মনে পূর্ণাধিকার স্থাপনপূর্বক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার শরীরকে পরিবর্তিত করিয়া উহার প্রকাশানুরূপ যন্ত্র করিয়া তুলিত। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে আমরা ঐ বিষয়ের নিত্য পরিচয় পাইতাম। দেখিতাম, সঙ্গীতাদি শ্রবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার মন ভাববিশেষে মগ্ন হইলে যদি কেহ সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তিনি বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এক লক্ষ্যে প্রবাহিত চিত্তবৃত্তিসকলের সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে তাঁহার ঐরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য। মহামুনি পতঞ্জলি এক ভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্প সমাধিস্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং ভক্তিগ্রন্থসকলে ঐ সমাধি ভাবসমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্থ ছিল।

সাধনকালে তাঁহার মনের উক্ত স্বভাবের কিরূপ পরিবর্তন হয়

সাধনায় প্রবর্তিত হইবার কাল হইতে তাঁহার মনের পূর্বোক্ত স্বভাব এক অপূর্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ দেখা যায়, ঐ কালে তাঁহার মন পূর্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়াই অন্য ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে না; কিন্তু কোন এক ভাবে আবিষ্ট হইলে, যতক্ষণ না ঐ ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অদ্বৈতভাবের আভাস পর্যন্ত উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে অবলম্বন করিয়াই সর্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দাস্যভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাতৃভাবোপলব্ধি করিতে অগ্রসর হন নাই; আবার মাতৃভাবসাধনায় চরমোপলব্ধি না করিয়া বাৎসল্যাদি ভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার সাধনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ঐরূপ সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

সাধনকালের পূর্বে ঠাকুরের মধুরভাব ভাল লাগিত না

ব্রাহ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অনুধ্যানে পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ স্ত্রীমূর্তিসকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্র তিনি কেন মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে বালকের ন্যায় ক্রোড়ে উপবেশনপূর্বক তাঁহার হস্তে আহার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী এই কালে কখনো কখনো ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা হইয়া মধুররসাত্মক সঙ্গীতসকল আরম্ভ করিলে ঠাকুর বলিতেন, ঐ ভাব তাঁহার ভাল লাগে না এবং ঐ ভাব সংবরণপূর্বক মাতৃভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাযথ বুঝিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরানী শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ের গভীরোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। ঘটনা অবশ্য ঠাকুরের মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূর্বের কথা। 'ভাবের ঘরে চুরি' যে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কোনকালে ছিল না, একথা উহাতে বুঝিতে পারা যায়।

উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া বাৎসল্যভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠককে ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। অতএব মধুরভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি যেসকল অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেইসকল কথা আমরা এখন বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঠাকুরের সাধনসকল কখনো শাস্ত্রবিরোধী হয় নাই–উহাতে যাহা প্রমাণিত হয়

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যাহাকে 'নিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায় তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইলেও কেমন করিয়া আজীবন শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। গুরুগ্রহণ করিবার পূর্বে কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যেসকল সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেসকলও কখনো শাস্ত্রবিরোধী না হইয়া উহার অনুগামী হইয়াছিল।

‘ভাবের ঘরে চুরি’ না রাখিয়া শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে ঐরূপ হইয়া থাকে, একথার পরিচয় উহাতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঘটনা ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ শাস্ত্রসমূহ ঐভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে, একথা স্বল্প চিন্তার ফলে বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মহাপুরুষদিগের সত্যলাভের চেষ্টা ও উপলব্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইয়া পরে ‘শাস্ত্র’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপলব্ধিসকলের যথাযথ অনুভূতি হওয়ায় শাস্ত্রসমূহের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ঐকথা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ শাস্ত্রসকলকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য।

তাঁহার স্বভাবতঃ শাস্ত্রমর্যাদা রাখার দৃষ্টান্ত—সাধনকালে নাম, ভেক ও বেশ-গ্রহণ

শাস্ত্রমর্যাদা স্বভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রেরণায় ঠাকুরের নানা বেশগ্রহণের কথার উল্লেখ করিতে পারি। উপনিষদ্‌মুখে ঋষিগণ বলিয়াছেন—‘তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ’ [1] সিদ্ধ হওয়া যায় না। ঠাকুরের জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন হৃদয়ের প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবানুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছিলেন। যথা, তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি রক্তবস্ত্র, বিভূতি, সিন্দূর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরুপরম্পরাপ্রসিদ্ধ ভেক বা তদনুকূল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন, তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়াছিলেন। বেদান্তোক্ত অদ্বৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্বক কাষায় ধারণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। আবার পুংভাবসমূহের সাধনকালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্ত্রীজনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভূষায় আপনাকে সজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার শিক্ষা দিয়াছেন—লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও জন্মজন্মাগত জাতি-কুল-শীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না করিলে কেহ কখনো ঈশ্বরলাভ করিতে পারে না। ঐ শিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন কায়মনোবাক্যে কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত ঠাকুরের স্ত্রীবেশগ্রহণ

মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষাধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখনো বহুমূল্য বারাণসী শাড়ি এবং কখনো ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। আবার ‘বাবা’র রমণীবেশ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান মথুরের ঐরূপ দান ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে দুষ্টচিত্তদিগকে অবসর দিয়াছিল; কিন্তু ঠাকুর ও মথুরামোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরামোহন ‘বাবা’র পরিতৃপ্তিতে এবং তিনি যে উহা নিরর্থক করিতেছেন না—এই বিশ্বাসে পরম সুখী হইয়াছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমৈকলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনাতে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, মধুরভাবসাধনকালে তিনি ছয় মাস কাল রমণীবেশ ধারণপূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

স্ত্রীবেশগ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ স্ত্রীজাতির ন্যায় হওয়া

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গি এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে এককালে ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখনো কল্পনা

করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর ও হৃদয় উভয়ের নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেন।

মথুরের বাটীতে রমণীগণের সহিত ঠাকুরের সখীভাবে আচরণ

ঠাকুর এই সময়ে কখনো কখনো রানী রাসমণির জানবাজারস্থ বাটীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন চরিত্রের সহিত পরিচিত থাকিয়া তাঁহাকে ইতঃপূর্বেই দেবতাসদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন তাঁহার স্ত্রীসুলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম স্নেহ ও পরিচর্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহারা আপনাদিগের অন্যতম বলিয়া এতদূর নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে লজ্জাসঙ্কোচাদি ভাব রক্ষা করিতে সমর্থা হয়েন নাই।[2] ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত মথুরের কন্যাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবাজার ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি নিজহস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক সখীর ন্যায় তাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "তাহারা তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হইত না!"

রমণীবেশগ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য হইত

হৃদয় বলিত—"ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুরবাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোনটি?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যুষে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় তাঁহার বামপদ প্রতিবার স্বতঃ অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মণী বলিতেন—'তাঁহার ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারানী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।' পুষ্পচয়নপূর্বক বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এই কালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে সজ্জিত করিতেন এবং কখনো কখনো শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐরূপে সাজাইয়া ৺কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত সকরুণ প্রার্থনা করিতেন।"

মধুরভাবসাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও শারীরিক বিকারসমূহ

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবা-পূজাদি সম্পাদনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও তাঁহাকে স্বীয় বল্লভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে ঠাকুর এখন অনন্যচিত্তে শ্রীশ্রীযুগলপাদপদ্মসেবায় রত হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিবা কিংবা রাত্রি, কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ, মাসান্তেও অবিশ্বাসপ্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে ঐ প্রার্থনা আকুল ক্রন্দনে এবং ঐ প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাঁহার আহারনিদ্রাদির লোপসাধন করিয়াছিল। আর বিরহ?—নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সর্বদা সর্বতোভাবে সম্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিঘ্নবাধায় প্রতিরুদ্ধ হইলে মানবের হৃদয়-মন-মথনকরী শরীরেন্দ্রিয়বিকলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ? উহা তাঁহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্বাবস্থায় অনুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জ্বালারূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণবিরহের প্রবল প্রভাবে এই কালে তাঁহার শরীরের লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্তনির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থিসকল ভগ্নপ্রায়

শিথিল লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায় দেহ কখনো কখনো মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

ঠাকুরের অতীন্দ্রিয় প্রেমের সহিত আমাদের ঐ বিষয়ক ধারণার তুলনা

দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ মানব আমরা প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি। অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ঊর্ধ্বে উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া উহার আখ্যা প্রদানপূর্বক উহার সহিত কত যশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রেম যে স্থূল দেহবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম ভোগলালসাপরিশূন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়!

শ্রীমতীর প্রেম সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের কথা

ভক্তিগ্রন্থসকলে লিখিত আছে, ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীই কেবলমাত্র যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্যক্ষপূর্বক উহার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জা ঘৃণা ভয় ছাড়িয়া, লোকভয় সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল শীল পদমর্যাদা ও নিজ দেহ-মনের ভোগসুখের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুখেই কেবলমাত্র আপনাকে সুখী অনুভব করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সেজন্য বলেন, শ্রীমতী রাধারানীর কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ জগতে কখনো সম্ভবপর নহে, কারণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর প্রেমে চিরকাল সর্বতোভাবে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে কেহ কখনো ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং মধুরভাবে পূর্ণ মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রের পূর্বোক্ত কথার ইহাই অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর প্রেমের দিব্য মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের জনসাধারণ উহা কিরূপে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহা বহুকাল পর্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানকে শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইয়া একাধারে বা একশরীরাবলম্বনে পুনরায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মধুরভাবের প্রেমাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে আবির্ভূত শ্রীভগবানের ঐ অপূর্ব বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে রাধারানীর শরীরমনে যেসকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেই সমস্ত লক্ষণ ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াই গোস্বামিগণ তাঁহাকে শ্রীমতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে অতীন্দ্রিয় প্রেমাদর্শের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল, একথা বুঝা যায়।

ঠাকুরের শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা ও দর্শনলাভ

শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া ঠাকুর এখন তদ্গতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমঘনমূর্তি স্মরণ, মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারানীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অন্যান্য দেবদেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর ইতঃপূর্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও সেইরূপে ঐ মূর্তি নিজাঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।"

ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অনুভব ও তাহার কারণ

উক্ত দর্শনের পর হইতে ঠাকুর কিছুকালের জন্য আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া নিরন্তর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধারানীর শ্রীমূর্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ববোধ এককালে হারাইয়াই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধুরভাবোত্থ ঈশ্বর এখন পরিবর্ধিত হইয়া শ্রীমতী রাধারানীর প্রেমানুরূপ সুগভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। কারণ পূর্বোক্ত দর্শনের পর হইতে শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত শারীরিক লক্ষণসকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবতন্ত্রনিপুণা ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণবচরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় ঐসকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছিলেন—"উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মহাভাব বলে, একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐপ্রকার উনিশটি ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।" [3]

প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অদ্‌ভুত পরিবর্তন

শ্রীকৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—উহা মহাভাবের পরাকাষ্ঠায় এইকালেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখনো আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় কার্যকলাপে তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় স্বতই প্রবৃত্ত হইত! আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছি—স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোমকূপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় প্রতিবারই উপর্যুপরি দিবসত্রয় ঐরূপ হইত! তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়রাম আমাদিগকে বলিয়াছেন—তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন!

মানসিক ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার শারীরিক ঐরূপ পরিবর্তন দেখিয়া বুঝা যায়, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'

বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে—'মন সৃষ্টি করে এ শরীর' এবং তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তে উহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর মনের ঐরূপ প্রভুত্বের কথা শুনিলে আমরা বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ যেরূপ তীব্র বাসনা উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষয়-বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় এবং অপূর্ব শক্তি প্রকাশ করে, সেইরূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যই অনুভব করি না। বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর স্বল্পকালে ঐরূপে পরিবর্তিত হওয়ায় বেদান্তের পূর্বোক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। পদ্মলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপূর্বক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্বপূর্ব যুগের সিদ্ধ ঋষিকুলের উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে!" মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের শারীরিক পরিবর্তনসকলের অনুশীলনে তদ্রূপ স্তম্ভিত হইয়া বলিতে হয়—তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহ শারীরিক জ্ঞানরাজ্যের সীমা অতিক্রমপূর্বক উহাতে অপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিবার সূচনা করিয়াছে।

ঠাকুরের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ

সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিশুদ্ধ ও ঘনীভূত হওয়াতেই তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রেমের প্রভাবে

স্বল্পকাল পরেই সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দৃষ্ট মূর্তি অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। ঐ দর্শনলাভের দুই-তিন মাস পরে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী আসিয়া তাঁহাকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, মধুরভাবসাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসম্ভোগে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি–ঐকালে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় এককালে তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ববোধ হারাইয়া কখনো আপনাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, আবার কখনো আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন করিতেছি, তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটি ঘাসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে) যে কৃষ্ণমূর্তি দেখিতাম, তাঁহার অঙ্গের এইরকম রং ছিল।"

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি হইবার বাসনা

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে একপ্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃষ্ণলাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমাসুন্দরী দীর্ঘকেশী বালবিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের মতো কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়েঘরের পার্শ্বে দুই-এক কাঠা জমি থাকিবে–যাহাতে নিজ হস্তে দুই পাঁচ প্রকার শাকসব্জি উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটি গাভী–যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন করিতে পারিবেন এবং একখানি সূতা কাটিবার চরকা থাকিবে। বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া ঐসকল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরূপে তাঁহার নিকটে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব-সাধনকালে পূর্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান–তিন এক, এক তিন'-রূপ দর্শন

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটি দর্শনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব। ঐকালে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তির সন্দর্শন লাভ করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ মূর্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মতো একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবতগ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রাখিল।

ঠাকুর বলিতেন–ঐরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিনপ্রকার ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশসম্ভূত। "ভাগবত (শাস্ত্র), ভক্ত ও ভগবান–তিনে এক, একে তিন!"

[1] মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৪ – সন্ন্যাসের লিঙ্গ বা চিহ্ন (যথা, গৈরিকাদি) ধারণ না করিয়া কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন হয় না।

[2] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

[3] শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ রাগাত্মিকা ভক্তির নিম্নলিখিত বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন –

মহাভাবে কামাত্মিকা এবং সম্বন্ধাত্মিকা, উভয় প্রকার ভক্তির পূর্বোল্লিখিত ঊনবিংশ প্রকার অন্তর্ভাবের একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুর এখানে উহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

২.১৭. পঞ্চদশ অধ্যায়: ঠাকুরের বেদান্তসাধন

ঠাকুরের এইকালের মানসিক অবস্থার আলোচনা:

(১) কামকাঞ্চনত্যাগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্ব সাধনকথা অতঃপর লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, তাঁহার এই কালের মানসিক অবস্থার কথা একবার আলোচনা করা ভাল।

আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে সাধকের সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দূরে পরিহার করিয়া উহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধভক্ত তুলসীদাস যে বলিয়াছেন, "যাঁহা রাম তাঁহা কাম[1] নেহি" [2]—একথা বাস্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব সাধনেতিহাস ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ভিত্তি কখনো তিলমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতি স্বল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন-ভূমির সীমা বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার মন যে এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

(২) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ও ইহামুত্রফলভোগে বিরাগ

বিষয়কামনা ত্যাগপূর্বক নয় বৎসর নিরন্তর ঈশ্বরলাভে সচেষ্ট থাকায় অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের স্মরণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হইত। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎসার পরাৎপর বস্তু বলিয়া সর্বতোভাবে ধারণা করায় উহা ইহকালে বা পরকালে তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসীন ও স্পৃহাশূন্য হইয়াছিল।

(৩) শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব

রূপরসাদি বাহ্যবিষয়সকল এবং শরীরের সুখদুঃখাদি বিস্মৃত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র ধ্যানে তাঁহার মন এখন এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, সামান্য আয়াসেই উহা সম্পূর্ণরূপে সমাহৃত হইয়া লক্ষ্য বিষয়ে তন্ময় হইয়া আনন্দানুভব করিত। দিন মাস ও বৎসর একে একে অতিক্রান্ত হইলেও উহার ঐ আনন্দের কিছুমাত্র বিরাম হইত না এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধব্য বস্তু আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জন্যও উপস্থিত হইত না।

(৪) ঈশ্বরনির্ভরতা ও দর্শনজন্য ভয়শূন্যতা

পরিশেষে ঠাকুরের মনে জগৎকারণের প্রতি 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' বলিয়া একান্ত অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার এখন সীমা ছিল না। উহাদিগের সহায়ে তিনি যে এখন আপনাকে তাঁহার সহিত সপ্রেম সম্বন্ধে কেবলমাত্র নিত্যযুক্ত দেখিতেন তাহা নহে, কিন্তু মাতার প্রতি বালকের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগে সাধক যে তাঁহাকে সর্বদা নিজ সকাশে দেখিতে পায়, তাঁহার মধুর বাণী সর্বদা কর্ণগোচর করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় এবং তাঁহার প্রবল হস্ত দ্বারা রক্ষিত হইয়া সংসারপথে সতত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মন জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

ঈশ্বরদর্শনের পরেও ঠাকুর কেন সাধন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কথা

প্রশ্ন উঠিতে পারে—জগৎকারণকে ঐরূপে স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সর্বদা নিজ সমীপে পাইয়া ঠাকুর আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কেন? যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের যোগ-তপস্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তাঁহাকেই যদি পরম আত্মীয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্য? ঐ কথার উত্তর আমরা পূর্বে একভাবে করিয়া আসিলেও তৎসম্বন্ধে অন্য একভাবে এখন দুই-চারিটি কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে আমাদিগের মনে একদিন ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত

হই নাই। তদুত্তরে তিনি তখন আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রের তীরে যে ব্যক্তি সর্বদা বাস করে, তাহার মনে যেমন কখনো কখনো বাসনার উদয় হয়—রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে তাহা দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মাও তখন তাঁহার ঐ ভাব দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া সেই ভাবে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হইয়াছিল।"

পূর্বে বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্বভাবাতীত বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঐ প্রেরণা তাঁহার জীবনে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্গুণ নিরাকার নির্বিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুরের জননীর গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্প এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুইটি পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে বুক বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর পাগল হইয়াছে বলিয়া লোকে যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়া নানা চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐ ভাবের যখন কথঞ্চিৎ উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের ঐ অবস্থা আবার যখন উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না—পুত্রের আরোগ্যকামনায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্রের দিব্যোন্মাদ হইয়াছে জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেও তিনি উহার অনতিকাল পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, যাহাদের জন্য এবং যাহাদের লইয়া তাঁহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আর উহাতে লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এখন হইতে দ্বাদশবৎসরান্তে তাঁহার শরীরত্যাগের কালের মধ্যে তিনি কামারপুকুরে পুনর্বার আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের জননীর লোভরাহিত্য

ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটি ঘটনা আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। ঘটনাটি তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বে বলিয়াছি, ঐ কালে কালীবাটীতে মথুরবাবুর অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল এবং মুক্তহস্ত হইয়া তিনি নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠান ও প্রভূত অন্নদান করিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তির অবধি না থাকায় তিনি ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে কোনকালে ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়া তাঁহাকে ঐ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে এ পর্যন্ত সাহসী হন নাই। তাঁহার শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া তিনি ইতঃপূর্বে একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করিয়া দিবার পরামর্শ হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐ কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস' বলিয়া

তাঁহাকে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মনে জাগরূক থাকিলেও মথুর নিজ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ সুযোগলাভ করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—"ঠাকুরমা, তুমি তো আমার নিকট হইতে কখনো কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না। তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও।" সরলহৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐরূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিলেন না। সুতরাং কি চাহিয়া লইবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল—"বাবা, তোমার কল্যাণে আমার তো এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, যখন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব তখন চাহিয়া লইব।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁটরা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন—"দেখিবে, এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে! আর তোমার কল্যাণে এখানে খাবার তো কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই তো তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ; তবে আর কি চাহি, বল?" মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, 'যাহা ইচ্ছা কিছু লও' বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর একটি অভাবের কথা মনে পড়িল; তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যদি নেহাত দেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব, এক আনার দোক্তা তামাক কিনিয়া দাও।" বিষয়ী মথুরের ঐ কথায় চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়!" এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মতো দোক্তা তামাক আনাইয়া দিলেন।

হলধারীর কর্মত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হলধারী দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁহার সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া কখনো কখনো ঠাকুরকে কিরূপে শ্লেষ করিতেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐকথা নিবেদন করিয়া কিরূপে বারংবার আশ্বস্ত হইতেন—সে সকল কথা আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। হলধারীর তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্যে তিনি এক সময়ে বিষণ্ণ হইলে ভাবাবেশে এক সৌম্য মূর্তির দর্শন ও 'ভাবমুখে থাক' বলিয়া প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় ঐ দর্শন ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাবসাধনের সময় তাঁহাকে স্ত্রীবেশ ধারণপূর্বক রমণীর ন্যায় থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী কালীবাটীতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্রচর্চা করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। শ্রীমৎ তোতা ও হলধারীর ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ-চর্চাকালে ঠাকুর একদিন জায়া ও অনুজ লক্ষ্মণসহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এ ঘটনার কয়েক মাস পরে শারীরিক অসুস্থতাদি নিবন্ধন হলধারী কালীবাটীর কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন।

ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইবার কারণ

ভক্তের স্বভাব—তাঁহার সাযুজ্য বা নির্বাণ [তথা] মুক্তিলাভে কখনো প্রয়াসী হন না। শান্তদাস্যাদি ভাববিশেষ অবলম্বনপূর্বক ঈশ্বরের প্রেমের মহিমা ও মাধুর্য সম্ভোগ করিতেই তাঁহারা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরামপ্রসাদের 'চিনি হওয়া ভাল নয়, মা, চিনি খেতে ভালবাসি'-রূপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া সর্বকালপ্রসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকুরের ভাবাতীত অদ্বৈতাবস্থালাভের জন্য প্রয়াস অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার

বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভাবিবার পূর্বে আমাদিগের স্মরণ করা কর্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদম্বার বালক ঠাকুর এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহারই মুখ চাহিয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে যেভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেইভাবেই তখন পরমানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও ঐ কারণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণপূর্বক নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব অভিনব আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সর্বপ্রকার সাধনের অন্তে ঠাকুর জগদম্বার ঐ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়া লোককল্যাণসাধনরূপ তাঁহার সুমহৎ দায়িত্ব আপনার বলিয়া অনুভবপূর্বক সানন্দে বহন করিয়াছিলেন।

ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাবলাভের চেষ্টার যুক্তিযুক্ততা

মধুরভাবসাধনের পরে ঠাকুরের অদ্বৈতভাবসাধনের যুক্তিযুক্ততা আর একদিক দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধে সর্বদা অবস্থিত। কারণ, ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠালাভে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈত ভূমি ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর হইবে?

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন

শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতেই যে ঠাকুর এখন অদ্বৈতভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় সম্যক বুঝিতে পারিব—সাগরসঙ্গমে স্নান ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ তোতা এইকালে মধ্যভারত হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। পুণ্যতোয়া নর্মদাতীরে বহুকাল একান্তবাসপূর্বক সাধনভজনে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি ইতঃপূর্বে নির্বিকল্পসমাধিপথে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুরা এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরে তাঁহার মনে কিছুকাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সঙ্কল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণায় তিনি পূর্বভারতে আগমনপূর্বক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। আত্মারাম পুরুষদিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে বাহ্যজগতের উপলব্ধি হইলেও উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। মায়াকল্পিত জগদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, দেশ, কাল ও পদার্থে উচ্চাবচ ব্রহ্মপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা ঐকালে দেবস্থান, তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ তোতার তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্বোক্ত তীর্থদ্বয়দর্শনান্তে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। তিন দিবসের অধিক কাল এক স্থানে যাপন করা তাঁহার নিয়ম ছিল না। ঐজন্য কালীবাটীতে তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার জ্ঞানের মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা নিজ বালককে বেদান্তসাধন করাইবেন বলিয়া যে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন, একথা তাঁহার তখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

ঠাকুর ও তোতাপুরীর প্রথম সম্ভাষণ এবং ঠাকুরের বেদান্তসাধনবিষয়ে প্রত্যাদেশলাভ

কালীবাটীতে আগমন করিয়া তোতাপুরী প্রথমেই ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনিতে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর তখন তথায় অন্যমনে একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল বদনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন—বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তমাধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে ভাবিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণপূর্বক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্তসাধন করিবে?"

জটাজূটধারী দীর্ঘবপু উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর করিলেন, "কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না—আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

ঠাকুর ঐকথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ৺জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন—"যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীজগদম্বা সম্বন্ধে শ্রীমৎ তোতার যেরূপ ধারণা ছিল

অর্ধবাহ্যভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে তোতাপুরী গোস্বামীর সমীপে আসিয়া তাঁহার মাতার ঐরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতা ৺দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে ঐরূপে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ন্যায় সরলভাবে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐ প্রকার আচরণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারনিবন্ধন বলিয়া ধারণা করিলেন। ঐরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহার অধরপ্রান্তে করুণা ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছিল, একথা আমরা অনুমান করিতে পারি। কারণ শ্রীমৎ তোতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্মফলদাতা ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেবদেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সংযত সাধকের ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস ভিন্ন কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত না। আর ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া?—গোস্বামীজী উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধকের পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের করুণা ও সহায়তা প্রার্থনার কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্য তিনি প্রাণে অনুভব করিতেন না এবং যাহারা ঐরূপ করে, তাহারা ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ করিয়া থাকে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ন্যাসগ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ

সে যাহা হউক, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে ঠাকুরের মনের পূর্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে ভাবিয়া তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন—বেদান্তসাধনে উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাঁহাকে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্বক যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—গোপনে করিলে যদি হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে ঐরূপ করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজী উহাতে ঠাকুরের ঐরূপ অভিপ্রায়ের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং 'উত্তম কথা, শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব' বলিয়া পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্বক আসন বিস্তীর্ণ করিলেন।

ঠাকুরের সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণের পূর্বকার্যসকল সম্পাদন

অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ কার্য সমাধা হইলে শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদান করাইলেন। কারণ সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমস্ত লোকপ্রাপ্তির আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জন করেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে তৎপূর্বে আপন প্রেত-পিণ্ড আপনি প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

ঠাকুর যখন যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁহাতে আত্মসমর্পণপূর্বক তিনি যেরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ তোতা তাঁহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতেছিলেন, তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। শ্রাদ্ধাদি পূর্বক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়া

রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটিরে গুরুনির্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি-অবসানে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তের উদয় হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটিরে সমাগত হইলেন। পূর্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং ঈশ্বরার্থে সর্বস্ব-ত্যাগরূপ যে ব্রত সনাতন কাল হইতে গুরুপরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও ব্রহ্মজ্ঞপদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতাবলম্বনের পূর্বোচ্চার্য মন্ত্রসকলের পূতগম্ভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটী-উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নেহসম্পূর্ণ কম্পিতবক্ষে সেই ধ্বনির সুখস্পর্শ যেন নূতন জীবনের সঞ্চার আনয়ন করিল এবং যুগযুগান্তরের অলৌকিক সাধক বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহুজনহিতার্থ সর্বস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন—ঐ সংবাদ জানাইতেই ভাগীরথী যেন আনন্দকলগানে দিগন্তে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে প্রার্থনামন্ত্র

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্য অবহিতচিত্তে তাঁহাকে অনুসরণপূর্বক সেইসকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইল –

"পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন্! দেব-মনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষকরুণাযোগ্য বালক সেবক। হে সংসার-দুঃস্বপ্ন-হারিন্ পরমেশ্বর! দ্বৈতপ্রতিভারূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে পরমাত্মন্! আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদানপূর্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া তদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্বপ্রেরক দেব! জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয়, তাহাই কর। সূর্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্মল বারি, ব্রীহিযবাদি শস্য, বনস্পতিসমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নির্দেশে অনুকূলপ্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সহায়তা করুক। হে ব্রহ্মন্! তুমিই জগতে বিশেষশক্তিমান নানারূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। শরীর-মন-শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানধারণের যোগ্যতালাভের জন্য আমি অগ্নিস্বরূপ তোমাতে আহুতিপ্রদান করিতেছি—প্রসন্ন হও।" [3]

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব-সম্পাদ্য বিরজাহোমের সংক্ষেপ সারার্থ

অনন্তর বিরজাহোম আরম্ভ হইল—"পৃথ্বী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ-রূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চক শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি আমাতে অবস্থিত বায়ুসকল শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নামক আমার কোষ-পঞ্চক শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-প্রসূত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্কারসমূহ শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্মাদি শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"হে অগ্নিশরীরে শয়ান! জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ পুরুষ, জাগরিত হও। হে অভীষ্টপূরণকারিন্! তত্ত্বজ্ঞানলাভের পথে আমার যত কিছু প্রতিবন্ধক আছে, সেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র সংস্কার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাহাতে গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান আমার অন্তরে সম্যক উদিত হয়, তাহা করিয়া দাও; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা বিদূরিত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান্য, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতিপ্রদানপূর্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

ঠাকুরের শিখাসূত্রাদি পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ

ঐরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর 'ভূরাদি সকল লোকলাভের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম' এবং 'জগতের সর্বভূতকে অভয়প্রদান করিতেছি'—বলিয়া হোমপরিসমাপ্তি হইল। অনন্তর শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমানকাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে[4] ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোতার নিকটে উপদেশ-গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

ঠাকুরের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য শ্রীমৎ তোতার প্রেরণা

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে এখন বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায়াবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন –

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজপ্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরে পরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধিসহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর; দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র 'আমি'-জ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। "যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে, তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র; যাহা অল্প, তাহা তুচ্ছ—তাহাতে পরমানন্দ নাই; কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা বা মহান, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্বথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছেন, কোন্ মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে?"

ঠাকুরের মনকে নির্বিকল্প করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় তোতার আচরণ এবং ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিলাভ

শ্রীমৎ তোতা পূর্বোক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্তবাক্যসহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যেন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "দীক্ষা প্রদান করিয়া ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্ঘনোজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্যুপরি তিন দিন ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন নির্বিকল্পসমাধিসম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেঁও, হোগা নেহি' অর্থাৎ—কি! হইবে না, এত বড় কথা! বলিয়া কুটিরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচের ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন।' তখন পুনরায় দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি

কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নামরূপরাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম।”

ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধি যথার্থ লাভ করিয়াছেন কিনা, তদ্বিষয়ে তোতার পরীক্ষা ও বিস্ময়

ঠাকুর পূর্বোক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে নিঃশব্দে কুটিরের বাহিরে আগমনপূর্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটিরে প্রবেশপূর্বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে, এজন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনন্তর কুটিরের অনতিদূরে পঞ্চবটীতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না। তখন বিস্ময়কৌতূহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গলমোচন করিয়া কুটিরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যেমন বসাইয়া গিয়াছিলেন, ঠাকুর সেইভাবেই বসিয়া আছেন—দেহে প্রাণের প্রকাশমাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিপূর্ণ! বুঝিলেন—বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প—নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে!

শ্রীমৎ তোতার ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ করিবার চেষ্টা

সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—যাহা দেখিতেছি, তাহা কি বাস্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই তিন দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কিনা, নাসিকাদ্বারে বিন্দুমাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কিনা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারংবার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার, বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না! তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন –

‘য়হ ক্যা দৈবী মায়া’—সত্য সত্যই সমাধি! বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল—নির্বিকল্প সমাধি! তিন দিনে[5] হইয়াছে! দেবতার এ কি অত্যদ্ভুত মায়া! অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং ‘হরি ওম্’-মন্ত্রের সুগভীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল-জল-ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নির্বিকল্প ভূমিতে তাহাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া শ্রীমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র[6] সবিস্তারে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঠাকুরের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি এখন হইতে নিরন্তর নির্বিকল্প অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিবেন। কিরূপে তিনি ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন—জীবকোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয়মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐকালে কিরূপে জনৈক সাধুপুরুষ কালীবাটীতে আগমনপূর্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোককল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে, একথা জানিতে পারিয়া ছয়মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র[7] বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের সহায়ে

এইকালে মথুরবাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

ঠাকুরের জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা

ঠাকুরের ভিতর নানাপ্রকার দৈবশক্তির দর্শনে শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের ভক্তি-বিশ্বাস ইতঃপূর্বেই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছিল। এই কালের একটি ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকতর অচলভাব ধারণপূর্বক চিরকাল তাঁহাকে ঠাকুরের শরণাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

মথুরামোহনের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী এই কালে গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার-বৈদ্যসকল তাঁহার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে প্রথমে সংশয়াপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন।

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, মথুরামোহন সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান দেখিয়াই রাসমণি তাঁহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর সহিত এবং ঐ কন্যার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব বিবাহের পরেই শ্রীযুক্ত মথুরের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধিবলে ও কর্মকুশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শ্বশ্রূঠাকুরানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। অনন্তর রানী রাসমণির মৃত্যু হইলে কিরূপে তিনি রানীর বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্যপরিচালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন, তাহা আমরা পাঠককে জানাইয়াছি।

জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ শ্বশ্রূঠাকুরানীর বিষয়ের উপর পূর্বোক্ত আধিপত্যও হারাইতে বসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনের এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তার-বৈদ্যরা জবাব দিয়া গেলেন, মথুর তখন কাতর হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতে আসিলেন। তাঁহার ঐপ্রকার উন্মত্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইলেন এবং ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সজলনয়নে গদগদ বাক্যে সকল কথা নিবেদন করিয়া দীনভাবে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "আমার যাহা হইবার তাহা তো হইতে চলিল; বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর করিতে পাইব না।"

মথুরের ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, "ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্যলাভ করিবে।" বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহসা জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, "সেইদিন হইতে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল এবং তাহার ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে থাকিল; জগদম্বা দাসীকে ভাল করিয়া ছয়মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত মথুরের ঠাকুরের প্রতি অদ্‌ভুত প্রেমপূর্ণ সেবার কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল, তাহা কি অমনি করিয়াছিল? মা তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার অদ্‌ভুত অদ্‌ভুত সব দেখাইয়াছিলেন, সেইজন্যই সে অত সেবা করিয়াছিল।"

[1] সকাম কর্ম।

[2] যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি,
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।

দুঁহু একসাথ, মিলত নেহি,
রবি রজনী এক ঠাম্॥ – তুলসীদাস–কৃত দোঁহা

[3] ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের ভাবার্থ।

[4] আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরমভক্ত সেবক শ্রীযুত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

[5] গুরুভাব – পূর্বার্ধ (৯ম সং), 'কথামৃত' ৪র্থ ভাগ (৮ম সং) ৩১০ পৃঃ – প্রঃ

[6] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়।

[7] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়।

২.১৮. ষোড়শ অধ্যায়: বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্মসাধন

ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি–ঐ কালে তাঁহার মনের অপূর্ব আচরণ

জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়া পূর্বোক্ত প্রকারে আরোগ্য করিয়া হউক, অথবা অদ্বৈত-ভাবভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য ঠাকুর দীর্ঘ ছয়মাস কাল পর্যন্ত যে অমানুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই হউক, তাঁহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া এখন কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল এবং শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ঐরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জিত মন এখন যে অপূর্ব শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায়[1] উহা শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক হইয়া দূরে নির্বিকল্পভূমিতে এককালে উপনীত হইত এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্য আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিত। সুতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে উহার সামান্যমাত্রই উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাঁহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়া শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, এইকালে তাঁহার নিকটে বেদান্তমার্গবিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমহংসসকলের আগমন হইয়াছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়া থাকিত।[2] ঐসকল উচ্চতত্ত্বের বিচারকালে তাঁহারা যখন কোন বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতরসাধারণের ন্যায় ব্যাধির প্রকোপে নিরন্তর মুহ্যমান হইয়া থাকিলে কঠোর দার্শনিক বিচারে ঐরূপে প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ঠাকুরের দর্শন–ঐ দর্শনের ফলে তাঁহার উপলব্ধিসমূহ

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, নির্বিকল্প ভূমিতে নিরন্তর অবস্থানকালের শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবমুখে অবস্থান করিবার জন্য তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন।[3] 'দর্শন' বলিয়া ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও উহা যে তাঁহার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির কথা, উহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কারণ পূর্ব দুইবারের ন্যায় ঠাকুর এইকালে কোন দৃষ্ট মূর্তির মুখে ঐকথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তুরীয় অদ্বৈততত্ত্বে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান না করিয়া যখনই তাঁহার মন ঐ তত্ত্ব হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক হইয়া আপনাকে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের বা শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল, তখন উহা ঐ বিরাট ব্রহ্মের বিরাট মনে ঐরূপ ভাব বা ইচ্ছার বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল।[4] ঐ উপলব্ধি হইতে তাঁহার মনে নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ শরীররক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার বিচিত্র ইচ্ছায় বারংবার ভাবমুখে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে দেহরক্ষা করিতে হইবে এবং নিত্যকাল ব্রহ্মে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তিনি এখন ঐরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। জাতিস্মরত্বসহায়ে ঠাকুর এইকালেই সম্যক বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান আধিকারিক অবতারপুরুষ, বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি দূর করিয়া লোককল্যাণসাধনের জন্যই তাঁহাকে দেহধারণ ও তপস্যাদি করিতে হইয়াছে। একথাও তাঁহার এই সময়ে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা উদ্দেশ্য-বিশেষ সাধনের জন্যই এবার তাঁহাকে বাহ্যৈশ্বর্যের আড়ম্বরপরিশূন্য ও নিরক্ষর করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে আনয়ন করিয়াছেন এবং ঐ লীলারহস্য তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকে বুঝিতে সমর্থ হইলেও, যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ তাঁহার শরীরমনের দ্বারা জগতে

উদিত হইবে, তাহা সর্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্বে সাধকের জাতিস্মরত্বলাভ–সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা

ঐরূপ অসাধারণ উপলব্ধিসকল ঠাকুরের কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল বুঝিতে হইলে শাস্ত্রের কয়েকটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, অদ্বৈতভাবসহায়ে জ্ঞানস্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পূর্বে সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।[5] অথবা ঐ ভাবের পরিপাকে তাঁহার স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতঃপূর্বে তিনি যেভাবে যথায় যতবার শরীর পরিগ্রহপূর্বক যাহা কিছু সুকৃত-দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকে। ফলে সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা ও রূপরসাদি ভোগসুখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বারংবার একইভাবে জন্মপরিগ্রহের নিষ্ফলতা সম্যক প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ঐ বৈরাগ্যসহায়ে তাঁহার প্রাণ সর্ববিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক হইয়া দণ্ডায়মান হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সাধকের সর্বপ্রকার যোগবিভূতি ও সিদ্ধসঙ্কল্পত্ব–লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা

উপনিষদ্ বলেন,[6]ঐরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এবং দেব, পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখনই তাঁহার মন সমাধি-বলে ঐসকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পুরুষের সর্ববিধ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্যের স্বতঃ উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব ঐরূপ পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্যলাভ–উভয় কথার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বিচিত্র ঐশ্বর্যসকল লাভ করিলেও অন্তরে বিন্দুমাত্র বাসনা না থাকায় তাঁহারা ঐসকল শক্তি কখনও প্রয়োগ করেন না। পুরুষ সংসারে যে অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, জ্ঞানলাভের পরে তদবস্থাতে কালাতিপাত করে। কারণ চিত্ত সর্বপ্রকারে বাসনাশূন্য হওয়ায়, সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্তন করিবার আবশ্যকতা সে কিছুমাত্র অনুভব করে না। আধিকারিক পুরুষেরাই[7] কেবল সর্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া বহুজনহিতায় ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ সময়ে সময়ে করিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত শাস্ত্রকথা অনুসারে ঠাকুরের জীবনালোচনায় তাঁহার অপূর্ব উপলব্ধিসকলের কারণ বুঝা যায়

পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় কথাসকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্তমান জীবনের অনুশীলনে তাঁহার এইকালের বিচিত্র অনুভূতিসকল সম্যক না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে তিনি ভগবৎপাদপদ্মে অন্তরের সহিত সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্বপ্রকারে বাসনাপরিশূন্য হইয়াছিলেন বলিয়াই, অত স্বল্পকালে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুঝা যায়, জাতিস্মরত্বলাভ করিয়াই তিনি এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি 'শ্রীরাম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ'-রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্তমানকালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহপূর্বক 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুঝা যায়, লোককল্যাণসাধনের জন্য পরজীবনে তাঁহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা তাঁহাকে নিজ শরীরমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঐসকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে কখনও দেখিতে পাই না। বুঝা যায়, কেন তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিতে সমর্থ হইতেন এবং কেনই বা তাঁহার দিব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্ব আধিপত্য লাভ করিতেছে।

পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত না হইবার কারণ

অদ্বৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবরাজ্যে অবরোহণ করিবার কালে ঠাকুর ঐরূপে নিজ জীবনের ভূতভবিষ্যৎ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উপলব্ধিসকল তাঁহাতে যে সহসা একদিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের অনুমান, ভাব-ভূমিতে অবরোহণের পরে বৎসরকালের মধ্যে তিনি ঐসকল কথা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঐকালে

তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পর আবরণ উঠাইয়া দিন দিন তাঁহাকে ঐসকল কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল তাঁহার মনে যুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই, তদ্বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয়—অদ্বৈতভাবে অবস্থানপূর্বক গভীর ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে তিনি এই কালে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং যতদিন না তাঁহার মন পুনরায় বহির্মুখী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, ততদিন ঐসকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তাঁহার অবসর এবং প্রবৃত্তি হয় নাই। ঐরূপে সাধনকালের প্রারম্ভে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, আমি কি করিব, তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি তাহাই শিখিব'—তাহাই এই কালে পূর্ণ হইয়াছিল।

অদ্বৈতভাবলাভ করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঠাকুরের উপলব্ধি

অদ্বৈতভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষয়েরও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, "উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা; ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।"

পূর্বোক্ত উপলব্ধি তাঁহার পূর্বে অন্য কেহ পূর্ণভাবে করে নাই

ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষাপ্রদান করে ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উহা এখন অপূর্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ উদারতা ও সহানুভূতি যে তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি এবং পূর্বযুগের কোন সাধকাগ্রণী যে উহা তাঁহার ন্যায় পূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, একথা প্রথমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থসকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্মের একদেশী ভাব অপরে অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—তাঁহার ইসলাম ধর্মসাধন

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদারভাবসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা এই কালের একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব হইতে ধর্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলিত, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইসলামধর্মের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া যথারীতি দীক্ষাগ্রহণ করেন। ধর্মপিপাসু গোবিন্দ ইসলামধর্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে কোরানপাঠ এবং তদুক্ত প্রণালীতে সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মতো তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন।

সুফি গোবিন্দ রায়ের আগমন

যেরূপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং সাধনানুকূল স্থান বুঝিয়া পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসন বিস্তীর্ণ করিয়া কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রানী

রাসমণির কালীবাটীতে তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে গোবিন্দের অন্যত্র ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না এবং ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া তিনি সানন্দে দিনযাপন করিতেন।

গোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প

প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন এবং তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। ঐরূপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও তো ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্ত-লীলাময়ী মা এপথ দিয়াও তো কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন; কিরূপে তিনি এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন, তাহা দেখিতে হইবে; গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইব।'

গোবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সাধনে ঠাকুরের সিদ্ধিলাভ

যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা'-মন্ত্র জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম; ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হইয়াছিল।" ইসলামধর্মসাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর, জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।

মুসলমানধর্মসাধনকালে ঠাকুরের আচরণ

হৃদয় বলিত, মুসলমানধর্মসাধনের সময় ঠাকুর মুসলমানদিগের প্রিয় খাদ্যসকল, এমন কি গো-মাংস পর্যন্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরামোহনের সানুনয় অনুরোধই তখন তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বালকস্বভাব ঠাকুরের ঐরূপ ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ না হইলে তিনি কখনও নিরস্ত হইবেন না ভাবিয়া মথুর ঐ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাহার নির্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাদ্যসকল রন্ধন করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্মসাধনের সময় ঠাকুর কালীবাটীর অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই বাস করিয়াছিলেন।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান জাতি কালে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, ঠাকুরের ইসলামমত-সাধনে ঐ বিষয় বুঝা যায়

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে, একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত-ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।" ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্মসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল?

পরবর্তী কালে ঠাকুরের মনে অদ্বৈত-স্মৃতি কতদূর প্রবল ছিল

নির্বিকল্প ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন দ্বৈত ভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অদ্বৈতস্মৃতি অনেক সময় সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাকে তুরীয়ভাবে লীন করিত। সঙ্কল্প না করিলেও সামান্যমাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব, এখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিবামাত্র যে ঐ ভূমিতে আরোহণে

সমর্থ ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। অদ্বৈতভাব যে তাঁহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল, তাহা উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ঐ ভাব তাঁহার হৃদয়ে যেমন দুরবগাহ তেমনই দূরপ্রসারী ছিল।

ঐ বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্ত

(১) বৃদ্ধ ঘেসেড়া

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় মালীদিগের তরিতরকারি বপনের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঘেসেড়াদিগকে ঐ সময়ে ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। একজন বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন ঐরূপে বিনামূল্যে ঘাস লইবার অনুমতিলাভে সানন্দে সারাদিন ঐ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাহ্নে মোট বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, ঐ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু ঐ বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বৃহৎ বোঝাটি মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নানারূপে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। ঐ বিষয় দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নির্বুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান। 'হে রাম, তোমার বিচিত্র লীলা!'—বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

(২) আহত পতঙ্গ

একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি পতঙ্গ (ফড়িং) উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহ্যদেশে একটি লম্বা কাটি বিদ্ধ রহিয়াছে। কোন দুষ্ট বালক ঐরূপ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 'হে রাম, তুমি আপনার দুর্দশা আপনি করিয়াছ' বলিয়া হাস্যের রোল উঠাইলেন।

(৩) পদদলিত নবীন দূর্বাদল

কালীবাটীর উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয় দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্বতোভাবে নিজ অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি ঐ সময়ে ঐ স্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণা অনুভব হয়, ঐকালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকালমাত্র ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

(৪) নৌকায় মাঝিদ্বয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের নিজ শরীরে আঘাতানুভব

কালীবাটীর চাঁদনি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গা দর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে সহসা প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারংবার বলিতে লাগিল, "মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই।" পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে মাঝিদিগের বিবাদ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাতজনিত বেদনাচিহ্ন উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখনও সম্ভবপর! ঘটনাটি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক ঘটনার[৪] উল্লেখ করা যাইতে পারে।

[1] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়।

[2] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়।
[3] এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দেখ।
[4] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৩য় অধ্যায়।
[5] সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানং। – পাতঞ্জল সূত্র, বিভূতিপাদ, ১৮শ সূত্র।
[6] ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৮ম প্রপাঠক, ২য় খণ্ড।
[7] লোককল্যাণসাধনের জন্য যাঁহারা বিশেষ অধিকার বা শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।
[8] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়।

২.১৯. সপ্তদশ অধ্যায়: জন্মভূমিসন্দর্শন

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন

প্রায় ছয়মাস কাল ভুগিয়া ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইল এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিতে অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার শরীর তখনও পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। সুতরাং বর্ষাগমে গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাঁহার পেটের পীড়া পুনরায় দেখা দিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া মথুরবাবু প্রমুখ সকলে স্থির করিলেন, তাঁহার কয়েক মাসের জন্য জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। তখন সন ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে। মথুরপত্নী ভক্তিমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরের কামারপুকুরের সংসার শিবের সংসারের ন্যায় চির-দরিদ্র বলিয়া জানিতেন। অতএব সেখানে যাইয়া 'বাবা'কে যাহাতে কোন দ্রব্যের অভাবে কষ্ট পাইতে না হয়, এই প্রকারে তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় গুছাইয়া তাঁহার সঙ্গে দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।[1] অনন্তর শুভমুহূর্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্রা করিলেন। হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে যাইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতঃপূর্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরকে তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণ যে ভাবে দেখিয়াছিল

ইতঃপূর্বে প্রায় আট বৎসরকাল ঠাকুর কামারপুকুরে আগমন করেন নাই, সুতরাং তাঁহার আত্মীয়বর্গ যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। কখনও স্ত্রীবেশ ধরিয়া 'হরি হরি' করিতেছেন, কখনও সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কখনও 'আল্লা আল্লা' বলিতেছেন, প্রভৃতি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হওয়ায় ঐরূপ হইবার বিশেষ কারণ যে ছিল, একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহাদিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল। তাঁহারা দেখিলেন, তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্যপরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই ধর্মপ্রাণতা, সেই হরিনামে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হওয়া–সেই সকলই তাঁহাতে পূর্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কেবল কি একটা অদৃষ্টপূর্ব অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ তাঁহার শরীরমনকে সর্বদা এমন সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে, সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে এবং তিনি স্বয়ং ঐরূপ না করিলে ক্ষুদ্র সংসারের বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে তাঁহাদিগের অন্তরে বিষম সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য এক বিষয় তাঁহারা এখন বিশেষরূপে এই ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে থাকিলে সংসারের সকল দুর্ভাবনা কোথায় অপসারিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণে একটি ধীর স্থির আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত থাকে এবং দূরে যাইলে পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েন।

শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন

সে যাহা হউক, বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দেশে ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর এ বিষয় জানিতে পারিয়া উহাতে বিশেষ সম্মতি বা আপত্তি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বিবাহের পর নববধূর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শনলাভ হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়সকালে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরকে একদিন জয়রামবাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি নিতান্ত বালিকা; সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার এইটুকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটীর কোন নিভৃত অংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জা ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্‌কুচিতা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়া হয়। সেবার তাঁহাকে তথায় একমাস থাকিতেও হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর ও ঠাকুরের জননী তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায়

উভয়ের কাহাকেও দেখা তাঁহার ভাগ্যে হইয়া উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরায় শ্বশুরালয়ে আগমনপূর্বক দেড়মাস কাল থাকিয়াও পূর্বোক্ত কারণে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র তিন-চারি মাস তাঁহার তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিবার পরেই এখন সংবাদ আসিল–ঠাকুর আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তিনি তখন ছয়-সাত মাস হইল চতুর্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে গেলে বিবাহের পরে ইহাই তাঁহার প্রথম স্বামিসন্দর্শন।

আত্মীয়বর্গ ও বাল্যবন্ধুগণের সহিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ

কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয়-সাত মাস ছিলেন। তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রী-পুরুষ সকলে তাঁহার সহিত পূর্বের ন্যায় মিলিত হইয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরও বহুকাল পরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালক-বালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত ক্রীড়াদিতে যোগদান করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, কামারপুকুরের স্ত্রী-পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগদান করিয়া ঠাকুরের বর্তমান আনন্দ তদ্রূপ হইয়াছিল। তবে, ইহজীবনের নশ্বরতা অনুভব করিয়া যাহাতে তাহারা সংসারে থাকিয়াও ধীরে ধীরে সংযত হইতে এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে, তদ্বিষয়ে তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, একথা নিশ্চয় বলা যায়। ক্রীড়া, কৌতুক, হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর ঐসকল বিষয় যেভাবে শিক্ষা দিতেন, তাহা হইতে আমরা পূর্বোক্ত কথা অনুমান করিতে পারি।

উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

আবার এই ক্ষুদ্র পল্লীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র সংসারে থাকিয়া কেহ কেহ ধর্মজীবনে আশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনার তিনি বহুবার আমাদিগের নিকটে উল্লেখ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন–এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজগৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটি রমণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং নিকটে উপবিষ্টা থাকিয়া তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধীয় নানা প্রশ্নালাপে নিযুক্তা ছিলেন। ঐ সময়ে সহসা তাঁহার ভাবাবেশ হয় এবং অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দসাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন এবং নানাভাবে সন্তরণক্রীড়া করিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে তিনি অনেক সময়ে ঐরূপে ভাবাবেশে মগ্ন হইতেন। সুতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, "উনি (ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উঁহার ঐ আনন্দে ব্যাঘাত হইবে।" রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "রমণী সত্যই বলিয়াছে। আশ্চর্য, কিরূপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল!"

কামারপুকুরবাসীদিগকে ঠাকুরের অপূর্ব নূতনভাবে দেখিবার কারণ

কামারপুকুরপল্লীস্থ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে এখন যে অনেকাংশে নবীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা যায়। বিদেশ হইতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয়, ঠাকুরের এখন অনেকটা তদ্রূপ হইয়াছিল। কারণ ঐ কেবল আট বৎসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দূরে থাকিলেও ঐ কালের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া উহাতে আমূল পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দূরাৎ সুদূরে দেশকালের সীমার বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতরে পুনরায় ফিরিবার কালে সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আগমনপূর্বক সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে অপূর্ব নবীনভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিন্তাশ্রেণীসমূহের পারম্পর্য হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি এবং উহার

দৈর্ঘ্য-স্বল্পতাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ। ঐজন্য স্বল্পকালের মধ্যে প্রভূত চিন্তারাশির অন্তরে উদয় ও লয় হইলে ঐকাল আমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্বোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়! সুতরাং ঐ কালকে তাঁহার যে এক যুগতুল্য বলিয়া অনুভব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

জন্মভূমির সহিত ঠাকুরের চিরপ্রেমসম্বন্ধ

কামারপুকুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, কামার, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশিগণের পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষদিগের সকলেই তাঁহার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার সরলহৃদয়া ভক্তিমতী বিধবা কন্যা প্রসন্ন ও ঠাকুরের বাল্যসখা, তৎপুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা, সরলবিশ্বাসী শ্রীনিবাস শাঁখারী, পাইনদের বাটীর ভক্তিপরায়ণা রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকন্যা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তি-ভালবাসার কথা ঠাকুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন এবং আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইঁহারা সকলে প্রায় সর্বক্ষণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিতেন। বিষয় বা গৃহকর্মের অনুরোধে যাঁহারা ঐরূপ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা সকাল সন্ধ্যা বা মধ্যাহ্নে অবসর পাইলেই আসিয়া উপস্থিত হইতেন। রমণীগণ তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, তজ্জন্য নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী নিজ সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। গ্রামবাসিগণের ঐসকল মধুর আচরণ এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিয়াও ঠাকুর নিরন্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন, সেসকল কথার আভাস আমরা অন্যত্র পাঠককে দিয়াছি,[2]সেজন্য পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরের নিজ পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনের আরম্ভ

কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্তব্যপালনে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন। নিজ পত্নীর তাঁহার নিকটে আসা না আসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যখন তিনি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর তখন তাঁহাকে শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদানপূর্বক তাঁহার কল্যাণসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া শ্রীমদাচার্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।" শ্রীমৎ তোতার পূর্বোক্ত কথা ঠাকুরের স্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলব্ধ নিজ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

ঐ বিষয়ে ঠাকুর কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন

কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোন কার্য উপেক্ষা বা অর্ধসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না; বর্তমান বিষয়েও তদ্রূপ হইয়াছিল। ঐহিক, পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা-পত্নীকে শিক্ষাপ্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয়ে অর্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা এবং গৃহকর্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশকালপাত্রভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন,[3]তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অখণ্ডব্রহ্মচর্যসম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া পূর্বোক্তরূপ শিক্ষাপ্রদানের ফল কতদূর কিরূপ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের আমরা অন্যত্র আভাস প্রদান করিয়াছি। অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তা হইয়া সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতাজ্ঞানে

ঠাকুরকে আজীবন পূজা করিতে এবং তাঁহার শ্রীপদানুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ঐরূপ আচরণদর্শনে ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা ও ভাবান্তর

পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনে অগ্রসর ঠাকুরকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এখন অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ তোতার সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার কালে তিনি তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[4]তাঁহার মনে হইয়াছিল, সন্ন্যাসী হইয়া অদ্বৈততত্ত্বের সাধনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ঐরূপ কোন আশঙ্কাই এই সময়ে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্নীর সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্যের হানি হইবে। ঠাকুর কিন্তু পূর্ববারের ন্যায় এবারেও ব্রাহ্মণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণী যে উহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণা হইয়াছিলেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঐরূপেই এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ঐ ঘটনায় তাঁহার অভিমান প্রতিহত হইয়া ক্রমে অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল এবং কিছুকালের জন্য উহা তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনা করিয়াছিল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি ঐ বিষয়ের প্রকাশ্য পরিচয় পর্যন্ত প্রদান করিয়া বসিতেন। যথা—আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন তাঁহার সমীপে উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া বসিতেন, “সে আবার বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান তো আমিই করিয়াছি!” অথবা সামান্য কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিয়া বসিতেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কথা বা অন্যায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহাকে পূর্বের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার নির্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী শ্বশ্রূতুল্যা জানিয়া ভক্তিপ্রীতির সহিত সর্বদা ব্রাহ্মণীর সেবাদিতে নিযুক্তা থাকিতেন এবং তাঁহার কোন কথা বা কার্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না।

অভিমান-অহঙ্কারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিনাশ

অভিমান, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মনুষ্যেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব ঐরূপ অহঙ্কার পদে পদে প্রতিহত হইতে দেখিয়াই মানব উহার বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিতে পারে এবং উহাকে পরিত্যাগপূর্বক নিজ কল্যাণসাধনের অবসর লাভ করে। বিদুষী সাধিকা ব্রাহ্মণীরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। অহঙ্কারের বশবর্তিনী হইয়া তিনি ‘যেখানে যেমন, সেখানে তেমন’ ব্যবহার করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ক ঘটনা

শ্রীনিবাস শাঁখারীর কথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ জাতিতে জন্মপরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাস ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বড় ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য ইনি একদিন এই সময়ে ঠাকুরের সমীপে আগমন করেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে পাইয়া ঠাকুর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সকলে সেদিন বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাসের বিশ্বাসভক্তি দর্শনে পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথামত তিনি আপন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, “আমরাই উহা করিব এখন।” ব্রাহ্মণী বারংবার ঐরূপ বলায় শ্রীনিবাস অগত্যা নিরস্ত হইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণীর সহিত হৃদয়ের কলহ

সমাজ-প্রবল পল্লীগ্রামে সামান্য সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া অনেক সময় বিষম গণ্ডগোল এবং দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এখনও ঐরূপ হইবার উপক্রম হইল। কারণ, ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবী শ্রীনিবাসের উচ্ছিষ্ট মোচন করিবেন, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী

ব্রাহ্মণকন্যাগণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে সম্মতা হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ঐকথা শুনিতে পাইল। সামান্য বিষয় লইয়া বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া হৃদয় ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্যে বিরত হইতে বলিলেও তিনি তাহার কথা গ্রহণ করিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ঐরূপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না।" ব্রাহ্মণীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, বলিলেন–"না দিলে ক্ষতি কি? শীতলার ঘরে[5] মনসা[6] শোবে এখন!" তখন বাটীর অন্য সকলে মধ্যস্থ হইয়া নানা অনুনয়-বিনয়ে ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্য হইতে নিরস্ত করিয়া বিবাদশান্তি করিলেন।

ব্রাহ্মণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপরাধের আশঙ্কা, অনুতাপ ও ক্ষমা চাহিয়া কাশীগমন

অভিমানিনী ব্রাহ্মণী সেদিন নিরস্তা হইলেও অন্তরে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে যখন ঐরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হইতেছে, তখন অতঃপর এইখানে তাঁহার আর অবস্থান করা শ্রেয়ঃ নহে। সদসদ্বিচারসম্পন্ন বিবেকী সাধক যখন অন্তরদর্শনে নিযুক্ত হয়েন, চিত্তের কোন মলিন ভাবই তখন তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারে না–ব্রাহ্মণীরও এখন তদ্রূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভাবপরিবর্তনের আলোচনা করিয়া তিনি উহারও মূলে আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্তা হইলেন। অনন্তর কয়েক দিন গত হইলে এক দিবস তিনি ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দনচর্চিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। পরে সংযতা হইয়া মনপ্রাণ ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন। কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে নিরন্তর থাকিবার পরে ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন

ঐরূপে প্রায় সাতমাসকাল নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার শরীর তখন পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়াছিল। এখানে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহার কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

[1] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়।
[2] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়।
[3] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় এবং ৪র্থ অধ্যায়।
[4] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়।
[5] অর্থাৎ দেবমন্দিরে।
[6] ব্রাহ্মণী ঐরূপে ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত আপনাকে সমতুল্য করেন।

২.২০. অষ্টাদশ অধ্যায়: তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা

ঠাকুরের তীর্থযাত্রা স্থির হওয়া

মথুরবাবু এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পুণ্যতীর্থসকল দর্শনে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এবং গুরুপুত্রাদি অন্যান্য অনেক ব্যক্তি সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সস্ত্রীক মথুরামোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফলে বৃদ্ধা জননী[1] এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন।

ঐ যাত্রার সময়নিরূপণ

অনন্তর শুভদিন আগত দেখিয়া মথুরবাবু ঠাকুরপ্রমুখ সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ, ইংরাজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তারিখ হইবে। ঠাকুরের তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।[2] সেজন্য হৃদয়ের নিকট ঐ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ঐ যাত্রার বন্দোবস্ত

হৃদয় বলিত, শতাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া মথুরবাবু এইকালে তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ি রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ (reserve) করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং বন্দোবস্ত ছিল কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ চারিখানি গাড়ি ইচ্ছামত কাটাইয়া লইয়া মথুরবাবু কয়েকদিন অবস্থান করিতে পারিবেন।

৺বৈদ্যনাথদর্শন ও দরিদ্রসেবা

দেওঘরে ৺বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ও পূজাদি করিবার জন্য মথুরবাবু কয়েকদিন অবস্থান করেন। একটি বিশেষ ঘটনা এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক দরিদ্র পল্লীর স্ত্রী-পুরুষদিগের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল এবং মথুরবাবুকে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।[3]

পথে বিঘ্ন

বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুক্ত মথুর একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কেবল, কাশীর সন্নিকটে কোন স্থানে কার্যান্তরে গাড়ি হইতে নামিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হৃদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে এই মর্মে তার করিয়া পাঠান যে, পরবর্তী গাড়িতে যেন তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী গাড়ির জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কার্যের তত্ত্বাবধানে একখানি স্বতন্ত্র (special) গাড়িতে করিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া নিজ গাড়িতে উঠাইয়া লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্রবাবু কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন।

কেদারঘাটে অবস্থান ও ৺বিশ্বনাথদর্শন

কাশীধামে পৌঁছিয়া মথুরবাবু কেদারঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন।[4] ঐ কারণে এবং বাটীর বাহিরে কোন স্থানে গমন করিবার কালে রূপার ছত্র ও আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অগ্র-পশ্চাৎ দ্বারবানগণকে যাইতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একজন রাজরাজড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিল।

এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাল্কীতে চাপিয়া প্রায় প্রত্যহ ৺বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, দেবদর্শনকালের তো কথাই নাই। ঐরূপে সকল দেবস্থানে তাঁহার ভাবাবেশ হইলেও কেদারনাথের মন্দিরে তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত।

ঠাকুর ও শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী

দেবস্থান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিখ্যাত সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। ঐরূপে পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে দর্শন করিতে তিনি একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন। স্বামীজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম দর্শনের দিন স্বামীজী আপন নস্যদানি ঠাকুরের সম্মুখে ধারণপূর্বক ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অবয়বসকলের গঠন লক্ষ্য করিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "ইঁহাতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণসকল বর্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।" স্বামীজী তখন মণিকর্ণিকার পার্শ্বে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয় কয়েক কোদাল মৃত্তিকা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। তৎপরে ঠাকুর একদিন স্বামীজীকে দেখিতে গিয়া স্বহস্তে পায়সান্ন খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।[5]

৺প্রয়াগধামে ঠাকুরের আচরণ

পাঁচ সাত দিন কাশীতে থাকিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলেন। মথুরপ্রমুখ সকলে তথায় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মস্তক মুণ্ডিত করিলেও ঠাকুর উহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, "আমার করিবার আবশ্যক নাই।" প্রয়াগ হইতে মথুরবাবু পুনরায় ৺কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং এক পক্ষকাল তথায় বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবনাদি স্থান দর্শন

শ্রীবৃন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটি বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর ন্যায় এখানেও তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন এবং পত্নীসমভিব্যাহারে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। নিধুবন ভিন্ন ঠাকুর এখানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি খ্যাতনামা সাধকসাধিকাগণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়কে তাঁহার অঙ্গের লক্ষণসকল দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ইঁহার বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে।"

৺কাশীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি

এক পক্ষকাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। ঐ সময়ে ঠাকুর এখানে সুবর্ণময়ী অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন।

কাশীতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন—ব্রাহ্মণীর শেষ কথা

কাশীধামে যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত ঠাকুরের পুনরায় দেখা হইয়াছিল এবং চৌষট্টিযোগিনী নামক পল্লীস্থ তাঁহার আবাসে তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী ঐস্থলে মোক্ষদা নাম্নী একটি রমণীর সহিত বাস করিতেছিলেন। ঐ রমণীর ভক্তি-বিশ্বাসদর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর এখন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ঠাকুর তথা হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

বীনকার মহেশকে দেখিতে যাওয়া

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে তথায় কোন বীণকার উপস্থিত না থাকায় উহা সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরিয়া তাঁহার মনে পুনরায় ঐ ইচ্ছা উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীণকারের ভবনে হৃদয়ের সহিত উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বীণা শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মহেশবাবু কাশীস্থ মদনপুরা নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহ্লাদে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বীণা বাজাইয়াছিলেন। বীণার মধুর ঝঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে 'মা, আমায় হুঁশ

দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব'—এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুনা গিয়াছিল। ঐরূপ প্রার্থনার পরে তিনি বাহ্যভাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সদানন্দে বীণা শ্রবণপূর্বক মধ্যে মধ্যে উহার সুরের সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া গীত গাহিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ঐরূপে আনন্দে অতিবাহিত হইলে মহেশবাবুর অনুরোধে তিনি ঐস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহেশবাবু তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—বীণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মত্ত হইয়া উঠিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন ও আচরণ

কাশী হইতে শ্রীযুক্ত মথুর গয়াধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি[6] থাকায় তিনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ঐরূপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর মথুরবাবুর সহিত পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটিরমধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হইল।" হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে মথুরবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রিত করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। মথুরবাবু ঐকালে গোস্বামীদিগকে ১৬ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১ টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।

হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য

তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনায় তাহার মন সংসারের প্রতি কিছুকালের জন্য বিরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, হৃদয়রাম ভাবুক ছিল না। নিজ ক্ষুদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যথাসম্ভব ভোগ-সুখে কালযাপন করাই তাহার জীবনে আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে তাহার মনে কখনও কখনও অন্য ভাবের উদয় হইলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইত না। ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় সকল ভুলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা সংসিদ্ধ না হইত, ততকাল তাহার মনে অন্য চিন্তা প্রবেশলাভ করিত না। সেজন্য ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও, সে তাহার স্বল্পই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। ঐরূপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার মাতুলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং তাঁহার যখন যেরূপ সেবার আবশ্যক হইত, তাহা সম্পাদন করিতে যত্নের ত্রুটি করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্যকুশলতা বিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আবার বিখ্যাত সাধকদিগের নিকটে মাতুলের অলৌকিকত্ব শ্রবণে এবং তাঁহাতে দৈবশক্তিসকলের প্রকাশদর্শনে তাহার মনে একটা বিশেষ বলের সঞ্চারও হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবাদ্বারা যখন সে তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে, তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলসকল তাহার একপ্রকার করায়ত্তই রহিয়াছে। যখনই তাহার মন ঐসকল লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে, মাতুল নিজ দৈবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে তখনই ঐসকল লাভ করাইয়া দিবেন। অতএব পরকাল সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। কিছুকাল সংসারসুখ ভোগ করিবার পরে সে পারত্রিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। পত্নী-বিয়োগবিধুর হৃদয় ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্বাপেক্ষা নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় মনোনিবেশ করিল, পরিধানের কাপড় ও পৈতা খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল, তাহার যাহাতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহা করিয়া দিতে হইবে। ঠাকুর তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, তাহার ঐরূপ করিবার আবশ্যক নাই, তাঁহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি দিবারাত্র ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রাদি শারীরিক সকল চেষ্টা ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কে কাহাকে দেখিবে,

ইত্যাদি–সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, "মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে!–মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টাইয়া দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত উপলব্ধিসকল করাইয়া দিয়াছেন–মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।"

হৃদয়ের ভাবাবেশ

ঐরূপ কথাবার্তার কয়েকদিন পরে পূজা ও ধ্যানকালে হৃদয়ের জ্যোতির্ময় দেবমূর্তিসকলের দর্শন এবং অর্ধবাহ্যভাব হইতে আরম্ভ হইল। মথুরবাবু হৃদয়কে একদিন ঐরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন–"হৃদুর আবার একি অবস্থা হইল, বাবা?" ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "হৃদয় ঢং করিয়া ঐরূপ করিতেছে না–একটু-আধটু দর্শনের জন্য সে মাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিল, তাই ঐরূপ হইতেছে। ঐরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।" মথুর বলিলেন, "বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও–আমরা উভয়ে নন্দীভৃঙ্গীর মতো তোমার কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের ঐরূপ অবস্থা কেন?"

হৃদয়ের অদ্ভুত দর্শন

মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী-অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব দর্শন উপস্থিত হইল। সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত অপূর্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং চলিবার কালে তাঁহার জ্যোতির্ময় পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শূন্যে শূন্যেই তাঁহাকে বহন করিতেছে! চক্ষুর দোষে ঐরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া হৃদয় বারংবার চক্ষু মার্জন করিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না–বৃক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটির প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ববৎ দেখিতে পাইলেও ঠাকুরকে পুনঃপুনঃ ঐরূপ দেখিতে থাকিল! তখন বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, 'আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে ঐরূপ দেখিতেছি?' ঐরূপ ভাবিয়া সে আপনার দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল সেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ময় দেবানুচর সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাঁহার সেবা করিতেছে। মনে হইল, সে যেন ঐ দেবতার জ্যোতির্ঘন-অঙ্গসম্ভূত অংশবিশেষ, এবং তাঁহার সেবার জন্যই তাহার ভিন্ন শরীরধারণপূর্বক পৃথকভাবে অবস্থিতি। ঐরূপ দেখিয়া এবং নিজ জীবনের ঐরূপ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পৃথিবীর মানুষ তাহাকে উন্মাদ বলিবে, সে কথা ভুলিল এবং অর্ধবাহ্যভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল–"ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা তো মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যাহা, আমিও তাহাই!"

হৃদয়ের মনের জড়ত্বপ্রাপ্তি

ঠাকুর বলিতেন, "তাহাকে ঐরূপ চিৎকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 'ওরে থাম থাম, অমন বলিতেছিস কেন, কি একটা হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে।' কিন্তু সে কি তাহা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'দে মা, শালাকে জড় করে দে'।"

হৃদয় বলিত, ঠাকুর ঐরূপ বলিবামাত্র তাহার পূর্বোক্ত দর্শন ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে পূর্বে যেমন ছিল, আবার তেমনি হইল। অপূর্ব আনন্দ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, "মামা, তুমি কেন অমন করিলে, কেন জড় হইতে বলিলে, ঐরূপ দর্শনানন্দ আমার আর হইবে না।" ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে জড় হইতে বলিয়াছি? তুই এখন স্থির হইয়া থাক–এই কথা বলিয়াছি। সামান্য দর্শনলাভ করিয়া তুই যে গোল করিলি, তাহাতেই

তো আমাকে ঐরূপ বলিতে হইল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি কি ঐরূপ গোল করি? তোর এখনো ঐরূপ দর্শন করিবার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া থাক, সময় হইলে আবার কত কি দেখিবি!”

হৃদয়ের সাধনায় বিঘ্ন

ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথায় হৃদয় নীরব হইলেও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইল। পরে অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া সে ভাবিল, যেরূপেই হউক সে ঐরূপ দর্শন আবার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। সে ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়াইল এবং রাত্রে পঞ্চবটীতলে যাইয়া ঠাকুর যেখানে বসিয়া পূর্বে জপ-ধ্যান করিতেন, সেই স্থলে ৺জগদম্বাকে ডাকিবে, এইরূপ মনস্থ করিল। ঐরূপ ভাবিয়া একদিন সে গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগপূর্বক পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের মনে পঞ্চবটীতলে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও ঐদিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতর চিৎকারে তাঁহাকে ডাকিতেছে, “মামা গো, পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম!” ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে, কি হইয়াছে?” হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল, “মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢালিয়া দিল, অসহ্য দাহ-যন্ত্রণা হইতেছে!” ঠাকুর তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিলেন, “যা, ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তুই কেন এরূপ করিস্ বল দেখি? তোকে বলিয়াছি আমার সেবা করিলেই তোর সব হইবে।” হৃদয় বলিত, ঠাকুরের হস্তস্পর্শে বাস্তবিক তাহার সকল যন্ত্রণা তখনই শান্ত হইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবটীতে ঐরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে তাহার ভাল হইবে না।

হৃদয়ের ৺দুর্গোৎসব

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয় এখন অনেকটা শান্তিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটীর দৈনন্দিন কর্মসকল তাহার পূর্বের ন্যায় রুচিকর বোধ হইতে লাগিল না। তাহার মন নূতন কোন কর্ম করিয়া নবোল্লাস লাভ করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটীতে শারদীয়া পূজা করিতে মনস্থ করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের তখন মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব মথুরবাবুর জমিদারিতে খাজানা আদায়ের কর্মে বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছে। সময় ফিরায় বাটীতে নূতন চণ্ডীমণ্ডপখানি নির্মিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৺জগদম্বাকে আনিয়া তথায় বসাইবেন; কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। হৃদয় তখন তাঁহার ঐ ইচ্ছা স্মরণপূর্বক উহা পূর্ণ করিতে যত্নপর হইল। কর্মী হৃদয়ের ঐ কার্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মথুরবাবু হৃদয়ের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর ঐরূপে অর্থসাহায্য করিলেন বটে, কিন্তু পূজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হৃদয় তাহাতে ক্ষুণ্ণমনে পূজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার কালে তাহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তুই দুঃখ করিতেছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রাখিয়া নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস্ এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাহ্নে দুগ্ধ, গঙ্গাজল ও মিছরির শরবত পান করিস। ঐরূপে পূজা করিলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।” ঐরূপে ঠাকুর, কাহার দ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধারক করিতে হইবে, কিভাবে অন্য সকল কার্য করিতে হইবে–সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন এবং সে মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল।

৺দুর্গোৎসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখা

বাটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং ষষ্ঠীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সপ্তমীবিহিতা পূজা সাঙ্গ

করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে সে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।”

৺দুর্গোৎসবের শেষ কথা

হৃদয় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, “তুই তিন বৎসর পূজা করিবি।”—ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের কথা না শুনিয়া চতুর্থবারে পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া এমন বিঘ্নপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৎসরে পূজার কিছুকাল পরে হৃদয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের পূজাকার্যে এবং ঠাকুরের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

[1] কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাঁহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হৃদয় কিন্তু আমাদিগকে অন্যরূপ বলিয়াছিল।

[2] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়।

[3] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

[4] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়।

[5] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, ১৪৫ পৃঃ। – প্রঃ

[6] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

২.২১. ঊনবিংশ অধ্যায়: স্বজনবিয়োগ

রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের কথা

ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত পাঠককে আমরা ইতঃপূর্বে সামান্যভাবে পরিচিত করাইয়াছি। পূজ্যপাদ আচার্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরে সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিল। তখন তাহার বয়স সতর বৎসর হইবে। তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

অক্ষয়ের রূপ

জন্মগ্রহণকালে অক্ষয়ের প্রসূতির মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন বালক নিজ আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর মাত্র ছিল। অতএব ঐ ঘটনার পূর্বে দুই তিন বৎসরকাল পর্যন্ত ঠাকুর অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতে ও সর্বদা আদরযত্ন করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিন্তু অক্ষয়কে কখনো ক্রোড়ে করেন নাই, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই; এ ছেলে বাঁচিবে না!" পরে ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন, তখন সুন্দর শিশু তাঁহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রমপূর্বক যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি অক্ষয় বাস্তবিকই অতি সুপুরুষ ছিল। তাঁহারা বলিতেন, অক্ষয়ের দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গঠনও তেমন সুঠাম ও সুললিত ছিল—দেখিলে জীবন্ত শিবমূর্তি বলিয়া জ্ঞান হইত।

অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনানুরাগ

বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের সেবায় সে প্রতিদিন অনেক কাল যাপন করিত। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অক্ষয় যখন পূজাকার্যে ব্রতী হইল, তখন আপনার মনের মতো কার্যেই নিযুক্ত হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজা করিতে বসিয়া অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় হইত যে, ঐ সময় বিষ্ণুঘরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে জানিতে পারিত না—দুই ঘণ্টাকাল ঐরূপে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার হুঁশ হইত!" হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের নিত্যপূজা সুসম্পন্ন করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্বক অনেকক্ষণ শিবপূজায় অতিবাহিত করিত; পরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন-সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে নিবিষ্ট হইত। তদ্ভিন্ন নবানুরাগের প্রেরণায় সে এইকালে ন্যাস ও প্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়া বসিত যে, তজ্জন্য তাহার কণ্ঠতালুদেশ স্ফীত হইয়া কখনো কখনো রুধির নির্গত হইত। অক্ষয়ের ঐরূপ ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ তাহাকে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

অক্ষয়ের বিবাহ

ঐরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৬ সালের অর্ধেকের অধিক অতীত হইল। অক্ষয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া খুল্লতাত রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্য এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কামারপুকুরের অনতিদূরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্তা পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন অক্ষয়কে লইয়া যাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন চৈত্র মাস। চৈত্র মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর উহা মানিলেন না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটীতে আগমনকালে ঐ নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্যকতা নাই। বাটীতে ফিরিয়া অনতিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল।

বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অক্ষয়ের কঠিন পীড়া হইল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামারপুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করাইয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আসিয়া তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি

হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জ্বর হইল। ডাক্তার-বৈদ্যেরা বলিল, সামান্য জ্বর, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার পীড়া—অক্ষয়ের মৃত্যু-ঘটনা ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পারা

হৃদয় বলিত, অক্ষয় শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর ইতঃপূর্বে বলিয়াছিলেন, "হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ, রাক্ষসগণবিশিষ্টা কোন কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে, ছোঁড়া মারা যাইবে দেখিতেছি!" যাহা হউক, তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জ্বরের উপশম হইল না দেখিয়া ঠাকুর এখন হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "হৃদু, ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া আশ মিটাইয়া চিকিৎসা কর, ছোঁড়া কিন্তু বাঁচিবে না।"

অক্ষয় বাঁচিবে না শুনিয়া হৃদয়ের আশঙ্কা ও আচরণ

হৃদয় বলিত, তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া আমি বলিলাম, 'ছি ছি মামা, তোমার মুখ দিয়া ওরকম কথাগুলা কেন বাহির হইল?'—তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি কি ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ বলিয়াছি? মা যেমন জানান ও বলান, ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে তেমনি বলিতে হয়। আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় মারা পড়ে?"

অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকুরের আচরণ

ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল এবং সুচিকিৎসকসকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীড়া-আরোগ্যের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। অনন্তর প্রায় মাসাবধি ভুগিবার পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত দেখিয়া ঠাকুর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "অক্ষয়, বল্, গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম!" অক্ষয় এক দুই করিয়া তিনবার ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পরক্ষণেই তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তত হাসিতে লাগিলেন!

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট

প্রিয়দর্শন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়া ঠাকুর ঐরূপে হাস্য করিলেও প্রাণে বিষমাঘাত যে অনুভব করেন নাই, তাহা নহে। বহুকাল পরে আমাদের নিকট ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ভাবাবেশে মৃত্যুটাকে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র বলিয়া দেখিতে পাইলেও ভাবভঙ্গ হইয়া সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব বোধ করিয়াছিলেন।[1] অক্ষয়ের দেহত্যাগ ঐ বাটীতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি মথুরবাবুর বৈঠকখানা বাটীতে অতঃপর আর কখনো বাস করিতে পারেন নাই।

ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের পূজকের পদগ্রহণ

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীউর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারের সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধান তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে পারিতেন না। বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে ঐ কার্যের ভারার্পণপূর্বক মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর গ্রামে যাইয়া থাকিতেন। শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীননাথ নামক এক ব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ কর্ম সম্পন্ন করিত।

মথুরের সহিত ঠাকুরের রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা

অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমিদারি মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয়, তিনি এখন ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমভক্ত মথুর এক পক্ষে যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে সকল বিষয়ে তাঁহার অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপার মাত্রে অনভিজ্ঞ বালকবোধে সর্বতোভাবে নিজরক্ষণীয় বিবেচনা করিতেন। মথুরের জমিদারি মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া

ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্দশা ও অভাব দেখিয়া তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন' দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, রাণাঘাটের সন্নিকটে কলাইঘাট নামক স্থানে পূর্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

মথুরের নিজবাটী ও গুরুগৃহ-দর্শন

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে মথুরের পৈতৃক ভিটা ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তখন মথুরের জমিদারিভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মথুর এই সময়ে ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে মথুরের গুরুগৃহ অধিক দূরবর্তী ছিল না। বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এইকালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগরো। মথুর তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন।[2] মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন পরিচর্যায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

কলুটোলার হরিসভায় ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যদেবের আসনাধিকার ও কালনা, নবদ্বীপাদি দর্শন

মথুরের বাটী ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় কলুটোলা নামক পল্লীতে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত বা ধরের বাটীতে তখন হরিসভার অধিবেশন হইত। ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমনপূর্বক ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠককে অন্যত্র প্রদান করিয়াছি।[3] উহার অনতিকাল পরে ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় মথুরবাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কালনায় গমন করিয়া ঠাকুর কিরূপে ভগবানদাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কিরূপ অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সেসকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।[4] সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে ঠাকুর ঐসকল পুণ্যস্থানদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্নিকট গঙ্গার চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেরূপ গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া তদ্রূপ হয় নাই। মথুরবাবু প্রভৃতি ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে; ঐসকল চড়ার স্থলেই সেইসকল বিদ্যমান ছিল, সেইজন্যই ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল।

মথুরের নিষ্কাম ভক্তি

একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া মথুরবাবুর মন এখন কতদূর নিষ্কামভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে হৃদয় আমাদিগকে একটি ঘটনা বলিয়াছিল। পাঠককে উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

এক সময়ে মথুরবাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ঐ সময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐ কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমি যাইয়া কি করিব, তাহার ফোড়া আরাম করিয়া দিবার আমার কি শক্তি আছে?" ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়া বারংবার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতায় ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। ঠাকুর উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।"

ঠাকুর বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা লইয়া কি হইবে, উহাতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে?"

মথুর তাহাতে বলিলেন, "বাবা, আমি কি এমনি, তোমার পায়ের ধূলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাহিতেছি।"

ঐ কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মথুর ঐ অবকাশে তাঁহার চরণে মস্তকস্থাপনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার দুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

ঠাকুরের সহিত মথুরের গভীর প্রেমসম্বন্ধ

মথুরবাবু ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্বিষয়ের নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক কথায় বলিতে হইলে, তিনি তাঁহাকে ইহকাল পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীনচেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্যে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও ঐ ভাব ভুলিয়া তখনই আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূর্বক তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় –

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে, আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাকিব।' মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ জগদম্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন—সুতরাং ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহার অবর্তমানে ঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী ও পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।' মথুরকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকিবে, আমি ততদিন থাকিব!' ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ও দ্বারকানাথের দেহাবসানের অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিলেন।[5] উহার পরে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

অন্য এক দিবস মথুরবাবু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "কই বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ আসিবে, তাহারা কেহই তো এখনো আসিল না?" ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 'কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে কত দিনে আনিবেন—তাহারা সব আসিবে, একথা কিন্তু মা আমাকে স্বয়ং জানাইয়াছেন। অপর যাহা যাহা দেখাইয়াছেন সে-সকলি তো একে একে সত্য হইয়াছে, এটি কেন সত্য হইল না কে জানে!' ঐ বলিয়া ঠাকুর বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ দর্শনটি কি তবে ভুল হইল? মথুর তাঁহাকে বিষণ্ন দেখিয়া মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন ঐকথা পাড়িয়া ভাল করেন নাই। পরে বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সান্ত্বনার জন্য বলিলেন, 'তারা আসুক আর নাই আসুক, বাবা, আমি তো তোমার চিরানুগত ভক্ত রহিয়াছি—তবে আর তোমার দর্শন সত্য হইল না কিরূপে? আমি একাই একশত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলিয়াছিলেন অনেক ভক্ত আসিবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'কে জানে বাবু, তুমি যা বলচ তাই বা হবে!' মথুর ঐ প্রসঙ্গে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া অন্য কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইয়া দিলেন।

মথুরের ঐরূপ নিষ্কাম ভক্তি লাভ করা আশ্চর্য নহে—ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত

ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে মথুরের মনে কতদূর ভাবপরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন, মুক্ত পুরুষের সেবকেরা

তদনুষ্ঠিত শুভকর্মসকলের ফলের অধিকারী হয়েন। অতএব অবতার-পুরুষের সেবকেরা যে বিবিধ দৈবী সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

মথুরের দেহত্যাগ

সম্পদ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুরূপ তরঙ্গসমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আষাঢ়েরও অর্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি হইয়া সাত-আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্-রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, মা তাঁহার ভক্তকে নিজ স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন–মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্-যাপন হইয়াছে। সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও স্বয়ং মথুরকে দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষদিন উপস্থিত হইল–অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেইদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না, কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে দুই-তিন ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন এবং জ্যোতির্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন–বহুপুণ্যার্জিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন।

ঠাকুরের ভাবাবেশে ঐ ঘটনা দর্শন

ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন (তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে) এবং বলিলেন, “শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্য রথে উঠাইয়া লইলেন–তাহার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করিল।” পরে গভীর রাত্রে কালীবাটীর কর্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, মথুরবাবু অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় দেহরক্ষা করিয়াছেন।[6] ঐরূপে পুণ্যলোকে গমন করিলেও ভোগ-বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়ায় পরম ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে পুনরায় ফিরিতে হইবে, ঠাকুরের মুখে একথা আমরা অন্য সময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।[7]

[1] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়।

[2] হৃদয় বলিত, যাইবার কালে পথ বন্ধুর ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন এবং গ্রামে পৌঁছিবার পরে ঠাকুরের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে কখনও কখনও হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

[3] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়।

[4] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়।

[5] “Jagadamba died on or about 1st January, 1881, intestate, leaving defendant Trayluksha, then the only son of Mathura, her surviving.” Quoted from Plaintiff’s statement in High Court, Suit No. 203 of 1889”

[6] “Mathura Mohan Biswas died in July, 1871, intestate, leaving his surviving Jagadamba, sole widow, Bhupal since deceased, a son by his another wife who had predeceased him – and Dwarka Nath Biswas since deceased, defendant Trayluksha Nath and Thakurdas alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba.”

Quoted from plaintiff’s statement in High Court Suit No. 230 of 1889 – Shyama Charan Biswas vs. Trayluksha Nath Biswas, Gurudas, Kalidas, Durgadas and Kumudini.

[7] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

২.২২. বিংশ অধ্যায়: ৺ষোড়শী পূজা

বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে শ্রীশ্রীমা বালিকামাত্র ছিলেন

মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মানবের জীবনপ্রবাহ কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা ঐকালে উপস্থিত হইয়াছিল। উহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জয়রামবাটী গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে একবার গমন করিতে হইবে।

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়া রমণীগণ তাঁহার পত্নীকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে বিবাহের পর ঐকালেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর স্বামিসন্দর্শন প্রথম লাভ হইয়াছিল। কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না।

গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরীরমনের পরিণতি হয়

চতুর্দশ এবং কখনও কখনও পঞ্চদশ ও ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যাদিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদ্‌গত হয় না এবং শরীরের ন্যায় তাহাদিগের মনের পরিণতিও ঐরূপ বিলম্বে উপস্থিত হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীসকলের ন্যায় অল্পপরিসর স্থানে কালযাপন করিতে বাধ্য না হইয়া পবিত্র নির্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রামমধ্যে যথা তথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।

ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্রীশ্রীমার মনের ভাব

চতুর্দশ বৎসরে (বস্তুতঃ) প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী নিতান্ত বালিকাস্বভাবসম্পন্না ছিলেন। দাম্পত্য-জীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব বোধ করিবার শক্তি তাঁহাতে তখন বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্নলাভে ঐকালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

ঐ ভাব লইয়া শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটীতে বাসের কথা

কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অনন্ত আনন্দসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার চলন, বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এখন একটি পরিবর্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কারণ উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা

যত্নে সংবরণপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিতেন; ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না—সময় হইলেই নিজসকাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ কালে শ্রীশ্রীমার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সঙ্কল্প

চারিটি দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা-প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে উহা তাঁহাকে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে ‘উন্মত্ত’ বলিয়া নির্দেশ করিত, ‘পরিধানের কাপড় পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায়’ ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে ‘পাগলের স্ত্রী’ বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—‘তবে কি পূর্বে যেমন দেখিয়াছিলাম, তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তো আর এখানে থাকা কর্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্তা থাকাই উচিত।’ অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিবেন, পরে যাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায়[1] শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করিবার জন্য বঙ্গের সুদূর প্রান্ত হইতে অনেকে ঐদিন কলিকাতায় আগমন করে। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া রমণী ঐ বৎসর ঐজন্য আগমন করিবেন বলিয়া ইতঃপূর্বে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এখন তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার অভিমত না হইলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া রমণীরা তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধিমান পিতা শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্যা কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাষিণী হইয়াছেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কলিকাতায় আসিবার জন্য সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

নিজ পিতার সহিত শ্রীশ্রীমার পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিতে আগমন ও পথিমধ্যে জ্বর

রেল কোম্পানির প্রসাদে সুদূর কাশী, বৃন্দাবন কলিকাতার অতি সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটী উহাতে বঞ্চিত থাকিয়া যে দূরে সেই দূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও ঐরূপ, অতএব তখনকার তো কথাই নাই—তখন বিষ্ণুপুর বা তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই এবং ঘাটালকেও বাষ্পীয় জলযান কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই। সুতরাং শিবিকা অথবা পদব্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐসকল গ্রামের লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং জমিদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূরপথ পদব্রজে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে তাঁহারা সকলে প্রথম দুই-তিন দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছান পর্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটিতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পীড়িতাবস্থায় শ্রীশ্রীমার অদ্‌ভুত দর্শন-বিবরণ

পথিমধ্যে এরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়াছিল। উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে স্ত্রীভক্তদিগকে কখনও কখনও নিম্নলিখিতভাবে বলিয়াছেন –

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল–মেয়েটির রঙ কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!–বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল–এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আসচ গা?' রমণী বলিল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি।' শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐসব আর হলো না।' রমণী বলিল, 'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটি বললে, 'আমি তোমার বোন হই।' আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ!' ঐরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম!"

রাত্রে জ্বরগায়ে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান ও ঠাকুরের আচরণ

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। রাত্রে পূর্বোক্ত দর্শনে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী তাঁহার ঐ পরামর্শ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। তাঁহার পুনরায় জ্বর আসিল, কিন্তু পূর্ব দিবসের ন্যায় প্রবলবেগে না আসায় তিনি উহার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন না। ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হইল এবং রাত্রি নয়টার সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপে রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে, তোমার যত্ন হবে?" ঔষধ-পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন-চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আরোগ্যলাভ করিলেন। ঐ তিন-চারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধ-পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবতঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ঠাকুরের ঐরূপ আচরণে শ্রীশ্রীমার সানন্দে তথায় অবস্থিতি

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল, পরের কথায় উদিত হইয়া যে সন্দেহ মেঘের ন্যায় বিশ্বাস-সূর্যকে আবৃত করিতে উপক্রম করিয়াছিল, ঠাকুরের যত্ন-প্রবৃদ্ধ অনুরাগপবনে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া এখন কোথায় বিলীন হইল! শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন–সংসারী মানব না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা দেবতাই আছেন এবং বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি পূর্বের ন্যায় সমানভাবে কৃপাপরবশ রহিয়াছেন। অতএব কর্তব্য স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন–এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েক দিন ঐস্থানে অবস্থানপূর্বক হৃষ্টচিত্তে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ঠাকুরের নিজ ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পত্নীকে শিক্ষাপ্রদান

সন ১২৭৪ সালে কামারপুকুরে অবস্থান করিবার কালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পরার উদয় হইয়াছিল তাহা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। ব্রহ্মবিজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠালাভসম্বন্ধীয় আচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথা আলোচনাপূর্বক তিনি ঐ কালে নিজ

সাধনলব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্তব্যপরিপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তদুভয় অনুষ্ঠানের আরম্ভমাত্র করিয়াই তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে নিকটে পাইয়া তিনি এখন পুনরায় ঐ দুই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

ইতিপূর্বে ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান না করিবার কারণ

প্রশ্ন উঠিতে পারে—পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি ইতঃপূর্বেই তো ঐরূপ করিতে পারিতেন, ঐরূপ করেন নাই কেন? উত্তরে বলিতে হয়—সাধারণ মানব ঐরূপ করিত, সন্দেহ নাই; ঠাকুর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিয়া ঐরূপ আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাঁহারা জীবনে প্রতিক্ষণ প্রতি কার্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখনও কোন কার্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণসাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তা না লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সেজন্য স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তাঁহারা সর্বথা পরাঙ্‌মুখ হন। কিন্তু বিরাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চলিতে যদি কখনও পরীক্ষা দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা ঐ পরীক্ষা প্রদানের জন্য সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্নী কামারপুকুরে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি নিজ কর্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তখনই ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ অবসর চলিয়া যাইয়া যখন তাঁহাকে কলিকাতায় আগমনপূর্বক পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইল, তখন তিনি ঐরূপ অবসর পুনরানয়নের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী যতদিন না স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। সাধারণ বুদ্ধিসহায়ে আমরা ঠাকুরের আচরণের ঐরূপে সামঞ্জস্য করিতে পারি; তদ্ভিন্ন বলিতে পারি যে, যোগদৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীশ্রীমার সহিত এইকালে আচরণ

সে যাহা হউক, পত্নীর প্রতি কর্তব্য পালনপূর্বক পরীক্ষাপ্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর এখন তদ্বিষয়ে সানন্দে অগ্রসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠাকুরানীকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি মাতাঠাকুরানীকে বলিয়াছিলেন, "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক তো তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।" কেবল উপদেশমাত্র দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হইত না; কিন্তু শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, পরে শিষ্য উহা কার্যে কতদূর প্রতিপালন করিতেছে সর্বদা তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে তিনি যে এখন পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি তাঁহাকে কতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা আগমনমাত্র তাঁহাকে নিজ গৃহে বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার অনুমতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মাতাঠাকুরানীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র[2] বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। দুই একটি কথা, যাহা ইতঃপূর্বে বলা হয় নাই, তাহাই কেবল বলিব।

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন

শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী একদিন এই সময়ে ঠাকুরের পদসংবাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "যে মা

মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!"

ঠাকুরের নিজমনের সংযম-পরীক্ষা

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—"মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।" ঐরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল।

পত্নীকে লইয়া ঠাকুরের আচরণের ন্যায় আচরণ কোন অবতারপুরুষ করেন নাই—উহার ফল

ঐরূপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানব-হৃদয় স্বতই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে একক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।

শ্রীশ্রীমার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস[3] অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল—কিন্তু এই অদ্‌ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরানীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না।—একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদের মন, প্রিয় বোধ করিয়া দেহের রমণকামনা করিল না। ঐ কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখনও কখনও বলিয়াছেন, "ও (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম, 'মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে'—ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্রে বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে-কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য যখন দেহবুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে কখনও ৺জগদম্বার অংশভাবে এবং কখনও সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং মার কৃপায় তাঁহার মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে মন এতদূর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে এক অদ্‌ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি এখন উহা কার্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব।

৺ষোড়শী-পূজার আয়োজন

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেকের উপর গত হইয়াছে।[4] আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকাপূজার পুণ্যদিবস। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পনভূষিত একখানি পীঠ পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য অস্তগমন করিল, ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্যার নিশি সমাগতা হইল। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অদ্য রাত্রিকালে মন্দিরে ৺দেবীর বিশেষ পূজা করিতে হইবে, সুতরাং ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং ৺রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালে সেবা-পূজা-সমাপনান্তর দীনু পূজারী আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। ৺দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতঃপূর্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

শ্রীশ্রীমাকে অভিষেকপূর্বক ঠাকুরের পূজা-করণ

পূজাদ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া পূর্বকৃত্য সম্পাদিত হইল। ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পূজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী ইতঃপূর্বে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। সুতরাং কি করিতেছেন, তাহা সম্যক না বুঝিয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তিনি এখন পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন –

"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!"

পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপপূজাদি ৺দেবীচরণে সমর্পণ

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞানতিরোহিতা হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন! ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৺দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন –

"হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"

পূজা শেষ হইল–মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল–তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

ঠাকুরের নিরন্তর সমাধির জন্য শ্রীশ্রীমার নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় অন্যত্র শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন

৮ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী প্রায় পাঁচমাস কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বের ন্যায় ঐকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া দিবাভাগ নহবতঘরে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিতেন। দিবারাত্র ঠাকুরের ভাবসমাধির বিরাম ছিল না এবং কখনও কখনও নির্বিকল্প সমাধিপথে তাঁহার মন সহসা এমন বিলীন হইত যে, মৃতের লক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত। কখন ঠাকুরের ঐরূপ সমাধি হইবে, এ আশঙ্কায় শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। বহুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া ভীতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তিনি একরাত্রিতে হৃদয় এবং অন্যান্য সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহুক্ষণ নাম শুনাইলে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে প্রত্যহ নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাঁহার জননীর নিকটে মাতাঠাকুরানীর শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঐরূপে প্রায় এক বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়া ১২৮০ সালের আরম্ভে কোন সময়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।[5]

[1] ১২৭৮ সালের দোলপূর্ণিমা ১৩ চৈত্র পড়িয়াছিল (ইং ২৫ মার্চ, ১৮৭২) । – প্রঃ
[2] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।
[3] ‘শ্রীশ্রীমায়ের কথা’-য় আছে, “দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন।” শ্রীশশিভূষণ ঘোষ প্রণীত ‘শ্রীরামকৃষ্ণদেব’ গ্রন্থের ৩৩১ পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার ৩ মাসের মধ্যেই ষোড়শীপূজার উল্লেখ আছে। অধিকন্তু ‘শ্রীশ্রীমায়ের কথা’-য় এবং ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-এ ৮ মাস একত্রে শয়নের উল্লেখ আছে। গুরুভাব – পূর্বার্ধেও ৮ মাস শয়নের কথাই সমর্থিত হয়। – প্রঃ
[4] ‘শ্রীশ্রীমায়ের কথা’, ২য় ভাগ, দ্রষ্টব্য। – প্রঃ
[5] ‘শ্রীশ্রীমায়ের কথা,’ ২য় খণ্ড।

২.২৩. একবিংশ অধ্যায়: সাধকভাবের শেষ কথা

৺ষোড়শীপূজার পরে ঠাকুরের সাধন-বাসনার নিবৃত্তি

৺ষোড়শী-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। ঈশ্বরানুরাগরূপ যে পুণ্য হুতবহ হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অস্থির করিয়া নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল এবং ঐকালের পরেও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইতে দেয় নাই, পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়া এতদিনে তাহা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। ঐরূপ না হইয়াই বা উহা এখন করিবে কি–ঠাকুরের আপনার বলিবার এখন আর কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতঃপূর্বে আহুতি প্রদান না করিয়াছেন?—ধন, মান, নাম, যশাদি পৃথিবীর সমস্ত ভোগাকাঙক্ষা বহুপূর্বেই তিনি উহাতে বিসর্জন করিয়াছেন। হৃদয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে একে আহুতি দিয়াছেন!–ছিল কেবল বিবিধ সাধনপথে অগ্রসর হইয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা–তাহাও এখন তিনি উহাতে নিঃশেষে অর্পণ করিলেন! অতএব প্রশান্ত না হইয়া উহা এখন আর করিবে কি?

কারণ, সর্বধর্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর কি করিবেন

ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সর্বাগ্রে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন–পরে, নানা অদ্‌ভুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করিয়া ঐ দর্শন মিলাইয়া লইবার অবসর দিয়াছেন–অতএব তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি চাহিবেন! দেখিলেন চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্তিত আছে সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিক মার্গানুসারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ নিরাকার রূপের দর্শন হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্যলীলায় ভারতের বাহিরে উদ্‌ভূত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্তিত হইয়াও যথাযথ ফল হস্তগত হইয়াছে–সুতরাং তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন!

শ্রীশ্রীঈশা-প্রবর্তিত ধর্মে ঠাকুরের অদ্‌ভুত উপায়ে সিদ্ধিলাভ

এই কালের এক বৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধনপথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায়-প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্‌ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেই হেতু উহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল–দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণপার্শ্বে যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটী; ঠাকুর ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। যদুলাল ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং উদ্যানে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে যাইলে কর্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকখানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল। মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপালমূর্তিও একখানি তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার অদ্‌ভুত জীবনকথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অদ্‌ভুত দেবজননী ও দেবশিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্তন করিয়া দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্কারসকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তখন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন–"মা, আমাকে এ কি করিতেছিস্!" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঐ সংস্কারতরঙ্গ প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহার মনের হিন্দুসংস্কারসমূহকে এককালে তলাইয়া দিল। তখন

দেবদেবীসকলের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ, ভালবাসা কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রীঈশার ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকারপূর্বক খ্রীষ্টীয় পাদরিসমূহ প্রার্থনামন্দিরে শ্রীশ্রীঈশার মূর্তির সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া নিরন্তর ঐসকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এককালে ভুলিয়া যাইলেন। তিন দিন পর্যন্ত ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহার উপর ঐরূপে প্রভুত্ব করিয়া বর্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগল ইঁহার মুখের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখ-যাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি!' তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাটব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল! ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্বসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঈশাসম্বন্ধীয় ঠাকুরের দর্শন কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়

উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছি, তখন তিনি একদিন শ্রীশ্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "হাঁ রে, তোরা তো বাইবেল পড়িয়াছিস্, বল দেখি উহাতে ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা আছে? তাঁহাকে দেখিতে কিরূপ ছিল?" আমরা বলিলাম, "মহাশয়, ঐ কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি নাই; তবে ঈশা ইহুদি জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়!" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি দেখিয়াছি তাঁহার নাক একটু চাপা! কেন ঐরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে!" ঠাকুরের ঐকথায় তখন কিছু না বলিলেও আমরা ভাবিয়াছিলাম তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্তি ঈশার বাস্তবিক মূর্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে? ইহুদিজাতীয় পুরুষসকলের ন্যায় ঈশার নাসিকা টিকাল ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ঠাকুরের শরীররক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটিতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীশ্রীবুদ্ধের অবতারত্ব ও তাঁহার ধর্মমতসম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

ঠাকুরকে ঐরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্মমতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা জানা আছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দুসাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা সর্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভেদবুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বিরহিত হওয়া-রূপ উক্ত ধামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া এবং যোগদৃষ্টিসহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই

সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[1] গাঙ্গবারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি বলিয়া ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী অন্নগ্রহণে মানবের বিষয়াসক্ত মন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারণের উপযোগী হয়, এ কথাতেও তিনি ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই কিঞ্চিৎ গাঙ্গবারি ও 'আটকে' মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন। শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের বিশ্বাস সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটি কথা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন, তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।" আমাদিগের ধারণা, ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ কথা জানিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

ঠাকুরের জৈন ও শিখ ধর্মমতে ভক্তিবিশ্বাস

জৈনধর্মপ্রবর্তক তীর্থঙ্করসকলের এবং শিখধর্মপ্রবর্তক গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুর অনেক কথা ঠাকুর পর-জীবনে জৈন এবং শিখ ধর্মাবলম্বীদিগের নিকটে শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার ঐসকল সম্প্রদায়-প্রবর্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। অন্যান্য দেবদেবীর আলেখ্যের সহিত তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি এবং শ্রীশ্রীঈশার একখানি আলেখ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐসকল আলেখ্যের এবং তদুভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধূপ ধুনা প্রদান করিতেন। ঐরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেও কিন্তু আমরা তাঁহাকে তীর্থঙ্করদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দেশ করিতে শ্রবণ করি নাই। শিখদিগের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "উঁহারা সকলে জনক ঋষির অবতার—শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনার উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন; শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।"

সর্বধর্মমতে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অসাধারণ উপলব্ধিসকলের আবৃত্তি

সে যাহা হউক, সর্বসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিগুলির কতকগুলি ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ছিল। উহার কিছু কিছু বর্তমান গ্রন্থে আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে বলিলেও প্রধান প্রধানগুলির এখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধনকালের অবসানে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভাবমুখে থাকিবার কালে ঐ উপলব্ধিগুলির সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তিনি যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ উপলব্ধিসকল প্রত্যক্ষ করিলেও সাধারণ মানববুদ্ধিতে উহাদিগের সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতে চেষ্টা করিব।

(১) তিনি ঈশ্বরাবতার

প্রথম—ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক পুরুষ, তাঁহার সাধন-ভজন অন্যের জন্য সাধিত হইয়াছে। আপনার সহিত অপরের সাধকজীবনের তুলনা করিয়া তিনি তদুভয়ের বিশেষ পার্থক্য সাধারণ দৃষ্টিসহায়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, সাধারণ সাধক একটিমাত্র ভাবসহায়ে আজীবন চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের দর্শনলাভপূর্বক শান্তির অধিকারী হয়; তাঁহার কিন্তু ঐরূপ না হইয়া যতদিন পর্যন্ত তিনি সকল মতের সাধনা না করিয়াছেন, ততদিন কিছুতেই শান্ত হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তাঁহার অত্যল্প সময় লাগিয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব; পূর্বোক্ত বিষয়ের কারণানুসন্ধানই ঠাকুরকে এখন যোগারূঢ় করাইয়া উহার কারণ পূর্বোক্ত প্রকারে দেখাইয়া দিয়াছিল। দেখাইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ-

বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষাবতার বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ হইয়াছে এবং বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক রাজ্যে নূতন আলোক আনয়নপূর্বক জীবের কল্যাণসাধনের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভাবমোচনের জন্য নহে।

(২) তাঁহার মুক্তি নাই

দ্বিতীয়—তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, অন্য জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি হইবে না। সাধারণ যুক্তিসহায়ে ঐকথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ যিনি ঈশ্বর হইতে সর্বদা অভিন্ন—তাঁহার অংশবিশেষ, তিনি তো সর্বদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহার অভাব বা পরিচ্ছিন্নতাই নাই; অতএব মুক্তি হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের জীবকল্যাণসাধন-রূপ কর্ম যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহাকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া উহা করিতে হইবে—অতএব তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে? ঠাকুর যেমন বলিতেন, "সরকারি কর্মচারীকে জমিদারির যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।" যোগদৃষ্টিসহায়ে তিনি নিজ সম্বন্ধে কেবল ঐ কথাই জানিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দেশ করিয়া আমাদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, আগামী বারে তাঁহাকে ঐদিকে আগমন করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ[2] বলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময়নিরূপণ পর্যন্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "দুই শত বৎসর পরে ঐদিকে আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে; যাহারা তখন মুক্তিলাভ না করিবে, তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে!"

(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পারা

তৃতীয়—যোগারূঢ় হইয়া ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে একদিন ঐ বিষয়ে তিনি ভাবাবেশে এইরূপ বলিয়াছিলেন –

"যখন দেখিবে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্বে খাওয়াইয়া পরে স্বয়ং অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার কাল নিকটবর্তী হইয়াছে।"—ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন, "শেষকালে আর কিছু খাইব না, কেবল পায়সান্ন খাইব"—উহা সত্য হইবার কথা আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি।[3]

(৪) সর্ব ধর্ম সত্য—'যত মত তত পথ'

আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধিগুলি এখন আমরা লিপিবদ্ধ করিব –

প্রথম—সর্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত তত পথ মাত্র'। যোগবুদ্ধি এবং সাধারণবুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে ঐ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্বক পৃথিবীর ধর্ম-বিরোধ ও ধর্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্তমান কালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কোন ঈশ্বরাবতার ইতঃপূর্বে সাধনসহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধিপূর্বক জগৎকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতারসকলের স্থাননির্দেশ করিতে হইলে, ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।

(৫) দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত মত মানবকে অবস্থাভেদে অবলম্বন করিতে হইবে

দ্বিতীয়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষসকল অনন্ত শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে যে কতদূর সহায়তা করিবে, তাহা স্বল্প-চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায় ঋষিগণের

ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তিসকলকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষা মোচড়াইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। টীকাকারগণের ঐপ্রকার চেষ্টার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার ঐ মীমাংসা সর্বদা স্মরণ রাখা আমাদিগের শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার-লাভের একমাত্র পথ। ঐ বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি উক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি –

“অদ্বৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।

“মন-বুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য–চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম!

“বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মতো উচ্চ নাম-সংকীর্তনাদি প্রশস্ত।”

(৬) কর্মযোগ-অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে

কর্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর ঐরূপে সীমানির্দেশ করিয়া বলিতেন–“সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়–চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম করিতে পারে না, অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মত্যাগ এবং পুত্র হইলে সর্বপ্রকার গৃহকর্মত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া অবস্থান। অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে যত কিছু কার্য বড়লোকের বাটীর দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ ও ধ্যান করা এবং পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করা–ইহাই পথ।”

(৭) উদার মতে সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে হইবে

তৃতীয়–ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্তিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মথুরবাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকট ধর্মলাভ করিতে অনেক ভক্ত আসিবে। পরে ঐ বিষয় যে সত্য হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামূর্তি (photograph) দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি–কালে এই মূর্তির[4] ঘরে ঘরে পূজা হইবে।”

(৮) যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিবে

চতুর্থ–যোগদৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, ‘যাহাদের শেষ জন্ম, তাহারা তাঁহার নিকটে (ধর্মলাভ করিতে) আসিবে।’ ঐ বিষয়ে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে অন্যত্র[5] বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তিনজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন

ঠাকুরের সাধনকালে তিনটি বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা স্বচক্ষে দর্শনপূর্বক তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন ঠাকুর তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন–পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সাধনকালে সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন–এবং গৌরী পণ্ডিত দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধনকালের অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি দেখিতেছি।” বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার অবতারত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত ঠাকুরকে দেখিয়া

বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রে যেসকল উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্তমান দেখিতেছি। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই, এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের প্রকাশও তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি–তোমার অবস্থা বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাঁহা হইতে উৎপত্তি হয়, সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে!" ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কথা এবং পূর্বোক্ত অপূর্ব উপলব্ধিসকলের আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঐসকল সাধক পণ্ডিতাগ্রণিগণ তাঁহাকে বৃথা চাটুবাদ করিয়া পূর্বোক্ত কথাসকল বলিয়া যান নাই। ঐসকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল নিম্নলিখিতভাবে নিরূপিত হয় –

ঐ পণ্ডিতদিগের আগমনকাল নিরূপণ

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী গৌরী পণ্ডিতকে তথায় দেখিয়াছিলেন। আবার, মথুরবাবু জীবিত থাকিবার কালে গৌরী পণ্ডিত যে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন, একথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয়, শ্রীযুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক সন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিজ জীবনে যাঁহারা ঐ জ্ঞান পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন, ঐরূপ সাধক পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের নিরন্তর আগ্রহ ছিল। ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হয় এবং মথুরবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করেন। পণ্ডিতজীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ইঁদেশ নামক গ্রামে ছিল। হৃদয়ের ভ্রাতা রামরতন মথুরবাবুর নিমন্ত্রণপত্র লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত গৌরীকান্তকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রসূত অদ্‌ভুত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তিনি যেভাবে সংসারত্যাগ করেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র[6] বলিয়াছি।

'রানী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত'-শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিয়া নিরূপিত আছে। পণ্ডিত পদ্মলোচনকে ঐকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া দানগ্রহণ করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। অতএব বেদান্তবিদ্ ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমনকাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্বর-ঠাকুরবাটীতে তাঁহার ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণীর ন্যায় তিনিও ঠাকুরের শরীরমনে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমুদয় প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্ভিত হৃদয়ে শ্রীযুক্তা ব্রাহ্মণীর সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনরবতীর্ণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া মনে হয়, শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব-সাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহার নিকটে আসিয়া সন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিজ সাঙ্গোপাঙ্গসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহ্বান

পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিল। যোগারূঢ় হইয়া পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহাদিগের অন্তরে নিজ ধর্মশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সেই ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। দিবাভাগে সর্বকাল ঐ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কোনরূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত, তখন ভাবিতাম, তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ

জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব। ঐরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের আগমনের কথার উদ্দীপনা হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতাম—কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব, ঐ সকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত, তখন ধৈর্যের বাঁধ দিয়া ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না, মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না। যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টারোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ‘তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না’ বলিয়া চিৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম! মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কিনা সন্দেহ; সখা সখার সহিত এবং প্রণয়িযুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনো ঐরূপ করে বলিয়া শুনি নাই—এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল। ঐরূপ হইবার কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল।”

ঐরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থের সহিত ঐসকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকায় আমরা উহাদিগকে পরিশিষ্টমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম।

[1] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়।
[2] মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।
[3] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়।
[4] ঠাকুরের বসিয়া সমাধিস্থ থাকিবার মূর্তি।
[5] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।
[6] গুরুভাব – উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়।

২.২৪. পরিশিষ্ট

৺ষোড়শী-পূজার পর হইতে পূর্বপরিদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তসকলের আগমনকালের পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

রামেশ্বরের মৃত্যু

আমরা পাঠককে বলিয়াছি ৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সন ১২৮০ সালের কার্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার ঐ স্থানে পৌঁছিবার স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য জ্বরাতিসাররোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রকাশ ছিল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

রামেশ্বরের উদার প্রকৃতি

রামেশ্বর বড় উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী-ফকিরেরা দ্বারে আসিয়া যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে তিনি তাহাদিগকে উহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, ঐরূপে কোন ফকির আসিয়া বলিত রন্ধনের জন্য আমার একটি বোকনোর অভাব, কেহ বলিত আমার লোটা বা জলপাত্রের অভাব, কেহ বলিত আমার কম্বলের অভাব—রামেশ্বরও ঐসকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। বাটীর যদি কেহ উহাতে আপত্তি করিত, তাহা হইলে রামেশ্বর তাহাকে শান্তভাবে বলিতেন—লইয়া যাউক, কিছু বলিও না, ঐরূপ দ্রব্য আবার কত আসিবে, ভাবনা কি? জ্যোতিষশাস্ত্রে রামেশ্বরের সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল।

রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পারা ও তাঁহাকে সতর্ক করা

দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটী ফিরিয়া আসিবার কালে আর যে তাঁহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, একথা ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন—'বাটী যাচ্ছ, যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না; তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।' ঐ কথা ঠাকুরের মুখে আমাদিগের কেহ কেহ[1] শ্রবণ করিয়াছেন।

রামেশ্বরের মৃত্যুসংবাদে জননীর শোকে প্রাণসংশয় হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল

রামেশ্বর বাটীতে পৌঁছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি পীড়িত। ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন—"সে নিষেধ মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়!" ঐ ঘটনার পাঁচ-সাত দিন পরেই সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে ঠাকুর তাঁহার বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন এবং মন্দিরে গমনপূর্বক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ করিবার পরে তিনি জননীকে সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সজলনয়নে তাঁহাকে ঐ দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিয়াছিলাম, মা ঐ কথা শুনিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইবেন এবং তাঁহার প্রাণরক্ষা-সংশয় হইবে, কিন্তু ফলে দেখিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। মা ঐ কথা শুনিয়া অল্প-স্বল্প দুঃখ প্রকাশপূর্বক 'সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক করা বৃথা'—ইত্যাদি বলিয়া আমাকেই শান্ত করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া সুর যেমন চড়াইয়া দেয়, শ্রীশ্রীজগদম্বা যেন ঐরূপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া রাখিয়াছেন, পার্থিব শোকদুঃখ ঐজন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। ঐরূপ দেখিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বার বার প্রণাম করিলাম এবং নিশ্চিন্ত হইলাম।"

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া রামেশ্বরের আচরণ

রামেশ্বর পাঁচ-সাত দিন পূর্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়াছিলেন এবং আত্মীয়গণকে ঐ কথা বলিয়া নিজ সৎকার ও শ্রাদ্ধের জন্য সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাটীর সম্মুখে একটি আমগাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ভাল হইল, আমার কার্যে লাগিবে।" মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূত নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন,

পরে সংজ্ঞা হারাইয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে রামেশ্বর আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহটাকে শ্মশানমধ্যে অগ্নিসাৎ না করিয়া উহার পার্শ্বের রাস্তার উপরে যেন অগ্নিসাৎ করা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোকে ঐ রাস্তার উপর দিয়া চলিবেন। তাঁহাদের পদরজে আমার সদ্গতি হইবে। রামেশ্বরের মৃত্যু গভীর রাত্রিতে হইয়াছিল।

মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজ বন্ধু গোপালের সহিত কথোপকথন

পল্লীর গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বহুকালাবধি বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। গোপাল বলিতেন, তাঁহার মৃত্যু যে দিন যে সময়ে হইয়াছিল, সেই দিন সেই সময়ে তিনি তাঁহার বাটীর দ্বারে কাহাকেও শব্দ করিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন, 'আমি রামেশ্বর, গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছি, বাটীতে ৺রঘুবীর রহিলেন তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহাতে গোল না হয়, তদ্বিষয়ে তুমি নজর রাখিও!' গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়া পুনরায় শুনিলেন, 'আমার শরীর নাই, অতএব দ্বার খুলিলেও তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না।' গোপাল তথাপি দ্বার খুলিয়া যখন কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ সত্য কি মিথ্যা– জানিবার জন্য রামেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্য সত্যই রামেশ্বরের দেহত্যাগ হইয়াছে।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও পূজকের পদগ্রহণ–চানকের অন্নপূর্ণার মন্দির

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণের ২৭ তারিখে হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎসর ছিল। পিতার অস্থি সঞ্চয়পূর্বক কলিকাতার নিকটবর্তী বৈদ্যবাটী নামক স্থানে আসিয়া তিনি উহা গঙ্গায় বিসর্জন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার জন্য ঐ স্থলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। পার হইবার কালে ব্যারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুরবাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী তথায় যে মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীকে পরে প্রতিষ্ঠিতা করেন, তাহার অর্ধেক ভাগ মাত্র তখন গাঁথা হইয়াছে। অনন্তর সন ১২৮১ সালের ৩০ চৈত্র, ইংরাজী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে ঐ মন্দিরে ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্দার শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের কথা

মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতার সিঁদুরিয়াপট্টি-পল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন।[2] শম্ভুবাবু ইতঃপূর্বে ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত ধর্মমতে বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অজস্র দানের জন্য কলিকাতাবাসী সকলের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি শম্ভুবাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর কাল তিনি তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর যখন যাহা কিছুর অভাব হইত, জানিতে পারিলে শম্ভুবাবু তৎসমস্ত পরম আনন্দে পূরণ করিতেন। শ্রীযুক্ত শম্ভু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু!" শম্ভু কিন্তু তাহাতে নিরস্ত না হইয়া চিরকাল তাঁহাকে ঐরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে শম্ভুবাবু যে আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসসকল যে পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ সম্বোধনে হৃদয়ঙ্গম হয়। শম্ভুবাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণপূজা করিতেন।

শ্রীশ্রীমার জন্য শম্ভুবাবুর ঘর করিয়া দেওয়া, কাপ্তেনের ঐ বিষয়ে সাহায্য, ঐ গৃহে ঠাকুরের একরাত্রি বাস

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় তখন তিনি নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীর সহিত বাস করিতে থাকেন। শম্ভুবাবু ঐ কথা জানিতে পারিয়া সঙ্কীর্ণ নহবতঘরে তাঁহার থাকিবার কষ্ট হইতেছে অনুমান করিয়া দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সন্নিকটে কিছু জমি ২৫০ টাকা প্রদানপূর্বক মৌরসী করিয়া লন এবং তদুপরি একখানি সুপরিসর চালাঘর বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। তখন কাপ্তেন-উপাধিপ্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নেপাল-রাজসরকারের শালকাঠের কারবারের ভার তখন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, উহা দেওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাধ্য ছিল না। গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গঙ্গার অপর পারে বেলুড় গ্রামস্থ তাঁহার কাঠের গদি হইতে তিনখানি শালের চকোর পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার আসায় উহার একখানি ভাসিয়া গেল। হৃদয় উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাকে 'ভাগ্যহীনা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল। সে যাহা হউক, কাঠ ভাসিয়া যাইবার কথা শুনিয়া কাপ্তেন আর একখানি কাঠ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী উক্ত গৃহে প্রায় বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। গৃহকর্মে সাহায্য করিবে এবং সর্বদা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া একটি রমণীকে তখন নিযুক্তা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা এই গৃহে রন্ধন করিয়া ঠাকুরের জন্য নানাবিধ খাদ্য প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার সন্তোষ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে কখনো কখনো ঐ গৃহে আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমনমাত্র গভীর রাত্রি পর্যন্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, মন্দিরে ফিরিয়া আসা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ঐরূপে সে রাত্রি তিনি তথায় বাস করিতে বাধ্য হন এবং শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে ঝোল-ভাত রাঁধিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন।

ঐ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া ও জয়রামবাটীতে গমন

এক বৎসর ঐ গৃহে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আমাশয়রোগে কঠিনভাবে আক্রান্তা হইলেন। শম্ভুবাবু তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োগে প্রসাদ ডাক্তার এই সময়ে শ্রীশ্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু আরোগ্য হইলে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয় জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় যাইবার অল্পকাল পরে পুনরায় তিনি ঐ রোগে শয্যাশায়িনী হইলেন। ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার শরীররক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পূজ্যপাদ পিতা শ্রীরামচন্দ্র তখন মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জননী এবং ভ্রাতৃবর্গই তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর ঐ সময়ে তাঁহার নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "তাই তো রে হৃদে, ও (শ্রীশ্রীমা) কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!"

৺সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও ঔষধপ্রাপ্তি

রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন শ্রীশ্রীমার প্রাণে ৺দেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদিত হইল এবং জননী ও ভ্রাতৃগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা প্রদান করিতে পারেন ভাবিয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রাম্যদেবী ৺সিংহবাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল ঐরূপে থাকিবার পরেই ৺দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে আরোগ্যের জন্য ঔষধ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

৺দেবীর আদেশে উক্ত ঔষধ সেবনমাত্রেই তাঁহার রোগের শান্তি হইল এবং ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমার হত্যা-প্রদানপূর্বক ঔষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ঐ দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে শম্ভুবাবুর নির্ভীক আচরণ

প্রায় চারি বৎসরকাল ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ঐরূপে সেবা করিবার পরে শম্ভুবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়িতাবস্থায় ঠাকুর তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "শম্ভুর প্রদীপে তৈল নাই!" ঠাকুরের কথাই সত্য হইল—বহুমূত্ররোগে বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত শম্ভু শরীররক্ষা করিলেন। শম্ভুবাবু পরম উদার, তেজস্বী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। পীড়িতাবস্থায় তাঁহার মনের প্রসন্নতা একদিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি হৃদয়কে হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, "মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি!" শম্ভুবাবুর সহিত পরিচয় হইবার বহু পূর্বে ঠাকুর যোগারূঢ় অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা শম্ভুকেই তাঁহার দ্বিতীয় রসদদাররূপে মনোনীত করিয়াছেন এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন।

ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবীর শেষাবস্থা ও মৃত্যু

পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী পিত্রালয়ে যাইবার কয়েক মাস পরে ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চন্দ্রাদেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিদিবসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহার কিছুকাল পূর্ব হইতে জরার আক্রমণে তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহ অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমরা হৃদয়ের নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি –

ঐ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্য অবসর লইয়া বাটী যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্বে একটি অনির্দেশ্য আশঙ্কায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন, তবে যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিন দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

ঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্য যাইয়া তাঁহার সেবা স্বহস্তে যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। হৃদয়ও ঐরূপ করিত এবং 'কালীর মা' নাম্নী চাকরানী দিবাভাগে প্রায় সর্বদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না। অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় হইতেই বৃদ্ধার মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ঠাকুরকে ও তাঁহার পত্নীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সেজন্য বৃদ্ধা ঠাকুরকে কখনো কখনো সতর্ক করিয়া দিতেন, বলিতেন—"হৃদুর কথা কখনো শুনিবি না!" জরাজীর্ণ হইয়া বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় অন্য নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত। যথা—দক্ষিণেশ্বর বাগানের সন্নিকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাহ্নে ঐ কলের কর্মচারীদিগকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দেওয়া হয় এবং অর্ধঘণ্টাকাল বাদে বাঁশী বাজাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের বাঁশীর আওয়াজকে বৃদ্ধা ৺বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং যতক্ষণ না ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বসিতেন না। ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—"এখন কি খাব গো, এখনও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খাইতে আছে?" কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাঁশী বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে বসানো সেদিন বিষম মুশকিল হইত; হৃদয় এবং ঠাকুরকে ঐদিন নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত।

সে যাহা হউক চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অসুস্থতার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সন্ধ্যার পর ঠাকুর তাঁহার নিকট গমনপূর্বক তাঁহার পূর্বজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পূর্ণ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাঁহাকে শয়ন করাইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রভাত হইয়া ক্রমে আটটা বাজিয়া গেল। বৃদ্ধা তথাপি ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন না। 'কালীর মা' নহবতের উপরের ঘরের দ্বারে যাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া পাইল না। দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, তাঁহার গলা হইতে কেমন একটা বিকৃত রব উত্থিত হইতেছে! তখন ভীত হইয়া সে ঠাকুর ও হৃদয়কে ঐ বিষয় নিবেদন করিল। হৃদয় যাইয়া কৌশলে বাহির হইতে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন কবিরাজী ঔষধ আনিয়া হৃদয় তাঁহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন ঐভাবে থাকিবার পর বৃদ্ধার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে অন্তর্জলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে করিতে নাই বলিয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তাঁহার নিয়োগে বৃদ্ধার দেহের সৎকার করিলেন। অনন্তর অশৌচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের নির্দেশে রামলালই বৃষোত্সর্গ করিয়া ঠাকুরের জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে যাইয়া তৎকরণে অপারগ হওয়া—তাঁহার গলিত-কর্মাবস্থা

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের মর্যাদা রক্ষা করিয়া অশৌচগ্রহণাদি কোন কার্য করেন নাই। জননীর পুত্রোচিত কোন কার্য করিলাম না ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গুলিসকল অসাড় অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি ঐ বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই এবং দুঃখিত অন্তরে ক্রন্দন করিয়া পরলোকগতা জননীকে নিজ অসামর্থ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন, গলিত-কর্ম অবস্থা হইলে, অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে স্বভাবতঃ কর্ম এককালে উঠিয়া যাইলে ঐরূপ হইয়া থাকে; শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান না করিতে পারিলে, তখন ঐরূপ ব্যক্তিকে দোষ স্পর্শে না।

ঠাকুরের কেশববাবুকে দেখিতে গমন

ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের এক বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১৮২১ সালের চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা উদিত হইয়াছিল। যোগারূঢ় ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কেশব তখন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘরিয়া নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় সশিষ্য সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঐ উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়িতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণ আন্দাজ এক ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। ঠাকুরের পরিধানে সেদিন একখানি লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল এবং উহার কোঁচার খুঁটটি তাঁহার বাম স্কন্ধোপরি লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছিল।

বেলঘরিয়া উদ্যানে কেশব

গাড়ি হইতে নামিয়া হৃদয় দেখিলেন, শ্রীযুক্ত কেশব অনুচরবর্গের সহিত উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছেন। অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "আমার মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভালবাসেন এবং উহা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্তন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ পাইলে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব।" শ্রীযুক্ত কেশব সম্মতিপ্রকাশ করিলে হৃদয় গাড়ি হইতে ঠাকুরকে নামাইয়া সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্তি মাত্র।

কেশবের সহিত প্রথমালাপ

ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরূপ, তাহা জানিতে বাসনা, সেজন্য তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।" ঐরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত কেশব কি বলিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে "কে জানে কালী কেমন—ষড়দর্শনে না পায় দরশন"-রূপ রামপ্রসাদী সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হৃদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন উহা মিথ্যা ভান বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত। সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহ্যচৈতন্য আনয়নের জন্য হৃদয় তাঁহার কর্ণে এখন প্রণব শুনাইতে লাগিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঐরূপে অর্ধবাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্তসহায়ে এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে পুনরায় উপাসনার সময় উপস্থিত হইতে বসিয়াছে, সে কথা কাহারও মনে হইল না। ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐপ্রকার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "গরুর পালে অন্য কোন পশু আসিলে তাহারা তাহাকে গুঁতাইতে যায়, কিন্তু গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে—আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে।" অনন্তর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ খসিয়াছে!" শ্রীযুক্ত কেশবের অনুচরবর্গ ঐ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর তখন ঐ কথার অর্থ বুঝাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, "দেখ, ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না; কিন্তু ল্যাজ যখন খসিয়া পড়ে তখন জলেও থাকিতে পারে, ড্যাঙাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে; উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে!" ঐরূপে নানা প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শ্রীযুক্ত কেশবের মন তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্য দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার 'কমল কুটির' নামক বাটীতে লইয়া যাইয়া তাঁহার দিব্যসঙ্গলাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ ক্রমে এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েকদিন দেখিতে না পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন, তখন ঠাকুর কলিকাতায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন, অথবা শ্রীযুক্ত কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে শ্রীযুক্ত কেশব ঐ উৎসবের অঙ্গমধ্যে পরিগণিত করিতেন। ঐরূপে অনেক বার তিনি ঐ সময়ে জাহাজে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কেশবের আচরণ

দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীযুক্ত কেশব শাস্ত্রীয় প্রথা স্মরণ করিয়া কখনো রিক্তহস্তে আসিতেন না, ফলমূলাদি কিছু আনয়নপূর্বক ঠাকুরের সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর রহস্য করিয়া তাঁহাকে একসময়ে বলিয়াছিলেন, "কেশব, তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল?"

শ্রীযুক্ত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, "মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব! আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দুই চারিটি কথা লোককে বলিবামাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়।"

ঠাকুরের কেশবকে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং 'ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান–তিনে এক, একে তিন'–বুঝান

ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্বদা অভেদভাবে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের ঐ কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান-রূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত–ভাগবত, ভক্ত, ভগবান–তিনে এক, একে তিন। কেশব তাঁহার ঐ কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন–তোমাকে এখন একথা বুঝাইয়া দিতেছি।" কেশব তাহাতে কি চিন্তা করিয়া বলিতে পারি না, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "মহাশয়, পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না; অতএব বর্তমান প্রসঙ্গ এখন আর উত্থাপনে প্রয়োজন নাই।" ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, "বেশ বেশ, এখন ঐ পর্যন্ত থাক।" ঐরূপে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্মের সার-রহস্য দিন দিন বুঝিতে পারিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাঁহার ধর্মমত দিন দিন পরিবর্তিত হওয়ায় ঐকথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ কুচবিহার বিবাহ–ঐ কালে আঘাত পাইয়া কেশবের আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভ–ঐ বিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরকে নিজসর্বস্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীযুক্ত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ঐরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইয়া উহাকে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং শ্রীযুক্ত কেশবের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আপনাদিগকে পৃথক করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া অন্য এক নূতন সমাজের সৃষ্টি করিয়া বসেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া সামান্য বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের ঐরূপ বিরোধ শ্রবণে মর্মাহত হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহাদিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা চলে না, কেশব কেন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল!" কুচবিহার-বিবাহের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুক্ত কেশবের নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, "কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে? কেশব সংসারী, নিজ পুত্রকন্যাগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা করিবে না? সংসারী ব্যক্তি ধর্মপথে থাকিয়া ঐরূপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে? কেশব উহাতে ধর্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরন্তু পিতার কর্তব্যপালন করিয়াছে।" ঠাকুর ঐরূপে সংসারধর্মের দিক দিয়া দেখিয়া কেশবকৃত ঐ ঘটনা নির্দোষ বলিয়া সর্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহরূপ ঘটনায় বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত কেশব যে আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই–ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের দুই প্রকার আচরণ

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিন্তু তাঁহাকে সম্যক বুঝিয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ। কারণ, দেখা যায়, এক পক্ষে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্মমূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন–নিজ বাটীতে লইয়া যাইয়া তিনি

যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণচিন্তা করিতেন, সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ সকল স্থানের কোথাও অবস্থান করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তা না করে—আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।[3] দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।

নববিধান ও ঠাকুরের মত

সেইরূপ অন্যপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ'-রূপ বাক্য সম্যক লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্বক 'নববিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমতসম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ঐরূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

ভারতের জাতীয় সমস্যা ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন

পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির যখন আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গদেশে যেমন ঐ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অন্যত্রও সেইরূপ অনেক মহাত্মার ঐরূপ করিবার কথা শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহাদিগের কেহই ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর নিজ জীবনে ভারতের ধর্মমতসমূহের সাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রত্যেকটিতে সাফল্য লাভ করিয়া বুঝিলেন যে, ভারতের ধর্ম ভারতের অবনতির কারণ নহে; উহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখাইলেন যে, ঐ ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের সমাজ, রীতি, নীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরবসম্পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনো ঐ ধর্মের সেই জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং উহাকে সর্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে। ঐ ধর্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজ জীবনাদর্শে দেখাইয়া যাইলেন, পরে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত নিজ শিষ্যবর্গের—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার ধর্মশক্তি সঞ্চারপূর্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্য কিভাবে ধর্মের সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক ভারতের পূর্বোক্ত জাতীয় সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব ধর্মমতের সাধনে সাফল্যলাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতীয় সকল ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্মবিরোধ নাশপূর্বক কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়েরও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ

সে যাহা হউক, শ্রীযুক্ত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা কতদূর গভীর ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের আচরণে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিন দিন শয্যাত্যাগ করিতে পারি নাই। মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ (পক্ষাঘাতে) পড়িয়া গিয়াছে।'

ঠাকুরের সংকীর্তনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন

কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্য একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। ঠাকুরের ঐ সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজন-মোহকর নগরকীর্তন দেখিতে বাসনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে ঐ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন–নিজগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটীর দিক হইতে অদ্‌ভুত সংকীর্তনতরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; দেখিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তাণ্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে লোকের যেন আর অন্ত নাই। ঐ অদ্‌ভুত সংকীর্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্বজীবনে তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল।

ঠাকুরের ফুলুই-শ্যামবাজারে গমন ও অপূর্ব কীর্তনানন্দ–ঐ ঘটনার সময়নিরূপণ

সে যাহা হউক, ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে এবং হৃদয়ের বাটী শিহড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানের কয়েক ক্রোশ দূরে ফুলুই-শ্যামবাজার নামক স্থান। সেখানে অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে এবং তাহারা নিত্য কীর্তনাদি করিয়া ঐ স্থানকে আনন্দপূর্ণ করে শুনিয়া ঠাকুরের ঐ স্থানে যাইয়া কীর্তন শুনিবার অভিলাষ হয়। শ্যামবাজার গ্রামের পার্শ্বেই বেলটে নামক গ্রাম। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতঃপূর্বে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া সাতদিন অবস্থানপূর্বক শ্যামবাজারের বৈষ্ণবসকলের কীর্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মল্লিক তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে কীর্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কীর্তনকালে তাঁহার অপূর্ব ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং ক্রমে সর্বত্র ঐ কথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্যামবাজার গ্রামেই যে ঐ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে। রামজীবনপুর, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর দূরান্তর গ্রামসকলেও ঐ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সংকীর্তনদলসমূহ তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে আগমনপূর্বক শ্যামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ করে এবং দিবারাত্র কীর্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে, একজন ভগবদ্ভক্ত এইক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে! তখন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। ঐরূপে সাত দিবারাত্র তথায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইয়া লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুর স্নানাহারের অবকাশ পর্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই! পরে হৃদয় তাঁহাকে লইয়া লুকাইয়া শিহড়ে পলাইয়া আসিলে ঐ আনন্দমেলার অবসান হয়। শ্যামবাজার গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, শ্রীনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তিসকল ও তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ ঘটনার কথা এখনো উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ খোলবাদক শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছিল। ইঁহার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটির পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়দংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়দংশ হৃদয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। উহার সময় নিরূপণ করিতে নিম্নলিখিতভাবে সক্ষম হইয়াছি –

সিঁথির বরানগর-আলমবাজার-নিবাসী ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল পাল কবিরাজ মহাশয় কেশববাবুর পরে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর ঐ ঘটনার পরে শিহড়

হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐদিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর নিকট ফুলুই-শ্যামবাজারের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন।
৺যোগানন্দ স্বামীজীর বাটী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে ছিল। সেজন্য তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ সাল ইংরাজী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৮ সালে ইংরাজী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে শ্রীমতী জগদম্বা দাসী মৃত্যুমুখে পতিতা হন। ঐ ঘটনার ছয়মাস আন্দাজ পরে হৃদয় বুদ্ধিহীনতাবশতঃ মথুরবাবুর স্বল্পবয়স্কা পৌত্রীর চরণ পূজা করে। কন্যার পিতা উহাতে তাহার অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া বিশেষ রুষ্ট হয়েন এবং হৃদয়কে কালীবাটীর কর্ম হইতে চিরকালের জন্য অবসর প্রদান করেন।

পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়নিরূপণের তালিকা

ঠাকুরের জন্ম সন ১২৪২ সালের ৬ ফাল্গুন, বুধবার, ব্রাহ্মমুহূর্তে, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে হইয়াছিল।
সনখ্রীষ্টাব্দঘটনা
১২৫৯১৮৫২–১৮৫৩কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হইয়া কয়েক মাস) ।
১২৬০১৮৫৩–১৮৫৪চতুষ্পাঠীতে বাস, পাঠ ও পূজাদি।
১২৬১১৮৫৪–১৮৫৫ঐ ঐ।
১২৬২১৮৫৫–১৮৫৬১৮ জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা; ঠাকুর কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে ও হৃদয় সাহায্যকারীর পদে নিযুক্ত; বিষ্ণুবিগ্রহ ভগ্ন হওয়া, ঠাকুরের বিষ্ণুঘরের পূজকের পদগ্রহণ; ১৪ ভাদ্র, ইং ২৯ আগস্ট রানীর দেবসেবার জন্য জমিদারি কেনা; কেনারাম ভট্টের নিকট ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণ; ঠাকুরের ৺কালীপূজকের ও রামকুমারের বিষ্ণুপূজকের পদগ্রহণ।
১২৬৩১৮৫৬–১৮৫৭হৃদয়ের বিষ্ণুপূজকের পদগ্রহণ; রামকুমারের মৃত্যু; ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ হওয়া ও গাত্রদাহ; ঠাকুরের প্রথমবার দেবোন্মত্তভাব ও দর্শন; ভূকৈলাসের বৈদ্যের ঔষধসেবন।
১২৬৪১৮৫৭–১৮৫৮ঠাকুরের রাগানুগা পূজা দেখিয়া মথুরের আশ্চর্য হওয়া; ঠাকুরের রানী রাসমণিকে দণ্ডদান; হলধারীর পূজকরূপে নিযুক্ত হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ।
১২৬৫১৮৫৮–১৮৫৯আশ্বিন বা কার্তিকে ঠাকুরের কামারপুকুর গমন; চণ্ড নামানো।
১২৬৬১৮৫৯–১৮৬০বৈশাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ।
১২৬৭১৮৬০–১৮৬১ঠাকুরের দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী গমন; পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন; মথুরের শিব ও কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন; ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মত্ততা ও কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা; ১৮৬১, ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে রানী রাসমণির দেবোত্তর দলিলে সহি করা ও পরদিন মৃত্যু; ঠাকুরের জননীর বুড়ো শিবের নিকটে হত্যা দেওয়া; ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্রসাধন আরম্ভ।
১২৬৯১৮৬২–১৮৬৩ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া।
১২৭০১৮৬৩–১৮৬৪পদ্মলোচন পণ্ডিতের সহিত দেখা; মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠান; ঠাকুরের জননীর গঙ্গাবাস করিতে আগমন; জটাধারীর আগমন, ঠাকুরের বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধন।
১২৭১১৮৬৪–১৮৬৫তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাস গ্রহণ।
১২৭২১৮৬৫–১৮৬৬হলধারীর কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ ও অক্ষয়ের পূজকের পদগ্রহণ; শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়া।
১২৭৩১৮৬৬–১৮৬৭ঠাকুরের ছয়মাস কাল অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান সম্পূর্ণ হওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের শারীরিক পীড়া ও মুসলমানধর্ম সাধন।
১২৭৪১৮৬৭–১৮৬৮ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন; শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন; অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও মাঘ মাসে তীর্থযাত্রা।

১২৭৫১৮৬৮–১৮৬৯জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন; হৃদয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু এবং দুর্গোৎসব ও দ্বিতীয়বার বিবাহ।

১২৭৬১৮৬৯–১৮৭০অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু।

১২৭৭১৮৭০–১৮৭১ঠাকুরের মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গমন; কলুটোলায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আসনগ্রহণ; পরে কালনা, নবদ্বীপ ও ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন।

১২৭৮১৮৭১–১৮৭২জুলাই মাসের ১৬ তারিখে (১ শ্রাবণ) মথুরের মৃত্যু; ফাল্গুন মাসে রাত্রি ৯টার সময় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন।

১২৭৯১৮৭২–১৮৭৩শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস।

১২৮০১৮৭৩–১৮৭৪জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের ৺ষোড়শী-পূজা; শ্রীশ্রীমার গৌরী পণ্ডিতকে দর্শন ও আন্দাজ আশ্বিনে (১৮৭৩, সেপ্টেম্বর) কামারপুকুরে প্রত্যাগমন; অগ্রহায়ণে রামেশ্বরের মৃত্যু।

১২৮১১৮৭৪–১৮৭৫ (আন্দাজ ১৮৭৫ এপ্রিল) শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসা; শম্ভু মল্লিকের ঘর করিয়া দেওয়া; চানকে ৺অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা; ঠাকুরের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা।

১২৮২১৮৭৫–১৮৭৬ (আন্দাজ ১৮৭৫ নভেম্বর) পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমার পিত্রালয়ে গমন; ঠাকুরের জননীর মৃত্যু।

১২৮৩১৮৭৬–১৮৭৭কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

১২৮৪১৮৭৭–১৮৭৮কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। (আন্দাজ ১৮৭৭, নভেম্বর) শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

১২৮৫১৮৭৮–১৮৭৯ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন আরম্ভ।

১২৮৭১৮৮০–১৮৮১শ্রীশ্রীমার পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও হৃদয়ের কটু কথায় পুনরায় ঐ দিবসেই চলিয়া যাওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু।

১২৮৮১৮৮১–১৮৮২হৃদয়ের পদচ্যুতি ও দক্ষিণেশ্বর হইতে অন্যত্র গমন; শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর ঠাকুরের নিকট আগমন।

[1] শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী।

[2] ঠাকুরের ভক্তসকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটিনিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন তখন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্বদাই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শম্ভুবাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শম্ভুবাবুকে ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার দ্বিতীয় রসদদার বলিয়া যখন নির্দেশ করিয়াছেন, তখন মণিবাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল উহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

[3] শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা শুনিয়াছি।

৩.১. গুরুভাব—পূর্বার্ধ: গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে গুরুভাব প্রকাশিত হইল। ঠাকুরের সাধনকালের সময় হইতে বিশেষ প্রকটভাবের পূর্ব পর্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীই ইহাতে প্রধানতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে কেবলমাত্র ঐসকল ঘটনা বা ঠাকুরের ঐ সময়ের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই। যে মনের ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যে উদ্দেশ্যে তিনি ঐসকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। কারণ, শরীর ও মনের সমষ্টিভূত মানবের জীবনেতিহাস কেবলমাত্র তাহার জড় দেহ ও তৎকৃত কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে পাওয়া যায় না। জড়বাদী পাশ্চাত্য জীবনী ও ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রধানতঃ ঘটনাবলীর সংগ্রহেই দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং আত্মবাদী হিন্দু মনোভাবের সুনিপুণ সংস্থানেই মনোনিবেশ করে। আমাদের ধারণা, ঐ উভয় ভাবের সম্মিলনেই যথার্থ জীবনী বা ইতিহাস সম্ভবে এবং মনের ইতিহাসকে পুরোবর্তী রাখিয়াই সর্বত্র জড়ের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য।

আর এক কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবন আমরা বর্তমান গ্রন্থে শাস্ত্রসহায়েও অনেক স্থলে অনুশীলন করিয়াছি; তাঁহার অসাধারণ মনোভাব, অনুভব ও কার্যকলাপের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি ভারতের এবং ঈশাদি ভারতেতর দেশের মহাপুরুষগণের অনুভব ও কার্যকলাপের তুলনার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ ঠাকুর আমাদিগের নিকট স্পষ্টাক্ষরে বারংবার নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে, "যে রাম, যে কৃষ্ণ (ইত্যাদি হইয়াছিল) সে-ই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতর রহিয়াছে!"—এবং "এখানকার (আমার) অনুভবসকল বেদ-বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে!" বাস্তবিক 'ভাবমুখে' অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ঈদৃশ অলৌকিক জীবন আধ্যাত্মিক জগতে আর ইতঃপূর্বে দেখা যায় নাই।

আবার পূর্ব পূর্ব অবতারসকলের মতানুগ হইয়া সকলপ্রকার সাধনমার্গে স্বল্পকালেই সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি 'যত মত তত পথ'-রূপ যে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার ও লোকহিতার্থ ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহাকে পূর্ব পূর্ব যুগাবির্ভূত সকল অবতারপুরুষগণের ঘনীভূত সমষ্টি ও নবাভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিতেই বাধ্য হইয়াছি। বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র জীবনের আমরা যতই অনুশীলন করিয়াছি, ততই উহাকে বৈদিক সার্বজনীন ও সনাতন অধ্যাত্মভাববৃক্ষের সারসমষ্টিসমুদ্ভূত প্রথমোৎপন্ন ফলস্বরূপেই নির্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া বর্তমান কালে অনেকে অনেক কথা তৎসম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিলেও ঐ অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন সনাতন হিন্দুধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক এক ব্যক্তি এবং সাম্প্রদায়িক মতবিশেষেরই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ বিপরীত ধারণাই ঐসকল পুস্তকপাঠে মনে উদিত হইয়া থাকে। আবার ঐসকল গ্রন্থের অনেকগুলি ঠাকুরের জীবনাখ্যায়িকা সম্বন্ধে নানা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং অপরগুলিতে ঐসকল জীবনঘটনার প্রকৃত অর্থ এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ ও পারম্পর্য লক্ষিত হয় না। সাধারণের তদ্ভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য ঐ মহদুদার জীবন আমাদের নিকটে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে এবং যে ভাবোপলব্ধি করিয়া শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি, তাহারই কিছু স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া বর্তমান গ্রন্থে পাঠককে বলিবার প্রযত্ন করিয়াছি। ঠাকুরের

অলৌকিক জীবনাদর্শ যদি উহাতে কথঞ্চিৎ যথার্থভাবেও অঙ্কিত হইয়া থাকে, তবে উহা তাঁহারই গুণে হইয়াছে; এবং যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ও অঙ্গহানিত্ব রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিবার ও বলিবার দোষেই হইয়াছে, পাঠক এ কথা বুঝিয়া লইবেন। ভবিষ্যতে ঠাকুরের অমূল্য জীবনের পূর্ব ও শেষভাগের পরিচয়ও এইভাবে পাঠককে উপহার দিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে ‘ভাবমুখে’ অবস্থিত দূরবগাহী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সনাতন বৈদিক ধর্মের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধালোচনা করিয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ যে সূত্রগুলি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখানে পাঠকের নয়নগোচর করিয়া আমরা গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত হই।

অলমিতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

৩.২. হিন্দুধর্ম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ

লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।

ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ

ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তম্

হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।

গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ

সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥[1]

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।

'সত্য' দুই প্রকার:—

(১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত।

(২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তিগ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।

'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান; সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।

ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্মানুভূতি। সাধকের জীবনে যতদিন উহার উন্মেষ না হয়, ততদিন 'ধর্ম' কেবল 'কথার কথা' ও ধর্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও তাহার পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'।

অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম, সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত

সংগ্রহ বলিয়া আর্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ ‘বেদ’ নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্য জাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে তাহাই ‘বেদ’।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফলসমূহ মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে সর্বকাল অবস্থিত বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচারসকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়াই কালে কালে গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায়—মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব-পদে সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা সর্বথা অপ্রতিহত থাকা বিধায় উহাই সার্বলৌকিক, সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ-কাল-পাত্রভেদে সামাজিক কল্যাণকর কর্মের শিক্ষাই প্রধানতঃ দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র বেদান্তনিহিত তত্ত্বসকল লইয়া অবতারাদির মহান চরিত বর্ণনমুখে ঐসকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যানই করিতেছেন; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান—এইসকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আপাতপ্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত, ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী—পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, তখন আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী দ্বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্তমান, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে স্বতঃ আবির্ভূত হন তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে এইজন্য বেদমূর্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ—অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের, এবং ব্রাহ্মণত্ব—অর্থাৎ ধর্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান যে বারংবার শরীরধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়, পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও যে শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর আমাদের পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছে এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারংবার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা, গতপ্রায়া, বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোন অমানিশা ইতঃপূর্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় আর্য-সমাজের পূর্ব পূর্ব যুগের বোধনসমূহ সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় মহিমাবিহীন হইবে এবং উহার এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পূর্ব পূর্ব যুগে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

সনাতন ধর্মের সমগ্র-ভাবসমষ্টি, বর্তমান পতনাবস্থাকালে, অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-আকারে কোথাও আংশিকভাবে পরিরক্ষিত এবং কোথাও বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে নববলে বলীয়ান মানবসন্তান যে সেই বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া নিজ জীবনে ধারণা ও অভ্যাস করিতে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ পরম কারুণিক শ্রীভগবান বর্তমান যুগে সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যাসহায়, পূর্বোক্ত যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব-যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব-যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম-প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ!–হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর!

হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না–গতরাত্রি পুনর্বার আসে না–বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না–জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি–গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি–লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও!

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর!

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক–এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও!

বিবেকানন্দ

[1] প্রেমের প্রবাহ যাঁর আচণ্ডালে অবারিত।

লোকহিতে রত সদা হয়ে যিনি লোকাতীত॥
জানকীর প্রাণবন্ধ উপমা নাহিক যাঁর।
ভক্ত্যাবৃত জ্ঞানবপু যিনি রাম অবতার॥
স্তব্ধ করি কুরুক্ষেত্রে প্রলয়ের হুহুঙ্কার।
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার॥
উঠেছিল সুগম্ভীর গীতাসিংহনাদ যাঁর।
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার॥

৩.৩. প্রথম অধ্যায়: শ্রীরামকৃষ্ণ–ভাবমুখে

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

– গীতা, ৭/১২–১৩

ঠাকুরের কথার গভীর ভাব

দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক তপস্যান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে বলেন–"ওরে, তুই ভাবমুখে থাক"; ঠাকুরও তাহাই করেন–একথা এখন অনেকেই জানিয়াছেন। কিন্তু ভাবমুখে থাকা যে কি ব্যাপার এবং উহার অর্থ যে কত গভীর তাহা বুঝা ও বুঝানো বড় কঠিন। আটাশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন জনৈক বন্ধুকে[1] বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।" বন্ধুটি তৎশ্রবণে অবাক হইয়া বলেন–"বটে? আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না। তাঁর কোন একটি কথা ঐ ভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?"

স্বামীজী–বোঝবার মাথা থাকলে তবে তো বুঝবি। আচ্ছা, ঠাকুরের যে-কোন একটি কথা ধর, আমি বুঝুচ্চি।

বন্ধু–বেশ; সর্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুর 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণে'র যে গল্পটি বলেন সেইটি বুঝিয়ে বল।

স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের ভিতরে আবহমানকাল ধরিয়া, স্বাধীন-ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ অথবা পুরুষকার ও ভগবদিচ্ছা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে অথচ কোন একটা স্থির মীমাংসা হইতেছে না, সেই সকল কথা উত্থাপন করেন এবং ঠাকুরের ঐ গল্পটি যে ঐ বিবাদের এক অপূর্ব সমাধান, তাহা সরল ভাষায় তিন দিন ধরিয়া বন্ধুটিকে বুঝাইয়া বলেন।

সকল অবতারপুরুষের কথাই ঐরূপ

তলাইয়া দেখিলে বাস্তবিকই ঠাকুরের অতি সামান্য-সামান্য দৈনিক ব্যবহার ও উপদেশের ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য হইতে হয়। অবতারপুরুষদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কথাটি সত্য। তাঁহাদের জীবনালোচনায় ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি যে দুই-একজন মহাপুরুষকে বিপক্ষদলের কুতর্কজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, অপর সকল মহাপুরুষদিগের জীবনেই দেখা যায়, তাঁহারা সাদা কথায়, মর্মস্পর্শী ছোট ছোট গল্প, উপমা বা রূপকের সহায়ে যাহা বলিবার বলিয়া ও বুঝাইয়া গিয়াছেন। লম্বা-চওড়া কথা, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস প্রভৃতির ধার দিয়াও যান নাই। কিন্তু সে সাদা কথার, সে ছোট উপমার ভিতর এত ভাব ও মানবসাধারণকে উচ্চ আদর্শে পৌঁছাইয়া দিবার এত শক্তি রহিয়াছে যে, আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের ভাবের

অন্ত বা শক্তির সীমা এখনও করিতে পারিলাম না। যতই দেখি ততই উচ্চ উচ্চতর ভাব দেখিতে পাই, যতই নাড়াচাড়া তোলাপাড়া করি ততই মন 'অনিত্য অশুভ' সংসারের রাজত্ব ছাড়িয়া ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বতর দেশে উঠিতে থাকে, এবং 'পরমপদপ্রাপ্তি', 'ব্রাহ্মীস্থিতি', 'মোক্ষ' বা 'ভগবদ্দর্শনে'র দিকে–কারণ এক বস্তুকেই নানাভাবে দেখিয়া মহাপুরুষেরা ঐসকল নানা নামে নির্দেশ করিয়াছেন–যতই কেহ অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ঐসকল সাদা কথার গভীর ভাব প্রাণে প্রাণে বুঝিতে থাকে।

দৃষ্টান্ত–গিরিশকে বকল্‌মা দিতে বলা

ইহাই নিয়ম। ঠাকুরের কথা ও ব্যবহার সম্বন্ধেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি না। তাঁহার যে কথাগুলি আগে যে ভাবে বুঝিতাম, এখন সেইগুলিরই আরও কতই না গভীর ভাব দেখিতে পাই! দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি কথা বলিলেই চলিবে। শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর একদিন তাঁহাকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন–"এখন থেকে আমি কি করব?"

ঠাকুর–"যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) দুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।"–এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গিরিশের মনের অবস্থা

গিরিশ শুনিয়া বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার যে কাজ তাহাতে স্নান-আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে-বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে তো মুশকিল–শ্রীগুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে মহা দোষ ও অনিষ্ট হইবে। অতএব এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়াই সে কথা না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাঁহাকে পরকালের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহার কাছে–!' গিরিশ মনের কথাগুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, 'কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোন একটা বিশেষ কঠিন কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে এ কথা বলিলে এখনি আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত।' কিন্তু তিনি কি করিবেন, আপনার একান্ত বহির্মুখ অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে, ধর্মকর্মের অতটুকু প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থ্যের অতীত। আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন–কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে, 'চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ হইলাম'–এ কথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ না ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয় ততক্ষণ যেন প্রাণে অশান্তি। আজীবন এইরূপ ঘটিয়া আসিয়াছে। নিজের ইচ্ছায় ভালমন্দ যাহা হয় করিতে কোন গোল নাই, কিন্তু যেমন মনে হইল–বাধ্য হইয়া অমুক কাজটা আমাকে করিতে হইতেছে বা হইবে অমনি মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। কাজেই আপনার নিতান্ত অপারগ ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন–'করিব' বা 'করিতে পারিব না' কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। আর অত সোজা কাজটা করিতে পারিবেন না, একথা লজ্জার মাথা খাইয়া বলেনই বা কিরূপে–বলিলেও ঠাকুর ও উপস্থিত সকলে মনে করিবেনই বা কি? তাঁহার একান্ত অসহায় অবস্থার কথা হয়তো বুঝিতেই পারিবেন না, আর মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে নিশ্চয় করিবেন–তিনি একটা ঢঙ করিয়া কথাগুলি বলিতেছেন।

ঠাকুর, গিরিশকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া, তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করে নিও।"

গিরিশ নীরব। ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন। দেখিলেন–কোন দিন খান বেলা দশটায়, আর কোন দিন বৈকাল পাঁচটায়; রাত্রির খাওয়া সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। আবার মামলা-মকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়িয়া এমন দিন গিয়াছে যে, খাইতে বসিয়াছেন বলিয়াই হুঁশ নাই! কেবলই উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছেন–'ব্যারিস্টারকে যে ফি পাঠাইয়াছি তাহা ঠিক সময়ে তাঁহার হাতে পৌঁছিল কি না খবরটা পাইলাম না, মকদ্দমার সময় যদি তিনি উপস্থিত না হন তাহা হইলেই তো বিপদ' ইত্যাদি। কার্যগতিকে ঐরূপ দিন যদি আবার আসে–আর আসাও কিছু অসম্ভব নয়–তাহা হইলে সেদিন ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে তো নিশ্চয় ভুলিবেন! হায় হায়, ঠাকুর এত সোজা কাজ করিতে বলিতেছেন, আর তিনি 'করিব' বলিতে পারিতেছেন না! গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির, নীরব রহিলেন, আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা, ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন–"তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'–আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা[2] দে।" ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা!

বকল্‌মা দেওয়ার পর গিরিশের মনের অবস্থা

কথাটি মনের মতো হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল। গিরিশ ভাবিলেন, 'যাক্–নিয়মবন্ধনগুলিকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না। এখন যাহাই করি না কেন এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে, ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তিবলে কোন-না-কোন উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।' শ্রীযুত গিরিশ তখন বকল্‌মা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন–বুঝিলেন তাঁহাকে নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে না; ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজশক্তিবলে ছাড়াইয়া লইবেন।

বকল্‌মা ভালবাসার বন্ধন

কিন্তু নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ অপযশ যাহাই আসুক না কেন, দুঃখ-কষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যে আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না, সে কথা তখন আর তলাইয়া দেখিলেন না; দেখিবার শক্তিও হইল না। অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন–শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা! আর বাড়িয়া উঠিল–শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল–'সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার–তবে আর কি? কাহাকে ডরাই?' ভক্তিশাস্ত্র[3] অহঙ্কারকে যে সাধনের মধ্যে গণ্য করেন এবং মানবের বহুভাগ্যে আসে বলেন তাহাই বা তখন কেমন করিয়া জানিবেন? যাহা হউক শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে-শুইতে-বসিতে ঐ এক চিন্তা–'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন'–সর্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সুখী–কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার!

গিরিশের অতঃপর শিক্ষা

ঠাকুর চিরকাল শিক্ষা দিয়াছেন, 'কখনো কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই' এবং প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঐরূপ ব্যবহারও নিত্য করিতেন। শ্রীযুত গিরিশকে পূর্বোক্ত ভাব দিয়া ধরিয়া এখন হইতে ঐ ভাবের উপযোগী শিক্ষাসকলও তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের

সম্মুখে কোন একটি সামান্য বিষয়ে 'আমি করিব' বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ও কি গো? অমন করে 'আমি করিব' বল কেন? যদি না করতে পার? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করব।" গিরিশও বুঝিলেন, 'ঠিক কথা, আমি যখন ভগবানের উপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কার্য আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে পারিব?' বুঝিয়া তদবধি আমি করিব, যাইব ইত্যাদি বলা ও ভাবাগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

গিরিশের বকল্‌মার গূঢ় অর্থবোধ

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের অদর্শন হইল; স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগরূপ নানা দুঃখ-কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার মন কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল—'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐসকল হইতে দিয়াছেন। তুই তাঁহার উপর ভার দিয়াছিস, তিনিও লইয়াছেন; কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর 'না' বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর বকল্‌মা বা ভার দেওয়াটা একটা মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি?' ইত্যাদি। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকল্‌মা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে? শ্রীযুত গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "এখনও ঢের বাকি আছে! বকল্‌মা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি! এখন দেখি যে সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের আর অন্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'-টার জোরে সেটি করলে!"

অবতারেরাই বকল্‌মার ভার লইতে পারেন

বকল্‌মার প্রসঙ্গে নানা কথা মনে উদয় হইতেছে। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই ভগবান যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণই কখনো কখনো কাহাকেও ঐরূপ অভয় দিয়াছেন। সাধারণ গুরুর ঐরূপ করিবার সামর্থ্য বা অধিকার নাই। সাধারণ গুরু বা সাধুরা মন্ত্র-তন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষ, যাহা দ্বারা তাঁহারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহাই বড় জোর অপরকে বলিয়া দিতে পারেন। অথবা পবিত্রভাবে নিজ জীবন যাপন করিয়া লোককে পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু নানা বন্ধনে জড়ীভূত হইয়া মানুষ যখন একেবারে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হয়, যখন 'এইরূপ কর' বলিলে সে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠে, 'করিব কিরূপে? করিবার শক্তি দাও তো করি', তখন তাহাকে সাহায্য করা সাধারণ গুরুর সাধ্যাতীত। 'তোমার দুষ্কৃতির সকল ভার লইলাম, আমিই তোমার হইয়া ঐ সকলের ফলভোগ করিব'—একথা মানবকে মানবের বলা ও তদ্রূপ করা সাধ্যাতীত। মানবহৃদয়ে ধর্মের ঐরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলেই কৃপায় শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন এবং তাহার হইয়া ফলভোগ করিয়া তাহাকে সেই বন্ধনের আবর্ত হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু ঐরূপ করিলেও তিনি তাহাকে একেবারে রেহাই দেন না। শিক্ষার নিমিত্ত তাহাকে দিয়া কিছু-না-কিছু করাইয়া লন। ঠাকুর যেমন বলিতেন—"তাঁদের (অবতারপুরুষদিগের) কৃপায় মানবের দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মে হয়ে যায়।" ব্যক্তির সম্বন্ধে যেরূপ, জাতির সম্বন্ধেও উহা সেইরূপ সত্য।

তদ্দৃষ্টান্ত

ইহাই গীতায়—বিশ্বরূপদর্শনের জন্য অর্জুনের দিব্যচক্ষুলাভ বলিয়া, পুরাণে—শ্রীভগবানের কৃপালাভ বলিয়া, বৈষ্ণবশাস্ত্রে—জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারসাধন বা পাষণ্ডদলন বলিয়া, এবং খ্রীষ্টান ধর্মে—ঈশার

অপরের ভোগটা নিজের ঘাড়ে লইয়া ভগবানের কোপশমন করা (Atonement) বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যদি ইহার আভাস না পাইতাম, তাহা হইলে কথাটিতে যে সত্য আছে তাহা কখনই বুঝিতে পারিতাম না।

বকল্‌মা সম্বন্ধে ঠাকুরের দর্শন

কলিকাতার শ্যামপুকুরে চিকিৎসার জন্য আসিয়া ঠাকুর যখন থাকেন, তখন একদিন দেখিয়াছিলেন—তাঁহার নিজের সূক্ষ্মশরীরটা স্থূলশরীর হইতে বাহিরে আসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখলুম তার পিঠময় ঘা হয়েছে! ভাবচি কেন এমন হলো? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছে—যা তা করে এসে যত লোকে ছোঁয়, আর তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়—সেইগুলো (দুষ্কর্মের ফল) নিতে হয়! সেইসব নিয়ে নিয়ে ঐরূপ হয়েছে। সেইজন্যই তো (নিজের গলা দেখাইয়া) এই হয়েছে। নইলে এ শরীর কখনও কিছু অন্যায় করেনি—এত (রোগ) ভোগ কেন?" আমরা শুনিয়া অবাক! ভাবিতে লাগিলাম—বাস্তবিকই তবে একজন অপরের কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়া তাহাকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে? অনেকে তখন ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসায় ভাবিয়াছিলেন—'হায় হায়, কেন আমরা ঠাকুরকে মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি নানা দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া ছুঁইয়াছি! আমাদের জন্য তাঁহার এত ভোগ, এত কষ্ট! আর কখনো ঠাকুরের দেবশরীর স্পর্শ করিব না।'

ঠাকুরের ধবলকুষ্ঠ আরোগ্য করা

এ সম্বন্ধে ঠাকুরের আর একটি কথা এখানে মনে পড়িতেছে। কোন সময় একটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত (ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ) ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে কাতর হইয়া ধরে ও বলে যে, তিনি একবার হাত বুলাইয়া দিলেই তাহার ঐ রোগ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ঠাকুর তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলেন, "আমি তো কিছু জানি না, বাবু; তবে তুমি বলছ, আচ্ছা, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। মার ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।"—এই বলিয়া হাত বুলাইয়া দেন। সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়া ঠাকুরের হাতে এমন যন্ত্রণা হয় যে, তিনি অস্থির হইয়া জগদম্বাকে বলেন, "মা আর কখনো এমন কাজ করব না।" ঠাকুর বলিতেন, "তার রোগ সারিয়া গেল—কিন্তু তার ভোগটা (নিজের দেহ দেখাইয়া) এইটের উপর দিয়ে হয়ে গেল।" ঠাকুরের জীবনের ঐসকল ঘটনা হইতেই মনে হয়, বেদ বাইবেল পুরাণ কোরান তন্ত্র-মন্ত্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোক-সহায়ে বুঝিলে এ যুগে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুরও আমাদের বলিয়াছেন—"ওরে, নবাবী আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না!"

বকল্‌মা দেওয়া সহজ নয়

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বকল্‌মা দেওয়াটা বড় সোজা কথা—দিলেই হইল আর কি। মানুষ প্রবৃত্তির দাস, ধর্মকর্ম করিতে আসিয়াও কেবল সুবিধাই খোঁজে—কিরূপে এদিক-ওদিক, সংসারসুখ ও ভগবদানন্দ, দুইটাই পাইতে পারে তাহাই কেবল দেখিতে থাকে। সংসারের ভোগসুখগুলোকে এত মধুর, এত অমৃতোপম বলিয়া বোধ করে যে, সেগুলোকে ছাড়িতে হইবে মনে হইলেও দশদিক শূন্য দেখে, মনে করে তাহা হইলে কি লইয়া থাকিব। সেজন্য আধ্যাত্মিক জগতে বকল্‌মা দেওয়া চলে শুনিয়াই সে লাফাইয়া উঠে। মনে করে, তবে আর কি?—আমি চুরি জুয়াচুরি বাটপারি যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া যতটা পারি সংসারে সুখভোগ করি আর শ্রীচৈতন্য, যীশু বা শ্রীরামকৃষ্ণ, আমি পরকালটায়—কারণ মরিতে তো একদিন হইবেই—যাহাতে সুখী হইতে পারি, তাহা দেখুন। সে তখন বোঝে না যে, উহা আর কিছুই নহে, কেবল পাজি মনের জুয়াচুরি—বোঝে না যে ঐরূপে সে নিরন্তর আপনাকে আপনি ঠকাইতেছে। বোঝে না যে উহা আর

কিছুই নহে, কেবল আপনার দুষ্কৃতসকলের ভীষণ মূর্তি দেখিতে হইবে বলিয়া সাধ করিয়া চক্ষে ঠুলি পরিয়া সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া–বোঝে না যে ঐ ঠুলি একদিন জোর করিয়া একজন খুলিয়া দিবে এবং সে অকূল পাথার দেখিবে–দেখিবে জুয়াচোরের বকল্‌মা কেহ লয় নাই! হায় মানব! কত রকমেই না তুমি আপনাকে আপনি ঠকাইতেছ এবং মনে করিতেছ যে, 'বড় জিতিয়াছি!' আর ধন্য মহামায়া! তুমি কি ভেলকিই না মানবমনে লাগাইয়াছ! শ্রীরামপ্রসাদ স্বরচিত গীতে তোমায় সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ সত্য –

সাবাস মা দক্ষিণাকালী, ভুবন ভেলকি লাগিয়ে দিলি

তোর ভেলকির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।

এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল সাজায়ে

নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।

মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,

প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি?—তুইও বুঝি পাগল হলি!

কোন্ অবস্থায় বকল্‌মা দেওয়া চলে

বকল্‌মা অমনি দিলেই দেওয়া যায় না। নানা উদ্যম অধ্যবসায়ের ফলে মনে বকল্‌মা দিবার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইলে, তখনই মানব উহা ঠিক ঠিক দিতে পারে; আর তখনই শ্রীভগবান তাহার ভার লইয়া থাকেন। সুখী হইবার আশায় সংসারের নানা কাজে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া মানব যখন বাস্তবিকই দেখে–"প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়", সাধন-ভজন-জপ-তপ করিয়া মানব যখন প্রাণে প্রাণে বুঝে অনন্ত ভগবানকে পাইবার উহা কখনই উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে না, অদম্য উদ্যমে পাহাড় কাটিয়া পথ করিয়া লইব ভাবিয়া সকল বিষয়ে লাগিয়া মানব যখন বুঝিতে পারে তাহার কোন ক্ষমতাই নাই, তখন সে 'কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর' বলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতে থাকে, আর তখনই শ্রীভগবান তাহার বকল্‌মা লইয়া থাকেন।

মনের জুয়াচুরি হইতে সাবধান

নতুবা সাধন-ভজন করিতে বা শ্রীভগবানকে ডাকিতে আমার ভাল লাগে না, যথেচ্ছাচার করিতে ভাল লাগে, অতএব তাহাই করিব, আর কেহ ঐ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে বলিব–'কেন? আমি তো ভগবানকে বকল্‌মা দিয়াছি? তিনি আমায় ঐরূপ করাইতেছেন তা কি করিব? মনটি কেন তিনি ফিরাইয়া দেন না?'—এ বকল্‌মা কেবল পরকে ফাঁকি দিবার এবং নিজেও ফাঁকিতে পড়িবার বকল্‌মা; উহাতে 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইতে হয়।

বকল্‌মার শেষ কথা

আর একদিক দিয়া কথাটির আলোচনা করিলে আরও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। আচ্ছা বুঝিলাম–তুমি বকল্‌মা দিয়াছ, তোমার শ্রীভগবানকে ডাকিবার বা সাধন-ভজন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ঠিক ঠিক বকল্‌মা দিলে তোমার প্রাণে প্রাণে সর্বক্ষণ তাঁহার করুণার কথা উদয় হইতে থাকিবেই থাকিবে–মনে হইবে যে, এই অপার সংসারসমুদ্রে পড়িয়া এতদিন হাবু-ডুবু খাইতেছিলাম, আহা, তিনি আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন! বল দেখি, ঐরূপ অনুভবে তাঁহার উপর তোমার কতটা ভক্তি-ভালবাসার উদয় হইবে! তোমার হৃদয় তাঁহার উপর কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া সর্বদাই যে তাঁহার কথা ভাবিতে ও তাঁহার নাম লইতে থাকিবে– উহা করিতে তোমাকে কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সর্পের ন্যায় ক্রূর প্রাণীও আশ্রয়দাতার প্রতি

কৃতজ্ঞ হইয়া বাস্তুসাপ হয় ও বাটীর কাহাকেও দংশন করে না। তোমার হৃদয় কি উহা অপেক্ষাও নীচ যে, যিনি তোমার ইহকাল পরকালের ভার লইলেন, তত্রাচ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইল না? অতএব বকল্‌মা দিয়া যদি দেখ—তোমার ভগবানকে ডাকিতে ভাল লাগে না, তাহা হইলে বুঝিও তোমার বকল্‌মা দেওয়া হয় নাই এবং তিনিও তোমার ভার গ্রহণ করেন নাই। 'বকল্‌মা দিয়াছি' বলিয়া আর আপনাকে ঠকাইও না এবং অপাপবিদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক ভগবানে নিজকৃত দুষ্কৃতির কালিমা অর্পণ করিও না। উহাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি ও অমঙ্গল। ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণের গোহত্যা' গল্পটি মনে রাখিও:

ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণ ও গোহত্যা'র গল্প

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে একখানি সুন্দর বাগান করিয়াছিল। নানাজাতীয় ফল-ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিল ও সেগুলি দিন দিন নধর হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা ছিল না। এখন একদিন দরজা খোলা পাইয়া একটা গরু ঢুকিয়া সেই গাছগুলি মুড়াইয়া খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কার্যান্তরে গিয়াছিল। আসিয়া দেখে তখনও গরুটা গাছ খাইতেছে। বিষম কোপে তাড়া করিয়া সেটাকে যেমন এক ঘা লাঠি মারিয়াছে, আর অমনি মর্মস্থানে আঘাত লাগায় গরুটা মরিয়া গেল! ব্রাহ্মণের তখন প্রাণে ভয়—তাইতো, হিন্দু হইয়া গোহত্যা করিলাম? গোহত্যার তুল্য যে পাপ নাই! ব্রাহ্মণ একটু-আধটু বেদান্ত পড়িয়াছিল। দেখিয়াছিল তাহাতে লেখা আছে যে, বিশেষ বিশেষ দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানবের ইন্দ্রিয়সকল স্ব-স্ব কার্য করে। যথা—সূর্যের শক্তিতে চক্ষু দেখে, পবনের শক্তিতে কর্ণ শুনে, ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত কার্য করে, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের সেই কথাগুলি এখন মনে পড়ায় ভাবিল—'তবে তো আমি গোহত্যা করি নাই। ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত চালিত হইয়াছে—ইন্দ্রই তবে তো গোহত্যা করিয়াছে!' কথাটি মনে মনে পাকা করিয়া ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইল।

এদিকে গোহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করিতে আসিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের মন তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলিল, "যাও, এখানে তোমার স্থান নাই; গোহত্যা ইন্দ্র করিয়াছে, তাহার কাছে যাও।" কাজেই পাপ ইন্দ্রকে ধরিতে গেল। ইন্দ্র পাপকে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্রাহ্মণের সহিত দুটো কথা কহিয়া আসি, তারপর আমায় ধরিও।" ঐ কথা বলিয়া ইন্দ্র মানবরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন ব্রাহ্মণ অদূরে দাঁড়াইয়া গাছপালার তদারক করিতেছে। ইন্দ্র উদ্যানের শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মণের যাহাতে কানে যায় এমনভাবে প্রশংসা করিতে করিতে ধীরপদে ব্রাহ্মণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বলিলেন—"আহা, কি সুন্দর বাগান, কি রুচির সহিত গাছপালাগুলি লাগানো হইয়াছে, যেখানে যেটি দরকার ঠিক সেখানে সেটি পোঁতা রহিয়াছে!" এইপ্রকার বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, বলিতে পারেন বাগানখানি কার? এমন সুন্দরভাবে গাছপালাগুলি কে লাগাইয়াছে?" ব্রাহ্মণ উদ্যানের প্রশংসা শুনিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল—"আজ্ঞা এখানি আমার; আমিই এগুলি সব পুঁতিয়াছি। আসুন না, ভাল করিয়া বেড়াইয়া দেখুন না।" এই বলিয়া উদ্যান সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রকে উদ্যানমধ্যস্থ সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ক্রমে ভুলিয়া মৃত গরুটা যথায় পড়িয়াছিল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্র যেন একেবারে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাম, রাম, এখানে গোহত্যা করিল কে?" ব্রাহ্মণ, এতক্ষণ উদ্যানের সকল পদার্থই 'আমি করিয়াছি, আমি করিয়াছি' বলিয়া আসিয়াছে; কাজেই গোহত্যা কে করিল জিজ্ঞাসায় বিষম ফাঁপরে পড়িয়া একেবারে নির্বাক—চুপ! তখন ইন্দ্র নিজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "তবে রে ভণ্ড, উদ্যানের যাহা কিছু ভাল সব তুমি করিয়াছ, আর গোহত্যাটাই কেবল আমি করিয়াছি, বটে? নে তোর গোহত্যা-কৃত পাপ।" এই বলিয়া ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন এবং পাপও আসিয়া ব্রাহ্মণের শরীর অধিকার করিল।

সাধকের মনের উন্নতির সহিত ঠাকুরের কথার গভীর অর্থবোধ

যাক এখন বকল্‌মার কথা, আমরা পূর্বপ্রসঙ্গের অনুসরণ করি। ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ঠাকুরের কথাগুলির পূর্বে তাঁহারা যে অর্থগ্রহণে সমর্থ হইতেন, এখন যত দিন যাইতেছে তত সেইগুলির ভিতর আরও কত গভীর অর্থ তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারিতেছেন। আবার ঠাকুরের অনেক কথা বা ব্যবহার, যাহার অর্থ আমরা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কেবল হাঁ করিয়া শুনিয়া গিয়াছি মাত্র, তাহাদের ভিতর এখন অপূর্ব অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিয়া অবাক হইয়া থাকিতে হয়!

'কালে হবে'

ঠাকুরের কথাই ছিল–"ওরে, কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারাগাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল–সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না; এই গানটায় কি বলছে শোন।" এই বলিয়া ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গান ধরিতেন –

হরিষে লাগি রহো রে ভাই।

তেরা বনত বনত বনি যাই–তেরা বিগড় বাত বনি যাই॥

অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই

(আওর্) শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ।

দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চালাই

(আওর্) এক বাতকো টাণ্টা পড়ে তো খোঁজ খবর না পাই।

এয়্সী ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাঈ

সেবা বন্দি আওর্ অধীনতা সহজ মিলি রঘুরাঈ॥

সাধনে লাগিয়া থাকা আবশ্যক

– গান গাহিয়া আবার বলিতেন, "তাঁর সেবা, বন্দনা ও অধীনতা–কি না দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্যন্তই হলো। একজন চাকরি করে কষ্টে-সৃষ্টে কিছু কিছু করে টাকা জমাত। একদিন গুণে দেখে যে হাজার টাকা জমেছে। অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনে করলে, তবে আর কেন চাকরি করা? হাজার টাকা তো জমেছে, আর কি? এই বলে চাকরি ছেড়ে দিলে। এতটুকু আধার, এতটুকু আশা! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠল, ধরাকে সরাখানা দেখতে লাগল। তারপর–হাজার টাকা খরচ হতে আর কদিন লাগে? অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখে-কষ্টে আবার চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতে লাগল। ও রকম করলে চলবে না, তাঁর (ভগবানের) দ্বারে পড়ে থাকতে হবে; তবে তো হবে।"

ম্যাদাটে ভক্তি ত্যাগ করা

আবার কখনো কখনো গানটির দ্বিতীয় চরণ–'তেরা বনত বনত বনি যাই' অর্থাৎ ভক্তি করিতে করিতে ফল পাওয়া যাইবে–গাহিতে গাহিতে বলিয়া উঠিতেন–"দূর শালা! 'বনত বনত' কি? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নাই। মনে জোর করতে হয়–এখনি হবে, এখনি তাঁকে পাব। ম্যাদাটে ভক্তির কর্ম কি তাঁকে পাওয়া?"

ভাবঘনমূর্তি ঠাকুরের প্রত্যেক ভাবের সহিত দৈহিক পরিবর্তন

ঠাকুরকে দেখিলেই বাস্তবিকই মনে হইত, যেন একটি জ্বলন্ত ভাবঘনমূর্তি!—যেন পুঞ্জীকৃত ধর্মভাবরাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার একটা আকার ও রূপ দেখিতে পাইতেছি! মনের ভাব-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটার পরিবর্তন হওয়ার কথা আমরা বলিয়াই থাকি ও কালে-ভদ্রে কখনো একটু-আধটু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু মনের ভাবতরঙ্গ যে শরীরে এতটা পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারে, তাহা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই। নির্বিকল্প সমাধিতে 'আমি'-জ্ঞানের একেবারে লোপ হইল—আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের হাতের নাড়ি, হৃদয়ের স্পন্দন, সব বন্ধ হইয়া গেল; শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ডাক্তারেরা যন্ত্রসহায়ে পরীক্ষা করিয়াও হৃৎপিণ্ডের কার্য কিছুই পাইলেন না।[4] তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জনৈক ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের চক্ষুর তারা বা মণি অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিলেন—তথাচ উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায় কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না! 'সখীভাব'-সাধনকালে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী ভাবিতে ভাবিতে মন তন্ময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও স্ত্রী-সুলভ ভাব উঠা-বসা, দাঁড়ানো, কথা কহা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যে এমন প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শ্রীযুত মথুরানাথ মাড় প্রভৃতি যাহারা চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সঙ্গে উঠা-বসা করিত, তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অনেকবার কোন আগন্তুক স্ত্রীলোক হইবে বলিয়া ভ্রমে পড়িল। এইরূপ কত ঘটনাই না আমরা দেখিয়াছি ও ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি—যাহাতে বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলিকে পালটাইয়া বাঁধিতে হয়। সেসব কথা বলিলেও কি লোকে বিশ্বাস করিবে?

ঠাকুরের সকলের সকলপ্রকার ভাব ধরিবার ক্ষমতা

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় দেখিয়াছি ঠাকুরের ভাবরাজ্যের সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা—ছোট-বড় সব রকম ভাব বুঝিতে পারা। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের মনোভাব—বিষয়ী, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত, স্ত্রী, পুরুষ সকলের হৃদ্‌গত ভাব ধরিয়া কে কোন্ পথে কতদূর ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পূর্ব সংস্কারানুযায়ী ঐ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে তাহার কিরূপ সাধনেরই বা বর্তমানে প্রয়োজন, সকল কথা বুঝিতে পারা ও তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করা। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঠাকুর যেন মানবমনে যতপ্রকার ভাব উঠিয়াছে, উঠিতে পারে বা পরে উঠিবে, সে সকল ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়া বসিয়া আছেন এবং ঐসকল ভাবের প্রত্যেকটি তাঁহার নিজের মনের ভিতর আবির্ভাব হইতে তিরোভাবকাল পর্যন্ত পর পর তাঁহার যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন! আর তজ্জন্যই ইতরসাধারণ মানব যে যখন আসিয়া যে ভাবের কথা বলিতেছে, নিজের ঐসকল পূর্বানুভূত ভাবের সহিত মিলাইয়া তখনি তাহা ধরিতেছেন, বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন। সকল বিষয়েই যেন এইরূপ। মায়ামোহ, সংসার-তাড়না, ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ কোন অবস্থায় পড়িয়া উহা হইতে উদ্ধার হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কাতর-জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে ঠাকুর পথের সন্ধান তো দিয়া দিতেনই, আবার অনেক সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঐ অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ অনুভূতি হইয়াছিল তাহাও বলিতেন। বলিতেন, "ওগো, তখন এইরূপ হইয়াছিল ও এইরূপ করিয়াছিলাম" ইত্যাদি। বলিতে হইবে না।—ঐরূপ করায় জিজ্ঞাসুর মনে কত ভরসার উদয় হইত এবং ঠাকুর তাহার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, কতদূর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রসর হইত। শুধু তাহাই নহে, এইরূপে নিজ জীবনের ঘটনা বলায় জিজ্ঞাসুর মনে হইত, ঠাকুর তাহাকে কত ভালবাসেন!—আপনার মনের কথাগুলি পর্যন্ত বলেন! দুই-একটি দৃষ্টান্তেই বিষয়টি সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে।

১ম দৃষ্টান্ত—মণিমোহনের পুত্রশোকের কথা

সিঁদুরিয়াপটির শ্রীযুত মণিমোহন মল্লিকের একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইল। মণিমোহন পুত্রের সৎকার করিয়াই ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বিমর্ষভাবে ঘরের একপাশে বসিলেন। দেখিলেন, ঘরে স্ত্রী-পুরুষ অনেকগুলি জিজ্ঞাসু ভক্ত বসিয়া রহিয়াছেন

এবং ঠাকুর তাঁহাদের সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন। বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো? আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?”

মণিমোহন বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—(পুত্রের নাম করিয়া) অমুক আজ মারা পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ মণিমোহনের সেই রুক্ষবেশ ও শোকনিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই স্তম্ভিত, নীরব! সকলেই বুঝিলেন, বৃদ্ধের হৃদয়ের সেই গভীর মর্মবেদনা ও উথলিত শোকাবেগ বাক্যে রুদ্ধ হইবার নহে। তথাচ বৃদ্ধের বিলাপ ও ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া—সংসারের ধারাই ঐ প্রকার, সকলকেই একদিন মরিতে হইবে, যাহা হইয়াছে সহস্র ক্রন্দনেও তাহা ফিরিবার নহে, অতএব শোক পরিত্যাগ কর, সহ্য কর—এইরূপ নানা কথায় তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই মানব শোকসন্তপ্ত নরনারীকে ঐসকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া আসিতেছে; কিন্তু হায়, কয়টা লোকের প্রাণ তাহাতে শান্ত হইতেছে? কেনই বা হইবে? মন, মুখ এবং অনুষ্ঠিত কর্ম—তিনটি পদার্থ একই ভাবে ভাবিত থাকিলে তবেই আমাদের উচ্চারিত বাক্যসমূহ অপরের প্রাণস্পর্শ করিয়া তাহাতে সমভাবের তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারে। এখানে যে তাহার একান্তাভাব! আমরা মুখে সংসার অনিত্য বলিয়া প্রতি চিন্তায় ও কার্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; নিশার স্বপ্নসম সংসারটা অনিত্য বলিয়া ভাবিতে অপরকে উপদেশ করিয়া নিজে সর্বদা প্রাণে প্রাণে উহাকে নিত্য বলিয়া ভাবি এবং চিরকালের মতো এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকি। আমাদের কথায় সে শক্তি কোথা হইতে আসিবে?

অপর সকলে মণিমোহনকে ঐরূপে নানা কথা কহিলেও ঠাকুর এক্ষেত্রে অনেকক্ষণ কোন কথাই না কহিয়া মণিমোহনের শোকোচ্ছ্বাস কেবল শুনিয়াই যাইতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার সেই উদাসীন ভাব দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেও লাগিলেন—ইঁহার হৃদয় কি কঠোর, কি করুণাশূন্য!

বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন এবং সহসা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত মণিমোহনকে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তেজের সহিত গান ধরিলেন –

জীব সাজ সমরে।

ঐ দেখ্ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।

আরোহণ করি মহাপুণ্য-রথে ভজন-সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে

দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান ভক্তি-ব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে।

আর এক যুক্তি আছে শুন সুসঙ্গতি,

সব শত্রু নাশের চাইনে রথরথী

রণভূমি যদি করেন দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥

গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী ঠাকুরের নয়ন হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সহিত মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে তখন এক অপূর্ব আশা ও উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত করিল। সকলেরই মন তখন শোক-মোহের রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া এক অপূর্ব ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারাতীত, বিমল ঈশ্বরীয় আনন্দে পূর্ণ হইল। মণিমোহনও উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এখন শোক-তাপ ভুলিয়া স্থির, গম্ভীর, শান্ত!

গীত সাঙ্গ হইল—কিন্তু গীতোক্ত কয়েকটি বাক্যের সহায়ে ঠাকুর যে দিব্য ভাবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘর অনেকক্ষণ অবধি জমজম করিতে লাগিল। ঈশ্বরই একমাত্র আপনার, মন-প্রাণ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম—তিনি কৃপা করুন, দর্শন দিন—এই ভাবে আত্মহারা হইয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি মণিমোহনের নিকটে বসিয়া বলিতে লাগিলেন –

"আহা! পুত্রশোকের মতো কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।"

এই বলিয়া ঠাকুর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। এমন বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে ঠাকুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে, স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আপনার আত্মীয়ের মৃত্যু পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন! বলিলেন, "অক্ষয় মলো—তখন কিছু হলো না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হলো—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম! তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল! তার পরদিন (ঘরের পূর্বে, কালীবাড়ির উঠানের সামনের বারাণ্ডার দিকে দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্চে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্চে! ভাবলুম, মা, এখানে (আমার) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!—তাই দেখাচ্ছিস, বটে!"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, "তবে কি জান? যারা তাঁকে (ভগবানকে) ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মতো আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় স্টীমারগুলো গেলে জেলেডিঙিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল—আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উলটেই গেল। আর বড় বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু-চারবার টাল-মাটাল হয়েই যেমন তেমনি—স্থির হলো। দু-চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।"

আবার কিছুক্ষণ বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে থাকিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "কয়দিনের জন্যেই বা সংসারের এসকলের (পুত্রাদির) সঙ্গে সম্বন্ধ! মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায়—বিয়ে করলে, ছেলে হলো, সেই ছেলে আবার বড় হলো, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটা মলো, এটা বয়ে গেল—ভাবনায়, চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত; যত রস মরে তত একেবারে 'দশ ডাক' ছাড়তে থাকে। দেখনি?—ভিয়েনের উনুনে কাঁচা সুঁদরীর চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মতো হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ-চাঁ, ফুস-ফাস নানারকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।" এইপ্রকারে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা এবং শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতেই একমাত্র সুখ—ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা কহিয়া মণিমোহনকে বুঝাইতে লাগিলেন। মণিমোহনও সামলাইয়া বলিলেন, "এইজন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম—এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।"

আমরা তখন ঠাকুরের এই অদৃষ্টপূর্ব ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইঁহাকেই আমরা পূর্বে কঠোর উদাসীন ভাবিতেছিলাম। যিনি যথার্থ মহৎ তাঁহার ছোট ছোট কাজগুলিও অপর সাধারণের ন্যায় হয় না। ছোট-বড় প্রত্যেক কার্যেই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এইমাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে সমাধি বা ঈশ্বরের সহিত নৈকট্য-উপলব্ধিতে যাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন

পর্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছিল, ইনি কি তিনি? সেই ঠাকুরই কি বাস্তবিক মণিমোহনের অবস্থার সহিত সহানুভূতিতে একেবারে সাধারণ মানবের ন্যায় হইয়াছেন? 'মায়া হ্যায়'—ছোট কথা বলিয়া বৃদ্ধের কথা ইনি তো উড়াইয়া দিতে পারিতেন? সে ক্ষমতা যে ইঁহার নাই তাহা তো নহে। কিন্তু ঐরূপে মহত্ত্বখ্যাপন করিলে বুঝিতাম, ইনি বড় হন বা আর যাহা কিছু হন, লোকগুরু—জগদ্গুরু ঠাকুর নহেন। বুঝিতাম, মানবসাধারণের ভাব বুঝিবার ইঁহার ক্ষমতা নাই এবং বলিতাম, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতায় দুর্বল মানব আমাদের মতো অসহায় অবস্থায় ইনি যদি একবার পড়িতেন, তবে কেমন করিয়া মায়ার খেলায় উদাসীন থাকিতে পারিতেন তাহা দেখিতাম।

২য় দৃষ্টান্ত—কাম দূর করা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

পরক্ষণেই আবার হয়তো কোন যুবক আসিয়া বিষণ্নচিত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি, তবুও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ও কুভাব মনে উপস্থিত হয়ে বড় অশান্তি আসে।"

ঠাকুর—"ওরে, ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি, আর এমনি কামের তোড় এল যে আর যেন সামলাতে পারিনি! তারপর ধুলোয় মুখ ঘসড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনো ভাবব না যে কাম জয় করেছি'—তবে যায়। কি জানিস—(তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে! তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাধ মানে? বাঁধ উছলে ভেঙে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধান-ক্ষেতের ওপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায়! তবে বলে—কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে একবার আধবার কখনো কুভাব এসে পড়ে তো—'কেন এল' বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো কখনো কখনো শরীরের ধর্মে আসে যায়—শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মতো মনে করবি। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করে মনে আর আনবি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাবগুলো এল কি গেল—সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মানবে।" যুবকের কাছে ঠাকুর যেন এখন যুবকই হইয়া গিয়াছেন!

৩য় দৃষ্টান্ত—যোগানন্দকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত যোগেনের কথা মনে পড়িতেছে। স্বামী যোগানন্দ, যাঁহার মতো ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল্পদিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটিরে থাকিয়া নেতি-ধৌতি[5] ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছে। যোগেন স্বামীজী বলিতেন, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐসকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐসকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শনও হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন একটা আসন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরীতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন, বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজী বলিতেন—"ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।' কথাটা আমার একটুও মনের মতো হলো না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়! তাহলে এত লোক তো কচ্চে, যাচ্ছে না কেন? তারপর একদিন কালীবাটীর বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর

কাছে দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই ডেকে আমার হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, 'তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাসনি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের উপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।' আমি কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলি শুনে ভাবলুম—পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এইসব বলছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা, কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম আর কি। আমি তাঁর কাছে আসি বা না-ই আসি তাতে তাঁর (ঠাকুরের) যে কিছুই লাভ-লোকসান নাই—একথা তখন মনেও এল না। এমন পাজি সন্দিগ্ধ মন ছিল। ঠাকুরের কৃপার শেষ নাই, তাই এত সব অন্যায় ভাব মনে এনেও স্থান পেয়েছিলাম। তারপর ভাবলুম—উনি (ঠাকুর) যা বলেছেন, তা করেই দেখি না কেন—কি হয়? এই বলে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম।"

৪র্থ দৃষ্টান্ত—মণিমোহনের আত্মীয়ার কথা

এইরূপে সকলের অবস্থা ও ভাব ধরিবার কথার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সিঁদুরিয়াপটির মল্লিক মহাশয়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ভক্তিমতী জনৈকা আত্মীয়াও ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেন। একদিন আসিয়া তিনি বিশেষ কাতরভাবে জানাইলেন যে, ভগবানের ধ্যান করিতে বসিলে সংসারের চিন্তা, এর কথা, তার মুখ ইত্যাদি মনে পড়িয়া বড়ই অশান্তি আসে। ঠাকুর অমনি তাঁর ভাব ধরিলেন; বুঝিলেন, ইনি কাহাকেও ভালবাসেন—যাহার কথা ও মুখ মনে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি?" তিনি উত্তর করিলেন, "একটি ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রকে"—যাহাকে তিনি মানুষ করিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "বেশ তো, তার জন্য যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ানো-পরানো ইত্যাদি সব, গোপাল ভেবে করো। যেন গোপাল-রূপী ভগবান তার ভেতরে রয়েছেন—তুমি তাকেই খাওয়াচ্চ, পরাচ্চ, সেবা করচ—এই রকম ভাব নিয়ে কর। মানুষের করচি ভাববি কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।" শুনিতে পাই ঐরূপ করার ফলে অল্পদিনেই তাঁহার বিশেষ মানসিক উন্নতি, এমনকি ভাবসমাধি পর্যন্ত হইয়াছিল।

ঠাকুরের স্ত্রী-জাতির সর্বপ্রকার মনোভাব ধরিবার ক্ষমতা

ঠাকুরের নিজের পুরুষশরীর ছিল, সেজন্য তাঁহার পুরুষের ভাব বুঝা ও ধরাটা কতক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীজাতি—কোমলতা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্য ভগবান যাহাদের পুরুষ অপেক্ষা একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন—তাহাদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া ঠিক ঠিক ধরিতেন, তাহা ভাবিলে আর আশ্চর্যের সীমা থাকে না। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা বলেন, "ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক সময় মনে হইত না। মনে হইত—যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কোচ-লজ্জা আসে, ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না। যদি বা কখনো আসিত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলিয়া যাইতাম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতাম।"

উহার কারণ

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখী বা দাসী আমি'—এই ভাবনা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তন্ময় হইয়া 'পুরুষ আমি' এ ভাবটি ঠাকুর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই কি ঐরূপ হইত? পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন, 'তোমার মন হইতে হিংসা যদি একেবারে ত্যাগ হয়, তো মানুষের তো কথাই নাই, জগতে কেহই—বাঘ সাপ প্রভৃতিও—তোমাকে আর হিংসা করিবে না! তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে হিংসা-প্রবৃত্তিরই উদয় হইবে না।' হিংসার ন্যায় কাম-ক্রোধাদি অন্য সকল বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। পুরাণে এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি

বলিলেই চলিবে। মায়াহীন নিষ্কলঙ্ক যুবক শুক ভগবদ্ভাবে অহরহঃ নিমগ্ন থাকিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন, আর বৃদ্ধ পিতা ব্যাস পুত্রমায়ায় অন্ধ হইয়া 'কোথা যাও, কোথা যাও' বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। পথিমধ্যে সরোবর-তীরে বস্ত্র রাখিয়া অপ্সরাগণ স্নান করিতেছিলেন। শুককে দেখিয়া তাঁহাদের মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জার উদয় হইল না—যেমন স্নান করিতেছিলেন তেমনই করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন। ব্যাস ভাবিলেন—'এতো বেশ! আমার যুবক পুত্র অগ্রে যাইল, তাহাতে কেহ একটু নড়িলও না, আর আমি বৃদ্ধ, আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা!' কারণ জিজ্ঞাসায় রমণীরা বলিলেন, "শুক এত পবিত্র যে, 'তিনি আত্মা' এই চিন্তাই তাঁহার সর্বক্ষণ রহিয়াছে! তাঁহার নিজের স্ত্রীশরীর কি পুরুষশরীর সে বিষয়ে আদৌ হুঁশই নাই! কাজেই তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা আসিল না। আর তুমি বৃদ্ধ, রমণীর হাবভাব কটাক্ষের অনেক পরিচয় পাইয়াছ ও রূপলাবণ্যের অনেক বর্ণনাও করিয়াছ; তোমার শুকের মতো স্ত্রী-পুরুষে আত্মদৃষ্টি নাই এবং হইবেও না; কাজেই তোমাকে দেখিয়া আমাদের পুরুষবুদ্ধির উদয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিল।"

স্ত্রীজাতির ঠাকুরের নিকট সর্বথা নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কারণ

ঠাকুরের সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই মনে হয়। তাঁহার জ্বলন্ত আত্মজ্ঞান ও স্ত্রী-পুরুষ সকলের ভিতর, সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি, তাঁহার নিকটে যতক্ষণ থাকা যাইত ততক্ষণ সকলের মন এত উচ্চে উঠাইয়া রাখিত যে, 'আমি পুরুষ', 'উনি স্ত্রী'—এসকল ভাব অনেক সময়ে মনেই উঠিত না। কাজেই পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিরও তাঁহার নিকট সঙ্কোচাদি না হইবারই কথা। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের সংসর্গে ঐ আত্মদৃষ্টি তাঁহাদের ভিতর তৎকালে এত বদ্ধমূল হইয়া যাইত যে, যে-সকল কাজকে মেয়েরা অসীম সাহসের কাজ বলেন ও কখনো কাহারও দ্বারা আদিষ্ট হইয়া করিতে পারেন না, ঠাকুরের কথায় সেইসকল কাজ অবাধে অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোক যাঁহারা গাড়ি-পালকি ভিন্ন কোথাও কখনো গমনাগমন করিতেন না, ঠাকুরের আজ্ঞায় তাঁহারাও কখনো কখনো তাঁহার সহিত দিনের বেলায় পদব্রজে সদর রাস্তা দিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত অনায়াসে হাঁটিয়া আসিয়া নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গমন করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সেখানে যাইয়া হয়তো আবার ঠাকুরের আজ্ঞায় নিকটস্থ বাজার হইতে বাজার করিয়া আনিয়াছেন এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় হাঁটিয়া কলিকাতায় নিজ বাড়িতে ফিরিয়াছেন। এ বিষয়ে দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলেই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

ঐ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র বা আশ্বিন মাস। শ্রীশ্রীমা তখন পিত্রালয় জয়রামবাটীতে গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বলরাম বসু তাঁহার পিতার সহিত বৃন্দাবন গিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুত রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী), শ্রীযুত গোপাল (অদ্বৈতানন্দ স্বামী) প্রভৃতি ও অন্যান্য অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ গিয়াছেন। বাগবাজারের একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোকের—যিনি ঠাকুরকে কখনো দেখেন নাই, কথামাত্রই শুনিয়াছেন—ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল; পরিচিতা আর একটি স্ত্রীলোককে ঐ কথা বলিলেন। পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটি দুই বৎসর পূর্ব হইতে ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেছেন, সেজন্যই তাঁহাকে বলা। পরামর্শ স্থির হইল; পরদিন অপরাহ্নে নৌকায় করিয়া উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। দেখিলেন—ঠাকুরের ঘরের দ্বার রুদ্ধ। ঘরের উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তাহার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন—ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। কাজেই নহবতে, যেখানে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন, গিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ঠাকুর উঠিলেন এবং উত্তরের দরজা খুলিয়া নহবতের দ্বিতলের বারাণ্ডায় তাঁহারা বসিয়া আছেন দেখিতে পাইয়া "ওগো, তোরা এখানে আয়" বলিয়া ডাকিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তক্তা হইতে নামিয়া পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটির নিকট যাইয়া বসিলেন।

তিনি তাহাতে সঙ্কুচিতা হইয়া সরিয়া বসিবার উপক্রম করিলে ঠাকুর বলিলেন, "লজ্জা কিগো? লজ্জা ঘৃণা ভয়–তিন থাকতে নয়। (হাত নাড়িয়া) তোরাও যা, আমিও তাই। তবে (দাড়ির চুলগুলি দেখাইয়া) এইগুলি আছে বলে লজ্জা হচ্ছে, না?"

এই বলিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ পাড়িয়া নানা কথার উপদেশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ ভুলিয়া যাইয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতে ও শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বিদায়কালে ঠাকুর বলিলেন, "সপ্তাহে একবার করে আসবে। নূতন নূতন এখানে আসা-যাওয়াটা বেশি রাখতে হয়।" আবার সম্ভ্রান্তবংশীয়া হইলেও গরিব দেখিয়া নৌকা বা গাড়ির ভাড়া নিত্য নিত্য কোথা পাবেন ভাবিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, "আসবার সময় তিন-চার জনে মিলে নৌকায় করে আসবে। আর যাবার সময় এখান থেকে হেঁটে বরানগরে গিয়ে 'শেয়ারে' গাড়ি করবে।" বলা বাহুল্য, স্ত্রী-ভক্তেরা তদবধি তাহাই করিতে লাগিলেন।

ঐ সম্বন্ধে ২য় দৃষ্টান্ত

আর একজন আমাদের একদিন বলিয়াছিলেন–"ভোলা ময়রার দোকানে বেশ সর করেছিল। ঠাকুর সর খেতে ভালবাসতেন জানতুম, তাই বড় একখানি সর কিনে আমরা পাঁচজনে মিলে নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। ওমা, এসে শুনলুম ঠাকুর কলিকাতায় গিয়েছেন। সকলে তো একেবারে বসে পড়লুম। কি হবে? রামলালদাদা ছিলেন–তাঁকে ঠাকুর কোথায় গিয়েছেন জিজ্ঞাসা করায়, বলে দিলেন, 'কম্বুলেটোলায় মাস্টার মহাশয়ের[6] বাড়িতে'। অ-র মা শুনে বললে, 'সে বাড়ি আমি জানি, আমার বাপের বাড়ির কাছে–যাবি? চল যাই; এখানে বসে আর কি করব?' সকলেই তাই মত করলে। রামলালদাদার হাতে সরখানি দিয়ে বলে গেলুম, 'ঠাকুর এলে দিও'। নৌকা তো ছেড়ে দিয়েছিলুম–হেঁটে হেঁটেই সকলে চললুম। কিন্তু এমনি ঠাকুরের ইচ্ছে, আলমবাজারটুকু গিয়েই একখানা ফেরতা গাড়ি পাওয়া গেল। ভাড়া করে তো শ্যামপুকুরে সব এলুম। এসে আবার বিপদ। অ-র মা বাড়ি চিনতে পারলে না। শেষে ঘুরে ঘুরে তার বাপের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটা চাকরকে ডেকে আনলে। সে সঙ্গে এসে দেখিয়ে দেয়, তবে হয়। অ-র মারই বা দোষ দেব কি, আমাদের চেয়ে ৩।৪ বছরের ছোট তো? তখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের হবে। বউ মানুষ, রাস্তাঘাটে কখনো বেরোয়নি, আর গলির ভেতরে বাড়ি–সে চিনবেই বা কেমন করে গা?

"যা হোক করে তো পৌঁছুলুম। তখন মাস্টারদের (পরিবারের) সঙ্গেও চেনাশুনা হয়নি। বাড়ি ঢুকে দেখি একখানি ছোট ঘরে তক্তাপোশের ওপর ঠাকুর বসে, কাছে কেউ নাই। আমাদের দেখেই হেসে বলে উঠলেন, 'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?' আমরা তাঁকে প্রণাম করে সব কথা বললুম। তিনি খুব খুশি, ঘরের ভেতর বসতে বললেন, আর অনেক কথাবার্তা কইতে লাগলেন। এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি ছুঁতে দিতেন না! কাছে যেতে দিতেন না। আমরা শুনে হাসি ও মনে করি–তবু আমরা এখনো মরিনি! তাঁর যে কি দয়া ছিল, তা কে জানবে! স্ত্রী-পুরুষে সমান ভাব! তবে স্ত্রীলোকের হাওয়া অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না, অনেকক্ষণ থাকলে বলতেন, 'যা গো, এইবার একবার মন্দিরে দর্শন করে আয়'। পুরুষদেরও ঐরূপ বলতে আমরা শুনেছি।

"যাক। আমরা তো বসে কথা কইছি। আমাদের ভেতর যে দুজনের বেশি বয়েস ছিল তারা দরজার সামনেই বসেছে, আর আমরা তিনজনে ঘরের ভেতর, এককোণে; এমন সময়ে ঠাকুর যাকে 'মোটা বামুন' বলতেন (শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) তিনি এসে উপস্থিত। বেরিয়ে যাব–তারও জো নেই! কোথায় যাই! বুড়িরা দরজার সামনেই একটা জানালা ছিল, তাতেই বসে রইল। আর আমরা তিনটেয় ঠাকুর যে তক্তাপোশে বসেছিলেন তার নিচে ঢুকে উপুড় হয়ে

শুয়ে পড়ে রইলুম। মশার কামড়ে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠল, কি করি, নড়বার জো নেই, স্থির হয়ে পড়ে রইলুম। কথাবার্তা কয়ে বামুন প্রায় এক ঘণ্টা বাদে চলে গেল, তখন বেরুই!—আর হাসি!

"তারপর বাড়ির ভেতর জলখাবারের জন্য ঠাকুরকে নিয়ে গেল। তখন তাঁর সঙ্গে বাড়ির ভেতর গেলুম। তারপর খেয়েদেয়ে কতক্ষণ বাদে ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন (দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া); তখন সকলে হেঁটে বাড়ি ফিরি। রাত তখন ৯টা হবে।

স্ত্রীভক্তদিগের প্রতি ঠাকুরের সমান কৃপা

"তার পরদিন আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। যাবামাত্র ঠাকুর কাছে এসে বললেন, 'ওগো, তোমার সর প্রায় সবটা খেয়েছিলুম, একটু বাকি ছিল; কোন অসুখ করেনি, পেটটা একটু সামান্য গরম হয়েছে'। আমি তো শুনে অবাক! তাঁর পেটে কিছু সয় না, আর একখানা সর তিনি একেবারে খেয়েছেন! তারপর শুনলুম—ভাবাবস্থায় খেয়েছেন। শুনলুম—মাস্টার মহাশয়ের বাড়ি থেকে ঠাকুর খেয়ে-দেয়ে তো রাত্রি সাড়ে দশটায় এসে পৌঁছুলেন; এসে খানিক বাদে তাঁর ভাব হয় ও অর্ধবাহ্যদশায় রামলালদাদাকে বলেন, 'বড় ক্ষুধা পেয়েছে, ঘরে কি আছে দে তো রে'। রামলালদাদা শুনে আমার সেই সরখানি এনে সামনে দেন ও ঠাকুর তা প্রায় সব খেয়ে ফেলেন! ভাবের ঘোরে তাঁর কখনো কখনো অমন অসম্ভব খাওয়া ও খেয়ে হজম করার কথা মা-র কাছে ও লক্ষ্মীদিদির কাছে শুনেছিলুম, সেইসব কথা মনে পড়ল। এত কৃপা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি! সে যে কি দয়া, তা বলে বোঝাবার নয়! আর সে কি টান, কেমন করে যে আমরা সব যেতুম, করতুম—তা আমরাই জানি না, বুঝি না। কই—এখন তো আর সে রকম করে কোথাও হেঁটে হেঁটে বলা নেই কওয়া নেই অচেনা লোকের বাড়িতে সাধু দেখতে বা ধর্মকথা শুনতে যেতে পারি নে! সে যাঁর শক্তিতে করতুম তাঁর সঙ্গে গিয়েছে! তাঁকে হারিয়ে এখন কেন যে বেঁচে আছি, তা জানি না!"

এইরূপ আরও কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা কখনো বাটীর বাহির হন নাই—তাঁহাদের দিয়া বাজার করাইয়া আনিয়াছেন, অভিমান অহঙ্কার দূরে যাইবে বলিয়া সাধারণ ভিখারির ন্যায় লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করাইয়াছেন, সঙ্গে লইয়া পেনেটীর মহোৎসব ইত্যাদি দেখাইয়া আনিয়াছেন—আর তাঁহারাও মনে কোন দ্বিধা না করিয়া মহানন্দে যাহা ঠাকুর বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন! ভাবিয়া দেখিলে ইহা একটি কম ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না; সে প্রবল জ্ঞানতরঙ্গের সম্মুখে সকলেরই ভেদজ্ঞানপ্রসূত দ্বিধাভাব তখনকার মতো ভাসিয়া গিয়াছে। সে উজ্জ্বল ভাবঘনতনু ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে! পুরুষ পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী স্ত্রীজনসুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে!

ঠাকুরের স্ত্রীসুলভ হাবভাবের অনুকরণ

স্ত্রীজাতিসুলভ হাবভাবাদি ঠাকুর কখনো কখনো আমাদের সাক্ষাতে নকল করিতেন। উহা এত ঠিক হইত যে, আমরা অবাক হইতাম। জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত ঐ সম্বন্ধে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, ঠাকুর একদিন তাঁহাদের সামনে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দেখিলে যেরূপ হাবভাব করে, তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন—"সে মাথায় কাপড় টানা, কানের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকে কাপড় টানা, ঢং করে নানারূপ কথা কওয়া—একেবারে হুবহু ঠিক। দেখে আমরা হাসতে লাগলুম, কিন্তু মনে লজ্জা আর কষ্টও হলো যে, ঠাকুর মেয়েদের এই রকম করে হেয় জ্ঞান করচেন। ভাবলুম—কেন, সকল স্ত্রীলোকেরাই কি ঐ রকম? হাজার হোক আমরা মেয়ে কিনা, মেয়েদের ওরকম করে কেউ ব্যাখ্যানা করলে মনে কষ্ট হতেই পারে। ওমা, ঠাকুর অমনি

আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন! আর বলছেন, 'ওগো, তোদের বলচি না। তোরা তো অবিদ্যাশক্তি নোস; ওসব অবিদ্যাশক্তিগুলো করে'!"

ঠাকুরের স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ

ঠাকুরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুত গিরিশ ঐরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন, "মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?" ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন, "জানি না"। ঠাকুর ঐ কথাটি আত্মজ্ঞ পুরুষেরা যেমন বলেন, 'আমি পুরুষ নহি, স্ত্রীও নহি'–সেই ভাবে বলিলেন, অথবা নিজের ভিতর উভয় ভাবের সমান সমাবেশ দেখিয়া বলিলেন, সে কথা এখন কে মীমাংসা করিবে?

ভাবমুখে থাকাতেই ঠাকুর সকলের ভাব বুঝিতে সমর্থ হইতেন

এইরূপে ভাবময় ঠাকুর ভাবমুখে থাকিয়া স্ত্রীর কাছে স্ত্রী ও পুরুষের কাছে পুরুষ হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের সকল ভাব ঠিক ঠিক ধরিতেন। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে একথা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রীভক্ত[7] আমাদিগকে বলিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিতেছেন, "লোকের দিকে চেয়েই–কে কেমন বুঝতে পারি, কে ভাল কে মন্দ, কে সুজন্মা, কে বেজন্মা, কে জ্ঞানী, কে ভক্ত, কার হবে, কার হবে না (ধর্মলাভ)–সব জানতে পারি; কিন্তু বলি না–তাদের মনে কষ্ট হবে, তাই!" ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাঁহার নিকট সদা সর্বক্ষণ ভাবময় বলিয়াই প্রতীত হইত। বোধ হইত–স্ত্রী-পুরুষ, গরু-ঘোড়া, কাঠ-মাটি সকলই যেন বিরাট মনে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টিরূপে উঠিতেছে, ভাসিতেছে–আর ঐ ভাবাবরণের ভিতর দিয়া অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদাকাশ কোথাও অল্প, কোথাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত রহিয়াছে; আবার কোথাও বা আবরণের নিবিড়তায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে! আনন্দময়ীর নিষ্কলঙ্ক মানসপুত্র ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে স্বেচ্ছায় শরীর-মন, চিত্তবৃত্তি, সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সমাধিবলে অশরীরী আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় পৌঁছিয়া জগন্মাতার অন্যরূপ ইচ্ছা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত অনির্বচনীয় অবস্থায় লীন আপনার মনকে জোর করিয়া আবার বিদ্যার আবরণে আবরিত করিয়া নিয়ত মা-র আদেশ পালন করিতে থাকিলেন! অনন্তভাবময়ী জগজ্জননীও ঠাকুরের প্রতি প্রসন্না হইয়া ঠাকুরকে শরীরী করিয়া রাখিয়াও একত্বের এত উচ্চপদে তাঁহার মনটি সর্বক্ষণ রাখিয়া দিলেন যে, অনন্ত বিরাট মনে যতকিছু ভাবের উদয় হইতেছে, তৎসকলই সেখান হইতে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সর্বকালে অনুভূত হইত এবং এতদূর আয়ত্তীভূত হইয়া থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত–যিনিই মাতা তিনিই সন্তান এবং যিনিই সন্তান তিনিই মাতা–'চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম'!

আমরা যতটুকু বলিতে পারিলাম বলিলাম; পাঠক, এইবার তুমি ভাবিয়া দেখ অনন্তভাবরূপী এ ঠাকুর কে?

[1] শ্রীযুত হরমোহন মিত্র।

[2] অর্থাৎ ভার দাও। বিষয়কর্মে এক ব্যক্তি তাহার হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে সে ব্যক্তি তাহার হইয়া সমস্ত লেন-দেন করে, রসিদ চিঠিপত্র লিখে

এবং তাহার নামে ঐসকলে সহি করিয়া নিম্নে 'বঃ (অর্থাৎ বকলম)' - অমুক বলিয়া নিজের নাম লিখিয়া দেয়।

[3] নারদ-ভক্তিসূত্র।

[4] গলরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের বাসায় যখন ঠাকুর থাকেন, তখন আমাদের সম্মুখে এই পরীক্ষা হয়।

[5] দুই অঙ্গুলি চওড়া ও দশ-পনর হাত লম্বা একটা ন্যাকড়ার ফালি ভিজাইয়া আস্তে আস্তে গিলিয়া ফেলা ও পরে তাহা আবার টানিয়া বাহির করার নাম নেতি। আর ২/৩ সের জল খাইয়া পুনরায় বমন করিয়া ফেলার নাম ধৌতি। গুহ্যদ্বার দিয়া জল টানিয়া বাহির করাকেও ধৌতি বলে। হঠযোগীরা এইরূপে শরীরমধ্যস্থ সমস্ত শ্লেষ্মাদি বাহির করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বলেন - ইহাতে শরীরে রোগ আসিতে পারে না এবং উহা দৃঢ় হয়।

[6] ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত - যিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন - তখন কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকিতেন।

[7] স্বামী প্রেমানন্দজীর মাতাঠাকুরানী।

৩.৪. দ্বিতীয় অধ্যায়: ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

– গীতা, ১৮।৬৪

সমাধি মস্তিষ্ক-বিকার নহে

ঠাকুরের আবির্ভাব বা প্রকাশের পূর্বে কলিকাতায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই যে ভাব, সমাধি বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অপূর্ব দর্শন ও উপলব্ধিসমূহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অশিক্ষিত জনসাধারণের ঐ সম্বন্ধে ভয়-বিস্ময়-সম্ভূত একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল; এবং নবীন শিক্ষিতসম্প্রদায় তখন ধর্মজ্ঞান-বিবর্জিত বিদেশী শিক্ষার স্রোতে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গ ঢালিয়া ঐরূপ দর্শনাদি হওয়া অসম্ভব বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত বলিয়া মনে করিতেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাবসমাধি হইতে উৎপন্ন শারীরিক বিকারসমূহ তাঁহাদের নয়নে মূর্চ্ছা ও শারীরিক রোগবিশেষ বলিয়াই প্রতিভাত হইত! বর্তমান কালে ঐ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হইলেও ভাব এবং সমাধিরহস্য যথাযথ বুঝিতে এখনো অতি অল্প লোকেই সক্ষম। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবমুখাবস্থা কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে হইলে সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকার নিতান্ত প্রয়োজন। সেজন্য ঐ বিষয়েই কিছু কিছু আমরা এখন পাঠককে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

সাধারণ মানবে যাহা উপলব্ধি করে না তাহাকেই আমরা সচরাচর 'বিকার' বলিয়া থাকি। ধর্মজগতের সূক্ষ্ম উপলব্ধিসমূহ কিন্তু কখনই সাধারণ মানবমনের অনুভবের বিষয় হইতে পারে না; উহাতে শিক্ষা, দীক্ষা ও নিরন্তর অভ্যাসাদির প্রয়োজন। ঐসকল অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদি সাধককে দিন দিন পবিত্র করে ও নিত্য নূতন বলে বলীয়ান এবং নব নব ভাবে পূর্ণ করিয়া ক্রমে চিরশান্তির অধিকারী করে। অতএব ঐসকল দর্শনাদিকে 'বিকার' বলা যুক্তিসঙ্গত কি? 'বিকার' মাত্রই যে মানবকে দুর্বল করে ও তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি হ্রাস করে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মজগতের দর্শনানুভূতিসকলের ফল যখন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন ঐসকলের কারণও সম্পূর্ণ বিপরীত বলিতে হইবে এবং তজ্জন্য ঐসকলকে মস্তিষ্ক-বিকার বা রোগ কখনো বলা চলে না।

সমাধি দ্বারাই ধর্মলাভ হয় ও চিরশান্তি পাওয়া যায়

বিশেষ বিশেষ ধর্মানুভূতিসকল ঐরূপ দর্শনাদি দ্বারাই চিরকাল অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। তবে যতক্ষণ না মনের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মানব নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত ও অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হয়, ততক্ষণ সে আধ্যাত্মিক জগতের চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন–"একটা কাঁটা ফুটেছে, আর একটা কাঁটা দিয়ে পূর্বের সেই কাঁটাটা তুলে ফেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।" শ্রীভগবানকে ভুলিয়া এই জগৎ-রূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছে। এইসকল নানা রূপ-রসাদির অনুভবরূপ বিকার ধর্মজগতের পূর্বোক্ত দর্শনানুভবাদির দ্বারা প্রতিহত হইয়া মানবকে ক্রমশঃ ঐ অদ্বৈতানুভূতিতে উপস্থিত করে। তখন 'রসো বৈ সঃ'–এই ঋষিবাক্যের উপলব্ধি হইয়া মানব ধন্য হয়। ইহাই প্রণালী। ধর্মজগতের যত কিছু মত, অনুভব, দর্শনাদি সব ঐ লক্ষ্যেই মানবকে অগ্রসর করে। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ

স্বামীজী ঐসকল দর্শনাদিকে, সাধক লক্ষ্যাভিমুখে কতদূর অগ্রসর হইল, তাহারই পরিচায়কস্বরূপ (mile-stones on the way to progress) বলিয়া নির্দেশ করিতেন। অতএব পাঠক যেন না মনে করেন, ভাববিশেষের কিঞ্চিৎ প্রাবল্যে অথবা ধ্যানসহায়ে দুই-একটি দেবমূর্তি দর্শনাদিতেই ধর্মের 'ইতি' হইল! তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সাধকেরা ধর্মজগতে ঐরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই লক্ষ্য হারাইয়া থাকেন এবং লক্ষ্য হারাইয়াই একদেশী-ভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসাদিতে পূর্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে যাইয়া ঐ ভ্রম উপস্থিত হইলেই মানুষ 'গোঁড়া', 'একঘেয়ে' হয়। ঐ দোষই ভক্তিপথের বিষম কণ্টকস্বরূপ এবং মানবের 'হীনবুদ্ধি'-প্রসূত।

দেবমূর্ত্যাদি-দর্শন না হইলেই যে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, তাহা নহে

আবার ঐরূপ দর্শনাদিতে বিশ্বাসী হইয়া অনেকে বুঝিয়া বসেন, যাহার ঐরূপ দর্শনাদি হয় নাই, সে আর ধার্মিক নহে। ধর্ম ও লক্ষ্যবিহীন অদ্‌ভুত-দর্শন-পিপাসা (miracle-mongering) তাঁহাদের নিকট একই ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু ঐরূপ পিপাসায় ধর্মলাভ না হইয়া মানব দিন দিন সকল বিষয়ে দুর্বলই হইয়া পড়ে। যাহাতে একনিষ্ঠ বুদ্ধি ও চরিত্রবল না আসে, যাহাতে মানব পবিত্রতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া সত্যের জন্য সমগ্র জগৎকে তুচ্ছ করিতে না পারে, যাহাতে কামগন্ধহীন না হইয়া মানব দিন দিন নানা বাসনা-কামনায় জড়ীভূত হয়, তাহা ধর্মরাজ্যের বহির্ভূত। অপূর্ব দর্শনাদি যদি তোমার জীবনে ঐরূপ ফল প্রসব না করিয়া থাকে, অথচ দর্শনাদিও হইতে থাকে, তবে জানিতে হইবে–তুমি এখনো ধর্মরাজ্যের বাহিরে রহিয়াছ, তোমার ঐসকল দর্শনাদি মস্তিষ্ক-বিকারজনিত, উহার কোন মূল্য নাই। আর যদি অপূর্ব দর্শনাদি না করিয়াও তুমি ঐরূপ বলে বলীয়ান হইতেছ দেখ, তবে বুঝিবে তুমি ঠিক পথে চলিয়াছ, কালে যথার্থ দর্শনাদিও তোমার উপস্থিত হইবে।

ত্যাগ, বিশ্বাস এবং চরিত্রের বলই ধর্মলাভের পরিচায়ক

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকের ভাবসমাধি হইতেছে, অথচ তাঁহার অনেকদিন গতায়াত করিয়াও ওরূপ কিছু হইল না দেখিয়া আমাদের জনৈক বন্ধু[1] কোন সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সজলনয়নে উপস্থিত হইয়া প্রাণের কাতরতা নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, "তুই ছোঁড়া তো ভারি বোকা, ভাবচিস বুঝি ঐটে হলেই সব হলো? ঐটেই ভারি বড়? ঠিক ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস ওর চেয়ে ঢের বড় জিনিস জানবি। নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) তো ওসব বড় একটা হয় না; কিন্তু দেখ দেখি– তার কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের তেজ ও নিষ্ঠা!"

'পাকা আমি' ও শুদ্ধ বাসনা। জীবন্মুক্ত, আধিকারিক বা ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি

একনিষ্ঠ বুদ্ধি, দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তিসহায়ে সাধকের যখন বাসনাসমূহ ক্ষীণ হইয়া শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পূর্বসংস্কারবশে কাহারও কাহারও মনে কখনো কখনো 'আমি লোক-কল্যাণ সাধন করিব, যাহাতে বহুজন সুখী হইতে পারে তাহা করিব'–এইরূপ শুদ্ধ বাসনার উদয় হইয়া থাকে। ঐ বাসনাবশে সে আর তখন পূর্ণরূপে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করিতে পারে না। ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র নামিয়া আসিয়া 'আমি, আমার'-রাজ্যে পুনরায় আগমন করে। কিন্তু সে 'আমি' শ্রীভগবানের দাস, সন্তান বা অংশ 'আমি' এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লইয়াই অনুক্ষণ থাকে। সে 'আমি' দ্বারায় আর অহর্নিশি কাম-কাঞ্চনের সেবা করা চলে না। সে 'আমি' শ্রীভগবানকে সারাৎসার জানিয়া আর সংসারের রূপ-রসাদি-ভোগের জন্য লালায়িত হয় না। যতটুকু রূপ-রসাদিবিষয়-গ্রহণ তাহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সহায়ক, ততটুকুই সে ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়া থাকে, এই পর্যন্ত। যাঁহারা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন

এবং জীবনের অবশিষ্টকাল কোনরূপ ভগবদ্ভাবে কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগকেই 'জীবন্মুক্ত' কহে। যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত ঐরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই সাধারণ মানবের ন্যায় বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাই শাস্ত্রে 'আধিকারিক পুরুষ', 'ঈশ্বরকোটি' বা 'নিত্যমুক্ত' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতভাব লাভ করিবার পরে এ জন্মে বা পরজন্মে সংসারে লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না—ইঁহারাই 'জীবকোটি' বলিয়া অভিহিত হন এবং ইঁহাদের সংখ্যাই অধিক বলিয়া আমরা গুরুমুখে শ্রুত আছি।

অদ্বৈতভাবোপলব্ধির তারতম্য

আবার যাঁহারা পূর্বোক্তরূপে অদ্বৈতভাব-লাভের পর লোককল্যাণের জন্য সমাধিভূমি হইতে নামিয়া আসেন, সেসকল সাধকদিগের মধ্যেও অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ জগৎকারণের সহিত অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিবার তারতম্য আছে। কেহ ঐ ভাবসমুদ্র দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন মাত্র, কেহ বা উহা আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া স্পর্শ করিয়াছেন, আবার কেহ বা ঐ সমুদ্রের জল অল্প-স্বল্প পান করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "দেবর্ষি নারদ দূর হতে ঐ সমুদ্র দেখেই ফিরেছেন, শুকদেব তিনবার স্পর্শমাত্র করেছেন, আর জগদ্গুরু শিব তিন গণ্ডূষ জল খেয়ে শব হয়ে পড়ে আছেন!" এই অদ্বৈতভাবে অল্পক্ষণের নিমিত্তও তন্ময় হওয়াকেই 'নির্বিকল্প সমাধি' কহে।

শান্ত-দাস্যাদি-ভাবের গভীরতায় সবিকল্প সমাধি

অদ্বৈতভাব-উপলব্ধির যেমন তারতম্য আছে, সেইরূপ নিম্নস্তরের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের অথবা যে ভাবসমূহ অদ্বৈতভাবে সাধককে উপনীত করে, সেসকলের উপলব্ধি করিবার মধ্যেও আবার তারতম্য আছে। কেহ বা উহার কোনটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন, আবার কেহ বা উহার আভাসমাত্রই পাইয়া থাকেন। এই নিম্নাঙ্গের ভাবসকলের মধ্যে কোন একটির সম্পূর্ণ উপলব্ধিই 'সবিকল্প সমাধি' নামে যোগশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে শারীরিক বিকার অবশ্যম্ভাবী

উচ্চাঙ্গের অদ্বৈতভাব বা নিম্নাঙ্গের সবিকল্পভাব, সকল প্রকার ভাবেই সাধকের অপূর্ব শারীরিক পরিবর্তন এবং অদ্ভুত দর্শনাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ শরীরবিকার ও অদ্ভুত দর্শনাদির প্রকাশ আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়। কাহারও অল্প উপলব্ধিতেই শারীরিক বিকার ও দর্শনাদি দেখা যায়, আবার কাহারও বা অতি গভীরভাবে ঐসকল ভাবোপলব্ধিতেও শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদি অতি অল্পই দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "গেড়ে ডোবার অল্প জলে যদি দু-একটা হাতি নামে তো জল ওছল্-পাছল্ হয়ে তোলপাড় হয়ে উঠে; কিন্তু সায়ের দীঘিতে অমন বিশগণ্ডা হাতি নামলেও যেমন জল স্থির, তেমনই থাকে।" অতএব শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদি যে ভাবের গভীরতার ধ্রুব লক্ষণ, তাহাও নহে।

সর্বপ্রকার ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অবতারেরাই সক্ষম। দৃষ্টান্ত—ঠাকুরের সমাধির কথা

ভাবসমাধির দার্শনিক তত্ত্ব শ্রীগুরুর মুখ হইতে আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি। আরও কয়েকটি কথা ঐ সম্বন্ধে এখানে বলা প্রয়োজন। তবেই পাঠক উহা বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। সাধকদিগের মধ্যে শান্তদাস্যাদি ও অদ্বৈত-ভাবোপলব্ধির তারতম্য লক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে যেসকল কথা পূর্বে বলা হইল, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ঈশ্বরাবতারেরাও ভাবরাজ্যে কোনরূপ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ থাকেন। তাঁহারা শান্তদাস্যাদি যখন যে ভাব ইচ্ছা, পূর্ণমাত্রায় নিজ জীবনে প্রদর্শন করিতে পারেন, আবার

অদ্বৈতভাবাবলম্বনে শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবে এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন যে, জীবন্মুক্ত, নিত্যমুক্ত বা ঈশ্বরকোটি কোনপ্রকার জীবেরই তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপের সহিত অতদূর একত্বে অগ্রসর হইয়া আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া এবং ‘আমি আমার’ রাজ্যে পুনরায় নামিয়া আসা–জীবের কখনই সম্ভবপর নহে। উহা কেবল একমাত্র অবতারপ্রথিত পুরুষসকলে সম্ভবে। তাঁহাদের অদৃষ্টপূর্ব উপলব্ধিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াই আধ্যাত্মিক জগতে বেদাদি সর্বশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল অনেক স্থলে যে বেদাদিশাস্ত্রনিবদ্ধ উপলব্ধিসকল অতিক্রম করিবে–ইহাতে বিচিত্র কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, “এখানকার অবস্থা (আমার উপলব্ধি) বেদ-বেদান্তে যা লেখা আছে, সেসকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে!” শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীর পুরুষসকলের অগ্রণী ছিলেন বলিয়াই নিরন্তর ছয়মাস কাল অদ্বৈতভাবে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পরেও আবার ‘বহুজনহিতায়’ লোকশিক্ষার জন্য ‘আমি আমার’ রাজ্যে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে বড় অদ্ভুত কথা। ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠককে এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না।

বেদান্ত-চর্চা করিতে ব্রাহ্মণীর নিষেধ

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ঠাকুরের তৃতীয় দিবসে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত নির্বিকল্প সমাধি বা শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চরম উপলব্ধি হয়। সে সময় ঠাকুরের তন্ত্রোক্ত সকলপ্রকার সাধন হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ঐসকল সাধনার সময় বৈধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এবং ঐসকল দ্রব্যের ব্যবহারপ্রণালী প্রভৃতি দেখাইয়া তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন, সে বিদুষী ভৈরবীও (ঠাকুর ইঁহাকে আমাদের নিকট ‘বামনী’ বলিয়া নির্দেশ করিতেন) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিতেছেন। কারণ, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি, উক্ত ‘বামনী’ বা ভৈরবী তাঁহাকে শ্রীমৎ তোতাপুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন–“বাবা, ওর সঙ্গে অত মেশামেশি করো না, ওদের সব শুকনো ভাব; ওর অত সঙ্গ করলে তোমার ভাব-প্রেম আর কিছু থাকবে না।” ঠাকুর কিন্তু ঐ কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অহর্নিশি তখন বেদান্ত-বিচার ও উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকিতেন।

ঠাকুরের নির্বিকল্প ভূমিতে সর্বদা থাকিবার সঙ্কল্প ও উক্ত ভূমির স্বরূপ

এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতাপুরী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হইল–‘আমি আমার’ রাজ্যে আর না থাকিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবে বা অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করিব এবং তিনি তদ্রূপ আচরণও করিতে লাগিলেন। সে বড় অপূর্ব কথা–তখন ঠাকুরের শরীরটা যে আছে, সে বিষয়ের আদৌ হুঁশ ছিল না। খাইব, শুইব, শৌচাদি করিব–এসকল কথারও মনে উদয় হইত না তো অপরের সহিত কথাবার্তা কহিব–সে তো অনেক দূরের কথা! সে অবস্থায় ‘আমি আমার’ও নাই–আর ‘তুমি তোমার’ও নাই! ‘দুই’ নাই; ‘এক’ও নাই! কারণ, ‘দুই’-এর স্মৃতি থাকিলে তবে তো ‘একে’র উপলব্ধি হইবে। সেখানে মনের সব বৃত্তি স্থির–শান্ত! কেবল –

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং

নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।

নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং

হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥

প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং।[2]

* * * * *

কেবল আনন্দ! আনন্দ!–তার দিক নাই, দেশ নাই, আলম্বন নাই, রূপ নাই, নাম নাই। কেবল অশরীরী আত্মা আপনার অনির্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায়, মনবুদ্ধির গোচরে অবস্থিত যতপ্রকার ভাবরাশি আছে, সেসকলের অতীত একপ্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত! যাহাকে শাস্ত্র 'আত্মায় আত্মায় রমণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন!–এইপ্রকার এক অনির্বচনীয় অবস্থার উপলব্ধি ঠাকুরের তখন নিরন্তর হইয়াছিল।

ঠাকুরের মনের অদ্‌ভুত গঠন

ঠাকুর বলিতেন, বেদান্তের নির্বিকল্প সমাধি-উপলব্ধিতে উঠিবার পথে সংসারের কোনও পদার্থ বা কোন সম্বন্ধই তাঁহার অন্তরায় হয় নাই। কারণ, পূর্ব হইতেই তো তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত যতপ্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। "মা, এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান–এই নে তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম–এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ–এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য–এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ–আমায় তোর শ্রীচরণে শুদ্ধা-ভক্তি দে, দেখা দে"–এই বলিয়া মন হইতে ঠিক ঠিক সকল প্রকার বাসনা কামনা শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। হায়, সে একাঙ্গী ভক্তি-প্রেমের কথা কি আমরা উপলব্ধি দূরে থাক, একটুও কল্পনা করিতে পারি? আমরা মুখে যদি কখনো শ্রীভগবানকে বলি, 'ঠাকুর, এই নাও আমার যাহা কিছু সব' তো বলিবার পরই আবার কাজের সময় ঠাকুরকে তাড়াইয়া সেসব 'আমার আমার' বলিতে থাকি এবং লাভ-লোকসান খতাই। প্রতি কার্যে 'লোকে কি বলবে' ভাবিয়া নানাপ্রকারে তোলাপাড়া, ছুটাছুটি করি; ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া কখনো অকূলপাথারে, আবার কখনো বা আনন্দে ভাসি; এবং মনে মনে একথা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি যে, দুনিয়াটা আমরা আমাদের উদ্যমে একেবারে ওলটপালট করিয়া না দিতে পারিলেও কতকটাও ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। ঠাকুরের তো আমাদের মতো জুয়াচোর মন ছিল না; তিনি যেমন বলিলেন, "মা, এই তোর দেওয়া জিনিস তুই নে", অমনি তদ্দণ্ড হইতে তাঁহার মন আর সে সকলের প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল না! 'বলে ফেলেছি কি করি? না বললে হতো'–মনের এইরূপ ভাব পর্যন্তও তখন হইতে আর উদিত হইল না! সেইজন্যই দেখিতে পাই, ঠাকুর যখনই যাহা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দিবেন বলিয়াছেন তাহা আর কখনো 'আমার' নিজের বলিতে পারেন নাই।

ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা

এখানে ঐ বিষয়ে আর একটি কথাও আমরা পাঠককে বলিতে ইচ্ছা করি। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ধর্মাধর্ম, পুণ্য-পাপ, ভাল-মন্দ, যশ-অযশ প্রভৃতি শরীর-মনের সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও 'মা, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর মিথ্যা'–এ কথাটি বলিতে পারেন নাই। উহার কারণ ঠাকুর নিজ মুখেই এক সময়ে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ঐরূপে সত্য ত্যাগ করিলে "শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সর্বস্ব যে অর্পণ করিলাম–এ সত্য রাখিব কিরূপে?" বাস্তবিক সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও কি সত্যনিষ্ঠাই না আমরা তাঁহাতে দেখিয়াছি। যেদিন যেখানে যাইব বলিয়াছেন, সেদিন ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন; যাহার নিকট হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, তাহার নিকট ভিন্ন অপর কাহারও নিকট তাহা লইতে পারেন নাই। যেদিন বলিয়াছেন, আর অমুক জিনিসটা খাইব না, বা অমুক কাজ আর করিব না, সেই দিন হইতে আর তাহা খাইতে বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুর বলিতেন, "যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনো মিথ্যা হতে দেয় না।" বাস্তবিকও ঐ বিষয়ের কতই না দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি! তাহার মধ্যে কয়েকটি পাঠককে এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

ঐ বিষয়ের প্রথম দৃষ্টান্ত

দক্ষিণেশ্বরে একদিন পরমা ভক্তিমতী গোপালের মা ঠাকুরকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবেন। সব প্রস্তুত; ঠাকুর খাইতে বসিলেন। বসিয়া দেখেন, ভাতগুলি শক্ত রহিয়াছে—সুসিদ্ধ হয় নাই। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, "এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর হাতে আর কখনো ভাত খাব না।" ঠাকুরের মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি বাহির হওয়ায় সকলে ভাবিলেন, ঠাকুর গোপালের মাকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিবার নিমিত্ত ঐরূপ বলিয়া ভয় দেখাইলেন মাত্র, নতুবা গোপালের মাকে যেরূপ আদর-যত্ন করেন, তাহাতে তাঁহার হাতে আর খাইবেন না—ইহা কি হইতে পারে? কিছুক্ষণ বাদেই আবার গোপালের মাকে ক্ষমা করিবেন এবং ঐ কথাগুলির আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না। কিন্তু ফলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। কারণ, উহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলায় অসুখ হইল। ক্রমে উহা বাড়িয়া ঠাকুরের ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং গোপালের মা-র হাতে আর একদিনও ভাত খাওয়া হইল না।

ঐ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভাবাবস্থায় বলিতেছেন, "এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।" শ্রীশ্রীমা ঐ সময়ে ঠাকুরের খাবার লইয়া আসিতেছিলেন। ঐ কথা শুনিতে পাইয়া এবং ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া যে কথা যখনি নির্গত হয় তাহা কখনই নিরর্থক হয় না জানিয়া, ভয় পাইয়া বলিলেন—"আমি মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব, খাবে—পায়েস কেন?" ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, "না—পায়সান্ন।" তাহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলদেশে অসুখ হওয়ায় বাস্তবিকই আর কোনরূপ ব্যঞ্জনাদি খাওয়া চলিল না—কেবল দুধ-ভাত, দুধ-বার্লি ইত্যাদি খাইয়াই কাল কাটিতে লাগিল।

ঐ তৃতীয় দৃষ্টান্ত

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়কেই ঠাকুর তাঁহার চারিজন 'রসদ্দারে'র ভিতর দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া নির্দেশ করিতেন। রানী রাসমণির কালীবাটীর নিকটেই তাঁহার একখানি বাগান ছিল। উহাতে তিনি ভগবৎ-চর্চায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কাল কাটাইতেন। ঐ বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য ঔষধালয়ও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পেটের অসুখ অনেক সময়ই লাগিয়া থাকিত। একদিন ঐরূপ পেটের অসুখের কথা শম্ভুবাবু জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একটু আফিম সেবন করিতে ও রাসমণির বাগানে ফিরিবার সময় উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। ঠাকুরও সে কথায় সম্মত হইলেন। তাহার পর কথাবার্তায় ঐ কথা দুইজনেই ভুলিয়া যাইলেন।

জগদম্বা 'বেচালে পা পড়িতে' দেন না

শম্ভুবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়িল এবং আফিম লইবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শম্ভুবাবু অন্দরে গিয়াছেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহাকে আর না ডাকাইয়া তাঁহার কর্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া রাসমণির বাগানে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে আসিয়াই ঠাকুরের কেমন একটা ঝোঁক আসিয়া পথ আর দেখিতে পাইলেন না! রাস্তার পাশে যে জলনালা আছে, তাহাতে যেন কে পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুর ভাবিলেন—এ কি? এ তো পথ নয়! অথচ পথও খুঁজিয়া পান না। অগত্যা কোনরূপে দিক ভুল হইয়াছে ঠাওরাইয়া, পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে দিকের পথ বেশ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া সেখান হইতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সাবধানে রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-এক পা আসিতে না আসিতে আবার পূর্বের মতো হইল—পথ আর দেখিতে পান না। বিপরীত দিকে যাইতে পা টানে! এইরূপ কয়েকবার হইবার পর ঠাকুরের মনে উদয় হইল—"ওঃ, শম্ভু বলিয়াছিল, 'আমার নিকট হইতে আফিম

চাহিয়া লইয়া যাইও'; তাহা না করিয়া আমি তাহাকে না বলিয়া তাহার কর্মচারীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া যাইতেছি, সেজন্যই মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না! কর্মচারীর শম্ভুর হুকুম ব্যতীত দেওয়া উচিত নয়, আর আমারও শম্ভু যেমন বলিয়াছে–তাহার নিকট হইতেই লওয়া উচিত। নহিলে যেভাবে আমি আফিম লইয়া যাইতেছি, উহাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটি দোষ হইতেছে; সেইজন্যই মা আমায় অমন করিয়া ঘুরাইতেছেন, ফিরিয়া যাইতে দিতেছেন না!" এই কথা মনে করিয়া শম্ভুবাবুর ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, সে কর্মচারীও সেখানে নাই–সেও আহারাদি করিতে অন্যত্র গিয়াছে। কাজেই জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়কটি ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল"– বলিয়া রাসমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন ঝোঁক নাই; রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে; বেশ চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেন, "মার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি কিনা?—তাই মা হাত ধরে আছেন। একটুকু বেচালে পা পড়তে দেন না।" ঐরূপ কতই না দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে শুনিয়াছি! চমৎকার ব্যাপার! আমরা কি এ সত্যনিষ্ঠা, এ সর্বাঙ্গীণ নির্ভরতার এতটুকু কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি? ইহা কি সেই প্রকারের নির্ভর, ঠাকুর যাহা আমাদিগকে রূপকচ্ছলে বারংবার বলিতেন, "ওদেশে (ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে) মাঠের মাঝে আলপথ আছে। তার উপর দিয়ে সকলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যায়। সরু আলপথ–চলে গেলে পাছে পড়ে যায়, সেজন্য বাপ ছোট ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে, আর বড় ছেলেটি সেয়ানা বলে নিজেই বাপের হাত ধরে সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে যেতে একটা শঙ্খচিল বা আর কিছু দেখে ছেলেগুলো আহ্লাদে হাততালি দিচ্ছে। কোলের ছেলেটি জানে বাপ আমায় ধরে আছে, নির্ভয়ে আনন্দ করতে করতে চলেছে। আর যে ছেলেটা বাপের হাত ধরে যাচ্ছিল, সে যেই পথের কথা ভুলে বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেছে– আর অমনি টিপ করে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠল! সেই রকম মা যার হাত ধরেছেন, তার আর ভয় নেই; আর যে মার হাত ধরেছে, তার ভয় আছে–হাত ছাড়লেই পড়ে যাবে।"

ঠাকুরের নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিবার পথে অন্তরায়

এইরূপে ঈশ্বরানুরাগের প্রাবল্যে সংসারের কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপরে মনের একটা বিশেষ আকর্ষণ বা পশ্চাৎটান ছিল না বলিয়াই নির্বিকল্প সমাধিলাভের পথে সাংসারিক কোনরূপ বাসনা-কামনা ঠাকুরের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। দাঁড়াইয়াছিল কেবল, ঠাকুর যাঁহাকে এতকাল ভক্তিভরে পূজা করিয়া, ভালবাসিয়া, সারাৎসারা পরাৎপরা বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলেন– শ্রীশ্রীজগদম্বার সেই 'সৌম্যাৎসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী' মূর্তি! ঠাকুর বলিতেন, "মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেচি আর অমনি মা-র মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল!–তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পারে আগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না! যতবার মন থেকে সব জিনিস তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি, ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে, সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম! তখন মনে আর কিছুই রহিল না–হু হু করে একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছুল।" আমাদের কাছে এগুলি যেন অর্থহীন কথার কথা মাত্র। কারণ, কখনো তো জগদম্বার কোন মূর্তি বা ভাব ঠিক ঠিক আপনার করিয়া লই নাই। কখনো তো কাহাকেও সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখি নাই। ঐপ্রকার পূর্ণ ভালবাসা–মনের অন্তস্তল পর্যন্ত ব্যাপিয়া ভালবাসা–রহিয়াছে আমাদের–এই মাংসপিণ্ড শরীর ও মনের উপর! সেজন্যই মৃত্যুতে বা মনের হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তনে আমাদের এত ভয় হয়! ঠাকুরের তো তাহা ছিল না। সংসারে একমাত্র জগদম্বার পাদপদ্মই মনে-জ্ঞানে সার জানিয়াছিলেন, এবং সেই পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্তির দিবানিশি সেবা করিয়াই কাল কাটাইতেছিলেন; কাজেই ঐ মূর্তিকে যখন একবার কোন প্রকারে মন হইতে সরাইয়া ফেলিলেন, তখন আর মন কি লইয়া সংসারে থাকিবে? একেবারে আলম্বনবিহীন হইয়া, বৃত্তিরহিত হইয়া, নির্বিকল্প অবস্থায় যাইয়া দাঁড়াইল। পাঠক, এ কথা বুঝিতে না পার, একবার

কল্পনা করিতেও চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই বুঝিবে, ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে কতদূর আপনার করিয়াছিলেন—কি 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' মন দিয়া তিনি জগদম্বাকে ভালবাসিয়াছিলেন!

একুশদিন যে ভাবে থাকিলে শরীর নষ্ট হয় সেইভাবে ছয় মাস থাকা

এই নির্বিকল্প অবস্থায় প্রায় নিরন্তর থাকা ঠাকুরের ছয়মাস কাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, "যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটে থেকে শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে তেমনি পড়ে যায়, সেইখানে ছ-মাস ছিলুম। কখন কোন্ দিক দিয়ে যে দিন আসত, রাত যেত, তার ঠিকানাই হতো না! মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে—তেমনি ঢুকত, কিন্তু সাড় হতো না। চুলগুলো ধুলোয় ধুলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল! হয়তো অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয় নাই! শরীরটে কি আর থাকত?—এই সময়েই যেত। তবে এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মতো একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল; আর বুঝেছিল—এ শরীরটে দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনো বাকি আছে, এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে! তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা করত। একটু হুঁশ হচ্চে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোন দিন একটু-আধটু পেটে যেত, কোন দিন যেত না। এই ভাবে ছ-মাস গেছে! তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুনতে পেলুম মা-র কথা—'ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্।' তারপর অসুখ হলো—রক্ত-আমাশয়। পেটে খুব মোচড়, খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছ-মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নাবল—সাধারণ মানুষের মতো হুঁশ এল! নতুবা থাকত থাকত মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে সেই নির্বিকল্প অবস্থায় চলে যেত!"

ঠাকুরের সমাধি সম্বন্ধে 'কাপ্তেনের' কথা

বাস্তবিক ঠাকুরের শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্বেও তাঁহার দর্শনলাভ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি তখনো ঠাকুরের কথাবার্তা শুনা বড় একটা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। চব্বিশ ঘণ্টা ভাব-সমাধি লাগিয়াই আছে! কথা কহিবে কে? নেপাল রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়—যাঁহাকে ঠাকুর 'কাপ্তেন' বলিয়া ডাকিতেন—মহাশয়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র ঠাকুরকে নিরন্তর সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন! তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বহুকালব্যাপী গভীর সমাধির সময় ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে—গ্রীবাদেশ হইতে মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত এবং জানু হইতে পদতল পর্যন্ত, উপর হইতে নিম্নের দিকে—মধ্যে মধ্যে গব্যঘৃত মালিশ করা হইত এবং ঐরূপ করা হইলে সমাধির উচ্চ ভাবভূমি হইতে 'আমি আমার' রাজ্যে আবার নামিতে ঠাকুরের সুবিধা বোধ হইত।

ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজের কথা

আমাদের নিকট ঠাকুর কতদিন স্বয়ং বলিয়াছেন, "এখানকার মনের স্বাভাবিক গতি ঊর্ধ্বদিকে (নির্বিকল্পের দিকে)। সমাধি হলে আর নামতে চায় না। তোদের জন্য জোর করে নামিয়ে আনি। কোন একটা নিচেকার বাসনা না ধরলে নামবার তো জোর হয় না, তাই 'তামাক খাব', 'জল খাব', 'সুক্তো খাব', 'অমুককে দেখব', 'কথা কইব'—এইরূপ একটা ছোটখাট বাসনা মনে তুলে বার বার সেইটে আওড়াতে আওড়াতে তবে মন ধীরে ধীরে নিচে (শরীরে) নামে। আবার নামতে নামতে হয়তো সেই দিকে (ঊর্ধ্বে) চোঁচা দৌড়ুল। আবার তাকে তখন ঐরূপ বাসনা দিয়ে ধরে নামিয়ে আনতে হয়!" চমৎকার ব্যাপার! শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর ভাবিতাম 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর' এ কথার যদি ঐ মানে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ করা আমাদের জীবনে হইয়াছে আর কি! শরণাগত হইয়া থাকাই

দেখিতেছি আমাদের একমাত্র উপায়। ঐরূপ করিতে যাইয়াও কিছুদিন বাদে দেখি, বিষম হাঙ্গামা! ঐ পথ আশ্রয় করিতে যাইয়াও দুষ্ট মন মাঝে মাঝে বলিয়া বসে—আমাকে ঠাকুর সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবেন না কেন? নরেন্দ্রনাথকে যতটা ভালবাসেন আমাকেও ততটা কেন না ভালবাসিবেন? আমি তদপেক্ষা ছোট কিসে?—ইত্যাদি! যাহা হউক এখন সে কথা—আমরা পূর্বানুসরণ করি।

মনোভাবপ্রসূত শারীরিক পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মত

উচ্চাঙ্গের ভাব এবং সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে যতদূর বুঝিয়াছি, অতঃপর তাহারই কিছু কিছু পাঠককে বলিয়া 'ভাবমুখ' অবস্থাটা যে কি, তাহাই এখন বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি—উচ্চাবচ যে ভাবই মনে আসুক না কেন, উহার সহিত কোন না কোন প্রকার শারীরিক পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহা আর বুঝাইতে হয় না—নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। ক্রোধের উদয়ে একপ্রকার, ভালবাসায় অন্যপ্রকার—এইরূপ নিত্যানুভূত সাধারণ ভাবসমূহের আলোচনাতেই উহা সহজে বুঝা যায়। আবার সৎ বা অসৎ কোনপ্রকার চিন্তার সবিশেষ আধিক্য কাহারও মনে থাকিলে তাহার শরীরেও এতটা পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে—ইহার এরূপ প্রকৃতি। 'অমুককে দেখিলেই মনে হয় রাগী, কামুক বা সাধু'—এরূপ কথার নিত্য ব্যবহার হওয়াই ঐ বিষয়ের প্রমাণ। আবার দানবতুল্য বিকটাকৃতি বিকৃত-স্বভাবাপন্ন লোক যদি কোন কারণে সৎচিন্তায়, সাধুভাবে নিরন্তর ছয়মাস কাল কাটায় তো তাহার আকৃতি হাব-ভাব পূর্বাপেক্ষা কত কোমল ও সরল হইয়া আসে, তাহাও বোধ হয় আমাদের ভিতর অনেকের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ বলেন—যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না কেন, উহা তোমার মস্তিষ্কে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়া যাইবে। এইরূপে ভাল-মন্দ দুইপ্রকার ভাবের দুইপ্রকার দাগের সমষ্টির স্বল্পাধিক্য লইয়াই তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত। প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতের যোগি-ঋষিগণ বলেন, ঐ দুইপ্রকার ভাব মস্তিষ্কে দুইপ্রকার দাগ অঙ্কিত করিয়াই শেষ হইল না—ভবিষ্যতে আবার তোমাকে পুনরায় ভাল-মন্দ কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ সূক্ষ্ম প্রেরণাশক্তিতে পরিণত হইয়া মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত 'মূলাধার' নামক মেরুচক্রে নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে; জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ঐরূপ প্রেরণাশক্তিসমূহের উহাই আবাসভূমি।

কুণ্ডলিনীর সঞ্চিত পূর্ব-সংস্কারের আবাসস্থান ও ঐ সকলের নাশ কিরূপে হয়

ঐসকলের নামই সংস্কার বা পূর্ব-সংস্কার, এবং ঐসকলের নাশ একমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলে বা নির্বিকল্প সমাধি-লাভ হইলে তবেই হইয়া থাকে। নতুবা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবার সময়ও জীব ঐ সংস্কারের পুঁটুলিটি 'বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ' বগলে করিয়া লইয়া যায়।

শরীর ও মনের সম্বন্ধ

অদ্বৈতজ্ঞান বা শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শরীর ও মনের পূর্বোক্তরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। শরীরে কিছু হইলে মনে আঘাত লাগে, আবার মনে কিছু হইলে শরীরে আঘাত অনুভব হয়। আবার ব্যক্তির শরীর-মনের ন্যায়, ব্যক্তির সমষ্টি—সমগ্র মনুষ্যজাতির শরীর ও মনে এইপ্রকার সম্বন্ধ বর্তমান। তোমার শরীর-মনের ঘাত-প্রতিঘাত আমার ও অপর সকলের শরীর-মনে লাগে। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ নিত্য সম্বন্ধে অবস্থিত ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে। সেইজন্যই দেখা যায়—যেখানে সকলে শোকাকুল, সেখানে তোমারও মনে শোকের উদয় হইবে। যেখানে সকলে ভক্তিমান, সেখানে তোমারও মনে বিনা চেষ্টায় ভক্তিভাব আসিবে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

ভাবসকল সংক্রামক বলিয়াই সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠেয়

সেইজন্যই দেখা যায় শারীরিক রোগ ও স্বাস্থ্যের ন্যায় মানসিক বিকার বা ভাবসকলেরও সংক্রামিকা শক্তি আছে। উহারাও অধিকারিভেদে সংক্রমণ করিয়া থাকে। ভগবদনুরাগ উদ্দীপিত করিবার জন্য শাস্ত্র সাধুসঙ্গের এত মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। সেইজন্যই ঠাকুর যাহারা তাঁহার নিকট একবার যাইত তাহাদের "এখানে যাওয়া-আসা করো–প্রথম প্রথম এখানে বেশি বেশি যাওয়া-আসাটা রাখতে হয়" ইত্যাদি বলিতেন। যাক এখন সে কথা।

একনিষ্ঠাপ্রসূত শারীরিক পরিবর্তন

সাধারণ মানসিক ভাবসমূহের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত একনিষ্ঠ তীব্র অনুরাগে যে সমস্ত ভাব মনে উদয় হয়, সেসকলেও অপূর্ব শারীরিক পরিবর্তন আনিয়া দেয়। যথা–ঐরূপ অনুরাগ উপস্থিত হইলে সাধকের রূপরসাদির উপর টান কমিয়া যায়–স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা হয়–খাদ্যবিশেষে রুচি ও অন্যপ্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়–স্ত্রীপুত্রাদি যেসকল ব্যক্তির সহিত মায়িক সম্বন্ধ তাহাকে শ্রীভগবান হইতে বিমুখ করে, তাহাদিগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়–বায়ুপ্রধান ধাত (ধাতু) হয়–ইত্যাদি; ঠাকুর যেমন বলিতেন, "বিষয়ী লোকের হাওয়া সইতে পারতুম না, আত্মীয়-স্বজনের সংসর্গে যেন দম বন্ধ হয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মতো হতো"; আবার বলিতেন, "ঈশ্বরকে যে ঠিক ঠিক ডাকে, তার শরীরে মহাবায়ু গর-গর করে মাথায় গিয়ে উঠবেই উঠবে" ইত্যাদি।

ভক্তিপথ ও যোগমার্গের সামঞ্জস্য

অতএব দেখা যাইতেছে, ভগবদনুরাগে যেসকল মানসিক পরিবর্তন বা ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐসকলেরও এক-একটা শারীরিক প্রতিকৃতি বা রূপ আছে। মনের দিক দিয়া দেখিয়া বৈষ্ণবতন্ত্র ঐসকল ভাবকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর–এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; আর ঐসকল মানসিক বিকারকে আশ্রয় করিয়া যেসকল শারীরিক পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহার দিক দিয়া দেখিয়া যোগশাস্ত্র মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কান্তর্গত কুণ্ডলিনীশক্তি ও ষট্‌চক্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন।

কুণ্ডলিনী কাহাকে বলে ও তাহার সুপ্ত এবং জাগ্রত অবস্থা

কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনীশক্তির সংক্ষেপে পরিচয় আমরা ইতঃপূর্বেই দিয়াছি। ইহজন্মে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মজন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত হইতেছে ও হইয়াছিল, তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলি-প্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যোগী বলেন, উহা বদ্ধজীবে প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। উহার ঐরূপ সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তির উদয়। উহা যদি কোনরূপে সম্পূর্ণ জাগরিত বা প্রকাশাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তবেই জীবকে পূর্ণজ্ঞানলাভে প্রেরণ করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। যদি বল, সুপ্তাবস্থায় কুণ্ডলিনীশক্তি হইতে কেমন করিয়া স্মৃতি-কল্পনা প্রভৃতির উদয় হইতে পারে? তদুত্তরে বলি, সুপ্ত হইলেও বাহিরের রূপ-রসাদি পদার্থ পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া নিরন্তর মস্তিষ্কে যে আঘাত করিতেছে তজ্জন্য একটু-আধটু ক্ষণমাত্রস্থায়ী চেতনা তাহার আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন মশকদষ্ট নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত স্বতই মশককে আঘাত বা কণ্ডূয়নাদি করে, সেইরূপ।

জাগরিতা কুণ্ডলিনীর গতি–ষট্‌চক্রভেদ ও সমাধি

যোগী বলেন, মস্তিষ্কমধ্যগত ব্রহ্মারন্ধ্রস্থ অবকাশ বা আকাশে অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান। তাঁহার প্রতি পূর্বোক্ত কুণ্ডলীশক্তির বিশেষ অনুরাগ অথবা শ্রীভগবান তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু জাগরিতা না থাকায় কুণ্ডলীশক্তির সে আকর্ষণ অনুভব হইতেছে না। জাগরিতা হইবামাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথও আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বর্তমান। মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে 'মূলাধার' নামক মেরুচক্র পর্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্র-কথিত সুষুম্নাবর্ত্ম। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ ঐ পথকেই canal centralis (মধ্যপথ) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার কোনরূপ আবশ্যকতা বা কার্যকারিতা এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। ঐ পথ দিয়াই কুণ্ডলী পূর্বে পরমাত্মা হইতে বিযুক্তা হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহা মেরুদণ্ডমধ্যে ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছয়টি চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়।[3] কুণ্ডলী জাগরিতা হইয়া এক চক্র হইতে অন্য চক্রে যেমনি আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব উপলব্ধি হইতে থাকে; এবং ঐ প্রকারে যখনি উহা মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখনি জীবের ধর্মবিজ্ঞানের চরমোপলব্ধি বা অদ্বৈতজ্ঞানে 'কারণং কারণানাং' পরমাত্মার সহিত তন্ময়ত্ব আসে। তখনই জীবের ভাবেরও চরমোপলব্ধি হয় বা যে মহাভাব অবলম্বনে অপর সকল ভাব মানবমনে সর্বক্ষণ উদিত হইতেছে, সেই 'ভাবাতীত ভাবে' তন্ময় হইয়া অবস্থান-করা-রূপ অবস্থা আসে।

ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের অনুভব

কি সরল কথা দিয়াই না ঠাকুর যোগের এইসকল জটিল তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইতেন! বলিতেন, "দ্যাখ, সড় সড় করে একটা পা থেকে মাথায় গিয়ে উঠে! যতক্ষণ না সেটা মাথায় গিয়ে উঠে ততক্ষণ হুঁশ থাকে; আর যেই সেটা মাথায় গিয়ে উঠল আর একেবারে বেব্‌ভুল হয়ে যাই, তখন আর দেখাশুনাই থাকে না, তা কথা কওয়া! কথা কইবে কে?—'আমি' 'তুমি' এ বুদ্ধিই চলে যায়! মনে করি তোদের সব বলব—সেটা উঠতে উঠতে কত কি দর্শন-টর্শন হয় সব কথা বলব। যতক্ষণ সেটা (হৃদয় ও কণ্ঠ দেখাইয়া) এ অবধি বা এই অবধি বড় জোর উঠেছে, ততক্ষণ বলা চলে ও বলি; কিন্তু যেই সেটা (কণ্ঠ দেখাইয়া) এখান ছাড়িয়ে উঠল, আর অমনি যেন কে মুখ চেপে ধরে, আর বেব্‌ভুল হয়ে যায়—সামলাতে পারিনি! (কণ্ঠ দেখাইয়া) ওর উপরে গেলে কি রকম সব দর্শন হয় তা বলতে গিয়ে যেই ভাবচি কি রকম দেখিছি, আর অমনি মন হুস্‌ করে উপরে উঠে যায়—আর বলা যায় না!"

ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিকালের অনুভব বলিবার চেষ্টা

আহা, কতদিন যে ঠাকুর কণ্ঠের উপরিস্থ চক্রে মন উঠিলে কিরূপ দর্শনাদি হয় তাহা অশেষ প্রয়াসপূর্বক সামলাইয়া আমাদের নিকট বলিতে যাইয়া অপারগ হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না! আমাদের এক বন্ধু বলেন, "একদিন ঐরূপে খুব জোর করিয়া বলিলেন, 'আজ তোদের কাছে সব কথা বলব, একটুও লুকোব না'—বলিয়া আরম্ভ করিলেন। হৃদয় ও কণ্ঠ পর্যন্ত সকল চক্রাদির কথা বেশ বলিলেন, তারপর ভ্রূমধ্যস্থল দেখাইয়া বলিলেন, 'এইখানে মন উঠলেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কেবল একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দামাত্র আড়াল (ব্যবধান) থাকে। সে তখন এইরকম দ্যাখে'—বলিয়া যেই পরমাত্মার দর্শনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বলিতে চেষ্টা করিলেন, পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন! এইরূপ বার বার চেষ্টার পর সজলনয়নে আমাদের বলিলেন, 'ওরে, আমি তো মনে করি সব কথা বলি, এতটুকুও তোদের কাছে লুকোব না, কিন্তু মা কিছুতেই বলতে দিলে না—মুখ চেপে ধরলে!' আমরা অবাক হইয়া ভাবিতে

লাগিলাম—এ কি ব্যাপার! দেখিতেছি উনি এত চেষ্টা করিতেছেন, বলিবেন বলিয়া। না বলিতে পারিয়া উঁহার কষ্টও হইতেছে বুঝিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছেন না—মা বেটী কিন্তু ভারি দুষ্ট! উনি ভাল কথা বলিবেন, ভগবদ্দর্শনের কথা বলিবেন, তাহাতে মুখ চাপিয়া ধরা কেন বাপু? তখন কি আর বুঝি যে, মন-বুদ্ধি যাহাদের সাহায্যে বলাকহাগুলো হয়, তাহাদের দৌড় বড় বেশি দূর নয়; আর তাহারা যতদূর দৌড়াইতে পারে তাহার বাহিরে না গেলে পরমাত্মার পূর্ণ দর্শন হয় না! ঠাকুর যে আমাদের প্রতি ভালবাসায় অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এই কথা কি তখন বুঝিতে পারিতাম?"

সমাধিপথে কুণ্ডলিনীর পাঁচ প্রকারের গতি

কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে যে যে রূপ অনুভব হয়, তৎসম্বন্ধে ঠাকুর আরও বিশেষ করিয়া বলিতেন, "দেখ, যেটা সড় সড় করে মাথায় উঠে, সেটা সব সময় এক রকম ভাবে উঠে না। শাস্ত্রে সেটার পাঁচ রকম গতির কথা আছে—যথা, পিপীলিকাগতি—যেমন পিঁপড়েগুলো খাবার মুখে করে সার দিয়ে সুড়সুড় করে যায়, সেই রকম পা থেকে একটা সুড়সুড়ানি আরম্ভ হয়ে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে, মাথা পর্যন্ত যায় আর সমাধি হয়! ভেকগতি—ব্যাঙগুলো যেমন টুপ টুপ টুপ—টুপ টুপ টুপ করে দু-তিন বার লাফিয়ে একটু থামে, আবার দু-তিন বার লাফিয়ে আবার একটু থামে, সেইরকম করে কি একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠছে বোঝা যায়; আর যেই মাথায় উঠল আর সমাধি! সর্পগতি—সাপগুলো যেমন লম্বা হয়ে বা পুঁটুলি পাকিয়ে চুপ করে পড়ে আছে, আর যেই সামনে খাবার (শিকার) দেখেছে বা ভয় পেয়েছে, অমনি কিলবিল কিলবিল করে এঁকে বেঁকে ছোটে, সেইরকম করে ওটা কিলবিল করে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠে আর সমাধি! পক্ষিগতি—পক্ষীগুলো যেমন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে বসবার সময় হুস করে উড়ে কখনো একটু উঁচুতে উঠে, কখনো একটু নিচুতে নাবে, কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করে না, একেবারে যেখানে বসবে মনে করেছে সেইখানে গিয়ে বসে, সেইরকম করে ওটা মাথায় উঠে ও সমাধি হয়! বাঁদরগতি—হনুমানগুলো যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে যাবার সময় 'উউপ' করে এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে 'উউপ' করে আর এক ডালে গিয়ে পড়ল—এইরূপে দু-তিন লাফে যেখানে মনে করেছে সেখানে উপস্থিত হয়, সেই রকম করে ওটাও দু-তিন লাফে মাথায় গিয়ে উঠে বোঝা যায় ও সমাধি হয়।"

বেদান্তের সপ্তভূমি ও প্রত্যেক ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে প্রতি চক্রে কি কি প্রকার দর্শন হয় তদ্বিষয়ে বলিতেন, "বেদান্তে আছে সপ্ত ভূমির কথা। এক এক রকম দর্শন হয়। মনের স্বভাবতঃ নিচের তিন ভূমিতে ওঠা-নামা, ঐ দিকেই দৃষ্টি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি—খাওয়া, পরা, রমণ ইত্যাদিতে। ঐ তিন ভূমি ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে উঠে তো তখন তার জ্যোতি দর্শন হয়। কিন্তু হৃদয়ে কখনো কখনো উঠলেও মন আবার নিচের তিন ভূমি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যায়। হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারও মন কণ্ঠে উঠে তো সে আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা—যেমন বিষয়ের কথা-টথা, কইতে পারে না। তখন তখন এমনি হতো—বিষয়কথা যদি কেউ কয়েছে তো মনে হতো মাথায় লাঠি মারলে; দূরে পঞ্চবটীতে পালিয়ে যেতাম, সেখানে ওসব কথা শুনতে পাব না। বিষয়ী দেখলে ভয়ে লুকোতুম! আত্মীয়-স্বজনকে যেন কূপ বলে মনে হতো—মনে হতো তারা যেন টেনে কূপে ফেলবার চেষ্টা করছে, পড়ে যাব আর উঠতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে যেত, মনে হতো যেন প্রাণ বেরোয় বেরোয়—সেখান থেকে পালিয়ে এলে তবে শান্তি হতো!—কণ্ঠে উঠলেও মন আবার গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যেতে পারে, তখন সাবধানে থাকতে হয়। তারপর কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারও মন ভ্রূমধ্যে ওঠে তো তার আর পড়বার ভয় নেই। তখন পরমাত্মার দর্শন হয়ে নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। এখানটার আর সহস্রারের মাঝে একটা কাচের মতো স্বচ্ছ পর্দামাত্র

আড়াল আছে। তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয় যেন তাঁতে মিশে গেছি; এক হয়ে গেছি; কিন্তু তখনো এক হয়নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ বা হৃদয় পর্যন্ত নামে–তার নিচে আর নামতে পারে না। জীবকোটিরা এখান থেকে আর নামে না–একুশ দিন নিরন্তর সমাধিতে থাকবার পর ঐ আড়ালটা বা পর্দাটা ভেদ হয়ে যায়, আর তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশি হয়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে উঠা।"

ঠাকুরের শ্রুতিধরত্ব

ঠাকুরকে ঐসব বেদ-বেদান্ত, যোগ-বিজ্ঞানের কথা কহিতে শুনিয়া আমাদের কেহ কেহ আবার কখনো কখনো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'মশাই, আপনি তো লেখাপড়ার কখনো ধার ধারেননি, এত সব জানলেন কোথা থেকে?' অদ্‌ভুত ঠাকুরের ঐ অদ্‌ভুত প্রশ্নেও বিরক্তি নাই! একটু হাসিয়া বলিতেন, "নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো! সেসব মনে আছে! অপরের কাছ থেকে, ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। শুনে, তাদের ভেতর কি আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গেঁথে গলায় পরে নিয়েচি–'এই নে তোর শাস্ত্র-পুরাণ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে' বলে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি!"

ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সহজে বুঝান

বেদান্তের অদ্বৈতভাব বা ভাবাতীত ভাব সম্বন্ধে বলিতেন, "ওটা সবশেষের কথা। কি রকম জানিস?—যেমন অনেক দিনের পুরোনো চাকর। মনিব তার গুণে খুশি হয়ে তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুব খুশি হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল! চাকর সঙ্কোচ করে 'কি কর, কি কর' বললেও মনিব জোর করে টেনে বসিয়ে বললে, 'আঃ বস না! তুইও যে, আমিও সে'–সেই রকম।"

ঐ দৃষ্টান্ত–স্বামী তুরীয়ানন্দ

আমাদের জনৈক বন্ধু[4] এক সময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান, এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধ্যানভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া বন্ধুটি ঠাকুরের নিকট পূর্বে পূর্বে যেমন ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন সেরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিষয় অলক্ষিত থাকে নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, তুই যে একলা–সে আসেনি?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, "সে মশাই আজকাল খুব বেদান্তচর্চায় মন দিয়েছে। রাত দিন পাঠ, বিচারতর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে বলে আসেনি।" ঠাকুর শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন না।

বেদান্ত আর কি? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা–এই ধারণা

উহার কিছুদিন পরেই, আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করচ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো–ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা–না আর কিছু?"

বন্ধু–আজ্ঞা হাঁ, আর কি?

বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন–বাস্তবিকই তো, ঐ কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝা হইল!

ঠাকুর—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে শুনলে; তারপর মনন—বিচার করে মনে মনে পাকা করলে; তারপর নিদিধ্যাসন—মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ করে সদ্বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে—এই। কিন্তু তা না হয়ে শুনলুম, বুঝলুম কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে চেষ্টা করলুম না—তা হলে কি হবে? সেটা হচ্চে সংসারীদের জ্ঞানের মতো; ও রকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই—তবে হবে। তা না হলে, মুখে বলচ বটে, 'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই', কিন্তু যেই হাত দিয়েছ অমনি প্যাঁট করে কাঁটা ফুটে উঁহু উঁহু করে উঠতে হবে, মুখে বলচ 'জগৎ নেই, অসৎ—একমাত্র ব্রহ্মাই আছেন' ইত্যাদি, কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অমনি সেগুলো সত্যজ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া। পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছিল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদান্ত-টেদান্ত বলে। তারপর একদিন শুনলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নটঘট হয়েছে। তারপর ওদিকে শৌচে গিয়েছি, দেখি সে বসে আছে। বললুম, 'তুমি এত বেদান্ত-টেদান্ত বল, আবার এসব কি?' সে বললে, 'তাতে কি? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাতে দোষ নেই। যখন জগৎটাই তিন কালে মিথ্যা হলো, তখন ঐটেই কি সত্য হবে? ওটাও মিথ্যা।' আমি তো শুনে বিরক্ত হয়ে বলি, 'তোর অমন বেদান্তজ্ঞানে আমি মুতে দি!' ওসব হচ্চে সংসারী, বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়।

বন্ধু বলেন, সেদিন ঐ পর্যন্ত কথাই হইল। কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার ধারণা ছিল—উপনিষৎ, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, সাংখ্য-ন্যায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে বেদান্ত কখনই বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভও সুদূরপরাহত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন ও বিচারগ্রন্থ পড়িয়া যদি কাহারও মনে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কথাটি নিশ্চয় ধারণা না হয়, তবে ঐসকল পড়া না পড়া উভয়ই সমান। ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধনভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন—ঐরূপ নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধনসহায়ে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

ঠাকুর কলিকাতায় কাহারও বাটীতে আগমন করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথা তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইত। কতকগুলি লোক যে ঐ কার্যের বিশেষভাবে ভার লইয়া ঐ কথা সকলকে জানাইয়া আসিতেন তাহা নহে। কিন্তু ভক্তদিগের প্রাণ ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন করিবার জন্য এতই উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং কার্যগতিকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে না পারিলে পরস্পরের বাটীতে সর্বদা গমনাগমন করিয়া তাঁহার কথাবার্তায় এত আনন্দানুভব করিত যে, তাহাদের ভিতর একজন কোনরূপে ঠাকুরের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা অনেকের ভিতর বিনা চেষ্টায় মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িত। ঠাকুরের শক্তিতে ভক্তগণ পরস্পরে কি যে এক অনির্বচনীয় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝানো দুষ্কর। কলিকাতায় বাগবাজার, সিমলা ও আহিরীটোলা পল্লীতেই ঠাকুরের অনেক ভক্তেরা বাস করিতেন, তজ্জন্য ঐ তিন স্থানেই ঠাকুরের আগমন অধিকাংশ সময়ে হইত। তন্মধ্যে আবার বাগবাজারেই তাঁহার অধিক পরিমাণে আগমন হইত।

পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদের পূর্বোক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরামবাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন

করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জন্যই অদ্য যেন ঐ প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন!

ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না

শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—"কি জান? কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি? সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা করতে পারে?" এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়!" ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন -

"ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,

ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে।"

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল। কতক্ষণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হইলেন। বন্ধু বলেন, "সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।"

শশধর পণ্ডিত ঠাকুরকে যোগশক্তিবলে রোগ সারাইতে বলায় ঠাকুরের উত্তর

ঠাকুরের অদ্বৈতজ্ঞানসম্বন্ধীয় গভীরতা সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন, অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করে ফেলতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ ও ঠাকুরের উত্তর

পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ ভক্তেরা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। পণ্ডিতজী চলিয়া যাইবার পরেই ঠাকুরকে ঐরূপ করিবার জন্য একেবারে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।"

ঠাকুর—আমার কি ইচ্ছা রে যে, আমি রোগে ভুগি; আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কই? সারা, না সারা, মা-র হাত।

স্বামী বিবেকানন্দ–তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।

ঠাকুর–তোরা তো বলছিস, কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে!

শ্রীযুত স্বামীজী–তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।

ঠাকুর–আচ্ছা, দেখি, পারি তো বলব।

কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত স্বামীজী পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, বলেছিলেন? মা কি বললেন?"

ঠাকুর–মাকে বললুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া), 'এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না; যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।' তা মা বললেন–তোদের সকলকে দেখিয়ে–'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্চিস!' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।

ঠাকুরের অদ্বৈতভাবের গভীরতা

কি অদ্‌ভুত দেহবুদ্ধির অভাব! কি অপূর্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান! তখন ছয়মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নিত্য আহার, বোধ হয় চারি-পাঁচ ছটাক বার্লি মাত্র, সেই অবস্থায় জগন্মাতা যাই বলিয়াছেন, 'এই যে এত মুখে খাচ্চিস', অমনি "কি কুকর্ম করিয়াছি, এই একটা ক্ষুদ্র শরীরকে 'আমি' বলিয়াছি!"–মনে করিয়া ঠাকুর লজ্জায় হেঁটমুখ ও নিরুত্তর হইলেন। পাঠক, এ ভাব কি একটুও কল্পনায় আনিতে পার?

ঠাকুরের সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া

কি অদ্‌ভুত ঠাকুরের সঙ্গে দেখাই না আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে! জ্ঞান-ভক্তি, যোগ-কর্ম, পুরান-নবীন, সকলপ্রকার ধর্মভাবের কি অদৃষ্টপূর্ব সামঞ্জস্যই না তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! উপনিষদ্‌কার ঋষি বলেন, ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্বজ্ঞ ও সত্যসঙ্কল্প হন। সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ইচ্ছা, বাহ্য জগতের সকল পদার্থ, সকল শক্তি ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লয় ও সেইভাবে পরিবর্তিত হয়। অতএব উক্ত পুরুষের নিজের শরীর-মন যে তদ্রূপ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি আছে! উপনিষদ্‌কারের ঐ বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করা সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে–তবে একথা বেশ বলা যাইতে পারে যে, যতদূর পরীক্ষা করা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব, তাহার বোধ হয় কিছু অভাব বা ত্রুটি, আমরা সকল বিষয়ে অনুক্ষণ যেভাবে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতাম, তাহাতে হয় নাই। ঠাকুর প্রতিবারই কিন্তু সেসকল পরীক্ষায় হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যেন ব্যঙ্গ করিয়াই আমাদের বলিতেন, "এখনও অবিশ্বাস! বিশ্বাস কর্–পাকা করে ধর্–যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং (নিজের শরীরটা দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর–তবে এবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য-পরিদর্শন! যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে–সেই রকম!"

ঠাকুরের ভাবকালে দৃষ্ট বিষয়গুলি বাহ্যজগতে সত্য হইতে দেখা

ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা উপনিষদুক্ত ঐ বিষয়ে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, মানবমনে যতপ্রকার ভাবের উদয় হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাহারই 'স্বসংবেদ্য' অর্থাৎ ঐসকল ভাবের পরিমাণ, তীব্রতা ইত্যাদি সে নিজেই ঠিক ঠিক জানিতে পারে। অপরে কেবল ভাবের বাহ্যিক বিকাশ দেখিয়া ঐসকলের অনুমানমাত্র করিয়া থাকে। ভাবসমাধির ঐরূপ স্বসংবেদ্য প্রকৃতি (subjective nature) সকলেরই প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। সকলেই জানে ভাবসকল অন্যান্য চিন্তাসমূহের ন্যায় মানসিক বিকার বা শক্তি-প্রকাশ মাত্র–মনেতেই উহাদের উদয়,

মনেতেই লয়; বাহ্যজগতে উহার ছবি বা অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখা ও দেখানো অসম্ভব। ঠাকুরের ভাবসমাধির অনেকগুলিতে কিন্তু উহার বৈপরীত্য দেখা যায়।

ঐ দৃষ্টান্ত—পঞ্চবটীর বেড়া ইত্যাদি

ধর—সাধনকালে ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর চারাগাছগুলি ছাগল-গরুতে মুড়াইয়া খাইয়াছে দেখিয়া ঐ স্থানের চতুর্দিকে ঠাকুরের বেড়া দিবার ইচ্ছা হওয়া এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান ডাকিয়া ঐ বেড়া-নির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদি, কতকগুলি গরানের খুঁটি, বাখারি, নারিকেলদড়ি, মায় একখানি কাটারি পর্যন্ত—সেইস্থানে ভাসিয়া আসিয়া লাগা ও তাঁহার কালীবাটীর ভর্তাভারি নামক মালির সাহায্যে ঐ বেড়া-নির্মাণ! অথবা ধর—রাসমণির জামাতা মথুরানাথের সহিত তর্কে তাঁহার বলা "ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হতে পারে—লাল ফুলের গাছে সাদা ফুলও হতে পারে", মথুরের তাহা অস্বীকার করা এবং পরদিনই ঠাকুরের বাগানের জবাগাছের একটি ডালের দুটি ফ্যাকড়ায় ঐরূপ দুটি ফুল দেখিতে পাওয়া ও ফুলসুদ্ধ ঐ ডালটি ভাঙিয়া আনিয়া মথুরানাথকে দেওয়া! অথবা ধর—তন্ত্র বেদান্ত বৈষ্ণব ইসলামাদি যখন যে মতের সাধনা করিবারই অভিলাষ ঠাকুরের প্রাণে উদয় হওয়া, তখনি সেই সেই মতের এক একজন সিদ্ধ ব্যক্তির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁহাকে ঐ ঐ মতে দীক্ষিত করা! অথবা ধর—ঠাকুরের ভক্তদিগকে আহ্বান ও তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রত্যেককে ঠাকুরের চিনিয়া গ্রহণ করা—ঐরূপ অনেক কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুধাবন করিলে ঐসকল ঘটনায় এইটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠাকুরের মানসিক ভাবের অনেকগুলি সাধারণ মানব-মনের ভাবসকলের ন্যায় কেবলমাত্র মানসিক চিন্তা বা প্রকাশরূপেই পর্যবসিত ছিল না। কিন্তু বাহ্যজগতের অন্তর্গত ঘটনাবলী ঐসকলের দ্বারা আমাদের অপরিজ্ঞাত কি এক নিয়মবশে তদনুরূপভাবে পরিবর্তিত হইত! আমরা এখানে উক্ত সত্যের নির্দেশমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দিলাম। উহা হইতে পাঠকেরা যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি তদ্রূপ আলোচনা ও অনুমানাদি করুন—ঘটনা কিন্তু সত্যই ঐরূপ।

প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ

পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর নির্বিকল্পসমাধি-অবস্থার সময় ভিন্ন অপর সকল সময়ে 'ভাবমুখে' থাকিতেন। এইজন্যই দেখা যায় তিনি তাঁহার সমীপাগত প্রত্যেক ভক্তের সহিত এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বরাবর সেই সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির বিশেষ বিকাশক্ষেত্রস্বরূপ যত স্ত্রীমূর্তির সহিত ঠাকুরের আজীবন মাতৃ-সম্বন্ধের কথা এখন সাধারণে প্রসিদ্ধ। কিন্তু পুরুষভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত তাঁহার ঐরূপ এক-একটি সম্বন্ধ থাকার কথা বোধ হয় সাধারণে এখনও জ্ঞাত নহে। সেজন্য ঐ সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ ঠাকুর তাঁর ভক্তদিগকে দুই থাকে বা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতেন—শিবাংশসম্ভূত ও বিষ্ণু-অংশোদ্ভূত। ঐ দুই শ্রেণীর ভক্তদিগের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, ভজনানুরাগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং নিজে তাহা সম্যক বুঝিতে পারিতেন—কিন্তু ঐ পার্থক্য যে কি, তাহা বিশেষ করিয়া পাঠককে বুঝানো আমাদের একপ্রকার সাধ্যাতীত।

ভক্তদিগের দুই শ্রেণী

অতএব সংক্ষেপে পাঠক ইহাই বুঝিয়া লউন যে, শিব ও বিষ্ণু-চরিত্র যেন দুইটি আদর্শ ছাঁচ (type or model) এবং ঐ দুই ভিন্ন ছাঁচে যেন ভক্তদিগের প্রত্যেকের মানসিক প্রকৃতি গঠিত—এই পর্যন্ত। ঐসকল ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সকলপ্রকার ভাবেরই সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল—অবশ্য বিভিন্ন জনের সহিত বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল। যথা, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতেন, "নরেন্দর যেন আমার শ্বশুরঘর—(আপনাকে

দেখাইয়া) এর ভেতর যেটা আছে সেটা যেন মাদি, আর (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ওর ভেতর যেটা আছে সেটা যেন মদ্দা"; শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা রাখাল মহারাজকে ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন—সন্ন্যাসী ও গৃহী বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ এক-একটা বিশেষ বিশেষ ভাব বা সম্বন্ধ ছিল এবং সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের প্রতি ঠাকুরের নারায়ণবুদ্ধি সর্বদা স্থির থাকায় তাহাদের সহিত শান্তভাবের সম্বন্ধ যে তিনি অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, একথা বলা বাহুল্য।

ভক্তদিগের প্রকৃতি দেখিয়া ঠাকুরের প্রত্যেকের সহিত ভাব-সম্বন্ধ-পাতান

ভক্তদিগের প্রত্যেকের ভিতরকার প্রকৃতি দেখিয়াই ঠাকুরের তাহাদের সহিত ঐরূপ ভাব বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। কারণ ঠাকুর বলিতেন, "মানুষগুলোর ভেতর কি আছে, তা সব দেখতে পাই; যেমন কাচের আলমারির ভেতর যা যা জিনিস থাকে সব দেখা যায়, সেই রকম।" যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে তদ্বিপরীতে কখনই আচরণ করিতে পারে না—কাজেই ভক্তদিগের কাহারও ঠাকুরের ঐ সম্বন্ধ বা ভাবের বিপরীতে গমন বা আচরণ কখনো সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যদি কখনো কেহ অপর কাহারও দেখাদেখি বিপরীত ভাবের আচরণ করিত তো ঠাকুর তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইতেন ও তাহার ভুল বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। যথা, শ্রীযুত গিরিশকে ঠাকুর ভৈরব বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালিকামাতার মন্দিরে ভাবসমাধিতে তাঁহাকে একদিন ঐরূপ দেখিয়াছিলেন। শ্রীযুত গিরিশের অনেক আবদার ও কঠিন ভাষা তিনি হাসিয়া সহ্য করিতেন—কারণ তাঁহার ঐরূপ ভাষার আবরণে অপূর্ব কোমল একান্ত-নির্ভরতার ভাব যে লুক্কায়িত তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন। গিরিশের দেখাদেখি ঠাকুরের অপর জনৈক প্রিয় ভক্ত একদিন ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করায় ঠাকুর তাহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন ও পরে তাহার ভুল তাহাকে বুঝাইয়া দেন। যাক এখন সেসব কথা, আমাদের বক্তব্য বিষয়ই বলিয়া যাই।

ঠাকুর ভক্তদিগকে কত প্রকারে ধর্মপথে অগ্রসর করাইতেন

ভাবমুখাবস্থিত ঠাকুর ঐরূপে স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেক ভক্তের নিজ নিজ প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক ভাব সম্যক বুঝিয়া তাহাদের সহিত তত্তদ্ভাবানুযায়ী একটা সপ্রেম সম্বন্ধ সর্বকালের জন্য পাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তত্তৎ ভাবসম্বন্ধাশ্রয়ে তাহাদের প্রত্যেককে ভগবদ্দর্শনলাভের পথে যে কিরূপে কত প্রকারে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে পাঠককে দিয়া আমরা এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। অদ্বৈতভাবভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াই ঠাকুর স্বয়ং সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসোপলব্ধির জন্য সাধনা করিয়া তত্তদ্ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার অনেকদিন পরে যখন ভক্তেরা অনেকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন একদিন ঠাকুরের ভাবাবস্থায় ইচ্ছা হয় ভক্তদেরও ভাবসমাধি হউক এবং জগদম্বার নিকট ঐ বিষয়ে প্রার্থনা করেন। তাহার পরই ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ঐরূপ হইতে থাকে। ঐরূপ ভাবাবস্থায় তাঁহাদের বাহ্যজগৎ ও দেহাদিবোধ কতকটা কমিয়া যাইয়া ভিতরের কোন একটি বিশেষ ভাবপ্রবাহ, যথা—কোন মূর্তিচিন্তা, এত পরিস্ফুট হইত যে, ঐ মূর্তি যেন জ্বলন্ত জীবন্তরূপে তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন ইত্যাদি তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিলেই তাঁহাদের প্রধানতঃ ঐরূপ হইত।

ভক্তদিগের দেবদেবীর মূর্তিদর্শন

ঠাকুরের আর একদল ভক্ত ছিলেন যাঁহাদের সঙ্গীতাদি শুনিলে ওরূপ হইত না, কিন্তু ধ্যানাদি করিবার কালে দেবমূর্ত্যাদির সন্দর্শন হইত। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র দর্শনই হইত, পরে ধ্যান যত গাঢ় বা গভীর হইতে থাকিত, তত ঐসকল মূর্তির নড়াচড়া, কথাকওয়া ইত্যাদিও তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। আবার কেহ কেহ প্রথম প্রথম নানাপ্রকার দর্শনাদি করিতেন, কিন্তু ধ্যান আরও গভীরভাবপ্রাপ্ত হইলে আর ঐরূপ দর্শনাদি করিতেন না।

জনৈক ভক্তের বৈকুণ্ঠ-দর্শন

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভবাদির কথা শ্রবণ করিয়াই বুঝিতেন, কে কোন্ ‘থাক’ বা শ্রেণীর এবং কাহার পক্ষে কি প্রয়োজন এবং পরেই বা তাঁহারা প্রত্যেকে কি দর্শনাদি করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে একজনের কথাই বলি। আমাদের একটি বন্ধু[5] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্তি নানাভাবে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যেমন যেমন দেখিতেন, কয়েকদিন অন্তর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উহা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিতেন, “বেশ হইয়াছে”, অথবা “এইরূপ করিস” ইত্যাদি। পরে একদিন ঐ বন্ধুটি ধ্যানের সময় দেখিলেন, যতপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি একটি মূর্তির অঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। ঠাকুরকে ঐকথা নিবেদন করায় ঠাকুর বলিলেন, “যা, তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল। ইহার পর আর দর্শন হবে না।” আমাদের বন্ধু বলেন, “বাস্তবিকই তাহাই হইল–ধ্যান করিতে করিতে কোন মূর্তিই আর দেখিতে পাইতাম না। শ্রীভগবানের সর্বব্যাপিত্বাদি অন্য প্রকারের উচ্চ ভাবসমূহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। আমার তখন মূর্তিদর্শন করা বেশ লাগিত, যাহাতে আবার ঐরূপ দর্শনাদি হয় তাহার চেষ্টাও খুব করিতাম; কিন্তু করিলে কি হইবে, কিছুতেই আর কোন মূর্তির দর্শন হইত না!”

সাকারবাদীদের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ

সাকারবাদী ভক্তদের বলিতেন, “ধ্যান করবার সময় ভাববে, যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখচ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বলছি কেন?—সে পাদপদ্ম যে বড় নরম। অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধলে লাগবে তাই।”

রেশমের দড়ি ও ‘জ্যোৎ’ প্রদীপ

আবার বলিতেন, “ধ্যান করবার সময় ইষ্টচিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সেইদিকে সর্বদা রাখবে। দেখেচ তো, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ-প্রদীপ জ্বালতে হয়। ঠাকুরের কাছে সর্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখতে হয়, সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়। সেইরকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্বদা জ্বেলে রাখতে হয়। সংসারের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ভেতরে চেয়ে দেখতে হয়, সে প্রদীপটা জ্বলচে কিনা।”

ধ্যান করবার আগে মনটা ধুয়ে ফেলা

আবার বলিতেন, “ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা করবার আগে ভাবতুম, যেন মনের ভেতরটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্ছি! মনের ভেতর নানান আবর্জনা, ময়লা-মাটি (চিন্তা, বাসনা ইত্যাদি) থাকে কিনা? সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে ধেয়ে সাফ্ করে তার ভেতর ইষ্টকে এনে বসাচ্চি!–এই রকম করো!” ইত্যাদি।

সাকার বড় না নিরাকার বড়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে শ্রীভগবানের সাকার ও নিরাকারভাবচিন্তা-সম্বন্ধে আমাদের বলেন, “কেহ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার কেহ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায়।” ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে বসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধু[6] ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন–‘মহাশয়, সাকার বড় না নিরাকার বড়?’ তাহাতে ঠাকুর বলেন, “নিরাকার দু-

রকম আছে, পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার উঁচু ভাব বটে; সাকার ধরে সে নিরাকারে পৌঁছুতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ বুজলেই অন্ধকার—যেমন ব্রাহ্মদের[7]।”

সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জস্য

পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে ঐরূপ কাঁচা নিরাকার ধরিয়া সাধনায় অগ্রসর ঠাকুরের আর একদল ভক্তও ছিলেন। তাঁহাদের ঠাকুর ক্রীশ্চান পাদ্রীদের মতো সাকারভাব চিন্তার নিন্দা অথবা শ্রীভগবানের সাকারমূর্ত্যাদি-অবলম্বনে সাধনায় অগ্রসর ভক্তদিগকে ‘পৌত্তলিক’, ‘অন্ধবিশ্বাসী’ ইত্যাদি বলিয়া দ্বেষ করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন, “ওরে, তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও বটে, আবার তা ছাড়া আরও কি তা কে জানে? সাকার কেমন জানিস—যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়; বরফের ভিতরে বাহিরে জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু দ্যাখ, জলের রূপ নেই (একটা কোন বিশেষ আকার নাই), কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তিহিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের জল জমে বরফের মতো নানা আকার ধারণ করে।” ঠাকুরের ঐ দৃষ্টান্তটি যে কত লোকের মনে শ্রীভগবানের সাকার নিরাকার উভয় ভাবের একত্রে এক সময়ে সমাবেশ সম্ভবপর বলিয়া ধারণা করাইয়া শান্তি দিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্ধবিশ্বাস

এখানে আর একটি কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরের কাঁচা নিরাকারবাদী ভক্তদলের ভিতর সর্বপ্রধান ছিলেন—শুধু ঐ দলের কেন ঠাকুর তাঁহাকে সকল থাক্ বা শ্রেণীর সকল ভক্তদিগের অগ্রে আসন প্রদান করিতেন—শ্রীযুত নরেন্দ্র বা স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার তখন পাশ্চাত্যশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সাকারবাদীদের উপর একটু-আধটু কঠিন কটাক্ষ কখনো কখনো আসিয়া পড়িত। তর্কের সময়েই ঐ ভাবটি তাঁহাতে বিশেষ লক্ষিত হইত। ঠাকুর কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত সাকারবাদী কোন কোন ভক্তের ঘোরতর তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ঐরূপ তর্কে স্বামীজীর মুখের সামনে বড় একটা কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না এবং স্বামীজীর তীক্ষ্ণ যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ কেহ মনে মনে ক্ষুণ্ণও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত বলিতেন, “অমুকের কথাগুলো নরেন্দর সে দিন ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে কেটে দিলে!—কি বুদ্ধি!” ইত্যাদি। সাকারবাদী গিরিশের সহিত তর্কে কিন্তু স্বামীজীকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। সেদিন ঠাকুর শ্রীযুত গিরিশের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্যই যেন তাঁহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল! সে যাহা হউক, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে কথার সময় ঠাকুরের নিকট সাকারবাদীদের বিশ্বাসকে ‘অন্ধবিশ্বাস’ বলিয়া নির্দেশ করেন। ঠাকুর তদুত্তরে তাঁহাকে বলেন, “আচ্ছা, অন্ধবিশ্বাসটা কাকে বলিস আমায় বোঝাতে পারিস? বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ; বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি? হয় বল ‘বিশ্বাস’, আর নয় বল ‘জ্ঞান’। তা নয়, বিশ্বাসের ভেতর আবার কতকগুলো অন্ধ আর কতকগুলোর চোখ আছে—এ আবার কি রকম?” স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “বাস্তবিকই সেদিন আমি ঠাকুরকে অন্ধবিশ্বাসের অর্থ বুঝাইতে যাইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। ও কথাটার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাই নাই। ঠাকুরের কথাই ঠিক বলিয়া বুঝিয়া সেদিন হইতে আর ও কথাটা বলা ছাড়িয়া দিয়াছি।”

নিরাকারবাদীদের প্রতি উপদেশ

কাঁচা নিরাকারবাদীদেরও ঠাকুর সাকারবাদীদের সহিত সমান চক্ষে দেখিতেন। তাহাদেরও কিরূপভাবে ধ্যান করিলে সহায়ক হইবে বলিয়া দিতেন। বলিতেন, “দ্যাখ্, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান যেন সমুদ্রের জলের মতো সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি! আবার কখনো মনে হতো

আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।”

ঠাকুরের নিজমূর্তি ধ্যান করিতে উপদেশ

আবার বলিতেন, “দ্যাখ্, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি?—এখানকার ওপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না? একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখলেই রাখালকে মনে পড়ে, ছেলেকে দেখলেই তার বাপের কথা মনে পড়ে, উকিল দেখলেই কাছারির কথা মনে পড়ে, সেই রকম–বুঝলে কি না? মন নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না, একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে–এইজন্যে বলছি।”

‘কাঁচা আমি ও পাকা আমি’; একটা ভাব পাকা ক’রে ধরলে তবে ঈশ্বরের উপর জোর চলে

আবার বলিতেন, “যাঁকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে, একজনকে বা একটাকে পাকা করে ধর তবে তো আঁট হবে। ‘সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?’—ভাব চাই। একটা ভাব নিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ‘যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।’–ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই–তবে তো হবে। তবে কি জান? তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটু সম্বন্ধ পাতানো–এরই নাম। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা, যেমন–তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি; এই হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি–এইটি খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা! আর এই যে বামুন আমি, কায়েৎ আমি, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি–এসব হচ্চে অবিদ্যার আমি; এগুলোকে ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়–ওগুলোতে অভিমান-অহঙ্কার বাড়িয়ে বন্ধন এনে দেয়। স্মরণ-মননটা সর্বদা রাখা চাই, খানিকটে মন সব সময় তাঁর দিকে ফিরিয়ে রাখবে–তবে তো হবে। একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। এই দ্যাখ না, প্রথম প্রথম একটু-আধটু ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ ‘আপনি, মশাই’ ইত্যাদি লোকে বলে থাকে; সেই ভাব যেই বাড়ল, অমনি ‘তুমি তুমি’–আর তখন ‘আপনি টাপনি’-গুলো বলা আসে না; যেই আরও বাড়লো, আর তখন ‘তুমি টুমি’-তেও মানে না–তখন ‘তুই মুই’! তাঁকে আপনার হতে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো হবে।”

নষ্ট মেয়ের দৃষ্টান্ত

“যেমন নষ্ট মেয়ে, পরপুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাসতে শিখচে–তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা, তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠল, তখন আর কিছু নেই! একেবারে তার হাত ধরে সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল! তখন যদি সে পুরুষটা তাকে আদর-যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে ‘তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কি না বল।’ সেই রকম, যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েচে সে তাঁর ওপর জোর করে বলে, ‘তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কিনা–বল’!”

এজন্মে ঈশ্বরলাভ করবো–মনে এই জোর রাখা চাই

কাহারও ভগবদনুরাগে জোর কমিয়াছে দেখিলে বলিতেন, “এ জন্মে না হোক পরজন্মে পাব, ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনি পাব–মনে এইরকম জোর রাখতে হয়, বিশ্বাস রাখতে হয়, তা না হলে কি হয়? ওদেশে চাষীরা সব

গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে–অমনি তারা বোঝে সেগুলো ভাল নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত দেবামাত্র তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে–অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে–ঐগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে কেনে।

এক এক ক'রে বাসনাত্যাগ করা চাই

ম্যাদাটে ভাব ভাল নয়; জোর নিয়ে এসে, বিশ্বাস করে বল–তাঁকে পাবই পাব, এখনি পাব–তবে তো হবে।" আবার বলিতেন, "এ দিককার বাসনাকামনাগুলো সব এক এক করে ছাড়, তবে তো হবে। কোথা ওগুলোকে সব এক এক করে ছাড়বে–না আরও বাড়াতে চললে!–তাহলে কেমন করে হবে?"

চার ক'রে মাছ ধরার মত অধ্যবসায় চাই

যখন ধ্যান-ভজন, প্রার্থনাদি করিয়া শ্রীভগবানের সাড়া না পাইয়া মন নিরাশার সাগরে ভাসিত, তখন সাকার নিরাকার উভয় বাদীদেরই বলিতেন, "মাছ ধরতে গেলে প্রথম চার করতে হয়। হয়তো চার করে ছিপ ফেলে বসেই আছে–মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্চে তবে বুঝি পুকুরে মাছ নেই। তারপর হয়তো একদিন দেখলে একটা বড় মাছ ঘাই দিলে–অমনি বিশ্বাস হলো পুকুরে মাছ আছে। তারপর হয়তো একদিন ছিপের ফাতনাটা নড়ল–অমনি মনে হলো চারে মাছ এয়েছে। তারপর হয়তো একদিন ফাতনাটা ডুবল, তুলে দেখলে–মাছ টোপ খেয়ে পালিয়েছে; আবার টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে খুব সাবধানে বসে রইল। তারপর একদিন যেমন টোপ খেয়েছে, অমনি টেনে তুলতেই মাছ আড়ায় উঠল।"

ভগবান 'কানখড়্কে'–সব শুনেন

কখনও বলিতেন, "তিনি খুব কানখড়্কে, সব শুনতে পান গো। যত ডেকেছ সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যুসময়েও দেখা দেবেন।" কাহাকেও বলিতেন–"সাকার কি নিরাকার যদি ঠিক করতে না পারিস তো এই বলে প্রার্থনা করিস যে, 'হে ভগবান, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি বুঝতে পারি না; তুমি যাহাই হও আমায় কৃপা কর, দেখা দাও'।" আবার কাহাকেও বলিতেন–"সত্য সত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় রে, এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কইচি এইরকম করে তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায়–সত্য বলছি, মাইরি বলছি!"

গভীর ভাব-প্রবণতার সহিত ঠাকুরের সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা

আর এক কথা–চব্বিশ ঘণ্টা 'ভাবমুখে' থাকিলে ভাবুকতার এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহার দ্বারা আর সংসারের অপর কোন কর্ম চলে না, অথবা সে সংসারের ছোটখাট ব্যাপার আর মনে রাখিতে পারে না–সর্বত্র আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। উহার দৃষ্টান্ত–ধর্ম-জগতে তো কথাই নাই, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা অন্য সকল স্থানেও বিশেষ মনস্বী পুরুষগণের জীবনালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, তাঁহারা হয়তো নিজের অঙ্গসংস্কার বা নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের যথাযথ স্থানে রাখা ইত্যাদি সামান্য বিষয়সকলে একেবারেই অপটু ছিলেন। ঠাকুরের জীবনে কিন্তু দেখিতে পাই যে, অত অধিক ভাবপ্রবণতার ভিতরেও তাঁহার ঐপ্রকার সামান্য বিষয়সকলেরও হুঁশ থাকিত। যখন থাকিত না তখন নিজের দেহ বা জগৎ-সংসারের কোন বস্তু বা ব্যক্তিরই হুঁশ থাকিত না–যেমন সমাধিতে, আর যখন থাকিত, তখন সকল বিষয়েরই থাকিত! ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে! এখানে দুই-একটি মাত্র ঐরূপ দৃষ্টান্তেরই আমরা উল্লেখ করিব।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরামবাবুর বাটী গমন করিতেছেন; সঙ্গে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ও শ্রীযুত যোগানন্দ স্বামী যাইতেছেন। সকলে গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া বাগানের 'গেট' পর্যন্ত আসিয়াছে মাত্র, ঠাকুর শ্রীযুত যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে, নাইবার কাপড় গামছা এনেছিস তো?"—তখন প্রাতঃকাল।

শ্রীযুত যোগেন—না মশাই, গামছা এনেছি, কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে। তা তারা (বলরামবাবু) আপনার জন্য একখানা নূতন কাপড় দেখে-শুনে দেবে এখন।

ঠাকুর—ও কি তোর কথা? লোকে বলবে, কোথা থেকে একটা হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে, আতান্তরে পড়বে—যা, গাড়ি থামিয়ে নেবে গিয়ে নিয়ে আয়।

কাজেই যোগীন স্বামীজী তদ্রূপ করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন—ভাল লোক, লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়িতে এলে সকল বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়, কাকেও কিছুতে বেগ পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগুলো এলে সকল বিষয়ে বেগ পেতে হয়; যে দিন ঘরে কিছু নেই, তার জন্য গেরস্তকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে, ঠিক সেই দিনেই সে এসে উপস্থিত হয়।

ঐ বিষয়ে ২য় দৃষ্টান্ত

শ্রীযুত প্রতাপ হাজরা নামক এক ব্যক্তি ঠাকুরের সময়ে দক্ষিণেশ্বরে অনেককাল সাধুভাবে কাটাইতেন। আমরা সকলে ইঁহাকে হাজরা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। ইনিও মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তদিগের নিকট আগমনকালে তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। একবার ঐরূপে আসিয়া প্রত্যাগমনকালে নিজের গামছাখানি ভুলিয়া কলিকাতায় ফেলিয়া যান। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—"ভগবানের নামে আমার পরনের কাপড়ের হুঁশ থাকে না, কিন্তু আমি তো একদিনও নিজের গামছা বা বেটুয়া কলিকাতায় ভুলিয়া আসি না। আর তোর একটু জপ করে এত ভুল!"

ঐ বিষয়ে ৩য় দৃষ্টান্ত—শ্রীশ্রীমার প্রতি উপদেশ

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর শিখাইয়াছিলেন—"গাড়িতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোন জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখে শুনে সকলের শেষে নামবে।" ঠাকুরের অতি সামান্য বিষয়েও এত নজর ছিল।

ঐ বিষয়ে শেষ কথা

এইরূপে 'ভাবমুখে' নিরন্তর থাকিয়াও ঠাকুরের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ের হুঁশ থাকিত; যে জিনিসটি যেখানে রাখিতেন তাহা সর্বদা সেইখানেই রাখিতেন, নিজের কাপড়-চোপড়, বেটুয়া প্রভৃতি সকল নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের নিজে খোঁজ রাখিতেন, কোথাও যাইবার আসিবার সময় আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি আনিতে ভুল হইয়াছে কিনা সন্ধান লইতেন এবং ভক্তদিগের মানসিক ভাবসমূহের যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান রাখিতেন, তেমনি তাহাদের সংসারের সকল বিষয়ের সন্ধান রাখিয়া কিসে তাহাদের বাহ্যিক সকল বিষয়ও সাধনার অনুকূল হইতে পারে তদ্বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতেন!

ঠাকুর ভাবরাজ্যের মূর্তিমান রাজা

ঠাকুরের কথা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তিনি যেন সর্বপ্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানবজগতে আর কখনো দেখা যায় নাই। ভাবময় ঠাকুর 'ভাবমুখে' অবস্থান করিয়া নির্বিকল্প অদ্বৈতভাব হইতে সবিকল্প সকল প্রকার ভাবের পূর্ণ প্রকাশ নিজে

দেখাইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তদিগকে স্ব স্ব পথের ও গন্তব্যস্থলের সংবাদ দিয়া অন্ধকারে অপূর্ব জ্যোতি, নিরাশায় অদৃষ্টপূর্ব আশা এবং সংসারের নিদারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর নিরুপম শান্তি আনিয়া দিতেন। ঠাকুর যে সকলের কি ভরসার স্থল ছিলেন তাহা বলিয়া বুঝানো দায়। মনোরাজ্যে তাঁহার যে কি প্রবল প্রতাপ দেখিয়াছি তাহা বলা অসম্ভব।

মানব-মনের উপর তাঁহার অপূর্ব আধিপত্য–স্বামী বিবেকানন্দের ঐ বিষয়ক কথা

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন–"মনের বাহিরের জড়-শক্তিসকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্‌ভুত ব্যাপার (miracle) দেখানো বড় বেশি কথা নয়–কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙত, পিট্‌ত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না!"

[1] শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ।

[2] বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮-০৯।

[3] যোগশাস্ত্রে এই ছয়টি মেরুচক্রের নাম ও বিশেষ বিশেষ অবস্থানস্থল পর পর নির্দিষ্ট আছে। যথা – মেরুদণ্ডের শেষভাগে 'মূলাধার' (১), তদূর্ধ্বে লিঙ্গমূলে 'স্বাধিষ্ঠান' (২), তদূর্ধ্বে নাভিস্থলে 'মণিপুর' (৩), তদূর্ধ্বে হৃদয়ে 'অনাহত' (৪), তদূর্ধ্বে কণ্ঠে 'বিশুদ্ধ' (৫), তদূর্ধ্বে ভ্রূমধ্যে 'আজ্ঞা' (৬), অবশ্য এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না পথেই বর্তমান – অতএব 'হৃদয়' 'কণ্ঠ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তদ্বিপরীতে অবস্থিত মেরুমধ্যস্থ স্থলই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

[4] স্বামী তুরীয়ানন্দ।

[5] স্বামী অভেদানন্দ।

[6] শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

[7] সত্যের অনুরোধে এ কথাটি আমরা বলিলাম বলিয়া কেহ না মনে করেন, ঠাকুর বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মজ্ঞানীদের নিন্দা করিতেন। কীর্তনান্তে যখন সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তদের প্রণাম করিতেন, তখন 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম' – এ কথাটি তাঁহাকে বার বার আমরা বলিতে শুনিয়াছি। সুবিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজের নেতা ভক্তপ্রবর কেশবই সর্বপ্রথম ঠাকুরের কথা কলিকাতার জনসাধারণে প্রচার করেন, একথা সকলেই জানেন এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজের নিকট চিরঋণী, একথাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

৩.৫. তৃতীয় অধ্যায়: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

– গীতা, ২।২৯

ঠাকুর, 'গুরু' 'বাবা' বা 'কর্তা' বলিয়া সম্বোধিত হইলে বিরক্ত হইতেন। তবে গুরুভাব তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে?

ঠাকুরকে যাঁহারা দু-চারবার মাত্র দেখিয়াছেন অথবা যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই, উপর উপর দেখিয়াছেন মাত্র, তাঁহারা গুরুভাবে ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলার কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইলে একেবারে অবাক হইয়া থাকেন। ভাবেন, 'লোকটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাগুলো বলছে।' আবার যখন দেখেন অনেকে ঐ ভাবের কথা বলিতেছে তখনো মনে করেন, "এরা সব একটা মতলব করে দল পাকিয়েচে, আর শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠাকুর করে তুলচে; তিনশ তেত্রিশ কোটির ওপর আবার একটা বাড়াতে চলেচে! কেন রে বাপু, অতগুলো ঠাকুরেও কি তোদের শানে না? যাকে ইচ্ছা, যতগুলো ইচ্ছা, ওরি ভেতর থেকে নে না–আবার একটা বাড়ানো কেন? কি আশ্চর্য এরা একবার ভাবেও না গা যে, মিথ্যা কথাগুলো ধরা পড়লে অমন পবিত্র লোকটার উপরে লোকের ভক্তি একেবারে চটে যাবে! আমরাও তো তাঁকে দেখেচি!–সকলের কাছে নিচু, নম্রভাব–একেবারে যেন মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট–এতটুকু অহঙ্কার নাই! তারপর একথা তো তোরাও বলিস, আর আমরাও দেখেচি যে, 'গুরু' কি 'বাবা' কি 'কর্তা' বলে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে সইতেই পারতেন না; বলে উঠতেন, 'ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা–আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান–একগাছি বড়র সমানও নই!'–বলেই হয়তো আবার তার পায়ের ধুলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন! এমন দীনভাব কোথাও কেউ কি দেখেচে? আর সেই লোককে কিনা এরা 'গুরু', 'ঠাকুর'–যা নয় তাই বলচে, যা নয় তাই করচে!"

সর্বভূতে নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির থাকায় ঠাকুরের দাসভাব সাধারণ

এইরূপ অনেক বাদানুবাদ চলা অসম্ভব নহে বলিয়াই আমরা ঠাকুরের গুরুভাব-সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহার কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ বাস্তবিকই ঠাকুর যখন সাধারণভাবে থাকিতেন, তখন আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বভূতে ঠিক ঠিক নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির রাখিয়া মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই 'দাস আমি' এই ভাব লইয়া থাকিতেন; বাস্তবিকই তখন তিনি আপনাকে হীনের হীন, দীনের দীন জ্ঞানে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেন; এবং বাস্তবিকই সে সময় তিনি 'গুরু', 'কর্তা' বা 'পিতা' বলিয়া সম্বোধিত হইলে সহিতে পারিতেন না।

কিন্তু দিব্য-ভাবাবেশে তাঁহাতে গুরুভাবের লীলা নিত্য দেখা যাইত। ঠাকুরের তখনকার ব্যবহারে ভক্তদিগের কি মনে হইত

কিন্তু সাধারণ ভাবে অবস্থানের সময় ঐরূপ করিলেও ঠাকুরের গুরুভাবের অপূর্ব লীলার কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? সে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যভাবাবেশে যখন তিনি যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাহাকেও স্পর্শমাত্রেই সমাধি, গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের অভূতপূর্ব নেশার ঝোঁকে[1] নিমগ্ন করিতেন, অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের তমোগুণ বা মলিনতা এতটা টানিয়া লইতেন

যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্বে যেরূপ কখনো অনুভব করে নাই, এ প্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিত–তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত এ ঠাকুর পূর্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন; ইঁহাতে কি একটা ঐশ্বরিক শক্তি স্বেচ্ছায় বা লীলায় প্রকটিত হইয়া ইঁহাকে আত্মহারা করিয়া ঐরূপ করাইতেছে; ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞানতিমিরান্ধ, ত্রিতাপে তাপিত, ভবরোগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, ত্রাতা এবং শ্রীভগবানের পরম পদের দর্শয়িতা! ভক্তেরা ঠাকুরের ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গুরু, কৃপাময়, ভগবান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যথার্থ দীনভাব এবং এই দিব্য ঐশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে অবস্থান করিতে পারে, তাহা আমরা বর্তমান যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণে যথার্থই দেখিয়াছি; এবং দেখিয়াছি বলিয়াই উহারা কেমনে একত্রে একই মনে থাকে সে বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছি।

ভাবময় ঠাকুরের ভাবের ইতি নাই

ঐরূপ চেষ্টা করিলেও যতটুকু বুঝিয়াছি ততটুকুও ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিব কিনা জানি না; আর সম্যক বুঝা বা বুঝানো, লেখক ও পাঠক উভয়েরই সাধ্যাতীত; কারণ ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা নাই। ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীভগবানের 'ইতি' নাই।" আমাদের প্রত্যক্ষ এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের 'ইতি' নাই।

সাধারণের বিশ্বাস ঠাকুর ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন না। 'ভাবমুখে থাকা' কখন ও কিরূপে সম্ভবে বুঝিলে ঐকথা আর বলা চলে না

সচরাচর লোকে ঠাকুর 'ভাবমুখে' থাকিতেন শুনিলেই ভাবিয়া বসে যে, তিনি জ্ঞানী ছিলেন না। ভগবদনুরাগ ও বিরহে মনে যে সুখদুঃখাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই লইয়া সদা সর্বক্ষণ থাকিতেন। কিন্তু 'ভাবমুখে' থাকাটি যে কি ব্যাপার বা কিরূপ অবস্থায় উহা সম্ভব, তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি তবে বর্তমান বিষয়টি বুঝিতে পারিব; সেজন্য 'ভাবমুখে থাকা' অবস্থাটির সংক্ষেপ আলোচনা এখানে একবার আর এক প্রকারে করিয়া লওয়া যাক। পাঠক মনে মনে ভাবিয়া লউন–তিনদিনের সাধনে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হইল।

প্র–নির্বিকল্প সমাধিটি কি?

উ–মনকে একেবারে সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত অবস্থায় আনয়ন করা।

প্র–সঙ্কল্প-বিকল্প কাহাকে বলে?

উ–বাহ্য জগতের রূপরসাদি বিষয়সকলের জ্ঞান বা অনুভব, সুখদুঃখাদি ভাব, কল্পনা, বিচার, অনুমান প্রভৃতি মানসিক চেষ্টা এবং ইচ্ছা বা 'এটা করিব', 'ওটা বুঝিব', 'এটা ভোগ করিব', 'ওটা ত্যাগ করিব' ইত্যাদি মনের সমস্ত বৃত্তিকে।

'আমি'-বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তিসমূহের উদয়। উহার আংশিক লোপে সবিকল্প ও পূর্ণ লোপে নির্বিকল্প সমাধি হয়। সমাধি, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তির প্রভেদ

প্র–বৃত্তিসকল কোন্ জিনিসটা থাকিলে তবে উঠিতে পারে?

উ–'আমি' 'আমি' এই জ্ঞান বা বোধ। 'আমি'-বোধ যদি চলিয়া যায় বা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে সময়ের মতো কোন বৃত্তিই আর মনে খেলা বা রাজত্ব করিতে পারে না।

প্র—মূর্ছা বা গভীর নিদ্রাকালেও তো ‘আমি’-বোধ থাকে না—তবে কি নির্বিকল্প সমাধিটা ঐরূপ একটা কিছু?

উ—না; মূর্ছা বা সুষুপ্তিতে ‘আমি’-বোধ ভিতরে ভিতরে থাকে, তবে মস্তিষ্করূপ (brain) যে যন্ত্রটার সহায়ে মন ‘আমি’ ‘আমি’ করে সেটা কিছুক্ষণের জন্য কতকটা জড়ভাবাপন্ন হয় বা চুপ করিয়া থাকে, এই মাত্র—ভিতরে বৃত্তিসমূহ গজগজ করিতে থাকে—ঠাকুর যেমন দৃষ্টান্ত দিতেন, “পায়রাগুলো মটর খেয়ে গলা ফুলিয়ে বসে আছে বা বক-বকম্ করে আওয়াজ করছে—তুমি মনে করচ তাদের গলার ভিতরে কিছুই নাই—কিন্তু যদি গলায় হাত দিয়ে দেখ তো দেখবে মটর গজগজ করচে!”

প্র—মূর্ছা বা সুষুপ্তিতে যে ‘আমি’-বোধটা ঐরূপে থাকে তা বুঝিব কিরূপে?

উ—ফল দেখিয়া; যথা—ঐসকল সময়েও হৃদয়ের স্পন্দন, হাতের নাড়ি, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি বন্ধ হয় না—ঐসকল শারীরিক ক্রিয়াও ‘আমি’-বোধটাকে আশ্রয় করিয়া হয়; দ্বিতীয় কথা, মূর্ছা ও সুষুপ্তির বাহ্যিক লক্ষণ কতকটা সমাধির মতো হইলেও ঐসকল অবস্থা হইতে মানুষ যখন আবার সাধারণ বা জাগ্রত অবস্থায় আসে, তখন তাহার মনে জ্ঞান ও আনন্দের মাত্রা পূর্বের ন্যায়ই থাকে, কিছুমাত্র বাড়ে বা কমে না—কামুকের যেমন কাম তেমনি থাকে, ক্রোধীর যেমন ক্রোধ তেমনি থাকে, লোভীর লোভ সমান থাকে ইত্যাদি।

সমাধি ফল—জ্ঞান ও আনন্দের বৃদ্ধি এবং ভগবদ্দর্শন

নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ হইলে কিন্তু ঐসকল বৃত্তি আর মাথা তুলিতে পারে না; অপূর্ব জ্ঞান ও অসীম আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জগৎকারণ ভগবানের সাক্ষাৎদর্শনে মনে আর পরকাল আছে কিনা, ভগবান আছেন কিনা—এ সকল সংশয়-সন্দেহ উঠে না।

প্র—আচ্ছা বুঝিলাম—ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিতে কিছুক্ষণের জন্য ‘আমি’-বোধের একেবারে লয় হইল—তাহার পর?

উ—তাহার পর, ঐরূপে ‘আমি’-বোধটার লোপ হইয়া কারণরূপিণী শ্রীশ্রীজগন্মাতার কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ দর্শনে ঠাকুর তৃপ্ত না হইয়া সদা-সর্বক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ছয় মাস নির্বিকল্প সমাধিতে থাকিবার কালের দর্শন ও অনুভব

প্র—সে চেষ্টার ফলে ঠাকুরের মনের কিরূপ অবস্থা হইল এবং কিরূপ লক্ষণই বা শরীরে প্রকাশিত হইল?

উ—কখনও ‘আমি’-বোধের লোপ হইয়া শরীরে মৃতব্যক্তির লক্ষণসকল প্রকাশিত হইয়া ভিতরে জগদম্বার পূর্ণ বাধামাত্রশূন্য সাক্ষাৎ দর্শন—আবার কখনও অত্যল্পমাত্র ‘আমি’-বোধ উদিত হইয়া শরীরে জীবিতের লক্ষণ একটু-আধটু প্রকাশ পাওয়া ও সত্ত্বগুণের অতিশয় আধিক্যে শুদ্ধ স্বচ্ছ পবিত্র মন-রূপ ব্যবধান বা পর্দার ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার কিঞ্চিৎ বাধাযুক্ত দর্শন!—এইরূপে কখনও ‘আমি’-বোধের লোপ, মনের বৃত্তিসকলের একেবারে লয় ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণ দর্শন ও কখনও ‘আমি’-বোধের একটু উদয়; মনের বৃত্তিসকলের ঈষৎ প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন ঈষৎ আবরিত হওয়া। এইরূপ বার বার হইতে লাগিল।

প্র—কতদিন ধরিয়া ঠাকুর ঐরূপ চেষ্টা করেন?

উ—নিরন্তর ছয়মাস কাল ধরিয়া।

‘আমি’-বোধের সম্পূর্ণ লোপে ঐ কালে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে

প্র—বল কি? তবে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে? কারণ, ছয়মাস না খাইলে তো আর মানবদেহ থাকিতে পারে না এবং তোমরা তো বল যতটা শরীরবোধ আসিলে আহারাদি কার্য করা চলে, ঠাকুরের ঐ কালে মাঝে মাঝে ‘আমি’-বোধের উদয় হইলেও ততটা কখনই আসে নাই।

উ—সত্যই ঠাকুরের শরীর থাকিত না এবং ‘শরীরটা কিছুকাল থাকুক’ এরূপ ইচ্ছার লেশমাত্রও তখন ঠাকুরের মনে ছিল না; তবে তাঁহার শরীরটা যে ছিল সে কেবল জগদম্বা ঠাকুরের শরীরটার সহায়ে তাঁহার অদ্‌ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখাইয়া বহুজন-কল্যাণ সাধিত করিবেন বলিয়া।

জনৈক যোগী-সাধুর আগমন ও ঠাকুরের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে নিত্য জোর করিয়া আহার করাইয়া দেওয়া

প্র—তা তো বটে, কিন্তু ঐ ছয়মাস কাল জগদম্বা নিজে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়া কি ঠাকুরকে জোর করিয়া আহার করাইয়া দিতেন?

উ—কতকটা সেইরূপই বটে; কারণ, ঐ সময়ে একজন সাধু কোথা হইতে আপনা-আপনি আসিয়া জোটেন, ঠাকুরের ঐরূপ মৃতকল্প অবস্থা যে যোগসাধনা বা শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবের ফলে তাহা সম্যক বুঝেন এবং ঐ ছয়মাস কাল দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীতে থাকিয়া সময়ে সময়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আঘাত পর্যন্ত করিয়া একটু-আধটু হুঁশ আনিতে নিত্য চেষ্টা করিতেন; আর একটু হুঁশ আসিতেছে দেখিলেই দুই-এক গ্রাস যাহা পারিতেন, খাওয়াইয়া দিতেন। একেবারে অপরিচিত জড়প্রায় মৃতকল্প একটি লোককে ঐরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে সাধুটির এত আগ্রহ, এতটা মাথাব্যথা কেন হইয়াছিল জানি না, তবে ঐরূপ ঘটনাবলীকেই আমরা ভগবদিচ্ছায় সাধিত বলিয়া থাকি। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ ইচ্ছা ও শক্তিতেই যে ঐ অসম্ভব সম্ভব হইয়া ঠাকুরের শরীরটা রক্ষা পাইয়াছিল ইহা ছাড়া আর কি বলিব?

শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ—‘ভাবমুখে থাক্’

প্র—আচ্ছা, বুঝিলাম, তারপর?

উ—তাহার পর, শ্রীশ্রীজগদম্বা বা শ্রীভগবান বা যে বিরাটচৈতন্য ও বিরাট-শক্তি জগদ্রূপে প্রকাশিত আছেন এবং জড় চেতন সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপাতবিভিন্ন নামরূপে অবস্থান করিতেছেন তিনি ঠাকুরকে আদেশ করিলেন—‘ভাবমুখে থাক’!

একমেবাদ্বিতীয়ং-বস্তুতে নির্গুণ ও সগুণভাবে স্বগত-ভেদ এবং জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব বর্তমান। ঐ বিরাট আমিত্বই ঈশ্বর বা শ্রীশ্রীজগদম্বার আমিত্ব; এবং উহার দ্বারাই জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়

প্র—সেটা আবার কি?

উ—বলিতেছি, কিন্তু ঠাকুরের ঐ সময়কার কথা বুঝিতে হইলে কল্পনাসহায়ে যতদূর সম্ভব ঠাকুরের ঐ সময়ের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লওয়া আবশ্যক। পূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের তখন কখনো ‘আমি’-জ্ঞানের লোপ এবং কখনো উহার ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল। যখন ‘আমি’-বোধটার ঐরূপ ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল তখনো ঠাকুরের নিকট জগৎটা, আমরা যেমন দেখি তেমন দেখাইতেছিল না। দেখাইতেছিল, যেন একটা বিরাট মনে নানা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে,

ক্রীড়া করিতেছে, আবার লয় হইতেছে! অপর সকলের তো কথাই নাই, ঠাকুরের নিজের শরীরটা, মনটা ও আমিত্ববোধটাও ঐ বিরাট-মনের ভিতরের একটা তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল। পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিতমূর্খের দল যে জগচ্চৈতন্য ও শক্তিকে নিজের বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদিসহায়ে মাপিতে যাইয়া বলিয়া বসে 'ওটা এক হলেও জড়', ঠাকুর এই অবস্থায় পৌঁছাইয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন বা অনুভব করিলেন–জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি, অনন্ত কৃপাময়ী জগজ্জননী! আর দেখিলেন–সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্, নির্গুণ ও সগুণ ভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত থাকায়–ইহাকেই শাস্ত্রে স্বগতভেদ বলিয়াছে–তাঁহাতে একটা আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্তব্যাপী বিরাট আমিত্ব বিকশিত রহিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, সেই বিরাট 'আমি'টা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে; আর সেই ভাবতরঙ্গই স্বল্পাধিক পরিমাণে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিতে পাইয়া মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি'গুলো উহাকেই বাহিরের জগৎ ও বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিতেছে ও বলা-কহা ইত্যাদি করিতেছে! ঠাকুর দেখিলেন বড় 'আমি'টার শক্তিতেই মানবের ছোট 'আমি'গুলো রহিয়াছে ও স্ব স্ব কার্য করিতেছে এবং বড় 'আমি'টাকে দেখিতে-ধরিতে পাইতেছে না বলিয়াই ছোট 'আমি'গুলো ভ্রমে পড়িয়া আপনাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিমান মনে করিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতাকেই শাস্ত্র অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলেন।

ঐ বিরাট আমিত্বেরই নাম 'ভাবমুখ', কারণ সংসারের সকল প্রকার ভাবই উহাকে আশ্রয় করিয়া উদয় হইতেছে

নির্গুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এইরূপে যে বিরাট 'আমিত্ব'টা বর্তমান, উহাই 'ভাবমুখ'–কারণ উহা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হইতেছে। এই বিরাট আমিই জগজ্জননীর আমিত্ব বা ঈশ্বরের আমিত্ব। এই বিরাট আমিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন, অচিন্ত্যভেদাভেদস্বরূপ জ্যোতির্ঘনমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

পূর্ণ নির্বিকল্প এবং ঈষৎ সবিকল্প বা 'ভাবমুখ' অবস্থায় ঠাকুরের অনুভব ও দর্শন

ঠাকুরের আমিত্ব-জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হইতেছিল তখন এই বিরাট আমিত্বের গণ্ডির পারে অবস্থিত জগদম্বার নির্গুণ ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন–তখন ঐ 'বিরাট আমি' ও তাহার অনন্ত ভাবতরঙ্গ, যাহাকে আমরা জগৎ বলিতেছি, তাহার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব হইতেছিল না; আর যখন ঠাকুরের 'আমি'-জ্ঞানের ঈষৎ উন্মেষ হইতেছিল তখন তিনি দেখিতেছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাবের সহিত সংযুক্ত এই সগুণ বিরাট 'আমি' ও তদন্তর্গত ভাবতরঙ্গসমূহ। অথবা নির্গুণভাবে উঠিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অনুভবে ঐ একমেবাদ্বিতীয়মের ভিতর স্বগতভেদের অস্তিত্বও লোপ হইতেছিল; আর ঐ সগুণ বিরাট আমিত্বের যখন বোধ করিতেছিলেন, তখন দেখিতেছিলেন–যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যে নির্গুণ সেই সগুণ, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, যে সাপ স্থির ছিল সেই এখন চলিতেছে, অথবা যিনিই স্বরূপে নির্গুণ তিনিই আবার লীলায় সগুণ!

'ভাবমুখে থাক্'–কথার অর্থ

শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্গুণ-সগুণ উভয় ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পর ঠাকুর আদেশ পাইলেন 'ভাবমুখে থাক্'–অর্থাৎ আমিত্বের একেবারে লোপ করিয়া নির্গুণভাবে অবস্থান করিও না; কিন্তু যাহা হইতে যত প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট 'আমি'ই তুমি, তাঁহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাঁহার কার্যই তোমার কার্য–এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবনযাপন কর ও লোককল্যাণসাধন কর। অতএব 'ভাবমুখে' থাকার অর্থই হইতেছে–মনে সর্বতোভাবে, সকল সময় সকল অবস্থায় দেখা, ধারণা বা বোধ করা যে আমি সেই 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'। 'ভাবমুখ' অবস্থায় পৌঁছিলে, আমি অমুকের সন্তান,

অমুকের পিতা, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত কথা একেবারে মন হইতে ধুইয়া-পুঁছিয়া যায় এবং 'আমি সেই বিশ্বব্যাপী আমি' এই কথাটি সর্বদা মনে অনুভব হয়। ঠাকুর তাই আমাদের বার বার শিক্ষা দিতেন—"ওগো, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, ব্রাহ্মণ আমি, শূদ্র আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি—এ সব হচ্চে কাঁচা আমি; ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। ও সব ছেড়ে মনে করবে তাঁর (ভগবানের) দাস আমি, তাঁর ভক্ত আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। এই ভাবটি মনে পাকা করে রাখবে।" অথবা বলিতেন—"ওরে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর!"

সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-ভাব পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়

পাঠক হয়তো বলিবে, ঠাকুর কি তবে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন না? শ্রীশ্রীজগদম্বার মধ্যে স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া ঠাকুর যখন জগন্মাতার নির্গুণ সগুণ দুই ভাবে অবস্থান দেখিতেন, তখন তো বলিতে হইবে তিনি আচার্য শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ, যাহাতে জগতের অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় নাই, তাহা মানিতেন না? তাহা নহে! ঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকল ভাব বা মতই মানিতেন। তবে বলিতেন, ঐ তিন প্রকার মত মানবমনের উন্নতির অবস্থানুযায়ী পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। এক অবস্থায় দ্বৈতভাব আসে—তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ধর্মোন্নতির উচ্চতর সোপানে উঠিয়া অপর অবস্থায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আসে—তখন নিত্য নির্গুণ বস্তু লীলায় সতত সগুণ হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ হয়। তখন দ্বৈতবাদ তো মিথ্যা বোধ হয়ই, আবার অদ্বৈতবাদে যে সত্য নিহিত আছে তাহাও মনে উপলব্ধি হয় না। আর মানব যখন ধর্মোন্নতির শেষ সীমায় সাধনসহায়ে উপস্থিত হয় তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণরূপেই কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করে। তখন আমি-তুমি, জীব-জগৎ, ভক্তি-মুক্তি, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম—সব একাকার!

মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ক কথা

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর দাস্যভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ের উপলব্ধিটি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেন। বলিতেন—"শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজ দাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আমায় কি ভাবে দেখ, বা ভাবনা ও পূজা কর?' হনুমান তদুত্তরে বলেন, 'হে রাম, যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি অথবা আমি এই দেহটা এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি—তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি সেব্য, আমি সেবক; তুমি পূজ্য, আমি পূজক; যখন আমি মন বুদ্ধি ও আত্মাবিশিষ্ট জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি—তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধিমাত্ররহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি—তুমিও যাহা, আমিও তাহা—তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই।'"

অদ্বৈতভাব চিন্তা, কল্পনা ও বাক্যাতীত; যতক্ষণ বলা কহা আছে ততক্ষণ নিত্য ও লীলা, ঈশ্বরের উভয় ভাব লইয়া থাকিতেই হইবে

ঠাকুর বলিতেন, "যে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী সে চুপ হইয়া যায়! অদ্বৈতবাদ বলবার বিষয় নয়। বলতে-কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে, ভাবনা-কল্পনা যতক্ষণ ততক্ষণও ভিতরে দুটো—ততক্ষণও ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই। জগতে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু বা শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাবই কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।" অর্থাৎ মানবের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, অথবা মানব ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ ঐ ভাব মানবের মন-বুদ্ধির অতীত; বাক্যে তাহা কেমন করিয়া বলা বা বুঝানো যাইবে? অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে ঠাকুর সেজন্য বার বার বলিতেন, "ওরে, ওটা শেষকালের কথা।" অতএব দেখা যাইতেছে ঠাকুর বলিতেন, "যতক্ষণ 'আমি-তুমি' 'বলা-কহা' প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নির্গুণ-সগুণ, নিত্য ও লীলা—দুই ভাবই কার্যে মানিতে হইবে। ততক্ষণ

অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্যে, ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী থাকিতে হইবে।” ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও কতই না দৃষ্টান্ত দিতেন! বলিতেন –

ঐ বিষয়ে ঠাকুরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। যথা–গানের অনুলোম-বিলোম; বেল, থোড়, প্যাঁজের খোলা

“যেমন গানের অনুলোম-বিলোম–সা ঋ গা মা পা ধা নি সা করিয়া সুর তুলিয়া আবার সা নি ধা পা মা গা ঋ সা–করিয়া সুর নামানো। সমাধিতে অদ্বৈত-বোধটা অনুভব করিয়া আবার নিচে নামিয়া ‘আমি’-বোধটা লইয়া থাকা।

“যেমন বেলটা হাতে লইয়া বিচার করা যে, খোলা, বিচি, শাঁস–ইহার কোনটা বেল। প্রথম খোলাটাকে অসার বলিয়া ফেলিয়া দিলাম, বিচিগুলোকেও ঐরূপ করিলাম; আর শাঁসটুকু আলাদা করিয়া বলিলাম, এইটিই বেলের সার–এইটিই আদত বেল। তারপর আবার বিচার আসিল যে, যাহারই শাঁস তাহারই খোলা ও বিচি–খোলা, বিচি ও শাঁস সব একত্র করিয়াই বেলটা; সেই রকম নিত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তারপর বিচার–যে নিত্য সেই লীলায় জগৎ!

“যেমন থোড়খানার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে মাঝটায় পৌঁছুলুম আর সেটাকেই সার ভাবলুম। তারপর বিচার এল–খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল–দুই জড়িয়েই থোড়টা।

“যেমন প্যাঁজটা খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই থাকে না, সেই রকম কোনটা ‘আমি’ বিচার করে দেখতে গিয়ে শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয় করে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায়, ‘আমি’ বলে একটা আলাদা কিছুই নাই–সবই ‘তিনি’ ‘তিনি’ ‘তিনি’ (ঈশ্বর); যেমন গঙ্গার খানিকটা জল বেড়া দিয়ে ঘিরে বলা–এটা আমার গঙ্গা!”

যাক্, এখন ও-সকল কথা, আমরা পূর্বকথার অনুসরণ করি।

ভাবমুখ–নির্গুণ হইতে কয়েকপদ নিম্নে অবস্থিত থাকিলেও ঐ অবস্থায় অদ্বৈত বস্তুর বিশেষ অনুভব থাকে। ঐ অবস্থায় কিরূপ অনুভব হয়। ঠাকুরের দৃষ্টান্ত

ভাবমুখে থাকিয়া যখন বিশ্বব্যাপী আমিত্বের ঠিক ঠিক অনুভব হইত তখন ‘এক’ হইতে ‘বহু’র বিকাশ দেখিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাব হইতে কয়েক পদ নিচে বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে যে বিচরণ করিতেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু সে রাজ্যেও একের বিকাশ ও অনুভব এত অধিক যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহা করিতেছে, ভাবিতেছে, বলিতেছে, সেসকলই আমি করিতেছি, ভাবিতেছি, বলিতেছি বলিয়া ঠাকুরের ঠিক ঠিক মনে হইত! এই অবস্থার অল্প বা আভাসমাত্র অনুভবও অতি অদ্‌ভুত! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, একদিন ঘাসের উপর দিয়া একজন চলিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার বুকে বিষম আঘাত লাগিতেছে!–যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়াই সে যাইতেছে! বাস্তবিকই তখন তাঁহার বুকে রক্ত জমিয়া কালো দাগ হইয়া তিনি বেদনায় ছটফট করিয়াছিলেন।

বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে আরও নিম্নস্তরে নামিলে তবে ঈশ্বরের দাস, ভক্ত, সন্তান বা অংশ–‘আমি’–এইরূপ অনুভব হয়

ঐ অবস্থা হইতে মায়ার রাজ্যের আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যখন থাকিতেন, তখন ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস আমি, ভক্ত আমি, সন্তান আমি বা অংশ আমি–এই ভাবটি সর্বদা জাগরূক থাকিত। উহা হইতেও নিম্নে অবিদ্যা-মায়ার বা কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির রাজত্ব। সে রাজ্য ঠাকুর যত্নপূর্বক নিরন্তর অভ্যাস সহকারে ত্যাগ করায় তাঁহার মন তথায় আর কখনো নামিত না বা শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে নামিতে দিতেন না। ঠাকুর যেমন বলিতেন, “যে মার উপর একান্ত নির্ভর করেছে, মা তার পা বেতালে পড়তে দেন না।”

ঠাকুরের ‘কাঁচা আমি’টার এককালে নাশ হইয়া বিরাট ‘পাকা আমিত্বে’ অনেক কাল অবস্থিতি। ঐ অবস্থাতেই তাঁহাতে গুরুভাব প্রকাশ পাইত। অতএব দীনভাব ও গুরুভাব অবস্থানুসারে এক ব্যক্তিতে আসা অসম্ভব নহে

অতএব বুঝা যাইতেছে, নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঠাকুরের ভিতরের ছোট আমি বা কাঁচা আমিটার একেবারে লোপ হইয়াছিল। আর যে আমিত্বটুকু ছিল সেটি আপনাকে ‘বড় আমি’ বা ‘পাকা আমি’-টার সঙ্গে চিরসংযুক্ত দেখিত—কখনো আপনাকে দেখিত সেই বিশ্বব্যাপী আমিটার অঙ্গ বা অংশ, আবার কখনো তাহার নিকট নিকটতর নিকটতম দেশে উঠিয়া সেই বিশ্বব্যাপী ‘আমি’-তে লীন হইয়া যাইত। এই পথেই ঠাকুরের সকল মনের সকল ভাব আয়ত্তীভূত হইত। কারণ ঐ ‘বড় আমি’-কে আশ্রয় করিয়াই জগতে সকলের মনের যত প্রকার ভাব উঠিতেছে। ঠাকুর ঐ বিশ্বব্যাপী ‘আমি’-কে আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ থাকিতে পারিতেন বলিয়াই বিশ্বমনে যত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, সকলই ধরিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইতেন। ঐরূপ উচ্চাবস্থায় ‘ভগবানের অংশ আমি’, ঠাকুরের এ ভাবটিও ক্রমশঃ লীন হইয়া যাইত, এবং ‘বিশ্বব্যাপী আমি’ বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত! কাজেই ঠাকুরকে দেখিলে তখন আর ‘দীনের দীন’ বলিয়া বোধ হইত না। তখন ঠাকুরের চাল-চলন, অপরের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকলাপই অন্য আকার ধারণ করিত। তখন কল্পতরুর মতো হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “তুই কি চাস?”—যেন ভক্ত যাহা চাহেন তাহা তৎক্ষণাৎ অমানুষী শক্তিবলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ঐরূপ ভাবাপন্ন হইতে ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিয়াছি; আর দেখিয়াছি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি। সেদিন ঠাকুর ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া তৎকালে উপস্থিত সকল ভক্তদিগকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত বা সুপ্ত ধর্মভাবকে জাগ্রত করিয়া দেন! সে এক অপূর্ব কথা—এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

গুরুভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরে ধর্মশক্তি জাগ্রত করিয়া দিবার দৃষ্টান্ত—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ ১লা জানুয়ারির ঘটনা

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি, পৌষ মাস। কিঞ্চিদধিক দুই সপ্তাহ হইল ভক্তেরা শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শানুসারে ঠাকুরকে কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রানী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর বাগানবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন কলিকাতার বায়ু অপেক্ষা বাগান অঞ্চলের বায়ু নির্মল ও যতদূর সম্ভব নির্মল বায়ুতে থাকিলে ঠাকুরের গলরোগের উপশম হইতে পারে। বাগানে আসিবার কয়েকদিন পরেই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং লাইকোপোডিয়াম (২০০) ঔষধ প্রয়োগ করেন। উহাতে গলরোগটার কিছু উপকারও বোধ হয়। ঠাকুর কিন্তু এখানে আসা অবধি বাটীর দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নিচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই। আজ শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্নে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ভক্তদিগের আজ বিশেষ আনন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের তখন তীব্র বৈরাগ্য—সাংসারিক উন্নতিকামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বাস করিতেছেন ও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য নানাপ্রকার সাধন করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলে ধুনি বা অগ্নি জ্বালাইয়া ধ্যান, জপ, ভজন, পাঠ ইত্যাদিতেই থাকেন! অপর কয়েকজন ভক্তও, যথা—ছোট গোপাল, কালী (অভেদানন্দ) ইত্যাদি, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়ন প্রভৃতি করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করেন এবং আপনারাও যথাসাধ্য ধ্যান-ভজন করেন। গৃহী ভক্তেরা বিষয়-কর্মাদিতে নিযুক্ত থাকায় সর্বদা ঠাকুরের নিকটে থাকিতে পারেন না; সুবিধা পাইলেই আসা-যাওয়া করেন এবং যাঁহারা ঠাকুরের সেবায়

নিরন্তর ব্যাপৃত, তাঁহাদের আহারাদির সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন ও কখনো কখনো এক-আধ দিন থাকিয়াও যান। আর ইংরাজী বর্ষের প্রথম দিন বলিয়া ছুটি থাকায় অনেকেই কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইয়াছেন।

অপরাহ্ণ বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটি পিরান, লালপাড় বসান একখানি মোটা চাদর, কানঢাকা টুপি ও চটিজুতাটি পরিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের সহিত উপর হইতে ধীরে ধীরে নিচে নামিলেন এবং নিচেকার হলঘরটি দেখিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া বাগানের পথে বেড়াইতে চলিলেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুর ঐরূপে বেড়াইতে যাইতেছেন দেখিতে পাইয়া সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ বালক বা যুবক ভক্তেরা তখন সমস্ত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত থাকায় হলঘরের পাশে যে ছোট ঘরটি ছিল, তাহার ভিতর নিদ্রা যাইতেছেন। শ্রীযুত লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাঁহাদিগকে ঐরূপে যাইতে দেখিয়া ঠাকুরের সহিত স্বয়ং আর অধিক দূর যাওয়া অনাবশ্যক বুঝিয়া হলঘরের সম্মুখে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটির দক্ষিণপাড় পর্যন্ত আসিয়াই ফিরিলেন এবং অপর একজন যুবক ভক্তকে ডাকিয়া লইয়া ঠাকুর উপরে যে ঘরটিতে থাকেন সেটি ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিতে ও ঠাকুরের বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিতে ব্যাপৃত হইলেন।

গৃহী ভক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অনুরাগ। ঠাকুর কোন সময়ে তাঁহার অদ্ভুত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্য ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস! ইহার পর লোকে ওর অবস্থা দেখে অবাক হবে!" বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান–জীবোদ্ধারের জন্য কৃপায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুক্ষণ দেখিতেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তাঁহার ঐ ধারণা সকলের নিকট প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতেন। গিরিশও সেদিন বাগানে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীযুত রাম প্রমুখ অন্য কয়েকটি গৃহী ভক্তের সহিত একটি আমগাছের তলায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ প্রশস্ত পথটি দিয়া বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় মধ্যপথে আসিয়া পথের ধারে আমগাছের ছায়ায় শ্রীযুত রাম ও শ্রীযুত গিরিশকে দেখিতে পাইলেন এবং গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে অত কথা (আমি অবতার ইত্যাদি) যাকে তাকে বলে বেড়াও?"

সহসা ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও গিরিশের বিশ্বাস টলিল না। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাস্তার উপরে আসিয়া ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ব্যাস বাল্মীকি যাঁহার কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি!"

গিরিশের ঐরূপ অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং মন উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। গিরিশও তখন ঠাকুরের সেই দেবভাবে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া উল্লাসে চিৎকার করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া বার বার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ঐরূপ স্পর্শে ভক্তদিগের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভব

ইতোমধ্যে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় হাস্যমুখে উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক!" ভক্তেরা সে অভয়বাণী শুনিয়া তখন আনন্দে জয় জয় রব করিয়া কেহ প্রণাম, কেহ পুষ্পবর্ষণ এবং কেহ বা আসিয়া পদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি পদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর ঐরূপ অর্ধবাহ্যাবস্থায় তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া নিচের দিক হইতে উপরদিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য হোক!" দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকেও ঐরূপ করিলেন! তৃতীয় ব্যক্তিকেও

ঐরূপ! চতুর্থকেও ঐরূপ! এইরূপে সমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক-দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন! সে চিৎকার ও জয় রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন! এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ! ত্যাগী ভক্তেরা আসিতে আসিতেই ঠাকুরের সে অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আবার সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হইল। পরে গৃহী ভক্তদিগের অনেককে ঐ সময়ে কিরূপ অনুভব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, কাহারও সিদ্ধির নেশার মতো একটা নেশা ও আনন্দ–কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্তির জাজ্বল্য দর্শন–কাহারও ভিতরে পূর্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড়সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে, এইরূপ বোধ ও আনন্দ এবং কাহারও বা পূর্বে যাহা কখনো দেখেন নাই এরূপ একটা জ্যোতিঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল! দর্শনাদি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একটা অসাধারণ দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ–এ কথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের ভিতরের অমানুষী শক্তিবিশেষই যে বাহ্যস্পর্শ দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া প্রত্যেক ভক্তের ভিতর ঐরূপ অপূর্ব মানসিক অনুভব ও পরিবর্তন আনিয়া দিল, এ কথাটিও সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল। উপস্থিত ভক্তসকলের মধ্যে দুই জনকে কেবল ঠাকুর "এখন নয়" বলিয়া ঐরূপ স্পর্শ করেন নাই! এবং তাঁহারাই কেবল এ আনন্দের দিনে আপনাদিগকে হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।[2]

কখন কাহাকে কৃপায় ঠাকুর ঐ ভাবে স্পর্শ করিবেন তাহা বুঝা যাইত না

ইহা দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা গিয়াছিল যে, কখন কাহার প্রতি কৃপায় ঠাকুরের ভিতর দিয়া ঐ দিব্যশক্তির প্রকাশ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর নিজেও তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ।

'কাঁচা আমি'টার লোপ বা নাশেই গুরুভাব-প্রকাশের কথা সকল ধর্মশাস্ত্রে আছে

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে, কাঁচা বা ছোট আমিত্বটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগদম্বার শক্তিপ্রকাশের মহান যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন! এবং ঐ কাঁচা 'আমি'-টাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যথার্থ 'দীনের দীন' অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার লোকগুরু, জগদ্গুরু-ভাবটির এইরূপ অপূর্ব বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল! এইরূপে আমিত্বের লোপেই গুরুভাব বা গুরুশক্তির বিকাশ যেসকল ধর্মগত সকল অবতারপুরুষগণের জীবনেই উপস্থিত হইয়াছিল, জগতের ধর্মেতিহাস এ বিষয়ে চিরকাল সাক্ষ্য দিতেছে।

গুরুভাব মানবীয় ভাব নহে–সাক্ষাৎ জগদম্বার ভাব, মানবের শরীর ও মনকে যন্ত্র-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে ধর্মলাভ বা ঈশ্বরলাভ হয় না, একথা আমরা আবহমান কাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি।

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।'

–ইত্যাদি স্তুতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত মন্ত্রদীক্ষাদাতা গুরুর উদ্দেশে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি। অনেকে আবার বিদেশী শিক্ষার কুহকে পড়িয়া আপনাদের জাতীয় শিক্ষা ও ভাব বিসর্জন দিয়া মানববিশেষকে ঐরূপ বলা মহাপাপের ভিতর গণ্য করিয়া অনেক বাদানুবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই! কারণ কে-ই বা তখন বুঝে যে, কোন কোন মানব-শরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও গুরুভাবটি মানবীয় ভাবরাজ্যেরই অন্তর্গত নহে। কে-ই বা তখন জানে যে, শরীররক্ষার উপযোগী জলবায়ু, আহার প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় বস্তুসমস্তের ন্যায়, মায়াপাশে বদ্ধ ত্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জ্বালানিবারণ ও শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ংই ঐ ভাব ও শক্তিরূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, অহমিকাশূন্য মানবমনের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছেন? এবং কে-ই বা তখন ধারণা করে যে, যাহার মন যতটা পরিমাণে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে বা 'কাঁচা আমি'-টাকে ছাড়িতে পারে ততটা পরিমাণেই সে ঐ ভাব ও শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়! সাধারণ মানবমনে ঐ দিব্যভাবের যৎসামান্য 'ছিটে ফোঁটা' মাত্র প্রকাশ, তাই আমরা ততটা ধরিতে ছুঁইতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, যীশু প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব যুগাবতারসকলে এবং বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ দিব্যশক্তির ঐরূপ অপূর্ব লীলা যখন বহুভাগ্যফলে কাহারও নয়নপথে পতিত হয়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া থাকে যে, এ শক্তিপ্রকাশ মানবের নহে–সাক্ষাৎ ঈশ্বরের! তখনই ভবরোগগ্রস্ত পথভ্রান্ত জিজ্ঞাসু মানবের মোহ-মলিনতা দূরে অপসারিত হয় এবং সে বলিয়া উঠে, 'হে গুরু, তুমি কখনই মানুষ নও–তুমি তিনি!'

ঈশ্বর করুণায় ঐ ভাবাবলম্বনে মানব-মনের অজ্ঞান-মোহ দূর করেন। সেজন্য গুরুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি একই কথা

অতএব বুঝা যাইতেছে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে ভাবরূপে মানবমনের সকল প্রকার অজ্ঞান-মলিনতা দূর করেন, সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুরুশক্তি। ঐ ভাবকেই শাস্ত্র গুরু নামে নির্দেশ করিয়াছেন ও মানবকে উহার প্রতি মনের ষোল আনা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি, ভক্তি-শ্রদ্ধাদি সবেমাত্র শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ প্রকার মানব-মন তো আর একটা অশরীরী ভাবকে ধরিতে ছুঁইতে, ভালবাসিতে পারে না; এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, দীক্ষাদাতা মানবকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতে। সেজন্য যাঁহারা বলেন, আমরা গুরুভাবটিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু যে দেহটা আশ্রয় করিয়া ঐ ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাহাকে মান্য-ভক্তি কেন করিব–ঐ ভাব তো আর তাঁহার নহে? তাঁহাদিগকে আমরা বলি–'ভাই, করিতে পার কর, কিন্তু দেখিও যেন নিজের মনের জুয়াচুরিতে ঠকিতে না হয়; শক্তি বা ভাব এবং যদবলম্বনে ঐ ভাব প্রকাশিত থাকে তদুভয়কে কখনো তো পৃথক পৃথক থাকিতে দেখ নাই, তবে কেমন করিয়া আগুন ও আগুনের দাহিকাশক্তিকে পৃথক করিয়া একটিকে গ্রহণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে এবং অপরটিকে ত্যাগ করিবে, তাহা বলিতে পারি না!' যে যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে সে প্রেমাস্পদের ব্যবহৃত অতি সামান্য জিনিসটাকেও হৃদয়ে ধারণ করে। তাঁহার স্পৃষ্ট ফুলটা বা কাপড়-চোপড়খানাও সে পবিত্র বলিয়া বোধ করে। তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া যান, সেখানকার মাটিটাও তাহার কাছে বহু মূল্যবান ও বহু আদরের জিনিস বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি যে শরীরটাতে অবস্থান করিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করেন ও তাহাকে কৃপা করেন, সেটার প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তি হইবে–এটা কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? যাহারা গুরুভাবটি কি তাহাই বুঝে না, তাহারাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। আর যাহার গুরুভাবের প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি হইবে, তাহার ঐ ভাবের আধার গুরুর শরীরটার উপরেও ভক্তি-শ্রদ্ধার বিকাশ হইবেই হইবে। ঠাকুর এই বিষয়টি বিভীষণের ভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন। যথা –

গুরুভক্তি-বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ–বিভীষণের গুরুভক্তির কথা

শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলাসংবরণের অনেক কাল পরে কোন সময়ে নৌকাডুবি হইয়া একজন মানব লঙ্কার উপকূলে সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। বিভীষণ অমর, তিন কালই তিনি লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছেন–তাঁহার নিকট ঐ সংবাদ পৌঁছিল। সভাস্থ অনেক রাক্ষসের সুকোমল মানবদেহরূপ খাদ্যের আগমনসংবাদে জিহ্বায় জল আসিল। রাজা বিভীষণের কিন্তু ঐ সংবাদ শুনিয়া এক অপূর্ব ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি গলদশ্রুলোচনে ভক্তি-গদ-গদ বাক্যে বার বার বলিতে লাগিলেন, 'অহো ভাগ্য!' রাক্ষসেরা তাঁহার ভাব না বুঝিতে পারিয়া সকলে একেবারে অবাক! তৎপরে বিভীষণ তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'যে মানবশরীর আমার রামচন্দ্র ধারণ করিয়া লঙ্কায় পদার্পণ করেন ও আমাকে কৃতার্থ করেন, বহুকাল পরে আজ আবার সেই মানবশরীর দেখিতে পাইব–এ কি কম ভাগ্যের কথা! আমার মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্রই পুনরায় ঐরূপে আসিয়াছেন!' এই বলিয়া রাজা পাত্র-মিত্র সভাসদসকলকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু সম্মান ও আদর করিয়া উক্ত মানবকে প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। পরে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সপরিবারে অনুগত দাসভাবে তাহার সেবা ও বন্দনাদি করিতে লাগিলেন! এইরূপে কিছুকাল তাহাকে লঙ্কায় রাখিয়া নানা ধন-রত্ন উপহার দিয়া সজলনয়নে বিদায় দিলেন এবং অনুচরবর্গের দ্বারা বাটী পৌঁছাইয়া দিলেন।

ঠিক ঠিক ভক্তিতে অতি তুচ্ছ বিষয়েও ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। 'এই মাটিতে খোল হয়!'–বলিয়াই শ্রীচৈতন্যের ভাব

গল্পটি বলিয়া ঠাকুর আবার বলিতেন, "ঠিক ঠিক ভক্তি হলে এইরূপ হয়। সামান্য জিনিস হতেও তার ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয়ে ভাবে বিভোর হয়। শুনিসনি–'এই মাটিতে খোল হয়' বলে চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল? এক সময়ে এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে তিনি শুনলেন যে সেই গ্রামে হরিসংকীর্তনের সময় যে খোল বাজে লোকে সেই খোল তৈয়ার ও উহা বিক্রয় করে দিনপাত করে। শুনেই তিনি বলে উঠলেন, 'এই মাটিতে খোল হয়!'–বলেই ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন! কেন না, উদ্দীপনা হলো; 'এই মাটিতে খোল হয়, সেই খোল বাজিয়ে হরিনাম হয়, সেই হরি সকলের প্রাণের প্রাণ–সুন্দরের চাইতেও সুন্দর।'–একেবারে এত কথা মনে হয়ে হরিতে চিত্ত স্থির হয়ে গেল। সেই রকম যার গুরুভক্তি হয় তার গুরুর আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখলে তো গুরুর উদ্দীপনা হবেই, যে গ্রামে গুরুর বাড়ি সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেয়, খাওয়ায় দাওয়ায় সেবা করে! এই অবস্থা হলে গুরুর দোষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তখনই এ কথা বলা চলে –

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ি যায়।

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥' [3]

নইলে মানুষের তো দোষ-গুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু তখন আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে! যেমন ন্যাবা-লাগা চোখে সব হলুদবর্ণ দেখে–সেই রকম; তখন তার ভক্তি তাকে দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরই সব–তিনিই গুরু, পিতা, মাতা, মানুষ, গরু, জড়, চেতন সব হয়েছেন।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন একজন সরল উদ্ধত যুবক ভক্ত[4] ঠাকুর যে বিষয়টি তাঁহাকে বলিতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানা আপত্তিতর্ক উত্থাপিত করিতেছিল! ঠাকুর তিন চারি বার তাহাকে ঐ বিষয়টি বলিলেও যখন সে বিচার করিতে লাগিল তখন ঠাকুর তাহাকে সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন গো? আমি বলচি আর তুমি কথাটা নিচ্চ না!" যুবকের এইবার ভালবাসায়

হাত পড়িল। সে বলিল, "আপনি যখন বলছেন তখন নিলুম বই কি। আগেকার কথাগুলো তর্কের খাতিরে বলেছিলাম।"

অর্জুনের গুরুভক্তির কথা

ঠাকুর শুনিয়া প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বলবে তা তখনি দেখতে পাবে–সে ভক্তি ছিল অর্জুনের। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে রথে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ সখা, কেমন এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে।' অর্জুন অমনি দেখিয়া বলিলেন, 'হাঁ সখা, অতি সুন্দর পায়রা!' পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ আবার দেখিয়া বলিলেন, 'না সখা, ও তো পায়রা নয়!' অর্জুন দেখিয়া বলিলেন, 'তাই তো সখা, ও পায়রা নয়।' কথাটি এখন বোঝ–অর্জুন মহা সত্যনিষ্ঠ, তিনি তো আর কৃষ্ণের খোশামোদ করিয়া ঐরূপ বলিলেন না? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁর এত বিশ্বাস-ভক্তি যে, যেমন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনও তখন ঠিক ঠিক তা দেখতে পেলেন!"

ঈশ্বরীয় ভাবরূপে গুরু এক। তথাপি নিজ গুরুতে ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা চাই। ঐ বিষয়ে হনুমানের কথা

শাস্ত্র যাঁহাকে অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণসমর্থ গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পূর্বোক্তরূপে ঐশ্বরিক ভাববিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই–গুরু অনেক নহেন, এক। আধার বা যে যে শরীরাবলম্বনে ঈশ্বরের ঐ ভাব প্রকাশিত হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তোমার গুরু, আমার গুরু পৃথক নহেন–ভাবরূপে এক। মৃন্ময় মূর্তিতে দ্রোণকে আচার্যরূপে গ্রহণ ও ভক্তিপূর্বক একলব্যের ধনুর্বেদলাভরূপ মহাভারতীয় কথাটি ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথাটি যুক্তিতে দাঁড়াইলেও ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়া অনেক সময় ও সাধন-সাপেক্ষ এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেও যতক্ষণ মানবের নিজের দেহবোধ থাকে, ততক্ষণ যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরুশক্তি তাঁহাকে কৃপা করেন সেই শরীরাবলম্বনেই শ্রীগুরুর পূজা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর এই কথাটির দৃষ্টান্তে নিষ্ঠা-ভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন হনুমানের কথা আমাদিগকে বলিতেন। যথা –

লঙ্কাসমরে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ মহাবীর মেঘনাদ কর্তৃক কোন সময়ে নাগপাশে আবদ্ধ হন এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নাগকুলের চিরশত্রু গরুড়কে স্মরণ করিয়া আনয়ন করেন। গরুড়কে দেখিবামাত্র নাগকুল ভয়ত্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। রামচন্দ্রও নিজভক্ত গরুড়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গরুড়ের চিরকালপূজিত ইষ্টমূর্তি বিষ্ণুরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন–যিনি বিষ্ণু তিনিই তখন রামরূপে অবতীর্ণ! হনুমানের কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে ঐরূপে বিষ্ণুমূর্তি পরিগ্রহ করিতে দেখা ভাল লাগিল না এবং কতক্ষণে তিনি পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিবেন এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। হনুমানের ঐ প্রকার মনোভাব বুঝিতে রামচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। তিনি গরুড়কে বিদায় দিয়াই পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিয়া হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমার বিষ্ণুরূপ দেখিয়া তোমার ঐরূপ ভাবান্তর হইল কেন? তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার তো আর জানিতে ও বুঝিতে বাকি নাই যে, যে রাম সেই বিষ্ণু?" হনুমান তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "সত্য বটে, এক পরমাত্মাই উভয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেজন্য শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু তথাপি আমার প্রাণ সতত জানকীনাথেরই দর্শন চায়–কারণ তিনিই আমার সর্বস্ব! ঐ মূর্তির ভিতর দিয়াই আমি ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি –

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।

তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

সকল মানবেই গুরুভাব সুপ্তভাবে বিদ্যমান

এইরূপে গুরুভাবটি শ্রীশ্রীজগন্মাতার শক্তিবিশেষ ও সেই শক্তি সকল মানবমনেই সুপ্ত বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন যে, তখন ঐ শক্তি তাঁহার নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্বসকল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে। তখন সাধককে আর বাহিরের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্মবিষয়ক কোনরূপ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হয় না। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন –

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

– গীতা, ২/৫২

যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞান-মোহ হইতে বিমুক্ত হইবে তখন আর এটা শুনা উচিত, ওটা শাস্ত্রে আছে ইত্যাদি কথায় আর তোমার প্রয়োজন থাকিবে না, তুমি ঐ সকলের পারে চলিয়া যাইয়া আপনিই তখন সকল বুঝিতে পারিবে; সাধকের তখন ঐরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঠাকুরের কথা "শেষে মনই গুরু হয়"

ঠাকুর ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেন, "শেষে মনই গুরু হয় বা গুরুর কাজ করে। মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, (আর) জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।" কিন্তু সে মন আর এ মনে অনেক প্রভেদ। সে সময় মন শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের উচ্চ শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়, আর এ সময়ে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া ভোগসুখ ও কামক্রোধাদিতেই মাতিয়া থাকিতে চায়।

"গুরু যেন সখী"

ঠাকুর বলিতেন, "গুরু যেন সখী–যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয়, ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেইরূপ যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই। এইরূপে মহামহিমান্বিত শ্রীগুরু জিজ্ঞাসু ভক্তের হাত ধরিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবরাজ্যে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে তাহাকে ইষ্টমূর্তির সম্মুখে আনিয়া বলেন, 'ও শিষ্য, ঐ দেখ! ' ইহা বলিয়াই অন্তর্হিত হন।"

"গুরু শেষে ইষ্টে লয় হন; গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব–তিনে এক, একে তিন"

ঠাকুরকে একদিন ঐরূপ বলিতে শুনিয়া একজন অনুগত ভক্ত 'শ্রীগুরুর সহিত বিচ্ছেদ তবে তো একদিন অনিবার্য' ভাবিয়া ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন–"গুরু তখন কোথায় যান, মশাই?" ঠাকুর তদুত্তরে বলেন, "গুরু ইষ্টে লয় হন। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব–তিনে এক, একে তিন।"

[1] বাস্তবিকই তখন অধিক পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে যেমন নেশা হয়, তেমনি একটা নেশার ঘোর উপস্থিত হইত। কাহারও কাহারও পা-ও টলিতে দেখিয়াছি। ঠাকুরের নিজের তো কথাই ছিল না। ঐরূপ নেশার ঝোঁকে পা এমন টলিত যে, আমাদের কাহাকেও ধরিয়া তখন চলিতে হইত। লোকে মনে করিত, বিপরীত নেশা করিয়াছেন।

[2] পরে একদিন ঠাকুর ইঁহাদেরও ঐরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন।

[3] অর্থাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান বা ঈশ্বর।

[4] শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।

৩.৬. চতুর্থ অধ্যায়: গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

– গীতা, ৯।১১

বাল্যাবস্থা হইতেই গুরুভাবের পরিচয় ঠাকুরের জীবনে পাওয়া যায়

ঠাকুরের ভিতরে গুরুভাবের প্রকাশ বাল্যাবধিই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যৌবনে নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঐ ভাবের যে পূর্ণ বিকাশ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বাল্যাবধি তাঁহাতে ঐ ভাবের প্রকাশ বলাতে কেহ না মনে করেন, আমরা ঠাকুরকে বাড়াইবার জন্য কথাটি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। যথার্থ নিরপেক্ষভাবে যদি কেহ ঠাকুরের জীবন আলোচনা করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ঐ দোষে কখনই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। এ অদ্‌ভুত অলৌকিক জীবনের ঘটনাবলী যিনি যতদূর পারেন বিচার করিয়া দেখুন না কেন, দেখিবেন বিচারশক্তিই পরিশেষে হার মানিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে! আমাদের মনও বড় কম সন্দিগ্ধ ছিল না; আমাদের ভিতরের অনেকেই ঠাকুরকে যে ভাবে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়াছেন ঐরূপ করিতে এখনকার কাহারও মন-বুদ্ধিতে উঠিবেই না বলিয়া আমাদের বোধ হয়। ঐরূপে ঠাকুরকে সন্দেহ করা এবং পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজেই পরাজিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হওয়া আমাদের ভিতর কতবার কত লোকেরই ভাগ্যে যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। 'লীলাপ্রসঙ্গে' ঐ বিষয়ের আভাস আমরা পূর্বেই পাঠককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছি, পরে আরও অনেক দিতে হইবে। পাঠক তখন নিজেই বুঝিয়া লইবেন; এজন্য এ বিষয়ে এখন আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

"আগে ফল, তারপর ফুল।" সকল অবতারপুরুষের জীবনেই ঐ ভাব

"আগে ফল, তারপর ফুল—যেমন লাউ-কুমড়ার"—ঠাকুর এ কথাটি নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটিদের জীবনপ্রসঙ্গে সর্বদাই ব্যবহার করিতেন। অর্থ—ঐরূপ পুরুষেরা জগতে আসিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন করেন, তাহা কেবল ইতর-সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যে, ঐ বিষয়ে ঐরূপ ফললাভ করিতে হইলে এইরূপ চেষ্টা তাহাদের করিতে হইবে। কারণ ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহারা এতটা চেষ্টা জীবনে দেখান, সেই জ্ঞান আজীবন থাকিলে সকল কার্য যেরূপভাবে করা যায়, ঐসকল পুরুষেরা বাল্যাবধি ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই সর্বত্রই সকল বিষয়ে করিয়া আসিয়াছেন। যেন ঐ জ্ঞানলাভ করিবার ফল তাঁহারা পূর্ব হইতেই নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন। নিত্যমুক্তদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা সত্য, তখন ঈশ্বরাবতারদের তো কথাই নাই। তাঁহাদের জীবনে ঐরূপ জ্ঞানের প্রকাশ আজীবনই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের সকল যুগের ঈশ্বরাবতারদের সম্বন্ধেই শাস্ত্র একথা সত্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঈশ্বরাবতারদিগের অনেক ব্যবহারের মধ্যে একটা সৌসাদৃশ্য আছে। যথা—স্পর্শদ্বারা ধর্মজীবন-সঞ্চারের কথা যীশু, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জীবনেই দেখিতে পাই। ঐরূপ, তাঁহাদের জন্মগ্রহণকালে বিশেষ বিশেষ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ঐ বিষয় অলৌকিক উপায়ে জ্ঞাত হইবার কথা, বাল্যাবধি তাঁহাদের ভিতর গুরুভাব প্রকাশিত থাকিবার কথা, তাঁহারা যে মানবসাধারণকে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ দেখাইতে কৃপায় অবতীর্ণ, এ বিষয়টি বাল্যাবধি উপলব্ধি করিবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঠাকুরের জীবনে বাল্যাবধি গুরুভাব প্রভৃতির প্রকাশ থাকার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কারণ 'অবতার'-পুরুষদিগের থাক বা শ্রেণীই একটা পৃথক। সাধারণ মানবের জীবনে

ঐরূপ ঘটনা কখনও সম্ভবে না বলিয়া অবতারপুরুষদিগের জীবনেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভব মনে করিলে বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে।

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথমবিকাশ–কামারপুকুরে

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাই তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুরে। তাঁহার তখন উপনয়ন হইয়া গিয়াছে; অতএব বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে।

লাহাবাবুদের বাটীতে পণ্ডিত-সভায় শাস্ত্র-বিচার

গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের নিমন্ত্রণ হয় এবং অনেক পণ্ডিতের একত্র সমাবেশ হইলে যাহা হইয়া থাকে–খুব তর্কের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। অনেক তর্কেও শাস্ত্রীয় প্রশ্নবিশেষের কোনরূপ মীমাংসা হইতেছিল না, এমন সময়ে বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাধর পরিচিত জনৈক পণ্ডিতকে বলেন, "কথাটার এই ভাবে মীমাংসা হয় না কি?" সভায় পল্লীর অনেক বালকই কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিল এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া পণ্ডিতদিগের উচ্চরবে বাগ্যুদ্ধটার বিন্দুমাত্র অর্থবোধ না হওয়ায় কেহ বা উহাকে একটা রঙ্গরসের মধ্যে ভাবিয়া হাসিতেছিল, কেহ বা বিরক্ত হইয়া পণ্ডিতদিগের অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করিয়া সোরগোল করিতেছিল, আবার কেহ বা একেবারে অন্যমনা হইয়া আপনাদের ক্রীড়াতেই মন দিয়াছিল। কাজেই এ অপূর্ব বালক যে পণ্ডিতদিগের সকল কথা ধৈর্যসহকারে শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে এবং মনে ভাবিয়া একটা সুমীমাংসায় উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পণ্ডিতটি প্রথম অবাক হইলেন; তাহার পর নিজের পরিচিত পণ্ডিতদের নিকট গদাধরের মীমাংসার কথা বলিতে লাগিলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলে উহাই ঐ বিষয়ের একমাত্র মীমাংসা বুঝিয়া অপরাপর সকল পণ্ডিতকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। তখন ঐ প্রশ্নের উহাই যে একমাত্র সমাধান তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এবং কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ অপূর্ব সমাধান প্রথম দেখিতে পাইল, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং যখন নিশ্চিত জানিতে পারিলেন, উহা বালক গদাধরই করিয়াছে, তখন কেহ বা স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া বালককে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভাবিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, আবার কেহ বা আনন্দপূরিত হইয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন!

ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা। জেরুজালেমের য়্যাভে-মন্দির

কথাটির আর একটু আলোচনা আবশ্যক। ক্রিশ্চান ধর্ম-প্রবর্তক ভগবদবতার ঈশার জীবনেও ঠিক এইরূপ একটি কথা বাইবেলে[1] লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবর্ষ। তাঁহার দরিদ্র ধর্মপরায়ণ পিতামাতা ইয়ুসুফ ও মেরি সে বৎসর তাঁহাকে লইয়া অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পদব্রজে নিজেদের বাসভূমি গ্যালিলি প্রদেশস্থ নাজারেথ্ নামক গণ্ডগ্রাম হইতে জেরুজালেম তীর্থের সুবিখ্যাত মন্দিরে দেবদর্শন ও পূজা বলি ইত্যাদি দিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। ইহুদিদিগের এই তীর্থ হিন্দুদিগের তীর্থসকলের ন্যায়ই ছিল। এখানে সুবর্ণকৌটায় য়াভে দেবতার আবির্ভাব ভক্ত-সাধক প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত; এবং উহার সম্মুখে একটি বেদীর উপর ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া পত্র-পুষ্প-ফল-মূল ও মেষ পায়রা প্রভৃতি পশু-পক্ষ্যাদি বলি দিয়া উক্ত দেবতার পূজা করিত। হিন্দুদিগের ৺কামাখ্যা পীঠ ও ৺বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি তীর্থে অদ্যাপি পায়রা প্রভৃতি পক্ষী বলি দেওয়া এখনো প্রচলিত।

সেকালের ইহুদী তীর্থযাত্রী

ইয়ুসুফ ও মেরি শাস্ত্রানুসারে দর্শন, পূজা, বলি ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত নিজ গ্রামাভিমুখে ফিরিলেন। সে সময়ে নানা দিগ্‌দেশ হইতে জেরুজালেমদর্শনে আগত যাত্রীদিগের অবস্থা অনেকটা, রেল হইবার পূর্বে পদব্রজে ৺পুরী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে অগ্রসর

যাত্রীদিগের মতোই ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-কূপ-তড়াগাদিশোভিত একই প্রকার দীর্ঘ পথ, সেই মধ্যে মধ্যে বিশ্রামস্থান, চটী বা সরাই–ধর্মশালারও অভাব ছিল না শুনা যায়–সেই তীর্থযাত্রীর সহচর পাণ্ডা, সেই চাল-ডাল-আটা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যাদিদ্রব্য-প্রাপ্তিস্থান মুদির দোকান, সেই ধূলা, সেই ধর্মভাববিস্মরণকারী নিদ্রালস্যের বৈরী যাত্রীদিগের পরমবন্ধু মশককুল, সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রিবর্গের দস্যু-তস্করাদি হইতে পরস্পরের সাহায্যলাভ করিতে পারিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া গমন এবং পরিশেষে সেই যাত্রীদিগের একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তি।

য়্যাভে-মন্দিরে ঈশার শাস্ত্রব্যাখ্যা

ঈশার পিতা-মাতা আপন দলের সহিত প্রত্যাবর্তনের সময় ঈশাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, বোধ হয় অপর কোন যাত্রীবালকের সহিত দলের পশ্চাতে আসিতেছে। কিন্তু অনেক দূর চলিয়া আসিয়াও যখন ঈশাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ভাবিত হইয়া তন্নতন্ন করিয়া দলমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন ঈশা তাঁহাদের সঙ্গে নাই। কাজেই ব্যাকুল হইয়া পুনরায় জেরুজালেম-অভিমুখে ফিরিলেন। সেখানে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন বালক ঈশা শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের ভিতর বসিয়া শাস্ত্রবিচার করিতেছে এবং শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নসকলের (যাহা পণ্ডিতেরাও সমাধান করিতে পারিতেছেন না) অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে।

পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত খণ্ডন

পণ্ডিত মোক্ষমূলর তৎকৃত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বাল্যলীলার সহিত ঈশার বাল্যলীলার সৌসাদৃশ্য পাইয়া ঐ বিষয়ের সত্যতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, একটু কটাক্ষ করিয়াও বলিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরাজীবিদ্যাভিজ্ঞ শিষ্যেরা গুরুর মান বাড়াইবার জন্য ঈশার বাল্যলীলার কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত ঐরূপে আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও আমরা নাচার, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ঐরূপ বাল্যলীলার কথা আমরা ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরও কখনো কখনো ঐ বিষয় আমাদের কাহারও কাহারও নিকট নিজমুখে বলিয়াছেন। এই পর্যন্ত বলিয়াই এখানে ক্ষান্ত থাকা ভাল।

ঠাকুর বিবাহ করিলেন কেন? আত্মীয়দিগের অনুরোধে?—না

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিতে যাইয়া সকলেরই মনে হয়–ঠাকুর বিবাহিত হইলেন কেন? স্ত্রীর সহিত যাঁহার কোনকালেই শরীরসম্বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প ছিল না, তিনি কেন বিবাহ করিলেন, ইহার কারণ বাস্তবিকই খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যদি বল, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই ঠাকুর 'ভগবান' 'ভগবান' করিয়া উন্মাদপ্রায় হইলেন বলিয়াই আত্মীয়েরা জোর করিয়া বিবাহ দিলেন, তদুত্তরে আমরা বলি ওটা একটা কথাই নয়। জোর করিয়া একটা ছোট কাজও তাঁহাকে বাল্যাবধি কেহ করাইতে পারে নাই। যখন যাহা করিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা কোন না কোনও উপায়ে নিশ্চিত সাধিত করিয়াছেন। উপনয়নকালে ধনী নাম্নী জনৈকা কামারজাতীয়া কন্যাকে ভিক্ষামাতা করাতেই দেখ না। কামারপুকুরে কলিকাতার ন্যায় সমাজবন্ধন শিথিল ছিল না যে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে; ঠাকুরের পিতামাতাও কম স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন না, বংশগত প্রথাও ছিল–কোন না কোনও ব্রাহ্মণকন্যাকে ভিক্ষামাতারূপে নির্দিষ্ট করা এবং বালক গদাধরের অভিভাবকদিগের সকলেই বালকের কামারকন্যার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তথাপি কেবলমাত্র গদাধরের নির্বন্ধে ধনীর ভিক্ষামাতা হওয়া সাব্যস্ত হইল–ইহা একটি কম আশ্চর্যের বিষয় নহে! এইরূপে সকল ঘটনায় যখন দেখিতে পাই, ঠাকুরের ইচ্ছা ও কথাই সকল বিষয়ে

অপর সকলের বিপরীত ভাব ও ইচ্ছাকে চিরকাল ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলি তাঁহার জীবনের অত বড় ঘটনাটা আত্মীয়দিগের ইচ্ছা ও অনুরোধের জোরে হইয়াছে?

ভোগবাসনা ছিল বলিয়া?—না

আবার, যদি বল ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে সর্বস্বত্যাগের ভাবটা যে ঠাকুরের আজীবন ছিল, এ কথাটা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ঐ কথাটা স্বীকার না করিয়া যদি বল যে, মানবসাধারণের ন্যায় ঠাকুরেরও বিবাহাদি করিয়া সংসারসুখভোগ করিবার ইচ্ছাটা প্রথম প্রথম ছিল, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার মনের গতির হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তন আসিয়া পড়িল; সংসার-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা তাঁহার প্রাণে বহিয়া তাঁহাকে এমন আত্মহারা করিয়া ফেলিল যে, তাঁহার পূর্বেকার বাসনাসমূহ একেবারে চিরকালের মতো কোথায় উড়িয়া যাইল। ঠাকুরের বিবাহটা ঐ বিরাগ-অনুরাগের ঝড়টা বহিবার আগেই হইয়াছিল বলিলেই তো সকল কথা মিটিয়া যায়! আমরা বলি—কথাটি আপাততঃ বেশ যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় আপত্তি আছে। প্রথম—চব্বিশ বৎসর বয়সে ঠাকুরের বিবাহ হয়, তখন বৈরাগ্যের ঝড় তাঁহার প্রাণে তুমুল বহিতেছে। আর, আজীবন যিনি নিজের জন্য কাহাকেও এতটুকু কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হইতেন, তিনি যে কিছুমাত্র না ভাবিয়া একজন পরের মেয়ের চিরকাল দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা বুঝিয়াও ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন, ইহা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়—ঠাকুরের জীবনের কোন ঘটনাই যে নিরর্থক হয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি। তৃতীয়—তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত; কারণ বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধানকালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বলিয়া দেন যে, তাঁহার বিবাহ জয়রামবাটীনিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইবে—ইহা পূর্ব হইতে স্থির আছে।

বিবাহের পাত্রী-অন্বেষণের সময় ঠাকুরের কথা—"কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখ্ গে যা।" অতএব স্বেচ্ছায় বিবাহ করা

কথাটি শুনিয়া পাঠক অবাক হইবে, অথবা অবিশ্বাস করিয়া বলিবে—"কেবলই অদ্ভুত কথার অবতারণা! বিংশ শতাব্দীতে ও-সকল কথা কি চলে?" তদুত্তরে আমাদের বলিতে হয়, "তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর বাপু, কিন্তু ঘটনা বাস্তবিকই ঐরূপ হইয়াছিল। এখনও অনেকে বাঁচিয়া আছেন যাঁহারা ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখই না কেন?" পাত্রীর অন্বেষণে যখন কোনটিই আত্মীয়দিগের মনোমতো হইতেছিল না, তখন ঠাকুর স্বয়ং বলিয়া দেন "অমুক গাঁয়ের অমুকের মেয়েটি কুটো বেঁধে[2] রাখা আছে, দেখগে যা!" অতএব বুঝাই যাইতেছে ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহ হইবে এবং কোথায় কাহার কন্যার সহিত হইবে। তিনি তাহাতে কোন আপত্তিও করেন নাই। অবশ্য ঐরূপ জানিতে পারা তাঁহার ভাবসমাধিকালেই হইয়াছিল।

প্রারব্ধ কর্ম-ভোগের জন্যই কি ঠাকুরের বিবাহ?

তবে ঠাকুরের বিবাহ হইবার অর্থ কি? শাস্ত্রজ্ঞ কোন পাঠক এইবার হয়তো বিরক্ত হইয়া বলিবেন—তুমি তো বড় অর্বাচীন হে! সামান্য কথাটা লইয়া এত গোল করিতেছ? শাস্ত্র-টাস্ত্র একটু-আধটু দেখিয়া সাধু-মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা লিখিতে কলম ধরিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—ঈশ্বরদর্শন বা পূর্ণজ্ঞান হইলে জীবের সঞ্চিত ও আগামী কর্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ভোগ জীবকে জ্ঞানলাভ হইলেও এই দেহে করিতে হয়। একটা ব্যাধের পিঠে-বাঁধা তূণে কতকগুলি তীর রহিয়াছে, হাতে একটি তীর এখনি ছুঁড়িবে বলিয়া লইয়াছে, আর একটি তীর বৃক্ষোপরি একটি পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া সে এইমাত্র ছুঁড়িয়াছে। এমন সময় ধর, ব্যাধের মনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হইয়া সে ভাবিল আর হিংসা করিবে না। হাতের তীরটি সে ফেলিয়া দিল, পিঠের তীরগুলিও

ঐরূপে ত্যাগ করিল, কিন্তু যে তীরটি সে পাখিটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল সেটাকে কি আর ফিরাইতে পারে? পিঠের তীরগুলি যেন তাহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম, আর হাতের তীরটি আগামী কর্ম বা যে কর্মসকলের ফল সে এইবার ভোগ করিবে—ঐ উভয় কর্মগুলি জ্ঞানলাভে নাশ হয়। কিন্তু তাহার প্রারব্ধ কর্মগুলি হইতেছে—যে তীরটি সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার মতো, তাহাদের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় মহাপুরুষেরা কেবল প্রারব্ধ কর্মসকলের ভোগই শরীরে করিয়া থাকেন। ঐ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; এবং তাঁহারা বুঝিতে বা জানিতেও পারেন যে, তাঁহাদের প্রারব্ধ অনুসারে তাঁহাদের জীবনে কিরূপ ঘটনাবলী আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপে নিজ বিবাহ কোন্ পাত্রীর সহিত কোথায় হইবে, তাহা বলিয়া দেওয়াটা কিছু বিচিত্র নহে।

না—যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের প্রারব্ধ ভোগ করা-না-করা ইচ্ছাধীন

ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি—অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে যথার্থজ্ঞানী পুরুষকে প্রারব্ধ কর্মসকলেরও ফলভোগ করিতে হয় না। কারণ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবে যে মন, সে মন যে তিনি চিরকালের নিমিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন—তাহাতে আর সুখ-দুঃখাদির স্থান কোথা? তবে যদি বল—তাঁহার শরীরটায় প্রারব্ধ ভোগ হয়, তাহাই বা কিরূপে হইবে? তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া অল্পমাত্র আমিত্ব কোন বিশেষ কারণে—যথা, পরোপকারাদির নিমিত্ত—রাখিয়া দেন, তবেই তাঁহার আবার শরীরমনের উপলব্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়। অতএব যথার্থজ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা হইলে প্রারব্ধ ভোগ বা ত্যাগ করিতে পারেন; তাঁহাদের ঐরূপ ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্যই তাঁহাদিগকে ‘লোকজিৎ’, ‘মৃত্যুঞ্জয়’, ‘সর্বজ্ঞ’ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

ঠাকুরের তো কথাই নাই; কারণ তাঁহার কথা—“যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ”

আর এক কথা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের অনুভব যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আর জ্ঞানী পুরুষ বলা চলে না; ঐ শ্রেণীমধ্যেই তাঁহাকে আর স্থান দিতে পারা যায় না। কেন না, তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি, “যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ”, অর্থাৎ যিনি পূর্বে রামরূপে এবং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে বর্তমান থাকিয়া অপূর্ব লীলার বিস্তার করিতেছেন! কথাটি বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ঈশ্বরাবতার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর ঐরূপ করিলে, তাঁহাকে প্রারব্ধাদি কোন কর্মেরই বশীভূত আর বলা চলে না। অতএব ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে অন্যপ্রকার মীমাংসাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং তাহাই এখানে বলিব।

বিবাহের কথা লইয়া ঠাকুরের রঙ্গরস

বিবাহের কথা আমাদের নিকট উত্থাপন করিয়া ঠাকুর অনেক সময় রঙ্গরসও করিতেন। উহাও বড় মধুর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে বসিয়াছেন; নিকটে শ্রীযুত বলরাম বসু ও অন্যান্য কয়েকটি ভক্ত বসিয়া তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন। সেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কামারপুকুরে যাত্রা করিয়াছেন কয়েক মাসের জন্য, কারণ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহ।

ঠাকুর—(বলরামবাবুকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হলো বল দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্য হলো? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই—আবার স্ত্রী কেন?

বলরাম ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর–ওঃ বুঝেছি; (থাল হইতে একটু ব্যঞ্জন তুলিয়া ও বলরামকে দেখাইয়া) এই–এর জন্যে হয়েছে। নইলে কে আর এমন করে রেঁধে দিত বল? (বলরামবাবু প্রভৃতি ভক্তগণের হাস্য) হাঁ গো, কে আর এমন করে খাওয়াটা দেখত। ওরা সব আজ চলে গেল–(ভক্তেরা কে চলিয়া গেল বুঝিতে না পারায়) রামলালের খুড়ী গো; রামলালের বিয়ে হবে–তাই সব কামারপুকুরে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কিছুই মনে হলো না! সত্যি বলছি; যেন কে তো কে গেল! কিন্তু তারপর কে রেঁধে দেবে বলে ভাবনা হলো। কি জান?—সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও থাকে না। ও (শ্রীশ্রীমা) বোঝে কি রকম খাওয়া সয়; এটা ওটা করে দেয়; তাই মনে হলো–কে করে দেবে!

দশ-প্রকারের সংস্কার পূর্ণ করিবার জন্যই সাধারণ আচার্যদিগের বিবাহ করা। ঠাকুরের বিবাহও কি সেজন্য?—না

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন, "বিয়ে করতে কেন হয় জানিস? ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে–বিবাহ তারই মধ্যে একটা। ঐ দশ রকম সংস্কার হলে তবে আচার্য হওয়া যায়।" আবার কখনো কখনো বলিতেন, "যে পরমহংস হয়, পূর্ণ জ্ঞানী হয়, সে হাড়ী-মেথরের অবস্থা থেকে রাজা, মহারাজা, সম্রাটের অবস্থা পর্যন্ত সব ভুগে দেখে এসেছে। নইলে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য আসবে কেন? যেটা দেখেনি (ভোগ করেনি), মন সেইটে দেখতে চাইবে ও চঞ্চল হবে–বুঝলে? ঘুঁটিটা সব ঘর ঘুরে তবে চিকে ওঠে–খেলার সময় দেখনি? সেই রকম।"

ধর্মাবিরুদ্ধ ভোগসহায়ে ত্যাগে পৌঁছাইবার জন্যই হিন্দুর বিবাহ

সাধারণ গুরুদিগের বিবাহ করিবার ঐরূপ কারণ ঠাকুর নির্দেশ করিলেও, ঠাকুরের নিজের বিবাহের বিশেষ কারণ যাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন বলিব। বিবাহটা ভোগের জন্য নয়–একথা শাস্ত্র আমাদের প্রতি পদে শিক্ষা দিতেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষারূপ নিয়ম-প্রতিপালন ও গুণবান পুত্র উৎপাদন করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করাই হিন্দুর বিবাহরূপ কর্মটার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত–শাস্ত্র বার বার এই কথাই আমাদের বলিয়া দিতেছেন। তবে কি উহাতে তাহার নিজ স্বার্থ কিছুমাত্র থাকিবে না–শাস্ত্র এইরূপ অসম্ভব কথা বলেন? না, তাহা নহে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ দুর্বল মানবচরিত্রের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে দুর্বল মানব স্বার্থ ভিন্ন এ জগতে আর কোন কথাই বুঝে না; লাভ-লোকসান না খতাইয়া অতি সামান্য কার্যেও অগ্রসর হয় না। শাস্ত্রকার ঐ কথা বুঝিয়াও যে পূর্বোক্ত আদেশ করিয়াছেন তাহার কারণ–তিনি এ কথাও বুঝিয়াছেন যে, ঐ স্বার্থটাকে যদি একটা মহান উদ্দেশ্যের সহিত সর্বদা জড়িত রাখিতে পারে তবেই মঙ্গল; নতুবা মানবকে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইবে। নিজের নিত্য-মুক্ত আত্মস্বরূপ ভুলিয়াই মানব ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যজগতের রূপরসাদি ভোগের নিমিত্ত ছুটিতেছে; আর, মনে করিতেছে–ঐসকল বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম!

বিচার-সংযুক্ত ভোগ করিতে করিতে কালে বোধ হয়–'দুঃখের মুকুট পরিয়া সুখ আসে'

কিন্তু জগতের প্রত্যেক সুখটাই যে দুঃখের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সুখটা ভোগ করিতে গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটাও লইতে হইবে–এ কথা কয়টা লোক ধরিতে বা বুঝিতে পারে? শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীজী বলিতেন, "দুঃখের মুকুট মাথায় পরে সুখ এসে মানুষের কাছে দাঁড়ায়"–মানুষ তখন সুখকে লইয়াই ব্যস্ত! তাহার মাথায় যে দুঃখের মুকুট, উহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিণামে যে দুঃখটাকেও লইতে হইবে–এ কথা তখন সে আর ভাবিবার অবসর পায় না! শাস্ত্র সেজন্য তাহাকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, 'ওরে, সুখলাভটাই নিজের স্বার্থ–এ কথা মনে করিস কেন? সুখ বা দুঃখের একটা লইতে গেলে যে অপরটাকেও লইতে

হইবে! স্বার্থটাকে একটু উচ্চ সুরে বাঁধিয়া ভাব না যে, সুখটাও আমার শিক্ষক, দুঃখটাও আমার শিক্ষক; আর যাহাতে ঐ দুয়ের হস্ত হইতে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্রাণ পাওয়া যায়–তাহাই আমার স্বার্থ বা জীবনের উদ্দেশ্য'। অতএব বুঝা যাইতেছে–বিবাহিত জীবনে বিচারসংযুক্ত ভোগের দ্বারা এবং সুখদুঃখপূর্ণ নানা অবশ্যম্ভাবী অবস্থার অনুভবের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর সংসারের সকল আপাতসুখের উপর বিরক্ত হইয়া যাহাতে জীব ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ হয় এবং তাঁহাকেই সারাৎসার জানিয়া তাঁহার দর্শনলাভের দিকে মহোৎসাহে অগ্রসর হয়, ইহা শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য।

ভোগসুখ ত্যাগ করিতে করিতে মনকে কি ভাবে বুঝাইতে হয়, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ

বিচার করিতে করিতে সংসারের কোন বিষয়টা ভোগ করিতে যাইলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ করিবে এ কথা নিশ্চিত; এজন্যই ঠাকুর বলিতেন, "ওরে, সদসদ্বিচার চাই। সর্বদা বিচার করে মনকে বলতে হয় যে, মন তুমি এই জিনিসটা ভোগ করবে, এটা খাবে, ওটা পরবে বলে ব্যস্ত হচ্ছ–কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু পটল চাল ডাল ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে; যে পঞ্চভূতের হাড়-মাংস রক্ত-মজ্জায় নারীর সুন্দর শরীর হয়েছে, তাহাতেই আবার তোমার, সকল মানুষের ও গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীরও শরীর হয়েছে; তবে কেন ওগুলো পাবার জন্য এত হাঁই-ফাঁই কর? ওতে তো আর সচ্চিদানন্দলাভ হবে না! তাতেও যদি না মানে তো বিচার করতে করতে দু-একবার ভোগ করে সেটাকে ত্যাগ করতে হয়। যেমন ধর, রসগোল্লা খাবে বলে মন ভারি ধরেছে, কিছুতেই আর বাগ মানচে না–যত বিচার করচ সব যেন ভেসে যাচ্চে; তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে এগাল ওগাল করে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে বলবি–মন, এরই নাম রসগোল্লা; এ-ও আলু-পটলের মতো পঞ্চভূতের বিকারে তৈয়ারি হয়েছে; এ-ও খেলে শরীরে গিয়ে রক্ত-মাংস-মল-মূত্র হবে; যতক্ষণ গালে আছে ততক্ষণই এটা মিষ্টি–গলার নিচে নাবলে আর ঐ আস্বাদের কথা মনে থাকবে না, আবার বেশি খাও তো অসুখ হবে; এর জন্য এত লালায়িত হও! ছি ছি!–এই খেলে, আর খেতে চেও না। (সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) সামান্য সামান্য বিষয়গুলো এই রকম করে বিচারবুদ্ধি নিয়ে ভোগ করে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু বড় বড়গুলোতে ও রকম করা চলে না, ভোগ করতে গেলেই বন্ধনে পড়ে যেতে হয়। সেজন্য বড় বড় বাসনাগুলোকে বিচার করে, তাতে দোষ দেখে, মন থেকে তাড়াতে হয়।"

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যপালন করিবার প্রথার উচ্ছেদ হওয়াতেই হিন্দুর বর্তমান জাতীয় অবনতি

শাস্ত্র বিবাহের ঐরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য উপদেশ করিলেও কয়টা লোকের মনে সে কথা আজকাল স্থান পায়? কয়জন বিবাহিত জীবনে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া আপনাদিগকে এবং জনসমাজকে ধন্য করিয়া থাকেন? কয়জন স্ত্রী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লোকহিতকর উচ্চব্রতে–ঈশ্বরলাভের কথা দূরে থাকুক–প্রেরণা দিয়া থাকেন? কয়জন পুরুষই বা 'ত্যাগই জীবনের উদ্দেশ্য' জানিয়া স্ত্রীকে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন? হায় ভারত! পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জড়বাদ ধীরে ধীরে তোমার অস্থি-মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে কি মেরুদণ্ডহীন পশুবিশেষে পরিণত করিয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! সাধে কি আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সন্ন্যাসি-ভক্তদিগকে বর্তমান বিবাহিত জীবনে দোষ দেখাইয়া বলিতেন, "ওরে, (ভোগটাকে সর্বস্বজ্ঞান বা জীবনের উদ্দেশ্য করাই যদি দোষ হয়, তবে বিবাহের সময়) একটা ফুল ফেলে সেটা করলেই কি শুদ্ধ হয়ে গেল–তার দোষ কেটে গেল?" বাস্তবিক বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়পরতা আর কখনো ভারতে এত প্রবল হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন বিবাহের যে অপর একটা মহাপবিত্র, মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে–একথা আমরা আজকাল একপ্রকার ভুলিয়াই

গিয়াছি, আর দিন দিন ঐ কারণে পশুরও অধম হইতে বসিয়াছি! নব্য ভারত-ভারতীর ঐ পশুত্ব ঘুচাইবার জন্যই লোকগুরু ঠাকুরের বিবাহ। তাঁহার জীবনের সকল কার্যের ন্যায় বিবাহরূপ কার্যটাও লোককল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।

নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া ঐ আদর্শ পুনরায় প্রচলনের জন্যই ঠাকুরের বিবাহ

ঠাকুর বলিতেন, "এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি ষোল টাং করলে তবে যদি তোরা এক টাং করিস! আর আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি তো তোরা শালারা পাক দিয়ে দিয়ে তাই করবি।" এই জন্যই ঠাকুরের বিবাহিত জীবনের কর্তব্য ঘাড়ে লইয়া মহোচ্চ আদর্শ সকলের চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া দেখান। ঠাকুর যদি স্বয়ং বিবাহ না করিতেন তাহা হইলে গৃহস্থ মানব বলিত, 'বিবাহ তো করেন নাই, তাই অত ব্রহ্মচর্যের কথা বলা চলিতেছে। স্ত্রীকে আপনার করিয়া এক সঙ্গে একত্র তো বাস কখনো করেন নাই, তাই আমাদের উপর লম্বা লম্বা উপদেশ দেওয়া চলিতেছে।' সেজন্যই ঠাকুর শুধু যে বিবাহ করিয়াছিলেন মাত্র তাহা নহে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শনলাভের পর যখন দিব্যোন্মাদাবস্থা তাঁহার সহজ হইয়া গেল, তখন পূর্ণযৌবনা বিবাহিতা স্ত্রীকে দক্ষিণেশ্বরে নিজ সমীপে আনাইয়া রাখিলেন, তাঁহাতে জগদম্বার আবির্ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যাজ্ঞানে পূজা ও আত্মনিবেদন করিলেন, আটমাস কাল নিরন্তর একত্র বাস ও তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন পর্যন্ত করিলেন এবং স্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাণের শান্তি ও আনন্দের জন্য অতঃপর কামারপুকুরে এবং কখনো কখনো শ্বশুরালয় জয়রামবাটীতেও স্বয়ং যাইয়া দুই-এক মাস কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন!

স্ত্রীর সহিত ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ-রহিত অদৃষ্টপূর্ব প্রেম-সম্বন্ধ। শ্রীশ্রীমার ঐ বিষয়ক কথা

দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর স্ত্রীর সহিত এইরূপে একত্র বাস করেন, তখনকার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমা এখনো স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিয়া থাকেন, "সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়! কখনো ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম, সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে! ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না; এক দিন তাঁর আর সমাধি ভাঙে না দেখে ভয়ে কেঁদেকেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়! তারপর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হতো না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হতো। তারপর অনেকদিন এইরূপে গেলেও, কখন তাঁর কি ভাবসমাধি হবে বলে সারা রাত্তির জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি না—এ কথা একদিন জানতে পেরে, নহবতে আলাদা শুতে বললেন।" পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা বলেন, এইরূপে প্রদীপে সলতেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ি যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

গৃহী মানবের শিক্ষার জন্যই ঠাকুরের ঐরূপ প্রেমলীলাভিনয়

হে গৃহী মানব, কয়জন তোমরা এইভাবে নিজ নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া থাক? তুচ্ছ শরীরসম্বন্ধটা যদি আজ হইতে কোন কারণে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কয় জন তোমরা স্ত্রীকে ঐরূপে মান্য, ভক্তি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা আজীবন দিতে পার? সেইজন্যই বলি, এ অপূর্ব যুগাবতারের বিবাহ করিয়া, একদিনের জন্যও শরীর-সম্বন্ধ না পাতাইয়া, স্ত্রীর সহিত এই অদ্‌ভুত, অদৃষ্টপূর্ব প্রেমলীলার বিস্তার কেবল তোমারই জন্য। তুমিই শিখিতে পারিবে বলিয়া যে—ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বিবাহের অপর মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে এবং এই উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে তুমিও বিবাহিত

জীবনে ব্রহ্মচর্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রী-পুরুষে ধন্য হইতে পার এবং মহামেধাবী, মহাতেজস্বী গুণবান সন্তানের পিতা-মাতা হইয়া ভারতের বর্তমান হীনবীর্য, হতশ্রী, হৃতশক্তিক সমাজকে ধন্য করিতে পার, সেইজন্য। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রূপে পূর্ব পূর্ব যুগে যে লীলা লোকগুরুদিগের জগৎকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাই এই যুগে তোমার প্রয়োজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আজীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা ও সাধনাবলে উদ্বাহবন্ধনের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র 'ছাঁচ' জগতে এই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে। এখন, ঠাকুর যেমন বলিতেন—তোমরা নিজ নিজ জীবন সেই আদর্শ ছাঁচে ফেল, আর নূতনভাবে গঠিত করিয়া তোল।

ঠাকুরের আদর্শে বিবাহিত জীবন গঠন করিতে এবং অন্ততঃ আংশিকভাবেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে। নতুবা আমাদের কল্যাণ নাই

'কিন্তু'—গৃহমেধিমানব এখনও বলিতেছে—'কিন্তু—!' ওঃ, বুঝিয়াছি; এবং শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে যেমন বলিতেন, তাহাই তদুত্তরে বলিতেছি, "তোরা মনে করেছিস বুঝি প্রত্যেকে এক একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? সে নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতে একটাই হয়—বনে একটা সিঙ্গিই (সিংহ) থাকে।" হে গৃহী-মানব, আমরাও তোমার 'কিন্তু'র উত্তরে সেইরূপ বলিতেছি—ঠাকুরের ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া একেবারে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য রাখা তোমার যে সাধ্যাতীত তাহা ঠাকুর বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিয়াও যে ঐরূপ করিয়া তোমায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল তুমি অন্ততঃ 'এক টাং' বা আংশিকভাবে উহার অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া। কিন্তু, জানিও, ঐ উচ্চ আদর্শের অনুষ্ঠান করিয়া যদি তুমি স্ত্রীজাতিকে জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ বলিয়া না দেখিতে এবং হৃদয়ের যথাসাধ্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা না দিতে চেষ্টা কর, জগতের মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীমূর্তিসকলকে তোমার ভোগমাত্রৈকসহায়া পরাধীনা দাসী বলিয়া ভাবিয়া চিরকাল পশুভাবেই দেখিতে থাক, তবে তোমার আর গতি নাই; তোমার বিনাশ ধ্রুব এবং অতি নিকটে। শ্রীকৃষ্ণের কথা উপেক্ষা করিয়া যদুবংশের কি হইল, তাহা ভাবিও, ঈশার কথা উপেক্ষা করিয়া ইহুদি জাতিটার কি দুর্দশা, তাহা স্মরণ রাখিও। যুগাবতারকে উপেক্ষা করা সর্বকালেই জাতিসকলের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

বিবাহ করিয়া ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রহিত হইয়া থাকা সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি ও তাহার খণ্ডন

আর একটি প্রশ্নের এখানে উত্তর দিয়াই আমরা উদ্বাহবন্ধনের ভিতর দিয়া ঠাকুরের গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব বিকাশের কথা সাঙ্গ করিয়া ঐ বিষয়ের অপর কথাসকল বলিব। রূপ-রসাদি বিষয়ের দাস, বহির্মুখ মানবমনে এখনো নিশ্চিত উদয় হইতেছে যে, ঠাকুর যদি বিবাহই করিলেন, তবে একটিও অন্ততঃ সন্তানোৎপাদন করিয়া স্ত্রীর সহিত শরীর-সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে ভাল হইত। ঐরূপ করিলে বোধ হয় ভগবানের সৃষ্টিরক্ষা করাটা যে মানুষমাত্রেরই কর্তব্য, তাহা দেখানো হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্যাদাটাও রক্ষা পাইত। কারণ, শাস্ত্র বলেন—বিবাহিত পত্নীতে অন্ততঃ একটি সন্তানও উৎপাদন করিতে। উহাতে পিতৃ-ঋণের হস্ত হইতে মানবের নিষ্কৃতি হয়। তদুত্তরে আমরা বলি –

প্রথমতঃ, আমরা যতটুকু দেখি, শুনি বা চিন্তা ও কল্পনা করি, সৃষ্টিটা বাস্তবিক কি ততটুকুই? সৃষ্টির নিয়মই বৈচিত্র্য থাকা। আজ এই মুহূর্ত হইতে যদি আমরা সকলে সকল বিষয়ে এক প্রকার চিন্তা ও কার্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে সৃষ্টি ধ্বংস হইতে আর বড় বিলম্ব হইবে না। তারপর জিজ্ঞাসা করি—সৃষ্টিরক্ষার সকল নিয়মগুলিই কি তুমি জানিয়াছ এবং সৃষ্টিরক্ষা করিতে যাইয়াই কি তুমি আজ ব্রহ্মচর্যবিহীন? বুকে হাত দিয়া উত্তর প্রদান করিও; দেখিও, ঠাকুর যেমন বলিতেন—"ভাবের ঘরে চুরি না থাকে।" আচ্ছা, না হয় ধরিলাম সৃষ্টিরক্ষার ঐ নিয়মটি

তুমি পালন করিতেছ। অপরকে ঐরূপ করিতে বলিবার তোমার কি অধিকার আছে? ব্রহ্মচর্য বা উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিবিকাশের জন্য সাধারণ বিষয়ে শক্তিক্ষয় না করাটাও সৃষ্টি-মধ্যগত একটা নিয়ম। সকলেই যদি তোমার মতো নিম্নাঙ্গের শক্তিবিকাশেই ব্যস্ত থাকিবে, তবে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক শক্তিবিকাশ দেখাইবে কে? ঐরূপ শক্তির বিকাশ তাহা হইলে তো লোপ পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রের ভিতর হইতে মনের মতো কথাগুলি বাছিয়া লওয়াই আমাদের স্বভাব। সন্তানোৎপাদনবিষয়ক কথাটিও ঐ ভাবেই বাছিয়া লওয়া হয়। কারণ, শাস্ত্র অধিকারিভেদে আবার বলেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' –যখনি ভগবানে অনুরাগ বাড়িয়া সংসারে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখনি সংসার ত্যাগ করিবে। অতএব ঠাকুর যদি তোমার মতে চলিতেন, তাহা হইলে এ শাস্ত্রবচনের মর্যাদাটি রক্ষা করিত কে? পিতৃ-ঋণশোধ করা সম্বন্ধেও ঐ কথা। শাস্ত্র বলেন– যথার্থ সন্ন্যাসী তাঁহার ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ এবং অধস্তন সপ্তপুরুষকে নিজ পুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব ঠাকুরের পিতৃ-ঋণশোধ হইল না ভাবিয়া আমাদের কাতর হইবার প্রয়োজন নাই।

গুরুভাবের প্রেরণাতেই যে ঠাকুরের বিবাহ, তৎপরিচয় শ্রীশ্রীমার ঠাকুরকে জগদম্বাজ্ঞানে আজীবন পূজা করাতেই বুঝা যায়

অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের জীবনে উদ্বাহবন্ধন কেবল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তই হইয়াছিল। বিবাহিত জীবনের কি উচ্চ, পবিত্র আদর্শ তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় শ্রীশ্রীমার আজীবন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করার কথাতেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ অপর সকলের নিকট আপন দুর্বলতা আবরিত রাখিতে পারিলেও, স্ত্রীর নিকট কখনই উহা লুক্কায়িত রাখিতে পারে না–ইহাই সংসারের নিয়ম। ঠাকুর ঐ বিষয়ে কখনো কখনো আমাদের বলিতেন, "যত সব দেখিস হোমরা-চোমরা বাবু ভায়া–কেউ জজ, কেউ মেজেস্টর, বাইরের যত বোলবোলাও–স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম! অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে, অন্যায় হলেও সেটা রদ করবার কারও ক্ষমতা নেই!" অতএব কাহারও বিবাহিতা পত্নী যদি তাহার পবিত্র, উচ্চ জীবন দেখিয়া তাহাকে অকপটে হৃদয়ের ভক্তি দেয় এবং আজীবন ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝা যায়, সে লোকটা বাহিরে যে আদর্শ দেখায় তাহাতে কিছুমাত্র ভেল নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে সেজন্য ঐ কথা যত নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি, এমন আর কাহারও সম্বন্ধে নহে। পরিণীতা পত্নীর সহিত ঠাকুরের অপূর্ব প্রেমলীলার অনেক কথা বলিবার থাকিলেও, ইহা তাহার স্থান নহে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয়ের ভিতর দিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত গুরুভাব-বিকাশের কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াই আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

[1] লুক্, ২-৪২

[2] পাড়াগাঁয়ে প্রথা আছে, শশা প্রভৃতি গাছের যে ফলটি ভাল বুঝিয়া ভগবানের ভোগ দিবে বলিয়া কৃষক মনে করে, স্মরণ রাখিবার জন্য সেটিতে একটি কুটো বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। ঐরূপ করায় কৃষক নিজে বা তাহার বাটীর আর কেহ সেটি ভুলক্রমে তুলিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে না। ঠাকুর ঐ প্রথা স্মরণ করিয়াই ঐ কথা বলেন। অর্থ – অমুকের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে একথা পূর্ব হইতে স্থির হইয়া আছে অথবা অমুক কন্যাটি তাঁহার বিবাহের পাত্রীস্বরূপে দৈবকর্তৃক রক্ষিতা আছে।

৩.৭. পঞ্চম অধ্যায়: যৌবনে গুরুভাব

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

– গীতা, ৭/২৫

গুরু ও নেতা হওয়া মানবের ইচ্ছাধীন নহে

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিশেষ বিকাশ আরম্ভ হয়–যেদিন হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় ব্রতী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। ঠাকুরের তখন সাধনার কাল–ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদাবস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়? যিনি গুরু, তিনি চিরকালই গুরু–যিনি নেতা, তিনি বাল্যকাল হইতেই নেতা। লোকে কমিটি করিয়া পরামর্শ আঁটিয়া যে তাঁহাকে গুরু বা নেতার আসন ছাড়িয়া দেয়, তাহা নহে। তিনি যেমন আসিয়া লোকসমাজে দণ্ডায়মান হন, অমনি মানবসাধারণের মন তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হয়। অমনি নতশিরে তাহারা তাঁহার নিকট শিক্ষাগ্রহণ ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে থাকে–ইহাই নিয়ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, মানুষ মানুষকে যে নেতা বা গুরু করিয়া তোলে, তাহা নহে, যাঁহারা গুরু বা নেতা হন, তাঁহারা ঐ অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। ‘A leader is always born and never created’—সেজন্য দেখা যায়, অপর সাধারণে যেসকল কাজ করিলে সমাজ চটিয়া দণ্ডবিধান করে, লোকগুরুরা সেইসকল কাজ করিলেও অবনতশিরে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছেন –

‘স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।’

– তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সৎকার্যের প্রমাণ বা পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায় এবং লোকে তদ্রূপ আচরণই তদবধি করিতে থাকে। বড়ই আশ্চর্যের কথা, কিন্তু বাস্তবিকই ঐরূপ চিরকাল হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইতে থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ‘আজ হইতে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হইয়া গোবর্ধনের পূজা হইতে থাকুক’–লোকে তাহাই করিতে লাগিল! বুদ্ধ বলিলেন, ‘আজ হইতে পশুহিংসা বন্ধ হউক’ অমনি ‘যজ্ঞে হনন করিবার জন্যই পশুগণের সৃষ্টি’, ‘যজ্ঞার্থে পশবো সৃষ্টাঃ’-রূপ নিয়মটি সমাজ পালটাইয়া বাঁধিল! যীশু মহাপবিত্র উপবাসের দিনে শিষ্যদিগকে ভোজন করিতে অনুমতি দিলেন–তাহাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল! মহম্মদ বহু বিবাহ করিলেন, তবুও লোকে তাঁহাকে ধর্মবীর, ত্যাগী ও নেতা বলিয়া মান্য করিতে লাগিল! সামান্য বা মহৎ সকল বিষয়েই ঐরূপ–তাঁহারা যাহা বলেন ও করেন, তাহাই সদাচরণের আদর্শ।

লোকগুরুদিগের ভিতরে বিরাট ভাবমুখী আমিত্বের বিকাশ সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধারণের ঐরূপ হয় না

কেন যে ঐরূপ হয় তাহাও ইতঃপূর্বে আমরা বলিয়াছি–লোকগুরুদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থপর ‘আমি’টা চিরকালের মতো একেবারে বিনষ্ট হইয়া তাহার স্থলে বিরাটভাবমুখী ‘আমিত্ব’টার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ‘আমি’টার দশের কল্যাণ খোঁজাই স্বভাব। আর ফুল ফুটিলে ভ্রমর যেমন আপনিই জানিতে পারিয়া মধুলোভে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, ফুলকে আর ভ্রমরের নিকট সাদর নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হয় না, সেইরূপ যেমনি কাহারও ভিতর ঐ বিরাট ‘আমি’টার বিকাশ হয়, অমনি সংসারে তাপিত লোকসকল আপনিই তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া শান্তিলাভের নিমিত্ত ছুটিয়া আসে। সাধারণ মানবের ভিতর ঐ বিরাট ‘আমি’টার একটু-আধটু ছিটে-ফোঁটার মতো বিকাশ অনেক কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু লোকগুরুদিগের জীবনে বাল্য হইতেই উহার কিছু না কিছু বিকাশ, যৌবনে অধিকতর প্রকাশ এবং পরিশেষে পূর্ণ

প্রকাশের অদ্‌ভুত লীলাসকল দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগকে একেবারে অপৃথকভাবে দেখিতে থাকি। কারণ তখন ঐ অমানুষ-ভাবপ্রকাশ তাঁহাদের এত সহজ হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, নিঃশ্বাস-ফেলার মতো একটা সাধারণ নিত্যকর্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই সাধারণ মানুষ আর কি করিবে?—দেখে যে, তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের মাপকাঠি দ্বারা তাঁহাদের দেবচরিত্র মাপা চলে না এবং তজ্জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-বিশ্বাস ও শরণ গ্রহণ করে।

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের পূর্ণবিকাশ হইয়া উহা সহজ-ভাব হইয়া দাঁড়ায় কখন

ঠাকুরের জীবনালোচনায়ও আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই—যৌবনে সাধকাবস্থায় দিনের পর দিন ঐ ভাবের ক্রমে ক্রমে বিকাশ হইতে হইতে দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনান্তে ঐ ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উহা একেবারে সহজভাব হইয়া দাঁড়ায়। তখন কখন যে তিনি কোন্ 'আমি'-বুদ্ধিতে রহিয়াছেন বা কখন যে তাঁহাতে বিরাট 'আমি'টার সহায়ে গুরুভাবাবেশ হইল, তাহা অনেক সময়ে সাধারণ-মানবমন-বুদ্ধির গোচর হইত না। কিন্তু ওটা ঐ ভাবের পূর্ণ পরিণত অবস্থার কথা এবং যেখানকার কথা সেইখানেই উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখন যৌবনে সাধকাবস্থায় ঐ ভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি অনেক সময়ে যেরূপ আচরণ করিতেন, তাহারই কিছু পাঠককে অগ্রে বলা আবশ্যক।

সাধনকালে ঐ ভাব—রানী রাসমণি ও তদীয় জামাতা মথুরের সহিত ব্যবহার

যৌবনে ঠাকুরের গুরুভাবের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী, রানী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরানাথ বা মথুরবাবুকে লইয়া। অবশ্য ইঁহাদের দুইজনের কাহাকেও দেখা আমাদের কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তবে ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রথম দর্শনেই ইঁহাদের মনে ঠাকুরের প্রতি একটা ভালবাসার উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে উহা এতই গভীরভাব ধারণ করে যে, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। মানুষকে মানুষ যে এতটা ভক্তি-বিশ্বাস করিতে—এতটা ভালবাসিতে পারে, তাহা আমাদের অনেকের মনে বোধ হয় ধারণা না হইয়া একটা রূপকথার মতো মনে হইবে! অথচ উপর উপর দেখিলে ঠাকুর তখন একজন সামান্য নগণ্য পূজক ব্রাহ্মণমাত্র এবং তাঁহারা সমাজে জাত্যংশে বড় না হইলেও, ধনে, মানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজের অগ্রণী বলিলে চলে।

ঠাকুরের অপূর্ব স্বভাব

আবার এদিকে ঠাকুরের স্বভাবও বাল্যাবধি অতি বিচিত্র! ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নামের শেষে বড় বড় উপাধি প্রভৃতি যেসকল লইয়া লোকে লোককে বড় বলিয়া গণ্য করে, তাঁহার গণনায়, তাঁহার চক্ষে ওগুলো চিরকালই ধর্তব্যের মধ্যে বড় একটা ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, "মনুমেন্টে উঠে দেখলে তিনতলা চারতলা বাড়ি, উঁচু উঁচু গাছ ও জমির ঘাস সব এক সমান হয়ে গেছে দেখায়।" আমরাও দেখি, ঠাকুরের নিজের মন বাল্যাবধি, সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগ-সহায়ে সর্বদা এত উচ্চে উঠিয়া থাকিত যে সেখান হইতে ধন-মান-বিদ্যাদির একটু-আধটু তারতম্য—যাহা লইয়া আমরা একেবারে ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার মতো হই ও 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করি—সব এক সমান দেখা যাইত! অথবা ঠাকুরের মন, চিরকাল প্রত্যেক কার্যটা কেন করিব ও প্রত্যেক ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সম্বন্ধের চরম পরিণতিতে কি কতদূর দাঁড়াইবে—তাহা ভাবিয়া অপরের ঐ ঐ বিষয়ে কিরূপ বা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া একটা বদ্ধমূল ধারণায় পূর্ব হইতেই উপস্থিত হইত। কাজেই ঐসকল বিষয় যে উদ্দেশ্য ও চরমপরিণতি লুকাইয়া মধুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে ভুলাইয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও মিছামিছি ঘুরাইবে, তাহার কোন পথই ছিল না। পাঠক বলিবে, 'কিন্তু ওরূপ বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের দোষগুলিই তো আগে চক্ষে পড়িয়া মানুষকে জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবে, জগতের কোন কার্য করিতেই আর অগ্রসর হইতে দিবে না।'

বাস্তবিকই তাহা। মন যদি পূর্ব হইতে বাসনাশূন্য বা পবিত্র না হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরলাভরূপ মহৎ উদ্দেশ্য যদি উহার গোড়ায় বাঁধা না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বুদ্ধি বাস্তবিকই মানবকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া উদ্যমরহিত এবং কখনো কখনো উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী করিয়া তোলে। নতুবা পবিত্রতা ও উচ্চ লক্ষ্যে যদি মনের সুর চড়াইয়া বাঁধা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ সকল বিষয়ের অন্তস্তলস্পর্শী দোষদর্শী বুদ্ধিই মানবকে ঈশ্বরদর্শনের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর করাইয়া দেয়। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐজন্য শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন মানবকেই সর্বদা সংসারে 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শন' করিয়া বৈরাগ্যবান হইতে বলিয়াছেন। ঠাকুরের চরিত্রে বাল্যাবধি ঐ দোষদৃষ্টি কতদূর পরিস্ফুট তা দেখ। লেখা-পড়া করিতে গিয়া কোথায় 'তর্কালঙ্কার', 'বিদ্যাবাগীশ' প্রভৃতি উপাধি ও নাম-যশের দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিতে পাইলেন, বড় বড় 'তর্কবাগীশ', 'ন্যায়চঞ্চু' মহাশয়দের ন্যায়-বেদান্তের লম্বা লম্বা কথা আওড়াইয়া ধনীর দ্বারে খোশামুদি করিয়া 'চাল কলা বাঁধা' বা জীবিকার সংস্থান করা! বিবাহ করিতে যাইয়া কোথায় সংসারের ভোগসুখ আমোদ-প্রমোদের দিকে নজর পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিলেন দুদিনের সুখের নিমিত্ত চিরকালের মতো বন্ধন গলায় পরা, অভাববৃদ্ধি করিয়া টাকার চিন্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানো ও সেই দুই দিনের সুখেরও অনিশ্চয়তা! টাকাতে সংসারে সব করিতে ও সব হইতে পারা যায় দেখিয়া কোথায় কোমর বাঁধিয়া রোজগারে লাগিয়া যাইবেন—না, দেখিলেন, টাকাতে কেবল ভাত, ডাল, কাপড় ও ইট, মাটি, কাঠ লাভই হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ হয় না! সংসারে গরিব-দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া পরের দুঃখমোচন করিয়া 'দাতা', 'পরোপকারী' ইত্যাদি নাম কিনিবেন, না, দেখিলেন, আজীবন চেষ্টার ফলে বড় জোর দুচারটে ফ্রী-স্কুল ও দুচারটে দাতব্য ডাক্তারখানা, না হয় দুচারটে অতিথিশালা স্থাপন করা যায়; তারপর মৃত্যু ও জগতের যেমন অভাব ছিল, তেমনিই থাকিল!—এইরূপ সকল বিষয়ে।

ধনী ও পণ্ডিতদের ঠাকুরকে চিনিতে পারা কঠিন। উহার কারণ

ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ঠাকুরকে কাজেই ঠিক ঠিক ধরা বা বুঝা সাধারণ মানবের বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ আবার বিদ্যাভিমানী ও ধনীদের; কারণ, স্পষ্ট কথা সংসারে কাহারও নিকট শুনিতে না পাইয়া, লোকমান্য ও ধনমদে শুনিবার ক্ষমতাটি পর্যন্ত তাঁহারা অনেক স্থলে হারাইয়া বসেন। কাজেই তাঁহারা ঠাকুরকে অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়া যে অসভ্য, পাগল বা অহঙ্কারী মনে করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্যই রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর ভক্তি-ভালবাসা দেখিয়া আরও অবাক হইতে হয়! মনে হয়, ঈশ্বরকৃপায় মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা ঠাকুরের উপর ভালবাসা শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, উপরন্তু তাঁহার দিব্য গুরুভাবের পরিচয় দিন দিন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্বতোভাবে আত্মবিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন! নতুবা যে ঠাকুর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার দিনে আপনার অগ্রজ পূজায় ব্রতী হইলে এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদ ভোজন করিলেও শূদ্রান্নভোজন করিতে হইবে বলিয়া তথায় উপবাস করিয়াছিলেন এবং পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ঐ নিমিত্ত কালীবাটীর গঙ্গাতীরে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছিলেন, যে ঠাকুর মথুরবাবু বার বার ডাকিলেও বিষয়ী লোক বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পরে মা কালীর পূজায় ব্রতী হইবার জন্য তাঁহার সাদর অনুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অভিমান এবং ধনমদ ত্যাগ করিয়া সেই ঠাকুরকে প্রথম হইতে ভালবাসা এবং বরাবর ঐ ভাব ঠিক রাখা রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর সহজ হইত না।

বিবাহের পর ঠাকুরের অবস্থা। মথুরের উহা লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। অপর সাধারণের ঠাকুরের বিষয়ে মতামত

ঠাকুরের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পূর্ণ যৌবন। বিবাহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং মা-কালীর পূজায় ব্রতী হইয়াছেন; এবং পূজায় ব্রতী হইয়াই আবার ঈশ্বরপ্রেমে পাগলের

মতো হইয়াছেন। ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কখনো কখনো ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘষড়াইয়া 'মা' 'মা' বলিয়া এত ক্রন্দন করেন যে, লোক দাঁড়াইয়া যায়! লোকে ব্যথিত হইয়া বলাবলি করে, 'আহা, লোকটির কোন উৎকট রোগ হইয়াছে নিশ্চয়; পেটের শূলব্যথায় মানুষকে অমনি অস্থির করে।' কখনো বা পূজার সময় যত ফুল নিজের মাথায় চাপাইয়া নিস্পন্দ হইয়া যান। কখনো বা সাধকদিগের পদাবলী উন্মত্তভাবে কতক্ষণ ধরিয়া গাহিতে থাকেন। নতুবা যখন কতকটাও সাধারণভাবে থাকেন তখন যাহার সহিত যেমন ব্যবহার করা উচিত, যাহাকে যেমন মান দেওয়া রীতি, সে সমস্ত পূর্বের ন্যায়ই করেন। কিন্তু জগন্মাতার ধ্যানে যখন ঐরূপ ভাবাবেশ হয়—এবং সে ভাবাবেশ যে দিনের ভিতর এক-আধবার একটু-আধটু হইত, তাহা নহে—তখন ঠাকুরের আর কোন ঠিক-ঠিকানাই থাকে না, কাহারও কোন কথা শোনেন না—বা উত্তর দেন না। কিন্তু তখনো সে দেবচরিত্রে মাধুর্যের অনেক সময় লোকে পরিচয় পায়। তখনো যদি কেহ বলে, 'মা-র নাম দুটো শোনাও না'—অমনি ঠাকুর তাহার প্রীতির জন্য মধুর কণ্ঠে গান ধরেন এবং গাহিতে গাহিতে গানের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আত্মহারা হন।

ইতঃপূর্বেই রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর কর্ণে হীনবুদ্ধি নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ এবং ঠাকুরবাড়ির প্রধান কর্মচারী খাজাঞ্চী মহাশয়ও পূজার সময় ঠাকুরের অনাচারের অনেক কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, 'ছোট ভট্‌চাজ্[1] সব মাটি করলে; মা-র (কালীর) পূজা, ভোগ, রাগ কিছুই হইতেছে না; ওরূপ অনাচার করলে মা কি কখনো পূজা ভোগ গ্রহণ করেন?'—ইত্যাদি। কিন্তু বলিয়াও কিছুমাত্র সফলমনোরথ হন নাই; কারণ, মথুরবাবু স্বয়ং মাঝে মাঝে কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ মন্দিরে আসিয়া অন্তরালে থাকিয়া ঠাকুরের পূজার সময় ভক্তিবিহ্বল, বালকের ন্যায় ব্যবহার ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি আবদার অনুরোধাদি দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাদের আজ্ঞা করিয়াছেন—"ছোট ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবে যাহাই করুন না কেন, তোমরা তাঁহাকে বাধা দিবে না বা কোন কথা বলিবে না। আগে আমাকে জানাইবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করিবে।"

রানী রাসমণিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া মা-র শিঙ্গার (ফুলের সাজ) ইত্যাদি দেখিয়া এবং ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মা-র নাম শুনিয়া এতই মোহিত হইয়াছেন যে, যখনই কালীবাড়িতে আসেন, তখনই ছোট ভট্টাচার্যকে নিকটে ডাকাইয়া মা-র নাম (গান) করিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুরও গান করিতে করিতে কাহাকেও যে শুনাইতেছেন এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকেই যেন শুনাইতেছেন, এই ভাবে গান গাহিতে থাকেন। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, জগৎরূপ বৃহৎ সংসারের ন্যায় ঠাকুরবাড়ির ক্ষুদ্র সংসারেও যে যাহার কাজ লইয়াই ব্যস্ত এবং সাংসারিক কাজকর্ম ও স্বার্থচিন্তা বাদে যতটুকু সময় পায় তাহাতে পরনিন্দা পরচর্চাদি রুচিকর বিষয়সকলের আন্দোলন করিয়া নিজ নিজ মনের একদেশিতার অবসাদ দূর করিয়া থাকে। কাজেই ছোট ভট্টাচার্যের ভিতরে ঈশ্বরপ্রেমে যে কি পরিবর্তন হইতেছে, তাহার খবর রাখে কে? 'ও একটা উন্মাদ, বাবুদের কেমন একটা সুনজরে পড়িয়াছে, তাই এখনো চাকরিটি বজায় আছে; তাই বা কদিন? কোন্ দিন এই একটা কি কাণ্ড করিয়া বসিবে ও তাড়িত হইবে! বড়লোকের মেজাজ—কিছু কি ঠিকঠিকানা আছে? খুশি হইতেও যতক্ষণ, আর গরম হইতেও ততক্ষণ'—ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তাই কর্মচারীদের ভিতর কখনো কখনো হইয়া থাকে, এই মাত্র। ঠাকুরের ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়ও তৎপূর্বেই ঠাকুরবাটীতে আসিয়া জুটিয়াছে।

গুরুভাবে ঠাকুরের রানী রাসমণিকে দণ্ডবিধান

আজ রানী রাসমণি স্বয়ং ঠাকুরবাড়িতে আসিয়াছেন। কর্মচারীরা সকলে শশব্যস্ত। যে ফাঁকিদার সে-ও আজ আপন কর্তব্য অতি যত্নের সহিত করিতেছে। গঙ্গায় স্নানান্তে রানী কালীঘরে দর্শন করিতে যাইলেন। তখন কালীর পূজা ও বেশ হইয়া গিয়াছে। জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া রানী

মন্দিরমধ্যে শ্রীমূর্তির নিকট আসনে আহ্নিক-পূজা করিতে বসিলেন এবং ছোট ভট্টাচার্য বা ঠাকুরকে নিকটে দেখিয়া মা-র নামগান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও রানীর নিকটে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন; রানী পূজা-জপাদি করিতে করিতে ঐসকল শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে ঠাকুর হঠাৎ গান থামাইয়া বিরক্ত হইয়া উগ্রভাবে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা?"—বলিয়াই রানীর কোমল অঙ্গে করতল দ্বারা আঘাত করিলেন! সন্তানের কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া পিতা যেরূপ কুপিত হইয়া কখনো কখনো দণ্ডবিধান করেন, ঠাকুরেরও এখন ঠিক সেই ভাব! কিন্তু কে-ই বা তাহা বুঝে!

উহার ফল

মন্দিরের কর্মচারী ও রানীর পরিচারিকারা সকলে হইচই করিয়া উঠিল। দ্বারপাল শশব্যস্তে ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। বাহিরের কর্মচারীরাও মন্দিরমধ্যে এত গোল কিসের ভাবিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ গোলযোগের প্রধান কারণ যাঁহারা—ঠাকুর ও রানী রাসমণি—তাঁহারা উভয়েই এখন স্থির, গম্ভীর! কর্মচারীদের বকাবকি ছুটাছুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে উদাসীন থাকিয়া ঠাকুর আপনাতে আপনি স্থির ও তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি; শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যান না করিয়া আজ কেবলই একটি বিশেষ মকদ্দমার ফলাফলের বিষয় ধ্যান করিতেছিলেন, রানী রাসমণি নিজের অন্তর পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিতে পাইয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ও অনুতাপে গম্ভীর! আবার ঠাকুর ঐ কথা কি করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া রানীর ঐ ভাবের সহিত কতক বিস্ময়ের ভাবও মনে বর্তমান! পরে কর্মচারীদের গোলযোগে রানীর চমক ভাঙিল ও বুঝিলেন—নিরপরাধ ঠাকুরের প্রতি, এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি লোকদিগের বিশেষ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা। বুঝিয়া সকলকে গম্ভীরভাবে আজ্ঞা করিলেন, "ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তোমরা উঁহাকে কেহ কিছু বলিও না।" পরে মথুরবাবুও নিজ শ্বশ্রূঠাকুরানীর নিকট হইতে ঘটনাটির সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কর্মচারীদিগের উপর পূর্বোক্ত হুকুমই বহাল রাখিলেন। ইহাতে তাহাদের কেহ কেহ বিশেষ দুঃখিত হইল; কিন্তু কি করিবে, 'বড় লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ কি' ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীচৈতন্য ও ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা

ঘটনাটি শুনিয়া পাঠক হয়তো ভাবিবে—এ আবার কোন্ দেশী গুরুভাব? লোকের অঙ্গে আঘাত করিয়া এ আবার কি প্রকার গুরুভাবের প্রকাশ? আমরা বলি—জগতের ধর্মেতিহাস পাঠ কর, দেখিবে লোকগুরু আচার্যদিগের জীবনে এরূপ ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে কাজিদলন, গুরুভাবে আত্মহারা হইয়া অদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করিয়া ভক্তিদান প্রভৃতির কথা স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, মহামহিম ঈশার জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই।

শিষ্যপরিবৃত ঈশা জেরুজালেমের 'য়াভে' দেবতার মন্দিরে দর্শনপূজাদি করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। ৺বারাণসী শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া হিন্দুর মনে যেরূপ অপূর্ব পবিত্র ভাবের উদয় হয়, ইহুদি-মনে জেরুজালেমের মন্দির-দর্শনেও ঠিক তদ্রূপ হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার উপর আবার ভাবমুখে অবস্থিত ঈশার মন! দূর হইতে মন্দির-দর্শনেই ঈশা ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া দেবদর্শন করিতে ছুটিলেন। মন্দিরের বাহিরে, দ্বারে, প্রাঙ্গণমধ্যে কত লোক কত প্রকারে দু-পয়সা রোজগার প্রভৃতি দুনিয়াদারিতেই ব্যস্ত। পাণ্ডা পুরোহিতেরা দেবদর্শন হউক আর নাই হউক যাত্রীদিগের নিকট হইতে দু-পয়সা ঠকাইয়া লইতে নিযুক্ত। আর দোকানি পসারিরা পূজায় পশু-পুষ্পাদি দ্রব্যসম্ভার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া কিসে দু-পয়সা অধিক লাভ করিবে, এই চিন্তাতেই ব্যাপৃত। ভগবানের মন্দির তাহার নিকটে রহিয়াছে—এ কথা ভাবিতে কাহার আর মাথাব্যথা পড়িয়াছে? যাহা হউক, ভাববিভোর

ঈশার চক্ষে মন্দিরপ্রবেশকালে এসকল কিছুই পড়িল না। সরাসরি মন্দিরমধ্যে যাইয়া দেবদর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মারূপে তিনি অন্তরে রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। মন্দির ও তন্মধ্যগত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ এখানে আসিয়াই তো তিনি প্রাণারামের দর্শন পাইলেন! পরে মন যখন আবার নিচে নামিয়া ভিতরের ভাবপ্রকাশ বাহিরের ব্যক্তি ও বস্তুর ভিতর দেখিতে যাইল, তখন দেখেন সকলই বিপরীত। কেহই তাঁহার প্রাণারামের সেবায় নিযুক্ত নহে; সকলেই কাম-কাঞ্চনের সেবাতেই ব্যাপৃত! তখন নিরাশা ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ভাবিলেন—একি? তোরা বাহিরে, সংসারের ভিতর যাহা করিস কর না, কিন্তু এখানে, যেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ—এখানে আবার এসকল দুনিয়াদারি কেন? কোথায় এখানে আসিয়া দুদণ্ড তাঁহার চিন্তা করিয়া সংসারের জ্বালা দূর করিবি, তাহা না হইয়া এখানেও সংসার আনিয়া পুরিয়াছিস!— ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইল এবং বেত্রহস্তে উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া তিনি সকল দোকানি পসারিদের বলপূর্বক মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। তাহারাও তখন তাঁহার কথায় ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া যথার্থই দুষ্কর্ম করিতেছি ভাবিতে ভাবিতে সুড় সুড় করিয়া বাহিরে গমন করিল; অতি বদ্ধ জীব—যাহার কথায় চৈতন্য হইল না, সে তাঁহার কশাঘাতে ঐ জ্ঞানলাভ করিয়া বহির্গমন করিল। কিন্তু কেহই ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইল না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও এইরূপে আহত ব্যক্তির জ্ঞানলাভ হইয়া তাঁহাকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে স্তবস্তুতি করার কথা, অতি বদ্ধ জীবকুলের তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আসিয়া তাঁহার হাস্যে বা কথায় স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার কথা প্রভৃতি অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাক এখন ঐ সকল পৌরাণিকী কথা।

গুরুভাবের প্রেরণায় আত্মহারা ঠাকুরের অদ্‌ভুতপ্রকারে শিক্ষাপ্রদান ও রানী রাসমণির সৌভাগ্য

গুরুভাবে সম্পূর্ণ আত্মহারা ঠাকুর যে কিভাবে অপরের সহিত ব্যবহার ও শিক্ষাদি প্রদান করিতেন, এই ঘটনাটি উহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ঘটনাটি তলাইয়া দেখিলে বড় কম ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোথায় একজন সামান্য বেতনমাত্রভোগী নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ এবং কোথায় রানী রাসমণি—যাঁহার ধন, মান, বুদ্ধি, ধৈর্য, সাহস ও প্রতাপে কলিকাতার তখনকার মহা মহা বুদ্ধিমানেরাও স্তম্ভিত! এরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই পারিবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অথবা যদি কখনো কোন কারণে তাঁহার সমীপস্থ হয় তো চাটুকারিতা প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার তিলমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তন্নিমিত্তই অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। তাহা না হইয়া একেবারে তদ্বিপরীত! তাঁহার অন্যায় আচরণের খালি প্রতিবাদ নহে, শারীরিক দণ্ডবিধান! ঠাকুরের দিক হইতে দেখিলে ইহা যেমন অল্প বিস্ময়ের কথা মনে হয় না, রানীর দিক হইতে দেখিলে ঐরূপ ব্যবহারে যে তাঁহার মনে ক্রোধ-অভিমান-হিংসাদির উদয় হইল না, ইহাও একটি কম কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে পূর্বেই যেমন আমরা বলিয়া আসিয়াছি—স্বার্থগন্ধহীন বিরাট 'আমি'টার সহায়ে যখন মহাপুরুষদিগের মনে এইরূপে গুরুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইচ্ছা না থাকিলেও সাধারণ মানবকে তাঁহার নিকট নতশির হইতে হইবেই হইবে, রানীর ন্যায় ভক্তিমতী সাত্ত্বিকপ্রকৃতির তো কথাই নাই। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থনিবদ্ধদৃষ্টি মানব-মন তখন তাঁহাদের কৃপা ও শক্তিতে উন্নত হইয়া তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেছেন তাহাতেই তাহার বাস্তবিক স্বার্থ—এ কথাটি আপনা-আপনি বুঝিতে পারে। কাজেই তখন তদ্রূপ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর থাকে না। আর এক কথা ঠাকুর যেমন বলিতেন—"তাঁহার (ঈশ্বরের) বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকিলে কেহ কখনো কোন বিষয়ে বড় হইতে পারে না; বা মান, ক্ষমতা প্রভৃতি হজম[2] করিতে পারে না!" সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্না রানীর ভিতর ঐরূপ ঐশী শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি

ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত হইলেও ঠাকুরের গুরুভাবে কৃপা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “রানী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্ট নায়িকার একজন! ধরাধামে তাঁহার পূজা-প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন। জমিদারির দলিল-পত্রাদি অঙ্কিত করিবার তাঁহার যে সীলমোহর ছিল তাহাতেও লেখা ছিল–‘কালীপদ-অভিলাষী, শ্রীমতী রাসমণি দাসী।’ রানীর প্রতি কার্যেই ঐরূপে জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।”

ঈশ্বরে তন্ময় মনের লক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রমত

আর এক কথা–সর্বতোভাবে ঈশ্বরে তন্ময় মনের নানা ভাবে অবস্থানের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য শ্রীমৎ শঙ্কর তৎকৃত ‘বিবেকচূড়ামণি’-নামক গ্রন্থে উহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন –

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।

উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ ৫৪১

–ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভে সিদ্ধকাম পুরুষদিগের কেহ বা জ্ঞানরূপ বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া, আবার কেহ বা বল্কল বা সাধারণ লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা উন্মাদের ন্যায়, আবার কেহ বা বহির্দৃষ্টে কামকাঞ্চনগন্ধহীন বালক, বা শৌচাচারবিবর্জিত পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

লোকগুরুদিগের এবং বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহার বুঝা এত কঠিন কেন

‘বিরাট আমি’-টার সহিত তন্ময়ভাবে অনেকক্ষণ অবস্থান করায় সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ইঁহাদের ঐরূপ অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণসমর্থ গুরুভাব ইঁহাদের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি–ক্ষুদ্র স্বার্থময় ‘আমি’-টার লোপ বা বিনাশেই জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব এবং তৎসহ লোককল্যাণসাধনকারী শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ। ঐ সকল জ্ঞানী পুরুষদিগের ভিতর আবার যাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায় সর্বদা গুরু বা ঋষি-পদবীতে অবস্থান করেন, তাঁহাদের আবার অপরের শিক্ষার নিমিত্ত সদ্বিষয়ে তীব্রানুরাগ, অসদ্বিষয়ে তীব্র বিরাগ বা ক্রোধ, আচার, নিষ্ঠা, নিয়ম, তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সকল ভাবই অবস্থানুযায়ী সাধারণ পুরুষদিগের ন্যায় দেখাইতে হয়। ‘দেখাইতে হয়’ বলিতেছি এজন্য যে, ভিতরে ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ব্রহ্মভাবে ভালমন্দ, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যাদি মায়ারাজ্যের অন্তর্গত সকল পদার্থে ও ভাবে একাকার জ্ঞান বা দৃষ্টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, অপরকে মায়ারাজ্যের পারে যাইবার পথ দেখাইবার জন্য ঐসকল ভাব লইয়া তাঁহারা কালযাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ গুরু বা ঋষিদিগেরই যখন ঐরূপে লোককল্যাণের নিমিত্ত অনেক সময় কালযাপন করিতে হয়, তখন ঈশ্বরাবতার বা জগদ্গুরুপদবীস্থ আচার্যকুলের তো কথাই নাই। এজন্য তাঁহাদের বুঝা, ধরা সাধারণ মানবের এত কঠিন হইয়া উঠে; বিশেষতঃ আবার বর্তমান যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেষ্টা ও ব্যবহারাদি ধরা ও বুঝা। কারণ অবতারকুলে যেসকল বাহ্যিক ঐশ্বর্য, শক্তি বা বিভূতির প্রকাশ শাস্ত্রে এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, সেসকল ইঁহাতে এত গুপ্তভাবে প্রকাশিত ছিল যে, যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করিয়া ইঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ না হইলে, ইঁহাকে দুই-চারি বার ভাসা ভাসা, উপর উপর মাত্র দেখিয়া কাহারও ঐসকলের পরিচয় পাইবার উপায় ছিল না। দেখ না, বাহ্যিক কোন্ গুণ দেখিয়া তুমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? বিদ্যায়–একেবারে নিরক্ষর বলিলেই চলে! শ্রুতিধরত্বগুণে বেদ-বেদান্তাদি সকল শাস্ত্র শুনিয়া যে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, একথা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? বুদ্ধিতে তাঁহাকে ধরিবে? “আমি কিছু নহি, কিছু জানি না–সব আমার মা জানেন”–সর্বদা এইরূপ বুদ্ধির যাঁহাতে প্রকাশ, তাঁহার নিকট তুমি কোন্ বিষয়ে কি বুদ্ধি লইতে যাইবে? আর লইতে যাইলেও তিনি যখন বলিবেন, “মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন”, তখন কি তুমি

তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐরূপ করিতে পারিবে? তুমি ভাবিবে—“কি পরামর্শই দিলেন! ও-কথা তো আমরা সকলে ‘কথামালা’ ‘বোধোদয়’ পড়িবার সময় হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, ইচ্ছা করিলে সকল বিষয় জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু ঐ কথা লইয়া কাজ করিতে যাইলে কি চলে?” ধনে, নাম-যশে তাঁহাকে ধরিবে? ঠাকুরের নিজের তো ও-সকল খুবই ছিল! আবার ও-সকল তো ত্যাগ করিতেই প্রথম হইতেই উপদেশ! এইরূপ সকল বিষয়ে। কেবল আকৃষ্ট হইয়া ধরিবার একমাত্র উপায় ছিল—তাঁহার পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ ও প্রেম দেখিয়া। ইহাতে তুমি যদি আকৃষ্ট হইলে তো হইল, নতুবা তাঁহাকে ধরা ও বুঝা তোমার পক্ষে বহু দূরে! তাই বলি, রানী রাসমণি যে ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত ঠাকুরের গুরুভাব ধরিতে পারিলেন এবং তিনি ঐরূপে যে শিক্ষাদান করিলেন, তাহা অভিমান-অহঙ্কারে ভাসাইয়া না দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন—ইহা তাঁহার কম ভাগ্যোদয়ের কথা নহে।

[1] ঠাকুরের অগ্রজকে ‘বড় ভট্টাচার্য’ বলিয়া ডাকায় ঠাকুর তখন এই নামে নির্দিষ্ট হইতেন।

[2] মান প্রভৃতি হজম করা অর্থাৎ ঐসকল লাভ করিয়াও মাথা ঠিক রাখা; অহঙ্কৃত হইয়া ঐসকলের অপব্যবহার না করা।

৩.৮. ষষ্ঠ অধ্যায়: গুরুভাব ও মথুরানাথ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥

– গীতা, ১০।১৯

‘বড় ফুল ফুটতে দেরি লাগে’

পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের ধীর বিকাশ রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর চক্ষের সম্মুখেই অনেকটা হইতে থাকে। উচ্চাঙ্গের ভাববিকাশ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, “বড় ফুল ফুটতে দেরি লাগে, সারবান গাছ অনেক দেরিতে বাড়ে।” ঠাকুরের জীবনেও অদৃষ্টপূর্ব গুরুভাবের বিকাশ হইতে বড় কম সময় ও সাধনা লাগে নাই; দ্বাদশবর্ষব্যাপী নিরন্তর কঠোর সাধনার আবশ্যক হইয়াছিল। সে সাধনার যথাসাধ্য পরিচয় দিবার ইহা স্থান নহে। এখানে চিৎসূর্যের কিরণমালায় সম্যক সমুদ্ভাসিত গুরুভাবরূপ কুসুমটির সহিতই আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ; তাহার কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইব। তবে ঐ ভাববিকাশের কথা পূর্বাবধি শেষ পর্যন্ত বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন কথা আসিয়া পড়িবে। যেসকল ভক্তের সহিত ঠাকুরের ঐ ভাবের পূর্ব-পূর্বাবস্থার সময়ে সম্বন্ধ, তাহাদের কথাও কিছু না কিছু আসিয়া পড়িবে নিশ্চয়।

মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্‌ভুত সম্বন্ধ। মথুর কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল

মথুরবাবুর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ এক অদ্‌ভুত ব্যাপার! মথুর ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্যশীল এবং ধীরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। মথুর ইংরাজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক, কিন্তু কেহ কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব না–এরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না; ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে তাহাই যে চোখ-কান বুঁজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন, তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন বা গুরুই হউন বা অন্য যে কেহই হউন; উদার-প্রকৃতি ও সরল, কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়কর্মে বা অন্য কোন বিষয়ে যে বোকার মতো ঠকিয়া আসিবেন, তাহা ছিলেন না, বরং বিষয়ী জমিদারগণ যে কূটবুদ্ধি এবং সময়ে সময়ে অসদুপায়-সহায়ে প্রতিনিয়ত বিষয়বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সে সকলেরও তাঁহাতে কখনো কখনো প্রকাশ দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকই পুত্রহীনা রানী রাসমণির অন্যান্য জামাতা বর্তমান থাকিলেও বিষয়কর্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্তে কনিষ্ঠ মথুরবাবুই তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন; এবং শাশুড়ী ও জামাই উভয়ের বুদ্ধি একত্রিত হওয়াতেই রানী রাসমণির নামের তখন এতটা দপ্‌দপা হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠাকুরের গুরুভাব-বিকাশে রাণী রাসমণি ও মথুরের অজ্ঞাত ভাবে সহায়তা। বন্ধু বা শত্রুভাবে সম্বদ্ধ যাবতীয় লোক অবতারপুরুষের শক্তিবিকাশের সহায়তা করে

পাঠক হয়তো বলিবে–‘এ ধান ভানতে শিবের গীত’ কেন? ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে আবার মথুরবাবু কেন? কারণ, গুটী কাটিয়া ভাবরূপী প্রজাপতিটি যখন বাহির হইতেছিল, তখন মথুরই তাহার ভাবী সৌন্দর্যের আভাস কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রধান রক্ষক ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন! রানী রাসমণি একটা মহা শুদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় এ অদ্‌ভুত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপযোগী স্থান নির্মাণ করিলেন, আর তাঁহার জামাতা মথুর ঐরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই দেবচরিত্র-বিকাশের সময় অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, তৎসমস্ত যোগাইলেন। অবশ্য এ কথা আমরা এখন এতদিন পরে ধরিতে পারিতেছি; তাঁহারা উভয়ে কিন্তু এই বিষয়ের আভাস কখনো কখনো কিছু কিছু পাইলেও ঐসকল কার্য যে কেন করিতেছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পরেও যে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যুগে যুগে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনালোচনা করিতে যাইলেই ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, কি একটা অজ্ঞাত শক্তি

অলক্ষ্যে থাকিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের সকল বিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, সকল সময়ে সর্বাবস্থায় তাঁহাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, অপর সকল ব্যক্তির শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের অধীনে আনিয়া দেন; অথচ ঐসকল ব্যক্তি জানিতেও পারে না যে, তাহারা নিজে স্বাধীনভাবে, প্রেমে বা ঐসকল দেবচরিত্রের উপর বিদ্বেষে যাহা করিয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহাদেরই জন্য–তাঁহাদেরই কার্যের সহায়ক হইবে বলিয়া–তাঁহাদেরই গন্তব্য পথের বাধা-বিঘ্নগুলি সরাইয়া তাঁহাদের ভিতরের শক্তি উদ্দীপিত করিবে বলিয়া!–আর মানুষ বহুকাল পরে উহা বুঝিতে পারিয়া অবাক হইয়া থাকে! কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার ফল দেখ; বসুদেব দেবকীকে কারাগারে রাখিয়া কংসের আজীবন চেষ্টার শেষ দেখ; সিদ্ধার্থের পাছে বৈরাগ্যোদয় হয় বলিয়া রাজা শুদ্ধোদনের প্রমোদকানন-নির্মাণ দেখ; ক্রূর কাপালিক বৌদ্ধদিগের আচার্য শঙ্করকে অভিচারাদি-সহায়ে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখ; রাজপুরুষাদির সহায়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মপ্রচারের বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাচরণের ফল দেখ; আর দেখ মহামহিম ঈশাকে মিথ্যাপরাধে নিহত করিবার ফল!–সর্বত্রই 'উলটা বুঝিলু রাম' [1] হইয়া গেল! অথচ মহাপরাক্রান্ত বুদ্ধিমান বিপক্ষ ও স্নেহপরবশ স্বপক্ষকুল কূটনীতি বা বিষয়বুদ্ধি-সহায়ে চিরকালই অন্যরূপ ভাবিয়া অন্য উদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভাবিতে ও করিতে থাকিবে। তবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থসকলে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে–শত্রুভাবে, ঐ ঐশী শক্তির উদ্দেশ্য ও গতিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতে হয়, আর ভক্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ঐ ঐশী শক্তির অনুগামী হইয়া কখনো কখনো উহার কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এইমাত্র; এবং ঐ জ্ঞানের সহায়ে ক্রমে ক্রমে বাসনাবর্জিত হইয়া মুক্তি ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। মথুরবাবুর ক্রিয়াকলাপও শেষ ভাবের হইয়াছিল।

সাধারণ মানবজীবনেও ঐরূপ। কারণ, উহার সহিত অবতারপুরুষের জীবনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে

অবতার-মহাপুরুষদিগের জীবনেই যে কেবল এই দৈবী শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের জীবনে উহার উজ্জ্বল খেলা সহজে ধরিতে পারিয়া আমরা অবাক হই–এই পর্যন্ত। নতুবা আপন আপন দৈনন্দিন জীবন এবং জগতের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাসের আলোচনা করিলেও আমরা ঐ বিষয়ের যৎসামান্য প্রকাশ দেখিতে পাই। বহুদর্শিতা বা মানবজীবনের বহু ঘটনার তুলনায়, আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানব ঐ দৈবী শক্তির হস্তে সর্বক্ষণই ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অবতার-মহাপুরুষদিগের জীবনের সহিত সাধারণ মানবজীবনের এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকাটাও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। কারণ তাঁহাদের অলৌকিক জীবনাবলীই তো ইতরসাধারণের জীবন-গঠনের ছাঁচ (type or model)-স্বরূপ। তাঁহাদের জীবনাদর্শেই তো সাধারণ মানব আপন জীবনগঠনের প্রয়াস পাইতেছে ও চিরকালই পাইবে। দেখ না, নানা জাতির নানা ভাবের সম্মিলনভূমি বিশাল ভারতজীবন রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকটি মহাপুরুষ কেমন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন! আবার ঐ সকল পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষদিগের জীবনাদর্শসকলের একত্র সম্মিলনে অদৃষ্টপূর্ব নূতন ভাবে গঠিত বর্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ কেমন দ্রুতপদে আপন প্রবাহ বিস্তার করিয়া এই স্বল্পকালমধ্যেই বর্তমান ভারত-ভারতীর জীবন অধিকার করিয়া বসিতেছে! কালে ইহা কি ভাবে কতদূর যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমার সাধ্য হয়, বল; আমরা কিন্তু, হে পাঠক, উহা বুঝিতে ও বলিতে সম্পূর্ণ অপারক।

মথুর ভক্ত ছিল বলিয়া নির্বোধ ছিল না

আর এক কথা–মথুরবাবু ঠাকুরকে যেরূপ অকপটে 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' ভক্তি-বিশ্বাস করিতেন, তাহা শুনিয়া আমাদের ন্যায় সন্দেহদুষ্ট মন প্রথমেই ভাবিয়া ফেলে–'লোকটা বোকা বাঁদর গোছ একটা ছিল আর কি, নতুবা মানুষকে মানুষ এতটা বিশ্বাস-ভক্তি করিতে পারে

কখনো? আমরা যদি হইতাম তো একবার দেখিয়া লইতাম–শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেমন করিয়া নিজ চরিত্রবলে অতটা ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় আমাদের প্রাণে করিতে পারিতেন!’ যেন প্রাণের ভিতর ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় হওয়াটা একটা বিশেষ নিন্দার ব্যাপার। সেজন্য ঠাকুরের নিকট হইতে মথুরবাবুর বিষয় আমরা যতটুকু যেরূপ শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তাহাই এখানে পাঠককে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি যে, মথুরবাবু ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি আমাদের অপেক্ষা বড় কম বুদ্ধিমান বা সন্দিগ্ধমনা ছিলেন না। তিনিও ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও কার্যকলাপে সন্দেহবান হইয়া তাঁহাকে প্রথম প্রথম প্রতি পদে বড় কম যাচাইয়া লন নাই। কিন্তু করিলে কি হইবে? কখনো, কোন যুগে মানব যেরূপ নয়নগোচর করে নাই, বিজ্ঞাননন্দিনী প্রেমাবর্তশালিনী মহা ওজস্বিনী ঠাকুরের ভাব-মন্দাকিনীর গুরুগম্ভীর বেগ মথুরের সন্দেহ-ঐরাবত আর কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? অল্পকালেই স্খলিত, মথিত, ধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া চিরকালের মতো কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! কাজেই সর্বতোভাবে পরাজিত মথুর তখন আর কি করিতে পারে? অনন্যমনে ঠাকুরের শ্রীপদে শরণ লইয়াছিল। অতএব মথুরের কথা বলিলেও আমরা ঠাকুরের গুরুভাবেরই কীর্তন করিতেছি, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

ঠাকুরের প্রতি মথুরের প্রথমাকর্ষণ কি দেখিয়া এবং উহার ক্রমপরিণতি

ঠাকুরের সরল বালকভাব, মধুর প্রকৃতি এবং সুন্দর রূপে মথুর প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে সাধনার প্রথমাবস্থায় ঠাকুরের যখন কখনো কখনো দিব্যোন্মাদাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া এবং আপনার ভিতর তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি কখনো কখনো আপনাকেই পূজা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, যখন অনুরাগের প্রবল বেগে তিনি বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমপূর্ণ নানারূপ অবৈধ, সাধারণ নয়নে অহেতুক আচরণ দৈনন্দিন জীবনে করিয়া ফেলিয়া ইতর-সাধারণের নিন্দা ও সন্দেহ-ভাজন হইতে লাগিলেন, তখন বিষয়ী মথুরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়পরতা বলিয়া উঠিল, “যাঁহাকে প্রথম দর্শনে সুন্দর সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছি, স্বচক্ষে না দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করা হইবে না।” সেইজন্যই মথুরের গোপনে গোপনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের কার্যকলাপ তন্নতন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করা এবং ঐরূপ করিবার ফলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, “যুবক গদাধর অনুরাগ ও সরলতার মূর্তিমান জীবন্ত প্রতিমা; ভক্তি-বিশ্বাসের আতিশয্যেই ঐরূপ করিয়া ফেলিতেছেন!” তাই বুদ্ধিমান বিষয়ী মথুরের তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, “যা রয় সয়, তাই করা ভাল; ভক্তি-বিশ্বাস করাটা ভাল কথা, কিন্তু একেবারে আত্মহারা হইলে চলে কি? উহাতে লোকের নিন্দাভাজন তো হইতে হইবেই, আবার দশে যাহা বলে তাহা না শুনিয়া নিজের মনোমত আচরণ বরাবর করিয়া যাইলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পাগলও হইবার সম্ভাবনা”; কিন্তু ঐসকল কথা ঐরূপে বুঝাইলেও মথুরের অন্তর্নিহিতা সুপ্তা ভক্তি সংসর্গগুণে জাগরিতা হইয়া কখনো কখনো বলিয়া উঠিত, “কিন্তু রামপ্রসাদ প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব সাধককুলেরও তো ভক্তিতে এইরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহারের কথা শুনা গিয়াছে; শ্রীগদাধরের ঐরূপ আচরণ ও অবস্থাও তো সেইরূপ হইতে পারে।” কাজেই, মথুর ঠাকুরের আচরণে বাধা না দিয়া কতদূর কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া পরে যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাই করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বিষয়ী প্রভুর অধীনস্থ সামান্য কর্মচারীর উপর ঐরূপ ব্যবহার কম ধৈর্যের পরিচায়ক নহে।

ভক্তির সংক্রামিকা শক্তিতে মথুরের পরিবর্তন

ভক্তির একটা সংক্রামিকা শক্তি আছে। শারীরিক বিকারসকলের ন্যায় মানসিক ভাবসমূহেরও এক হইতে অন্যে সংক্রমণ আমরা নিত্য দেখিতে পাই। কারণ, একই পদার্থের বিকারে একই নিয়মে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম সমগ্র জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, ইহা আজকাল আর কেবলমাত্র বৈদিক ঋষিদিগের অনুভূতি দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই–জড়বিজ্ঞানও এ কথা প্রায় প্রমাণিত

করিয়া আনিয়াছে। অতএব একের ভক্তিরূপ মানসিক ভাব জাগ্রত হইয়া অন্যের মধ্যে নিহিত সুপ্ত ঐ ভাবকে যে জাগ্রত করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি! এইজন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গকে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার বিশেষ সহায়ক বলিয়া এত করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মথুরের ভাগ্যেও যে ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল, ইহা বেশ অনুমিত হয়। তিনি ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ যতই দিন দিন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভিতরের ভক্তিভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার পর পর কার্যসকলে আমরা ইহার বেশ পরিচয় পাইয়া থাকি। তবে বিষয়ী মনের যেমন হয়—এই ভক্তিবিশ্বাসের উদয়, আবার পরক্ষণেই সন্দেহ—এইরূপ বারবার হইয়া অনেকদিন পর্যন্ত দোলায়মান থাকিয়া তবে মথুরের হৃদয়ে ঠাকুরের আসন দৃঢ় ও অবিচলিত হয়, ইহা সুনিশ্চিত। সেইজন্য দেখিতে পাই, ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরাগ ও আচরণাদি প্রথম প্রথম মথুরের নয়নে ভক্তির আতিশয্য বলিয়া বোধ হইলেও, ঠাকুরের জীবনে দিন দিন ঐসকলের যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি মথুরানাথের মনে সন্দেহের উদয়—ইঁহার তো বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে না? কিন্তু এ সন্দেহে তাঁহার মনে দয়ারই উদয় হয় এবং সুচিকিৎসকের সহায়ে ঠাকুরের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া যাহাতে ঐসকল মানসিক বিকার প্রশমিত হয়, মথুর সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করেন।

বর্তমান ভাবে শিক্ষিত মথুরের ঠাকুরের সহিত তর্ক-বিচার। প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়া থাকে। লাল জবার গাছে সাদা জবা

ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি মথুরবাবুর মন্দ ছিল না এবং ইংরাজী বিদ্যার সহায়ে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী ও ভাবস্রোত মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া "আমিও একটা কেও-কেটা নই, অপর সকলের সহিত সমান"—এইরূপ যে একটা স্বাধীনভাব মানুষের মনে আনিয়া দেয়, সে ভাবটাও মথুরবাবুর কম ছিল না। সেজন্য যুক্তিতর্কাদি দ্বারা ঠাকুরকে ঐরূপে ঈশ্বরভক্তিতে একেবারে আত্মহারা হওয়ার পথ হইতে নিরস্ত করিবার প্রয়াসও আমরা মথুরবাবুর ভিতর দেখিতে পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ঠাকুর ও মথুরবাবুর জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে স্বকৃত নিয়মের (Law) বাধ্য হইয়া চলিতে হয় কিনা—এ বিষয়ে কথোপকথনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঠাকুর বলিতেন, "মথুর বলেছিল, 'ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই!' আমি বল্লুম, 'ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে সে তখনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।' ও কথা সে কিছুতেই মানলে না। বললে, 'লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদা ফুল কখনো হয় না; কেন না, তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কই লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি?' আমি বললুম, 'তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন, তাও করতে পারেন।' সে কিন্তু ও কথা নিলে না। তার পরদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে গেছি; দেখি যে একটা লাল জবাফুলের গাছে, একই ডালে দুটো ফেঁকড়িতে দুটো ফুল—একটি লাল, আর একটি ধপধপে সাদা, এক ছিটেও লাল দাগ তাতে নেই। দেখেই ডালটি সুদ্ধ ভেঙে এনে মথুরের সামনে ফেলে দিয়ে বল্লুম, 'এই দেখ।' তখন মথুর বললে, 'হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে'!" এইরূপে শারীরিক বিকারেই যে ঠাকুরের মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া ঐরূপ ভক্তির আতিশয্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, কখনো কখনো এ বিশ্বাসে মথুর যে তাঁহার সহিত নানা বাদানুবাদ করিয়া তাঁহার ঐ ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুরের অবস্থা লইয়া মথুরের নিত্য বাধ্য হইয়া আন্দোলন

এইরূপে কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের ভাববিহ্বলতাটা শারীরিক রোগবিশেষ মনে করিয়া দয়ায়, এবং কখনো কখনো ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থা ঠিক ঠিক ঈশ্বরভক্তির ফল ভাবিয়া বিস্ময় ও ভক্তিপূর্ণ হইয়া বিষয়ী মথুর তাঁহার সহিত ক্রমে ক্রমে অনেক কাল কাটাইতে এবং তাঁহার বিষয়ে অনেক চিন্তা ও আন্দোলনও যে করিতে থাকেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর স্থির নিশ্চিন্তই

বা থাকেন কিরূপে? ঠাকুর যে নবানুরাগের প্রবল প্রবাহে নিত্যই এক এক নূতন ব্যাপার করিয়া বসেন! আজ পূজার আসনে বসিয়া আপনার ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনলাভ করিয়া পূজার সামগ্রীসকল নিজেই ব্যবহার করিয়াছেন, কাল তিন ঘণ্টা কাল ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরতি করিয়া মন্দিরের কর্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, পরশু ভগবানলাভ হইল না বলিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘষড়াইতে ঘষড়াইতে এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছেন যে, চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে! এইরূপ এক এক দিনের এক এক ব্যাপারের কত কথাই না ঠাকুরের নিকট আমরা শুনিয়াছি!

'মহিম্নঃস্তোত্র' পড়িতে পড়িতে ঠাকুরের সমাধি ও মথুর

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর 'মহিম্নঃস্তোত্র' পাঠ করিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন একেবারে অপূর্ব ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন –

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে

সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥ ৩২

– হে মহাদেব, সমুদ্রগভীর পাত্রে বিশাল হিমালয়শ্রেণীর মতো পুঞ্জ পুঞ্জ কালি রাখিয়া, কোনরূপ অসম্ভব পদার্থের কামনা করিলেও যাঁহার তৎক্ষণাৎ তাহা সৃষ্টি বা রচনা করিয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে–সেই কল্পতরু-শাখার কলম ও পৃথিবী-পৃষ্ঠসদৃশ আয়ত বিস্তৃত কাগজ লইয়া, স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতীও যদি তোমার অনন্ত মহিমার কথা লিখিয়া শেষ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও কখনো তাহা করিতে পারেন না।

শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে ঠাকুর শিবমহিমা হৃদয়ে জ্বলন্ত অনুভব করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া স্তব, স্তবের সংস্কৃত, পর পর আবৃত্তি করা প্রভৃতি সকল কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া কেবলই বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব!" আর তাঁহার গণ্ড বহিয়া দরদরিত ধারে নয়নাশ্রু অবিরাম বক্ষে এবং বক্ষ হইতে বস্ত্র ও ভূমিতে পড়িয়া মন্দিরতল সিক্ত করিতে লাগিল! সে ক্রন্দনের রোল, পাগলের ন্যায় গদগদ বাক্য ও অদৃষ্টপূর্ব আচরণে ঠাকুরবাড়ির ভৃত্য ও কর্মচারীরা চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া কেহ বা অবাক হইয়া শেষটা কি হয় দেখিতে লাগিল, কেহ বা 'ও ছোট ভট্‌চাজের পাগলামি! আমি বলি আর কিছু–আজ কিছু বেশি বাড়াবাড়ি দেখচি'; কেহ বা 'শেষে শিবের ঘাড়ে চড়ে বসবে না তো হে? হাত ধরে টেনে আনা ভাল' ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল এবং রঙ্গরসের ঘটাও যে হইতে থাকিল, তাহা আর বলিতে হইবে না!

ঠাকুরের কিন্তু বাহিরের হুঁশ আদৌ নাই। শিবমহিমানুভবে তন্ময় মন তখন বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে–সেখানে এ জগতের মলিন ভাবরাশি ও কথাবার্তা কখনো পৌঁছে না। কাজেই কে কি ভাবিতেছে, বলিতেছে বা ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা তাঁহার কানে যাইবে কিরূপে?

মথুরবাবু সেদিন ঠাকুরবাড়িতে; তিনিও ঐ গোলমাল ভট্টাচার্য মহাশয়কে লইয়া শুনিতে পাইয়াই সেখানে উপস্থিত হইলেন। কর্মচারীরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মথুরবাবু আসিয়াই ঠাকুরকে ঐ ভাবাপন্ন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ সময়ে কোন কর্মচারী ঠাকুরকে শিবের নিকট হইতে বলপূর্বক সরাইয়া আনার কথা কহায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাহার মাথার উপর মাথা

আছে, সে-ই যেন এখন ভট্টাচার্য মহাশয়কে স্পর্শ করিতে যায়!” কর্মচারীরা কাজেই ভীত হইয়া আর কিছু বলিতে বা করিতে সাহসী হইল না। পরে কতক্ষণ বাদে ঠাকুরের বাহ্য-জগতের হুঁশ আসিল এবং ঠাকুরবাড়ির কর্মচারীদের সহিত মথুরবাবুকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালকের ন্যায় ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কি?” মথুরও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে; পাছে কেহ না বুঝিয়া তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম!”

ঠাকুরের নিকট অপরের সহজে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত

ঠাকুর আমাদের নিকট একদিন তাঁহার সাধনকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তখন তখন (সাধনকালে) যারা এখানে আসত, এখানকার সঙ্গে থেকে তাদের অতি শীঘ্র ঈশ্বর-উদ্দীপন হতো। বরানগর থেকে দুজন আসত–তারা জেতে খাট, কৈবত্ কি তামলি এমনি একটা; বেশ ভাল; খুব ভক্তি-বিশ্বাস করত ও প্রায় আসত। একদিন পঞ্চবটীতে তাদের সঙ্গে বসে আছি–আর তাদের ভেতর একজনের একটা অবস্থা হলো! দেখি বুকটা লাল হয়ে উঠেছে, চোখ ঘোর লাল, ধারা বেয়ে পড়ছে, কথা কইতে পাচ্ছে না, দাঁড়াতে পাচ্ছে না; দুবোতল মদ খাইয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি! কিছুতেই তার আর সে ভাব ভাঙে না! তখন ভয় পেয়ে মাকে বলি, ‘মা, একে কি করলি? লোকে বলবে, আমি কি করে দিয়েছি! ওর বাপ-টাপ সব বাড়িতে আছে; এখনই বাড়ি যেতে হবে।’ তার বুকে হাত বুলিয়ে দিই আর মাকে ঐরকম বলি। তবে কতক্ষণ বাদে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ি যায়।”

মথুরের ঠাকুরকে একাধারে শিব-শক্তিরূপে দর্শন

ঠাকুরের জ্বলন্ত জীবনের সংস্পর্শে মথুরবাবুরও যে ঐরূপ একটা অদ্‌ভুত অবস্থার একসময়ে উদয় হইয়া তাঁহার বিশ্বাস-ভক্তি সহস্রগুণে বর্ধিত হইয়া উঠে, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। সর্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে লম্বা বারান্দাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় আপন মনে গোঁ-ভরে পদচারণ করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ি ও পঞ্চবটীর মধ্যে যে একটি পৃথক বাড়ি আছে, যাহাকে এখনো ‘বাবুদের কুঠি’ বলিয়া ঠাকুরবাড়ির কর্মচারীরা নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহারই একটি প্রকোষ্ঠে মথুরবাবু তখন একাকী আপন মনে বসিয়াছিলেন। মথুরবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ঠাকুর যেখানে বেড়াইতেছিলেন সে স্থানটির ব্যবধান বড় বেশি না হওয়ায় বেশ নজর হইতেছিল। কাজেই মথুরবাবু কখনো ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ-ভরে বিচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, আবার কখনো বা বিষয়-সম্বন্ধীয় এ কথা সে কথার মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিতেছিলেন। মথুরবাবু যে বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ঐরূপে লক্ষ্য করিতেছেন, ঠাকুর তাহা আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। আর জানা থাকিলেই বা কি?–দুই জনের সামাজিক, সাংসারিক ও অন্য সর্বপ্রকার অবস্থার অন্তর এতদূর যে, জানা থাকিলেও কেহ কাহারও জন্য বড় বেশি ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। সে পক্ষে বরং ঠাকুরই ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় ও অন্যমনা না থাকিলে, মথুরবাবুর কথা টের পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া যাইবার কথা ছিল। কারণ, ধনী, মানী, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু, যাঁহাকে ঠাকুরবাড়ির ও রানীর সমস্ত বিষয়ের মালিক বলিলেও চলে এবং যাঁহার সুনয়নে পড়িয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর এখনো ঐ স্থান হইতে তাড়িত হন নাই, তাঁহার সম্মুখে একজন সামান্য নগণ্য দরিদ্র পূজক ব্রাহ্মণ, যাঁহাকে লোকে তখন নির্বোধ, উন্মাদ, অনাচারী বলিয়াই জানিত ও বিদ্রূপাদি করিতেও ছাড়িত না, কেমন করিয়া ভীত সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে বল? কিন্তু ঘটনা অভাবনীয়, অচিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল–মথুরবাবুই হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!

ঠাকুর বলেন, "বললুম, তুমি এ কি করচ? তুমি বাবু, রানীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, ওঠ। সে কি তা শোনে! তারপর ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা ভেঙে বললে—অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল! বললে—'বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখচি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম, চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই! এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।' এই বলে আর কাঁদে! আমি বললুম, 'আমি তো কই কিছু জানি না, বাবু'—কিন্তু সে কি শোনে! ভয় হলো, পাছে এ কথা কেউ জেনে গিন্নিকে, রানী রাসমণিকে বলে দেয়। সেই বা কি ভাববে—হয়তো বলবে কিছু গুণ টুন করেছে! অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়! মথুর কি সাধে এতটা করত—ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। মথুরের ঠিকুজিতে কিন্তু লেখা ছিল, বাবু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।"

ঐ দর্শনের ফল

এখন হইতে মথুরের বিশ্বাস অনেকটা পাকা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, ইহাই তাঁহার প্রথম আভাস পাওয়া যে, প্রথম দর্শনেই যাঁহার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অপরে না বুঝিয়া নিন্দা করিলেও যাঁহার মনোভাব ও আচরণ তিনি অনেক সময় ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন, সে ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন; জগদম্বা তাঁহারই প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে হয়, মন্দিরের পাষাণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকার কথামত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন!—এখন হইতে ঠাকুরের সহিত মথুরবাবুর ঘনিষ্ঠতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল।

মথুরের মহাভাগ্য-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ

মথুরের বাস্তবিকই মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন, যতদিন শরীর থাকিবে ততদিন ভাল-মন্দ দুই প্রকার কর্ম মানুষকে করিতে হইবেই—সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, মুক্ত পুরুষদিগেরও! সাধারণ মানব স্বয়ং-ই নিজকৃত সুকৃত-দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। এখন মুক্ত পুরুষদিগের শরীরকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করে কে? তাঁহারা তো আর নিজে উহা করিতে পারেন না? কারণ, সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবে যে অভিমান-অহঙ্কার, তাহা তো চিরকালের মতো তাঁহাদের ভিতর হইতে উড়িয়া-পুড়িয়া গিয়াছে; তবে উহা করে কে? আবার কর্মফল তো অবশ্যম্ভাবী এবং মুক্ত পুরুষদিগের শরীরটা যতদিন জীর্ণ পত্রের মতো পড়িয়া না যায়, ততদিন তো উহার দ্বারা ভাল-মন্দ কতকগুলি কাজ হইবেই হইবে। শাস্ত্র এখানে বলেন—যে সকল বদ্ধ পুরুষেরা তাঁহাদের সেবা করে, ভালবাসে, তাহারাই মুক্তাত্মাদিগের কৃত শুভকর্মের এবং যাহারা তাঁহাদের দ্বেষ করে, তাহারাই তাঁহাদের শরীরকৃত অশুভ কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।[2] সাধারণ মুক্ত পুরুষদিগের সেবার দ্বারাই যদি ঐরূপ ফললাভ হয়, তবে ঈশ্বরাবতারদিগের ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ সেবার যে কতদূর ফল তাহা কে বলিতে পারে?

ঠাকুরের দিন দিন গুরুভাবের অধিকতর বিকাশ ও মথুরের তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া অনুভব

দিনের পর দিন যতই চলিয়া যাইতে লাগিল, মথুরবাবুও ততই ঠাকুরের গুরুভাবের পরিচয় স্পষ্ট—স্পষ্টতর পাইতে থাকিয়া, ঠাকুরের প্রতি অবিচলা ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে অনেক ঘটনা হইয়া গেল; যথা—ভগবদ্বিরহে ঠাকুরের বিষম গাত্রদাহ ও তাহার চিকিৎসা; ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন ও বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মথুরবাবুর দ্বারা আহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে ঠাকুরের অবতারত্ব-প্রতিপাদন, মহাবৈদান্তিক জ্ঞানী তোতাপুরীর আগমন

ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ, ঠাকুরের বৃদ্ধা জননীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও বাস ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বোক্ত অদ্‌ভুত দর্শনের দিন হইতে মথুরানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সহিতই বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য মথুর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকারকে দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বাকে, পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পাঁইজর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ পরাইবার সাধ হইল—মথুর তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন; ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাব-সাধনকালে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বেশভূষা করিবেন ইচ্ছা হইল—মথুরানাথ তৎক্ষণাৎ এক 'স্যুট' ডায়মণ্ডকাটা অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ি, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। পানিহাটি উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া মথুর তৎক্ষণাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে সেখানে ভিড়ে-ভাড়ে তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুপ্তভাবে দারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে মথুরের অদ্‌ভুত সেবার কথা যেমন আমরা একদিকে শুনিয়াছি, তেমনি আবার অপরদিকে নষ্টস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎ ভাবের উদয় হয় কিনা পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া-পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুর ভাবাবস্থায় "কি! আমাকে বিষয়ী করতে চাস?"—বলিয়া মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা, জমিদারি-সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার-কামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া মথুরের ঐ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। ঐসকল ঘটনাবলী হইতেই আমরা মথুরবাবুর মনে যে ঠাকুরের প্রতি ক্রমে ক্রমে ভক্তি দৃঢ়া অচলা হইয়া আসিতেছিল ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। আর ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপই বা হয় কিরূপে? ঠাকুরের অদ্‌ভুত অলৌকিক দেবদুর্লভ স্বভাব যেমন একদিকে মথুরের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনের পর দিন অধিকতর সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল, অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের অপার অহেতুক ভালবাসা মথুরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মথুর দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়াও ইঁহাকে ত্যাগীর ভাব হইতে হটাইতে পারিলাম না, সুন্দরী নারীগণের দ্বারা ইঁহার মনে বিকার উপস্থিত করিতে পারিলাম না, পার্থিব মান-যশেও—কারণ মানুষকে মানুষ ভগবান বলিয়া পূজা করা অপেক্ষা অধিক মান আর কি দিতে পারে—ইঁহাকে কিছুমাত্র টলাইতে বা অহঙ্কৃত করিতে পারিলাম না, পার্থিব কোন বিষয়েই ইনি প্রার্থী নন—অথচ তাঁহার চরিত্রের সমস্ত দুর্বলতার কথা জানিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছেন না, আপনার হইতেও আপনার করিয়া ভালবাসিতেছেন, বিপদ হইতে বার বার উদ্ধার করিতেছেন, আর কিসে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় তাহাই চিন্তা করিতেছেন!—ইহার কারণ কি? বুঝিলেন, ইনি মনুষ্যশরীরধারী হইলেও 'যে দেশে রজনী নাই' সেই রাজ্যের লোক। ইঁহার ত্যাগ অদ্‌ভুত, সংযম অদ্‌ভুত, জ্ঞান অদ্‌ভুত, ভক্তি অদ্‌ভুত, সকল প্রকার কর্ম অদ্‌ভুত এবং সর্বোপরি তাঁহার ন্যায় দুর্বল অথচ অহঙ্কৃত জীবের উপর ইঁহার করুণা ও ভালবাসা অদ্‌ভুত!

আর একটি কথাও মথুরানাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন—এ অদ্‌ভুত চরিত্রের মাধুর্য! এমন অলৌকিক ঐশী শক্তির বিকাশ ইঁহার ভিতর দিয়া হইলেও, ইনি নিজে যে বালক, সেই বালক! এতটুকু অহঙ্কার নাই—এ কি চমৎকার ব্যাপার! নিজের ভিতর যে কোন ভাব উঠুক না কেন, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার এতটুকু লুকানো নাই! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর এক ভাব! যাহা মনে, তাহাই অকপটে মুখে ও কার্যে প্রকাশ—অথচ অন্যের যাহাতে কোনরূপ হানি হইতে পারে, তাহা কখনো বলা নাই—নিজের শারীরিক কষ্ট হইলেও তাহা বলা নাই! ইহা কি মানবে সম্ভব?

মথুরের ভক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া হালদার পুরোহিত

মথুরানাথের কালীঘাটের হালদার পুরোহিত, ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর অবিচলা ভক্তি দেখিয়া হিংসায় জরজর; ভাবে—'লোকটা বাবুকে কোনরূপ গুণটুন্ করিয়া ঐরূপ বশীভূত করিয়াছে।' ভাবে—'তাই তো, বাবুটাকে হাত করবার আমার এতকালের চেষ্টাটা এই লোকটার জন্য সব পণ্ড? আবার সরল বালকের ভান দেখায়। যদি এতই সরল তো বলে দিক 'বশীকরণের' ক্রিয়াটা। আমার যত বিদ্যা সব ঝেড়ে ঝুড়ে বাবুটা একটু বাগে আসছিল, এমন সময় এ আপদ কোথা হতে এল?'

এদিকে মথুরের ভক্তিবিশ্বাস যতই বাড়িতে থাকিল, ততই ঠাকুরের সঙ্গে সদাসর্বক্ষণ কি করিয়া থাকিতে পাইব, কি করিয়া তাঁহার আরও অধিক সেবা করিতে পাইব—এই সকল চিন্তাই বলবতী হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে ঠাকুরকে অনুরোধ-নির্বন্ধ করিয়া কলিকাতায় জানবাজারের বাটীতে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন; অপরাহ্নে 'বাবা, চল বেড়াইয়া আসি' বলিয়া সঙ্গে করিয়া গড়ের মাঠ প্রভৃতি কলিকাতার নানাস্থানে বেড়াইয়া লইয়া আসেন। 'বাবাকে কি যাহাতে তাহাতে খাইতে দেওয়া চলে?'—ভাবিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক স্যুট বাসন নূতন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন-পানীয় দেন; উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিচ্ছদ প্রভৃতি পরাইয়া দেন, আর বলেন—'বাবা, তুমিই তো সকলের (বিষয়ের) মালিক, আমি তোমার দেওয়ান বই তো নয়; এই দেখ না, তুমি সোনার থালে, রূপার বাটি-গেলাসে খাইবার পর ঐসকলের দিকে আর না দেখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলে, আর আমি আবার তুমি খাইবে বলিয়া সে সমস্ত মাজাইয়া ঘষাইয়া তুলিয়া রাখি, চুরি গেল কিনা দেখি, ভাঙা ফুটা হইল কিনা খবর রাখি, আর এইসব লইয়াই ব্যস্ত থাকি।'

বেনারসী শালের দুর্দশা

এই সময় এক জোড়া বেনারসী শালের দুর্দশার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। মথুর উহা সহস্র মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করেন এবং অমন ভাল জিনিস আর কাহাকে দিব ভাবিয়া, নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করেন। শালজোড়াটি বাস্তবিকই মূল্যবান—কারণ, উহার তখনকার (৫০ বৎসর পূর্বের) দামই যখন অত ছিল, তখন বোধ হয় সে প্রকার জিনিস এখন আর দেখিতেই পাওয়া যায় না। শালখানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের মতো মহা আনন্দিত হইয়া এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বার বার উহা নিজে দেখিতে লাগিলেন এবং অপরকে ডাকিয়া দেখাইতে ও মথুরবাবু উহা এত দরে কিনিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বালকের ন্যায় ঠাকুরের মনে অন্য ভাবের উদয় হইল! ভাবিলেন—"এতে আর আছে কি? কতকগুলো ছাগলের লোম বই তো নয়? যে পঞ্চভূতের বিকারে সকল জিনিস, সেই পঞ্চভূতেই তো এটাও তৈরি হয়েছে; আর শীতনিবারণ—তা লেপ-কম্বলেও যেমন হয়, এতেও তেমনি; অন্যসকল জিনিসের ন্যায় এতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না; বরং গায়ে দিলে মনে হয় আমি অপর সকলের চেয়ে বড়, আর অভিমান অহঙ্কার বেড়ে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে গিয়ে পড়ে! এতে এত দোষ!" এই সকল কথা ভাবিয়া শালখানি ভূমিতে ফেলিয়া—ইহাতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, 'থু, থু' বলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘষিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া পুড়াইবার উপক্রম করিলেন! এমন সময় কে সেখানে আসিয়া পড়িয়া উহা তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করে! মথুরবাবু শালখানির ঐরূপ দুর্দশা হইয়াছে জানিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বলিয়াছিলেন—'বাবা বেশ করেছেন!'

ঠাকুরের নির্লিপ্ততা

উপরে লিখিত ঘটনাদি হইতেই বেশ বুঝা যায়, মথুরবাবু ঠাকুরকে নানা ভোগ-সুখ ও আরামের ভিতর রাখিবার চেষ্টা করিলেও ঠাকুরের মন কত উচ্চে, কোথায় নিরন্তর থাকিত! যেখানেই থাকুন না কেন, এ মন সর্বদা আপন ভাবে বিভোর! অপর সকল মন যেখানে কেবল অন্ধকারের

উপর অন্ধকাররাশিই পুঞ্জীকৃত দেখে, সেখানে এ মন দেখে—আলোয় আলো—ছায়াবিহীন হ্রাসবৃদ্ধিরহিত আলো—যে আলোর সম্মুখে চন্দ্র-সূর্য-তারকার উজ্জ্বলতা, বিদ্যুতের চকমকানি, অগ্নির তো 'কা কথা'—সব মিটমিটে, প্রায় অন্ধকারতুল্য! সেই আলোকময় রাজ্যেই এ মনের নিরন্তর থাকা! আর এই হিংসাদ্বেষকপটতাপূর্ণ কামক্রোধের চির-আবাসভূমি এই রাজ্যে, যেন এ মনের দু-দিনের জন্য করুণায় বেড়াইতে আসা, এইমাত্র! অতএব মথুরবাবুর ভোগসুখ-বিলাসিতাপূর্ণ জানবাজারের বাড়িতে থাকিলেও, যে ঠাকুর সেই ঠাকুর—নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার, আপন ভাবে আপনি নিশিদিন মাতোয়ারা!

হালদার পুরোহিতের শেষ কথা

জানবাজারের বাড়িতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একদিন অর্ধবাহ্য দশায় পড়িয়া আছেন, নিকটে কেহ নাই। ঠাকুরের সমাধি ভাঙিতেছে; বাহ্যজগতের অল্পে অল্পে হুঁশ আসিতেছে। এমন সময় পূর্বোক্ত হালদার পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে একাকী তদবস্থ দেখিয়াই ভাবিল, ইহাই সময়। নিকটে যাইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বার বার বলিতে লাগিল—'অ বামুন, বল্ না—বাবুটাকে কি করে হাত করলি? কি করে বাগালি, বল না? ঢঙ করে চুপ করে রইলি যে? বল্ না?' বার বার ঐরূপ বলিলেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না—কারণ, ঠাকুরের তখন কথা কহিবার মতো অবস্থাই ছিল না—তখন কুপিত হইয়া 'যা শালা বললি না' বলিয়া সজোরে পদাঘাত করিয়া অন্যত্র গমন করিল। নিরভিমান ঠাকুর, মথুরবাবু এ কথা জানিতে পারিলে ক্রোধে ব্রাহ্মণের উপর একটা বিশেষ অত্যাচার করিয়া বসিবে, বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে—কিছুকাল পরে—অন্য অপরাধে মথুরবাবুর কোপে পড়িয়া ব্রাহ্মণ তাড়িত হইলে একদিন কথায় কথায় মথুরানাথকে ঐ কথা বলেন। শুনিয়া মথুর ক্রোধে দুঃখে বলিয়াছিলেন, "বাবা, এ কথা আমি আগে জানলে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণের মাথা থাকত না।"

মথুরানাথ ও তৎপত্নী জগদম্বা দাসীর ঠাকুরের উপর ভক্তি ও ঠাকুরের ঐ পরিবারের সহিত ব্যবহার

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সস্ত্রীক মথুরবাবু প্রাণে প্রাণে যে কতদূর অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে যে কতদূর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি—ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়। উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন, "বাবা মানুষ নন; ওঁর কাছে কথা লুকিয়ে কি করব? উনি সকল জানতে পারেন, পেটের কথা সব টের পান!" তাঁহারা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন, তাহা নহে—কার্যতঃ সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতেন। বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন শয়ন পর্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন। বাবা সকল সময়ে সর্বাবস্থায় অন্দরে অবাধ গমনাগমন করিবেন, তাহাতে কি? উনি অন্দরে না যাইলেই বা কি?—বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলের সকল প্রকার মনোভাব যে জানেন, ইহার পরিচয় তাঁহারা অনেক সময় পাইয়াছেন। আর পুরুষের, স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিবার যে প্রধান অনর্থ—মানসিক বিকার, সে সম্বন্ধে বাবাকে ঘরের দেয়াল বা অন্য কোন অচেতন পদার্থবিশেষ বলিলেও চলে! অন্দরের কোন স্ত্রীলোকেরই মনে তো বাবাকে দেখিয়া, অপর কোন পুরুষকে দেখিয়া যেরূপ সঙ্কোচ-লজ্জার ভাব আসে, সেরূপ আসে না। মনে হয় যেন তাঁহাদেরই একজন, অথবা একটি পাঁচ বছরের ছেলে! কাজেই সখীভাবে ভাবিত ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিয়া ৺দুর্গাপূজার সময়ে অন্দরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাহিরে আসিয়া প্রতিমাকে চামর-বীজন করিতেছেন, কখনো বা কোন যুবতীর স্বামীর আগমনে তাহাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া বেশভূষা পরাইয়া স্বামীর সহিত কিভাবে কথাবার্তা কহিতে হয়, তাহা কানে কানে শিখাইতে শিখাইতে শয়নমন্দিরে স্বামীর পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া আসিতেছেন—এরূপ অনেক কথা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে

জানিয়া আমরা ইঁহাদের ঠাকুরের উপর কি এক অপূর্ব ভাব ছিল, ভাবিয়া অবাক হইয়া থাকি! ঠাকুরের গুরুভাবে এই সকল স্ত্রীলোকদিগের মনে তাঁহার প্রতি দেবতাজ্ঞান যেমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি আবার তাঁহার অহেতুক ভালবাসার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ইঁহারা তাঁহাকে কতদূর আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কতদূর নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে উঠা-বসা ও অন্য সকল চেষ্টা ব্যবহারাদি করিতেন, তাহা আমরা কল্পনাতেও ঠিক ঠিক আনিতে পারি না!

ঠাকুরের বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ

একদিকে ঠাকুরের মথুরবাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত যেমন অমানুষী কামগন্ধহীন স্বার্থমাত্রশূন্য সখীর ন্যায় ভালবাসার প্রকাশ, অপরদিকে আবার বাহিরে পুরুষদিগের নিকট, পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝে দিব্যজ্ঞান ও অনুপম বুদ্ধির সহিত ব্যবহারাদি দেখিলে মনে হয়, এ বহু-বিপরীত ভাবের একত্র সম্মিলন তাঁহার ভিতরে কিরূপে হইয়াছিল? এ বহুরূপী ঠাকুর কে?

দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহমূর্তি ভগ্ন হওয়ায় বিধান লইতে পণ্ডিতসভার আহ্বান

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে ৺রাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্তিদ্বয় তখন প্রতিদিন প্রাতে পার্শ্বের শয়নঘর হইতে মন্দিরমধ্যে সিংহাসনে আনিয়া বসানো হইত এবং পূজা-ভোগ-রাগাদির অন্তে দুই প্রহরে পুনরায় শয়নমন্দিরে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া আসা হইত। আবার অপরাহ্নে বেলা চারিটার পর সেখান হইতে সিংহাসনে আনিয়া পুনরায় সান্ধ্য আরাত্রিক ও ভোগ-রাগাদির অন্তে রাত্রে রাখিয়া আসা হইত। মন্দিরের মর্মর পাথরের মেঝে একদিন জল পড়িয়া পিছল হওয়ায়, ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় পড়িয়া গিয়া পূজক ব্রাহ্মণ ৺গোবিন্দজীর মূর্তিটির পা ভাঙিয়া ফেলিলেন! একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পূজারী তো নিজে আঘাত পাইলেন, আবার ভয়ে কম্পমান! বাবুদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। কি হইবে? ভাঙা বিগ্রহে তো পূজা চলে না—এখন উপায়? রানী রাসমণি ও মথুরবাবু উপায়-নির্ধারণের জন্য শহরের সকল খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সসম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। যে সকল পণ্ডিতেরা কার্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহাদেরও মতামত সংগৃহীত হইতে লাগিল। একেবারে হইচই ব্যাপার এবং পণ্ডিতবর্গের সম্মানরক্ষার জন্য বিদায়-আদায়ে টাকারও শ্রাদ্ধ! পণ্ডিতেরা পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া বার বার বুদ্ধির গোড়ায় নস্য দিয়া বিধান দিলেন—'ভগ্ন মূর্তিটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তৎস্থলে অন্য নূতন মূর্তি স্থাপিত হউক।' কারিগরকে মূর্তিগঠনের আদেশ দেওয়া হইল।

ঠাকুরের মীমাংসা ও ঐ বিষয়ের শেষ কথা

সভাভঙ্গকালে মথুরবাবু রানীমাতাকে বলিলেন, "ছোট ভট্টাচার্য মহাশয়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা তো হয় নাই? তিনি কি বলেন জানিতে হইবে"—বলিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন! ঠাকুর ভাবমুখে বলিতে লাগিলেন, "রানীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসানো হতো—না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো? এখানেও সেই রকম করা হোক—মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে তেমন পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য?" সকলে ব্যবস্থা শুনিয়া অবাক! তাই তো, কাহারও মাথায় তো এ সহজ যুক্তিটি আসে নাই? মূর্তিটি যদি ৺গোবিন্দজীর দিব্য আবির্ভাবে জীবন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে সে আবির্ভাব তো ভক্তের হৃদয়ের গভীর ভক্তি-ভালবাসা-সাপেক্ষ, ভক্তের প্রতি কৃপা বা করুণায় হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা থাকিলে সে আবির্ভাব ভগ্ন মূর্তিতেই বা না হইতে পারে কেন? মূর্তিভঙ্গের দোষাদোষ তো আর সে আবির্ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না! তারপর, যে মূর্তিটিকে শ্রীভগবানের এতকাল পূজা করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার অঙ্গবিশেষের হানি হওয়াতে যথার্থ ভক্তের হৃদয় হইতে কি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হানি হইতে পারে? আবার বৈষ্ণবাচার্যগণ ভক্তকে ঠাকুরের

আত্মবৎ সেবা করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি যখন যে অবস্থায় যাহা করিতে ভালবাসি, ঠাকুরও তাহাই ভালবাসেন ভাবিয়া সেইরূপ করিতেই বলেন। সে পক্ষ হইতেও মূর্তিটির ত্যাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না। অতএব স্মৃতিতে যে ভগ্ন মূর্তিতে পূজাদি করিবে না বলিয়া বিধান আছে, তাহা প্রেমহীন, ভক্তিপথে সবে মাত্র অগ্রসর ভক্তের জন্যই নিশ্চয়। যাহা হউক, অভিমানী পণ্ডিতবর্গের কাহারও কাহারও ঠাকুরের মীমাংসার সহিত মতভেদ হইল, কেহ বা আবার মতভেদপ্রকাশে বিদায়-আদায়ের ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া স্বীয় মত পরিষ্কার প্রকাশ করিলেন না! আর যাঁহারা পাণ্ডিত্যের সহায়ে একটু যথার্থ জ্ঞান-ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঠাকুরের ঐ মীমাংসা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর স্বহস্তে মূর্তিটি জুড়িয়া দিলেন ও তাঁহার পূজাদি পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কারিগর নূতন মূর্তি একটি গড়িয়া আনিলে, উহা ৺গোবিন্দজীর মন্দিরমধ্যে একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল মাত্র, উহার প্রতিষ্ঠা আর করা হইল না। রানী রাসমণি ও মথুরবাবু পরলোকগমন করিলে, তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ কেহ কখনো কখনো ঐ নূতন মূর্তির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন না কোন সাংসারিক বিঘ্ন সেই সেই কালে উপস্থিত হওয়ায় ঐ কার্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই ৺গোবিন্দজীর নূতন মূর্তিটি এখনো সেইভাবেই রাখা আছে।

[1] নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে প্রচলিত উক্তিটির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা – এক বৈরাগী সাধু বহুকাল পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গের সাথী – তসলা, লোটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মোটটি নিজেই বহন করিতেন। একদিন সাধুর মনে হইল, একটি ঘোড়া পাই তো মোটটি আর নিজে বহিয়া কষ্ট পাই না। ভাবিয়াই 'এক ঘোড়া, দেলায় দে রাম' বলিয়া চিৎকার করিয়া ঘোড়া-ভিক্ষার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। তখন সেই স্থান দিয়া রাজার পল্টন যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি ঘোটকীর শাবক হওয়ায় উহার আরোহী ভাবিতে লাগিল, "তাইতো, পল্টন এখনি এ স্থান হইতে অন্যত্র কুচ করিবে, ঘোটকী হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু সদ্যোজাত শাবকটি কেমন করিয়া লইয়া যাই?" ভাবিয়া চিন্তিয়া শাবকটিকে বহন করিবার জন্য একটি লোকের অন্বেষণে বাহির হইয়াই 'ঘোড়া দেলায় দে রাম'-সাধুর সহিত দেখা হইল এবং সাধুকে বলিষ্ঠ দেখিয়া কোন বিচার না করিয়া একেবারে বলপূর্বক তাঁহাকে দিয়া শাবকটি বহন করাইয়া লইয়া চলিল। সাধু তখন ফাঁপরে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন – 'উলটা বুঝিলু রাম!' কোথায় ঘোড়া তাঁহার মোটটি ও তাঁহাকে বহন করিবে, না, তাঁহাকে ঘোটকী-শাবক বহন করিতে হইল!

[2] বেদান্তসূত্র, ৩য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ২৬ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে – "তথা শাট্যায়েনিনঃ পঠন্তি – 'তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্' ইতি। তথৈব কৌষীতকিনঃ – 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্' ইতি।"

পরবর্তী ভাষ্যেও ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

৩.৯. সপ্তম অধ্যায়: গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

– গীতা, ১০।২০

জানবাজারে মথুরের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া ৺দুর্গোৎসবের কথা

এ বৎসর মথুরানাথের জানবাজারের বাটীতে ৺দুর্গোৎসবে বিশেষ আনন্দ। কারণ, শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় বৎসরে বৎসরে আবালবৃদ্ধবনিতার যে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ, তাহা তো আছেই, তাহার উপর 'বাবা' আবার কয়েকদিন হইতে মথুরের বাটী পবিত্র করিয়া ঐ আনন্দ সহস্রগুণে বর্ধিত করিয়াছেন। কাজেই আনন্দের আর পরিসীমা নাই। মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া নির্ভয়ে আবদার, অনুরোধ ও হেতুরহিত হাস্য-নৃত্যাদির চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরন্তর ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 'বাবার' সেইরূপ অপূর্ব আচরণে, প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন! আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও অনুভূতি হইতেছে! দালান জম জম করিতেছে–উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আর বাটীর সর্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে!

হইবারই কথা। ধনী মথুরের রাজসিক ভক্তি, ঘর দ্বার ও মা-র প্রতিমা বিচিত্র সাজে সাজাইতে, পত্র পুষ্প ফল মূল মিষ্টান্নাদি পূজার দ্রব্যসম্ভারের অপর্যাপ্ত আয়োজনে এবং নহবতাদি বাদ্যভাণ্ডের বাহুল্যে মনোনিবেশ করিয়া বাহিরের কিছুরই যেমন ত্রুটি রাখে নাই, তেমনি আবার এ অদ্ভুত ঠাকুরের অলৌকিক দেবভাব বাহিরের ঐ জড় জিনিসসকলকে স্পর্শ করিয়া উহাদের ভিতর সত্য সত্যই একটা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে! কাজেই তুষারমণ্ডিত হিমালয়বক্ষে চিরশ্যামল দেবদারুকুঞ্জের গম্ভীর সৌন্দর্যে সাধু-তপস্বীর গৈরিক বসন যে শান্তিময় শোভা আনয়ন করে, সুন্দরী রমণীর কোলে স্তন্যপায়ী সুন্দর শিশু যে করুণামাখা সৌন্দর্যের বিস্তার করে, সুন্দর মুখে পবিত্র মনোভাব যে অপূর্ব প্রকাশ আনিয়া দেয়, মথুরবাবুর মহাভাগ্যোদয়ে তাঁহার ভবনে আজ সেই সৌন্দর্যের বিচিত্র সমাবেশ! পূজাসংক্রান্ত নানা কার্যের সুবন্দোবস্তে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও বাবু ও তাঁহার গৃহিণী যে ঐ ভাবসৌন্দর্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অব্যক্ত আনন্দে পূর্ণ হইতেছিলেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না।

দিবসের পূজা শেষ হইল। তাঁহারাও কোনরূপে একটু সময় করিয়া 'বাবার' ও জগন্মাতার শ্রীচরণে মহানন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

ঠাকুরের ভাবসমাধি ও রূপ

সন্ধ্যা সমাগতা। এইবার শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরাত্রিক হইবে। 'বাবা' এখন অন্দরে বিচিত্র ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার পুরুষ-শরীরের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন! কথায়, চেষ্টায় কেবলই প্রকাশ–যেন তিনি জন্মে জন্মে যুগে যুগে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দাসী বা সখী। জগদম্বাই তাঁহার প্রাণ-মন, সর্বস্বের সর্বস্ব; মা-র সেবার জন্যই তাঁহার দেহ ও জীবনধারণ। ঠাকুরের মুখমণ্ডল ভাবে প্রেমে সমুজ্জ্বল, অধরে মৃদু মৃদু হাসি, চক্ষের চাহনি, হাত-পা নাড়া, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়! ঠাকুরের পরিধানে মথুরবাবু-প্রদত্ত সুন্দর গরদের চেলি–স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় করিয়া পরিয়াছেন–কে বলিবে যে, তিনি পুরুষ! ঠাকুরের রূপ তখন বাস্তবিকই যেন ফাটিয়া পড়িত–এমন সুন্দর রং ছিল; ভাবাবেশে সেই রং আরও উজ্জ্বল হইয়া

উঠিত, শরীর দিয়া যেন একটা জ্যোতি বাহির হইত! সে রূপ দেখিয়া লোকে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না, অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত! শ্রীশ্রীমা-র মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ-ইষ্ট-কবচখানি তখন সর্বদা ধারণ করিতেন, তাহার সোনার রঙে ও গায়ের রঙে যেন মেশামেশি হইয়া এক হইয়া যাইত! ঠাকুরের নিজ মুখেও শুনিয়াছি—"তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল রে যে, লোকে চেয়ে থাকত; বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুত! লোকে চেয়ে থাকত বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, 'মা, তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে', গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা'; তবে কতদিন পরে ওপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।"

কামারপুকুরে ঠাকুরের রূপ-গুণে জনতার কথা

রূপের কথায় ঠাকুরের জীবনের আর একটি ঘটনা এখানে মনে আসিতেছে। এই সময় প্রতি বৎসর বর্ষার সময় ঠাকুর তিন-চারি মাস কাল জন্মভূমি কামারপুকুরে কাটাইয়া আসিতেন। কামারপুকুরে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে শিওড় গ্রামে ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়িতেও যাইতেন। ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামের ভিতর দিয়া শিওড়ে যাইবার পথ। সেখানকার লোকেরাও উপরোধ-অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে সেখানে কয়েক দিন এই অবসরে বাস করাইয়া লইতেন। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত ভাগিনেয় হৃদয় তখন সর্বদা ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সর্বপ্রকার সেবা করিতেন।

কামারপুকুরে থাকিবার কালে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার মুখের দুটো কথা শুনিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যূষেই প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা বাড়ির পাট-ঝাঁট সারিয়া স্নান করিয়া জল আনিবার জন্য কলসী কক্ষে লইয়া আসিতেন ও কলসীগুলি ঠাকুরের বাটীর নিকট হালদারপুকুরের পাড়ে রাখিয়া চাটুয্যেদের বাড়িতে আসিয়া বসিতেন; এবং ঠাকুরের বাটীর মেয়েদের ও ঠাকুরের সহিত কথাবার্তায় এক-আধ ঘণ্টা কাল কাটাইয়া পরে স্নানে যাইতেন। এইরূপ নিত্য হইত। এই অবকাশে আবার কেহ কেহ রাত্রে বাটীতে কোন ভালমন্দ মিষ্টান্নাদি তৈয়ার করা হইলে, তাহার অগ্রভাগ তুলিয়া রাখিয়া তাহা লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে দিয়া যাইতেন। রঙ্গরসপ্রিয় ঠাকুর ইঁহারা রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে আসিয়া উপস্থিত হন দেখিয়া কখনো কখনো রঙ্গ করিয়া বলিতেন—"শ্রীবৃন্দাবনে নানাভাবে নানা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের মিলন হতো—পুলিনে জল আনতে গিয়ে গোষ্ঠ-মিলন, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর যখন গরু চরিয়ে ফিরতেন তখন গোধূলি-মিলন, তারপর রাত্রে রাসে মিলন—এই রকম, এই রকম সব আছে। তা, হাঁগা, এটা কি তোদের স্নানের সময়ের মিলন নাকি?" তাঁহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেন। মেয়েরা দিবসের রন্ধনাদি করিতে চলিয়া যাইবার পর পাড়ার পুরুষেরা ঠাকুরের নিকট আসিয়া যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা বসিয়া কথাবার্তা কহিত। অপরাহ্ণে আবার স্ত্রীলোকেরা আসিত এবং সন্ধ্যার পর রাত্রে আবার পুরুষদের কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। আর দূর-দূরান্তর হইতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষেরা আসিত, তাহারা প্রায় অপরাহ্ণেই আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া যাইত। এইরূপে সমস্ত দিন রথ-দোলের ভিড় লাগিয়া থাকিত।

ঠাকুরের রূপ লইয়া ঘটনা ও তাঁহার দীনভাব

একবার কামারপুকুর হইতে ঐরূপে জয়রামবাটী ও শিওড় যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনুক্ষণ ভাবসমাধিতে থাকায় ঠাকুরের অঙ্গ বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় সুকোমল হইয়া গিয়াছিল। অল্প দূর হইলেও পালকি, গাড়ি ভিন্ন যাইতে পারিতেন না। সেজন্য জয়রামবাটী হইয়া শিওড় যাইবার জন্য পালকি আনা হইয়াছে। হৃদয় সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ঠাকুর আহারান্তে পান খাইতে খাইতে লাল চেলি পরিয়া, হস্তে সুবর্ণ ইষ্ট-কবচ ধারণ করিয়া পালকিতে উঠিতে আসিলেন।

দেখেন, রাস্তায় পালকির নিকটে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে; চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে! দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন–"হৃদু, এত ভিড় কিসের রে?"

হৃদয়–কিসের আর? এই তুমি আজ ওখানে যাবে, (লোকদিগকে দেখাইয়া) এরা এখন আর তোমাকে কিছুদিন দেখতে পাবে না, তাই সব তোমায় দেখতে এসেছে।

ঠাকুর–আমাকে তো রোজ দেখে; আজ আবার কি নূতন দেখবে?

হৃদয়–এই চেলি পরে সাজলে গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোঁট দুখানি লাল টুকটুকে হলে খুব সুন্দর দেখায়; তাই সব দেখবে আর কি?

তাঁহার সুন্দর রূপে ইহারা আকৃষ্ট, শুনিয়াই ঠাকুরের মন এক অপূর্ব ভাবে পূর্ণ হইল। ভাবিলেন–হায় হায়! এরা সব এই দুই দিনের বাহিরের রূপটা লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে চায় না!

রূপে বিতৃষ্ণা তো তাঁহার পূর্ব হইতেই ছিল; এই ঘটনায় তাহা আরও সহস্রগুণে বর্ধিত হইল। বলিলেন –

"কি? একটা মানুষকে মানুষ দেখবার জন্য এত ভিড় করবে? যাঃ, আমি কোথাও যাব না। যেখানে যাব, সেইখানেই তো লোকে এই রকম ভিড় করবে?"—বলিয়াই ঠাকুর বাটীর ভিতরে নিজ কক্ষে যাইয়া কাপড়-চোপড় সব খুলিয়া ক্ষোভে দুঃখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দীনভাবে পূর্ণ ঠাকুর সেদিন বাস্তবিকই জয়রামবাটী ও শিওড়ে যাইলেন না। হৃদয় ও বাটীর সকলে কত মতে বুঝাইল, সকলি ভাসিয়া গেল। আপনার শরীরটার উপর এ অলৌকিক পুরুষের যে কি তুচ্ছ, হেয় বুদ্ধি ছিল, তাহা একবার হে পাঠক, ভাবিয়া দেখ! আর ভাব আমাদের কথা, কি রূপ রূপ করিয়া পাগল!–কি মাজা-ঘষা, আরশি, চিরুণী, ক্ষুর, ভাঁড়, বেসন, সাবান, এসেন্স, পোমেডের ছড়াছড়ি! আর পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'হাড়মাসের খাঁচাটার' উপর নিত্য ভ্রমের বাড়াবাড়ি করিয়া একেবারে উৎসন্ন যাইবার হুড়াহুড়ি! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শুদ্ধ পবিত্রভাবে পূর্ণ থাকা, আর এটা–দুই কি এক কথা হে বাপু? যাক আমরা জানবাজারের পূর্ব কথাই বলি।

ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গাইতে জগদম্বা দাসীর কৌশল

জগদম্বার আরাত্রিক আরম্ভ হয় হয়, ঠাকুরের কিন্তু সে ভাব আর ভাঙে না! মথুরবাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে কোনরূপে প্রকৃতিস্থ করিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত আরতি দেখিতে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশের বিরাম নাই দেখিয়া এবং তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়াটাও যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। ভাবিলেন–করি কি? আমি যাহাকেই রাখিয়া চলিয়া যাইব, একবার আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিলেই সে নিশ্চয়ই তথায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিবে। আর 'বাবা'ও তো ভাবে বিহ্বল হইলে নিজেকে নিজে সামলাইতে পারেন না। একবার তো ঐরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় গুলের আগুনের উপর পড়িয়া যাইয়াও হুঁশ হয় নাই–পরে সে ঘা কতদিনে কত চিকিৎসায় সারিয়াছে। একাকী রাখিয়া যাইলে এ আনন্দের দিনে পাছে ঐরূপ একটা বিভ্রাট হয়–তখন উপায়? কর্তাই বা কি বলিবেন? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে একটা উপায় আসিয়া জুটিল। তাড়াতাড়ি নিজের বহুমূল্য গহনাসকল বাহির করিয়া বাবাকে পরাইতে পরাইতে তাঁহার কানের গোড়ায় বার বার বলিতে লাগিলেন, 'বাবা, চল; মার যে আরতি হইবে, মাকে চামর করিবে না?'

ঠাকুরের সমাধি হইতে সাধারণ অবস্থায় নামিবার প্রকার শাস্ত্রসম্মত

ভাবাবেশে ঠাকুর যতই কেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হউন না, যে মূর্তি ও ভাবে তাঁহার মন সমাধিস্থ হইয়াছে, তাহা ছাড়া অপর সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ভাব-সম্বন্ধ হইতে তাঁহার মন যতই কেন দূরে

যাইয়া পড়ুক না, এটা কিন্তু সকল সময়েই দেখা গিয়াছে যে, ঐ মূর্তির নাম বা ঐ মূর্তির ভাবের অনুকূল কথা কয়েকবার ঠাকুরের কানের কাছে বলিলেই, তখনই তাঁহার মন উহাতে আকৃষ্ট হইত এবং উহা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত। একাগ্রচিত্তের নিয়ম ও আচরণ যে ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা মহামুনি পতঞ্জলি প্রভৃতির যোগশাস্ত্রে সবিস্তার না হউক সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকের ঠাকুরের মনের ঐরূপ আচরণের কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আর বহু পুণ্যফলে যাঁহারা কিছুমাত্রও চিত্তের একাগ্রতা জীবনে লাভ বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আরও সহজে এ কথা বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা প্রকৃত ঘটনারই অনুসরণ করি।

সখীভাবে ঠাকুরের ৺দুর্গাদেবীকে চামর করা

মথুরবাবুর পত্নীর কথা ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্ধ-বাহ্যদশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা ঠাকুর-দালানে পৌঁছিবামাত্র আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুরও স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া চামরহস্তে প্রতিমাকে বীজন করিতে লাগিলেন। দালানের এক দিকে স্ত্রীলোকেরা এবং অপর দিকে মথুরবাবু-প্রমুখ পুরুষেরা দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার আরতি দেখিতে লাগিলেন। সহসা মথুরবাবুর নয়ন স্ত্রীলোকদিগের দিকে পড়িবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর পার্শ্বে বিচিত্রবস্ত্রভূষণে অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যবিস্তার করিতে করিতে কে দাঁড়াইয়া চামর করিতেছেন! বার বার দেখিয়াও যখন বুঝিতে পারিলেন না তিনি কে, তখন ভাবিলেন, হয়তো তাঁহার পত্নীর পরিচিতা কোন সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহিণী নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন।

আরতি সাঙ্গ হইল। অন্তঃপুরবাসিনীরা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন ও নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃতা হইলেন। ঠাকুরও ঐরূপ অর্ধবাহ্য অবস্থায় মথুরবাবুর পত্নীর সহিত ভিতরে যাইলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সাধারণ ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়া অলঙ্কারাদি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে পুরুষদিগের নিকট আসিয়া বসিলেন, ও নানা ধর্মপ্রসঙ্গ তুলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে সরলভাবে বুঝাইয়া চিত্তহরণ করিতে লাগিলেন।

মথুরের তাঁহাকে ঐ অবস্থায় চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা

কিছুক্ষণ পরে মথুরবাবু কার্যান্তরে অন্দরে গিয়া কথায় কথায় তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরতির সময় তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে চামর করিতেছিলেন?" মথুরবাবুর পত্নী তাহাতে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপে চামর করিতেছিলেন। তা হইতেই পারে, মেয়েদের মতো কাপড়-চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না।" এই বলিয়া মথুরবাবুকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। মথুরবাবু একেবারে অবাক হইয়া বলিলেন, "তাইতো বলি—সামান্য বিষয়েও না ধরা দিলে বাবাকে চেনে কার সাধ্য? দেখ না, চব্বিশ ঘণ্টা দেখে ও একত্র থেকেও আজ তাঁকে চিনতে পারলুম না।"

বিজয়া দশমী

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পরমানন্দে কাটিয়া গিয়াছে। আজ বিজয়া দশমীর প্রাতঃকাল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীজগদম্বার সংক্ষেপ পূজা সারিয়া লইতেছে, কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দর্পণ-বিসর্জন করিতে হইবে। পরে সন্ধ্যার পর প্রতিমাবিসর্জন। মথুরবাবুর বাটীর সকলেরই মনে যেন একটা বিষাদের ছায়া—কিসের যেন একটা অব্যক্ত অপরিস্ফুট অভাব—যেন একটা হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত অপরিহার্য আশু বিচ্ছেদাশঙ্কা! পৃথিবীর অতি বিশুদ্ধ আনন্দের পশ্চাতেও এইরূপ একটা বিষাদছায়া সর্বদা সংলগ্ন আছে। এই নিয়মের বশেই বোধ হয় অতি বড় ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনেও সময়ে সময়ে অসহ্য ঈশ্বরবিরহের সন্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। আর কঠিন মানব, আমাদের হৃদয়ও বিজয়ার দিনে প্রতিমাবিসর্জন দিতে যাইয়া উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ

করে! মথুর-পত্নীর তো কথাই নাই–আজ প্রাতঃকাল হইতে হস্তে কর্ম করিতে করিতে অঞ্চলে অনেকবার নয়নাশ্রু মুছিয়া চক্ষু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইতেছে।

মথুরের আনন্দে ঐ বিষয়ে হুঁশ না থাকা

বাহিরে মথুরবাবুর কিন্তু অদ্যকার কথা এখনও ধারণা হয় নাই। তিনি পূর্ববৎই আনন্দে উৎফুল্ল! শ্রীশ্রীজগদম্বাকে গৃহে আনিয়া এবং 'বাবা'র অলোকসামান্য সঙ্গ ও অচিন্ত্য কৃপাবলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনাতে আপনি ভরপুর হইয়া রহিয়াছেন। বাহিরে কি হইবে না হইবে, তাহা এখন খোঁজে কে? খুঁজিবার আবশ্যকই বা কি? মাকে ও বাবাকে লইয়া এইরূপেই দিন কাটিবে। এমন সময় পুরোহিতের নিকট হইতে সংবাদ আসিল–এইবার মা-র বিসর্জন হইবে, বাবুকে নিচে আসিয়া মাকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া যাইতে বল।

দেবীমূর্তি-বিসর্জন দিবে না বলিয়া মথুরের সংকল্প

কথাটা মথুরবাবু প্রথম বুঝিতেই পারিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার হুঁশ হইল–আজ বিজয়া দশমী! আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এক বিষম আঘাত পাইলেন। শোকে দুঃখে পূর্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আজ মাকে বিসর্জন দিতে হইবে– কেন? বাবা ও মা-র কৃপায় আমার তো কিছুরই অভাব নাই। মনের আনন্দের যেটুকু অভাব ছিল, তাহা তো বাড়িতে মা-র শুভাগমনে পূর্ণ হইয়াছে। তবে আবার কেন মাকে বিসর্জন দিয়া বিষাদ ডাকিয়া আনি? না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙিতে পারিব না। মা-র বিসর্জন, মনে হইলেও যেন প্রাণ কেমন করিয়া উঠে!" এরূপ নানা কথা ভাবিতে ও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হয়। পুরোহিত লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন, বাবু একবার আসিয়া দাঁড়ান, মা-র বিসর্জন হইবে। মথুর বিষম বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি মাকে বিসর্জন দিতে দিব না। যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হইবে–খুনোখুনি পর্যন্ত হইতে পারে।" এই বলিয়া মথুরবাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য বাবুর ঐরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল এবং পূজার দালানে যাইয়া সকল কথা পুরোহিত মহাশয়কে জানাইল। সকলে অবাক!

সকলে বুঝাইলেও মথুরের উত্তর

তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বাবু বাটীর ভিতরে যাঁহাদের সম্মান করিতেন, তাঁহাদের বুঝাইতে পাঠাইলেন। তাঁহারাও যাইলেন, বুঝাইলেন, কিন্তু বাবুর সে ভাবান্তর দূর করিতে পারিলেন না। বাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "কেন? আমি মা-র নিত্যপূজা করিব। মা-র কৃপায় আমার যখন সে ক্ষমতা আছে তখন কেন বিসর্জন দিব?" কাজেই তাঁহারা আর কি করেন, বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন–মাথা খারাপ হইয়াছে! কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বা উপায় কি? হঠকারী মথুরকে বাটীর সকলেরই ভালরকম জানা ছিল! সকলেই জানিত, ক্রুদ্ধ হইলে বাবুর দিক-বিদিক-জ্ঞান থাকে না। কাজেই তাঁহার অনভিমতে দেবীর বিসর্জনের হুকুম দিয়া কে তাঁহার কোপে পড়িবে বল? সে বিষয়ে কেহই অগ্রসর হইলেন না। গিন্নির নিকট অতিরঞ্জিত হইয়া সংবাদ পৌঁছিল; তিনি ভয়ে ডরে অভিভূতা হইয়া ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন; কারণ, 'বাবা' ভিন্ন তাঁহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার আর কে আছে?—বাবুর যদি বাস্তবিকই মাথা খারাপ হইয়া থাকে!

ঠাকুরের মথুরকে বুঝান

ঠাকুর যাইয়াই দেখিলেন, মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মথুর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকিতে বিসর্জন দিতে পারিব না। বলিয়া দিয়াছি, নিত্যপূজা করিব। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?"

ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঃ–এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখনো থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে–সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন।"

ঠাকুরের কথা ও স্পর্শের অদ্‌ভুত শক্তি

কি এক অদ্‌ভুত মোহিনী শক্তিই যে ঠাকুরের স্পর্শে ও কথায় ছিল, তাহা বলিয়া বুঝানো কঠিন! দেখা গিয়াছে, অনেক সময় লোকে আসিয়া তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া খুব তর্ক করিতেছে–তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই লইতেছে না, ঠাকুর তখন কৌশলে কোনরূপে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দিতেন; আর অমনি তখন হইতে তাহার মনের স্রোত যেন ফিরিয়া যাইত এবং ঐ ব্যক্তি কথাটা গুটাইত–ঠাকুরের কথা বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া! ঐ বিষয়ে তিনি আমাদের কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেনও–"কথা কইতে কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস? যে শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।" এইরূপে স্পর্শমাত্রেই অপরের যথার্থ সত্য উপলব্ধি করিবার পথের অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান শক্তিসমূহকে নিজের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাদের প্রভাব কমাইয়া দেওয়া বা ঐসকলকে চিরকালের মতো একেবারে হরণ করার সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। দেখিয়াছি, যে সকল কথা অপরের মুখ হইতে বাহির হইয়া কাহারও মনে কোনরূপ ভাবোদয় করিল না, সেই সকলই আবার তাঁহার মুখনিঃসৃত হইয়া মানবহৃদয়ে এমন অদম্য আঘাত করিয়াছে যে, সেইক্ষণ হইতে শ্রোতার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! সে সকল পাঠককে সবিস্তারে বলিবার অন্য কোন সময় চেষ্টা করিব। এখন মথুরবাবুর কথাই বলিয়া যাই।

মথুর প্রকৃতিস্থ কিরূপে হইয়াছিল

ঠাকুরের কথায় ও স্পর্শে মথুর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার ঐরূপে প্রকৃতিস্থ হওয়া, ঠাকুরের ইচ্ছা এবং স্পর্শে কোনরূপ দর্শনাদি হইয়াছিল কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে মনে হয়, উহাই সম্ভব। মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি তাঁহার হৃদয়কন্দর অপূর্ব আলোকে উজ্জ্বল করিয়া বিদ্যমান–দেখিতে পাইয়াই তাঁহার আনন্দ আরও শতগুণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া বাহিরের প্রতিমা রক্ষা করিবার মনে যে ঝোঁক উঠিয়াছিল, তাহা কমিয়া গিয়াছিল। যথার্থ গুরু এইরূপে উচ্চতর লক্ষ্যের উজ্জ্বল ছটায় শিষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দেন। কাজেই তখন নিম্নাঙ্গের ভাব-দর্শনাদি তাহার মন হইতে আপনা-আপনি খসিয়া যায়।

মথুরের ভক্তিবিশ্বাসের অবিচলতা ঠাকুরকে পরীক্ষার ফলে

মথুরের ভক্তি-বিশ্বাস আমাদের চক্ষে অদ্‌ভুত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা যে নানারূপে ঠাকুরকে যাচাইবার ফলেই উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মথুর ধন দিয়া, সুন্দরী রমণী দিয়া, নিজের ও বাটীর সকলের উপর অকুণ্ঠ প্রভুতা দিয়া, ঠাকুরের আত্মীয়বর্গ–যথা, হৃদয় প্রভৃতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, সকল ভাবে ঠাকুরকে যাচাইয়া দেখিয়াছিলেন–ইনি অপর সাধারণের ন্যায় বাহ্যিক কিছুতেই ভুলেন না। বাহ্যিক ভাব-ভক্তির কপটাবরণ ইঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির

কাছে অধিকক্ষণ আত্মগোপন করিয়া রাখিতে পারে না! আর নরহত্যাদি দুষ্কর্ম করিয়াও মন-মুখ এক করিয়া যথার্থ সরলভাবে যদি কেহ ইঁহার শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহার সাত খুন মাপ করিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, দিন দিন উচ্চ লক্ষ্য চিনিবার ও ধরিবার সামর্থ্য দেন এবং কি এক বিচিত্র শক্তি-বলে তাহার জন্য অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়!

মথুরের ভাবসমাধিলাভের ইচ্ছা

ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া এবং ভাবসমাধিতে তাঁহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষয়ী মথুরেরও এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি একবার দেখিবে ও বুঝিবে। মথুরের তখন হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, 'বাবা ইচ্ছামাত্রেই ও-সকল করিয়া দিতে পারেন। কারণ, শিব বল, কালী বল, ভগবান বল, কৃষ্ণ বল, রাম বল–সবই তো উনি নিজে!–তবে আর কি! কৃপা করিয়া কাহাকেও নিজের কোন মূর্তি যে দেখাইতে পারিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি!' বাস্তবিক ইহা এক কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে। ঠাকুরের দর্শনলাভের পর যাহারাই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে, তাহাদেরই ক্রমে ক্রমে এইরূপ ধারণার উদয় হইত! সকলেরই মনে হইত, উঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়–উনি ইচ্ছামাত্রেই ধর্মজগতের সমস্ত সত্যই কাহাকেও উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারেন। আধ্যাত্মিক শক্তি ও নিজ পূত চরিত্রবলে একজনের প্রাণেও ঐরূপ ভাবের উদয় করিতে পারা কঠিন–তো অনেকের প্রাণে! উহা কেবল এক অবতার-পুরুষেই সম্ভবে। তাঁহাদের অবতারত্বের বিশিষ্ট প্রমাণসমূহের মধ্যে ইহা একটি কম প্রমাণ নহে। আর, এ মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণার রাজ্যে তাঁহাদের নামে অনেক ভেল জুয়াচুরি চলিবে দেখিতে পাইয়াই, তাঁহারা সকলের সমক্ষে ডঙ্কা মারিয়া বলিয়া যান, "আমার অদর্শনের পর অনেক ভণ্ড 'আমি অবতার, আমি দুর্বল জীবের শরণ ও মুক্তিদাতা' বলিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে; সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিও না।" [1]

ঐ জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা

মথুরের মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইবামাত্র ঠাকুরকে যাইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বাবা, আমার যাহাতে ভাবসমাধি হয়, তাহা তোমায় করিয়া দিতেই হইবে।" ঠাকুর ঐরূপ স্থলে সকল সময়েই যেমন বলিতেন, সেইরূপই বলিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বলিলেন, "ওরে, কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রেই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই তো বেশ আছিস–এদিক-ওদিক দুদিক চলছে। ও-সব হলে এদিক (সংসার) থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে। তখন কি করবি?"

উদ্ধব ও গোপীদের দৃষ্টান্তে ঠাকুরের তাহাকে বুঝান

ও-সব কথা সেদিন শুনে কে? মথুর একেবারে 'নাছোড়বান্দা'–'বাবা'কে ভাবসমাধি করিয়া দিতেই হইবে। ঐরূপ বুঝানোয় ফল হইল না দেখিয়া ঠাকুর আর এক গ্রাম চড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "ওরে, ভক্তেরা কি দেখতে চায়? তারা সাক্ষাৎ সেবাই চায়। দেখলে শুনলে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্যজ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীরা বিরহে আকুল! শ্রীকৃষ্ণ তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন। উদ্ধব জ্ঞানী কিনা! বৃন্দাবনের কান্নাকাটি ভাব, খাওয়ানো, পরানো ইত্যাদি উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের শুদ্ধ ভালবাসাটাকে মায়িক ও ছোট বলে দেখত; তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে সেও এক কথা। উদ্ধব গিয়ে গোপীদের বুঝাতে লাগল–'তোমরা সব কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে অমন কেন করছ? জান তো, তিনি ভগবান, সর্বত্র আছেন; তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে নেই, এটা তো হতে পারে না। অমন করে হা-হুতাশ না করে একবার চক্ষু মুদে দেখ দেখি, দেখবে, তোমাদের হৃদয়মাঝে সেই নবঘনশ্যাম মুরলীবদন বনমালী সর্বদা রয়েছেন'–ইত্যাদি। তাই শুনে গোপীরা বলেছিল, 'উদ্ধব,

তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এসব কি কথা বলছ! আমরা কি ধ্যানী, না জ্ঞানী, না ঋষি-মুনির মতো জপ-তপ করে তাঁকে পেয়েছি? আমরা যাঁকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি-গুজিয়েছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, ধ্যান করে তাঁকে আবার ঐ সব করতে যাব? আমরা তা কি আর করতে পারি? যে মন দিয়ে ধ্যান-জপ করব, সে মন আমাদের থাকলে তো তা দিয়ে ঐসব করব! সে মন যে অনেক দিন হলো, কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করেছি! আমাদের বলতে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং-বুদ্ধি করে জপ করব?' উদ্ধব তো শুনে অবাক! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর ও কি বস্তু, তা বুঝতে পেরে তাদের গুরু বলে প্রণাম করে চলে এল! এতেই দেখ না, ঠিক ঠিক ভক্ত কি তাঁকে দেখতে চায়? তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার অধিক–দেখা, শুনা, সে চায় না; তাতে তার ভাবের হানি হয়।"

ইহাতেও যখন মথুর বুঝিলেন না, তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা কি জানি বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।"

মথুরের ভাবসমাধি হওয়া ও প্রার্থনা

তাহার কয়েক দিন পরেই মথুরের একদিন ভাবসমাধি! ঠাকুর বলিতেন, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়! চক্ষু লাল, জল পড়ছে; ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্চে! আর বুক থর থর করে কাঁপচে। আমাকে দেখে একেবারে পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, 'বাবা ঘাট হয়েছে! আজ তিন দিন ধরে এই রকম, বিষয়কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতে মন যায় না! সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।' বললুম–'কেন? তুই যে ভাব হোক, বলেছিলি?' তখন সে বললে, 'বলেছিলুম, আনন্দও আছে; কিন্তু হলে কি হয়, এদিকে যে সব যায়। বাবা, ও তোমার ভাব তোমাকেই সাজে। আমাদের ও সবে কাজ নেই! ফিরিয়ে নাও।' তখন আমি হাসি আর বলি, 'তোকে তো এ কথা আগেই বলেছি?' সে বললে, 'হাঁ বাবা, কিন্তু তখন কি অত-শত জানি যে, ভূতের মতো এসে ঘাড়ে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমার চব্বিশ ঘণ্টা ফিরতে হবে?—ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারব না!' তখন তার বুকে আবার হাত বুলিয়ে দি!"

ত্যাগী না হইলে ভাবসমাধি স্থায়ী হয় না

বাস্তবিক ভাব বা সমাধি হইলেই হয় না। উহার বেগ সহ্য করিতে–উহাকে রক্ষা করিতে পারে কয়টা লোক? এতটুকু বাসনার পশ্চাৎটান থাকিতে উহা পারা অসম্ভব। ঈশ্বরীয় পথের পথিককে শাস্ত্র সেজন্যই পূর্ব হইতে নির্বাসনা হইতে বলিয়াছেন–'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ'–একমাত্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যই অমৃতত্ব দিতে সমর্থ। ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে নিম্নাঙ্গের সমাধি হইল, কিন্তু ভিতরে ধন হোক, মান হোক ইত্যাদি বাসনার রাশি গজ গজ করিতেছে, এরূপ লোকের ঐ ভাব কখনই স্থায়ী হয় না।

ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত–কাশীপুরের বাগানে আনীত জনৈক ভক্ত যুবকের কথা

আচার্য শঙ্কর যেমন বলিয়াছেন –

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্ ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।

আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে, নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ॥

– বিবেকচূড়ামণি, ৭৯

—অর্থাৎ, যথার্থ বৈরাগ্যরূপ সম্বল অগ্রে সংগ্রহ না করিয়া, ভবসমুদ্রের পারে যাইবার জন্য যাহারা অগ্রসর হয়, বাসনা-কুম্ভীর তাহাদের ঘাড়ে ধরিয়া ফিরাইয়া বলপূর্বক অতলজলে ডুবাইয়া দেয়।–

বাস্তবিক, কতই না ঐরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের নিকট দেখিয়াছি! কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তখন অবস্থান করিতেছেন; একদিন কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত একটি উন্মনা যুবককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। ইঁহাদের পূর্বে কখনো আসিতে আমরা দেখি নাই। আসিবার কারণ, সঙ্গী যুবকটিকে একবার ঠাকুরকে দেখাইবেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক কি অবস্থা সহসা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের মতামত শ্রবণ করিবেন। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া গেল।

যুবকটিকে দেখিলাম—বুক ও মুখ লাল, দীনভাবে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেছে; ভগবানের নামে ঘন ঘন কম্পন ও পুলক; এবং দু-নয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা বহায় চক্ষুর্দ্বয় রক্তিম ও কিঞ্চিৎ স্ফীতও হইয়াছে। দেখিতে শ্যামবর্ণ, না স্থূল না কৃশ, মুখমণ্ডল ও অবয়বাদি সুশ্রী এবং সুগঠিত, মস্তকে শিখা। পরিধানে একখানি মলিন সাদাধুতি, গায়ে উত্তরীয় ছিল না বলিয়াই মনে হয়; পায়ে জুতা নাই; এবং শরীর-সংস্কার বা রক্ষার বিষয়ে একেবারে উদাসীন! শুনিলাম—হরিসংকীর্তন করিতে করিতে একদিন সহসা এইরূপ উত্তেজিত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তদবধি আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, নিদ্রা নাই এবং ভগবানলাভ হইল না বলিয়া দিবারাত্র কান্নাকাটি ও ভূমে গড়াগড়ি! আজ কয়েক দিন হইল, ঐরূপ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক ভাবের আতিশয্যে উপস্থিত বিকারসকল চিনিবার ঠাকুরের শক্তি। গুরু যথার্থই ভবরোগ-বৈদ্য

আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের আতিশয্যে মানবশরীরে যেসকল বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্বিষয় ধরিবার ও চিনিবার শক্তি ঠাকুরের যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কুত্রাপি দেখি নাই! গুরুগীতাদিতে শ্রীগুরুকে 'ভবরোগ-বৈদ্য' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে; তাহার ভিতর যে এত গূঢ় অর্থ আছে, তাহা ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের পূর্বে একটুও বুঝি নাই। শ্রীগুরু যে বাস্তবিকই মানসিক রোগের বৈদ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবে মানবমনে যে যে বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা দেখিবামাত্র চিনিয়া, লক্ষণ দেখিয়া ধরিয়া অনুকূল হইলে—উহা যাহাতে সাধকের মনে সহজ হইয়া দাঁড়ায় ও তাহাকে উচ্চতর ভাবসোপানে আরোহণ করিবার ক্ষমতা দেয়, তাহার এরূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং প্রতিকূল বুঝিলে তাহা যাহাতে সাধকের অনিষ্টসাধন না করিয়া ধীরে ধীরে অপনীত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েরও ব্যবস্থা করেন, এ কথা পূর্বে কিছুই জানা ছিল না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ঐরূপ করিতে দেখিয়াই মনে সে কথার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। দেখিয়াছি—পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইলে অমনি ঠাকুর ব্যবস্থা করিতেছেন, "তুই এখন কয়েকদিন কাহারও হাতে খাস নি, নিজে রেঁধে খাস। এ অবস্থায় বড় জোর নিজের মার হাতে খাওয়া চলে, অপর কারও হাতে খেলেই ঐ ভাব নষ্ট হয়ে যায়! পরে ঐটে সহজ হয়ে দাঁড়ালে, তখন আর ভয় নেই!" গোপালের মার বায়ুবৃদ্ধিতে শারীরিক যন্ত্রণা দেখিয়া বলিতেছেন, "ও যে তোমার হরি-বাই, ও গেলে কি নিয়ে থাকবে? ও থাকা চাই; তবে যখন বিশেষ কষ্ট হবে, তখন যা হোক কিছু খেও।" জনৈক ভক্তের বাহ্যিক শৌচে অত্যন্ত অভ্যাস ও অনুরাগের জন্য শরীর ভুলিয়া মন একেবারে ঈশ্বরে তন্ময় হয় না দেখিয়া গোপনে ব্যবস্থা করিতেছেন, "লোকে যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, সেইখানকার মাটিতে তুমি একদিন ফোঁটা পরে ঈশ্বরকে ডেকো।" একজনের সংকীর্তনে উদ্দাম শারীরিক বিকার তাহার উন্নতির প্রতিকূল দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, "শালা, আমায় ভাব দেখাতে এসেছেন। ঠিক ঠিক ভাব হলে কখনো এমন হয়? ডুবে যায়; স্থির হয়ে যায়। ও কি? স্থির হ, শান্ত হয়ে যা। (অপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া) এ সব কেমন ভাব জান? যেমন এক ছটাক দুধ কড়ায় করে আগুনে বসিয়ে ফোটাচ্ছে; মনে হচ্চে, যেন কতই দুধ, এক কড়া; তারপর নামিয়ে দেখ, একটুও নেই, যেটুকু দুধ ছিল, সব কড়ার গায়েই লেগে গেছে।" একজনের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেছেন, "যাঃ শালা, খেয়ে লে, পরে লে, সব করে লে, কিন্তু কোনটাই ধর্ম কচ্চিস বলে করিসনি"; ইত্যাদি কত লোকের কত কথাই বা বলিব!

ঐ যুবকের অবস্থা সম্বন্ধে ঠাকুরের মীমাংসা

সেই যুবককে দেখিয়াই এক্ষেত্রে ঠাকুর বলিলেন, "এ যে দেখছি মধুরভাবের[2] পূর্বাভাস! কিন্তু এ অবস্থা এর থাকবে না, রাখতে পারবে না। এ অবস্থা রক্ষা করা বড় কঠিন। স্ত্রীলোককে ছুঁলেই (কামভাবে) এ ভাব আর থাকবে না! একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।" যাহা হউক, আগন্তুক ভক্তগণ ঠাকুরের কথায় যুবকটির যে মাথা খারাপ হয় নাই, এ বিষয়টি জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলেন। তাহার পর কিছু কাল গত হইলে সংবাদ পাওয়া গেল–ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে–যুবকটির কপাল ভাঙিয়াছে! সংকীর্তনের ক্ষণিক উত্তেজনায় সে ভাগ্যক্রমে যত উচ্চে উঠিয়াছিল, হায় হায়–ভাবাবসাদে দুর্ভাগ্যক্রমে আবার ততই নিম্নে নামিয়াছে! পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঐরূপ হইবার ভয়েই সর্বদা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং ঐরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দিতেন।

ঠাকুরের মথুরকে সকল বিষয় বালকের মত খুলিয়া বলা ও মতামত লওয়া

মথুরের যেমন 'বাবা'র নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, 'বাবা'রও আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে, মাতার নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখা যেমন, অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। পরাবিদ্যার সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে মানবের অবস্থা যে উন্মাদ, পিশাচ বা বালকবৎ সাধারণ নয়নে প্রতীত হইয়া থাকে, শাস্ত্রের এ কথা আমরা পাঠককে পূর্বেই বলিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, জগৎপূজ্য আচার্য শঙ্কর এ কথাও স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ মানব, অতুল রাজ-বৈভব উপভোগ করিয়া বা কৌপীনমাত্রেকসম্বল ও ভিক্ষান্নে উদরপোষণ করিয়া ইতর-সাধারণে যাহাকে বড় সুখের অবস্থা বা বড় দুঃখের অবস্থা বলিয়া গণ্য করে, তাহার ভিতর থাকিয়াও, কিছুতেই বিচলিত হন না; সর্বদা আত্মানন্দে আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া থাকেন।

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ

ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।

ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-

শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥

– বিবেকচূড়ামণি, ৫৪৩

—অর্থাৎ, 'মুক্ত ব্যক্তি কখনো মূঢ়ের ন্যায়, আবার কখনো পণ্ডিতের ন্যায়, আবার কখনো বা রাজবৎ বিভবশালী হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাকে কখনো পাগলের ন্যায়, আবার কখনো ধীর, স্থির, বুদ্ধিমানের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। আবার কখনো বা তাঁহাকে নিত্যাবশ্যকীয় আহার্য প্রভৃতির জন্যও যাচ্ঞারহিত হইয়া অজগরের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখা যায়। তিনি কোথাও বা বহু মান প্রাপ্ত হন, আবার কোথাও বা অপমানিত হন, আবার কোথাও বা একেবারে অপরিচিতভাবে থাকেন। এইরূপে সকল অবস্থায় তিনি পরমানন্দে বিভোর ও অবিচলিত থাকেন।' জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা, তখন মহামহিম অবতার-পুরুষদিগের ঐরূপে সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকা ও বালকবৎ ব্যবহার করাটা আর অধিক কথা কি? অতএব মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু মথুরের তাঁহার সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিয়া এত কাল কাটাইতে পারাটা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে!

মথুরের কল্যাণের দিকে ঠাকুরের কতদূর দৃষ্টি ছিল

কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখনো কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে, অমনি তাহা মথুরকে বলা ছিল। সমাধিকালে বা অন্য সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া "এটা কেন হলো, বল দেখি?" "ওটা তোমার মনে কি হয়–বল দেখি?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা ছিল। তাহার পয়সার যাহাতে সদ্ব্যয় হয়, দেবসেবার পয়সাতে যাহাতে যথার্থ দেবসেবা হইয়া অতিথি, কাঙাল, সাধু-সন্ত প্রভৃতি পালিত হয় ও তাহার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে ঠাকুরের লক্ষ্য থাকিত–এইরূপ সকল বিষয়ে কত কথাই না আমরা শুনিয়াছি। পুণ্যবতী রানী রাসমণি ও মথুরের শরীর যাইবার অনেক পরে যখন আমরা সকলে ঠাকুরের নিকট গিয়াছি, তখনও ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ঐ ভাবের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এখানে মন্দ হইবে না।

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত–ফলহারিণী-পূজার প্রসাদ ঠাকুরের চাহিয়া লওয়া

মথুরের আমল হইতে বন্দোবস্ত ছিল, ৺মা কালী ও ৺রাধাগোবিন্দের ভোগরাগাদির পর বড় থালে করিয়া এক থাল প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন ও এক থাল ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ঘরে নিত্য আসিবে ও ঠাকুর নিজে ও তাঁহার নিকট যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা প্রসাদ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে মা কালী ও রাধাগোবিন্দজীকে যে বিশেষ ভোগরাগাদি দেওয়া হইত, তাহারও কিয়দংশ ঐরূপে ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত।

বর্ষাকাল। আজ ফলহারিণী পূজার দিন। এ দিনে ঠাকুরবাড়িতে বেশ একটি ছোট-খাট আনন্দোৎসব হইত। শ্রীশ্রীজগন্মাতা কালিকার বিশেষ পূজা করিয়া নানা প্রকারের ফল-মূল ভোগ-নিবেদন করা হইত। আজও তদ্রূপ হইতেছে। নহবত বাজিতেছে। ঠাকুরের নিকট অদ্য যোগানন্দ স্বামীজী প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে ঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাব-সমাধির স্বভাবতঃ উদয়

বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে ঠাকুরের শরীর-মনে বিশেষ বিশেষ দেবভাব প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণবদিগের পর্বদিনে বৈষ্ণবভাব এবং শাক্তদিগের পর্বদিনে শক্তিসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রকাশিত হইত। যথা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়, বিশেষতঃ ঐ পূজার সন্ধিক্ষণে, অথবা ৺কালীপূজাদিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে আবিষ্ট, নিস্পন্দ ও কখনো কখনো বরাভয়কর পর্যন্ত হইয়া যাইতেন; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্বদিনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর ভাবে আরূঢ় হওয়ায় কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ তাঁহার শরীরে দেখা যাইত–এইরূপ। আবার ঐ ঐ ভাবাবেশ এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত যে, উহা যে কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার ফলে হইতেছে, একথা আদৌ মনে হইত না! বরং এমন দেখা গিয়াছে, ঐরূপ পর্বদিনে ঠাকুর আমাদের সহিত অন্য নানা প্রসঙ্গে কথায় খুব মাতিয়াছেন, ঐ দিনে ঈশ্বরের যে বিশেষ লীলাপ্রকাশ হইয়াছিল, সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মন ঐসকল বাহিরের ব্যাপার হইতে গুটাইয়া একেবারে ঈশ্বরের ঐ ভাবে যাইয়া তন্ময় হইয়া পড়িল! কে যেন জোর করিয়া ঐরূপ করাইয়া দিল! কলিকাতায় শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে আমরা ঐরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ একঘর লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ হইল! তখনকার সেই হাস্যচ্ছটায় বিকশিত জ্যোতিঃপূর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডল ও তাহার পূর্বক্ষণের অসুস্থতা-নিবন্ধন কালিমাপ্রাপ্ত বদন দেখিয়া কে বলিবে যে, ইনি সেই লোক–কে বলিবে, ইঁহার কোন অসুস্থতা আছে!

অদ্যকার ফলহারিণী পূজার দিনেও ঠাকুরের শরীর-মনে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হইতেছে; কখনো বা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় মা-র নাম গাহিয়া আনন্দে

নৃত্য করিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব বদনশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন এবং সে অদৃষ্টপূর্ব দেবমানবের সঙ্গগুণে মনে কতপ্রকার অপূর্ব দিব্যভাব অনুভব করিতেছেন। মা-র পূজা সাঙ্গ হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল। একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই প্রভাত।

বেলা প্রায় ৮।৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফল-মূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনো পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারী ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন—"সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে; সেখান হইতে সকলকে, যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হইতেছে; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্য এখনো কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।" রামলালদাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। "কেন এখনো দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না?"—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন! এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন—তখনো আসিল না, তখন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট আসিয়া উপস্থিত! বলিলেন, "হ্যাঁগা, ও ঘরের (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনো দেওয়া হয়নি কেন? ভুল হলো নাকি? চিরকেলে মামুলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে, বড় অন্যায় কথা!" খাজাঞ্চী মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"এখনো আপনার ওখানে পৌঁছায়নি? বড় অন্যায় কথা! আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি।"

ঠাকুরের ঐরূপে প্রসাদ চাহিয়া লওয়ায় যোগানন্দ স্বামীর চিন্তা

স্বামী যোগানন্দ তখন বালক। সত্কুলে বনেদী সাবর্ণ চৌধুরীদের ঘরে জন্ম, কাজেই মনে বেশ একটু অভিমানও ছিল। ঠাকুরবাড়ির খাজাঞ্চী, কর্মচারী, পূজারী প্রভৃতিদের একটা মানুষ বলিয়াই বোধ হইত না। তবে ঠাকুরের ভালবাসায় ও অহেতুক কৃপায় তাঁহার শ্রীপদে মাথা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং রাসমণির বাগানের একপ্রকার পার্শ্বেই তাঁহাদের বাড়ি বলিলেও চলে। কাজেই ঠাকুরের নিকট নিত্য যাওয়া-আসার বেশ সুবিধা। আর না যাইয়াই বা করেন কি? ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণ যে জোর করিয়া নিয়মিত সময়ে টানিয়া লইয়া যায়! কিন্তু ঠাকুরকে মানেন বলিয়া কি আর ঠাকুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে প্রীতির সহিত আলাপ করা চলে? অতএব 'প্রসাদী ফল-মূলাদি কেন আসিল না' বলিয়া ঠাকুর ব্যস্ত হইলে তিনি বলিয়াই ফেলিলেন—"তা নাই বা এল মশায়, ভারি তো জিনিস! আপনার তো ও-সকল পেটে সয় না, ওর কিছুই তো খান না—তখন নাই বা দিলে?" আবার ঠাকুর যখন তাঁহার ঐরূপ কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অল্পক্ষণ পরেই নিজে খাজাঞ্চীকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইলেন, তখন যোগীন ভাবিতে লাগিলেন—'কি আশ্চর্য! ইনি আজ সামান্য ফল-মূল-মিষ্টান্নের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? যাঁকে কিছুতে বিচলিত হতে দেখিনি, তাঁর আজ এ ভাব কেন?' ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোনই কারণ না খুঁজিয়া পাইয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—'বুঝিয়াছি! ঠাকুরই হন, আর যত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশানুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু না একটু থাকবে তো? তাই আর কি! বড় বড় বিষয়ে ব্যস্ত হন না, কিন্তু এ সামান্য বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! তা নহিলে, নিজে ও-সব খাবেন না, নিজের কোন দরকারেই লাগবে না, তবু তার জন্য এত ভাবনা কেন? বংশানুগত অভ্যাস!'

ঠাকুরের ঐরূপ করিবার কারণ নির্দেশ

যোগীন বা যোগানন্দ স্বামীজী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি জানিস, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধু-সন্ত ভক্ত লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেচে। এখানে যা প্রসাদী

জিনিস আসে, সে সব ভক্তেরাই খায়; ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে, তারাই খায়। এতে রাসমণির যে জন্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তার পর ওরা (ঠাকুরবাড়ির বামুনেরা) যা সব নিয়ে যায়, তার কি ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে! কারু কারু আবার বেশ্যা আছে; ঐসব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়, এইসব করে! রাসমণির যেজন্য দান, তার কিছুও অন্তত সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি!" যোগীন স্বামীজী শুনিয়া অবাক। ঠাকুরের এ কাজেরও এত গূঢ় অর্থ!

মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ

এইরূপে কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুর মথুরের সহিত পাতাইয়াছিলেন! মথুরের ভালবাসা ঘনীভূত হইয়া শেষে যে 'বাবা'-অন্ত-প্রাণ হইয়াছিল, তাহা যে ঠাকুরের এইরূপ অহেতুক কৃপার ফলে, এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর ঠাকুরের বালকবৎ অবস্থা মথুরকে কম আকর্ষণ করে নাই। সাংসারিক সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ বালকের প্রতি কাহার মন না আকৃষ্ট হয়? নিকটে থাকিলে—ক্রীড়া-মত্ততায় পাছে তাহার কোন অনিষ্ট হয় বলিয়া ভয়চকিত নয়নে তাহার অকারণ-মধুর চেষ্টাদি দেখিতে ও তাহাকে রক্ষা করিতে কে না ত্রস্তভাবে অগ্রসর হয়? আর ঠাকুরের বালকভাবটাতে তো আর কৃত্রিমতা বা ভানের লেশমাত্র ছিল না! যখন তিনি ঐ ভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক ঠিক আত্মরক্ষণাসমর্থ বালক বলিয়াই বোধ হইত! কাজেই তেজীয়ান, বুদ্ধিমান মথুরের তাঁহাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করিবার স্বতই যে একটা চেষ্টার উদয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব একদিকে মথুর যেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপরদিকে তেমনি আবার তিনি 'বাবা'কে অনভিজ্ঞ বালক জানিয়া সর্বদা রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। সর্বজ্ঞ গুরুভাব ও অল্পজ্ঞ বালকভাবের 'বাবা'তে এইরূপ বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া, মথুর বোধ হয় মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সাংসারিক সকল ব্যাপারে, এমনকি দেহরক্ষাদি-বিষয়েও তাঁহাকে 'বাবা'কে রক্ষা করিতে হইবে; আর মানব-চক্ষু ও শক্তির অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম পারমার্থিক ব্যাপারে 'বাবা'ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অতএব একই কালে দেব ও মানব, সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ, মহাজটিল বিপরীত ভাবসমষ্টির অপরূপ সম্মিলনভূমি এ অদ্ভুত 'বাবা'র প্রতি মথুরের ভালবাসাটাও যে একটা জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল, এ কথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর 'বাবা' মথুরের উপাস্য হইলেও বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরের ঘনমূর্তি সেই 'বাবা'কেই আবার সময়ে সময়ে মথুরকে নানা কথায় ভুলাইতে ও বুঝাইতে হইত!

মথুরের কামকীটের কথা বলিয়া বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে বুঝান

বাবার জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের ভালবাসায় বেশ যোগাইত! মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বহির্দেশে গমন করিয়া 'বাবা' একদিন চিন্তায় মুখখানি শুষ্ক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মথুরকে বলিলেন, "একি ব্যারাম হলো, বল দেখি? দেখলুম, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল! শরীরের ভিতরে এমন তো কারুর পোকা থাকে না। আমার একি হলো?" ইতঃপূর্বেই যে 'বাবা' হয়তো গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল অপূর্ব সরলভাবে বুঝাইয়া মোহিত ও মুগ্ধ করিতেছিলেন, সেই 'বাবা'ই এখন বালকের ন্যায় নিষ্কারণ ভাবিয়া অস্থির! মথুরের আশ্বাসবাক্য এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছেন! মথুর শুনিয়াই বলিলেন, "ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে নানা কুভাবের উদয় করে কুকাজ করায়। মা-র কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল! এতে এত ভাবনা কেন?" 'বাবা' শুনিয়াই বালকের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ; ভাগ্যিস তোমায় এ কথা বললুম, জিজ্ঞাসা করলুম!" বলিয়া বালকের ন্যায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মথুরের সহিত ঠাকুরের ভক্তদিগের আগমনের কথা

কথায় কথায় একদিন 'বাবা' বলিলেন, "দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েচেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে; তারা সব আসবে; এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবেন, অনেকের উপকার করবেন, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙে দেন নি—রেখেচেন। তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেছি, বল দেখি?"

মথুর বলিলেন, "মাথার ভুল কেন হবে, বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তারা সব দেরি করচে কেন? (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) শিগ্গির শিগ্গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।"

'বাবা'ও বুঝিয়া গেলেন, মা ওসব ঠিক দেখাইয়াছেন। বলিলেন, "কি জানি বাবু, কবে তারা সব আসবে; মা বলেছেন, দেখিয়েছেন, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।"

ঠাকুরের বালকভাবের দৃষ্টান্ত—সুষনিশাক তোলার কথা

রানী রাসমণির পুত্র ছিল না, চার কন্যা ছিল। মথুরবাবু তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়া ও কনিষ্ঠাকে পর পর বিবাহ করিয়াছিলেন। অবশ্য একজনের মৃত্যু হইলে অপরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জামাতাদিগের ভিতর বিষয় লইয়া পরে পাছে কোন গণ্ডগোল বাধে, এজন্য বুদ্ধিমতী রানী স্বয়ং বর্তমান থাকিতে থাকিতে প্রত্যেকের ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়া যান। ঐরূপে বিষয়ভাগ হইবার পরে একদিন মথুরবাবুর পত্নী বা সেজগিন্নি অপরের ভাগের এক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইয়া সুন্দর সুষনি শাক হইয়াছে দেখিয়া তুলিয়া লইয়া আসেন। কেবল ঠাকুর তাঁহার ঐ কার্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য দেখিয়াই ঠাকুরের মনে নানা তোলাপাড়া উপস্থিত! না বলিয়া ওরূপে অপরের বিষয় সেজগিন্নি লইয়া গেল, বড় অন্যায়। না বলিয়া ওরূপে লইলে যে চুরি করা হয়, তাহা ভাবিল না। আর অপরের জিনিসে ওরূপ লোভ করা কেন বাবু?—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঐরূপ নানা কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রানীর যে কন্যার ভাগে ঐ পুষ্করিণী পড়িয়াছে, তাঁহার সহিত দেখা। অমনি ঠাকুর তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ের আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিনি শুনিয়া এবং সেজগিন্নি যেন কতই অন্যায় করিয়াছে বলিয়া ঠাকুরের ঐরূপ গম্ভীর ভাব দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'তাই তো বাবা, সেজ বড় অন্যায় করেছে।' এমন সময় সেজগিন্নিও তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনিও ভগ্নীর হাস্যের কারণ শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, 'বাবা, এ কথাটিও কি তোমার ওকে বলে দিতে হয়? আমি পাছে ও দেখতে পায় বলে লুকিয়ে শাকগুলি চুরি করে নিয়ে এলুম, আর তুমি কিনা তাই বলে দিয়ে আমাকে অপদস্থ করলে!' এই বলিয়া দুই ভগ্নীতে হাস্যের রোল তুলিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা, কি জানি বাবু, যখন বিষয় সব ভাগ-যোগ হয়ে গেল, তখন ওরূপে না বলে নেওয়াটা ভাল নয়; তাই বলে দিলুম যে, উনি শুনে যা হয় বোঝা-পড়া করুন।" রানীর কন্যারা 'বাবা'র কথায় আরও হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, বাবার কি সরল উদার স্বভাব!

সাংসারিক বিপদে মথুরের ঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়া

একপক্ষে 'বাবা'র এইরূপ বালকভাব! অপর দিকে আবার অন্য জমিদারের সহিত বিবাদে মথুরের হুকুমে লাঠালাঠি ও খুন হইয়া যাওয়ায় বিপদে পতিত মথুর আসিয়া 'বাবা'কে ধরিলেন, 'বাবা, রক্ষা কর।' 'বাবা' প্রথম চটিয়া মথুরকে নানা ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, "তুই শালা রোজ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে বলবি 'রক্ষা কর'! আমি কি করতে পারি রে শালা? যা, নিজে বুঝগে যা; আমি কি জানি?" তারপর মথুরের নির্বন্ধে বলিলেন, "যাঃ, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।" বাস্তবিকই সে বিপদ কাটিয়া গেল!

কৃপণ মথুরের ঠাকুরের জন্য অজস্র অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্ত

ঠাকুরের উভয় ভাবের পরিচায়ক এইরূপ কত দৃষ্টান্তই না বলা যাইতে পারে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মথুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, বহুরূপী 'বাবা'র কৃপাতেই তাঁহার যাহা কিছু–ধন বল, মান বল, প্রতাপ বল, আর যা কিছুই বল। সুতরাং বাবাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া রাজসম্মান দেওয়া ও অচল ভক্তি-বিশ্বাস করাটা মথুরের পক্ষে একটা বিচিত্র ব্যাপার হয় নাই। বিষয়ী লোকের ভক্তির দৌড় ভক্তিভাজনের প্রতি অর্থব্যয়েই বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে আবার মথুর–সুচতুর হিসাবে বুদ্ধিমান বিষয়ী ব্যক্তি সচরাচর যেমন হইয়া থাকে–একটু কৃপণও ছিলেন। কিন্তু 'বাবা'র বিষয়ে মথুরের অকাতরে ধনব্যয় দেখিয়া তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস যে বাস্তবিকই আন্তরিক ছিল, এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। 'বাবা'কে যাত্রা শুনাইতে সাজ-গোজ পরাইয়া বসাইয়া, গায়কদের প্যালা বা পুরস্কার দিবার জন্য মথুর তাঁহার সামনে দশ দশ টাকার থাক করিয়া একেবারে একশত বা ততোধিক টাকা সাজাইয়া দিলেন। 'বাবা' যাত্রা শুনিয়া যাইতে যাইতে যেমনি কোন হৃদয়স্পর্শী গান বা কথায় মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, অমনি হয়তো সে সমস্ত টাকাগুলিই একেবারে হাত দিয়া গায়কের দিকে ঠেলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন! মথুরের তাহাতে বিরক্তি নাই! 'বাবার যেমন উঁচু মেজাজ, তেমনি তাহার মতোই প্যালা দেওয়া হইয়াছে', বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার ঐরূপ টাকা সাজাইয়া দিলেন! ভাবমুখে অবস্থিত 'বাবা'–যিনি 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' করিয়া একেবারে লোভশূন্য হইয়াছেন–তাঁহার সম্মুখে উহা আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? আবার হয়তো ভাবতরঙ্গের উন্মাদ-বিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া সমস্ত টাকা এককালে দিয়া ফেলিলেন! পরে কাছে টাকা নাই দেখিয়া হয়তো গায়ের শাল ও পরনের বহুমূল্য কাপড় পর্যন্ত খুলিয়া দিয়া কেবলমাত্র ভাবাম্বর ধারণ করিয়া নিস্পন্দ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন! মথুর তাঁহার টাকার সার্থকতা হইল ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া 'বাবা'কে বীজন করিতে লাগিলেন।

ঐ বিষয়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত

কৃপণ মথুরের 'বাবা'র সম্বন্ধে এইরূপ উদারতার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়! মথুর 'বাবা'কে সঙ্গে লইয়া ৺কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থপর্যটনে যাইয়া 'বাবা'র কথায় ৺কাশীতে 'কল্পতরু' হইয়া দান করিলেন, আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন! 'বাবা'কে সে সময়ে কিছু চাহিতে অনুরোধ করায় 'বাবা' কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না! বলিলেন, "একটি কমণ্ডলু দাও!" 'বাবা'র ত্যাগ দেখিয়া মথুরের চক্ষে জল আসিল।

ঠাকুরের ইচ্ছায় মথুরের বৈদ্যনাথে দরিদ্রসেবা

মথুরের সহিত কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাইবার কালে ৺বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গ্রামবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া 'বাবা'র হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। মথুরকে বলিলেন, "তুমি তো মা-র দেওয়ান; এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" মথুর প্রথম একটু পেছপাও হইলেন। বলিলেন, 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক, এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?' সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন! তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া 'বাবা'র কথামত সকল কার্য করিলেন। 'বাবা'ও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত ৺কাশী গমন করিলেন।

শুনিয়াছি, মথুরের সহিত রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁহার জমিদারিভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময়ে বেড়াইতে যাইয়া, গ্রামবাসীদের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণার আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।

ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট; ভোগবাসনা ছিল বলিয়া মথুরের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ঠাকুর

গুরুভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর এইরূপ মধুর সম্বন্ধে মথুরকে চিরকালের মতো আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধনকালে একসময়ে ঠাকুরের মনে যে অদ্ভুত ভাবের সহসা উদয় হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করাইয়াছিল, "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিস নি, রসে বশে রাখিস"—মথুরানাথের সহিত এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ তাহারই পরিণত ফলবিশেষ। কারণ, সেই প্রার্থনার ফলেই ৺জগন্মাতা ঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চারিজন রসদ্দার তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে এবং মথুরানাথই তাঁহাদের ভিতর প্রথম ও অগ্রণী। দৈবনির্দিষ্ট সম্বন্ধ না হইলে কি এতকাল এ সম্বন্ধ এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে কখনও থাকিতে পারিত? হায় পৃথিবী, এরূপ বিশুদ্ধ মধুর সম্বন্ধ এতকাল কয়টাই বা তুমি নয়নগোচর করিয়াছ! আর বলি, হায় ভোগবাসনা, তুমি কি বজ্রবন্ধনেই না মানবমনকে বাঁধিয়াছ! এই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব অহেতুক ভালবাসার ঘনীভূত প্রতিমা এমন অদ্ভুত ঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া এখনও আমাদের মন তোমাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না! জনৈক বন্ধু ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "(মৃত্যুর পর) মথুরের কি হলো, মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!" ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, "কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।" এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।

[1] ঈশা – (Matthew XXIV – 11, 23, 24, 25, 26).

[2] বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারানীর যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ঊনবিংশ প্রকার অষ্টসাত্ত্বিক শারীরিক বিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশ পাইত, যথা – হাস্য, ক্রন্দন, অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি – বৈষ্ণব-শাস্ত্রে উহাই মধুরভাব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাকেই 'মহাভাব' বলে। ঐ মহাভাবেই ঊনবিংশ প্রকার শারীরিক বিকার ঈশ্বর-প্রেমে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা জীবের সর্বাঙ্গীণ হওয়া অসম্ভব বলিয়া কথিত আছে।

৩.১০. অষ্টম অধ্যায়: গুরুভাবে নিজগুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥

– গীতা, ১৫।১৫

গুরুভাব অবতারপুরুষদিগের নিজস্ব সম্পত্তি

পূর্বেই বলিয়াছি, যিনি গুরু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাল্যাবধিই তাঁহার ভিতর ঐ ভাবের পরিচয় বেশ পাওয়া গিয়া থাকে। মহাপুরুষ অবতারকুলের তো কথাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে

যিনি জনসমাজে যে ভাব-প্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যাবধিই তাঁহাতে যেন ঐ ভাব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়! শরীরেন্দ্রিয়াদির পূর্ণতা, দেশকালাদি অবস্থাসকলের অনুকূলতা প্রভৃতি কারণসমূহ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনে ঐ ভাব পূর্ণ পরিস্ফুট হইবার সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু ঐ সকল কারণই যে তাঁহাদের ভিতর ঐ ভাবের জন্ম দিয়া এ জীবনে তাঁহাদের গুরু করিয়া তোলে, তাহা নহে। দেখা যায়, উহা যেন তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি, উহা লইয়াই তাঁহারা যেন জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বর্তমান জীবনে ঐ ভাবোৎপত্তির কারণানুসন্ধান করিলে সহস্র চেষ্টাতেও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবোৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইলেও ঠিক ঐরূপ দেখা যায়। বাল্যে দেখ, যৌবনে দেখ, সাধনকালে দেখ, সকল সময়েই ঐ ভাবের অল্পাধিক বিকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইয়া অবাক হইতে হয়; আর কিরূপে ঐ ভাবের প্রথম আরম্ভ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল, এ কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। বাল্যজীবনের উল্লেখ এখানে করিয়া আমাদের পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। তবে ঠাকুরের যৌবন এবং সাধনকালে, যে কালের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মথুরবাবুকে লইয়া কত প্রকার গুরুভাবের লীলার বিকাশ হইয়াছিল, সেই কালেরই অনেক কথা এখনো বলিতে বাকি আছে এবং তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।

ঠাকুরের বহু গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ

মন্ত্রদাতা গুরু এক হইলেও উপগুরু বা শিক্ষাগুরু অনেক করা যাইতে পারে—এ বিষয়টি ঠাকুর অনেক সময়ে আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতোপাখ্যানের কথা তুলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন। ভাগবতে লেখা আছে, ঐ অবধূত ক্রমে ক্রমে চব্বিশজন উপগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা পর পর লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও আমরা ঐরূপে বিশেষ বিশেষ সাধনোপায় ও সত্যোপলব্ধির জন্য বহু বহু গুরুগ্রহণের অভাব দেখি না। তন্মধ্যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী; 'ল্যাংটা' তোতাপুরী ও মুসলমান গোবিন্দের নামই আমরা অনেক সময়ে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। অপরাপর হিন্দুসম্প্রদায়ের সাধনোপায়সমূহ অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিলেও ঠাকুর তাঁহাদের নাম বড় একটা উল্লেখ করিতেন না। কেবলমাত্র বলিতেন যে, তিনি অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে অন্যান্য মতের সাধন-প্রণালী জানিয়া লইয়া তিন তিন দিন মাত্র সাধন করিয়াই ঐ সকল মতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গুরুগণের নাম ঠাকুরের মনে ছিল না, অথবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই ঠাকুর উল্লেখ করিতেন না, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে এটা বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধও ঠাকুরের অতি অল্পকালের নিমিত্ত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী বা 'বামনী'

ঠাকুরের শিক্ষাগুরুগণের ভিতর আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। কত কাল, তাহা ঠিক নির্দেশ করিয়া বলা সুকঠিন, কারণ, ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবার কিছুকাল পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন এবং পুনরায় আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহার পরে ঠাকুর তাঁহার আর একবার মাত্র সন্ধান পাইয়াছিলেন; তখন ঐ ব্রাহ্মণী ভৈরবী ৺কাশীধামে কাল কাটাইতেছিলেন।[1]

'বামনী'র ঠাকুরকে সহায়তা

ব্রাহ্মণী ভৈরবী যে বহুকাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং তন্নিকটবর্তী গঙ্গাতটে—যথা, দেবমণ্ডলের ঘাট প্রভৃতি স্থলে—বাস করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে চৌষট্টিখানা প্রধান প্রধান তন্ত্রোক্ত যত কিছু সাধন-প্রণালী, সকলই একে একে করাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবমতসম্বন্ধীয় তন্ত্রাদিতেও সুপণ্ডিতা ছিলেন; তবে ঠাকুরকে সখীভাব প্রভৃতি সাধনকালেও কোন কোন স্থলে সহায়তা করিয়াছিলেন কিনা, ঐ বিষয়ে কোন

কথা স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই।[2] শুনিয়াছি যে, ঠাকুরকে ঐরূপে সাধনকালে সহায়তা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও তিনি কয়েক বৎসর–সর্বসুদ্ধ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল, বহু সম্মানে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে কখনো কখনো ঠাকুর এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর পর্যন্ত যাইয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এই সময় হইতে ব্রাহ্মণীকে আপন শ্বশ্রূর ন্যায় সম্মান এবং মাতৃসম্বোধন করিতেন।

'বামনী'র বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্তভাবে অভিজ্ঞতা

ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবদিগের সাধন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের রসও কিছু কিছু নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থানকালে তিনি ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্যরসে মুগ্ধ হইয়া ননী হস্তে লইয়া নয়নাশ্রুতে বসন সিক্ত করিতে করিতে 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন। আর, এদিকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সহসা ঠাকুরের মন ব্রাহ্মণীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শুনিয়াছি, তখন তিনি বালক যেমন জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তেমনি একছুটে ঐ এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং নিকটে বসিয়া ননী ভোজন করিতেন! এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণীও কখনো কখনো কোথা হইতে যোগাড় করিয়া লাল বেনারসী চেলী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যাদি হস্তে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ এবং ভাববিহ্বল অবস্থা দেখিয়া তখন তাঁহাকে গোপালবিরহে কাতরা নন্দরাণী যশোদা বলিয়াই লোকের মনে হইত।

'বামনী'র রূপ-গুণ দেখিয়া মথুরের সন্দেহ

ব্রাহ্মণী গুণে যেমন, রূপেও তেমনি অসামান্যা ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, মথুরবাবু প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণীর রূপলাবণ্যদর্শনে এবং তাঁহার একাকিনী অসহায় অবস্থায় যথাতথা ভ্রমণাদি শুনিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। একদিন নাকি বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, "ভৈরবী, তোমার ভৈরব কোথায়?" ব্রাহ্মণী তখন মা কালীর মন্দির হইতে দর্শনাদি করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। হঠাৎ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা রাগান্বিতা না হইয়া স্থিরভাবে মথুরের প্রতি প্রথম নিরীক্ষণ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পদতলে শবরূপে পতিত মহাদেবকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মথুরকে দেখাইয়া দিলেন। সন্দিগ্ধমনা বিষয়ী মথুরও অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। বলিলেন, "ও ভৈরব তো অচল।" ব্রাহ্মণী তখন ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "যদি অচলকে সচল করিতেই না পারিব, তবে আর ভৈরবী হইয়াছি কেন?" ব্রাহ্মণীর ঐরূপ ধীর গম্ভীর ভাব ও উত্তরে মথুর লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। পরে দিন দিন তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি ও অশেষ গুণের পরিচয় যতই পাইতে থাকিলেন, ততই মথুরের মনে আর ঐরূপ দুষ্ট সন্দেহ রহিল না।

'বামনী'র পূর্বপরিচয়

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী পূর্ববঙ্গের কোন স্থলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিলেই 'বড় ঘরের মেয়ে' বলিয়া সকলের নিঃসংশয় ধারণা হইত। বাস্তবিকও তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু কোন্ গ্রামে কাহার ঘর পুত্রীরূপে আলো করিয়াছিলেন, ঘরণীরূপে কাহারও ঘর কখনো উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কিনা, এবং প্রৌঢ় বয়সে এইরূপে সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার ও সংসারে বীতরাগ হইবার কারণই বা কি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে কখনই শুনি নাই। আবার এত লেখা-পড়াই বা শিখিলেন কোথায় এবং সাধনেই বা এত উন্নতিলাভ কোথায়, কবে করিলেন–তাহাও আমাদের কাহারও কিছুমাত্র জানা নাই।

ব্রাহ্মণী উচ্চদরের সাধিকা

সাধনে যে ব্রাহ্মণী বিশেষ উন্নতা হইয়াছিলেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না। দৈবকর্তৃক ঠাকুরের গুরুরূপে মনোনীত হওয়াতেই তাঁহার পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া যায়। আবার যখন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে আসিবার পূর্বেই যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জীবৎকালে তাঁহাকে ঠাকুরপ্রমুখ তিন ব্যক্তিকে সাধনায় সহায়তা করিতে হইবে এবং ঐ তিন ব্যক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে সাক্ষাৎ হইবামাত্র ব্রাহ্মণী তাঁহাদের চিনিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন, তখন আর ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

'বামনী'র যোগলব্ধ দর্শন

ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই চন্দ্র ও গিরিজার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "বাবা, তাদের দুজনকে ইহার পূর্বেই পেয়েছি; আর তোমাকে এতদিন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, আজ পেলেম। তাদের সঙ্গে পরে তোমায় দেখা করিয়ে দিব।" বাস্তবিকও পরে ঐ দুই ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত দেখা করাইয়া দেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইঁহারা দুইজনেই উচ্চদরের সাধক ছিলেন। কিন্তু সাধনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া পথভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণীর শিষ্য চন্দ্রের কথা

ঠাকুর বলিতেন, চন্দ্র ভাবুক ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার 'গুটিকাসিদ্ধি'-লাভ হইয়াছিল। মন্ত্রপূত গুটিকাটি অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি সাধারণ নয়নের দৃষ্টিবহির্ভূত বা অদৃশ্য হইতে পারিতেন এবং ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া সযত্নে রক্ষিত দুর্গম স্থানেও গমনাগমন করিতে পারিতেন।

সিদ্ধাই যোগভ্রষ্টকারী

কিন্তু ঈশ্বরলাভের পূর্বে ক্ষুদ্র মানব-মন ঐ প্রকার সিদ্ধাইসকল লাভ করিলেই যে অহঙ্কৃত হইয়া উঠে, এবং অহঙ্কারবৃদ্ধিই যে মানবকে বাসনাজালে জড়িত করিয়া উচ্চ লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে দেয় না এবং পরিশেষে তাহার পতনের কারণ হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই পাপের বৃদ্ধি এবং উহার হ্রাসেই পুণ্যলাভ, অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই ধর্মহানি এবং অহঙ্কারনাশেই ধর্মলাভ, স্বার্থপরতাই পাপ এবং স্বার্থনাশই পুণ্য, "আমি মলে ফুরায় জঞ্জাল"–এ কথা ঠাকুর আমাদের বার বার কত প্রকারেই না বুঝাইতেন! বলিতেন, "ওরে, অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি বলেছে; চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা; এবং জড় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি; ঐ অহঙ্কার এতদুভয়কে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া মানব-মনে 'আমি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীব'–এই ভ্রম স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বিষম গাঁটটা না কাটতে পারলে এগুনো যায় না। ঐটেকে ত্যাগ করতে হবে। আর মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হেয়। ও-সকলে মন দিতে নেই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখনো কখনো আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয়, সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে আর এগুতে পারে না।" স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানই জীবনস্বরূপ ছিল; খাইতে শুইতে বসিতে সকল সময়েই তিনি ঈশ্বরধ্যানে মন রাখিতেন, কতকটা মন সর্বদা ভিতরে ঈশ্বরের চিন্তায় রাখিতেন। ঠাকুর বলিতেন, তিনি 'ধ্যানসিদ্ধ'; ধ্যান করিতে করিতে সহসা একদিন তাঁহার দূরদর্শন ও শ্রবণের (বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তিসকল কি করিতেছে, বলিতেছে, ইহা দেখিবার ও শ্রবণ করিবার) ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত! ধ্যান করিতে বসিয়া একটু ধ্যান জমিলেই মন এমন এক ভূমিতে উঠিত যে, তিনি দেখিতেন অমুক ব্যক্তি অমুক বাটীতে বসিয়া অমুক প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন! ঐরূপ দেখিয়াই আবার প্রাণে ইচ্ছার উদয় হইত, যাহা দেখিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা, জানিয়া আসি। আর অমনি ধ্যান ছাড়িয়া তিনি সেই সেই স্থলে আসিয়া দেখিতেন, যাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন তাহার সকলই

সত্য, এতটুকু মিথ্যা নহে! কয়েক দিবস ঐরূপ হইবার পর, ঠাকুরকে ঐ কথা বলিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, “ও সকল ঈশ্বরলাভ-পথের অন্তরায়। এখন কিছুদিন আর ধ্যান করিসনি।”

সিদ্ধাইলাভে চন্দ্রের পতন

গুটিকাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রেরও অহঙ্কার বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, চন্দ্রের মনে ক্রমে কাম-কাঞ্চনাসক্তি বাড়িয়া যায় এবং এক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ সিদ্ধাইপ্রভাবেই তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতে থাকেন; এবং ঐরূপে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার বৃদ্ধিতে ক্রমে ঐ সিদ্ধাইও হারাইয়া বসিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত হন।

‘বামনী’র শিষ্য গিরিজার কথা

গিরিজারও অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ঠাকুর আমাদের বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, একদিন ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীর নিকটবর্তী শ্রীযুক্ত শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শম্ভু মল্লিক ঠাকুরকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং ঠাকুরের কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। শম্ভুবাবু ২৫০ টাকা দিয়া কালীবাড়ির নিকট কিছু জমি খাজনা করিয়া লইয়া তাহার উপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর থাকিবার জন্য ঘর করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তখন তখন গঙ্গাস্নান করিতে এবং ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে ঐ ঘরেই বাস করিতেন। ঐ স্থানে থাকিবার কালে এক সময়ে তিনি কঠিন রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্তা হন; তখন শম্ভুবাবুই চিকিৎসা, পথ্যাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শম্ভুবাবুর ভক্তিমতী পত্নীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন; প্রতি জয়মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এখানে থাকিলে তাঁহাকে লইয়া গিয়া দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন শম্ভুবাবু ঠাকুরের কলিকাতায় গমনাগমনের গাড়িভাড়া এবং খাদ্যাদির যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাই যোগাইতেন। অবশ্য মথুরবাবুর শরীরত্যাগের পরেই শম্ভুবাবু ঠাকুরের ঐরূপ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। শম্ভুকে ঠাকুর তাঁহার ‘দ্বিতীয় রসদ্দার’ বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং তখন তখন প্রায়ই তাঁহার উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্মালাপে কয়েক ঘণ্টাকাল কাটাইয়া আসিতেন।

গিরিজার সিদ্ধাই

গিরিজার সহিত সেদিন শম্ভুবাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইয়া কথাবার্তায় অনেক কাল কাটিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, “ভক্তদের গাঁজাখোরের মতো স্বভাব হয়! গাঁজাখোর যেমন গাঁজার কল্কেতে ভরপুর এক দম লাগিয়ে কল্কেটা অপরের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে—অপর গাঁজাখোরের হাতে ঐরূপে কল্কেটা না দিতে পারলে যেমন তার একলা নেশা করে সুখ হয় না, ভক্তেরাও সেইরূপ একসঙ্গে জুটলে একজন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভাবে তন্ময় হয়ে বলে ও আনন্দে চুপ করে এবং অপরকে ঐ কথা বলতে অবসর দেয় ও শুনে আনন্দ পায়।” সেদিন শম্ভুবাবু, গিরিজা ও ঠাকুর একসঙ্গে ঐরূপে মিলিত হওয়ায় কোথা দিয়া যে কাল কাটিতে লাগিল তাহা কেহই টের পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা ও এক প্রহর রাত্রি হইল, তখন ঠাকুরের ফিরিবার হুঁশ হইল। শম্ভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিরিজার সহিত রাস্তায় আসিলেন এবং কালীবাটীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় অন্ধকার। পথের কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় প্রতি পদে পদস্খলন ও দিক্‌ভুল হইতে লাগিল। অন্ধকারের কথা খেয়াল না করিয়া, ঈশ্বরীয় কথার ঝোঁকে চলিয়া আসিয়াছেন, শম্ভুর নিকট হইতে একটা লণ্ঠন চাহিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—এখন উপায়? কোনরূপে গিরিজার হাত ধরিয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ঐরূপ কষ্ট দেখিয়া গিরিজা বলিলেন, “দাদা, একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় আলো দেখাইতেছি।”—এই বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জ্যোতির

একটা লম্বা ছটা নির্গত করিয়া পথ আলোকিত করিলেন! ঠাকুর বলিতেন, "সে ছটায় কালীবাটীর ফটক পর্যন্ত বেশ দেখা যাইতে লাগিল ও আমি আলোয় আলোয় চলিয়া আসিলাম।"

গুরুভাবে ঠাকুরের চন্দ্র ও গিরিজার সিদ্ধাই-নাশ

এই কথা বলিয়াই কিন্তু ঠাকুর আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তাদের ঐরূপ ক্ষমতা আর বেশিদিন রহিল না! এখানকার (তাঁহার নিজের) সঙ্গে কিছুদিন থাকতে থাকতে ঐসকল সিদ্ধাই চলে গেল!" আমরা ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, (নিজের শরীর দেখাইয়া) "মা এর ভেতরে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের সিদ্ধাই বা শক্তি আকর্ষণ করে নিলেন। আর ঐরূপ হবার পর তাদের মন আবার ঐসব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল!"

সিদ্ধাই ভগবানলাভের অন্তরায়; ঐ বিষয়ে ঠাকুরের 'পায়ে হেঁটে নদী পারের' গল্প

এই বলিয়াই ঠাকুর আবার বলিলেন, "ও-সকলে আছে কি? ও-সব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়। একটা গল্প শোন্—একজনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হলো ও সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট লেখা-পড়া শিখে ধার্মিক বিদ্বান হয়ে বিবাহ করে সংসারধর্ম করতে লাগল। এখন সন্ন্যাসীদের নিয়ম—বার বৎসর অন্তে, ইচ্ছা হলে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বার বৎসর বাদে জন্মভূমি দেখতে আসে এবং ছোট ভায়ের জমি, চাষ-বাস, ধন-ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। নাম শুনে ছোট ভাই বাইরে এসে দেখে—তার বড় ভাই! অনেক দিন পরে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা—ছোট ভাইয়ের আর আনন্দের সীমা রইল না! দাদাকে প্রণাম করে বাড়িতে এনে বসিয়ে তার সেবাদি করতে লাগল। আহারান্তে দুই ভাইয়ের নানা প্রসঙ্গ হতে লাগল। তখন ছোট বড়কে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, তুমি যে এই সংসারের ভোগ-সুখ সব ত্যাগ করে এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি লাভ করলে আমাকে বল।' শুনেই দাদা বললে, 'দেখবি? তবে আমার সঙ্গে আয়।'—বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির নিকটে নদীতীরে এসে উপস্থিত হলো এবং বললে, 'এই দেখ।' বলেই নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে পরপারে চলে গেল! গিয়ে বললে, 'দেখলি?' ছোট ভাইও পার্শ্বের খেয়ানৌকায় মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে নদী পেরিয়ে বড় ভায়ের নিকটে গিয়ে বললে, 'কি দেখলুম?' বড় বললে, 'কেন? এই হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা?' তখন ছোট ভাই হেসে বললে, 'দাদা, তুমিও তো দেখলে—আমি আধ পয়সা দিয়ে এই নদী পেরিয়ে এলুম। তা তুমি এই বার বৎসর এত কষ্ট সয়ে এই পেয়েছ? আমি যা আধ পয়সায় অনায়াসে করি, তাই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম তো আধ পয়সা মাত্র।' ছোটর ঐ কথায় বড় ভায়ের তখন চৈতন্য হয় এবং ঈশ্বরলাভে মন দেয়।"

সিদ্ধাইয়ে অহঙ্কার-বৃদ্ধি-বিষয়ে ঠাকুরের 'হাতী-মরা-বাঁচা'র গল্প

ঐরূপে কথাচ্ছলে ঠাকুর কত প্রকারেই না আমাদের বুঝাইতেন যে, ধর্মজগতে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষমতালাভ অতি তুচ্ছ, হেয়, অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! ঠাকুরের ঐরূপ আর একটি গল্পও আমরা এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—"একজন যোগী যোগসাধনায় বাকসিদ্ধি লাভ করেছিল। যাকে যা বলত তাই তৎক্ষণাৎ হতো; এমনকি কাকেও যদি বলত 'মর্', তো সে অমনি মরে যেত, আবার যদি তখনি বলত 'বাঁচ্', তো তখনি বেঁচে উঠত! একদিন ঐ যোগী পথে যেতে যেতে একজন ভক্ত সাধুকে দেখতে পেলে। দেখলে, তিনি সর্বদা ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান কচ্ছেন। শুনলে, ঐ ভক্ত সাধুটি ঐ স্থানে অনেক বৎসর ধরে ঐরূপে তপস্যা কচ্ছেন। দেখে-শুনে অহঙ্কারী যোগী ঐ সাধুটির কাছে গিয়ে বললে, 'ওহে, এতকাল ধরে তো 'ভগবান ভগবান' করচ, কিছু পেলে বলতে পার?' ভক্ত সাধু বললেন, 'কি আর পাব বলুন। তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া ছাড়া আমার তো আর অন্য কোন কামনা নেই। আর তাঁকে পাওয়া তাঁর কৃপা না

হলে হয় না। তাই পড়ে পড়ে তাঁকে ডাকচি, দীন হীন বলে যদি কোন দিন কৃপা করেন।' যোগী ঐ কথা শুনেই বললে, 'যদি না-ই কিছু পেলে, তবে এ পণ্ডশ্রমের আবশ্যক কি? যাতে কিছু পাও তার চেষ্টা কর।' ভক্ত সাধুটি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বললেন, 'আচ্ছা মশায়, আপনি কি পেয়েছেন–শুনতে পাই কি?' যোগী বললে, 'শুনবে আর কি–এই দেখ।' এই বলে নিকটে বৃক্ষতলে একটা হাতি বাঁধা ছিল, তাকে বললে, 'হাতি, তুই মর্।' অমনি হাতিটা মরে গেল! যোগী দম্ভ করে বললে, 'দেখলে? আবার দেখ।' বলেই মরা হাতিটাকে বললে, 'হাতি, তুই বাঁচ্।' অমনি হাতিটা বেঁচে পূর্বের ন্যায় গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল! যোগী বললে, 'কি হে, দেখলে তো?' ভক্ত সাধু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন; এখন বললেন, 'কি আর দেখলুম বলুন–হাতিটা একবার মলো, আবার বাঁচল, কিন্তু বলবেন কি, হাতির ঐরূপ মরা-বাঁচায় আপনার কি এসে গেল? আপনি কি ঐরূপ শক্তিলাভ করে বার বার জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন? জরা-ব্যাধি কি আপনাকে ত্যাগ করেছে? না, আপনার অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ দর্শন হয়েছে?' যোগী তখন নির্বাক হয়ে রইল এবং তার চৈতন্য হলো।"

চন্দ্র[3] ও গিরিজা এইরূপে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় ঈশ্বরীয় পথে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জ্বলন্ত দর্শনলাভ করিয়া এবং তাঁহার দিব্যশক্তিবলে অহঙ্কারের মূল ঐ সকল সিদ্ধাইয়ের নাশ হওয়াতেই তাঁহাদের ঐ বিষয়ে চৈতন্য হয় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

'বামনী'র নির্বিকল্প অদ্বৈতভাব-লাভ হয় নাই; তদ্বিষয়ে প্রমাণ

ভৈরবী ব্রাহ্মণী স্বয়ং সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত যে হন নাই, তাহারও পরিচয় আমরা বেশ পাইয়া থাকি। বেদান্তের শেষভূমি, নির্বিকল্প অবস্থার অধিকারী 'ল্যাংটা' তোতাপুরী যখন ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে প্রথম আগমন করেন, তখন ঠাকুরের ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে সিদ্ধিলাভ হইয়াই গিয়াছে। তোতাপুরী ঠাকুরকে দেখিয়াই বেদান্তপথের অতি উত্তম অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করিয়া নির্বিকল্প সমাধিসাধনের বিষয় উপদেশ করেন, তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে ঐ বিষয় হইতে নিরস্ত করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "বাবা, (ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে পুত্রজ্ঞানে ঐরূপে সম্বোধন করিতেন) ওর কাছে বেশি যাওয়া-আসা করো না, বেশি মেশামেশি করো না; ওদের সব শুষ্ক পথ। ওর সঙ্গে মিশলে তোমার ঈশ্বরীয় ভাব-প্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে।" ইহাতে বেশ অনুমিত হয় যে, বিদুষী ব্রাহ্মণী ভগবদ্ভক্তিতে অসামান্যা হইলেও এ কথা জানিতেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, বেদান্তোক্ত যে নির্বিকল্প অবস্থাকে তিনি শুষ্কমার্গ বলিয়া নির্দেশ ও ধারণা করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ পরাভক্তিলাভের প্রথম সোপান–যে, শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মারাম পুরুষেরাই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে সকল প্রকার হেতুশূন্য হইয়া ভক্তিপ্রেম করিতে পারেন, এবং ঠাকুর যেমন বলিতেন–'শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান–দুই-ই এক পদার্থ।' আমাদের অনুমান, ব্রাহ্মণী এ কথা বুঝিতেন না এবং বুঝিতেন না বলিয়াই ঠাকুর মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিক ধারণ ও পুরী স্বামীজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্বক নির্বিকল্প সমাধি-সাধনের সময় নিজ গর্ভধারিণী মাতার নিকট যেমন উহা গোপন করিয়াছিলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকটেও তেমনি ঐ বিষয় গোপন রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরের উত্তর দিকের নহবতখানার উপরে থাকিতেন এবং ঠাকুর ঐরূপে বেদান্তসাধনকালে তিন দিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সকলের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়াছিলেন। কেবল পুরী গোস্বামী মাত্র ঐ সময়ে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর ব্রাহ্মণীর ঐ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই।

তন্ত্রোক্ত পশু, বীর ও দিব্যভাব-নির্ণয়

ঠাকুরের মুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তন্ত্রোক্ত বীরভাবের উপাসিকা ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তন্ত্রে পশু, বীর ও দিব্য এই তিন ভাবে ঈশ্বরসাধনার পথ নির্দিষ্ট আছে। পশুভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের আধিক্য থাকে; সেজন্য তিনি সর্বপ্রকার প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকিবেন এবং বাহ্যিক শৌচাচার প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভগবানের নামজপ, পুরশ্চরণাদিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। বীরভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের অপেক্ষা ঈশ্বরানুরাগ প্রবল থাকে। কাম-কাঞ্চন, রূপ-রসাদির আকর্ষণ তাঁহার ভিতর ঈশ্বরানুরাগকেই প্রবলতর করিয়া দেয়। সেজন্য তিনি কামকাঞ্চনাদির প্রলোভনের ভিতর বাস করিয়া উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বরে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ করিতে চেষ্টা করিবেন। দিব্যভাবের সাধক কেবলমাত্র তিনিই হইতে পারেন, যাঁহাতে ঈশ্বরানুরাগের প্রবল প্রবাহে কাম-ক্রোধাদি একেবারে চিরকালের মতো ভাসিয়া গিয়াছে, এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যাঁহাতে ক্ষমার্জব-দয়া-তোষ-সত্যাদি সদ্‌গুণসমূহের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ তিন ভাব সম্বন্ধে ইহাই বলা যায়। বেদান্তোক্ত উত্তম অধিকারীই তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবের ভাবুক, মধ্যম অধিকারীই বীরভাবের এবং অধমাধিকারীই পশুভাবের সাধক।

বীর সাধিকা 'বামনী' দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে তখনও সমর্থা হন নাই

বীরভাবের সাধকাগ্রণী হইলেও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখনও দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সহায়তালাভ করিয়াই ব্রাহ্মণীর ক্রমে দিব্যভাবের বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণী দেখিলেন—গ্রহণের কথা দূরে থাকুক, সিদ্ধি বা কারণের নাম মাত্রেই ঠাকুর জগৎকারণ-ঈশ্বরভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন; সতী বা নটী কোন স্ত্রীমূর্তি দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির কথার উদয় হইয়া তাঁহাতে সন্তানভাবই আনিয়া দেয়, এবং কাঞ্চনাদি-ধাতুসংস্পর্শে সুপ্তাবস্থায়ও তাঁহার হস্তাদি অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া যায়! এ জ্বলন্ত পাবকের নিকট থাকিয়া কাহার না ঈশ্বরানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে? কে না এই দুই দিনের বিষয়-বিভবাদির প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরকেই আপনার হইতে আপনার, চিরকালের আত্মীয় বলিয়া ধারণা না করিয়া থাকিতে পারে? এজন্যই ব্রাহ্মণীর জীবনের অবশিষ্টকাল তীব্র তপস্যায় কাটাইবার কথা আমরা শুনিতে পাইয়া থাকি।

ঐ বিষয়ে প্রমাণ

ঠাকুর অপর কাহারও সহিত বেশি মেশামেশি করিলে বা অন্য কোন ঈশ্বরভক্ত সাধককে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে ব্রাহ্মণীর মনে হিংসার উদয় হইত, এ কথাও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ন্যাওটো ছেলে বড় হইয়া বাটীর অপর কাহাকেও ভালবাসিলে বা আদরযত্ন করিলে তাহার ঠাকুরমা বা অন্য কোন বৃদ্ধা আত্মীয়ার (যাহার নিকটে সে এতদিন পালিত হইয়া আসিয়াছে) মনে যেরূপ ঈর্ষা, দুঃখ ও কষ্ট উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণীরও ঠাকুরের প্রতি ঐ ভাব যে সেই প্রকারের, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি! কিন্তু ব্রাহ্মণীর ন্যায় অত উচ্চদরের সাধিকার মনে ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। যিনি ঠাকুরকে খাইতে, শুইতে, বসিতে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা এতকাল ধরিয়া সকল অবস্থায় সকল ভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাদি অপরের ন্যায়, 'এই আছে এই নাই' গোছের ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহার উপর যে ভক্তি-শ্রদ্ধা একবার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা চিরকালের মতোই অর্পিত হইয়াছিল—তাহাতে আর জোয়ার-ভাঁটা খেলিত না। কিন্তু হায়, মায়িক ভালবাসা ও স্ত্রীলোকের মন, তোমরা সর্বদাই ভালবাসার পাত্রকে চিরকালের মতো বাঁধিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাও! এতটুকু স্বাধীনতা তাঁহাকে দিতে চাও না। মনে কর স্বাধীনতা পাইলেই তোমাদের ভালবাসার পাত্র আর তোমাদের

থাকিবে না, অপর কাহাকেও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া ফেলিবে। তোমরা বুঝ না যে, তোমাদের অন্তরের দুর্বলতাই তোমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া দেয়। তোমরা বুঝ না যে, যে ভালবাসা ভালবাসার পাত্রকে স্বাধীনতা দেয় না—যাহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া সে যাহা চাহে তাহাতেই আনন্দানুভব করিতে জানে না বা শিখে না, তাহা প্রায়ই স্বল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যদি যথার্থই কাহাকেও প্রাণের ভালবাসা দিয়া থাক, তবে নিশ্চিন্ত থাকিও, তোমার ভালবাসার পাত্র তোমারই থাকিবে এবং ঐ শুদ্ধ স্বার্থসম্পর্কশূন্য ভালবাসা শুধু তোমাকে নহে, তাহাকেও চরমে ঈশ্বরদর্শন ও সর্ববন্ধনবিমুক্তি পর্যন্ত আনিয়া দিবে।

ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণীর নিজ আধ্যাত্মিক অভাববোধ ও তপস্যা করিতে গমন

ব্রাহ্মণী উচ্চদরের প্রেমিক সাধিকা হইলেও যে পূর্বোক্ত কথাটি বুঝিতেন না, বা বুঝিয়াও ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহার ঐ ধারণার অভাব ছিল; এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুপদে ভাগ্যক্রমে বৃত হইয়া 'তিনি সর্বাপেক্ষা বড়, তাঁহার কথা সকলে সর্বদা মানিয়া চলুক, না চলিলে তাহাদের কল্যাণ নাই'—এই প্রকার ভাবসমূহও তাঁহার মনে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে যে কখনো কখনো শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহাতেও তিনি ঈর্ষান্বিতা হইতেন। শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁহার ঐ প্রকার ভাবপ্রকাশে সর্বদা ভীতা, সঙ্কুচিতা হইয়া থাকিতেন। যাহা হউক, পরিশেষে ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণী তাঁহার মনের এই দুর্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, এ অবস্থায় ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেই তবে তিনি তাঁহার এই মনোভাব-জয়ে সমর্থা হইবেন; এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার এই প্রকার আকর্ষণ সোনার শিকলে বন্ধনের ন্যায় হইলেও, উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এজন্যই ব্রাহ্মণী পরিশেষে দক্ষিণেশ্বর ও ঠাকুরের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং 'রম্‌তা সাধু ও বহ্‌তা জল কখনো মলিন হয় না' [4] ভাবিয়া অসঙ্গ হইয়া তীর্থে তীর্থে পর্যটন ও তপস্যায় কালহরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের গুরুভাবসহায়েই যে ব্রাহ্মণীর এই প্রকার চৈতন্যের উদয় হয়, ইহা আর বলিতে হইবে না।

তোতাপুরী গোস্বামীর কথা

তোতাপুরী লম্বা-চওড়া সুদীর্ঘ পুরুষ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর ধ্যান-ধারণা এবং অসঙ্গভাবে বাস করিবার ফলে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে মন স্থির, বৃত্তিমাত্রহীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তত্রাপি তিনি নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান এবং সমাধিতে অনেককাল কাটাইতেন। সর্বদা বালকের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে 'ল্যাংটা' নামে নির্দেশ করিতেন। বিশেষতঃ আবার গুরুর নাম সর্বদা গ্রহণ করিতে নাই, বা নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে নাই বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, ল্যাংটা কখনো ঘরের ভিতর থাকিতেন না এবং নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সর্বদা অগ্নিসেবা করিতেন! নাগা সাধুরা অগ্নিকে মহা পবিত্রভাবে দর্শন করে; এবং সেজন্য যেখানেই যখন থাকুক না কেন, কাষ্ঠাহরণ করিয়া নিকটে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। ঐ অগ্নি সচরাচর 'ধুনি' নামে অভিহিত হয়। নাগা সাধু ধুনিকে সকাল সন্ধ্যা আরতি করিয়া থাকে এবং ভিক্ষালব্ধ আহার্যসমুদয় প্রথমে ধুনিরূপী অগ্নিকে নিবেদন করিয়া তবে স্বয়ং গ্রহণ করে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে 'ল্যাংটা' সেজন্য পঞ্চবটীর বৃক্ষতলেই আসন করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পার্শ্বে ধুনি জ্বালাইয়া রাখিতেন। রৌদ্র হউক, বর্ষা হউক 'ল্যাংটা'র ধুনি সমভাবেই জ্বলিত। আহার বল, শয়ন বল 'ল্যাংটা' ঐ ধুনির ধারেই করিতেন। আর যখন গভীর নিশীথে সমগ্র বাহ্যজগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সকল চিন্তা ভুলিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সুখশয়ন লাভ করিত, 'ল্যাংটা' তখন উঠিয়া ধুনি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে বসিয়া নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির মনকে সমাধিমগ্ন করিতেন। দিনের বেলায়ও 'ল্যাংটা' অনেক সময় ধ্যান করিতেন। কিন্তু লোকে না জানিতে পারে এমন ভাবে

করিতেন। সেজন্য পরিধেয় চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ধুনির ধারে শবের ন্যায় লম্বা হইয়া 'ল্যাংটা'কে শয়ন করিয়া থাকিতে অনেক সময় দেখা যাইত। লোকে মনে করিত, 'ল্যাংটা' নিদ্রা যাইতেছেন।

ঠাকুর ও পুরী গোস্বামীর পরস্পর ভাব-আদান-প্রদানের কথা

'ল্যাংটা' নিকটে একটি জলপাত্র বা 'লোটা', একটি সুদীর্ঘ চিমটা এবং আসন করিয়া বসিবার জন্য একখণ্ড চর্মমাত্র রাখিতেন এবং একখানি মোটা চাদরে সর্বদা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া থাকিতেন। লোটা ও চিমটাটি 'ল্যাংটা' নিত্য মাজিয়া ঝকঝকে রাখিতেন। 'ল্যাংটা'র ঐরূপ নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিলেন, 'তোমার তো ব্রহ্মলাভ হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছ, তবে কেন আবার নিত্য ধ্যানাভ্যাস কর?' 'ল্যাংটা' ইহাতে ধীরভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া লোটাটি দেখাইয়া বলিলেন, 'কেমন উজ্জ্বল দেখছ? আর যদি নিত্য না মাজি?—মলিন হয়ে যাবে না? মনও সেইরূপ জানবে। ধ্যানাভ্যাস করে মনকেও ঐরূপে নিত্য না মেজে-ঘষে রাখলে মলিন হয়ে পড়ে।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর 'ল্যাংটা' গুরুর কথা মানিয়া লইয়া বলিলেন, "কিন্তু যদি সোনার লোটা হয়? তাহলে তো আর নিত্য না মাজলেও ময়লা ধরে না।" 'ল্যাংটা' হাসিয়া স্বীকার করিলেন, 'হাঁ, তা বটে।' নিত্য ধ্যানাভ্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে 'ল্যাংটা'র কথাগুলি ঠাকুরের চিরকাল মনে ছিল এবং বহুবার তিনি উহা 'ল্যাংটা'র নাম করিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। আর আমাদের ধারণা—ঠাকুরের 'সোনার লোটায় ময়লা ধরে না', কথাটি 'ল্যাংটা'র মনেও চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। 'ল্যাংটা' বুঝিয়াছিল, ঠাকুরের মন বাস্তবিকই সোনার লোটার মতো উজ্জ্বল! গুরু-শিষ্যে এইরূপ আদান-প্রদান ইঁহাদের ভিতরে প্রথমাবধিই চলিত।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নির্ভীকতা ও বন্ধনবিমুক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র

বেদান্তশাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মানুষ একেবারে ভয়শূন্য হয়। সম্পূর্ণ অভীঃ হইবার উহাই একমাত্র পথ। বাস্তবিক কথা। যিনি জানিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী অজরামর আত্মা, তাঁহার মনে ভয় কিসে, কাহারই বা দ্বারা হইবে? যিনি, এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি জগতে নাই, ইহা সত্য সত্যই দেখিতে পান, সর্বদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তাঁহার ভয় কি করিয়া, কোথায়ই বা হইবে? খাইতে, শুইতে, বসিতে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে তিনি দেখেন—তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ; সকলের ভিতর, সর্বত্র, সর্বদা তিনি পূর্ণ হইয়া আছেন; তাঁহার আহার নাই, বিহার নাই, নিদ্রা নাই, জাগরণ নাই, অভাব নাই, আলস্য নাই, শোক নাই, হর্ষ নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—মানব পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি-সহায়ে যাহা কিছু দেখে, শুনে, চিন্তা বা কল্পনা করে, তাহার কিছুই নাই। এই প্রকার অনুভবকেই শাস্ত্র, 'নেতি নেতি'র বিরামাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহারই পরে পূর্ণস্বরূপ আত্মার অবস্থান ও প্রত্যক্ষদর্শন বলিয়াছেন। এই আত্মদর্শন সদা-সর্বক্ষণ হওয়ার নামই 'জ্ঞানে অবস্থান', এবং এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান হইলেই সর্ববন্ধনবিমুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুর বলিতেন, এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে হইলে জীবের শরীর একুশ দিন মাত্র থাকিয়া শুষ্ক পত্রের ন্যায় পড়িয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায় এবং আর সে এ সংসারের ভিতর অহং-জ্ঞান লইয়া ফিরিয়া আসে না। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের নিমিত্ত এই জ্ঞানে অবস্থান ও আত্মার দর্শন হইতে হইতে পরিশেষে পূর্ণ অবস্থান ও দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়। আর নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষ, যাঁহারা কোন বিশেষ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুজনের কল্যাণসাধন করিতেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও বাল্যাবধি মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের জন্য এই জ্ঞানে অবস্থান করেন এবং যে কর্মের জন্য আসিয়াছেন, সেই কর্ম শেষ হইলে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন। আবার, যাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া জগৎ এ পর্যন্ত ধারণা করিতে পারে নাই, তাঁহারা ঈশ্বর স্বয়ং মানব-কল্যাণের

নিমিত্ত মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, অথবা অত্যদ্‌ভুত শক্তিসম্পন্ন মানব; সেই অবতারপুরুষেরা এই পূর্ণ জ্ঞানাবস্থায় বাল্যাবধি ইচ্ছামাত্র উঠিতে, যতকাল ইচ্ছা থাকিতে এবং পুনরায় ইচ্ছামত লোক-কল্যাণের নিমিত্ত জন্ম-জরা-শোক-হর্ষাদির মিলনভূমি সংসারে আসিতে পারেন।

তোতাপুরীর উচ্চ অবস্থা

ঠাকুরের শিক্ষাগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনের ফলে পূর্বোক্ত জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্যই মানবসাধারণের ন্যায় ছিল না। নিত্যমুক্ত বায়ুর ন্যায় তিনি বাধাশূন্য হইয়া যত্র তত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন; বায়ুর ন্যায়ই তাঁহাকে সংসারের দোষ-গুণ কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না এবং বায়ুর ন্যায়ই তিনি কখনো একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কারণ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, তোতা তিন দিনের অধিক কোথাও অবস্থান করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের অদ্‌ভুতাকর্ষণে কিন্তু তোতা দক্ষিণেশ্বরে একাদিক্রমে এগার মাস কাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের কি অদ্‌ভুত মোহিনীশক্তিই ছিল!

তোতার নির্ভীকতা–ভৈরব-দর্শনে

তোতার নির্ভীকতা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ভুতুড়ে ঘটনাও বলেন, তাহা এই–গভীর নিশীথে তোতা একদিন ধুনি উজ্জ্বল করিয়া ধ্যানে বসিবার উপক্রম করিতেছেন; জগৎ নীরব; নিস্তব্ধ; ঝিল্লী ও মধ্যে মধ্যে মন্দির-চূড়ায় অবস্থিত পেচকের গম্ভীর নিঃস্বন ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুরও সঞ্চার নাই। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখাসকল আলোড়িত হইতে লাগিল এবং দীর্ঘাকার মানবাকৃতি এক পুরুষ বৃক্ষের উপর হইতে নিম্নে নামিয়া তোতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ধীর পদবিক্ষেপে পুরী গোস্বামীর ধুনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। 'ল্যাংটা' নিজেরই ন্যায় উলঙ্গ সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' পুরুষ উত্তর করিলেন, 'আমি দেবযোনি, ভৈরব; এই দেবস্থানরক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি।' 'ল্যাংটা' কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, 'উত্তম কথা, তুমিও যা, আমিও তাই; তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই; এস, বস, ধ্যান কর।' পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন! 'ল্যাংটা'ও ঐ ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতে 'ল্যাংটা' ঠাকুরকে ঐ ঘটনা বলেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ, উনি ঐখানে থাকেন বটে; আমিও উঁহার দর্শন অনেকবার পেয়েছি। কখনো কখনো কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয়ও উনি আমাকে বলে দিয়েছেন। কোম্পানি, বারুদখানার (Powder Magazine) জন্য পঞ্চবটীর সমস্ত জমিটি একবার নেবার চেষ্টা করে। আমার তাই শুনে বিষম ভাবনা হয়েছিল; সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন স্থানটিতে বসে মাকে ডাকি, তা আর হবে না–সেইজন্য! মথুর তো রানী রাসমণির তরফ থেকে কোম্পানির সঙ্গে খুব মামলা লাগিয়ে দিলে, যাতে কোম্পানি জমিটি না নেয়! সেই সময়ে একদিন ঐ ভৈরব গাছে বসে আছেন দেখতে পাই; আমাকে সঙ্কেতে বলেছিলেন, 'কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না; মামলায় হেরে যাবে।' বাস্তবিকও তাই হলো!"

তোতাপুরীর গুরুর কথা

'ল্যাংটা'র জন্মস্থান পশ্চিমে কোন্ স্থানে ছিল, ঠাকুরের নিকট সে সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনি নাই। ঠাকুরও হয়তো ঐ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। বিশেষতঃ, আবার পূর্ব নাম-ধাম-গোত্রাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসীরা উহার উল্লেখ করেন না; বলেন, 'সন্ন্যাসীকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সন্ন্যাসীর তদ্বিষয়ে উত্তর দেওয়া–উভয়ই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ!' ঠাকুর হয়তো সেইজন্যই ঐ প্রশ্ন 'ল্যাংটা'কে কখনো করেন নাই।

তবে বেলুড় মঠস্থ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহান্তের পর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণকালে প্রাচীন সন্ন্যাসী পরমহংসগণের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ পুরী গোস্বামী পঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাঁহার গুরুস্থান বা গুরুর আবাস কুরুক্ষেত্রের নিকট লুধিয়ানা নামক স্থানে ছিল। তাঁহার গুরুও একজন বিখ্যাত যোগীপুরুষ ছিলেন এবং ঐ স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠটি তিনি নিজে স্থাপন করেন বা তাঁহার গুরুর গুরু কেহ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে ঠিক জানা যায় নাই। তবে শ্রীমৎ তোতাপুরীর গুরু যে ঐ মঠের মোহন্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মানে এখনো যে ঐ স্থানে বৎসর বৎসর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদের একটি মেলা হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তিনি তামাক খাইতেন বলিয়া গ্রামবাসীরা মেলার সময় তামাক আনিয়া তাঁহার 'সমাজে' এখনো উপহার দিয়া থাকে। গুরুর দেহান্তে শ্রীমৎ তোতাপুরীই ঐ মঠের মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

নিজ গুরুর মঠ ও মণ্ডলীসম্বন্ধে তোতাপুরীর কথা

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিজের কথাতেও মনে হয়, তিনি সন্ন্যাসিমণ্ডলীর অধীশ্বর নিজ গুরুর নিকট বাল্যেই বেদান্ত-শাস্ত্রোপদেশ পাইয়াছিলেন এবং বহুকাল তাঁহার অধীনে বাস করিয়া স্বাধ্যায়রত থাকেন ও সাধনরহস্য অবগত হন! কারণ, ঠাকুরকে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মণ্ডলীতে সাত শত সন্ন্যাসী বাস করিয়া গুরুর আদেশমত বেদান্তনিহিত সত্যসকল জীবনে অনুভবের জন্য ধ্যানাদি নিত্যানুষ্ঠান করিত। উক্ত মণ্ডলীতে ধ্যান-শিক্ষাদিদানও যে বড় সুন্দর প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইত, এ বিষয়েও 'ল্যাংটা' ঠাকুরকে কিছু কিছু আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ কথা অনেক সময়ে আমাদের নিকট গল্প বা উপদেশচ্ছলে বলিতেন। বলিতেন, "ল্যাংটা বলত, তাদের দলে সাত শত ল্যাংটা ছিল। যারা প্রথম ধ্যান শিখতে আরম্ভ করচে, তাদের গদির উপর বসিয়ে ধ্যান করাত। কেন না, কঠিন আসনে বসে ধ্যান করলে পা টনটন করবে; আর ঐ টনটনানিতে অনভ্যস্ত মন ঈশ্বরে না গিয়ে শরীরের দিকে এসে পড়বে। তারপর তার যত ধ্যান জমত ততই তাকে কঠিন হতে কঠিনতর আসনে বসে ধ্যান করতে দেওয়া হতো। শেষকালে শুধু চর্মাসন ও খালি মাটিতে পর্যন্ত বসে তাকে ধ্যান করতে হতো। আহারাদি সকল বিষয়েও ঐরূপ নিয়মে অভ্যাস করাত। পরিধানেও শিষ্যদের সকলকে ক্রমে ক্রমে উলঙ্গ হয়ে থাকতে অভ্যাস করানো হতো। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত, কুল, শীল, মান ইত্যাদি অষ্টপাশে মানুষ জন্মাবধি বদ্ধ আছে কিনা? এক এক করে সেগুলোকে সব ত্যাগ করতে শিক্ষা দেওয়া হতো। তারপর ধ্যানাদিতে মন পাকা হয়ে বসলে তাকে প্রথম অপর সাধুদের সঙ্গে, তারপর একা একা, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আসতে হতো। ল্যাংটাদের এই রকম সব নিয়ম ছিল।" ঐ মণ্ডলীর মোহন্ত-নির্বাচনের প্রথাও ঠাকুর পুরীজীর নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ঐ সম্বন্ধে আমাদের একদিন এইরূপ বলেন, "ল্যাংটাদের ভেতর যার ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছে দেখত, গদি খালি হলে তাকেই সকলে মিলে মোহন্ত করে ঐ গদিতে বসাত। তা না হলে টাকা, মান, ক্ষমতা হাতে পড়ে ঠিক থাকতে পারবে কি করে? মাথা বিগড়ে যাবে যে? সেজন্য যার মন থেকে কাঞ্চন ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়েছে দেখত, তাকেই গদিতে বসিয়ে টাকা-কড়ির ভার দিত। কেন না, সে-ই ঐ টাকা দেবতা ও সাধুদের সেবায় ঠিক ঠিক খরচ করতে পারবে।"

তোতাপুরীর পূর্ব পরিচয়

পুরী গোস্বামীর ঐসকল কথায় বেশ বুঝা যায়, তিনি বাল্যাবধি সংসারের মায়া-মোহ-ঈর্ষা-দ্বেষাদি হইতে দূরে যেন এক স্বর্গীয় রাজ্যে গুরুর স্নেহে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রথা আছে যে, যে দম্পতির যথাসময়ে সন্তান জন্মে না, তাঁহারা দেবস্থানে কামনা করেন যে, তাঁহাদের প্রণয়ের প্রথম ফলস্বরূপ সন্তানকে সন্ন্যাসী করিয়া ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিবেন এবং কার্যেও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুরী গোস্বামী কি সেইরূপে গুরুর নিকট অর্পিত

হইয়াছিলেন? কে বলিবে! তবে তাঁহার পূর্বাশ্রমের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির কোন কথা ঠাকুরের নিকট কখনো উল্লেখ না করাতে ঐরূপই অনুমিত হয়।

তোতাপুরীর মন

পূর্বকৃত পুণ্যসংস্কারের ফলে গোস্বামীজীর মনটিও তেমনি সরলবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল। আচার্য শঙ্কর তৎকৃত 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, 'জগতে মনুষ্যত্ব, ঈশ্বরলাভেচ্ছা এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয়–এই তিন বস্তু একত্রে লাভ করা বড়ই দুর্লভ; ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত হয় না।' পুরী গোস্বামী শুধু যে ঐ তিন পদার্থ ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে পাইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু ঐসকলের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য মুক্তিলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে যেমন যেমন উপদেশ করিতেন, তাঁহার মনও ঠিক ঠিক উহা ধারণা করিয়া সর্বদা কার্যে পরিণত করিত। মনের জুয়াচুরি ভণ্ডামিতে তাঁহাকে কখনো বেশি ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণবদিগের ভিতর একটি কথা আছে –

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল।

একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।"

–'একের' অর্থাৎ নিজ মনের দয়া না হওয়াতে জীব বিনষ্ট হইল। পুরী গোস্বামীকে এরূপ পাজি মনের হাতে পড়িয়া কখনো ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সরল মন, সরলভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুনির্দিষ্ট গন্তব্য পথে ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছিল, যাইতে যাইতে একবারও পশ্চাতে সংসারের পাপ-প্রলোভনাদির দিকে অতৃপ্ত লালসার কটাক্ষপাত করে নাই। কাজেই গোসাঁইজী নিজ পুরুষকার, উদ্যম, আত্মনির্ভরতা ও প্রত্যয়কেই সর্বেসর্বা বলিয়া জানিয়াছিলেন। মন বাঁকিয়া দাঁড়াইলে ঐ পুরুষকার যে প্রবল প্রবাহের মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, ঐ আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে যে আপনার ক্ষমতার উপর ঘোর অবিশ্বাস আসিয়া জীবকে সামান্য কীটাপেক্ষা দুর্বল করিয়া তুলে–এ কথা গোসাঁইজী জানিতেন না। ঈশ্বরকৃপায় বহির্জগতের সহস্র বিষয়ের অনুকূলতা না পাইলে জীবের শত-সহস্র উদ্যম যে আশানুরূপ ফল প্রসব না করিয়া বিপরীত ফলই প্রসব করিতে থাকে এবং তাহাকে বন্ধনের উপর আরও ঘোরতর বন্ধন আনিয়া দেয়, পুরী গোস্বামী নিজ জীবনের দিকে চাহিয়া এ কথা কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কেনই বা ভাবিবেন? তিনি যখনই যাহা ধরিয়াছেন–আজন্ম, তখনই তাহা করিতে পারিয়াছেন, যখনই যাহা মানবের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন–তখনই তাহা নিজ জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কাজেই 'মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না' এমন একটা অবস্থা যে মানবের হইতে পারে, 'মন মুখ এক' করিতে না পারিয়া সে যে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা ভিতরে নিরন্তর অনুভব করিতে পারে, মনের ভিতর সহস্রটা কর্তা এবং শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টা স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেহ কাহারও কথা না মানিয়া চলিয়া তাহাকে যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া হতাশার অন্ধতামিস্রে ফেলিয়া ঘোর যন্ত্রণা দিতে পারে–এ কথা গোসাঁইজী কখনো কল্পনায়ও আনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। অথবা আনিতে পারিলেও শুনে শিখা, দেখে শিখা ও ঠেকে শিখার ভিতর অনেক তফাত। কাজেই পুরী গোস্বামীর মনে অবস্থিত মানবের ঐরূপ অবস্থার ছবিতে এবং যে ঐ প্রকারে বাস্তবিক নিরন্তর ভুগিতেছে, তাহার মনের ছবিতে ঐরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। পুরী গোস্বামী সেজন্য পরমেশ-শক্তি অনাদ্যবিদ্যা মায়ার দুরন্ত প্রভাববিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন; এবং সেজন্য দুর্বল মানবমনের কার্যকলাপের প্রতি তিনি কঠোর দ্বেষ-দৃষ্টি ভিন্ন কখনো করুণার সহিত দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের গুরুভাবের সম্পর্কে আসিয়াই তাঁহার এই অভাব অপনীত হয় এবং তিনি পরিশেষে মায়ার শক্তি মানিয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ জানিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে দক্ষিণেশ্বর-

কালীবাটী হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে ঐ বিষয়েই বলিতে আরম্ভ করিব।

তোতাপুরীর ভক্তিমার্গে অনভিজ্ঞতা

ব্রাহ্মণী ভৈরবী ঠাকুরকে যেমন বলিয়াছিলেন, আকুমার ব্রহ্মচারী কঠোর যতি তোতার বাস্তবিকই ভগবদ্ভক্তিমার্গকে একটা কিম্ভূতকিমাকার পথ বলিয়া ধারণা ছিল। ভক্তি-ভালবাসা যে মানবকে ভালবাসার পাত্রের জন্য সংসারের সকল বিষয়, এমনকি আত্মতৃপ্তি পর্যন্ত ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে শিখাইয়া চরমে ঈশ্বর-দর্শন আনিয়া দেয়, যথার্থ ভক্তসাধক যে ভক্তির চরম পরিণতিতে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানেরও অধিকারী হইয়া থাকেন এবং সেজন্য তাঁহারও সাধনসহায় জপ-কীর্তন-ভজনাদি যে উপেক্ষার বিষয় নহে—এ কথা তোতা বুঝিতেন না। না বুঝিয়া গোসাঁইজী ভক্তের ভাববিহ্বল চেষ্টাদিকে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। অবশ্য এ কথায় পাঠক না বুঝিয়া বসেন যে, পুরী গোস্বামী এক প্রকার নাস্তিক গোছের ছিলেন বা তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ ছিল না। শমদমাদিসম্পত্তিসহায় শান্তপ্রকৃতি গোসাঁইজী স্বয়ং ভক্তির শান্তভাবের পথিক ছিলেন এবং অপরের ঐ ভাবের ঈশ্বরভক্তিই বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু কল্পনাসহায়ে জগৎকর্তা মহান ঈশ্বরকে নিজ সখা, পুত্র, স্ত্রী বা স্বামিভাবে ভজনা করিয়াও সাধক যে তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারে, এ কথা পুরীজীর মাথায় কখনো ঢোকে নাই। ঐরূপ ভক্তের নিজ ভাবপ্রণোদিত ঈশ্বরের প্রতি আবদার-অনুরোধ, তাঁহাকে লইয়া বিরহ, ব্যাকুলতা, অভিমান, অহঙ্কার এবং ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হাস্য-ক্রন্দন-নৃত্যাদি চেষ্টাকে তিনি পাগলের খেয়াল বা প্রলাপের মধ্যেই গণ্য করিতেন; এবং উহাতে যে ঐরূপ অধিকারী সাধকের আশু অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে, এ কথা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। কাজেই ব্রহ্মশক্তি জগদম্বিকাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করা এবং ভক্তিপথের ঐরূপ চেষ্টাদির কথা লইয়া পুরীজীর সহিত ঠাকুরের অনেক সময় ঠোকাঠুকি লাগিয়া যাইত।

ঐ বিষয়ে প্রমাণ—‘কেঁও রোটী ঠোকতে হো’

ঠাকুর বাল্যাবধি সকাল-সন্ধ্যায় করতালি দিতে দিতে এবং সময়ে সময়ে ভাবে নৃত্য করিতে করিতে ‘হরিবোল হরিবোল’, ‘হরি গুরু, গুরু হরি’, ‘হরি প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন’, ‘মন কৃষ্ণ—প্রাণ কৃষ্ণ—জ্ঞান কৃষ্ণ—ধ্যান কৃষ্ণ—বোধ কৃষ্ণ—বুদ্ধি কৃষ্ণ’, ‘জগৎ তুমি—জগৎ তোমাতে’, ‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী’ ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে বার বার কিছুকাল বলিতেন। বেদান্তজ্ঞানে অদ্বৈতভাবে নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরও নিত্য ঐরূপ করিতেন। একদিন পঞ্চবটীতে পুরীজীর নিকট অপরাহ্নে বসিয়া নানা ধর্মকথা-প্রসঙ্গে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ঠাকুর বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, করতালি দিয়া ঐরূপে ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া পুরীজী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—যিনি বেদান্তপথের এত উত্তম অধিকারী যে, তিন দিনেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন, তাঁহার আবার হীনাধিকারীর মতো এ সব অনুষ্ঠান কেন? প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াও ফেলিলেন, ‘আরে, কেঁও রোটী ঠোকতে হো?’—অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্ত্রীপুরুষে অনেক সময়ে চাকি-বেলুন প্রভৃতির সাহায্য না লইয়া ময়দার নেচি হাতে লইয়া পটাপট আওয়াজ করিতে করিতে চাপড়ে চাপড়ে যেমন রুটি তৈয়ার করে, সেই রকম কেন করচ? ঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, আর তুমি কিনা বলছ—আমি রুটি ঠুকচি!” পুরীজীও ঠাকুরের বালকের ন্যায় কথায় হাসিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন, ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান অর্থশূন্য নহে; উহার ভিতর এমন কোন গূঢ়ভাব আছে, যাহা তাঁহার রুচিকর নয় বলিয়া তিনি ধরিতে-বুঝিতে পারিতেছেন না। উঁহার ঐরূপ কার্যে প্রতিবাদ না করাই ভাল।

তোতাপুরীর ক্রোধত্যাগের কথা

আর একদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর পুরীজীর ধুনির ধারে বসিয়া আছেন। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ঠাকুর এবং গোসাঁইজী উভয়েরই মন খুব উচ্চে উঠিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে প্রায় তন্ময়ত্ব অনুভব করিতেছে। পার্শ্বে ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধুনির অগ্নিমধ্যস্থ আত্মাও যেন তাঁহাদের আত্মার সহিত একত্বানুভব করিয়া আনন্দে শত জিহ্বা প্রকাশ করিয়া হাসিতেছেন! এমন সময় বাগানের চাকরবাকরদিগের একজনের তামাক খাইবার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায়, কল্কেতে তামাক সাজিয়া অগ্নির জন্য সেখানে উপস্থিত হইল এবং ধুনির কাঠ টানিয়া অগ্নি লইতে লাগিল। গোসাঁইজী ঠাকুরের সহিত বাক্যালাপে ও অন্তরে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দানুভবেই মগ্ন ছিলেন, ঐ লোকটির আগমন ও ধুনি হইতে অগ্নি লওয়ার বিষয় এতক্ষণ জানিতেই পারেন নাই। হঠাৎ এখন সেদিকে লক্ষ্য পড়ায় বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন! এমন কি চিমটা তুলিয়া তাহাকে দুই এক ঘা দিবার মতোও ভয় দেখাইতে লাগিলেন! কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, নাগা-সাধুরা ধুনিরূপী অগ্নিকে পূজা ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন!

ঠাকুর পুরীজীর ঐরূপ ব্যবহারে অর্ধবাহ্যদশায় হাস্যের রোল তুলিয়া তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "দূর শালা, দূর শালা!" ঐ কথা বারবার বলেন ও হাসিয়া গড়াগড়ি দেন! তোতা ঠাকুরের ঐরূপ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তুমি অমন করচ যে? লোকটির কি অন্যায় দেখ দেখি?" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা তো বটে, সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখচি! এই মুখে বলছিলে–ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তাই নেই, জগতে সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁরই প্রকাশ, আর পরক্ষণেই সব কথা ভুলে মানুষকে মারতেই উঠেচ! তাই হাসছি যে, মায়ার কি প্রভাব!" তোতা ঐ কথা শুনিয়াই গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ক্রোধে সকল কথা বাস্তবিক ভুলিয়া গিয়াছিলাম! ক্রোধ বড় পাজি জিনিস! আজ থেকে আর ক্রোধ করব না, ক্রোধ পরিত্যাগ করলুম।" বাস্তবিকই স্বামীজীকে সেদিন হইতে আর ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই!

মায়া কৃপা করিয়া পথ না ছাড়িলে মানবের ঈশ্বরলাভ হয় না

ঠাকুর বলিতেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে–চোখ বুজে তুমি 'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই', যতই কেন মনকে বুঝাও না, কাঁটায় হাত পড়লেই প্যাঁট করে বিঁধে গিয়ে উঁহু উঁহু করে উঠতে হয়; তেমনি, যতই কেন মনকে বুঝাও না–তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পাপ নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই–তুমি জন্ম-জরারহিত নির্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা–কিন্তু যাই শরীরে অসুস্থতা এল, যাই মন সংসারের রূপ-রসাদি প্রলোভনের সামনে পড়ল, যাই কাম-কাঞ্চনের আপাতসুখে ভুলে কোন একটা কুকাজ করে ফেললে, অমনি মোহ, যন্ত্রণা, দুঃখ সব উপস্থিত হয়ে সব বিচার-আচার ভুলিয়ে একেবারে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে! সেজন্য ঈশ্বরের কৃপা না হলে, মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কারুর আত্মজ্ঞানলাভ ও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না–জানবি। চণ্ডীতে আছে শুনিসনি?–'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'–অর্থাৎ মা কৃপা করে পথ ছেড়ে না দিলে কিছুই হবার জো নেই।"

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত–রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনে পর্যটনের কথা

"রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্চেন। বনের সরু পথ, একজনের বেশি যাওয়া যায় না। রাম ধনুকহাতে আগে আগে চলেছেন; সীতা তাঁর পাছু পাছু চলেছেন; আর লক্ষ্মণ সীতার পাছু পাছু ধনুর্বাণ নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণের রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাসা যে, সর্বদা মনে মনে ইচ্ছা নবঘনশ্যাম রামরূপ দেখেন; কিন্তু সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চলতে চলতে রামচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী সীতা তা বুঝতে পেরে, তাঁর দুঃখে কাতর হয়ে চলতে চলতে একবার পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই দ্যাখ্।' তবে লক্ষ্মণ প্রাণভরে

একবার তাঁর ইষ্টমূর্তি রামরূপ দেখতে পেলেন! সেইরকম জীব আর ঈশ্বরের মাঝখানে এই মায়ারূপিণী সীতা রয়েছেন। তিনি জীবরূপী লক্ষ্মণের দুঃখে ব্যথিত হয়ে পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে না দাঁড়ালে জীব তাঁকে দেখতে পায় না, জানবি। তিনি যাই কৃপা করেন, অমনি জীবের রামরূপী নারায়ণের দর্শন হয় ও সে সব যন্ত্রণার হাত থেকে এড়ায়। নৈলে, হাজারই বিচার-আচার কর না কেন, কিছুতে কিছু হয় না। কথায় বলে—এক একটি জোয়ানের দানায় এক একশটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয়, তখন একশটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না—সেইরকম জানবি।”

জগদম্বার কৃপায় তাঁহার উচ্চাবস্থা—তোতা একথা বুঝেন নাই

তোতাপুরী স্বামীজী ৺জগদম্বার আজন্ম কৃপাপাত্র। সৎসংস্কার, সরল মন, যোগী মহাপুরুষের সঙ্গ, বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর বাল্যাবধিই লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতী মায়া তো তাঁহাকে কখনো তাঁহার করাল, বিভীষিকাময়ী, মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় সর্বগ্রাসী মূর্তি দেখান নাই—তাঁহার অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মূর্তির ফাঁদে তো কখনো ফেলেন নাই—কাজেই গোসাঁইজীর নিকট পুরুষকার ও চেষ্টাসহায়ে অগ্রসর হইয়া নির্বিকল্প-সমাধিলাভ, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান সব সোজা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পথে অগ্রসর হইবার যত কিছু বিঘ্ন-বাধা, মা যে সে-সব নিজ হস্তে সরাইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এ কথা তিনি বুঝিবেন কিরূপে? এতদিনে সে বিষয় পুরী স্বামীজীকে বুঝাইবার জগদম্বার ইচ্ছা হইল। এতদিনে তিনি মনের ঐ ভ্রম বুঝিবার অবসর পাইলেন।

তোতাপুরীর অসুস্থতা

পুরীজীর পশ্চিমী শরীর; রোগ, অজীর্ণ, শরীরে শতপ্রকার অসুস্থতা কাহাকে বলে তাহা কখনো জানিতেন না। যাহা খাইতেন, তাহাই হজম হইত; যেখানেই পড়িয়া থাকিতেন, সুনিদ্রার অভাব হইত না। আর ঈশ্বর-জ্ঞানে ও দর্শনে মনের উল্লাস ও শান্তি শতমুখে অবিরামধারে মনে প্রবাহিত থাকিত। কিন্তু বাঙলার জল, বাঙলার বাষ্পকণাপূরিত গুরুভার উত্তপ্ত বায়ুতে, ঠাকুরের শ্রদ্ধাভালবাসায় মোহিত হইয়া কয়েক মাস বাস করিতে না করিতেই সে দৃঢ় শরীরে রোগ প্রবেশ করিল। পুরীজী কঠিন রক্তামাশয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্র পেটের মোচড় ও টনটনানিতে পুরীজীর ধীর, স্থির, সমাধিস্থ মনও অনেক সময়ে ব্রহ্মসদ্ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া শরীরের দিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল! ‘পঞ্চ ভূতের ফাঁদে’ ব্রহ্ম পড়িয়াছেন, এখন সর্বেশ্বরী জগদম্বিকার কৃপা ব্যতীত আর উপায় কি?

তোতার নিজ মনের সঙ্কেত অগ্রাহ্য করা

অসুস্থ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার সতর্ক ব্রহ্মনিষ্ঠ মন তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, এখানে শরীর ভাল থাকিতেছে না, আর এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু ঠাকুরের অদ্ভুত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শরীরের মায়ায় তিনি চলিয়া যাইবেন? ‘শরীর—হাড়-মাসের খাঁচা’—রসরক্তপূর্ণ, কৃমিকুলসঙ্কুল, দুই দিন মাত্র স্থায়ী দেহ—যেটার অস্তিত্বই বেদান্তশাস্ত্রে ভ্রম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি মমতাদৃষ্টি করিয়া তিনি কিনা অশেষ-আনন্দ-প্রসূ এই দেব-মানবের সঙ্গ সহসা ত্যাগ করিয়া যাইবেন? যেখানে যাইবেন সেখানেও শরীরের রোগাদি তো হইতে পারে? আর রোগাদি হইলেই বা তাঁহার ভয় কি? শরীরটাই ভুগিবে, কৃশ হইবে, বড় জোর বিনষ্ট হইবে—তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়? তিনি তো প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন—তিনি অসঙ্গ নির্বিকার আত্মা, শরীরটার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই—তবে আবার ভয় কিসের? এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া পুরীজী মনকে ব্যস্ত হইতে দেন নাই।

তোতার ঠাকুরের নিকট বিদায় লইতে যাইয়াও না পারা ও রোগবৃদ্ধি

ক্রমে রোগের যখন সূত্রপাত ও কিছু কিছু যন্ত্রণার আরম্ভ হইল, তখন পুরীজীর স্থানত্যাগের ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে প্রবলতর হইতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইবেন ভাবিয়া কখনো কখনো তাঁহার নিকট উপস্থিতও হইলেন, কিন্তু অন্য সৎপ্রসঙ্গে মাতিয়া সে কথা বলিতে ভুলিয়াই যাইলেন। আবার যদি বা বিদায়ের কথা বলিতে মনে পড়িল তো তখন যেন কে ভিতর হইতে তাঁহার সে সময়ের জন্য বাক্য রুদ্ধ করিয়া দিল, বলিতে বাধ বাধ করায় পুরীজী ভাবিলেন, 'আজ থাক, কাল বলা যাইবে'। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজী ঠাকুরের সহিত বেদান্তালাপ করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া পঞ্চবটীতলে আসনে ফিরিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। স্বামীজীর শরীরও অধিকতর দুর্বল এবং ক্রমে রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর স্বামীজীর শরীর ঐ প্রকার দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বিশেষ পথ্য ও সামান্য ঔষধাদি-সেবনের বন্দোবস্ত ইতঃপূর্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় না হইয়া রোগ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। ঠাকুরও মথুরকে বলিয়া তাঁহার আরোগ্যের জন্য ঔষধপথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করিতে লাগিলেন। এখনো পর্যন্ত স্বামীজী শরীরেই বিশেষ যন্ত্রণানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু চিরনিয়মিত মনকে ইচ্ছামাত্রেই সমাধিমগ্ন করিয়া দেহের সকল যন্ত্রণার কথা এককালে ভুলিয়া শান্তিলাভ করিতেছিলেন।

মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া তোতার গঙ্গায় শরীর বিসর্জন করিতে যাওয়া ও বিশ্বরূপিণী জগদম্বার দর্শন

রাত্রিকাল—আজ পেটের যন্ত্রণা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বামীজীকে স্থির হইয়া শয়ন পর্যন্ত করিয়া থাকিতে দিতেছে না। একটু শয়ন করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াই তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। বসিয়াও সোয়াস্তি নাই। ভাবিলেন, মনকে ধ্যানমগ্ন করিয়া রাখি, শরীরে যাহা হইবার হউক। মনকে গুটাইয়া শরীর হইতে টানিয়া লইয়া স্থির করিতে না করিতে পেটের যন্ত্রণায় মন সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল। আবার চেষ্টা করিলেন, আবার তদ্রূপ হইল। যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই সমাধিভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িতে লাগিল। যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই চেষ্টা বিফল হইল! তখন স্বামীজী নিজের শরীরের উপর বিষম বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন—এ হাড়-মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আজ আমার বশে নাই। দূর হোক, জানিয়াছি তো শরীরটা কোনমতেই আমি নই, তবে এ পচা শরীরটার সঙ্গে আর কেন থাকিয়া যন্ত্রণা অনুভব করি? এটা আর রাখিয়া লাভ কি? এই গভীর রাত্রিকালে গঙ্গায় এটাকে বিসর্জন দিয়া এখনি সকল যন্ত্রণার অবসান করিব। এই ভাবিয়া 'ল্যাংটা' বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর ভাগীরথী কি আজ সত্য সত্যই শুষ্কা হইয়াছেন? অথবা তোতা তাঁহার মনের ভিতরের ছবির বহিঃপ্রকাশে ঐরূপ দেখিতেছেন? কে বলিবে? তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন, তত্রাচ ডুবজল পাইলেন না! ক্রমে যখন রাত্রির অন্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মতো নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! একি ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা! এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-

ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী-মূর্তিতে অবস্থিত–ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!

তোতার পূর্বসংকল্প-ত্যাগ

গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপূরিত চিত্তে জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত বিরাট রূপের দর্শন করিতে করিতে, গম্ভীর অম্বারবে দিকসকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং আপনাকে তৎপদে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন, তেমন জল ভাঙিয়া ফিরিয়া চলিলেন! শরীরে যন্ত্রণা হইলেও এখন আর তাহার অনুভব নাই। প্রাণ সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব উল্লাসে উল্লসিত! ধীরে ধীরে স্বামীজী পঞ্চবটীতলে ধুনির ধারে আসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন!

অসুস্থতায় তোতার জ্ঞান–ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তি এক

প্রভাত হইলেই ঠাকুর স্বামীজীর শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিতে আসিয়া দেখেন, যেন সে মানুষই নয়! মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, হাস্যপ্রস্ফুটিত অধর, শরীরে যেন কোন রোগই নাই! তোতা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে পার্শ্বে বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে রাত্রের সকল ঘটনা বলিলেন। বলিলেন, রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম! যাহা হউক, তোমার মাকে এখন বলিয়া কহিয়া আমাকে এ স্থান হইতে যাইতে বিদায় দাও। আমি এখন বুঝিয়াছি, তিনিই আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমাকে এখানে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নতুবা আমি এখান হইতে অনেক কাল পূর্বে চলিয়া যাইব ভাবিয়াছি, বিদায় লইবার জন্য তোমার কাছেও বার বার গিয়াছি, কিন্তু কে যেন প্রতিবারেই বিদায়ের কথা বলিতে দেয় নাই! অন্য প্রসঙ্গে ভুলাইয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখিয়াছে! ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাকে যে আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'ঝুট' বলে তর্ক করতে? এখন দেখলে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল। আমাকে তিনি পূর্বেই বুঝিয়েছেন, 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি'!"

তোতার জগদম্বাকে মানা ও বিদায়গ্রহণ

অনন্তর প্রভাতী সুরে নহবত-ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া শিবরামের ন্যায় গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ উভয় মহাপুরুষ উঠিয়া জগদম্বার মন্দিরে দর্শনার্থ যাইলেন এবং শ্রীমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইলেন। উভয়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মা তোতাকে এইবার এখান হইতে যাইতে প্রসন্ন মনে অনুমতি দিয়াছেন। ইহার কয়েক দিবস পরেই তোতা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ দর্শন–কারণ ইহার পর পুরী গোস্বামী আর কখনো এদিকে ফিরেন নাই।

তোতার 'কিমিয়া'-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা

আর একটি কথা বলিলেই তোতাপুরী সম্বন্ধে আমরা যত কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার সকলই প্রায় পাঠককে বলা হয়। পুরী গোস্বামী 'কিমিয়া' বিদ্যায় বিশ্বাস করিতেন। শুধু যে বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন তিনি ঐ বিদ্যাপ্রভাবে তাম্রাদি ধাতুকে অনেকবার স্বর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোতা বলিতেন, তাঁহাদের মণ্ডলীর প্রাচীন পরমহংসেরা উক্ত বিদ্যা অবগত আছেন এবং গুরুপরম্পরায় তিনি উহা পাইয়াছেন। আরও বলিতেন, 'ঐ বিদ্যাপ্রভাবে নিজের স্বার্থসাধন বা ভোগবিলাস করিতে একেবারে নিষেধ আছে, উহাতে গুরুর অভিসম্পাত আছে। তবে মণ্ডলীতে অনেক সাধু থাকে, উহাদের লইয়া কখনো কখনো মণ্ডলীশ্বরকে তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমনাগমন করিতে হয় এবং তাঁহাদের সকলের

আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হয়। গুরুর আদেশ–ঐ সময়ে অর্থের অনটন হইলে ঐ বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত করিতে পার।'

উপসংহার

এইরূপে ঠাকুরের গুরুভাবসহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী নিজ নিজ গন্তব্য পথে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণও যে তাঁহার সহায়ে এইরূপে আধ্যাত্মিক উদারতা লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ও আমরা ইহাতেই বেশ অনুমান করিতে পারি।

ওমিতি -

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-গুরুভাবপর্বে

পূর্বার্ধ সম্পূর্ণ॥ ওঁ॥

[1] সাধকভাব (১০ম সংস্করণ), দ্বাদশ অধ্যায়।

[2] সাধকভাব (১০ম সংস্করণ), দ্বাদশ অধ্যায়।

[3] ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন। উহারই কিছুকাল পরে বেলুড় মঠে একদিন এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া আপনাকে 'চন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্রায় মাসাবধিকাল তথায় বাস করেন। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সর্বদা মঠেই থাকিতেন। তাঁহার সহিত ঐ ব্যক্তির গোপনে অনেক কথাবার্তাও হইতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি তিনি ব্রহ্মানন্দজীকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন - "আপনি কি এখানে কিছু টের পান? অর্থাৎ, ঠাকুরের জাগ্রত সত্তা কিছু অনুভব করেন?" – ইত্যাদি।

তিনি বলিতেন, ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহার সমুদয় কথাই সত্য ঘটিয়াছে। কেবল মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে দর্শন দিতে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ঐ কথাটিই সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার তখনও বাকি আছে। লোকটি মঠের ঠাকুরঘরে গিয়া প্রতিদিন অনেকক্ষণ অতি ভক্তির সহিত জপ-ধ্যান করিতেন। ঐ সময় তাঁহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুও পড়িত। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি তৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা অতি আনন্দের সহিত বলিতেন। ইঁহাকে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়াই আমাদের বোধ হইয়াছিল। লোকটিকে সর্বদা একস্থানে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে এবং সময়ে সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক সময়ে একজন ইঁহাকে উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন - "মহাশয়ের কি আফিম খাওয়ার অভ্যাস আছে?" উহাতে তিনি অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন - "আমি আপনাদের নিকট কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছি যে ঐরূপ কথা বলিতেছেন?"

ঠাকুরঘরে যাইয়া প্রথম প্রণামকালে তিনি ঠাকুরের শ্রীমূর্তিকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং ভাবে-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অজস্র নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের ন্যায়ই বোধ হইত। গৈরিক বা তিলকাদির আড়ম্বর ছিল না। পরিধানে সামান্য একখানি ধুতি ও উড়ানি এবং হাতে ছাতি ও একটি কাম্বিসের ব্যাগ মাত্র ছিল। ব্যাগের ভিতর আর একখানি পরিধেয় ধুতি, গামছা ও বোধ হয় একটি জল খাইবার ঘটি মাত্র ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপে প্রায়ই তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিয়া বেড়ান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহাকে বিশেষ আদর-সম্মান করিয়া মঠেই চিরকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইনিও সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেশের জমিগুলোর একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া এখানে থাকিব।" কিন্তু তদবধি আর ঐ ব্যক্তি এ পর্যন্ত মঠে আসেন নাই। প্রসঙ্গোক্ত চন্দ্র সম্ভবতঃ তিনিই হইবেন।

[4] সংসার-বিরাগী সাধুদিগের ভিতর প্রচলিত একটি উক্তি। ‘রম্‌তা’ – অর্থাৎ নিরন্তর যিনি একস্থানে না থাকিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এই প্রকার সাধুতে এবং যে জলে প্রবাহ বা নিরন্তর স্রোত বহিতেছে, এইরূপ জলে কখনো মলিনতা দাঁড়াইতে পারে না। নিত্যপর্যটনশীল সাধুর মন কখনো কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে আসক্ত হয় না, ইহাই অর্থ।

৪.১. গুরুভাব–উত্তরার্ধ: নিবেদন

গুরুভাবের উত্তরার্ধ প্রকাশিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যভাগের পরিচয়মাত্র গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়া পাঠক হয়তো বলিবেন, এ বিপরীত প্রথার অবলম্বন কেন? ঠাকুরের জন্মাবধি সাধনকাল পর্যন্ত সময়ের জীবনেতিহাস পূর্বে লিপিবদ্ধ না করিয়া তাঁহার সিদ্ধাবস্থার কথা অগ্রে বলা হইল কেন? তদুত্তরে আমাদিগকে বলিতে হয় যে –

প্রথম–পূর্ব হইতে মতলব আঁটিয়া আমরা ঐ লোকোত্তর পুরুষের জীবনী লিখিতে বসি নাই। তাঁহার মহদুদার জীবনেতিহাস আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা যথাযথ লিপিবদ্ধ হওয়া যে সম্ভবপর, এ উচ্চাশাও কখনো হৃদয়ে পোষণ করিতে সাহসী হই নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দুই-চারিটি কথামাত্র 'উদ্বোধনে'র পাঠকবর্গকে জানাইবার অভিপ্রায়েই আমরা এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। উহাতে এতদূর যে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে সে কথা তখন বুঝিতে পারি নাই। অতএব ঐরূপ স্থলে পরের কথা যে পূর্বে বলা হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

দ্বিতীয়তঃ–শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং অদৃষ্টপূর্ব সাধনের কথা লিপিবদ্ধ করিতে আমাদের পূর্বে অনেকেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। স্থলে স্থলে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলেও ঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই ঐরূপে মোটামুটিভাবে সাধারণের নয়নগোচর হইয়াছিল। তজ্জন্য পুনরায় ঐসকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া এ পর্যন্ত কেহই যে কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই তদ্বিষয়ে অর্থাৎ ঠাকুরের অলৌকিক ভাবসকল পাঠককে যথাযথ বুঝাইতে যত্ন করাই আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলাম। আবার ঠাকুরের ভাবমুখে অবস্থান এবং তাঁহাতে গুরুভাবের স্বাভাবিক বিকাশপ্রাপ্তি, এই বিষয়টি প্রথমে না বুঝিতে পারিলে তাঁহার অদ্‌ভুত চরিত্র, অদৃষ্টপূর্ব মনোভাব এবং অসাধারণ কার্যকলাপের কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না বলিয়াই আমরা ঐ বিষয় পাঠককে সর্বাগ্রে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম।

কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে স্থলে স্থলে ঠাকুরের বিশেষ বিশেষ কার্য ও মনোভাবের কথা বুঝাইতে যাইয়া তোমরা নিজে ঐসকল যেভাবে বুঝিয়াছ তাহাই পাঠককে বলিতে চেষ্টা করিয়াছ। উহাতে তোমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাকেই ঠাকুরের দুরবগাহ চরিত্র ও মনোভাবের পরিমাপক করা হইয়াছে। ঐরূপে তোমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা যে ঠাকুরকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ এ কথা স্পষ্টতঃ না হউক পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া তোমরা কি তাঁহাকে সাধারণ নয়নে ছোট কর নাই? ঐরূপ না করিয়া যথার্থ ঘটনার কেবলমাত্র যথাযথ উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই তো হইত। উহাতে ঠাকুরকেও ছোট করা হইত না এবং যাহার যেরূপ বুদ্ধি সে সেইভাবেই ঐসকলের অর্থ বুঝিয়া লইতে পারিত।

কথাগুলি আপাতমনোহর হইলেও অল্প চিন্তার ফলেই উহাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতীয়মান হইবে। কারণ, বিষয়বিশেষ ধরিতে ও বুঝিতে মানব চিরকালই তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে এবং পরেও তদ্রূপ করিতে থাকিবে। ঐরূপ করা ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর নাই। উহাতে এ কথা কিন্তু কখনই প্রতিপন্ন হয় না যে, গ্রাহ্য বিষয়াপেক্ষা তাহার মনবুদ্ধ্যাদি বড়। দেশ, কাল, বিশ্ব, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি সকল অনন্ত পদার্থকেই মানব, মন-বুদ্ধির অতীত জানিয়াও পূর্বোক্তভাবে সর্বদা ধরিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ঐসকল পদার্থকে তাহার ঐরূপে বুঝিবার চেষ্টাকে আমরা পরিমাণ করাও বলি না অথবা দূষণীয়ও বিবেচনা করি না। পরন্তু ইহাই বুঝিয়া থাকি যে, ঐ চেষ্টার ফলে তাহার নিজ মন-বুদ্ধিই পরিশেষে প্রশস্ততা লাভ করিয়া তাহার কল্যাণসাধন করিবে।

অতএব লোকোত্তর পুরুষদিগের অলৌকিক চেষ্টাদির ঐরূপে অনুধাবন করিলে উহাতে আমাদের নিজ কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে পরিমাণ করা হয় না। মন ও বুদ্ধির সাধনপ্রসূত

শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারেই লোকে তাঁহাদের দিব্যভাব ও কার্যকলাপ অল্প বা অধিক পরিমাণে বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র-সম্বন্ধে আমরা যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিকতরভাবে উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ নিজ মন-বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে উহাতে দূষ্য কিছুই নাই; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি—এ কথা মনে না করিলেই হইবে। ঐ কথাটির দৃঢ় ধারণা হৃদয়ে থাকিলেই ঐসকল বৃথা আশঙ্কার আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। ইতি –

বিনীত

গ্রন্থকার

৪.২. প্রথম অধ্যায়: বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীর কথা

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥

– গীতা, ৩।৩১

দক্ষিণেশ্বরাগত সাধু ও সাধকগণের সহিত ঠাকুরের গুরুভাবের সম্বন্ধ-বিষয়ে কলিকাতার লোকের অজ্ঞতা

কলিকাতার জনসাধারণের ধারণা, ঠাকুর কলিকাতার কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ কতকগুলি ইংরেজীশিক্ষিত, পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত নব্য হিন্দুদলের লোকের ভিতরেই ধর্মভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন বা তাঁহাদের ভিতরেই পূর্ব হইতে প্রদীপ্ত ধর্মভাবকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার লোকেরা ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা জানিতে পারিবার বহু পূর্ব হইতেই যে ঠাকুরের নিকটে বাঙলা এবং উত্তর ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশ হইতে সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধু, সাধক এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসকল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের জ্বলন্ত জীবন্ত ধর্মাদর্শ ও গুরুভাবসহায়ে আপন আপন নির্জীব ধর্মজীবনে প্রাণসঞ্চার লাভ করিয়া অন্যত্র অনেকানেক লোকের ভিতর সেই নব ভাব, নব শক্তি সঞ্চারিত করিতে গমন করিয়াছিলেন–এ কথা কলিকাতার ইতরসাধারণে অবগত নহেন।

"ফুল ফুটিলে ভ্রমর জুটে।" ধর্মদানের যোগ্যতা চাই, নতুবা প্রচার বৃথা

ঠাকুর বলিতেন–'ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আপনি আসিয়া জুটে', তাহাকে ডাকিয়া আনিতে হয় না। তোমার ভিতরে ঈশ্বরভক্তি ও প্রেম যথার্থই বিকশিত হইলে যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বের অনুসন্ধানে, সত্যলাভের জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে কি একটা অনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক নিয়মের বশে তোমার নিকট আসিয়া জুটিবেনই জুটিবেন। ঠাকুরের মতই ছিল সেজন্য–অগ্রে ঈশ্বরবস্তু লাভ কর, তাঁহার দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া যথার্থ লোকহিতের জন্য কার্য করিবার ক্ষমতায় ভূষিত হও, ঐ বিষয়ে তাঁহার আদেশ বা 'চাপরাস' লাভ কর, তবে ধর্মপ্রচার বা বহুজনহিতায় কর্ম করিতে অগ্রসর হও; নতুবা, ঠাকুর বলিতেন, "তোমার কথা লইবে কে? তুমি যাহা করিতে বলিবে, দশে তা লইবে কেন, শুনিবে কেন?"

আধ্যাত্মিক বিষয়ে সকলেই সমান অন্ধ

বাস্তবিক এই জন্ম-জরা-মৃত্যু-সঙ্কুল দুঃখ-দারিদ্র্য-অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ জগতে আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া যতই কেন আপনাদের অপরের অপেক্ষা বড় জ্ঞান করি না, অবস্থা আমাদের সকলেরই সমান। জড়বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী জগজ্জননীর মায়ার রাজ্যে দুই-চারিটা দ্রব্যগুণ জানিয়া লইয়া যতই কেন আমরা কল-কারখানার বিস্তার করি না, দুর্দশা আমাদের চিরকাল সমান রহিয়াছে! সেই ইন্দ্রিয়-তাড়না, সেই লোভ-লালসা, সেই নিরন্তর মৃত্যুভয়, সেই কে আমি, কেনই বা এখানে, পরেই বা কোথায় যাইব–পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধি-সহায়ে সত্যলাভের প্রয়াসী হইলেও ঐসকলের দ্বারাই পদে পদে প্রতারিত ও বিপথগামী–আমার এ খেলার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কখনও হইবে কিনা–এ সকল বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় অজ্ঞানতা নিরন্তরই বিদ্যমান! এ চির-অভাবগ্রস্ত সংসারে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লইবার লোক তো সকলেই! কিন্তু তাহাদের উহা দেয় কে? বাস্তবিক কাহারও যদি কিছু দান করিবার থাকে তো সে কত দিবে দিক না। কিন্তু ভ্রান্ত–শত ভ্রান্ত মানব সে কথা বুঝে না। কিছু না থাকিলেও সে নাম-যশের বা অন্য কিছু স্বার্থের প্ররোচনায় অগ্রেই যাহা তাহার নাই অপরকে

তাহা দিতে ছুটে বা সে যে তাহা দিতে পারে এইরূপ ভান করে এবং 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' আপনিও হায় হায় করিয়া পশ্চাত্তাপ করে এবং অপরকেও সেইরূপ করায়!

ঠাকুর ধর্মপ্রচার কিভাবে করেন

সেইজন্য ঠাকুর সংসারে সকলে যে পথে চলিতেছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ণমাত্রায় ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সংযমাদি অভ্যাসে আপনাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের ঠিক ঠিক যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ফেলিলেন এবং সত্যবস্তু লাভ করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত হইয়া একই স্থানে বসিয়া জীবন কাটাইয়া যথার্থ কার্যানুষ্ঠানের এক নূতন ধারা দেখাইয়া গেলেন। দেখাইলেন যে, বস্তুলাভ করিয়া অপরকে দিবার যথার্থ কিছু সংগ্রহ করিয়া যেমন তিনি উহা বিতরণের নিমিত্ত তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন, অমনি অনাহূত হইলেও কোথা হইতে পিপাসু লোকসকল আসিয়া জুটিতে লাগিল এবং তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ও স্পর্শে পূত হইয়া নিজেরাই যে কেবল ধন্য হইয়া গেল তাহা নহে, কিন্তু সেই নব ভাব তাহারা যেখানেই যাইতে লাগিল সেখানেই প্রসারিত করিয়া অপর সাধারণকে ধন্য করিতে লাগিল। কারণ ভিতরে যে ভাবরাশি থাকে তাহাই আমরা বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকি–তা আমরা যেখানেই থাকি না কেন। ঠাকুর তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় যেমন বলিতেন, "যে যা খায় তার ঢেকুরে (উদ্গারে) সেই গন্ধই পাওয়া যায়–শশা খাও, শশার গন্ধ বেরুবে; মুলো খাও, মুলোর গন্ধ বেরুবে–এইরূপই হয়।"

ব্রাহ্মণীর সহিত মিলনকালে ঠাকুরের অবস্থা

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত সম্মিলন ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। দেখিতে পাই, ঐ সময় হইতেই তিনি শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিয়া তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে যেমন দৃঢ় ও দ্রুতপদে অগ্রসর, তেমনি আবার তাঁহাতে গুরুভাবের বিশেষ প্রকাশ হইতে আরম্ভ। কিন্তু ঐ কালের পূর্বে তাঁহাতে যে ঐ ভাব আদৌ ছিল না, তাহা বলিতে পারি না। কারণ পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিকাশ বাল্যাবধি সকল সময়েই স্বল্পাধিক পরিমাণে বর্তমান এবং এমনকি, তাঁহার নিজ দীক্ষাগুরুগণও ঐ গুরুভাবের সহায়ে নিজ নিজ ধর্ম-জীবনের অভাব, ত্রুটি ও অবসাদ দূরীভূত করিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্তির অবসর পাইয়াছিলেন।

ঠাকুরের উচ্চাবস্থা-সম্বন্ধে অপরে কি বুঝিত

ব্রাহ্মণী আসিবার পূর্বে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরানুরাগ ও ব্যাকুলতা উন্মত্ততা ও শারীরিক ব্যাধি বলিয়াই অনেকটা গণ্য হইয়া আসিতেছিল এবং উহার উপশমের জন্য চিকিৎসাও হইতেছিল। ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাটীতে পূর্ববঙ্গীয় জনৈক সাধক কবিরাজী চিকিৎসার জন্য আগত ঠাকুরকে দেখিয়া ঐসকল শারীরিক লক্ষণসমূহকে 'যোগজ বিকার' বা যোগাভ্যাস করিতে করিতে শরীরে যে-সকল অসাধারণ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বলিয়া নির্দেশ করিলেও সে কথায় তখন কেহ একটা বড় আস্থা স্থাপন করেন নাই। মথুর প্রমুখ সকলেই স্থির করিতেছিলেন, উহা ঈশ্বরানুরাগের সহিত বায়ুরোগের সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞা বিদুষী ব্রাহ্মণীই ঐসকল শারীরিক বিকারকে প্রথম অসাধারণ ঈশ্বরভক্তি-প্রসূত দেববাঞ্ছিত মানসিক পরিবর্তনের অনুরূপ দিব্য শারীরিক পরিবর্তন বলিয়া সকলের সমক্ষে নির্দেশ করিলেন। শুধু নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রেম-ভক্তিরূপিণী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধা হইতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য পর্যন্ত পূর্ব পূর্ব সমস্ত যোগী আচার্যগণের জীবনেই যে অপূর্ব মানসিক অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ঐরূপ অনুভূতিসমূহ সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে কথা যে ভক্তিগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাও তিনি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া এবং ঠাকুরের শারীরিক লক্ষণের সহিত ঐসকল মিলাইয়া নিজ বাক্য প্রমাণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে কথায় জননীর আশ্বাসে বালক যেমন সাহস ও বল পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে, ঠাকুর তো তদ্রূপ করিতে লাগিলেনই আবার মথুর প্রমুখ কালীবাটীর সকলেও বড় অল্প আশ্চর্যান্বিত

হইলেন না। তাহার উপর যখন ব্রাহ্মণী মথুরকে বলিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত সকলকে আন, আমি তাঁহাদের নিকট আমার এ কথা প্রমাণিত করিতে প্রস্তুত", তখন আর তাঁহাদের আশ্চর্যের পরিসীমা রহিল না।

ঠাকুরের অবস্থা বুঝিয়া ব্রাহ্মণী শাস্ত্রজ্ঞদের আনিতে বলায় মথুরের সিদ্ধান্ত

কিন্তু আশ্চর্য হইলে কি হইবে? ভিক্ষাব্রতাবলম্বিনী নগণ্যা একটা অপরিচিতা স্ত্রীলোকের কথায় ও পাণ্ডিত্যে সহসা কে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে? কাজেই পূর্ববঙ্গীয় কবিরাজের কথার ন্যায় ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কথাও মথুরানাথ প্রভৃতির হৃদয়ে এক কান দিয়া প্রবেশলাভ করিয়া অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যাইত নিশ্চয়, তবে ঠাকুরের আগ্রহ ও অনুরোধে ব্যাপারটা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। বালকবৎ ঠাকুর মথুরবাবুকে ধরিয়া বসিলেন, 'ভাল ভাল পণ্ডিত আনাইয়া ব্রাহ্মণী যাহা বলিতেছে, তাহা যাচাইতে হইবে।' ধনী মথুরও ভাবিলেন—ছোট ভট্চাযের জন্য ঔষধে ও ডাক্তার-খরচায় তো এত টাকা ব্যয় হইতেছে, তা ঐরূপ করিতে দোষ কি? পণ্ডিতেরা আসিয়া শাস্ত্রপ্রমাণে ব্রাহ্মণীর কথা কাটিয়া দিলে—এবং দিবেও নিশ্চিত—অন্ততঃ একটা লাভও হইবে। পণ্ডিতদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ছোট ভট্চাযের সরল বিশ্বাসী হৃদয়ে অন্ততঃ এ ধারণাটা হইবে যে, তাঁহার রোগবিশেষ হইয়াছে—তাহাতে তাঁহার নিজের মনের উপর একটা বাঁধ দিতেও ইচ্ছা হইতে পারে। পাগল তো লোকে এইরূপেই হয়—নিজে যাহা করিতেছি, বুঝিতেছি, তাহাই ঠিক আর অপর দশজনে যাহা বুঝিতেছে, করিতে বলিতেছে, তাহা ভুল—এইটি নিশ্চয় করিয়া নিজের মনের উপর, চিন্তার উপর বাঁধ না দিয়া মনকে নিজের বশীভূত রাখিবার চেষ্টা না করিয়াই তো লোক পাগল হয়! আর পণ্ডিতদের না ডাকিয়া ভট্চাযকে ব্রাহ্মণীর কথায় অবাধে বিশ্বাস করিতে দিলে তাঁহার মানসিক বিকার আরও বাড়িয়া শারীরিক রোগও যে বাড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। এইরূপে কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের প্রতি ভালবাসায়—ঐরূপ কিছু একটা ভাবিয়াই যে মথুর ঠাকুরের অনুরোধে পণ্ডিতদিগকে আনাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

বৈষ্ণবচরণ ও 'ইঁদেশে'র গৌরীকে আহ্বান

কলিকাতার পণ্ডিতমহলে তখন বৈষ্ণবচরণের বেশ প্রতিপত্তি। আবার অনেক স্থলে সকলের সমক্ষে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া পাঠ করিয়া ইতরসাধারণের নিকটেও তাঁহার খুব নামযশ। সেজন্য ঠাকুর, মথুরবাবু ও ব্রাহ্মণী সকলেই তাঁহার কথা ইতঃপূর্বেই শুনিয়াছিলেন। মথুর তাঁহাকে আনাইতে মনোনীত করিলেন এবং বাঁকুড়া অঞ্চলের ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিতের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকেও আনাইবার মানস করিলেন। এইরূপেই বৈষ্ণবচরণ ও ইঁদেশের গৌরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন হয়। ঠাকুরের নিকট আমরা ইঁহাদের অনেক কথা অনেক সময় শুনিয়াছি। তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।

বৈষ্ণবচরণের তখন কতদূর খ্যাতি

বৈষ্ণবচরণ কেবল যে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু একজন ভক্ত সাধক বলিয়াও সাধারণে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহাকে তাত্কালিক বৈষ্ণবসমাজের একজন নেতা করিয়া তুলিয়াছিল বলা যাইতে পারে। বিদায়-আদায় নিমন্ত্রণাদিতে বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে অগ্রেই সাদর আহ্বান করিতেন। ধর্মবিষয়ক কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে সমাজ অনেক সময় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন ও তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। আবার সাধনপথের ঠিক ঠিক নির্দেশ পাইবার জন্য অনেক ভক্ত সাধকও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারই পরামর্শে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন। কাজেই ভক্তির আতিশয্যে ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাদি হইতেছে কিংবা কোনরূপ শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত হওয়াতে

ঐরূপ হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে যে বৈষ্ণবচরণকে মথুর আনিতে সঙ্কল্প করিবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

ঠাকুরের গাত্রদাহ-নিবারণে ব্রাহ্মণীর ব্যবস্থা

ভৈরবী ব্রাহ্মণী আবার ইতোমধ্যে ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সত্য তদ্বিষয়ে এক বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া নিজেও উল্লসিতা হইয়াছিলেন এবং অপরেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহা এই—ব্রাহ্মণীর আগমনকালের কিছু পূর্ব হইতে ঠাকুর গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইতেছিলেন। সে জ্বালা নিবারণের অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, সূর্যোদয় হইতে যত বেলা হইত ততই সে জ্বালা অধিকতর বৃদ্ধি পাইত। দুই প্রহরে এত অসহ্য হইয়া উঠিত যে, গঙ্গার জলে শরীর ডুবাইয়া মাথায় একখানি ভিজা গামছা চাপা দিয়া দুই-তিন ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইত। আবার অত অধিকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিলে পাছে বিপরীত ঠাণ্ডা লাগিয়া অনুরূপ অসুস্থতা উপস্থিত হয়, এজন্য ইচ্ছা না হইলেও জল হইতে উঠিয়া আসিয়া বাবুদের কুঠির ঘরের মর্মর-প্রস্তর-বাঁধানো মেঝে ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া ঘরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া সেই মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে হইত।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থার কথা শুনিয়াই অন্যরূপ ধারণা করিলেন। বলিলেন, উহা ব্যাধি নয়; উহাও ঠাকুরের মনের প্রবল আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বরানুরাগের ফলেই উপস্থিত হইয়াছে। বলিলেন, ঈশ্বরদর্শনের অত্যুগ্র ব্যাকুলতায় শরীরে এইরূপ বিকার-লক্ষণসকল শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে অনেক সময় উপস্থিত হইত। এ রোগের ঔষধও অপূর্ব—সুগন্ধি পুষ্পের মাল্যধারণ এবং সর্বাঙ্গে সুবাসিত চন্দনলেপন।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণীর ঐ প্রকার রোগনির্দেশে বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, মথুর প্রমুখ সকলে হাস্য সংবরণ করিতেও পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, কত ঔষধসেবন, মধ্যমনারায়ণ বিষ্ণুতৈলাদি কত তৈলমর্দন করিয়া যাহার কিছু উপশম হইল না, তাহা কিনা বলে 'রোগ নয়'। তবে ব্রাহ্মণী যে সহজ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছে তাহার ব্যবহারে কাহারও কোনও আপত্তিই হইতে পারে না। দুই-এক দিন লাগাইয়া কোনও ফল না পাইলে রোগী আপনিই উহা ত্যাগ করিবে। অতএব ব্রাহ্মণীর কথামতো ঠাকুরের শরীর চন্দনলেপ ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইল। কিন্তু তিন দিন ঐরূপ অনুষ্ঠানের পর দেখা গেল, ঠাকুরের সে গাত্রদাহ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। সকলে আশ্চর্য হইলেন। কিন্তু অবিশ্বাসী মন কি সহজে ছাড়ে? বলিল—ওটা কাকতালীয়ের ন্যায় হইয়াছে আর কি! ভট্টাচার্য মহাশয়কে শেষে ঐ যে বিষ্ণুতৈলটা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ওটা একেবারে খাঁটি তেল ছিল; কবিরাজের কথার ভাবেই সেটা বুঝা গিয়াছিল—সেই তৈলটাতেই উপকার হইয়া আসিতেছিল; আর দুই-এক দিন ব্যবহার করিলেই সব জ্বালাটুকু দূর হইত, এমন সময় ভৈরবী চন্দন মাখাইবার ব্যবস্থাটা করিয়াছে, তাই ঐ প্রকার হইয়াছে। ব্রাহ্মণী যাহাই বলুক আর ব্যবস্থা করুক না কেন, ও তৈলটা কিন্তু বরাবর মাখানো উচিত।

ঠাকুরের বিপরীত ক্ষুধা-নিবারণে ব্রাহ্মণীর ব্যবস্থা

কিছুদিন পরে ঠাকুরের আবার এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণীর সহজ ব্যবস্থায় উহাও তিন দিনে নিবারিত হইয়াছিল এ কথাও আমরা ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, "এ সময় একটা বিপরীত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। যতই কেন খাই না, পেট কিছুতেই যেন ভরত না। এই খেয়ে উঠলুম, আবার তখনি যেন কিছু খাই খাই—সমান খাবার ইচ্ছা! দিন-রাত্তির কেবলই 'খাই-খাই' ইচ্ছা—তার আর বিরাম নেই। ভাবলুম, এ আবার কি ব্যারাম হল? বামনীকে বল্লুম, সে বল্লে—'বাবা, ভয় নেই, ঈশ্বরপথের পথিকদের ওরকম অবস্থা কখন কখন হয়ে থাকে, শাস্ত্রে এ কথা আছে; আমি তোমার ওটা ভাল করে দিচ্ছি।' এই ব'লে, মথুরকে ব'লে ঘরের ভেতর চিঁড়ে মুড়কি থেকে সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি অবধি যত রকম খাবার আছে,

সব থরে থরে সাজিয়ে রাখলে আর বল্লে, 'বাবা, তুমি এই ঘরে দিন-রাত্তির থাক আর যখন যা ইচ্ছে হবে তখনই তা খাও।' সেই ঘরে থাকি, বেড়াই; সেই সব খাবার দেখি, নাড়ি-চাড়ি; কখনও এটা থেকে কিছু খাই, কখনও ওটা থেকে কিছু খাই—এই রকমে তিন দিন কেটে যাবার পর সে বিপরীত ক্ষুধা ও খাইবার ইচ্ছাটা চলে গেল, তবে বাঁচি।"

যোগসাধনার ফলে ঐসকল অবস্থার উদয়, ঠাকুরের ঐরূপ ক্ষুধা-সম্বন্ধে আমরা যাহা দেখিয়াছি

যোগ বা ঈশ্বরে মনের তন্ময়ভাবে অবস্থানে অবস্থাটা সহজ হইয়া আসিবার পূর্বে এবং কখনও কখনও পরেও এইরূপ বিপরীত ক্ষুধাদির উদ্রেকের কথা সাধকদিগের জীবনে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরের জীবনেও অনেকবার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়াছি। তবে ঠাকুরের সম্বন্ধে আমরা যাহা দেখিয়াছি, সেটা একটু অন্য প্রকারের অবস্থা। উপরোক্ত সময়ের মতো তখন ঠাকুর নিরন্তর ঐরূপ ক্ষুধায় পীড়িত থাকিতেন না। কিন্তু সহজাবস্থায় সচরাচর তাঁহার যেরূপ আহার ছিল তাহার চতুর্গুণ বা ততোধিক পরিমাণ খাদ্য ভাবাবস্থায় উদরস্থ করিলেন, অথচ তজ্জন্য কোনই শারীরিক অসুস্থতা হইল না—এইরূপ হইতেই দেখিয়াছি। ঐরূপ দু-একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক উহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

১ম দৃষ্টান্ত—বড় একখানি সর খাওয়া

ইতঃপূর্বে ঐ বিষয়ের আভাস আমরা পাঠককে দিয়াছি।[1] পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, স্ত্রীভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গে আমরা পূর্বে একস্থলে বাগবাজারের কয়েকটি ভদ্রমহিলার ভোলা ময়রার দোকান হইতে একখানি বড় সর লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গমনের কথা এবং তথায় তাঁহার দর্শন না পাইয়া কোনও প্রকারে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা 'মাস্টার' মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের দর্শনলাভ, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের—ঠাকুর যাঁহাকে 'মোটা বামুন' বলিয়া নির্দেশ করিতেন—সহসা তথায় আগমন ও ঐসকল মহিলাদের ঠাকুর যে তক্তাপোষের উপর বসিয়াছিলেন তাহারই তলে লুকাইয়া থাকা প্রভৃতি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি; সে রাত্রে ঠাকুর আহারাদির পর দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পুনরায় কিরূপে ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্ত্রীভক্তদিগের আনীত বড় সরখানির প্রায় সমস্ত খাইয়া ফেলেন, সেকথাও আমরা পাঠককে বলিয়াছি। এখন ঐরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আমরা এখানে করিব। কয়েকটি ঘটনার কথাই বলিব, কারণ ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিত। অতএব তদ্বিষয়ে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

২য় দৃষ্টান্ত—কামারপুকুরে এক সের মিষ্টান্ন ও মুড়ি খাওয়া

ম্যালেরিয়ার প্রথমাগমন ও প্রকোপে 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশ, বিশেষতঃ রাঢ়ভূমি বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হইবার পূর্বাবধি হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাসকলের স্বাস্থ্য যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসকলের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না, এ কথা এখনও প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, লোকে তখন বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে বায়ুপরিবর্তনে যাইত। কামারপুকুর বর্ধমান হইতে বার-তের ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ঐ স্থানের জলবায়ুও তখন বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল। দ্বাদশ বৎসর অদৃষ্টপূর্ব কঠোর তপস্যায় এবং পরেও নিরন্তর শরীরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া 'ভাবমুখ'-এ থাকায় ঠাকুরের বজ্রসম দৃঢ় শরীরও যে ক্রমে ক্রমে শারীরিক পরিশ্রমে অপটু এবং কখনও কখনও প্রবল-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সেজন্য ঠাকুর সাধনকালের অন্তে প্রতি বৎসর চাতুর্মাস্যের সময়টা জন্মভূমি কামারপুকুর অঞ্চলেই কাটাইয়া আসিতেন। পরম অনুগত সেবক ভাগিনেয় হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত এবং মথুরবাবু, যাওয়া-আসার সমস্ত খরচ ছাড়া পল্লীগ্রামে তাঁহার কোন বিষয়ের পাছে অভাব হয়, এজন্য সংসারের আবশ্যকীয় যত কিছু পদার্থ তাঁহার সঙ্গে

পাঠাইয়া দিতেন। শুনিয়াছি লোকে নিজ কন্যাকে প্রথম শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার কালে যেমন প্রদীপের সলতেটি এবং আহারান্তে ব্যবহার্য খড়কে-কাঠিটি পর্যন্ত সঙ্গে দিয়া থাকে, মথুরবাবু ও তাঁহার পরম ভক্তিমতী গৃহিণী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে কামারপুকুরে পাঠাইবার কালে অনেক সময় সেইরূপভাবে 'ঘর বসত' সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিতেন। কারণ এ কথা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না যে, কামারপুকুরে ঠাকুরের সংসার যেন শিবের সংসার। সঞ্চয়ের নামগন্ধ ঠাকুরের পিতৃ-পিতামহের কাল হইতেই ছিল না। সৎপথে থাকিয়া যাহা জোটে তাহাই খাওয়া এবং ৺রঘুবীরের নামে প্রদত্ত দেড় বিঘা মাত্র জমিতে যে ধান্য হয় তাহাতেই সমস্ত বৎসর সংসার চালানো ঐ পরিবারের রীতি ছিল! পল্লীর মুদির দোকানই এ পবিত্র দেব-সংসারের ভাণ্ডার-স্বরূপ। যদি বিদায়-আদায়ে কিছু পয়সা-কড়ি পাওয়া গেল তবেই সে ভাণ্ডার হইতে সংসারের ব্যবহার্য তরি-তরকারি তৈল-লবণাদি সেদিনকার মতো বাহির হইল, নতুবা পুষ্করিণীর পাড়ের অযত্নলভ্য শাকান্নে আনন্দে জীবনধারণ। আর সর্বসময়ে সকল বিষয়ে যা করেন জীবন্ত জাগ্রত কুলদেবতা ৺রঘুবীর। ঐসকল কথা জানা ছিল বলিয়াই মথুরবাবুর কয়েক বিঘা ধান্যজমি শ্রীশ্রীরঘুবীরের নামে ক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ এবং ঠাকুরকে দেশে পাঠাইবার কালে সংসারের আবশ্যকীয় সকল পদার্থ ঠাকুরের সঙ্গে পাঠানো।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর চাতুর্মাস্যের সময় তখন কামারপুকুরে আসিতেন। প্রায় প্রতি বৎসরই আসিতেন। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় এইরূপে এক বৎসর আসিয়া জ্বররোগে বিশেষ কষ্ট পান—তদবধি আর দেশে যাইবেন না সঙ্কল্প করেন এবং আর তথায় গমনও করেন নাই। ঠাকুরের তিরোভাবের আট-দশ বৎসর পূর্বে তিনি ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ বৎসর তিনি পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় কামারপুকুরে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার ধর্মালাপ শুনিবার জন্য বাটীতে প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষের ভিড় লাগিয়াই আছে। আনন্দের হাট-বাজার বসিয়াছে। বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে পাইয়া মনের আনন্দে তাঁহার এবং তাঁহাকে দেখিতে সমাগত সকলের সেবা-পরিচর্যায় নিযুক্ত আছেন। দিনের পর দিন, সুখের দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া যাইতেছে তাহা কাহারও অনুভব হইতেছে না। বাটীতে তখন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলালদাদার পূজনীয়া মাতাঠাকুরানীই গৃহিণীস্বরূপে ছিলেন এবং তাঁহার কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীদিদি ও পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বাস করিতেছিলেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষেরা রাত্রের মতো বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ বাটীতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঠাকুরের কয়েক দিন হইতে অগ্নিমান্দ্য ও পেটের অসুখ হইয়াছে, সেজন্য রাত্রে সাগু-বার্লি ভিন্ন অন্য কিছুই খান না। আজও রাত্রে দুধ-বার্লি খাইয়া শয়ন করিলেন। বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহার আহার ও শয়নের পর নিজেরা আহারাদি করিলেন এবং রাত্রিতে করণীয় সংসারের কাজ-কর্ম সারিয়া এইবার শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সহসা ঠাকুর তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভাবাবেশে টলমল করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন এবং রামলালদাদার মাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সব শুলে যে? আমাকে কিছু খেতে না দিয়ে শুলে যে?"

রামলালের মাতা—ওমা, সে কি গো? তুমি যে এই খেলে?

ঠাকুর—কৈ খেলুম? আমি তো এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি—কৈ খাওয়ালে?

স্ত্রীলোকেরা সকলে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, ঠাকুর ভাবাবেশে ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু উপায়? ঘরে এখন আর এমন কোনরূপ খাদ্যদ্রব্যই নাই যাহা ঠাকুরকে খাইতে দিতে পারেন! এখন উপায়? কাজেই রামলালদাদার মাতাকে ভয়ে ভয়ে বলিতে হইল—"ঘরে এখন তো আর কিছু খাবার নেই, কেবল মুড়ি আছে। তা মুড়ি খাবে? দুটি খাও না। তাতে পেটের অসুখ করবে না।" এই বলিয়া থালে করিয়া মুড়ি আনিয়া ঠাকুরের

সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর তাহা দেখিয়া বালকের ন্যায় রাগ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন—"শুধু মুড়ি আমি খাব না।" অনেক বুঝানো হইল—"তোমার পেটের অসুখ, অপর কিছু তো খাওয়া চলবে না; আর দোকান-পসারও এ রাত্রে সব বন্ধ—সাগু-বার্লি যে কিনে এনে করে দেব তারও জো নেই। আজ এই দুটি খেয়ে থাক, কাল সকালে উঠেই ঝোল-ভাত রেঁধে দেব" ইত্যাদি; কিন্তু সে কথা শুনে কে? অভিমানী আবদেরে বালকের ন্যায় ঠাকুরের সেই একই কথা—"ও আমি খাব না।"

কাজেই রামলালদাদা তখন বাহিরে যাইয়া ডাকাডাকি করিয়া দোকানির ঘুম ভাঙাইলেন এবং এক সের মিঠাই কিনিয়া আনিলেন। সেই এক সের মিষ্টান্ন এবং সহজ লোকে যত খাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক মুড়ি থালে ঢালিয়া দেওয়া হইলে তবে ঠাকুর আনন্দ করিয়া খাইতে বসিলেন এবং উহার সকলই নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলেন। তখন বাটীর সকলের ভয়—'এই পেট-রোগা মানুষ, মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন সাগু-বার্লি খেয়ে থাকা, আর এই রাত্রে এই সব খাওয়া! কাল একটা কাণ্ড হবে আর কি!' কিন্তু কি আশ্চর্য, দেখা গেল পরদিন ঠাকুরের শরীর বেশ আছে, রাত্রে খাইবার জন্য কোনরূপ অসুস্থতাই নাই।

৩য় দৃষ্টান্ত—জয়রামবাটীতে একটি মৌরলা মাছ সহায়ে এক রেক চালের পান্তাভাত খাওয়া

আর একবার ঐরূপে কামারপুকুর অঞ্চলে বাস করিবার কালে ঠাকুরকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে জয়রামবাটী গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। রাত্রের আহারাদির পর শয়ন করিবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন—"বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" বাটীর মেয়েরা ভাবিয়া আকুল—কি খাইতে দিবে, ঘরে কিছুই নাই। কারণ সে দিন বাটীতে পূর্বপুরুষদিগের কাহারও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা ঐরূপ একটা কিছু ক্রিয়াকর্ম হইয়াছিল এবং সেজন্য বাটীতে অনেক লোকের আগমন হওয়ায় সকল প্রকার খাদ্যাদিই নিঃশেষে উঠিয়া গিয়াছিল। কেবল হাঁড়িতে কতকগুলা পান্তাভাত ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ঠাকুরকে ভয়ে ভয়ে ঐ কথা জানাইলে ঠাকুর বলিলেন, "তাই নিয়ে এস।" তিনি বলিলেন—"কিন্তু তরকারি তো নাই।"

ঠাকুর—দেখ না খুঁজে-পেতে; তোমরা 'মাছ চাটুই' (ঝাল-হলুদে মাছ) করেছিলে তো? দেখ না, তার একটু আছে কি না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী অনুসন্ধানে দেখিলেন, ঐ পাত্রে একটি ক্ষুদ্র মৌরলা মাছ ও একটু কাই কাই রস লাগিয়া আছে। অগত্যা তাহাই আনিলেন। দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ! সেই রাত্রে সেই পান্তাভাত খাইতে বসিলেন এবং ঐ একটি ক্ষুদ্র মৎস্যের সহায়ে এক রেক চালের ভাত খাইয়া শান্ত হইলেন।

৪র্থ দৃষ্টান্ত—দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি দু-প্রহরে এক সের হালুয়া খাওয়া

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ হইত। একদিন ঐরূপে প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় উঠিয়া ঠাকুর রামলালদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে ভারি ক্ষুধা পেয়েছে, কি হবে?"

ঘরে অন্যদিন কত মিষ্টান্নাদি মজুত থাকে, সেদিন খুঁজিয়া দেখা গেল, কিছুই নাই! অগত্যা রামলালদাদা নহবতখানার নিকটে যাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রী-ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সেই সংবাদ দিলেন। তাঁহারা শশব্যস্তে উঠিয়া খড়কুটো দিয়া উনুন জ্বালিয়া একটি বড় পাথরবাটির পুরাপুরি এক বাটি, প্রায় এক সের আন্দাজ হালুয়া তৈয়ার করিয়া ঠাকুরের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। জনৈকা স্ত্রী-ভক্তই উহা লইয়া আসিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি ঘরে প্রবেশ করিয়াই চমকিত হইয়া দেখিলেন ঘরের কোণে মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, ঠাকুর ঘরের ভিতর ভাবাবিষ্ট হইয়া পায়চারি করিতেছেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল নিকটে বসিয়া আছে।

সেই ধীর স্থির নীরব নিশীথে ঠাকুরের গম্ভীর ভাবোজ্জ্বল বদন, সেই উন্মাদবৎ মাতোয়ারা নগ্ন বেশ ও বিশাল নয়নে স্থির অন্তর্মুখী দৃষ্টি—যাহার সমক্ষে সমগ্র বিশ্বসংসার ইচ্ছামাত্রেই সমাধিতে লুপ্ত হইয়া আবার ইচ্ছামাত্রেই প্রকাশিত হইত—সেই অনন্যমনে গুরুগম্ভীর পাদবিক্ষেপ ও উদ্দেশ্যবিহীন সানন্দ বিচরণ দেখিয়াই স্ত্রী-ভক্তটির হৃদয় কি এক অপূর্ব ভাবে পূর্ণ হইল! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুরের শরীর যেন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়িয়া কত বড় হইয়াছে। তিনি যেন এ পৃথিবীর লোক নহেন! যেন ত্রিদিবের কোন দেবতা নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া দুঃখ-হাহাকার-পূর্ণ নরলোকে রাত্রির তিমিরাবরণে গুপ্ত লুক্কায়িত ভাবে নির্ভীক পদসঞ্চারে বিচরণ করিতেছেন এবং কেমন করিয়া এ শ্মশানভূমিকে দেবভূমিতে পরিণত করিবেন, করুণাপূর্ণ হৃদয়ে তদুপায়-নির্ধারণে অনন্যমনা হইয়া রহিয়াছেন! যে ঠাকুরকে সর্বদা দেখেন ইনি সেই ঠাকুর নহেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং নিকটে যাইতে একটা অব্যক্ত ভয় হইতে লাগিল।

ঠাকুরের বসিবার জন্য রামলাল পূর্ব হইতেই আসন পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি কোনরূপে যাইয়া সেই আসনের সম্মুখে হালুয়ার বাটিটা রাখিলেন। ঠাকুর খাইতে বসিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভাবের ঘোরে সে সমস্ত হালুয়াই খাইয়া ফেলিলেন। ঠাকুর কি স্ত্রী-ভক্তের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন? কে জানে! কিন্তু খাইতে খাইতে স্ত্রী-ভক্তটি নির্বাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি, কে খাচ্চে? আমি খাচ্চি, না আর কেউ খাচ্চে?"

স্ত্রী-ভক্ত—আমার মনে হচ্চে, আপনার ভিতরে যেন আর একজন কে রয়েছেন, তিনিই খাচ্চেন।

ঠাকুর 'ঠিক বলেছ' বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

প্রবল মনোভাবে ঠাকুরের শরীর পরিবর্তিত হওয়া

এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যায়, প্রবল মানসিক ভাবতরঙ্গে ঐসকল সময়ে ঠাকুরের শরীরে এতদূর পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইত যে, তাঁহাকে তখন যেন আর এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইত এবং তাঁহার চাল-চলন, আহার-বিহার, ব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয়ই যেন অন্য প্রকারের হইয়া যাইত। অথচ ঐরূপ বিপরীত আচরণে ভাবভঙ্গের পরেও শরীরে কোনরূপ বিকার লক্ষিত হইত না। ভিতরে অবস্থিত মনই যে আমাদের স্থূল শরীরটাকে সর্বক্ষণ ভাঙিতেছে, গড়িতেছে, নূতন করিয়া নির্মাণ করিতেছে—এ বিষয়টি আমরা জানিয়াও জানি না, শুনিয়াও বিশ্বাস করি না। কিন্তু বাস্তবিকই যে ঐরূপ হইতেছে তাহার প্রমাণ আমরা এ অদ্ভুত ঠাকুরের জীবনের এই সামান্য ঘটনাসমূহের আলোচনা হইতেও বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু থাক এখন ও কথা, আমরা পূর্ব কথারই অনুসরণ করি।

বৈষ্ণবচরণের আগমনে দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতসভা

কেহ কেহ বলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মুখেই বৈষ্ণবচরণের কথা মথুরবাবু প্রথম জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থাসকল শারীরিক ব্যাধিবিশেষের সহিত যে সম্মিলিত নহে, তাহা পরীক্ষা করিবার মানস করেন। যাহাই হউক, কিছুদিন পরে বৈষ্ণবচরণ নিমন্ত্রিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন যে একটি ছোটখাট পণ্ডিতসভার আয়োজন হইয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে কতকগুলি ভক্ত সাধক ও পণ্ডিত নিশ্চয়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন; তাহার উপর বিদুষী ব্রাহ্মণী ও মথুরবাবুর দলবল, সকলে ঠাকুরের জন্য একত্র সম্মিলিত; সেইজন্যই সভা বলিতেছি।

ঠাকুরের অবস্থা-সম্বন্ধে ঐ সভায় আলোচনা

এইবার ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। ব্রাহ্মণী ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা লোকমুখে শুনিয়াছেন এবং যাহা স্বয়ং চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই সমস্তের উল্লেখ করিয়া ভক্তিপথের পূর্ব পূর্ব প্রসিদ্ধ আচার্যসকলের জীবনে যে-সকল অনুভব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঐসকল কথার সহিত ঠাকুরের বর্তমান অবস্থা মিলাইয়া উহা একজাতীয় অবস্থা বলিয়া নিজমত প্রকাশ করিলেন। বৈষ্ণবচরণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি এ বিষয়ে অন্যরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ঐরূপ কেন করিতেছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।" মাতা যেমন নিজ সন্তানকে রক্ষা করিতে বীরদর্পে দণ্ডায়মানা হন, ব্রাহ্মণীও যেন আজ সেইরূপ কোন দৈববলে বলশালিনী হইয়া ঠাকুরের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর। আর ঠাকুর–যাঁহার জন্য এত কাণ্ড হইতেছে? আমরা যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, ঠাকুর বাদানুবাদে নিবিষ্ট ঐসকল লোকের ভিতর আলুথালু ভাবে বসিয়া 'আপনাতে আপনি' আনন্দানুভব ও হাস্য করিতেছেন, আবার কখনও বা নিকটস্থ বেটুয়াটি হইতে দুটি মৌরি বা কাবাবচিনি মুখে দিয়া তাঁহাদের কথাবার্তা এমনভাবে শুনিতেছেন, যেন ঐসকল কথা অপর কাহারও সম্বন্ধে হইতেছে! আবার কখনও বা নিজের অবস্থার বিষয়ে কোন কথা "ওগো, এই রকমটা হয়" বলিয়া বৈষ্ণবচরণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুরের অবস্থা-সম্বন্ধে বৈষ্ণবচরণের সিদ্ধান্ত

কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণবচরণ সাধনপ্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পারুন আর নাই পারুন, এ ক্ষেত্রে সকল কথা শুনিয়া ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি ব্রাহ্মণীর সকল কথাই হৃদয়ের সহিত যে অনুমোদন করেন, এ কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। শুধু তাহাই নহে–বলিয়াছিলেন যে, যে প্রধান প্রধান ঊনবিংশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র 'মহাভাব' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং যাহা কেবল একমাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ পর্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে, কি আশ্চর্য, তাহার সকল লক্ষণগুলিই (ঠাকুরকে দেখাইয়া) ইঁহাতে প্রকাশিত বোধ হইতেছে! জীবের ভাগ্যক্রমে যদি কখনও জীবনে মহাভাবের আভাস উপস্থিত হয়, তবে ঐ উনিশ প্রকারের অবস্থার ভিতর বড় জোর দুই-পাঁচটা অবস্থাই প্রকাশ পায়। জীবের শরীর ঐ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ কখনই ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং শাস্ত্র বলেন, পরেও ধারণে কখনও সমর্থ হইবে না। মথুর প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বৈষ্ণবচরণের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক! ঠাকুরও স্বয়ং বালকের ন্যায় বিস্ময় ও আনন্দে মথুরকে বলিলেন, "ওগো, বলে কি? যা হোক, বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।"

কর্তাভজাদি সম্প্রদায়-সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে ঐরূপ মতপ্রকাশ বৈষ্ণবচরণ যে একটা কথার কথামাত্র ভাবে করেন নাই, তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার অদ্য হইতে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আধিক্য হইতেই পাইয়া থাকি। এখন হইতে তিনি ঠাকুরের দিব্য সঙ্গসুখের জন্য প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে থাকেন, নিজের গোপনীয় রহস্যসাধনসমূহের কথা ঠাকুরকে বলিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করেন এবং কখনও কখনও নিজ সাধনপথের সহচর ভক্ত-সাধক সকলেও যাহাতে ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার ন্যায় কৃতার্থ হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটেও তাঁহাকে বেড়াইতে লইয়া যান। পবিত্রতার ঘনীভূত প্রতিমা-সদৃশ দেবস্বভাব ঠাকুর ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া এবং ইঁহাদের জীবন ও গুপ্ত সাধনপ্রণালীসমূহ অবগত হইয়াই সাধারণ দৃষ্টিতে দূষণীয় এবং নিন্দার্হ অনুষ্ঠানসকলও যদি কেহ 'ভগবান-লাভের জন্য করিতেছি', ঠিক ঠিক এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধন বলিয়া অনুষ্ঠান করে, তবে ঐসকল হইতেও অধঃপাতে না গিয়া কালে ক্রমশঃ ত্যাগ ও সংযমের অধিকারী হইয়া ধর্মপথে অগ্রসর হয় ও ভগবদ্ভক্তি লাভ

করে—এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তবে প্রথম প্রথম ঐসকল অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া এবং কিছু কিছু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ঠাকুরের মনে 'ইঁহারা সব বড় বড় কথা বলে অথচ এমন সব হীন অনুষ্ঠান করে কেন?'—এরূপ ভাবেরও উদয় হইয়াছিল, এ কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অনেক সময় শুনিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে ইঁহাদের ভিতরে যাঁহারা যথার্থ সরল-বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে দেখিয়া ঠাকুরের মত-পরিবর্তনের কথাও আমরা তাঁহারই নিকট শুনিয়াছি। ঐসকল সাধনপথাবলম্বীদিগের উপর আমাদের বিদ্বেষবুদ্ধি দূর করিবার জন্য ঠাকুর তাঁহার ঐ বিষয়ক ধারণা আমাদের নিকট কখনও কখনও এইভাবে প্রকাশ করিতেন—"ওরে দ্বেষবুদ্ধি করবি কেন? জানবি ওটাও একটা পথ, তবে অশুদ্ধ পথ। বাড়িতে ঢোকবার যেমন নানা দরজা থাকে—সদর ফটক থাকে, খিড়কির দরজা থাকে, আবার বাড়ির ময়লা সাফ করবার জন্য বাড়ির ভেতর মেথর ঢোকবারও একটা দরজা থাকে—এও জানবি তেমনি একটা পথ। যে যেদিক দিয়েই ঢুকুক না কেন, বাড়ির ভিতরে ঢুকলে সকলে এক স্থানে পৌঁছায়। তা বলে কি তোদের ঐরূপ করতে হবে? না—ওদের সঙ্গে মিশতে হবে? তবে দ্বেষ করবি না।"

প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব কিরূপ ধর্ম চায়

প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবমন কি সহজে নিবৃত্তিপথে উপস্থিত হয়? সহজে কি সে শুদ্ধ সরলভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে অগ্রসর হয়? শুদ্ধতার ভিতরে সে কিছু কিছু অশুদ্ধতা স্বেচ্ছায় ধরিয়া রাখিতে চায়; কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়াও উহার একটু আধটু গন্ধ প্রিয় বোধ করে; অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া শুদ্ধভাবে জগদম্বার পূজা করিতে হইবে এ কথা লিপিবদ্ধ করিবার পরেই তাঁহার সন্তোষার্থ বিপরীত কামভাবসূচক সঙ্গীত গাহিবার বিধান পূজাপদ্ধতির ভিতর ঢুকাইয়া রাখে! ইহাতে বিস্মিত হইবার বা নিন্দা করিবার কিছুই নাই। তবে ইহাই বুঝা যায় যে, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-নায়িকা মহামায়ার প্রবল প্রতাপে দুর্বল মানব কামকাঞ্চনের কি বজ্র-বন্ধনেই আবদ্ধ রহিয়াছে! বুঝা যায় যে, তিনি এ বন্ধন কৃপা করিয়া না ঘুচাইলে জীবের মুক্তিলাভ একান্ত অসাধ্য। বুঝা যায় যে, তিনি কাহাকে কোন্ পথ দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন তাহা মানববুদ্ধির অগম্য। আর স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আপনার অন্তরের কথা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া ধরিয়া এ অদ্‌ভুত ঠাকুরের জীবনরহস্য তুলনায় পাঠ করিতে বসিলে ইনি এক অপূর্ব, অমানব, পুরুষোত্তম পুরুষ স্বেচ্ছায় লীলায় বা আমাদের প্রতি করুণায় আমাদের এ হীন সংসারে কিছু কালের জন্য—বহির্দৃষ্টে দীনের দীনভাবে হইলেও জ্ঞানদৃষ্টে—রাজরাজেশ্বরের মতো বাস করিয়া গিয়াছেন।

তন্ত্রোৎপত্তির ইতিহাস ও তন্ত্রের নূতনত্ব

বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞাদিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে যোগের সহিত ভোগের মিলন ছিল; রূপরসাদি সকল বিষয়ের নিয়মিত ভোগ দেবতার উপাসনা করিয়া লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। ঐসকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানবমন যখন অনেকটা বাসনাবর্জিত হইয়া আসিত তখনই সে উপনিষদুক্ত শুদ্ধা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইত। কিন্তু বৌদ্ধযুগে চেষ্টা হইল অন্য প্রকারের। অরণ্যবাসী বাসনাশূন্য সাধকদিগের শুদ্ধভাবে উপাসনা ভোগবাসনাপূর্ণ সংসারী মানবকে নির্বিশেষে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইল। তাত্‌কালিক রাজ্যশাসনও বৌদ্ধ যতিদিগের ঐ চেষ্টায় সহায়তা করিতে লাগিল। ফলে দাঁড়াইল, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির—যাহা প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত মানবমনকে নিয়মিত ভোগাদি প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে যোগের নিবৃত্তিমার্গে উপনীত করিতেছিল, তাহার—বাহিরে উচ্ছেদ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নীরব নিশীথে জনশূন্য বিভীষিকাপূর্ণ শ্মশানাদি চত্বরে অনুষ্ঠেয় তন্ত্রোক্ত গুপ্ত সাধনপ্রণালীরূপে প্রকাশ। তন্ত্রে প্রকাশ, মহাযোগী মহেশ্বর বৈদিক অনুষ্ঠানসকল নির্জীব হইয়া গিয়াছে দেখিয়া উহাদিগকে পুনরায় সজীব করিয়া ভিন্নাকারে তন্ত্ররূপে প্রকাশিত করিলেন। এই প্রবাদে বাস্তবিকই মহা সত্য

নিহিত রহিয়াছে। কারণ, তন্ত্রে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ন্যায় যোগের সহিত ভোগের সম্মিলন তো লক্ষিত হইয়াই থাকে, তদ্ভিন্ন বৈদিক কর্মকাণ্ডসমূহ যেমন উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে সুদূরে পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছিল, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানসকল তেমনভাবে না থাকিয়া প্রতি ক্রিয়াটিই অদ্বৈত জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে–ইহাও পরিলক্ষিত হয়। দেখ না–তুমি কোন দেবতার পূজা করিতে বসিলে অগ্রেই কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থ সহস্রারে উঠাইয়া ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চিন্তা তোমায় করিতে হইবে; পরে পুনরায় তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া জীবভাব ধারণ করিলে এবং ঈশ্বরজ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার পূজ্য দেবতারূপে প্রকাশিত হইলেন, এবং তুমি তাঁহাকে তোমার ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে বসিলে–ইহাই চিন্তা করিতে হইবে। মানবজীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য–প্রেমে ঈশ্বরের সহিত একাকার হইয়া যাইবার কি সুন্দর চেষ্টাই না ঐ ক্রিয়ায় লক্ষিত হইয়া থাকে! অবশ্য সহস্রের ভিতর হয়তো একজন উন্নত উপাসক ঐ ক্রিয়াটি ঠিক ঠিক করিতে পারেন; কিন্তু সকলেই ঐরূপ করিবার অল্পবিস্তর চেষ্টাও তো করে, তাহাতেই যে বিশেষ লাভ–কারণ, ঐরূপ করিতে করিতেই যে তাহারা ধীরে ধীরে উন্নত হইবে। তন্ত্রের প্রতি ক্রিয়ার সহিতই এইরূপে অদ্বৈত জ্ঞানের ভাব সম্মিলিত থাকিয়া সাধককে চরম লক্ষ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাই তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হইতে নূতনত্ব এবং এইজন্যই তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর ভারতের জনসাধারণের মনে এতদূর প্রভুত্ব-বিস্তার।

তন্ত্রে বীরাচারের প্রবেশেতিহাস

তন্ত্রের আর এক নূতনত্ব–জগৎকারণ মহামায়ার মাতৃত্বভাবের প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় স্ত্রী-মূর্তির উপর একটা শুদ্ধ পবিত্র ভাব আনয়ন। বেদ পুরাণ ঘাঁটিয়া দেখ, এ ভাবটি আর কোথাও নাই। উহা তন্ত্রের একেবারে নিজস্ব। বেদের সংহিতাভাগে স্ত্রী-শরীরের উপাসনার একটু আধটু বীজমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, বিবাহকালে কন্যার ইন্দ্রিয়কে 'প্রজাপতের্দ্বিতীয়ং মুখং' বা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি করিবার দ্বিতীয় মুখ বলিয়া নির্দেশ করিয়া উহা যাহাতে সুন্দর তেজস্বী গর্ভ ধারণ করে এজন্য 'গর্ভং ধেহি সিনীবালি' ইত্যাদি মন্ত্রে উহাতে দেবতাসকলের উপাসনার এবং ঐ ইন্দ্রিয়কে পবিত্রভাবে দেখিবার বিশেষ বিধান আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন, বৈদিক সময় হইতেই যোনিলিঙ্গের উপাসনা ভারতে প্রচলিত ছিল। বাবিল-নিবাসী সুমের জাতি এবং তচ্ছাখা দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই স্থূলভাবে ঐ উপাসনা যে প্রথম প্রচলিত ছিল, ইতিহাস তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। ভারতীয় তন্ত্র বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ভাব যেমন আপন শরীরে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল, তেমনি আবার অধিকারী-বিশেষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঐ উপাসনার ভিতর দিয়াই সহজে হইবে দেখিয়া দ্রাবিড় জাতির ভিতরে নিবদ্ধ স্ত্রী-শরীরে উপাসনাটির স্থূলভাব অনেকটা উল্টাইয়া দিয়া উহার সহিত পূর্বোক্ত বৈদিক যুগের উপাসনার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবটি সম্মিলিত করিয়া পূর্ণ বিকশিত করিল; এবং ঐরূপে উহাও নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লইল। তন্ত্রে বীরাচারের উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তন্ত্রকার কুলাচার্যগণ ঠিকই বুঝিয়াছিলেন প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব স্থূল রূপরসাদির অল্পবিস্তর ভোগ করিবেই করিবে; কিন্তু যদি কোনরূপে তাহার প্রিয় ভোগ্যবস্তুর উপর ঠিক ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধার উদয় করিয়া দিতে পারেন, তবে সে কত ভোগ করিবে করুক না–ঐ তীব্র শ্রদ্ধাবলে স্বল্পকালেই সংযমাদি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইবে, নিশ্চয়। সেজন্যই তাঁহারা প্রচার করিলেন–নারীশরীর পবিত্র তীর্থস্বরূপ, নারীতে মনুষ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেবীবুদ্ধি সর্বদা রাখিবে এবং জগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ ভাবনা করিয়া সর্বদা স্ত্রী-মূর্তিতে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে; নারীর পাদোদক ভক্তিপরায়ণ হইয়া পান করিবে এবং ভ্রমেও কখনও নারীর নিন্দা বা নারীকে প্রহার করিবে না। যথা –

যস্যাঃ অঙ্গে মহেশানি সর্বতীর্থানি সন্তি বৈ।

– পুরশ্চরণোল্লাসতন্ত্র, ১৪ পটল

শক্তৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু যঃ করোতি বরাননে।

ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্বিপরীতং ফলং লভেৎ॥

– উত্তরতন্ত্র, ২য় পটল

শক্ত্যা পাদোদকং যস্তু পিবেদ্ভক্তিপরায়ণঃ।

উচ্ছিষ্টং বাপি ভুঞ্জীত তস্য সিদ্ধিরখণ্ডিতা॥

– নিগমকল্পদ্রুম

স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্।

স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্তব্যস্তাসু নিন্দাং প্রহারকম্॥

– মুণ্ডমালাতন্ত্র, ৫ম পটল

প্রত্যেক তন্ত্রে উত্তম ও অধম দুই বিভাগ আছে

কিন্তু হইলে কি হইবে? কালে তান্ত্রিক সাধকদিগের ভিতরেও এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যখন ঈশ্বরীয় জ্ঞানলাভ ছাড়িয়া তাঁহারা সামান্য সামান্য মানসিক শক্তি বা সিদ্ধাইসকল-লাভেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই নানা প্রকার অস্বাভাবিক সাধনপ্রণালী ও ভূতপ্রেতাদির উপাসনা তন্ত্রশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে বর্তমান আকার ধারণ করাইয়াছিল। প্রতি তন্ত্রের ভিতরেই সেজন্য উত্তম ও অধম, উচ্চ ও হীন–এই দুই স্তরের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং উচ্চাঙ্গের ঈশ্বরোপাসনার সহিত হীনাঙ্গের সাধনসকলও সন্নিবেশিত দেখা যায়। আর যাহার যেমন প্রকৃতি, সে এখন উহার ভিতর হইতে সেই মতটি বাছিয়া লয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-প্রবর্তিত নূতন পূজা-প্রণালী

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রাদুর্ভাবে আবার একটি নূতন পরিবর্তন তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি ও তৎপরবর্তী বৈষ্ণবাচার্যগণ সাধারণের দ্বৈতভাবের বিস্তারেই মঙ্গল ধারণা করিয়া তান্ত্রিক সাধনপ্রণালীর ভিতর হইতে অদ্বৈতভাবের ক্রিয়াগুলি অনেকাংশে বাদ দিয়া কেবল তন্ত্রোক্ত মন্ত্রশাস্ত্র ও বাহ্যিক উপাসনাটি জনসাধারণে প্রচলিত করিলেন। ঐ উপাসনা ও পূজাদিতেও তাঁহারা নবীন ভাব প্রকাশ করাইয়া আত্মবৎ দেবতার সেবা করিবার উপদেশ দিলেন। তান্ত্রিক দেবতাকুল নিবেদিত ফলমূল আহার্যাদি দৃষ্টিমাত্রেই সাধকের নিমিত্ত পূত করিয়া দেন এবং উহা গ্রহণে সাধকের কামক্রোধাদি পশুভাবের বৃদ্ধি না হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে–ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। বৈষ্ণবাচার্যগণের নব-প্রবর্তিত প্রণালীতে দেবতাগণ ঐসকল আহার্যের সূক্ষ্মাংশ এবং সাধকের ভক্তির আতিশয্য ও আগ্রহনির্বন্ধে কখনও কখনও স্থূলাংশও গ্রহণ করিয়া থাকেন–এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত হইল। উপাসনা-প্রণালীতে এইরূপে আরও অনেক পরিবর্তন বৈষ্ণবাচার্যগণ কর্তৃক সংসাধিত হয়, তন্মধ্যে প্রধান এইটিই বলিয়া বোধ হয় যে, তাঁহারা যতদূর সম্ভব তন্ত্রোক্ত পশুভাবেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বাহ্যিক শৌচাচারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং আহারে শৌচ, বিহারে শৌচ, সকল বিষয়ে শুচিশুদ্ধ থাকিয়া 'জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্নসংশয়ঃ'–নামই ব্রহ্ম এই জ্ঞানে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের নাম-জপ দ্বারাই জীব সিদ্ধকাম হইবে, এই মত সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন।

ঐ প্রণালী হইতে কালে কর্তাভজাদি মতের উৎপত্তি ও সে সকলের সার কথা

কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ করিলে কি হইবে? তাঁহাদের তিরোভাবের স্বল্পকাল পরেই প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবমন তাঁহাদের প্রবর্তিত শুদ্ধমার্গেও কলুষিত ভাবসকল প্রবেশ করাইয়া ফেলিল। সূক্ষ্ম ভাবটুকু ছাড়িয়া স্থূল বিষয় গ্রহণ করিয়া বসিল—পরকীয়া নায়িকার উপপতির প্রতি আন্তরিক টানটুকু গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরে উহার আরোপ না করিয়া পরকীয়া স্ত্রীই গ্রহণ করিয়া বসিল এবং এইরূপে তাঁহাদের প্রবর্তিত শুদ্ধযোগমার্গের ভিতরেও কিছু কিছু ভোগ প্রবেশ করাইয়া উহাকে কতকটা নিজের প্রবৃত্তির মতো করিয়া লইল। ঐরূপ না করিয়াই বা সে করে কি? সে যে অত শুদ্ধভাবে চলিতে অক্ষম। সে যে যোগ ও ভোগের মিশ্রিত ভাবই গ্রহণ করিতে পারে। সে যে ধর্মলাভ চায়; কিন্তু তৎসঙ্গে একটু আধটু রূপরসাদি-ভোগেরও লালসা রাখে। সেইজন্যই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর কর্তাভজা, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি মতের উপাসনা ও গুপ্ত সাধনপ্রণালীসকলের উৎপত্তি। অতএব ঐসকলের মূলে দেখিতে পাওয়া যায় সেই বহু প্রাচীন বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রবাহ, সেই যোগ ও ভোগের সম্মিলন; আর দেখিতে পাওয়া যায় সেই তান্ত্রিক কুলাচার্যগণের প্রবর্তিত অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত প্রতি ক্রিয়ার সম্মিলনের কিছু কিছু ভাব।

কর্তাভজাদি মতে সাধ্য ও সাধনবিধি-সম্বন্ধে উপদেশ

কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, মুক্তি, সংযম, ত্যাগ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটি কথার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদের পূর্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঠাকুর ঐসকল সম্প্রদায়ের কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় এগুলি আমাদের বলিতেন। সরল ভাষায় ও ছন্দোবদ্ধে লিপিবদ্ধ হইয়া উহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের ঐসকল বিষয় বুঝিবার কতদূর সহায়তা করে, তাহা পাঠক ঐসকল শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐসকল সম্প্রদায়ের লোকে ঈশ্বরকে 'আলেকলতা' বলিয়া নির্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত 'অলক্ষ্য' কথাটি হইতেই 'আলেক্' কথাটির উৎপত্তি। ঐ 'আলেক্' শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনে প্রবিষ্ট বা তদবলম্বনে প্রকাশিত হইয়া 'কর্তা' বা 'গুরু' রূপে আবির্ভূত হন। ঐরূপ মানবকে ইঁহারা 'সহজ' উপাধি দিয়া থাকেন। যথার্থ গুরুভাবে ভাবিত মানবই এ সম্প্রদায়ের উপাস্য বলিয়া নির্দিষ্ট হওয়ায় উহার নাম 'কর্তাভজা' হইয়াছে। 'আলেকলতার' স্বরূপ ও বিশুদ্ধ মানবে আবেশ সম্বন্ধে ইঁহারা এইরূপ বলেন –

আলেকে আসে, আলেকে যায়,

আলেকের দেখা কেউ না পায়।

আলেককে চিনিছে যেই,

তিন লোকের ঠাকুর সেই।

'সহজ' মানুষের লক্ষণ—তিনি 'অটুট' হইয়া থাকেন অর্থাৎ রমণীর সঙ্গে সর্বদা থাকিলেও তাঁহার কখনো কামভাবে ধৈর্যচ্যুতি হয় না।

এই সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন –

রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।

সংসারে কামকাঞ্চনের ভিতর অনাসক্তভাবে না থাকিলে সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সেজন্য সাধকদিগের প্রতি উপদেশ –

রাঁধুনি হইবি, ব্যঞ্জন বাঁটিবি, হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়।

সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, সাপ না গিলিবে তায়।

অমিয়-সাগরে সিনান করিবি, কেশ না ভিজিবে তায়।

তন্ত্রের ভিতর সাধকদিগের যেমন পশু, বীর ও দিব্যভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা আছে, ইঁহাদের ভিতরেও তেমনি সাধকদিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথা আছে –

‘আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই –

সাঁইয়ের পর আর নাই।’

অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে তবে মানব সাঁই হইয়া থাকে।

ঠাকুর বলিতেন, “ইঁহারা সকলে ঈশ্বরের ‘অরূপ রূপ’-এর ভজন করেন” এবং ঐ সম্প্রদায়ের কয়েকটি গানও আমাদের নিকট অনেক সময় গাহিতেন। যথা –

বাউলের সুর।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেমরত্নধন॥

(ওরে) খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্ খুঁজলে পাবি, হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।

(আবার) দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গি, চালায় আবার সে কোন্ জন?

কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

এইরূপে গুরুর উপাসনা ও সকলে একত্রিত হইয়া ভজনাদিতে নিবিষ্ট থাকা–ইহাই তাঁহাদের প্রধান সাধন। ইঁহারা দেবদেবীর মূর্ত্যাদি অস্বীকার না করিলেও উপাসনা বড় একটা করেন না। ভারতে গুরু বা আচার্যের উপাসনা অতীব প্রাচীন; উপনিষদের কাল হইতেই প্রবর্তিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ উপনিষদেই রহিয়াছে “আচার্যদেবো ভব”। তখন দেবদেবীর উপাসনা আদৌ প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। সেই আচার্যোপাসনা কালে ভারতে কতরূপ মূর্তি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।

এতদ্ভিন্ন শুচি-অশুচি, ভাল-মন্দ প্রভৃতি ভেদজ্ঞান মন হইতে ত্যাগ করিবার জন্য নানা প্রকারের অনুষ্ঠানও সাধককে করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, সেসকল সাধকেরা গুরুপরম্পরায় অবগত হইয়া থাকেন। ঠাকুর তাহারও কিছু কিছু কখনও কখনও উল্লেখ করিতেন।

বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে কাছিবাগানের আখড়ায় লইয়া যাওয়া ও পরীক্ষা

ঠাকুরকে অনেক সময় বলিতে শুনা যাইত, ‘বেদ পুরাণ কানে শুনতে হয়; আর তন্ত্রের সাধনসকল কাজে করতে হয়, হাতে হাতে করতে হয়।’ দেখিতেও পাওয়া যায়, ভারতের প্রায় সর্বত্রই স্মৃতির অনুগামী সকলে কোন না কোনরূপ তান্ত্রিকী সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় ন্যায়-বেদান্তের পণ্ডিতসকল অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক। বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সকলের ভিতরেও সেইরূপ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ কর্তাভজাদি সম্প্রদায়সকলের গুপ্ত সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিতেছেন। পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও এই দলভুক্ত ছিলেন। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে কাছিবাগানে ঐ সম্প্রদায়ের আখড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ঐ স্থলে থাকিয়া তাঁহার উপদেশমত সাধনাদিতে রত থাকিতেন। ঠাকুরকে বৈষ্ণবচরণ এখানে কয়েকবার লইয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এখানকার কতকগুলি স্ত্রীলোক ঠাকুরকে সদাসর্বক্ষণ সম্পূর্ণ নির্বিকার

থাকিতে দেখিয়া এবং ভগবৎ-প্রেমে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব ভাবাদি হইতে দেখিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হইয়াছেন কিনা জানিবার জন্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'অটুট সহজ' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য বালকস্বভাব ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে ও অনুরোধে তথায় সরলভাবেই বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উহারা যে তাঁহাকে ঐরূপে পরীক্ষা করিবে, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না। যাহাই হউক, তদবধি তিনি আর ঐ স্থানে গমন করেন নাই।

বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার-জ্ঞান

ঠাকুরের অদ্‌ভুত চরিত্রবল, পবিত্রতা ও ভাবসমাধি দেখিয়া তাঁহার উপর বৈষ্ণবচরণের ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল যে, পরিশেষে তিনি ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

তান্ত্রিক গৌরী পণ্ডিতের সিদ্ধাই

বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের নিকট কিছুদিন যাতায়াত করিতে না করিতেই ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী পণ্ডিত একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তিনি পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে লইয়া একটি মজার ঘটনা ঘটে। ঠাকুরের নিকটেই আমরা উহা শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, গৌরীর একটি সিদ্ধাই বা তপস্যালব্ধ ক্ষমতা ছিল। শাস্ত্রীয় তর্কবিচারে আহূত হইয়া যেখানে তিনি যাইতেন, সেই বাটীতে প্রবেশকালে এবং যেখানে বিচার হইবে সেই সভাস্থলে প্রবেশকালে তিনি উচ্চরবে কয়েকবার 'হা রে রে রে, নিরালম্বো লম্বোদরজননী কং যামি শরণম্'—এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া তবে সে বাটীতে ও সভাস্থলে প্রবেশ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, জলদগম্ভীরস্বরে বীরভাবদ্যোতক 'হা রে রে রে' শব্দ এবং আচার্যকৃত দেবীস্তোত্রের ঐ এক পাদ তাঁহার মুখ হইতে শুনিলে সকলের হৃদয় কি একটা অব্যক্ত ত্রাসে চমকিত হইয়া উঠিত! উহাতে দুইটি কার্য সিদ্ধ হইত। প্রথম, ঐ শব্দে গৌরীর ভিতরের শক্তি সম্যক জাগরিতা হইয়া উঠিত; এবং দ্বিতীয়, তিনি উহার দ্বারা শত্রুপক্ষকে চমকিত ও মুগ্ধ করিয়া তাহাদের বলহরণ করিতেন। ঐরূপ শব্দ করিয়া এবং কুস্তিগীর পালোয়ানেরা যেরূপে বাহুতে তাল ঠোকে সেইরূপ তাল ঠুকিতে ঠুকিতে গৌরী সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন ও বাদশাহী দরবারে সভ্যেরা যেভাবে উপবেশন করিত, পদদ্বয় মুড়িয়া তাহার উপর সেইভাবে সভাস্থলে বসিয়া তিনি তর্কসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তখন গৌরীকে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত না।

গৌরীর ঐ সিদ্ধাইয়ের কথা ঠাকুর জানিতেন না। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পদার্পণ করিয়া যেমন গৌরী উচ্চরবে 'হা রে রে রে' শব্দ করিলেন, অমনি ঠাকুরের ভিতরে কে যেন ঠেলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গৌরীর অপেক্ষা উচ্চরবে ঐ শব্দ করাইতে লাগিল। ঠাকুরের মুখনিঃসৃত ঐ শব্দে গৌরী উচ্চতর রবে ঐ শব্দ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাহাতে উত্তেজিত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর উচ্চরবে 'হা রে রে রে' করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেন, বারংবার সেই দুই পক্ষের 'হা রে রে রে' রবে যেন ডাকাত-পড়ার মতো এক ভীষণ আওয়াজ উঠিল। কালীবাটীর দারোয়ানেরা যে যেখানে ছিল শশব্যস্তে লাঠি-সোটা লইয়া তদভিমুখে ছুটিল। অন্য সকলে ভয়ে অস্থির। যাহা হউক, গৌরী এক্ষেত্রে ঠাকুরের অপেক্ষা উচ্চতর রবে আর ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া শান্ত হইলেন এবং একটু যেন বিষণ্নভাবে ধীরে ধীরে কালীবাটীতে প্রবেশ করিলেন। অপর সকলেও ঠাকুর এবং নবাগত পণ্ডিতজীই ঐরূপ করিতেছিলেন জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, "তারপর মা জানিয়ে দিলেন, গৌরী যে শক্তি বা সিদ্ধাইয়ে লোকের বলহরণ করে নিজে অজেয় থাকত, সেই শক্তির এখানে ঐরূপে পরাজয় হওয়াতে তার ঐ সিদ্ধাই থাকল না! মা তার কল্যাণের জন্য তার শক্তিটা (নিজেকে দেখাইয়া) এর ভিতর টেনে নিলেন।" বাস্তবিক দেখা

গিয়াছিল, গৌরী দিন দিন ঠাকুরের ভাবে মোহিত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

গৌরীর আপন পত্নীকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা

পূর্বেই বলিয়াছি, গৌরী পণ্ডিত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, গৌরী প্রতি বৎসর ৺দুর্গাপূজার সময় জগদম্বার পূজার যথাযথ সমস্ত আয়োজন করিতেন এবং বসনালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া আলপনা দেওয়া পীঠে বসাইয়া নিজের গৃহিণীকেই শ্রীশ্রীজগদম্বা জ্ঞানে তিন দিন ভক্তিভাবে পূজা করিতেন। তন্ত্রের শিক্ষা–যত স্ত্রী-মূর্তি, সকলই সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্তি–সকলের মধ্যেই জগন্মাতার জগৎপালিনী ও আনন্দদায়িনী শক্তির বিশেষ প্রকাশ। সেইজন্য স্ত্রী-মূর্তিমাত্রকেই মানবের পবিত্রভাবে পূজা করা উচিত। স্ত্রী-মূর্তির অন্তরালে শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ং রহিয়াছেন, একথা স্মরণ না রাখিয়া ভোগ্যবস্তুমাত্র বলিয়া সকামভাবে স্ত্রী-শরীর দেখিলে উহাতে শ্রীশ্রীজগন্মাতারই অবমাননা করা হয় এবং উহাতে মানবের অশেষ অকল্যাণ আসিয়া উপস্থিত হয়। চণ্ডীতে দেবতাগণ দেবীকে স্তব করিতে করিতে ঐ কথা বলিতেছেন –

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

– হে দেবি! তুমিই জ্ঞানরূপিণী; জগতে উচ্চাবচ যত প্রকার বিদ্যা আছে–যাহা হইতে লোকের অশেষ প্রকার জ্ঞানের উদয় হইতেছে–সে সকল তুমিই, তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা। তুমিই স্বয়ং জগতের যাবতীয় স্ত্রী-মূর্তিরূপে বিদ্যমানা। তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার সর্বত্র বর্তমান। তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীতা–স্তব করিয়া তোমার অনন্ত গুণের উল্লেখ করিতে কে কবে পারিয়াছে বা পারিবে!

ভারতের সর্বত্র আমরা নিত্যই ঐ স্তব অনেকে পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু হায়! কয়জন কতক্ষণ দেবীবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীর অবলোকন করিয়া ঐরূপ যথাযথ সম্মান দিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে উদ্যম করিয়া থাকি? শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ-প্রকাশের আধারস্বরূপিণী স্ত্রী-মূর্তিকে হীন বুদ্ধিতে কলুষিত নয়নে দেখিয়া কে না দিনের ভিতর শতবার সহস্রবার তাঁহার অবমাননা করিয়া থাকে? হায় ভারত, ঐরূপ পশুবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীরের অবমাননা করিয়াই এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে ভুলিয়াই তোমার বর্তমান দুর্দশা। কবে জগদম্বা আবার কৃপা করিয়া তোমার এ পশুবুদ্ধি দূর করিবেন, তাহা তিনিই জানেন!

গৌরীর অদ্‌ভুত হোমপ্রণালী

গৌরী পণ্ডিতের আর একটি অদ্‌ভুত শক্তির কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকেরা জগন্মাতার নিত্যপূজান্তে হোম করিয়া থাকেন। গৌরীও সকল দিন না হউক, অনেক সময় হোম করিতেন। কিন্তু তাঁহার হোমের প্রণালী অতি অদ্‌ভুত ছিল। অপর সাধারণে যেমন জমির উপর মৃত্তিকা বা বালুকা দ্বারা বেদি রচনা করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ সাজাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করেন এবং আহুতি দিয়া থাকেন, তিনি সেরূপ করিতেন না। তিনি স্বীয় বামহস্ত শূন্যে প্রসারিত করিয়া হস্তের উপরেই এককালে এক মন কাঠ সাজাইতেন এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ অগ্নিতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেন! হোম করিতে কিছু অল্প সময় লাগে না, ততক্ষণ হস্ত শূন্যে প্রসারিত রাখিয়া ঐ এক মন কাষ্ঠের গুরুভার ধারণ করিয়া থাকা এবং তদুপরি হস্তে অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়া মন স্থির রাখা ও যথাযথভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে

আহুতি প্রদান করা—আমাদের নিকটে একেবারে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। সেজন্য আমাদের অনেকে ঠাকুরের মুখে শুনিয়াও ঐ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেন, "আমি নিজের চক্ষে তাকে ঐরূপ করতে দেখেছি রে! ওটাই তার একটা সিদ্ধাই ছিল।"

বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে সভা; ভাবাবেশে ঠাকুরের বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধারোহণ ও তাঁহার স্তব

গৌরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কয়েকদিন পরেই মথুরবাবু বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ কয়েকজন সাধক পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া একটি সভার অধিবেশন করিলেন। উদ্দেশ্য, পূর্বের ন্যায় ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে নবাগত পণ্ডিতজীর সহিত আলোচনা ও নির্ধারণ করা। প্রাতেই সভা আহূত হয়। স্থান—শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। বৈষ্ণবচরণের কলিকাতা হইতে আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর গৌরীকে সঙ্গে করিয়া অগ্রেই সভাস্থলে চলিলেন, এবং সভাপ্রবেশের পূর্বেই শ্রীশ্রীজগন্মাতা কালিকার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীমূর্তিদর্শন ও শ্রীচরণবন্দনাদি করিয়া ভাবে টলমল করিতে করিতে যেমন মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে বৈষ্ণবচরণ তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইতেছেন। দেখিয়াই ঠাকুর ভাবে প্রেমে সমাধিস্থ হইয়া বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধদেশে বসিয়া পড়িলেন এবং বৈষ্ণবচরণ উহাতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া তদ্দণ্ডেই রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ঠাকুরের স্তব করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সেই সমাধিস্থ প্রসন্নোজ্জ্বল মূর্তি এবং বৈষ্ণবচরণের তদ্রূপে আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সুললিত স্তবপাঠ দেখিয়া শুনিয়া মথুরপ্রমুখ উপস্থিত সকলে স্থিরনেত্রে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল, তখন ধীরে ধীরে সকলে তাঁহার সহিত সভাস্থলে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এইবার সভার কার্য আরম্ভ হইল। কিন্তু গৌরী প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন—(ঠাকুরকে দেখাইয়া) "উনি যখন পণ্ডিতজীকে এরূপ কৃপা করিলেন, তখন আজ আর আমি উহার (বৈষ্ণবচরণের) সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইব না; হইলেও আমাকে নিশ্চয় পরাজিত হইতে হইবে, কারণ উনি (বৈষ্ণবচরণ) আজ দৈববলে বলীয়ান! বিশেষতঃ উনি (বৈষ্ণবচরণ) তো দেখিতেছি আমারই মতের লোক—ঠাকুর সম্বন্ধে উহারও যাহা ধারণা, আমারও তাহাই; অতএব এস্থলে তর্ক নিষ্প্রয়োজন।" অতঃপর শাস্ত্রীয় অন্যান্য কথাবার্তায় কিছুক্ষণ কাটাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ঠাকুরের সম্বন্ধে গৌরীর ধারণা

গৌরী যে বৈষ্ণবচরণের পাণ্ডিত্যে ভয় পাইয়া তাঁহার সহিত অদ্য তর্কযুদ্ধে নিরস্ত হইলেন, তাহা নহে। ঠাকুরের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য লক্ষণাদি দেখিয়া এই অল্পদিনেই তিনি তপস্যা-প্রসূত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসহায়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন—ইনি সামান্য নহেন, ইনি মহাপুরুষ! কারণ, ইহার কিছুদিন পরেই ঠাকুর একদিন গৌরীর মন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, বৈষ্ণবচরণ (নিজের শরীর দেখাইয়া) একে অবতার বলে; এটা কি হতে পারে? তোমার কি বোধ হয়, বল দেখি?"

গৌরী তাহাতে গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে তো ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোক-কল্যাণসাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য সাধন করেন, আপনি তিনিই!" ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ও বাবা! তুমি যে আবার তাকেও (বৈষ্ণবচরণকেও) ছাড়িয়ে যাও! কেন বল দেখি? আমাতে কি দেখেছ, বল দেখি?" গৌরী বলিলেন, "শাস্ত্রপ্রমাণে এবং নিজের

প্রাণের অনুভব হইতেই বলিতেছি। এ বিষয়ে যদি কেহ বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বনে আমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি আমার ধারণা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি।"

ঠাকুর বালকের ন্যায় বলিলেন, "তোমরা সব এত কথা বল, কিন্তু কে জানে বাবু, আমি তো কিছু জানি না!"

গৌরী বলিলেন, "ঠিক কথা। শাস্ত্রও ঐ কথা বলেন–আপনিও আপনাকে জানেন না। অতএব অন্যে আর কি করে আপনাকে জানবে বলুন? যদি কাহাকেও কৃপা করে জানান তবেই সে জানতে পারে।"

ঠাকুরের সংসর্গে গৌরীর বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যায় গমন

পণ্ডিতজীর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। দিন দিন গৌরী ঠাকুরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনের ফল এতদিনে ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া সংসারে তীব্র বৈরাগ্যরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। দিন দিন তাঁহার মন পাণ্ডিত্য, লোকমান্য, সিদ্ধাই প্রভৃতি সকল বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে গুটাইয়া আসিতে লাগিল। এখন আর গৌরীর সে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নাই, সে দাম্ভিকতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সে তর্কপ্রিয়তা এককালে নীরব হইয়াছে। তিনি এখন বুঝিয়াছেন, ঈশ্বরপাদপদ্ম-লাভের একান্ত চেষ্টা না করিয়া এতদিন বৃথা কাল কাটাইয়াছেন–আর ওরূপে কালক্ষেপ উচিত নহে। তাঁহার মনে এখন সঙ্কল্প স্থির–সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিয়া দিন কয়টা কাটাইয়া দিবেন; এইরূপে যদি তাঁর কৃপা ও দর্শনলাভ করিতে পারেন!

এইরূপে ঠাকুরের সঙ্গসুখে ও ঈশ্বরচিন্তায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেক দিন বাটী হইতে অন্তরে আছেন বলিয়া ফিরিবার জন্য পণ্ডিতজীর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গ বারংবার পত্র লিখিতে লাগিল। কারণ, তাহারা লোকমুখে আভাস পাইতেছিল, দক্ষিণেশ্বরের কোন এক উন্মত্ত সাধুর সহিত মিলিত হইয়া পণ্ডিতজীর মনের অবস্থা কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছে।

পাছে তাহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে টানাটানি করিয়া সংসারে পুনরায় লিপ্ত করে, তাহাদের চিঠির আভাসে পণ্ডিতজীর মনে ঐ ভাবনাও ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গৌরী উপায় উদ্ভাবন করিলেন এবং শুভ মুহূর্তের উদয় জানিয়া ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণাম করিয়া সজলনয়নে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "সে কি গৌরী, সহসা বিদায় কেন? কোথায় যাবে?"

গৌরী করজোড়ে উত্তর করিলেন, "আশীর্বাদ করুন যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরবস্তু লাভ না করিয়া আর সংসারে ফিরিব না।" তদবধি সংসারে আর কখনও কেহ বহু অনুসন্ধানেও গৌরী পণ্ডিতের দেখা পাইলেন না।

বৈষ্ণবচরণ ও গৌরীর কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুরের উপদেশ–নরলীলায় বিশ্বাস

এইরূপে ঠাকুর বৈষ্ণবচরণ এবং গৌরীর জীবনের নানা কথা আমাদিগের নিকট অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। আবার কখনও বা কোন বিষয়ের কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ে কি মতামত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলেন, সে বিষয়েরও উল্লেখ করিতেন। আমাদের মনে আছে, একদিন জনৈক ভক্ত সাধককে উপদেশ দিতে দিতে ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, "মানুষে ইষ্টবুদ্ধি ঠিক ঠিক হলে তবে ভগবানলাভ হয়। বৈষ্ণবচরণ বলত–নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হয়।"

কালী ও কৃষ্ণে অভেদ-বুদ্ধি-সম্বন্ধে গৌরী

কখনও বা কোন ভক্তের 'কালী' ও 'কৃষ্ণ'-এ বিশেষ ভেদবুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে বলিতেন, "ও কি হীন বুদ্ধি তোর? জানবি যে তোর ইষ্টই কালী, কৃষ্ণ, গৌর, সব হয়েছেন। তা বলে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বলছি, তা নয়। তবে দ্বেষবুদ্ধিটা ত্যাগ করবি। তোর ইষ্টই কৃষ্ণ হয়েছেন, গৌর হয়েছেন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখবি। দেখ্ না, গেরস্তের বৌ শ্বশুরবাড়ি গিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেওর, ভাসুর সকলকে যথাযোগ্য মান্য ভক্তি ও সেবা করে—কিন্তু মনের সকল কথা খুলে বলা, আর শোয়া কেবল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে যে, স্বামীর জন্যই শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি তার আপনার। সেই রকম নিজের ইষ্টকে ঐ স্বামীর মতন জানবি। আর তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হতেই তাঁর অন্য সকল রূপের সহিত সম্বন্ধ, তাঁদের সব শ্রদ্ধা ভক্তি করা—এইটে জানবি। ঐরূপ জেনে দ্বেষবুদ্ধিটা তাড়িয়ে দিবি। গৌরী বলত—'কালী আর গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে বুঝব যে ঠিক জ্ঞান হলো'।"

ভালবাসার পাত্রকে ভগবানের মূর্তি বলিয়া ভাবা সম্বন্ধে বৈষ্ণবচরণ

আবার কখনও বা ঠাকুর কোন ভক্তের মন সংসারে কাহারও প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় স্থির হইতেছে না দেখিয়া তাহাকে তাহার ভালবাসার পাত্রকেই ভগবানের মূর্তিজ্ঞানে সেবা করিতে ও ভালবাসিতে বলিতেন। লীলাপ্রসঙ্গে পূর্বে এক স্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, কেমন করিয়া ঠাকুর জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের মন তাঁহার অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অত্যন্ত আসক্ত দেখিয়া তাঁহাকে ঐ বালককেই গোপাল বা বালকৃষ্ণ-জ্ঞানে সেবা করিতে ও ভালবাসিতে বলিতেছেন এবং ঐরূপ অনুষ্ঠানের ফলে ঐ স্ত্রী-ভক্তের স্বল্পকালেই ভাবসমাধি-উদয়ের কথারও উল্লেখ করিয়াছি।[2] ভালবাসার পাত্রকে ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করার কথা বলিতে বলিতে কখনও কখনও ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের ঐ বিষয়ক মতের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "বৈষ্ণবচরণ বলত, যে যাকে ভালবাসে তাকে ইষ্ট বলে জানলে ভগবানে শীঘ্র মন যায়।" বলিয়াই আবার বুঝাইয়া দিতেন, "সে ঐ কথা তাদের সম্প্রদায়ের মেয়েদের করতে বলত, তজ্জন্য দূষ্য হতো না—তাদের সব পরকীয়া নায়িকার ভাব কি না! পরকীয়া নায়িকার উপপতির উপর মনের যেমন টান, সেই টানটা ঈশ্বরে আরোপ করতেই তারা চাইত।" ওটা কিন্তু সাধারণে শিক্ষা দিবার যে কথা নহে, তাহাও ঠাকুর বলিতেন। বলিতেন, তাতে ব্যভিচার বাড়বে। তবে নিজের পতি পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয়কে ঈশ্বরের মূর্তি-জ্ঞানে সেবা করিতে, ভালবাসিতে ঠাকুরের অমত ছিল না এবং তাঁহার পদাশ্রিত অনেক ভক্তকে যে তিনি ঐরূপ করিতে শিক্ষাও দিতেন, তাহা আমাদের জানা আছে।

ঐ উপদেশ শাস্ত্রসম্মত—উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ

ভাবিয়া দেখিলে বাস্তবিক উহা যে অশাস্ত্রীয় নবীন মত নহে তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদ্‌কার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে[3] শিক্ষা দিতেছেন—পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয়। স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রাহ্মণের ভিতর, ক্ষত্রিয়ের ভিতর, ধনের ভিতর, পৃথিবীর যে সমস্ত বস্তু অন্তরে প্রিয়বুদ্ধির উদয় করিয়া মানবমন আকর্ষণ করে, সে সমস্তের ভিতরেই প্রিয়স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, ঐশ্বরিক অংশের বিদ্যমানতা দেখিয়া ভালবাসিবার উপদেশ ভারতের উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বহু প্রাচীন যুগ হইতেই আমাদের শিক্ষা দিতেছেন। দেবর্ষি নারদাদি ভক্তিসূত্রের আচার্যগণও জীবকে ঈশ্বরের দিকে কামক্রোধাদি রিপুসকলের বেগ ফিরাইয়া দিতে বলিয়া এবং সখ্য-বাৎসল্য-মধুররসাদি আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবার উপদেশ করিয়া উপনিষদ্‌কার ঋষিদিগেরই যে পদানুসরণ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব ঠাকুরের ঐ বিষয়ক মত যে শাস্ত্রানুগত, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

অবতারপুরুষেরা সর্বদা শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করেন; সকল ধর্মমতকে সম্মান করা সম্বন্ধে ঠাকুরের শিক্ষা

ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষেরা পূর্ব পূর্ব শাস্ত্রসকলের মর্যাদা সম্যক রক্ষা করিয়া তাঁহাদের প্রবর্তিত বিধানের অবিরোধী কোন নূতন পথের সংবাদই যে ধর্মজগতে আনিয়া দেন, এ কথা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। যে-কোন অবতার-পুরুষের জীবনালোচনা করিলেই উহা বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও যে ঐ বিষয়ের অক্ষুণ্ণ পরিচয় আমরা সর্বদা সকল বিষয়ে পাইয়াছি, এ কথাই আমরা পাঠককে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ বুঝাইতে প্রয়াসী। যদি না পারি, তবে পাঠক যেন বুঝেন উহা আমাদের একদেশী বুদ্ধির দোষেই হইতেছে—যে ঠাকুর 'যত মত তত পথ'-রূপ অদৃষ্টপূর্ব সত্য আধ্যাত্মিক জগতে প্রথম প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার ত্রুটি বা দোষে নহে। পাশ্চাত্য নীতি—যাহার প্রয়োগ সুচতুর দুনিয়াদার পাশ্চাত্য কেবল অপর ব্যক্তি ও জাতির কার্যাকার্য-বিচারণের সময়েই বিশেষভাবে করিয়া থাকেন, নিজের কার্যকলাপ বিচার করিতে যাইয়া প্রায়ই পাল্টাইয়া দেন, সেই পাশ্চাত্য নীতির অনুসরণ করিয়া আমরা যাহাকে 'জঘন্য কর্তাভজাদি মত' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করি, ঐ কর্তাভজাদি মত হইতে শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তমত পর্যন্ত সকল মতই এ দেবমানব ঠাকুরের নিকট সসম্মানে ঈশ্বরলাভের পথ বলিয়া স্থানপ্রাপ্ত হইত এবং অধিকারী-বিশেষে অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দিষ্টও হইত। আমরা অনেকে দ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ঠাকুরকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছি—'মহাশয়, অত বড় উচ্চদরের সাধিকা ব্রাহ্মণী পঞ্চ-মকার লইয়া সাধন করিতেন, এটা কিরূপ? অথবা অত বড় উচ্চদরের ভক্ত সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ পরকীয়া-গ্রহণে বিরত হন নাই—এ তো বড় খারাপ?'

ঠাকুরও তাহাতে বারংবার আমাদের বলিয়াছেন, "ওতে ওদের দোষ নেই রে! ওরা ষোল আনা মন দিয়ে বিশ্বাস করত, ঐটেই ঈশ্বরলাভের পথ। ঈশ্বরলাভ হবে বলে যে যেটা সরলভাবে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করে অনুষ্ঠান করে, সেটাকে খারাপ বলতে নেই, নিন্দা করতে নেই। কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। কেন-না যে-কোন একটা ভাব ঠিক ঠিক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়। যে যার ভাব ধরে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডেকে যা। আর, কারো ভাবের নিন্দা করিসনি, বা অপরের ভাবটা নিজের বলে ধরতে যাসনি।" এই বলিয়াই সদানন্দময় ঠাকুর অনেক সময় গাহিতেন –

আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কারু ঘরে।

যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥

পরম ধন সে পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,

(ও মন) কত মণি পড়ে আছে, সে চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥

তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ, মন উচাটন হয়ো না রে,

(তুমি) আনন্দে ত্রিবেণী-স্নানে শীতল হও না মূলাধারে॥

কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,

(তুমি) বাজিকরে চিনলে নাকো, যে এই ঘটের ভিতর বিরাজ করে॥

[1] পূর্বার্ধ, প্রথম অধ্যায় দেখ।
[2] পূর্বার্ধ, প্রথম অধ্যায়।
[3] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ – ৫ম ব্রাহ্মণ।

৪.৩. দ্বিতীয় অধ্যায়:
গুরুভাব ও নানা সাধু সম্প্রদায়

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

– গীতা, ১০।৮

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

– গীতা, ১০।১১

ঠাকুরের সাধুদের সহিত মিলন কিরূপে হয়

ঠাকুর এক সময়ে আমাদের বলিয়াছিলেন, "কেশব সেনের আসবার পর থেকে তোদের মতো 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর (Young Bengal) দলই সব এখানে (আমার নিকটে) আসতে শুরু করেছে। আগে আগে এখানে কত যে সাধু-সন্ত, ত্যাগী-সন্ন্যাসী, বৈরাগী বাবাজী সব আসত যেত, তা তোরা কি জানবি? রেল হবার পর থেকে তারা সব আর এদিকে আসে না। নইলে রেল হবার আগে যত সাধুরা সব গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটা পথ ধরে সাগরে চান (স্নান) করতে ও ৺জগন্নাথ দেখতে আসত। রাসমণির বাগানে ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে অন্ততঃ দু-চার দিন থাকা, বিশ্রাম করা, তারা সকলে করতই করত। কেউ কেউ আবার কিছুকাল থেকেই যেত। কেন জানিস? সাধুরা 'দিশা-জঙ্গল' ও 'অন্ন-পানি'র সুবিধা না দেখে কোথাও আড্ডা করে না। 'দিশা-জঙ্গল' কি না—শৌচাদির জন্য সুবিধাজনক নিরেলা জায়গা। আর, 'অন্ন-পানি' কি না—ভিক্ষা। ভিক্ষান্নেই তো সাধুদের শরীর ধারণ—সেজন্য যেখানে সহজে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তারই নিকটে সাধুরা 'আসন' অর্থাৎ থাকিবার স্থান ঠিক করে।"

সাধুদের জল ও 'দিশা-জঙ্গলের' সুবিধা দেখিয়া বিশ্রাম করা

"আবার চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ভিক্ষার কষ্ট সহ্য করেও বরং সাধুরা কোন স্থানে দু-এক দিনের জন্য আড্ডা করে থাকে, কিন্তু যেখানে জলের কষ্ট এবং 'দিশা-জঙ্গল'-এর কষ্ট বা শৌচাদি যাবার 'ফারাকৎ' (নির্জন) স্থান নেই, সেখানে কখনো থাকে না। ভাল ভাল সাধুরা ওসব (শৌচাদি) কাজ যেখানে সকলে করে, যেখানে লোকের নজরে পড়তে হবে সেখানে করে না। অনেক দূরে নিরেলা জায়গায় (নিরালায়) গোপনে সেরে আসে। সাধুদের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম -''

ঐ সম্বন্ধে গল্প

"একজন লোক ভাল ত্যাগী সাধু দেখবে বলে সন্ধান করে ফিরছিল। তাকে একজন বলে দিলে যে, যে সাধুকে লোকালয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে শৌচাদি সারতে দেখবে, তাকেই জানবে ঠিক ঠিক ত্যাগী। সে ঐ কথাটি মনে রেখে লোকালয়ের বাহিরে সন্ধান করতে করতে একদিন একজন সাধুকে অপর সকলের চেয়ে অনেক অধিক দূরে গিয়ে ঐ সব কাজ সারতে দেখতে পেলে ও তার পেছনে পেছনে গিয়ে সে কেমন লোক তাই জানতে চেষ্টা করতে লাগল। এখন, সে দেশের রাজার মেয়ে শুনেছিল যে ঠিক ঠিক যোগী পুরুষকে বিয়ে করতে পারলে সুপুত্তুর লাভ হয়; কারণ শাস্ত্রে আছে—যোগী পুরুষদের ঔরসেই সাধু পুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন। রাজার মেয়ে তাই সাধুরা যেখানে আড্ডা করেছিল, সেখানে মনের মতো পতি খুঁজতে এসে ঐ সাধুটিকেই পছন্দ করে বাড়ি ফিরে গিয়ে তার বাপকে বললে যে, সে ঐ সাধুকে বিবাহ করবে। রাজা মেয়েটিকে বড় ভালবাসত। মেয়ে জেদ করে ধরেছে, কাজেই রাজা সেই সাধুর কাছে এসে 'অর্ধেক রাজত্ব দেব' ইত্যাদি বলে অনেক করে বুঝালে যাতে সাধু রাজকন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু সাধু রাজার সে সব কথায় কিছুতেই ভুলল না। কাকেও কিছু না বলে রাতারাতি সে স্থান ছেড়ে

পালিয়ে গেল। আগে যার কথা বলেছি, সেই লোকটি সাধুর ঐরূপ অদ্‌ভুত ত্যাগ দেখে বুঝলে যে বাস্তবিকই সে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দর্শন পেয়েছে ও তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর মুখে উপদেশ পেয়ে তাঁর কৃপায় ঈশ্বর-ভক্তি লাভ করে কৃতার্থ হলো।"

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে 'দিশা-জঙ্গল' ও ভিক্ষার বিশেষ সুবিধা বলিয়া সাধুদের তথায় আসা

"রাসমণির বাগানে ভিক্ষার সুবিধা, মা গঙ্গার কৃপায় জলেরও অভাব নেই। আবার নিকটেই মনের মতো 'দিশা-জঙ্গল' যাবার স্থান—কাজেই সাধুরা তখন এখানেই ডেরা করত। আবার, কথা মুখে হাঁটে—এ সাধু ওকে বললে, সে আর একজন এদিকে আসছে জেনে তাকে বললে—এইরূপে রাসমণির বাগানে যে সাগর ও জগন্নাথ দেখতে যাবার পথে একটি ডেরা করবার বেশ জায়গা, এ কথাটা সকল সাধুদের ভেতরেই তখন চাউর হয়ে গিয়েছিল।"

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাধুসম্প্রদায়ের আগমন

ঠাকুর আরও বলিতেন, "এক এক সময়ে এক এক রকমের সাধুর ভিড় লেগে যেত। এক সময়ে সন্ন্যাসী পরমহংসই যত আসতে লাগল! পেট-বৈরাগীর দল নয়—সব ভাল ভাল লোক। (নিজের ঘর দেখাইয়া) ঘরে দিনরাত্তির তাদের ভিড় লেগেই থাকত। আর দিবারাত্তির ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ, অস্তি ভাতি প্রিয়—এই সব বেদান্তের কথাই চলত।"

পরমহংসদেবের বেদান্তবিচার—'অস্তি, ভাতি, প্রিয়'

অস্তি, ভাতি, প্রিয়—ঠাকুর ঐ কথা কয়টি বলিয়াই আবার বুঝাইয়া দিতেন। বলিতেন, "সেটা কি জানিস?—ব্রহ্মের স্বরূপ; বেদান্তে ঐ ভাবে বোঝানো আছে, যিনিই 'অস্তি' কি না—ঠিক ঠিক বিদ্যমান আছেন, তিনিই 'ভাতি' কি না—প্রকাশ পাচ্ছেন। এখন, 'প্রকাশটা' হচ্চে জ্ঞানের স্বভাব। যে জিনিসটার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়েছে সেটাই আমাদের কাছে প্রকাশিত রয়েছে। যেটার জ্ঞান নেই সে জিনিসটা আমাদের কাছে অপ্রকাশ রয়েছে। কেমন, না? তাই বেদান্ত বলে, যে জিনিসটার যখনই আমাদের অস্তিত্ব-বোধ হলো, তখনি অমনি সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটা আমাদের কাছে দীপ্তিমান বা প্রকাশিত বলে বোধ হলো—অর্থাৎ তার জ্ঞান-স্বরূপের কথাটা আমাদের বোধ হলো। আর অমনি সেটা আমাদের প্রিয় বলে বোধ হলো—অর্থাৎ তার ভেতরের আনন্দ-স্বরূপ আমাদের মনে প্রিয় বুদ্ধির উদয় করে সেটাকে ভালবাসতে আমাদের আকর্ষণ করলে। এইরূপে যেখানেই আমাদের অস্তিত্ব-জ্ঞান হচ্চে, সেখানেই আবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপের জ্ঞান হচ্চে। সেজন্য, যেটা 'অস্তি', সেটাই 'ভাতি' ও 'প্রিয়'—যেটা 'ভাতি', সেটাই 'অস্তি' ও 'প্রিয়' এবং যেটা 'প্রিয়' সেটাই 'অস্তি' ও 'ভাতি' বলে বোধ হচ্চে। কারণ, যে ব্রহ্মবস্তু হতে এই জগৎ ও জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির উদয় হয়েছে, তাঁর স্বরূপই হচ্চে 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' বা সৎ-চিৎ-আনন্দ। সেজন্যই উত্তর গীতায় বলেছে—জ্ঞান হলে বোঝা যায়, যেখানে বা যে বস্তু বা ব্যক্তিতে তোমার মনকে টানছে, সেখানে বা সেই সেই বস্তু ও ব্যক্তির ভিতর পরমাত্মা রয়েছেন। 'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্।' রূপ-রসেও তাঁর অংশ রয়েছে বলে লোকের মন সেদিকে ছোটে, এ কথা বেদেও আছে।

"ঐ সব কথা নিয়ে তাদের ভেতর ধুম তর্কবিচার লেগে যেত। (আমার) আবার তখন খুব পেটের অসুখ, আমাশয়। হাতের জল শুকাত না! ঘরের কোণে হৃদু সরা পেতে রাখত। সেই পেটের অসুখে ভুগচি, আর তাদের ঐ সব জ্ঞান বিচার শুনচি! আর, যে কথাটার তারা কোন মীমাংসা করে উঠতে পারছে না, (নিজের শরীর দেখাইয়া) ভিতর থেকে তার এমন এক একটা সহজ কথায় মীমাংসা মা তুলে দেখিয়ে দিচ্চে—সেইটে তাদের বলচি, আর তাদের সব ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাচ্চে!"

জনৈক সাধুর আনন্দ-স্বরূপ উপলব্ধি করায় উচ্চাবস্থার কথা

"একবার এক সাধু এল, তার মুখখানিতে বেশ একটি সুন্দর জ্যোতিঃ রয়েছে। সে কেবল বসে থাকে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে! সকাল সন্ধ্যা একবার করে ঘরের বাইরে এসে সে গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা সব

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত ও আনন্দে বিভোর হয়ে দু-হাত তুলে নাচত; কখনও বা হেসে গড়াগড়ি দিত, আর বলত 'বাঃ বাঃ ক্যায়া মায়া—ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া।' অর্থাৎ, ঈশ্বর কি সুন্দর মায়া বিস্তার করেছেন। তার ঐ ছিল উপাসনা। তার আনন্দলাভ হয়েছিল।"

ঠাকুরের জ্ঞানোন্মাদ সাধু-দর্শন

"আর একবার এক সাধু আসে—সে জ্ঞানোন্মাদ! দেখতে যেন পিশাচের মতো—উলঙ্গ, গায়ে মাথায় ধুলো, বড় বড় নখ চুল, গায়ে মরার কাঁথার মতো একখানা কাঁথা! কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে করতে এমন স্তব পড়লে, যেন মন্দিরটা সুদ্ধ কাঁপতে লাগল; আর মা যেন প্রসন্না হয়ে হাসতে লাগলেন। তারপর কাঙালীরা যেখানে বসে প্রসাদ পায় সেখানে তাদের সঙ্গে প্রসাদ পাবে বলে বসতে গেল। কিন্তু তার ঐ রকম চেহারা দেখে তারাও তাকে কাছে বসতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। তারপর দেখি, প্রসাদ পেয়ে সকলে যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে, সেখানে বসে কুকুরদের সঙ্গে এঁটো ভাতগুলো খাচ্চে! একটা কুকুরের ঘাড়ে হাত দিয়ে রয়েছে, আর একই পাতে ঐ কুকুরটাও খাচ্চে, আর সেও খাচ্চে! অচেনা লোকে ঘাড় ধরেছে, তাতে কুকুরটা কিছু বলছে না বা পালাতে চেষ্টা করচে না! তাকে দেখে মনে ভয় হলো যে, শেষে আমারও ঐরূপ অবস্থা হয়ে ঐ রকম থাকতে বেড়াতে হবে নাকি!"

ব্রহ্মজ্ঞানে গঙ্গার জল ও নর্দমার জল এক বোধ হয়; পরমহংসদের বালক, পিশাচ বা উন্মাদের মত অপরে দেখে

"দেখে এসেই হৃদুকে বললুম, 'হৃদু, এ যে-সে উন্মাদ নয়—জ্ঞানোন্মাদ।' ঐ কথা শুনে হৃদু তাকে দেখতে ছুটল। গিয়ে দেখে, তখন সে বাগানের বাইরে চলে যাচ্ছে। হৃদু অনেক দূর তার সঙ্গে সঙ্গে চলল, আর বলতে লাগল, 'মহারাজ! ভগবানকে কেমন করে পাব, কিছু উপদেশ দিন।' প্রথম কিছুই বললে না। তারপর যখন হৃদে কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল, তখন পথের ধারের নর্দমার জল দেখিয়ে বললে—'এই নর্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখন পাবি'। এই পর্যন্ত—আর কিছুই বললে না। হৃদে আরও কিছু শোনবার ঢের চেষ্টা করলে, বললে, 'মহারাজ! আমাকে চেলা করে সঙ্গে নিন।' তাতে কোন কথাই বললে না। তারপর অনেক দূর গিয়ে একবার ফিরে দেখলে হৃদু তখনও সঙ্গে সঙ্গে আসচে। দেখেই চোখ রাঙিয়ে ইট তুলে হৃদেকে মারতে তাড়া করলে। হৃদে যেমন পালাল অমনি ইট ফেলে সে পথ ছেড়ে কোন্ দিকে যে সরে পড়ল, হৃদে তাকে আর দেখতে পেলে না। অমন সব সাধু, লোকে বিরক্ত করবে বলে ঐ রকম বেশে থাকে। ঐ সাধুটির ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছিল। শাস্ত্রে আছে, ঠিক ঠিক পরমহংসেরা বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ হয়ে সংসারে থাকে। সেজন্য পরমহংসেরা ছোট ছোট ছেলেদের আপনাদের কাছে রেখে তাদের মতো হতে শেখে। ছেলেদের যেমন সংসারের কোন জিনিসটার আঁট নেই, সকল বিষয়ে সেই রকম হবার চেষ্টা করে। দেখিসনি, বালককে হয়তো একখানি নূতন কাপড় মা পরিয়ে দিয়েছে, তাতে কতই আনন্দ! যদি বলিস, 'কাপড়খানি আমায় দিবি?' সে অমনি বলে উঠবে, 'না, দেব না, মা আমায় দিয়েচে।' বলেই আবার হয়তো কাপড়ের খোঁটটা জোর করে ধরবে, আর তোর দিকে দেখতে থাকবে—পাছে তুই সেখানি কেড়ে নিস! কাপড়খানাতেই তখন যেন তার প্রাণটা সব পড়ে আছে! তার পরেই হয়তো তোর হাতে একটা সিকি-পয়সার খেলনা দেখে বলবে, 'ঐটে দে, আমি তোকে কাপড়খানা দিচ্ছি।' আবার কিছু পরেই হয়তো সে খেলনাটা ফেলে একটা ফুল নিতে ছুটবে। তার কাপড়েও যেমন আঁট, খেলনাটায়ও সেই রকম আঁট। ঠিক ঠিক জ্ঞানীদেরও ঐ রকম হয়।"

রামাইত বাবাজীদের দক্ষিণেশ্বরে আগমন

"এই রকম করে কতদিন গেল। তারপর তাদের (সন্ন্যাসী পরমহংসশ্রেণীর) যাওয়া-আসাটা কমে গেল। তারা গিয়ে, আসতে লাগল যত রামাইৎ বাবাজী—ভাল ভাল ত্যাগী ভক্ত বৈরাগী বাবাজী। দলে দলে আসতে লাগল। আহা, তাদের সব কি ভক্তি, বিশ্বাস! কি সেবায় নিষ্ঠা! তাদের একজনের কাছ (নিকট) থেকেই তো 'রামলালা'[1] আমার কাছে থেকে গেল। সে সব ঢের কথা।"

রামলালা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

"সে বাবাজী ঐ ঠাকুরটির চিরকাল সেবা করত। যেখানে যেত, সঙ্গে করে নিয়ে যেত। যা ভিক্ষা পেত রেঁধে-বেড়ে তাকে (রামলালাকে) ভোগ দিত। শুধু তাই নয়—সে দেখতে পেত রামলালা সত্য সত্যই খাচ্ছে বা কোন একটা জিনিস খেতে চাচ্চে, বেড়াতে যেতে চাচ্চে, আবদার করচে, ইত্যাদি! আর ঐ ঠাকুরটি নিয়েই সে আনন্দে বিভোর, 'মত্ত' হয়ে থাকত! আমিও দেখতে পেতুম, রামলালা ঐ রকম সব কচ্চে! আর রোজ সেই বাবাজীর কাছে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতুম—আর রামলালাকে দেখতুম!

"দিনের পর দিন যত যেতে লাগল, রামলালারও তত আমার উপর পিরীত বাড়তে লাগল। (আমি) যতক্ষণ বাবাজীর (সাধুর) কাছে থাকি ততক্ষণ সেখানে সে বেশ থাকে—খেলা-ধুলো করে; আর (আমি) যেই সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে আসি, তখন সেও (আমার) সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে! আমি বারণ করলেও সাধুর কাছে থাকে না! প্রথম প্রথম ভাবতুম, বুঝি মাথার খেয়ালে ঐ রকমটা দেখি। নইলে তার (সাধুর) চিরকেলে পুজোকরা ঠাকুর, ঠাকুরটিকে সে কত ভালবেসে—ভক্তি করে সন্তর্পণে সেবা করে, সে ঠাকুর তার (সাধুর) চেয়ে আমায় ভালবাসবে—এটা কি হতে পারে? কিন্তু ও রকম ভাবলে কি হবে?—দেখতুম, সত্য সত্য দেখতুম—এই যেমন তোদের সব দেখছি, এই রকম দেখতুম—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখনো আগে কখনো পেছনে নাচতে নাচতে আসছে। কখনো বা কোলে ওঠবার জন্য আবদার কচ্চে। আবার হয়তো কখনো বা কোলে করে রয়েছি—কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়বে! যত বারণ করি, 'ওরে, অমন করিসনি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে! ওরে, অত জল ঘাঁটিসনি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে'—সে কি তা শোনে? যেন কে কাকে বলছে! হয়তো সেই পদ্ম-পলাশের মতো সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল, আর আরও দুরন্তপনা করতে লাগল বা ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গি করে ভ্যাঙ্চাতে লাগল! তখন সত্য সত্যই রেগে বলতুম, 'তবে রে পাজি, রোস্—আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব!'—বলে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি; আর এ জিনিসটা ও জিনিসটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের ভেতর খেলতে বলি। আবার কখনো বা কিছুতেই দুষ্টামি থামছে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতাম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে সজলনয়নে আমার দিকে দেখত! তখন আবার মনে কষ্ট হতো; কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভুলাতুম! এ রকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম, করতুম!

"একদিন নাইতে যাচ্চি, বায়না ধরলে সেও যাবে! কি করি, নিয়ে গেলুম। তারপর জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না, যত বলি কিছুতেই শোনে না। শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বললুম—তবে নে কত জল ঘাঁটতে চাস ঘাঁট; আর সত্য সত্য দেখলুম সে জলের ভিতর হাঁপিয়ে শিউরে উঠল! তখন আবার তার কষ্ট দেখে, কি করলুম বলে কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি!

"আর একদিন তার জন্য মনে যে কষ্ট হয়েছিল, কত যে কেঁদেছিলুম তা বলবার নয়। সেদিন রামলালা বায়না করচে দেখে ভোলাবার জন্য চারটি ধানসুদ্ধ খই খেতে দিয়েছিলুম। তারপর দেখি, ঐ খই খেতে খেতে ধানের তুষ লেগে তার নরম জিব চিরে গেছে! তখন মনে যে কষ্ট হলো; তাকে কোলে করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলুম আর মুখখানি ধরে বলতে লাগলুম—'যে মুখে মা কৌশল্যা, লাগবে বলে ক্ষীর, সর, ননীও অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন, আমি এমন হতভাগা যে, সেই মুখে এই কদর্য খাবার দিতে মনে একটুও সঙ্কোচ হলো না'!"—কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুরের আবার পূর্বশোক উথলিয়া উঠিল এবং তিনি আমাদের সম্মুখে অধীর হইয়া এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, রামলালার সহিত তাঁহার প্রেম-সম্বন্ধের কথার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝিতে না পারিলেও আমাদের চক্ষে জল আসিল।

ঠাকুরের মুখে রামলালার কথা শুনিয়া আমাদের কি মনে হয়

মায়াবদ্ধ জীব আমরা রামলালার ঐ সব কথা শুনিয়া অবাক। ভয়ে ভয়ে (রামলালা) ঠাকুরটির দিকে তাকাইয়া দেখি, যদি কিছু দেখিতে পাই। ওমা, কিছুই না! আর পাবই বা কেন? রামলালার উপর সে ভালবাসার টান তো আর আমাদের নাই। ঠাকুরের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ভাবটি ভিতরে ঘনীভূত হইয়া

আমাদের সে ভাবচক্ষু তো খুলে নাই যে বাহিরেও রামলালাকে জীবন্ত দেখিব। আমরা একটি ছোট পুতুলই দেখি, আর ভাবি, ঠাকুর যা বলিতেছেন তা কি হইতে পারে বা হওয়া সম্ভব? সংসারে সকল বিষয়েই তো আমাদের ঐরূপ হইতেছে, আর অবিশ্বাসের ঝুড়ি লইয়া বসিয়া আছি! দেখ না—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বলিলেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', জগতে এক সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর কিছুই নাই; তোরা যে নানা জিনিস নানা ব্যক্তি সব দেখিতেছিস, তার একটা কিছুও বাস্তবিক নাই। আমরা ভাবিলাম, 'হবেও বা'। সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মবস্তুর নামগন্ধও খুঁজিয়া পাইলাম না; দেখিতে পাইলাম, কেবল কাঠ মাটি, ঘর দ্বার, মানুষ, গরু, নানা রঙের জিনিস। না হয় বড় জোর দেখিলাম, নীল সুনীল তারকামণ্ডিত অনন্ত আকাশ, শুভ্রকিরীটি হরিৎ-শ্যামলাঙ্গ ভূধর তাহাকে স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে; আর কলনাদিনী স্রোতস্বতীকুল 'অত স্পর্ধা ভাল নয়' বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে নিম্নগা হইয়া তাহাকে দীনতা শিক্ষা দিতেছে! অথবা দেখিলাম, বাত্যাহত অনন্ত জলধি বিশাল বিক্রমে সর্বগ্রাস করিতে যেন ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও বেলাতিক্রম করিতে পারিতেছে না। আর ভাবিলাম, ঋষিরা কি কোনরূপ নেশা ভাঙ করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন? ঋষিরা যদি বলিলেন, 'না হে বাপু, কায়মনোবাক্যে সংযম ও পবিত্রতার অভ্যাস করিয়া একচিত্ত হও, চিত্তকে স্থির কর, তাহা হইলেই আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা বুঝিতে—দেখিতে পাইবে। দেখিবে, জগৎটা তোমারই ভিতরের ভাবের ঘনীভূত প্রকাশ; দেখিবে তোমার ভিতরে 'নানা' রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরেও 'নানা' দেখিতেছ।' আমরা বলিলাম, 'ঠাকুর, পেটের দায়ে ইন্দ্রিয়তাড়নায় অস্থির, আমাদের অত অবসর কোথায়?' অথবা বলিলাম, 'ঠাকুর, তোমার ব্রহ্মবস্তু দেখিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া ফর্দ বাহির করিলে, তাহা করা তো দুই-চারি দিন বা মাস বা বৎসরের কাজ নয়—মানুষে এক জীবনে করিয়া উঠিতে পারে কি না সন্দেহ। তোমাদের কথা শুনিয়া ঐ বিষয়ে লাগিয়া তারপর যদি ব্রহ্মবস্তু না দেখিতে পাই, অনন্ত আনন্দলাভটা সব ফাঁকি বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই তো আমার এ কুলও গেল, ও কুলও গেল—না পৃথিবীর, ক্ষণস্থায়ীই হউক আর যাহাই হউক, সুখগুলো ভোগ করিতে পাইলাম, না তোমার অনন্ত সুখটাই পাইলাম—তখন কি হইবে? না, ঠাকুর! তুমি অনন্ত সুখের আস্বাদ পাইয়া থাক, ভাল—তুমিই উহা শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে সুখে ভোগদখল কর; আমরা রূপরসাদি হইতে হাতে হাতে যে সুখটুকু পাইতেছি, আমাদের তাহাই ভোগ করিতে দাও; নানা তর্ক-যুক্তি, ফন্দি-ফারক্কা তুলিয়া আমাদের সে ভোগটুকু মাটি করিও না!'

বর্তমান কালের জড়বিজ্ঞান ভোগসুখবৃদ্ধির সহায়তা করে বলিয়া আমাদের উহাতে অনুরাগ

আবার দেখ, বিজ্ঞানবিদ্ আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে যন্ত্রসহায়ে দেখাইয়া দিতেছি—এক সর্বব্যাপী প্রাণপদার্থ ইট-কাঠ, সোনা-রূপা, গাছ-পালা, মানুষ-গরু সকলের ভিতরেই সমভাবে রহিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।' আমরা দেখিলাম, বাস্তবিকই সকলের ভিতরে প্রাণস্পন্দন পাওয়া যাইতেছে! বলিলাম—'বা! বা! তোমার বুদ্ধিখানার দৌড় খুব বটে। কিন্তু শুধু ঐ জ্ঞান লইয়া কি হইবে? ও কথা তো আমাদের শাস্ত্রকর্তা ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন বহুকাল পূর্বে।[2] তুমি না হয় উহা এখন দেখাইতেই পারিলে। উহার সহায়ে আমাদের রূপরসাদি-ভোগের কিছু বৃদ্ধি হইবে বলিতে পার? তাহা হইলে বুঝিতে পারি।' বিজ্ঞানবিদ্ বলিলেন—'হইবে না? নিশ্চিত হইবে। এই দেখ না, তড়িৎ-শক্তির পরিচয় পাইয়া তোমার দেশ-দেশান্তরের সংবাদ পাইবার কত সুবিধা হইয়াছে; বিস্ফোরক পদার্থের গূঢ় নিয়ম বুঝিয়া বন্দুক কামান করিয়া তোমার ভোগসুখলাভের অন্তরায় শত্রুকুলনাশের কত সুবিধা হইয়াছে। এইরূপে আজ আবার এই যে সর্বব্যাপী প্রাণশক্তির পরিচয় পাইলে তাহার দ্বারাও পরে ঐরূপ কিছু না কিছু সুবিধা হইবেই হইবে।' তখন আমরা বলিলাম, 'তা বটে; আচ্ছা, কিন্তু যত শীঘ্র পার ঐ নবাবিষ্কৃত শক্তিপ্রয়োগে যাহাতে আমাদের ভোগের বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়টায় লক্ষ্য রাখিয়া যাহা হয় কিছু একটা বাহির করিয়া ফেল; তাহা হইলেই বুঝিব, তুমি বাস্তবিক বুদ্ধিমান বটে; ঐ বেদ-পুরাণ-বক্তা ঋষিগুলোর মতো তুমি নেশা ভাঙ করিয়া কথা কহ না।' বিজ্ঞানবিদ্‌ও শুনিয়া আমাদের ধারা বুঝিয়া বলিলেন—'তথাস্তু'!

বৌদ্ধযুগের শেষে কাপালিকদের সকাম ধর্মপ্রচারের ফল। যোগ ও ভোগ একত্র থাকা অসম্ভব

ধর্মজগতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রচারক ঋষিরা ঐরূপে 'তথাস্তু' বলিতে পারিলেন না বলিয়াই তো যত গোল বাধিয়া গেল। আর তাঁহাদিগকে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে ঝোড়ে জঙ্গলে বাস করিয়া দুই-চারিটা সংসারবিরাগী লোককে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল! তবে ভারতে ধর্মজগতে ঐরূপ 'তথাস্তু' বলিবার চেষ্টা যে কোন কালে কখনও হয় নাই তাহা বোধ হয় না। বৌদ্ধযুগের শেষের কথাটা স্মরণ কর—যখন তান্ত্রিক কাপালিকেরা মারণ, উচাটন, বশীকরণাদির বিপুল প্রসার করিতেছেন, যখন শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিতে মানবের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উপশম ও আরোগ্যের এবং ভূত-প্রেত তাড়াইবার খুব ধুমধাম পড়িয়াছে, যখন তপস্যালব্ধ সিদ্ধাই-প্রভাবে অলৌকিক কিছু একটা না দেখাইতে পারিলে এবং শিষ্যবর্গের সাংসারিক ভোগসুখাদি নির্বিঘ্নে যাহাতে সম্পন্ন হয়, দৈবকে ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা তুমি যে ধারণ কর লোকের নিকট এরূপ ভান না করিতে পারিলে তুমি ধার্মিক বলিয়াই পরিচিত হইতে পারিতে না—সেই যুগের কথা স্মরণ কর। তখন ধর্মজগৎ একবার ভোগের কামনা পূর্ণ করিবার সহায়ক বলিয়া ধর্মনিহিত গূঢ় সত্যসকলকে সংসারী মানবের নিকট প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কিন্তু আলোক ও অন্ধকার একত্রে একই স্থানে এক সময়ে থাকিবে কিরূপে? ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই কাপালিক তান্ত্রিকদের যোগ ভুলিয়া ভোগভূমিতে অবরোহণ এবং ধর্মের নামে রূপরসাদি সুবিস্তৃত ভোগশৃঙ্খলের গুপ্ত প্রচার! তখন দেশের যথার্থ ধার্মিকেরা আবার বুঝিল যে, যোগ-ভোগ দুই পদার্থ পরস্পরবিরোধী—একত্র একাধারে কোনরূপেই থাকিতে পারে না এবং বুঝিয়া পুনরায় ঋষিকুল-প্রবর্তিত জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী হইয়া জীবনে তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

ঠাকুরের নিজের অদ্ভুত ত্যাগ এবং ত্যাগধর্মের প্রচার দেখিয়া সংসারী লোকের ভয়

আমাদেরও সংসারী মানবের মতে মত দিয়া ঐরূপে 'তথাস্তু' বলিবার সুযোগ কোথায়? আমরা যে এক জগৎছাড়া ঠাকুরের কথা বলিতে বসিয়াছি—যাঁহার মনে ত্যাগের ভাব এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, সুষুপ্তাবস্থায়ও হস্তে ধাতু স্পর্শ করিলে হস্ত সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট হইয়া যাইত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণের ভিতর বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইত!—যাঁহার মনে জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি বলিয়া জ্ঞান স্ত্রী-শরীর দেখিলেই উদয় হইত, নানা লোকে নানা চেষ্টা করিয়াও ঐ ভাব দূর করিতে পারে নাই!—সহস্র সহস্র মুদ্রার সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিল বলিয়া যাঁহার মনে এমন বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরম অনুগত মথুরকে যষ্টিহস্তে আরক্ত-নয়নে প্রহার করিতে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন এবং পরেও সে-সব কথা আমাদের নিকট কখনও কখনও বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া বলিতেন, 'মথুর ও লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী বিষয় লেখাপড়া করে দেবে শুনে মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিয়েছিল, এমন যন্ত্রণা হয়েছিল!'—যাঁহার মনে সংসারের রূপরসাদি কখনও আসক্তির কলঙ্ক-কালিমা আনয়ন করিয়া সমাধিভূমির অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভবের বিন্দুমাত্র বিচ্ছেদ জন্মাইতে পারে নাই—এ সৃষ্টিছাড়া ঠাকুরের কথা বলিতে যাইয়া আমাদের যে অনেক তিরস্কার-লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, হে ভোগলোলুপ সংসারী মানব, তাহা আমরা বহু পূর্ব হইতেই জানি। শুধু তাহাই নহে, পাছে তোমার দলবল, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-পৌত্রাদির ভিতর সরলমতি কেহ এ অলৌকিক চরিত্রের প্রতি আমাদের কথায় সত্য সত্যই আকৃষ্ট হইয়া ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সংসারের বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, তজ্জন্য তুমি এ দেবচরিত্রেও যে কলঙ্কার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না—তাহাও আমরা জানি। কিন্তু জানিলে কি হইবে? যখন এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আর আমাদের বিরত হইবার বা অন্ততঃ আংশিক গোপন করিয়া সত্য বলিবার সামর্থ্য নাই। যতদূর জানি, সমস্ত কথাই বলিয়া যাইতে হইবে। নতুবা শান্তি নাই। কে যেন জোর করিয়া বলাইতেছে যে! অতএব আমরা এ অদৃষ্টপূর্ব দেবমানবের কথা যতদূর জানি বলিয়া যাই, আর তুমি এই সকল কথা যতটা ইচ্ছা 'ন্যাজামুড়ো বাদ দিয়া' নিজের যতটা 'রয় সয়' ততটা লইও, বা ইচ্ছা হইলে 'কতকগুলো গাঁজাখুরি কথা লিখিয়াছে' বলিয়া পুস্তকখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিত্য নূতন ফুলে 'বিষয়-মধু' পান করিতে ছুটিও। পরে, সংসারে বিষম ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যদি কখনও 'বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো, কামাদি-কুসুমসকলে'—এমন অবস্থা তোমার ভাগ্যদোষে (বা গুণে?) আসিয়া পড়ে, তখন এ অলৌকিক পুরুষের লীলাপ্রসঙ্গ পড়িও—নিজেও শান্তি পাইবে এবং আমাদের ঠাকুরেরও 'কদর' বুঝিবে।

রামলালার ঠাকুরের নিকট থাকিয়া যাওয়া কিরূপে হয়

'রামলালা'র ঐরূপ অদ্‌ভুত আচরণের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বলিতেন—"এক এক দিন রেঁধেবেড়ে ভোগ দিতে বসে বাবাজী (সাধু) রামলালাকে দেখতেই পেত না। তখন মনে ব্যথা পেয়ে এখানে (ঠাকুরের ঘরে) ছুটে আসত; এসে দেখত রামলালা ঘরে খেলা করচে! তখন অভিমানে তাকে কত কি বলত! বলত, 'আমি এত করে রেঁধেবেড়ে তোকে খাওয়াব বলে খুঁজে বেড়াচ্চি, আর তুই কি না এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে রয়েছিস! তোর ধারাই ঐরূপ, যা ইচ্ছা তাই করবি; মায়া দয়া কিছুই নেই! বাপ-মাকে ছেড়ে বনে গেলি, বাপটা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, তবুও ফিরলি না—তাকে দেখা দিলি না!'—এইরকম সব কত কি বলে রামলালাকে টেনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত! এই রকমে দিন যেতে লাগল। সাধু এখানে অনেক দিন ছিল—কারণ রামলালা এখান (আমাকে) ছেড়ে যেতে চায় না—আর সেও চিরকালের আদরের রামলালাকে ফেলে যেতে পারে না!

"তারপর একদিন বাবাজী হঠাৎ এসে সজলনয়নে বললে, 'রামলালা আমাকে কৃপা করে প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে যেমন ভাবে দেখতে চাইতাম তেমনি করে দর্শন দিয়েছে ও বলেছে, এখান থেকে যাবে না; তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না! আমার এখন আর মনে দুঃখকষ্ট নাই! তোমার কাছে ও সুখে থাকে, আনন্দে খেলাধুলো করে, তাই দেখেই আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই। এখন আমার এমনটা হয়েছে যে ওর যাতে সুখ, তাতেই আমার সুখ! সেজন্য আমি এখন একে তোমার কাছে রেখে অন্যত্র যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে।'—এই বলে রামলালাকে আমায় দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলে। সেই অবধি রামলালা এখানে রয়েছে।"

ঠাকুরের দেবসঙ্গে বাবাজীর স্বার্থশূন্য প্রেমানুভব

আমরা বুঝিলাম ঠাকুরের দেবসঙ্গেই বাবাজীর মন স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসার আস্বাদন পাইল এবং বুঝিতে পারিল যে ঐ প্রেমে প্রেমাস্পদের সহিত আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। বুঝিল যে, তাহার শুদ্ধ-প্রেমঘন উপাস্য তাহার নিকটেই সর্বদা রহিয়াছেন, যখনি ইচ্ছা তখনি তাঁহার দর্শন পাইবে! সাধু ঐ আশ্বাস পাইয়াই যে প্রাণের রামলালাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়।

জনৈক সাধুর রামনামে বিশ্বাস

ঠাকুর বলিতেন, "আবার এক সাধু এসেছিল, তার ঈশ্বরের নামেই একান্ত বিশ্বাস! সেও রামাৎ; তার সঙ্গে অন্য কিছুই নেই, কেবল একটি লোটা (ঘটি) ও একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থখানি তার বড়ই আদরের—ফুল দিয়ে নিত্য পূজা করত ও এক একবার খুলে দেখত। তার সঙ্গে আলাপ হবার পর একদিন অনেক করে বলে কয়ে বইখানি দেখতে চেয়ে নিলুম। খুলে দেখি তাতে কেবল লাল কালিতে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, 'ওঁ রামঃ!' সে বললে, 'মেলা গ্রন্থ পড়ে কি হবে? এক ভগবান থেকেই তো বেদ-পুরাণ সব বেরিয়েছে; আর তাঁর নাম এবং তিনি তো অভেদ; অতএব চার বেদ, আঠার পুরাণে, আর সব শাস্ত্রে যা আছে, তাঁর একটি নামেতে সে-সব রয়েছে! তাই তাঁর নাম নিয়েই আছি!' তার (সাধুর) নামে এমনি বিশ্বাস ছিল!"

রামাইত সাধুদের ভজন-সঙ্গীত ও দোঁহাবলী

এইরূপে কত সাধুর কথাই না ঠাকুর আমাদিগের নিকট বলিতেন; আবার কখনও কখনও ঐ সকল রামাইৎ বাবাজীদের নিকট যে সকল ভগবানের ভজন শিখিয়াছিলেন, তাহা গাহিয়া আমাদের শুনাইতেন। যথা –

(মেরা) রামকো না চিনা হ্যায়, দিল্, চিনা হ্যায় তুম্ ক্যারে;

আওর্ জানা হ্যায় তুম্ ক্যারে।

সন্‌ত্ ওহি যো, রাম-রস চাখে

আওর্ বিষয়-রস চাখা হ্যায় সো ক্যারে॥

পুত্র ওহি যো, কুলকো তারে

আওর্ যো সব পুত্র হ্যায় সো ক্যারে॥

অথবা –

সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাঈ।

ভজলে অযোধ্যানাথ, দুসরা ন কোঈ॥

হসন বোলন চতুর চাল, অয়ন বয়ান দৃগ্-বিশাল।

ভ্রূকুটি কুটিল তিলক ভাল, নাসিকা শোভাঈ॥

কেশরকো তিলক ভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল।

শ্রবণ-কুণ্ডল-ঝলমলাত, রতিপতি-ছবি-ছাঈ॥

মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল।

মানো গিরি শিখর ফোড়ি, সুরসরি বহিরাঈ॥

বিহরে রঘুবংশবীর, সখা সহিত সরযূতীর।

তুলসীদাস হরষ নিরখি, চরণরজ পাঈ॥

অথবা গাহিতেন –

'রাম ভজা সেই জিয়ারে জগমে,

রাম ভজা সেই জিয়ারে॥'

অথবা –

'মেরা রাম বিনা কোহি নাহিরে তারণ-ওয়ালা!'

– এই মধুর গীত দুইটির অপর চরণসকল আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

কখনও বা আবার ঠাকুর ঐ সকল সাধুদিগের নিকট যে-সকল দোঁহা শিখিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের শুনাইতেন। বলিতেন, "সাধুরা চুরি, নারী ও মিথ্যা এই তিনের হাত থেকে সর্বদা আপনাকে বাঁচাতে উপদেশ করে।" বলিয়াই আবার বলিতেন, "এই তুলসীদাসের দোঁহায় সব কি বলছে শোন্ –

সত্যবচন অধীনতা পরধন-উদাস।

ইস্‌সে না হরি মিলে তো জামিন্ তুলসীদাস॥

সত্যবচন অধীনতা পরস্ত্রী মাতৃ সমান।

ইস্‌সে না হরি মিলে, তুলসী ঝুট্ জবান্॥"

"অধীনতা কি জানিস—দীনভাব। ঠিক ঠিক দীনভাব এলে অহঙ্কারের নাশ হয় ও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কবীরদাসের গানেও ঐ কথা আছে –

সেবা বন্দি আওর্ অধীনতা, সহজ মিলি রঘুরাঈ।

হরিষে লাগি রহোরে ভাই॥" ইত্যাদি।

ঠাকুরের সকল সম্প্রদায়ের সাধকদিগকে সাধনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিবার ইচ্ছা ও রাজকুমারের (অচলানন্দের) কথা

আবার একদিন ঠাকুর বলিলেন, "এক সময়ে এমনটা মনে হলো যে, সকল রকমের সাধকদের যা কিছু জিনিস সাধনার জন্য দরকার, সে সব তাদের যোগাব! তারা এইসব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ঈশ্বর সাধনা করবে, তাই দেখব আর আনন্দ করব। মথুরকে বললুম। সে বললে, 'তার আর কি বাবা, সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি; তোমার যাকে যা ইচ্ছা হবে দিও।' ঠাকুরবাড়ির ভাণ্ডার থেকে চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি যার যেমন ইচ্ছা তাকে সেই রকম সিধা দিবার বন্দোবস্ত তো ছিলই—তার উপর মথুর সাধুদের দিবার জন্য লোটা, কমণ্ডলু, কম্বল, আসন, মায় তারা যে-সব নেশা ভাঙ করে—সিদ্ধি, গাঁজা, তান্ত্রিক সাধুদের জন্য 'কারণ' প্রভৃতি সকল জিনিস দিবার বন্দোবস্ত করে দিলে। তখন তান্ত্রিক সাধক ঢের আসত ও শ্রীচক্রের অনুষ্ঠান করত! আমি আবার তাদের সাধনার দরকার বলে আদা পেঁয়াজ ছাড়িয়ে, মুড়ি কড়াইভাজা আনিয়ে সব যোগাড় করে দিতুম; আর তারা সব ঐ নিয়ে পূজা করছে, জগদম্বাকে ডাকছে, দেখতুম। আমাকে তারা আবার অনেক সময় চক্রে নিয়ে বসত, অনেক সময় চক্রেশ্বর করে বসাত; 'কারণ' গ্রহণ করতে অনুরোধ করত। কিন্তু যখন বুঝত যে, ও সব গ্রহণ করতে পারি না, নাম করলেই নেশা হয়ে যায়, তখন আর অনুরোধ করত না। তাদের সঙ্গে বসলে 'কারণ' গ্রহণ করতে হয় বলে 'কারণ' নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটতুম বা আঘ্রাণ নিতুম বা বড়জোর আঙুলে করে মুখে ছিটে দিতুম আর তাদের পাত্রে সব ঢেলে ঢেলে দিতুম। দেখতুম, তাদের ভিতর কেউ কেউ উহা গ্রহণ করেই ঈশ্বর চিন্তায় মন দেয়, বেশ তন্ময় হয়ে তাঁকে ডাকে। অনেকে আবার কিন্তু দেখলুম লোভে পড়ে খায়, আর জগদম্বাকে ডাকা দূরে থাক বেশি খেয়ে শেষটা মাতাল হয়ে পড়ে। একদিন ঐ রকমে বেশি ঢলাঢলি করাতে শেষটা ওসব (কারণাদি) দেওয়া বন্ধ করে দিলুম! রাজকুমারকে[3] কিন্তু বরাবর দেখেছি, গ্রহণ করেই তন্ময় হয়ে জপে বসত; কখনো অন্য দিকে মন দিত না। শেষটা কিন্তু যেন একটু নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক হয়েছিল। হতেই পারে—ছেলেপিলে পরিবার ছিল—বাড়িতে অভাবের দরুন টাকাকড়ি-লাভের দিকে একটু-আধটু মন দিতে হতো; তা যাই হোক, সে কিন্তু বাবু, সাধনার সহায় বলেই 'কারণ' গ্রহণ করত; লোভে পড়ে ঐ সব খেয়ে কখনো ঢলাঢলি করেনি—ওটা দেখেছি।"

ঠাকুরের 'সিদ্ধি' বা 'কারণ' বলিবামাত্র ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় হইয়া নেশা; ও খিস্তি-খেউড়-উচ্চারণেও সমাধি

ঠাকুর 'কারণ' গ্রহণ করিতে কখনও পারিতেন না—এ প্রসঙ্গে কত কথাই না মনে উদয় হইতেছে! কতদিন না আমাদের সম্মুখে তিনি কথা-প্রসঙ্গে 'সিদ্ধি', 'কারণ' প্রভৃতি পদার্থের নাম করিতে করিতে নেশায় ভরপুর হইয়া, এমনকি সমাধিস্থ পর্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিয়াছি! স্ত্রী-শরীরের বিশেষ গোপনীয় অঙ্গ, যাহার নামমাত্রেই সভ্যতাভিমানী জুয়াচোর আমাদের মনে কুৎসিত ভোগের ভাবই উদিত হয় বা ঐরূপ ভাব উদিত হইবে নিশ্চিত জানিয়া আমাদের ভিতর শিষ্ট যাঁহারা তাঁহারা 'অশ্লীল' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদানপূর্বক দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে করিতেই এ অদ্‌ভুত ঠাকুরকে কতদিন না সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি! আবার দেখিয়াছি—সমাধি-ভূমি হইতে কিছু নিম্নে নামিয়া একটু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াই ঐ প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "মা, তুইতো পঞ্চাশৎ-বর্ণ-রূপিণী; তোর যে-সব বর্ণ নিয়ে বেদ-বেদান্ত, সেই সবই তো খিস্তি-খেউড়ে! তোর বেদ-বেদান্তের ক খ আলাদা, আর খেউড়ের ক খ আলাদা তো নয়! বেদ-বেদান্তও তুই, আর খিস্তি-খেউড়ও তুই।" এই বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! হায়, হায়, বলা-বুঝানোর কথা দূরে যাউক, কে বুঝিবে এ অলৌকিক দেবমানবের নয়নে জগতের ভাল-মন্দ সকল পদার্থই কি অনির্বচনীয়, আমাদের মনোবুদ্ধির অগোচর, এক অপূর্ব আলোকে প্রকাশিত ছিল! কে সে চক্ষু পাইবে যে, তাঁহার ন্যায় দৃষ্টিতে জগৎ-সংসারটা দেখিতে পাইবে! হে পাঠক, অবহিত হও; স্তম্ভিত মনে কথাগুলি হৃদয়ে যত্নে ধারণ কর, আর ভাব—এ অদ্‌ভুত ঠাকুরের মানসিক পবিত্রতা কি সুগভীর, কি দুরবগাহ!

শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপাপাত্র শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমার মন-মাতালে মাতাল করে, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে" ইত্যাদি। বাস্তবিক নেশা-ভাঙ না করিয়া

কেবল ভগবদানন্দে যে লোকে, আমরা যে অবস্থাকে বেয়াড়া মাতাল বলি তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইতে পারে, এ কথা ঠাকুরকে দেখিবার পূর্বে আমাদের ধারণাই হইত না। আমাদের বেশ মনে আছে, আমাদের জীবনে একটা সময় এমন গিয়াছে যখন 'হরি' বলিলেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত—একথা কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে কুসংস্কারাপন্ন নির্বোধ বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। তখন ঐ প্রকারের একটা সকল বিষয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাসের তরঙ্গ যেন শহরের সকল যুবকেরই মনে চলিতেছিল! তাহার পরেই এই অলৌকিক ঠাকুরের সহিত দেখা। দেখা, দিবসে রাত্রে সকল সময়ে দেখা, নিজের চক্ষে দেখা যে কীর্তনানন্দে তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন বাহ্যজ্ঞানের লোপ—টাকা পয়সা হাতে স্পর্শ করাইলেই ঐ অবস্থাপ্রাপ্তি—'সিদ্ধি', 'কারণ' প্রভৃতি নেশার পদার্থের নাম করিবামাত্র ভগবদানন্দের উদ্দীপন হইয়া ভরপুর নেশা—ঈশ্বরের বা তদবতারদিগের নামের কথা দূরে থাক, যে নামের উচ্চারণে ইতর সাধারণের মনে কুৎসিত ইন্দ্রিয়জ আনন্দেরই উদ্দীপনা হয়, তাহাতে ব্রহ্মযোনি ত্রিজগৎপ্রসবিনী আনন্দময়ী জগদম্বার উদ্দীপন হইয়া ইন্দ্রিয়সম্পর্কমাত্রশূন্য বিমল আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়া! এখনও কি বলিতে হইবে, এ অলৌকিক দেবমানবের কি এমন গুণ দেখিয়া আমাদের চক্ষু চিরকালের মতো ঝলসিত হইয়া গেল, যাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার-জ্ঞানে হৃদয়ে আসন দান করিলাম?

ঐ বিষয়ে ১ম দৃষ্টান্ত—রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে

ঠাকুরের পরম ভক্ত, পরলোকগত ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র দত্তের সিমলার (কলিকাতা) ভবনে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে অনেক আনন্দ করিতেন। একদিন ঐরূপে কিছুকাল ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আনন্দ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। রামবাবুর বাটীখানি গলির[4] ভিতর, বাটীর সম্মুখে গাড়ি আসিতে পারে না। বাটীর কিছু দূরে পূর্বের বা পশ্চিমের বড় রাস্তায় গাড়ি রাখিয়া পদব্রজে বাড়িতে আসিতে হয়। ঠাকুরের যাইবার জন্য একখানি গাড়ি পশ্চিমের বড় রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল। ঠাকুর সেদিকে হাঁটিয়া চলিলেন, ভক্তেরা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবদানন্দে সেদিন ঠাকুর এমন টলমল করিতেছিলেন যে, এখানে পা ফেলিতে ওখানে পড়িতেছে। কাজেই বিনা সাহায্যে ঐ কয়েক পদ যাইতে পারিলেন না। দুই জন ভক্ত দুই দিক হইতে তাঁহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাইতে লাগিল। গলির মোড়ে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহারা ঠাকুরের ব্যাপার বুঝিবেন কিরূপে? আপনাদিগের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'উঃ! লোকটা কি মাতাল হয়েছে হে!' কথাগুলি ধীরস্বরে উচ্চারিত হইলেও আমরা শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না; আর মনে মনে বলিলাম, 'তা বটে'।

ঐ ২য় দৃষ্টান্ত—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমার সম্মুখে

দক্ষিণেশ্বরে একদিন দিনের বেলায় আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে পান সাজিতে ও তাঁহার বিছানা ঝাড়িয়া ঘরটা ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিয়া ঠাকুর কালীঘরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে যাইলেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর মন্দির হইতে ফিরিলেন—একেবারে যেন পুরোদস্তুর মাতাল! চক্ষু রক্তবর্ণ, হেথায় পা ফেলিতে হোথায় পড়িতেছে, কথা এড়াইয়া অস্পষ্ট অব্যক্ত হইয়া গিয়াছে! ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ ভাবে টলিতে টলিতে একেবারে শ্রীশ্রীমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমা তখন একমনে গৃহকার্য করিতেছেন, ঠাকুর যে তাঁহার নিকটে ঐ ভাবে আসিয়াছেন তাহা জানিতেও পারেন নাই। এমন সময়ে ঠাকুর মাতালের মতো তাঁহার অঙ্গ ঠেলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?" তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া সহসা ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবস্থ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত! বলিলেন—'না, না, মদ খাবে কেন?'

ঠাকুর—তবে কেন টলচি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্চি না? আমি মাতাল?

শ্রীশ্রীমা—না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।

ঠাকুর 'ঠিক বলেছ' বলিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঐ ৩য় দৃষ্টান্ত—কাশীপুরে মাতাল দেখিয়া

কলিকাতার ভক্তদিগের ঠাকুরের নিকট আগমন ও কৃপালাভের পর হইতেই ঠাকুর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দুই একবার কলিকাতায় কোন না কোন ভক্তের বাটীতে গমনাগমন করিতেন। নিয়মিত সময়ে কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে না পারিলে এবং অন্য কাহারও মুখে তাহার কুশল-সংবাদ না পাইলে কৃপাময় ঠাকুর স্বয়ং তাহাকে দেখিতে ছুটিতেন। আবার নিয়মিত সময়ে আসিলেও কাহাকেও কাহাকেও দেখিবার জন্য কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। তখন তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিতেন। কিন্তু সর্বসময়েই দেখা যাইত, তাঁহার ঐরূপ শুভাগমন সেই সেই ভক্তের কল্যাণের জন্যই হইত। উহাতে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও স্বার্থ থাকিত না। বরাহনগরে বেণী সাহার কতকগুলি ভাল ভাড়াটিয়া গাড়ি ছিল। ঠাকুর প্রায়ই কলিকাতা আসিতেন বলিয়া তাহার সহিত বন্দোবস্ত ছিল যে, ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি পাঠাইবে এবং কলিকাতা হইতে ফিরিতে যত রাত্রিই হউক না কেন গোলমাল করিবে না; অধিক সময়ের জন্য নিয়মিত হারে অধিক ভাড়া পাইবে। প্রথমে মথুরবাবু, পরে পানিহাটির মণি সেন, পরে শম্ভু মল্লিক এবং তৎপরে কলিকাতা সিঁদুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ঠাকুরের ঐ সকল গাড়িভাড়ার খরচ যোগাইতেন। তবে যাঁহার বাটীতে যাইতেন, পারিলে সেদিনকার গাড়িভাড়া তিনিই দিতেন।

আজ ঠাকুর ঐরূপে কলিকাতায় যাইবেন—যদু মল্লিকের বাটীতে। মল্লিক মহাশয়ের মাতাঠাকুরানী ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন—তাঁহাকে দেখিয়া আসিবেন; কারণ, অনেক দিন তাঁহাদের কোন সংবাদ পান নাই। ঠাকুরের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, গাড়ি আসিয়াছে। এমন সময় আমাদের বন্ধু অ—কলিকাতা হইতে নৌকা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর অ-কে দেখিয়াই কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ। আজ আমি যদু মল্লিকের বাড়িতে যাচ্চি; অমনি তোমাদের বাড়িতেও নেবে একবার গি-কে দেখে যাব; সে কাজের ভিড়ে অনেক দিন এদিকে আসতে পারেনি। চল, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।" অ—সম্মত হইলেন। অ-র তখন ঠাকুরের সহিত নূতন আলাপ, কয়েকবার মাত্র নানা স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। অদ্ভুত ঠাকুরের, আমরা যাহাকে তুচ্ছ, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য বা দর্শনাযোগ্য বস্তু ও ব্যক্তি বলি, সে সকলকে দেখিয়াও যে ঈশ্বরোদ্দীপনায় ভাবসমাধি যেখানে সেখানে যখন তখন উপস্থিত হইয়া থাকে, অ—তাহা তখনও সবিশেষ জানিতে পারেন নাই।

এইবার ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। যুবক ভক্ত লাটু, যিনি এখন স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে সকলের পরিচিত, ঠাকুরের বেটুয়া, গামছাদি আবশ্যক দ্রব্য সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া গাড়িতে উঠিলেন; আমাদের বন্ধু অ-ও উঠিলেন; গাড়ির একদিকে ঠাকুর বসিলেন এবং অন্যদিকে লাটু মহারাজ ও অ—বসিলেন। গাড়ি ছাড়িল এবং ক্রমে বরাহনগরের বাজার ছাড়াইয়া মতিঝিলের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটিল না। ঠাকুর রাস্তায় এটা ওটা দেখিয়া কখনও কখনও বালকের ন্যায় লাটু বা অ-কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; অথবা এ কথা সে কথা তুলিয়া সাধারণ সহজ অবস্থায় যেরূপ হাস্য-পরিহাসাদি করিতেন, সেইরূপ করিতে করিতে চলিলেন।

মতিঝিলের দক্ষিণে একটি সামান্য বাজার গোছ ছিল; তাহার দক্ষিণে একখানি মদের দোকান, একটি ডাক্তারখানা এবং কয়েকখানি খোলার ঘরে চালের আড়ত, ঘোড়ার আস্তাবল ইত্যাদি ছিল। ঐ সকলের দক্ষিণেই এখানকার প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ দেবীস্থান ৺সর্বমঙ্গলা ও ৺চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরে যাইবার প্রশস্ত পথ ভাগীরথীতীর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ পথটিকে দক্ষিণে রাখিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে হয়।

মদের দোকানে অনেকগুলি মাতাল তখন বসিয়া সুরাপান ও গোলমাল হাস্য-পরিহাস করিতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার আনন্দে গান ধরিয়াছিল; আবার কেহ কেহ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেও ব্যাপৃত ছিল। আর দোকানের স্বত্বাধিকারী নিজ ভৃত্যকে তাহাদের সুরাবিক্রয় করিতে লাগাইয়া আপনি দোকানের দ্বারে অন্যমনে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কপালে বৃহৎ এক সিন্দুরের ফোঁটাও ছিল। এমন সময়

ঠাকুরের গাড়ি দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। দোকানী বোধ হয় ঠাকুরের বিষয় জ্ঞাত ছিল; কারণ, ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়াই হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

গোলমালে ঠাকুরের মন দোকানের দিকে আকৃষ্ট হইল এবং মাতালদের ঐরূপ আনন্দ-প্রকাশ তাঁহার চক্ষে পড়িল। কারণানন্দ দেখিয়াই অমনি ঠাকুরের মনে জগৎকারণের আনন্দস্বরূপের উদ্দীপনা!—খালি উদ্দীপনা নহে, সেই অবস্থার অনুভূতি আসিয়া ঠাকুর একেবারে নেশায় বিভোর, কথা এড়াইয়া যাইতেছে। আবার শুধু তাহাই নহে, সহসা নিজ শরীরের কিয়দংশ ও দক্ষিণ পদ বাহির করিয়া গাড়ির পাদানে পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাতালের ন্যায় তাহাদের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বেশ হচ্চে, খুব হচ্চে, বা, বা, বা।"

অ—বলেন, "ঠাকুরের যে সহসা ঐরূপ ভাব হইবে, ইহার কোন আভাসই পূর্বে আমরা পাই নাই; বেশ সহজ মানুষের মতোই কথাবার্তা কহিতেছিলেন। মাতাল দেখিয়াই একেবারে হঠাৎ ঐ রকম অবস্থা! আমি তো ভয়ে আড়ষ্ট; তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে, ধরিয়া গাড়ির ভিতর তাঁহার শরীরটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসাইব ভাবিয়া হাত বাড়াইয়াছি, এমন সময় লাটু বাধা দিয়া বলিল, 'কিছু করতে হবে না, উনি আপনা হতেই সামলাবেন, পড়ে যাবেন না।' কাজেই চুপ করিলাম, কিন্তু বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল; আর ভাবিলাম, এ পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে এক গাড়িতে আসিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! আর কখনও আসিব না। অবশ্য এত কথা বলিতে যে সময় লাগিল, তদপেক্ষা ঢের অল্প সময়ের ভিতরই ঐ সব ঘটনা হইল এবং গাড়িও ঐ দোকান ছাড়াইয়া চলিয়া আসিল। তখন ঠাকুরও পূর্ববৎ গাড়ির ভিতরে স্থির হইয়া বসিলেন এবং ৺সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'ঐ সর্বমঙ্গলা বড় জাগ্রত ঠাকুর, প্রণাম কর।' ইহা বলিয়া স্বয়ং প্রণাম করিলেন, আমরাও তাঁহার দেখাদেখি দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়া ঠাকুরের দিকে দেখিলাম—যেমন তেমনি, বেশ প্রকৃতিস্থ। মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আমার কিন্তু 'এখনি পড়িয়া গিয়া একটা খুনোখুনি ব্যাপার হইয়াছিল আর কি'—ভাবিয়া সে বুক-ঢিপঢিপানি অনেকক্ষণ থামিল না!

"তারপর গাড়ি বাড়ির দুয়ারে আসিয়া লাগিলে, আমাকে বলিলেন, 'গি—বাড়িতে আছে কি? দেখে এস দেখি।' আমিও জানিয়া আসিয়া বলিলাম, 'না'। তখন বলিলেন, 'তাই তো গি-র সঙ্গে দেখা হলো না, ভেবেছিলাম, তাকে আজকের বেশি ভাড়াটা দিতে বলব। তা তোমার সঙ্গে তো এখন জানাশুনা হয়েছে, বাবু, তুমি একটা টাকা দেবে? কি জান, যদু মল্লিক কৃপণ লোক; সে সেই বরাদ্দ দু টাকা চার আনার বেশি গাড়িভাড়া কখনো দেবে না। আমার কিন্তু বাবু একে ওকে দেখে ফিরতে কত রাত হবে তা কে জানে? বেশি দেরি হলেই আবার গাড়োয়ান 'চল, চল' করে দিক্ করে। তাই বেণীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে, ফিরতে যত রাতই হোক না কেন, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোল করবে না। যদু দুই টাকা চার আনা দেবে, আর তুমি একটা টাকা দিলেই আজকের ভাড়ার আর কোন গোল রইল না; এই জন্যে বলছি।' আমি ঐ সব শুনে একটা টাকা লাটুর হাতে দিলাম এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। ঠাকুরও যদু মল্লিককে দেখিতে গেলেন।"

ঠাকুরের এইরূপ বাহ্যদৃষ্টে মাতালের ন্যায় অবস্থা নিত্যই যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার কয়টা কথাই বা আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠককে বলিতে পারি।

দক্ষিণেশ্বরে আগত সকল সম্প্রদায়ের সাধুদেরই ঠাকুরের নিকট ধর্মবিষয়ে সহায়তা-লাভ

রাসমণির কালীবাড়িতে পূর্বোক্ত প্রকারে যত সাধু সাধক আসিতেন, তাঁহাদের কথা ঠাকুর ঐরূপে অনেক সময় অনেকের কাছেই গল্প করিতেন; কেবল যে আমাদের কাছেই করিয়াছিলেন তাহা নহে। ঐ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার এখনও অনেক লোক জীবিত। আমরা তখন সেন্ট্ জেভিয়ার কলেজে পাঠ করি। সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবার দুই দিন কলেজ বন্ধ থাকিত। শনি ও রবিবারে ঠাকুরের নিকট অনেক ভক্তের ভিড় হইত বলিয়া আমরা বৃহস্পতিবারেও তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উহাতে তাঁহার জীবনের নানা কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিবার বেশ সুবিধা হইত। ঐ সকল কথা শুনিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী স্বামীজী, মুসলমান গোবিন্দ—যিনি কৈবর্তজাতীয় ছিলেন[5],

পূর্ণ নির্বিকল্প ভূমিতে ছয় মাস থাকিবার সময় জোর করিয়া আহার করাইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিবার জন্য যে সাধুটি দৈবপ্রেরিত হইয়া কালীবাটীতে আগমন করেন তিনি এবং ঐরূপ আরও দুই একটি ছাড়া নানা সম্প্রদায়ের অপর যত সাধু-সাধকসকল ঠাকুরের নিকটে আমরা যাইবার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক জীবনালোকের সহায়ে নিজ নিজ ধর্মজীবনে নবপ্রাণ-সঞ্চারলাভের জন্যই আসিয়াছিলেন, এবং তল্লাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া ঐ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত যথার্থ ধর্মপিপাসু সাধকসকলকে সেই সেই পথ দিয়া কেমন করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে হইবে তাহাই দেখাইবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিখিতেই আসিয়াছিলেন এবং শিক্ষা পূর্ণ করিয়া যে যাঁহার স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং তোতাপুরী প্রভৃতিও বহু ভাগ্যে ঠাকুরের ধর্মজীবনের সহায়ক-স্বরূপে আগমন করিলেও এতকাল ধরিয়া সাধনা করিয়াও নিজ নিজ ধর্মজীবনে যে সকল নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না, ঠাকুরের অলৌকিক জীবন ও শক্তিবলে সে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুর যে ধর্মমতে যখন সিদ্ধিলাভ করিতেন তখন ঐ সম্প্রদায়ের সাধুরাই তাঁহার নিকট আসিত

আবার এই সকল সাধু ও সাধকদিগের দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আগমনের ক্রম বা পারম্পর্য আলোচনা করিলে আর একটি বিশেষ সত্যের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না। তাঁহাদের ঐরূপ আগমনক্রমের কথা আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ঠাকুরের শ্রীমুখে যেমন শুনিয়াছিলাম, সেই ভাবে যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় তিনি যেমন করিয়া ঐ সকল কথা আমাদের বলিয়াছিলেন, সেই প্রকারে ঐ সকল কথা পাঠককে বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি এক এক ভাবের উপাসনা ও সাধনায় লাগিয়া ঈশ্বরের ঐ ঐ ভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যেমন যেমন করিতেন, অমনি সেই সেই সম্প্রদায়ের যথার্থ সাধকেরা সেই সেই সময়ে দলে দলে তাঁহার নিকট কিছুকাল ধরিয়া আগমন করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের ঐ ঐ ভাবের আলোচনায় তখন তখন দিবারাত্র কাটিয়া যাইত। রামমন্ত্রের উপাসনায় যেমন সিদ্ধিলাভ করিলেন, অমনি দলে দলে রামাইৎ সাধুরা তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত শান্ত দাস্যাদি এক-একটি ভাবে যেমন যেমন সিদ্ধিলাভ করিলেন, অমনি সেই সেই ভাবের সাধকদিগের আগমন হইতে লাগিল। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়ে চৌষট্টীখানা তন্ত্রোক্ত সকল সাধন যখন সাঙ্গ করিয়া ফেলিলেন বা শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন, অমনি সে সময়ের এ প্রদেশের যাবতীয় বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকসকল তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। পুরী গোস্বামীর সহায়ে অদ্বৈতমতের ব্রহ্মোপাসনা ও উপলব্ধিতে যেমন সিদ্ধিলাভ করিলেন, অমনি পরমহংস সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সাধকেরা তাঁহার সমীপে দলে দলে আগমন করিতে লাগিলেন।

সকল অবতারপুরুষের সমান শক্তি-প্রকাশ দেখা যায় না, কারণ তাঁহাদের কেহ বা জাতিবিশেষকে ও কেহ বা সমগ্র মানবজাতিকে ধর্মদান করিতে আসেন

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধককুলের ঐ ভাবে ঐ ঐ সময়ে ঠাকুরের দেবসঙ্গ-লাভ করিবার যে একটা বিশেষ গূঢ় অর্থ আছে তাহা বালকেরও বুঝিতে দেরি লাগিবে না। যুগাবতারের শুভাগমনে জগতে সর্বকালেই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইবে। তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় নিয়মানুসারে ধর্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য বা নির্বাপিতপ্রায় ধর্মালোককে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সর্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের জীবনালোচনায় তাঁহাদের ভিতরে অল্পাধিক পরিমাণে শক্তিপ্রকাশের তারতম্য দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কেহ বা কোন প্রদেশ-বিশেষের বা দুই-চারিটি সম্প্রদায়-বিশেষের অভাবমোচনের জন্য আগমন করিয়াছেন; আবার কেহ বা সমগ্র পৃথিবীর ধর্মাভাব-মোচনের জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। কিন্তু সর্বত্রই তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ববর্তী ঋষি, আচার্য ও অবতারকুলের দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত আধ্যাত্মিক মত-সকলের মর্যাদা সম্যক্ রক্ষা করিয়া, সে সকলকে বজায় রাখিয়া, নিজ নিজ আবিষ্কৃত উপলব্ধি ও মতের প্রচার করিয়াছেন, দেখা গিয়া থাকে। কারণ তাঁহারা তাঁহাদের দিব্যযোগশক্তিবলে পূর্ব পূর্ব কালের আধ্যাত্মিক মতসকলের ভিতর একটা পারম্পর্য ও সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়া থাকেন। আমাদের বিষয়-মলিন দৃষ্টির সম্মুখে ভাবরাজ্যের সে

ইতিহাস, সে সম্বন্ধ সর্বদা অপ্রকাশিতই থাকে। তাঁহারা পূর্ব পূর্ব ধর্মমতসকলকে 'সূত্রে মণিগণা ইব' এক সূত্রে গাঁথা দেখিতে পান এবং নিজ ধর্মোপলব্ধি-সহায়ে সেই মালার অঙ্গই সম্পূর্ণ করিয়া যান।

হিন্দু, ইহুদী, ক্রীশ্চান ও মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক অবতারপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক শক্তি-প্রকাশের সহিত ঠাকুরের ঐ বিষয়ে তুলনা

বৈদেশিক ধর্মমতসকলের আলোচনায় এ বিষয়টি আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। দেখ, ইহুদি আচার্যেরা যে সকল ধর্মবিষয়ক সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, ঈশা আসিয়া সে সকল বজায় রাখিয়া নিজোপলব্ধ সত্যসকল প্রচার করিলেন। আবার কয়েক শতাব্দী পরে মহম্মদ আসিয়া ঈশা-প্রচারিত মতসকল বজায় রাখিয়া নিজ মত প্রচার করিলেন। ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে, ইহুদি আচার্যগণ বা ঈশা-প্রচারিত মত অসম্পূর্ণ; বা ঐ ঐ মতাবলম্বনে চলিয়া তাঁহারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের যে ভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা করা যায় না। তাহা নিশ্চয়ই করা যায়; আবার মহম্মদ-প্রচারিত মতাবলম্বনে চলিয়া তিনি যে ভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাও করা যায়। আধ্যাত্মিক জগতের সর্বত্র ইহাই নিয়ম। ভারতীয় ধর্মমতসকলের মধ্যেও ঐরূপ ভাব বুঝিতে হইবে। ভারতের বৈদিক ঋষি, পুরাণকার এবং তন্ত্রকার আচার্য মহাপুরুষেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের যেটি যেটি ঠিক ঠিক অবলম্বন করিয়া তুমি চলিবে, সেই সেই পথ দিয়াই ঈশ্বরের তত্তদ্ভাবের উপলব্ধি করিতে পারিবে। ঠাকুর একাদিক্রমে সকল সম্প্রদায়োক্ত মতে সাধনায় লাগিয়া উহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহাই আমাদের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুরের নিকট সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সাধকদিগের আগমন-কারণ

ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আসিয়া জুটে—আধ্যাত্মিক জগতেও যে ইহাই নিয়ম, ঠাকুর সে কথা আমাদের বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। ঐ নিয়মেই, অবতার মহাপুরুষদিগের জীবনে যখন সিদ্ধিলাভ বা আধ্যাত্মিক জগতের সত্যোপলব্ধি, অমনি উহা জানিবার শিখিবার জন্য ধর্মপিপাসুগণের তাঁহাদিগের নিকট আকৃষ্ট হওয়া—ইহা সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের নিকটে একই সম্প্রদায়ের সাধককুল না আসিয়া যে, সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরাই দলে দলে আসিয়াছিলেন তাহার কারণ—তিনি তত্তৎ সকল পথ দিয়াই অগ্রসর হইয়া তত্তৎ ঈশ্বরীয় ভাবের সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ঐ ঐ পথের সংবাদ বিশেষরূপে বলিতে পারিতেন। তবে ঐ সকল সাধকদিগের সকলেই যে নিজ নিজ মতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহাদের ভিতর যাঁহারা বিশিষ্ট তাঁহারাই উহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই ঠাকুরের দিব্যসঙ্গগুণে নিজ নিজ পথে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ঐ পথ দিয়া চলিলে যে কালে ঈশ্বরকে লাভ করিবেন নিশ্চয়, ইহা ধ্রুব সত্যরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিজ নিজ পথের উপর ঐরূপ বিশ্বাসের হানি হওয়াতেই যে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং সাধক নিজ জীবনে ধর্মোপলব্ধি করিতে পারে না, ইহা আর বলিতে হইবে না।

দক্ষিণেশ্বরাগত সাধুদিগের সঙ্গলাভেই ঠাকুরের ভিতর ধর্ম-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে—একথা সত্য নহে

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে যে, ঠাকুর ঐ সকল সাধুদের নিকট হইতেই ঈশ্বর-সাধনার উপায়সকল জানিয়া লইয়া স্বয়ং উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং তপস্যার কঠোরতায় এক সময়ে সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল এবং কোনরূপ ভাবের আতিশয্যে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ারূপ একটা শারীরিক রোগও চিরকালের মতো তাঁহার শরীরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। হে ভগবান, এমন পণ্ডিত-মূর্খের দলও আমরা! পূর্ণ চিত্তৈকাগ্রতা-সহায়ে সমাধি-ভূমিতে আরোহণ করিলেই যে সাধারণ বাহ্যচৈতন্যের লোপ হয়, এ কথা ভারতের ঋষিকুল বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি-সহায়ে আমাদের যুগে যুগে বুঝাইয়া আসিলেন ও নিজ নিজ জীবনে উহা দেখাইয়া যাইলেন, সমাধি-শাস্ত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা—যাহা পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতির ভিতরেই বিদ্যমান নাই—আমাদের জন্য রাখিয়া যাইলেন; সংসারে এ পর্যন্ত অবতার বলিয়া সর্বদেশে মানব-হৃদয়ের শ্রদ্ধা পাইতেছেন যত মহাপুরুষ তাঁহারাও নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া ঐরূপ বাহ্যজ্ঞানলোপটা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত অবশ্যম্ভাবী, সে কথা

আমাদের ভূয়োভূয়ঃ বুঝাইয়া যাইলেন, তথাপি যদি আমরা ঐ কথা বলি এবং ঐরূপ কথা শুনি, তবে আর আমাদের দশা কি হইবে? হে পাঠক, ভাল বুঝ তো তুমি ঐ সকল অন্তঃসারশূন্য কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর; তোমার এবং যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহাদের মঙ্গল হউক! আমাদের কিন্তু এ অদ্‌ভুত দিব্য পাগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিবার স্বাধীনতাটুকু কৃপা করিয়া প্রদান করিও, ইহাই তোমার নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ বা ভিক্ষা। কিন্তু যাহা হয় একটা স্থিরনিশ্চয় করিবার অগ্রে ভাল করিয়া আর একবার বুঝিয়া দেখিও; প্রাচীন উপনিষদ্‌কার যেমন বলিয়াছেন, সেরূপ অবস্থা তোমার না আসিয়া উপস্থিত হয়! –

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।

দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

ঠাকুরের ভাবসমাধিসমূহকে রোগবিশেষ বলাটা আজ কিছু নূতন কথা নহে! তাঁহার বর্তমানকালে, পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত অনেকে ওকথা বলিতেন। পরে যত দিন যাইতে লাগিল, এবং এ দিব্য পাগলের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে উচ্চারিত পাগলামিগুলি যতই পূর্ণ হইতে লাগিল এবং তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব ভাবগুলি পৃথিবীময় সাধারণে যতই সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল, ততই ও কথাটার আর জোর থাকিল না। চন্দ্রে ধূলিনিক্ষেপের যে ফল হয় তাহাই হইল এবং লোকে ঐ সকল ভ্রান্ত উক্তির সম্যক পরিচয় পাইয়া ঠাকুরের কথাই সত্য জানিয়া স্থির হইয়া রহিল। এখনও তাহাই হইবে। কারণ সত্য কখনও অগ্নির ন্যায় বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা যায় না। অতএব ঐ বিষয়ে আর আমাদের বুঝাইবার প্রয়াসের আবশ্যক নাই। ঠাকুর নিজেই ঐ সম্বন্ধে যে দু-একটি কথা বলিতেন, তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

ঠাকুরের সমাধিতে বাহ্যজ্ঞানলোপ হওয়াটা ব্যাধি নহে; প্রমাণ—ঠাকুর ও শিবনাথ-সংবাদ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যদিগের মধ্যে অন্যতম, শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের ভাবসমাধিটা স্নায়ুবিকার-প্রসূত রোগ-বিশেষ (hysteria or epileptic fits) বলিয়া তখন হইতেই আমাদের কাহারও কাহারও নিকট নির্দেশ করিতেন এবং ঐ সঙ্গে এরূপ মতও প্রকাশ করিতেন যে, ঐ সময়ে ঠাকুর, ইতরসাধারণে ঐ রোগগ্রস্ত হইয়া যেমন অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ হইয়া যান! ঠাকুরের কর্ণে ক্রমে সে কথা উঠে। শাস্ত্রী মহাশয় বহু পূর্ব হইতে ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। একদিন তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত আছেন, তখন ঠাকুর ঐ কথা উত্থাপিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেন, "হ্যাঁ শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বল যে ঐ সময় অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকাকড়ি এই সব জড় জিনিসগুলোতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ-সংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে, তাঁকে দিনরাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম! এ কোনদিশি বুদ্ধি তোমার?" শিবনাথবাবু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

সাধনকালে ঠাকুরের উন্মত্তবৎ আচরণের কারণ

ঠাকুর 'দিব্যোন্মাদ', 'জ্ঞানোন্মাদ' প্রভৃতি কথা আমাদের নিকট নিত্য প্রয়োগ করিতেন এবং মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট বলিতেন যে, তাঁহার জীবনে বার বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। বলিতেন, "ঝড়ে ধুলো উড়ে যেমন সব একাকার দেখায়—এটা আমগাছ, ওটা কাঁঠালগাছ বলে বুঝা দূরে থাক, দেখাও যায় না, সেই-রকমটা হয়েছিল রে; ভাল-মন্দ, নিন্দা-স্তুতি, শৌচ-অশৌচ এ-সকলের কোনটাই বুঝতে দেয়নি! কেবল এক চিন্তা, এক ভাব—কেমন করে তাঁকে পাব, এইটেই মনে সদা-সর্বক্ষণ থাকত! লোকে বলত—পাগল হয়েছে!" যাক এখন সে কথা, আমরা পূর্বানুসরণ করি।

দক্ষিণেশ্বরাগত সাধকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের নিকট দীক্ষাও গ্রহণ করেন; যথা—নারায়ণ শাস্ত্রী

দক্ষিণেশ্বরে তখন তখন যে সকল সাধক পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতর কেহ কেহ আবার ভক্তির আতিশয্যে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস পর্যন্ত লইয়া চলিয়া

গিয়াছিলেন। পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী উঁহাদেরই অন্যতম। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, নারায়ণ শাস্ত্রী প্রাচীন যুগের নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর স্বাধ্যায় বা নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ষড়দর্শনের সকলগুলির উপরই সমান অভিজ্ঞতা ও আধিপত্য লাভ করিবার প্রবল বাসনা বরাবর তাঁহার প্রাণে ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে নানা গুরুগৃহে বাস করিয়া পাঁচটি দর্শন তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের অধীনে ন্যায়দর্শনের পাঠ সাঙ্গ না করিলে ন্যায়দর্শনে পূর্ণাধিপত্য লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকমধ্যে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব, এজন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিবার প্রায় আট বৎসর পূর্বে এ দেশে আগমন করেন এবং সাত বৎসর কাল নবদ্বীপে থাকিয়া ন্যায়ের পাঠ সাঙ্গ করেন। এইবার দেশে ফিরিয়া যাইবেন। আবার এদিকে কখনও আসিবেন কিনা সন্দেহ, এইজন্যই বোধ হয় কলিকাতা এবং তৎসন্নিকট দক্ষিণেশ্বরদর্শনে আসিয়া ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন।

শাস্ত্রীজীর পূর্বকথা

বঙ্গদেশে ন্যায় পড়িতে আসিবার পূর্বেই শাস্ত্রীজীর দেশে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছি, এক সময়ে জয়পুরের মহারাজ শাস্ত্রীজীর নাম শুনিয়া সভাপণ্ডিত করিয়া রাখিবেন বলিয়া উচ্চহারে বেতন নিরূপিত করিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীজীর তখনও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা কমে নাই এবং ষড়দর্শন আয়ত্ত করিবার প্রবল আগ্রহও মিটে নাই। কাজেই তিনি মহারাজের সাদরাহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাস্ত্রীর পূর্বাবাস রাজপুতানা অঞ্চলের নিকট বলিয়াই আমাদের অনুমান।

ঐ পাঠসাঙ্গ ও ঠাকুরের দর্শনলাভ

এদিকে আবার নারায়ণ শাস্ত্রী সাধারণ পণ্ডিতদিগের মতো ছিলেন না। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে অল্পে অল্পে বৈরাগ্যের উদয় হইতেছিল। কেবল পাঠ করিয়াই যে বেদান্তাদি শাস্ত্রে কাহারও দখল জন্মিতে পারে না, উহা যে সাধনার জিনিস তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেজন্য পাঠ সাঙ্গ করিবার পূর্বেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার এক একবার মনে উঠিত—এরূপে তো ঠিক ঠিক জ্ঞানলাভ হইতেছে না, কিছুদিন সাধনাদি করিয়া শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিব। আবার একটা বিষয় আয়ত্ত করিতে বসিয়াছেন, সেটাকে অর্ধপথে ছাড়িয়া সাধনাদি করিতে যাইলে পাছে এদিক ওদিক দুই দিক যায়, সেজন্য সাধনায় লাগিবার বাসনাটা চাপিয়া আবার পাঠেই মনোনিবেশ করিতেন। এইবার তাঁহার এতকালের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, ষড়দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; এখন দেশে ফিরিবার বাসনা। সেখানে ফিরিয়া যাহা হয় একটা করিবেন, এই কথা মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এমন সময় তাঁহার ঠাকুরের সহিত দেখা এবং দেখিয়াই কি জানি কেন তাঁহাকে ভাল লাগা।

পূর্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তখন তখন অতিথি, ফকির, সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের থাকিবার এবং খাইবার বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। শাস্ত্রীজী একে বিদেশী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার সুপণ্ডিত, কাজেই তাঁহাকে যে ওখানে সসম্মানে তাঁহার যতদিন ইচ্ছা থাকিতে দেওয়া হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আহারাদি সকল বিষয়ের অনুকূল এমন রমণীয় স্থানে এমন দেবমানবের সঙ্গ!—শাস্ত্রীজী কিছুকাল এখানে কাটাইয়া যাইবেন স্থির করিলেন। আর না করিয়াই বা করেন কি? ঠাকুরের সহিত যতই পরিচয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রতি কেমন একটা ভক্তি ভালবাসার উদয় হইয়া তাঁহাকে আরও বিশেষভাবে দেখিতে জানিতে ইচ্ছা দিন দিন শাস্ত্রীর প্রবল হইতে লাগিল। ঠাকুরও সরলহৃদয় উন্নতচেতা শাস্ত্রীকে পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় কথায় কাটাইতে লাগিলেন।

ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে শাস্ত্রীর সঙ্কল্প

শাস্ত্রীজী বেদান্তোক্ত সপ্তভূমিকার কথা পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্রদৃষ্টে জানিতেন, একটির পর একটি করিয়া নিম্ন হইতে উচ্চ উচ্চতর ভূমিকায় যেমন যেমন মন উঠিতে থাকে অমনি বিচিত্র বিচিত্র উপলব্ধি ও

দর্শন হইতে হইতে শেষে নির্বিকল্পসমাধি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঐ অবস্থায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে তন্ময় হইয়া মানবের যুগযুগান্তরাগত সংসারভ্রম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। শাস্ত্রী দেখিলেন, তিনি যে সকল কথা শাস্ত্রে পড়িয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন মাত্র, ঠাকুর সেই সকল জীবনে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেখিলেন—'সমাধি', 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রভৃতি যে সকল কথা তিনি উচ্চারণমাত্রই করিয়া থাকেন, ঠাকুরের সেই সমাধি দিবারাত্র যখন তখন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে হইতেছে! শাস্ত্রী ভাবিলেন, 'এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ জানাইবার বুঝাইবার এমন লোক আর কোথায় পাইব? এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। যেরূপে হউক ইঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভের উপায় করিতে হইবে। মরণের তো নিশ্চয়তা নাই—কে জানে কবে এ শরীর যাইবে। ঠিক ঠিক জ্ঞানলাভ না করিয়া মরিব? তাহা হইবে না। একবার তল্লাভে চেষ্টাও অন্ততঃ করিতে হইবে। রহিল এখন দেশে ফেরা।'

শাস্ত্রীর বৈরাগ্যোদয়

দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, শাস্ত্রীর বৈরাগ্যব্যাকুলতাও ততই ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পাণ্ডিত্যে সকলকে চমৎকৃত করিব, মহামহোপাধ্যায় হইয়া সংসারে সর্বাপেক্ষা অধিক নাম যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিব—এ সকল বাসনা তুচ্ছ হেয় জ্ঞান হইয়া মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শাস্ত্রী যথার্থ দীনভাবে শিষ্যের ন্যায় ঠাকুরের নিকট থাকেন এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাক্যাবলী একচিত্তে শ্রবণ করিয়া ভাবেন—আর অন্য কোন বিষয়ে মন দেওয়া হইবে না। কবে কখন শরীরটা যাইবে তাহার স্থিরতা নাই; এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দেখিয়া ভাবেন—"আহা, ইনি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহা জানিবার, বুঝিবার, তাহা বুঝিয়া কেমন নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন!—মৃত্যুও ইঁহার নিকট পরাজিত; 'মহারাত্রি'র করাল ছায়া সম্মুখে ধরিয়া ইতরসাধারণের ন্যায় ইঁহাকে আর অকূল পাথার দেখাইতে পারে না! আচ্ছা, উপনিষদ্‌কার তো বলিয়াছেন এরূপ মহাপুরুষ সিদ্ধ-সঙ্কল্প হন; ইঁহাদের ঠিক ঠিক কৃপালাভ করিতে পারিলে মানবের সংসার-বাসনা মিটিয়া যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। তবে ইঁহাকেই কেন ধরি না; ইঁহারই কেন শরণ গ্রহণ করি না?" শাস্ত্রী মনে মনে এইরূপ নানাবিধ জল্পনা করেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে থাকেন। কিন্তু পাছে ঠাকুর অযোগ্য ভাবিয়া আশ্রয় না দেন এজন্য সহসা তাঁহাকে কিছু বলিতে পারেন না। এইরূপে দিন কাটিতে থাকিল।

শাস্ত্রীর মাইকেল মধুসূদনের সহিত আলাপে বিরক্তি

শাস্ত্রীর মনে দিন দিন যে সংসার-বৈরাগ্য তীব্রভাব ধারণ করিতেছিল, ইহার পরিচয় আমরা নিম্নের ঘটনাটি হইতে বেশ পাইয়া থাকি। এই সময়ে রাসমণির তরফ হইতে কি একটি মকদ্দমা চালাইবার ভার বঙ্গের কবিকুলগৌরব শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মকদ্দমার সকল বিষয় যথাযথ জানিবার জন্য তাঁহাকে রানীর কোন বংশধরের সহিত একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিতে হইয়াছিল। মকদ্দমাসংক্রান্ত সকল বিষয় জানিবার পর এ কথা সে কথায় তিনি ঠাকুর এখানে আছেন জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া হইলে ঠাকুর মধুসূদনের সহিত আলাপ করিতে প্রথম শাস্ত্রীকেই পাঠান এবং পরে আপনিও তথায় উপস্থিত হন। শাস্ত্রীজী মধুসূদনের সহিত আলাপ করিতে করিতে তাঁহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ঈশার ধর্মাবলম্বনের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। মাইকেল তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পেটের দায়েই ঐরূপ করিয়াছেন। মধুসূদন অপরিচিত পুরুষের নিকট আত্মকথা খুলিয়া বলিতে অনিচ্ছুক হইয়া ঐ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ঠাকুর এবং উপস্থিত সকলেরই মনে হইয়াছিল তিনি আত্মগোপন করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে যে ঐরূপ বলিলেন তাহা নহে; যথার্থ প্রাণের ভাবই বলিতেছেন। যাহাই হউক, ঐরূপ উত্তর শুনিয়া শাস্ত্রীজী তাঁহার উপর বিষম বিরক্ত হন; বলেন—"কি! এই দুই দিনের সংসারে পেটের দায়ে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করা—এ কি হীন বুদ্ধি! মরিতে তো একদিন হইবেই—না হয় মরিয়াই যাইতেন।" ইঁহাকেই আবার লোকে বড় লোক বলে এবং ইঁহার গ্রন্থ আদর করিয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া শাস্ত্রীজীর মনে বিষম ঘৃণার উদয় হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত আর অধিক বাক্যালাপে বিরত হন।

ঠাকুর ও মাইকেল-সংবাদ

অতঃপর মধুসূদন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে কিছু ধর্মোপদেশ শুনিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুর আমাদের বলিতেন—"(আমার) মুখ যেন কে চেপে ধরলে, কিছু বলতে দিলে না!" হৃদয় প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ঐ ভাব চলিয়া গিয়াছিল এবং তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকদিগের কয়েকটি পদাবলী মধুর স্বরে গাহিয়া মধুসূদনের মন মোহিত করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যপদেশে তাঁহাকে, ভগবদ্ভক্তিই যে সংসারে একমাত্র সার পদার্থ, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শাস্ত্রীর নিজ মত দেওয়ালে লিখিয়া রাখা

মাইকেল বিদায় গ্রহণ করিবার পরেও শাস্ত্রীজী মাইকেলের ঐরূপে স্বধর্মত্যাগের কথা আলোচনা করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন, এবং পেটের দায়ে স্বধর্মত্যাগ করা যে অতি হীনবুদ্ধির কাজ, এ কথা ঠাকুরের ঘরে ঢুকিবার দরজার পূর্ব দিকের দালানের দেওয়ালের গায়ে একখণ্ড কয়লা দিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখেন। দেওয়ালের গায়ে সুস্পষ্ট বড় বড় বাঙলা অক্ষরে লেখা শাস্ত্রীর ঐ বিষয়ক মনোভাব আমাদের অনেকেরই নজরে পড়িয়া আমাদিগকে কৌতূহলাক্রান্ত করিত। পরে একদিন জিজ্ঞাসায় সকল কথা জানিতে পারিলাম। শাস্ত্রী অনেক দিন এ দেশে থাকায় বাঙলা ভাষা বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রীর সন্ন্যাসগ্রহণ ও তপস্যা

এইবার শাস্ত্রীর জীবনের শেষ কথা। সুযোগ বুঝিয়া শাস্ত্রীজী একদিন ঠাকুরকে নির্জনে পাইয়া নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলেন এবং 'নাছোড়বান্দা' হইয়া ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতে হইবে। ঠাকুরও তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে সম্মত হইয়া শুভদিনে তাঁহাকে ঐ দীক্ষাপ্রদান করিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রী আর কালীবাটীতে রহিলেন না। বশিষ্ঠাশ্রমে বসিয়া সিদ্ধকাম না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মোপলব্ধির চেষ্টায় প্রাণপাত করিবেন বলিয়া ঠাকুরের নিকট মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন এবং সজলনয়নে তাঁহার আশীর্বাদভিক্ষা ও শ্রীচরণবন্দনান্তে চিরদিনের মতো দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; ইহার পর নারায়ণ শাস্ত্রীর কোন নিশ্চিত সংবাদই আর পাওয়া গেল না। কেহ কেহ বলেন, বশিষ্ঠাশ্রমে অবস্থান করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে করিতে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত হয় এবং ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

সাধু ও সাধকদিগকে দেখিতে যাওয়া ঠাকুরের স্বভাব ছিল

আবার যথার্থ সাধু, সাধক বা ভগবদ্ভক্ত যে কোন সম্প্রদায়ের হউন না কেন, কোন স্থানে বাস করিতেছেন শুনিলেই ঠাকুরের তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইত এবং ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হইলে অযাচিত হইয়াও তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে কিছুকাল কাটাইয়া আসিতেন। লোকে ভাল বা মন্দ বলিবে, অপরিচিত সাধক তাঁহার যাওয়ায় সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, আপনি তথায় যথাযথ সম্মানিত হইবেন কি না—এ সকল চিন্তার একটিরও তখন আর তাঁহার মনে উদয় হইত না। কোনরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত সাধক কি ভাবের লোক ও নিজ গন্তব্য পথে কতদূরই বা অগ্রসর হইয়াছেন ইত্যাদি সকল কথা জানিয়া, বুঝিয়া, একটা স্থির মীমাংসায় উপনীত হইয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিতদিগের কথা শুনিলেও ঠাকুর অনেক সময় ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি অনেককে ঠাকুর ঐভাবে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কথা আমাদিগকে অনেক সময় গল্পচ্ছলে বলিতেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত পদ্মলোচনের কথাই আমরা এখন পাঠককে বলিতেছি।

বঙ্গে ন্যায়ের প্রবেশ-কারণ

ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলায় বেদান্তশাস্ত্রের চর্চা অতীব বিরল ছিল। আচার্য শঙ্কর বহু শতাব্দী পূর্বে বঙ্গের তান্ত্রিকদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিলেও সাধারণে নিজমত বড় একটা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফলে এদেশের তন্ত্র অদ্বৈতভাবরূপ বেদান্তের মূল তত্ত্বটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া নিজ উপাসনাপ্রণালীর ভিতর উহার কিছু কিছু প্রবিষ্ট করাইয়া জনসাধারণে পূর্ববৎ পূজাদির প্রচার করিতেই

থাকে এবং বাংলার পণ্ডিতগণ ন্যায়দর্শনের আলোচনাতেই নিজ উর্বর মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে থাকিয়া কালে নব্য ন্যায়ের সৃজন করতঃ উক্ত দর্শনের রাজ্যে অদ্‌ভুত যুগবিপর্যয় আনয়ন করেন। আচার্য শঙ্করের নিকট তর্কে পরাজিত ও অপদস্থ হইয়াই কি বাঙালী জাতির ভিতর তর্কশাস্ত্রের আলোচনা এত অধিক বাড়িয়া যায়—কে বলিবে? তবে জাতিবিশেষের নিকট কোন বিষয়ে পরাজিত হইয়া অভিমানে অপমানে পরাজিত জাতির ভিতরে ঐ বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টার উদয় জগৎ অনেকবার দেখিয়াছে।

বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচন

তন্ত্র ও ন্যায়ের রঙ্গভূমি বঙ্গে ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে বেদান্তচর্চা ঐরূপে বিরল থাকিলেও, কেহ কেহ যে উহার উদার মীমাংসাসকলের অনুশীলনে আকৃষ্ট হইতেন না, তাহা নহে। পণ্ডিত পদ্মলোচন ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। ন্যায়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবার পর পণ্ডিতজীর বেদান্তদর্শন-পাঠে ইচ্ছা হয় এবং তজ্জন্য ৺কাশীধামে গমন করিয়া গুরুগৃহে বাসকরতঃ তিনি দীর্ঘকাল ঐ দর্শনের চর্চায় কালাতিপাত করেন। ফলে, কয়েক বৎসর পরেই তিনি বৈদান্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং দেশে আগমন করিবার পর বর্ধমানাধিপের দ্বারা আহূত হইয়া তদীয় সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। পণ্ডিতজীর অদ্‌ভুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বর্ধমানরাজ তাঁহাকে ক্রমে প্রধান সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার সুযশ বঙ্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়।

পণ্ডিতের অদ্‌ভুত প্রতিভার দৃষ্টান্ত

পণ্ডিতজীর অদ্‌ভুত প্রতিভা সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ে একদেশী ভাব বুদ্ধিহীনতা হইতেই উপস্থিত হয়—এই প্রসঙ্গে ঠাকুর পণ্ডিতজীর ঐ কথা কখন কখন আমাদের নিকট উল্লেখ করিতেন। কারণ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ ঠাকুর কাহারও নিকট হইতে কখন কোন মনোমত উদারভাব-প্রকাশক কথা শুনিলে উহা স্মরণ করিয়া রাখিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে উহার উল্লেখকালে যাহার নিকটে তিনি উহা প্রথম শুনিয়াছিলেন, তাহার নামটিও বলিতেন।

'শিব বড় কি বিষ্ণু বড়'

ঠাকুর বলিতেন, বর্ধমান-রাজসভায় পণ্ডিতদিগের ভিতর 'শিব বড় কি বিষ্ণু বড়'—এই কথা লইয়া এক সময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত পদ্মলোচন তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত পণ্ডিতসকল নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান, ও বোধ হয় অভিরুচি-সহায়ে কেহ এক দেবতাকে, আবার কেহ বা অন্য দেবতাকে বড় বলিয়া নির্দেশ করিয়া বিষম কোলাহল উপস্থিত করিলেন। এইরূপে শৈব ও বৈষ্ণব উভয়পক্ষে দ্বন্দ্বই চলিতে লাগিল, কিন্তু কথাটার একটা সুমীমাংসা আর পাওয়া গেল না। কাজেই প্রধান সভাপণ্ডিতের তখন উহার মীমাংসা করিবার জন্য ডাক পড়িল। পণ্ডিত পদ্মলোচন সভাতে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন শুনিয়াই বলিলেন—"আমার চৌদ্দপুরুষে কেহ শিবকেও কখনও দেখেনি, বিষ্ণুকেও কখনও দেখেনি; অতএব কে বড় কে ছোট, তা কেমন করে বলব? তবে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাও তো এই বলতে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বাড়িয়েছে; অতএব যার যে ইষ্ট, তার কাছে সেই দেবতাই অন্য সকল দেবতা অপেক্ষা বড়।" এই বলিয়া পণ্ডিতজী শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই সর্বদেবতাপেক্ষা প্রাধান্যসূচক শ্লোকগুলি প্রমাণস্বরূপে উদ্‌ধৃত করিয়া উভয়কেই সমান বড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। পণ্ডিতজীর ঐরূপ সিদ্ধান্তে তখন বিবাদ মিটিয়া গেল এবং সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজীর ঐরূপ আড়ম্বরশূন্য সরল শাস্ত্রজ্ঞান ও স্পষ্টবাদিত্বেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আমরা বিলক্ষণ পাইয়া থাকি এবং তাঁহার এত সুনাম ও প্রসিদ্ধি যে কেন হইয়াছিল, তাহার কারণ বুঝিতে পারি।

পণ্ডিতের ঈশ্বরানুরাগ

শব্দজালরূপ মহারণ্যে বহুদূর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে পণ্ডিতজীর এত সুখ্যাতিলাভ হইয়াছিল তাহা নহে। লোকে দৈনন্দিন জীবনেও তাঁহাতে সদাচার, ইষ্টনিষ্ঠা, তপস্যা, উদারতা, নির্লিপ্ততা

প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির পুনঃপুনঃ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট সাধক বা ঈশ্বর-প্রেমিক বলিয়া স্থির করিয়াছিল। যথার্থ পাণ্ডিত্য ও গভীর ঈশ্বরভক্তির একত্র সমাবেশ সংসারে দুর্লভ; অতএব তদুভয় কোথাও একত্র পাইলে লোকে ঐ পাত্রের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। অতএব লোক-পরম্পরায় ঐসকল কথা শুনিয়া ঠাকুরের ঐ সুপুরুষকে যে দেখিতে ইচ্ছা হইবে, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ঠাকুরের মনে যখন ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয়, তখন পণ্ডিতজী প্রৌঢ়াবস্থা প্রায় অতিক্রম করিতে চলিয়াছেন এবং বর্ধমান-রাজসরকারে অনেক কাল সসম্মানে নিযুক্ত আছেন।

ঠাকুরের মনের স্বভাব ও পণ্ডিতের কলিকাতায় আগমন

ঠাকুরের মনে যখনি যে কার্য করিবার ইচ্ছা হইত, তখনি তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বালকের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। 'জীবন ক্ষণস্থায়ী, যাহা করিবার শীঘ্র করিয়া লও'—বাল্যাবধি মনকে ঐ কথা বুঝাইয়া তীব্র অনুরাগে সকল কার্য করিবার ফলেই বোধ হয় ঠাকুরের মনের ঐরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। আবার একনিষ্ঠা ও একাগ্রতা-অভ্যাসের ফলেও যে মন ঐরূপ স্বভাবাপন্ন হয়, এ কথা অল্প চিন্তাতেই বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহাকে বর্ধমানে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল, পণ্ডিত পদ্মলোচনের শরীর দীর্ঘকাল অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে আড়িয়াদহের নিকট গঙ্গাতীরবর্তী একটি বাগানে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং গঙ্গার নির্মল বায়ু-সেবনে তাঁহার শরীরও পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল আছে। সংবাদ যথার্থ কি না, জানিবার জন্য হৃদয় প্রেরিত হইল।

হৃদয় ফিরিয়া সংবাদ দিল—কথা যথার্থ, পণ্ডিতজী ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং হৃদয়কে তাঁহার আত্মীয় জানিয়া বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। তখন দিন স্থির হইল। ঠাকুর পণ্ডিতজীকে দেখিতে চলিলেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে চলিল।

পণ্ডিতের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন

হৃদয় বলেন, প্রথম মিলন হইতেই ঠাকুর ও পণ্ডিতজী পরস্পরের দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অমায়িক, উদার-স্বভাব, সুপণ্ডিত ও সাধক বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; এবং পণ্ডিতজীও ঠাকুরকে অদ্‌ভুত আধ্যাত্মিক অবস্থায় উপনীত মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মা-র নামগান শুনিয়া পণ্ডিতজী অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং সমাধিতে মুহুর্মুহুঃ বাহ্য চৈতন্যের লোপ হইতে দেখিয়া এবং ঐ অবস্থায় ঠাকুরের কিরূপ উপলব্ধিসমূহ হয়, সে সকল কথা শুনিয়া পণ্ডিতজী নির্বাক হইয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকলের সহিত ঠাকুরের অবস্থা মিলাইয়া লইতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ঐরূপ করিতে যাইয়া তিনি যে সেদিন ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন এবং কোন একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ইহাও সুনিশ্চিত। কারণ ঠাকুরের চরম উপলব্ধিসকল শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে না পাইয়া তিনি শাস্ত্রের কথা সত্য অথবা ঠাকুরের উপলব্ধি সত্য, ইহা স্থির করিতে পারেন নাই। অতএব শাস্ত্রজ্ঞান ও নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসহায়ে আধ্যাত্মিক সর্ববিষয়ে সর্বদা স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত পণ্ডিতজীর বিচারশীল মন ঠাকুরের সহিত পরিচয়ে আলোকের ভিতর একটা অন্ধকারের ছায়ার মতো অপূর্ব আনন্দের ভিতরে একটা অশান্তির ভাব উপলব্ধি করিয়াছিল।

পণ্ডিতের ভক্তি-শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির কারণ

প্রথম পরিচয়ের এই প্রীতি ও আকর্ষণে ঠাকুর ও পণ্ডিতজী আরও কয়েকবার একত্র মিলিত হইয়াছিলেন; এবং উহার ফলে পণ্ডিতজীর ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থাবিষয়ক ধারণা অপূর্ব গভীর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতজীর ঐরূপ দৃঢ় ধারণা হইবার একটি বিশেষ কারণও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি।

পণ্ডিত পদ্মলোচন বেদান্তোক্ত জ্ঞানবিচারের সহিত তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালীর বহুকাল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিলেন; এবং ঐরূপ অনুষ্ঠানের ফলও কিছু কিছু জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন,

জগদম্বা তাঁহাকে পণ্ডিতজীর সাধনালব্ধ শক্তিসম্বন্ধে একটি গোপনীয় কথা ঐ সময়ে জানাইয়া দেন। তিনি জানিতে পারেন, সাধনায় প্রসন্না হইয়া পণ্ডিতজীর ইষ্টদেবী তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এতকাল ধরিয়া অগণ্য পণ্ডিতসভায় অপর সকলের অজেয় হইয়া আপন প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন! পণ্ডিতজীর নিকটে সর্বদা একটি জলপূর্ণ গাড়ু ও একখানি গামছা থাকিত; এবং কোন প্রশ্নের মীমাংসায় অগ্রসর হইবার পূর্বে উহা হস্তে লইয়া ইতস্ততঃ কয়েক পদ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া মুখপ্রক্ষালন ও মোক্ষণ করতঃ তৎকার্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবহমান কাল হইতে তাঁহার রীতি ছিল। তাঁহার ঐ রীতি বা অভ্যাসের কারণানুসন্ধানে কাহারও কখনও কৌতূহল হয় নাই এবং উহার যে কোন নিগূঢ় কারণ আছে, তাহাও কেহ কখনও কল্পনা করে নাই। তাঁহার ইষ্টদেবীর নিয়োগানুসারেই যে তিনি ঐরূপ করিতেন এবং ঐরূপ করিলেই যে তাঁহাতে শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দৈববলে সম্যক জাগরিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অন্যের অজেয় করিয়া তুলিত, পণ্ডিতজী একথা কাহারও নিকটে—এমনকি নিজ সহধর্মিণীর নিকটেও কখনও প্রকাশ করেন নাই। পণ্ডিতজীর ইষ্টদেবী তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিভৃতে প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনিও তদবধি এতকাল ধরিয়া উহা অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে উহার ফল প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

ঠাকুরের পণ্ডিতের সিদ্ধাই জানিতে পারা

ঠাকুর বলিতেন—জগদম্বার কৃপায় ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি অবসর বুঝিয়া একদিন পণ্ডিতজীর গাড়ু, গামছা তাঁহার অজ্ঞাতসারে লুকাইয়া রাখেন এবং পণ্ডিতজীও তদভাবে উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া উহার অন্বেষণেই ব্যস্ত হন। পরে যখন জানিতে পারিলেন ঠাকুর ঐরূপ করিয়াছেন তখন আর পণ্ডিতজীর আশ্চর্যের সীমা থাকে নাই! আবার যখন বুঝিলেন ঠাকুর সকল কথা জানিয়া শুনিয়াই ঐরূপ করিয়াছেন, তখন পণ্ডিতজী আর থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিজ ইষ্টজ্ঞানে সজলনয়নে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। তদবধি পণ্ডিতজী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া জ্ঞান ও তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, "পদ্মলোচন অত বড় পণ্ডিত হয়েও এখানে (আমাতে) এতটা বিশ্বাস ভক্তি করত! বলেছিল—'আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে সভা করে সকলকে বলব, তুমি ঈশ্বরাবতার; আমার কথা কে কাটতে পারে দেখব।' মথুর (এক সময়ে অন্য কারণে) যত পণ্ডিতদের ডাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভার যোগাড় করছিল। পদ্মলোচন নির্লোভ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ; সভায় আসবে না ভেবে আসবার জন্য অনুরোধ করতে বলেছিল! মথুরের কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'হ্যাঁগো, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে না?' তাইতে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি! কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা'!"

পণ্ডিতের কাশীধামে শরীর-ত্যাগ

মথুরবাবুর আহূত সভায় কিন্তু পণ্ডিতজীকে যাইতে হয় নাই। সভা আহূত হইবার পূর্বেই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সজলনয়নে ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে গমন করেন। শুনা যায়, সেখানে অল্পকাল পরেই তাঁহার শরীরত্যাগ হয়।

ইহার বহুকাল পরে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তেরা যখন তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে এবং ভক্তির উত্তেজনায় তাহাদের ভিতর কেহ কেহ ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রকাশ্যে নির্দেশ করিতেছে, তখন ঐসকল ভক্তের ঐরূপ ব্যবহার জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান; এবং ভক্তির আতিশয্যে তাহারা ঐ কার্যে বিরত হয় নাই, কয়েকদিন পরে এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হইয়া একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বললেন। ওরা মনে করে 'অবতার' বলে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় করলে! কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি? ওদের এখানে আসবার ও অবতার বলবার ঢের আগে পদ্মলোচনের মতো লোক—যারা সারা জীবন ঐ বিষয়ের চর্চায় কাল কাটিয়েছে—কেউ ছ-টা দর্শনে পণ্ডিত, কেউ তিনটে দর্শনে পণ্ডিত—কত সব এখানে এসে অবতার বলে গেছে। অবতার বলা তুচ্ছজ্ঞান হয়ে গেছে। ওরা অবতার বলে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল্?"

পদ্মলোচন ভিন্ন আরও অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতদিগের সহিত ঠাকুরের সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের ভিতরে ঠাকুর যে সকল বিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন, কথাপ্রসঙ্গে তাহাও তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে বলিতেন। ঐরূপ কয়েকটির কথাও সংক্ষেপে এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

দয়ানন্দের সম্বন্ধে ঠাকুর

আর্যমত-প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এক সময়ে বঙ্গদেশে বেড়াইতে আসিয়া কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরের সিঁতি নামক পল্লীতে জনৈক ভদ্রলোকের উদ্যানে কিছুকাল বাস করেন। সুপণ্ডিত বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তখনও তিনি নিজের মত প্রচার করিয়া দলগঠন করেন নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া ঠাকুর একদিন ঐ স্থানে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দয়ানন্দের কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "সিঁতির বাগানে দেখতে গিয়েছিলাম; দেখলাম—একটু শক্তি হয়েছে; বুকটা সর্বদা লাল হয়ে রয়েচে; বৈখরী অবস্থা—দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই কথা (শাস্ত্রকথা) কচ্চে; ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার (শাস্ত্রবাক্যের) মানে সব উলটো-পালটা করতে লাগল; নিজে একটা কিছু করব, একটা মত চালাব—এ অহঙ্কার ভেতরে রয়েচে!"

জয়নারায়ণ পণ্ডিত

জয়নারায়ণ পণ্ডিতের কথায় ঠাকুর বলিতেন, "অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু অহঙ্কার ছিল না; নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে বলেছিল, কাশী যাবে ও সেখানে দেহ রাখবে—তাই হয়েছিল।"

রামভক্ত কৃষ্ণকিশোর

আড়িয়াদহ-নিবাসী কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্যের শ্রীরামচন্দ্রে পরম ভক্তির কথা ঠাকুর অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। কৃষ্ণকিশোরের বাটীতে ঠাকুরের গমনাগমন ছিল এবং তাঁহার পরম ভক্তিমতী সহধর্মিণীও ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। রামনামে ভক্তির তো কথাই নাই, ঠাকুর বলিতেন—কৃষ্ণকিশোর 'মরা' 'মরা' শব্দটিকেও ঋষিপ্রদত্ত মহামন্ত্রজ্ঞানে বিশেষ ভক্তি করিতেন। কারণ, পুরাণে লিখিত আছে, ঐ শব্দই মন্ত্ররূপে নারদ ঋষি দস্যু বাল্মীকিকে দিয়াছিলেন এবং উহার বারংবার ভক্তিপূর্বক উচ্চারণের ফলেই বাল্মীকির মনে শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব লীলার স্ফূর্তি হইয়া তাঁহাকে রামায়ণপ্রণেতা কবি করিয়াছিল। কৃষ্ণকিশোর সংসারে শোকতাপও অনেক পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হয়। ঠাকুর বলিতেন, পুত্রশোকের এমনি প্রভাব, অত বড় বিশ্বাসী ভক্ত কৃষ্ণকিশোরও তাহাতে প্রথম প্রথম সামলাইতে না পারিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত সাধকগণ ভিন্ন ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকেও দেখিতে গিয়াছিলেন; এবং মহর্ষির উদার ভক্তি ও ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মযোগপরায়ণতার কথা আমাদের নিকট সময়ে সময়ে উল্লেখ করিতেন।

[1] 'রামলালা' অর্থাৎ বালকবেশী শ্রীরামচন্দ্র। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লোকে বালকবালিকাদের আদর করিয়া লাল বা লালা ও লালী বলিয়া ডাকে। সেজন্য শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যাবস্থার পরিচায়ক ঐ অষ্টধাতুনির্মিত মূর্তিটিকে উক্ত বাবাজী 'রামলালা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বঙ্গভাষায়ও 'দুলাল', 'দুলালী' প্রভৃতি শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

[2] "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" – বৃক্ষপ্রস্তরাদি জড়পদার্থসকলেরও চৈতন্য আছে; উহাদের ভিতরেও সুখদুঃখের অনুভূতি বর্তমান।

[3] ইনি কয়েক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। কালীঘাটে অনেক সময় থাকিতেন এবং অচলানন্দনাথ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি অনেকগুলি শিষ্য-প্রশিষ্য রাখিয়া যান। ইঁহার দেহত্যাগের পর শিষ্যেরা কালীঘাটের নিকটবর্তী গ্রামান্তরে মহাসমারোহে তাঁহার শরীরের মৃৎসমাধি দেয়।

[4] গলির নাম মধু রায়ের গলি।

[5]সাধকভাব (১০ম সংস্করণ) দ্রষ্টব্য – প্রঃ।

৪.৪. তৃতীয় অধ্যায়: গুরুভাবে তীর্থভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

– গীতা, ১০।৪১

অপরাপর আচার্য পুরুষদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের জীবনের অদ্ভুত নূতনত্ব

গুরুভাবের প্রেরণায় ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কত স্থানে কত লোকের সহিত কত প্রকারে যে লীলা করিয়াছিলেন তাহার সমুদয় লিপিবদ্ধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। উহার কিছু কিছু ইতঃপূর্বেই আমরা পাঠককে উপহার দিয়াছি। ঠাকুরের তীর্থভ্রমণও ঐ ভাবেই হইয়াছিল। এখন আমরা পাঠককে উহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

আমরা যতদূর দেখিয়াছি ঠাকুরের কোন কার্যটিই উদ্দেশ্যবিহীন বা নিরর্থক ছিল না। তাঁহার জীবনের অতি সামান্য সামান্য দৈনিক ব্যবহারগুলির পর্যালোচনা করিলেও গভীর ভাবপূর্ণ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—বিশেষ ঘটনাগুলির তো কথাই নাই। আবার এমন অঘটন-ঘটনাবলী-পরিপূর্ণ জীবন বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক জগতে আর একটিও দেখা যায় নাই। আজীবন তপস্যা ও চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের অনন্তভাবের কোন একটির সম্যক উপলব্ধিই মানুষ করিয়া উঠিতে পারে না, তা নানাভাবে তাঁহার উপলব্ধি ও দর্শন করা—সকল প্রকার ধর্মমত সাধনসহায়ে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করা এবং সকল মতের সাধকদিগকেই নিজ নিজ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করা! আধ্যাত্মিক জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা দূরে থাকুক, কখনও কি আর শুনা গিয়াছে? প্রাচীন যুগের ঋষি আচার্য বা অবতার মহাপুরুষেরা এক একটি বিশেষ বিশেষ ভাবরূপ পথাবলম্বনে স্বয়ং ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া তত্তৎ ভাবকেই ঈশ্বরদর্শনের একমাত্র পথ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; অপরাপর নানা ভাবাবলম্বনেও যে ঈশ্বরের উপলব্ধি করা যাইতে পারে, এ কথা উপলব্ধি করিবার অবসর পান নাই। অথবা নিজেরা ঐ সত্যের অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলেও তৎপ্রচারে জনসাধারণের ইষ্টনিষ্ঠার দৃঢ়তা কমিয়া যাইয়া তাহাদের ধর্মোপলব্ধির অনিষ্ট সাধিত হইবে—এই ভাবিয়া সর্বসমক্ষে ঐ বিষয়টির ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু যাহা ভাবিয়াই তাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকুন, তাঁহারা যে তাঁহাদের গুরুভাব-সহায়ে একদেশী ধর্মমতসমূহই প্রচার করিয়াছিলেন এবং কালে উহাই যে মানবমনে ঈর্ষাদ্বেষাদির বিপুল প্রসার আনয়ন করিয়া অনন্ত বিবাদ এবং অনেক সময়ে রক্তপাতেরও হেতু হইয়াছিল, ইতিহাস এ বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য দিতেছে।

ঠাকুর নিজ জীবনে কি সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উদার মত ভবিষ্যতে কতদূর প্রসারিত হইবে

শুধু তাহাই নহে, ঐরূপ একঘেয়ে একদেশী ধর্মভাব-প্রচারে পরস্পরবিরোধী নানা মতের উৎপত্তি হইয়া ঈশ্বরলাভের পথকে এতই জটিল করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে জটিলতা ভেদ করিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই সাধারণ বুদ্ধির প্রতীত হইতেছিল! ইহকালাবসায়ী ভোগৈকসর্বস্ব পাশ্চাত্যের জড়বাদ আবার সময় বুঝিয়াই যেন দুর্দমনীয় বেগে শিক্ষার ভিতর দিয়া ঠাকুরের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব হইতে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া তরলমতি বালক ও যুবকদিগের মন কলুষিত করিয়া নাস্তিকতা, ভোগানুরাগ প্রভৃতি নানা বৈদেশিক ভাবে দেশ প্লাবিত করিতেছিল। পবিত্রতা, ত্যাগ ও ঈশ্বরানুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ এ অলৌকিক ঠাকুরের আবির্ভাবে ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে দুর্দশা কতদূর গড়াইত তাহা কে বলিতে পারে? ঠাকুর স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইলেন যে, ভারত এবং ভারতেতর দেশে প্রাচীন যুগে যত ঋষি, আচার্য, অবতার মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া যত প্রকার ভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়াছেন এবং ধর্মজগতের ঈশ্বরলাভের যত প্রকার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার কোনটিই মিথ্যা নহে—প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ সত্য; বিশ্বাসী সাধক ঐ ঐ পথাবলম্বনে অগ্রসর হইয়া এখনও তাঁহাদের ন্যায় ঈশ্বরদর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারেন।—দেখাইলেন যে, পরস্পরবিরুদ্ধ সামাজিক আচার, রীতিনীতি প্রভৃতি লইয়া ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর পর্বত-সদৃশ ব্যবধান বিদ্যমান

থাকিলেও উভয়ের ধর্মই সত্য; উভয়েই এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপাসনা করিয়া, বিভিন্ন পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া, কালে সেই প্রেমস্বরূপের সহিত প্রেমে এক হইয়া যায়। দেখাইলেন যে, ঐ সত্যের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই উহারা উভয়েই উভয়কে কালে সপ্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবে এবং বহু কালের বিবাদ ভুলিয়া শান্তিলাভ করিবে।—এবং দেখাইলেন যে, কালে ভোগলোলুপ পাশ্চাত্যও 'ত্যাগেই শান্তি' এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈশা-প্রচারিত ধর্মমতের সহিত ভারত এবং অন্যান্য প্রদেশের ঋষি এবং অবতারকুল-প্রচারিত ধর্মমতসমূহের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া নিজ কর্মজীবনের সহিত ধর্মজীবনের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়া ধন্য হইবে! এ অদ্‌ভুত ঠাকুরের জীবনালোচনায় আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই দেখিতে পাইব, ইনি দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা ধর্মবিশেষের সম্পত্তি নহেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই একদিন শান্তিলাভের জন্য ইঁহার উদারমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর ভাবরূপে তাহাদের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সমুদয় সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ভাঙিয়া চুরিয়া তাঁহার নবীন ছাঁচে ফেলিয়া তাহাদিগকে এক অপূর্ব একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিবেন।

এ বিষয়ে প্রমাণ

ভারতের পরস্পর-বিরোধী চিরবিবদমান যাবতীয় প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের সাধককুল ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যে তাঁহাতে নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে নিজ নিজ গন্তব্য পথেরই পথিক বলিয়া স্থির ধারণা করিয়াছিলেন, ইহাতে পূর্বোক্ত ভাবই সূচিত হইতেছে। ঠাকুরের গুরুভাবের যে কার্য এইরূপে ভারতে প্রথম প্রারব্ধ হইয়া ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়সমূহের ভিতর একতা আনিয়া দিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছে, সে কার্য যে শুধু ভারতের ধর্মবিবাদ ঘুচাইয়া নিরস্ত হইবে তাহা নহে—এশিয়ার ধর্মবিবাদ, ইউরোপের ধর্মহীনতা ও ধর্মবিদ্বেষ সমস্তই ধীর স্থির পদসঞ্চারে শনৈঃ শনৈঃ তিরোহিত করিয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব শান্তির রাজ্য স্থাপন করিবে। দেখিতেছ না, ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর হইতে ঐ কার্য কত দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে? দেখিতেছ না, কিরূপে গুরুগতপ্রাণ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে ঠাকুরের ভাব প্রবেশলাভ করিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই চিন্তাজগতে কি যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যতই চলিয়া যাইবে ততই এ অমোঘ ভাবরাশি সকল জাতির ভিতর, সকল ধর্মের ভিতর, সকল সমাজের ভিতর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্‌ভুত যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিবে। কাহার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে? অদৃষ্টপূর্ব তপস্যা ও পবিত্রতার সাত্ত্বিক তেজোদ্দীপ্ত এ ভাবরাশির সীমা কে উল্লঙ্ঘন করিবে? যে সকল যন্ত্রসহায়ে উহা বর্তমানে প্রসারিত হইতেছে, সে সকল ভগ্ন হইবে, কোথা হইতে ইহা প্রথম উত্থিত হইল তাহাও হয়তো বহুকাল পরে অনেকে ধরিতে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু এ অনন্তমহিমোজ্জ্বল ভাবময় ঠাকুরের স্নিগ্ধোদ্দীপ্ত ভাবরাশি হৃদয়ে যত্নে পোষণ করিয়া তাঁহারই ছাঁচে জীবন গঠিত করিয়া পৃথিবীর সকলকেই একদিন ধন্য হইতে হইবে নিশ্চয়।

ঠাকুরের ভাবপ্রসার কিরূপে বুঝিতে হইবে

অতএব ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধককুলের ঠাকুরের নিকট আগমন ও যথার্থ ধর্মলাভ করিয়া ধন্য হইবার যে সকল কথা আমরা তোমাকে উপহার দিতেছি, হে পাঠক, কেবলমাত্র ভাসাভাসা ভাবে গল্পের মতো ঐ সকল পাঠ করিয়াই নিরস্ত থাকিও না। ভাবমুখে অবস্থিত এ অলৌকিক ঠাকুরের দিব্য ভাবরাশি প্রথম যথাসম্ভব ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা কর; পরে ঐ সকল কথার ভিতর তলাইয়া দেখিতে থাক কিরূপে ঐ ভাবরাশির প্রসার আরম্ভ হইল, কিরূপেই বা উহা পরিপুষ্ট হইয়া প্রথম পুরাতন, পরে নবীন ভাবে শিক্ষিত জনসমূহের ভিতর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিল এবং কিরূপেই বা পরে উহা ভারত হইতে ভারতেতর দেশে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর ভাবজগতে যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

ঠাকুরের ভাবের প্রথম প্রচার হয় দক্ষিণেশ্বরাগত এবং তীর্থে দৃষ্ট সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের ভিতরে

ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধককুলকে লইয়াই ঠাকুরের ভাবরাশির প্রথম বিস্তার। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর যখন যে যে ভাবে সিদ্ধ হইয়াছিলেন তখন সেই সেই ভাবের ভাবুক সাধককুল তাঁহার নিকট স্বতঃপ্রেরিত হইয়া আগমনপূর্বক তত্তৎ ভাবের পূর্ণাদর্শ তাঁহাতে অবলোকন ও তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মথুরবাবু ও তৎপত্নী পরম ভক্তিমতী জগদম্বা দাসীর অনুরোধে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন পর্যন্ত তীর্থপর্যটনে গমন করিয়াছিলেন। কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থে সাধুভক্তের অভাব নাই। অতএব তত্তৎস্থানেও যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধকেরা ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গুরুভাবসহায়ে ধন্য হইয়াছিলেন এ কথা শুধু যে আমরা অনুমান করিতে পারি তাহাই নহে, কিন্তু উহার কিছু কিছু আভাস তাঁহার শ্রীমুখেও শুনিতে পাইয়াছি। তাহারও কিছু কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

জীবনে উচ্চাবচ নানা অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়া নানা শিক্ষা পাইয়াই ঠাকুরের ভিতর অপূর্ব আচার্যত্ব ফুটিয়া উঠে

ঠাকুর বলিতেন, "ঘুঁটি সব ঘর ঘুরে তবে চিকে ওঠে; মেথর থেকে রাজা অবধি সংসারে যত রকম অবস্থা আছে সে সমুদয় দেখে শুনে, ভোগ করে, তুচ্ছ বলে ঠিক ঠিক ধারণা হলে তবে পরমহংস অবস্থা হয়, যথার্থ জ্ঞানী হয়!" এ তো গেল সাধকের নিজের চরমজ্ঞানে উপনীত হইবার কথা। আবার লোকশিক্ষা বা জনসাধারণের যথার্থ শিক্ষক হইতে হইলে কিরূপ হওয়া আবশ্যক তৎসম্বন্ধে বলিতেন, "আত্মহত্যা একটা নরুন দিয়ে করা যায়; কিন্তু পরকে মারতে হলে (শত্রুজয়ের জন্য) ঢাল খাঁড়ার দরকার হয়।" ঠিক ঠিক আচার্য হইতে গেলে তাঁহাকে সব রকম সংস্কারের ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে শিক্ষালাভ করিয়া অপর সাধারণাপেক্ষা সমধিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়। "অবতার, সিদ্ধপুরুষ এবং জীবে শক্তি লইয়াই প্রভেদ"—ঠাকুর এ কথা বারংবার আমাদের বলিয়াছেন। দেখ না, ব্যবহারিক রাজনৈতিকাদি জগতে বিসমার্ক, গ্লাডস্টোন প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে দেশের প্রাচীন ও বর্তমান সমস্ত ইতিহাস ও ঘটনাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইতরসাধারণাপেক্ষা কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়; ঐরূপে শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তো তাঁহারা পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর পরে বর্তমানকালে প্রচলিত কোন্ ভাবটি কিরূপ আকার ধারণ করিয়া দেশের জনসাধারণের অহিত করিবে তাহা ধরিতে বুঝিতে পারেন এবং সেজন্য এখন হইতে তদ্বিপরীত ভাবে এমন সকল কার্যের সূচনা করিয়া যান যাহাতে দীর্ঘকাল পরে ঐ ভাব প্রবল হইয়া দেশে ঐরূপ অমঙ্গল আর আনিতে পারে না! আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অবতার বা যথার্থ আচার্যপুরুষদিগকে প্রাচীন যুগের ঋষিরা পূর্ব পূর্ব যুগে কি কি আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবর্তনা করিয়া গিয়াছিলেন, এতদিন পরে ঐ সকল ভাব কিরূপ আকার ধারণ করিয়া জনসাধারণের কতটা ইষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে এবং বিকৃত হইয়া কতটা অনিষ্টই বা করিতেছে ও করিবে, ঐ সকল ভাবের ঐরূপে বিকৃত হইবার কারণই বা কি, বর্তমানে দেশে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব প্রবর্তিত হইয়াছে সে সকলও কালে বিকৃত হইতে হইতে দুই-এক শতাব্দী পরে কিরূপ আকার ধারণ করিয়া কিভাবে জনসাধারণের অধিকতর অহিতকর হইবে—এ সমস্ত কথা ঠিক ঠিক করিয়া বুঝিয়া নবীন ভাবের কার্য প্রবর্তন করিয়া যাইতে হয়। কারণ, ঐ সকল বিষয় যথার্থভাবে ধরিতে বুঝিতে না পারিলে সকলের বর্তমান অবস্থা ধরিবেন বুঝিবেন কিরূপে, এবং রোগ ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিলে তাহার ঔষধ প্রয়োগই বা কিরূপে করিবেন? সেজন্য তীব্র তপস্যাদি করিয়া পূর্বোক্ত ঔষধদানে আপনাকে শক্তিসম্পন্ন করা ভিন্ন আচার্যদিগকে সংসারে নানা অবস্থায় পড়িয়া যতটা শিক্ষালাভ করিতে হয়—ইতরসাধারণ সাধককে ততটা করিতে হয় না। দেখ না, ঠাকুরকে কত প্রকার অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল। দরিদ্রের কুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত, কালীবাটীর পূজকের পদগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া যৌবনে পরের দাসত্ব করা-রূপ হীনাবস্থার সহিত, সাধকাবস্থায় ভগবানের জন্য আত্মহারা হইয়া আত্মীয়-কুটুম্বদিগের তীব্র তিরস্কার লাঞ্ছনা অথবা গভীর মনস্তাপ এবং সাংসারিক অপর সাধারণের পাগল বলিয়া নিতান্ত উপেক্ষা বা করুণার সহিত, মথুরবাবুর তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয়ে রাজতুল্য ভোগ ও

সম্মানের সহিত, নানা সাধককুলের ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি ঢালিয়া দেওয়ায় দেবতুল্য পরম ঐশ্বর্যের সহিত—এইরূপ কতই না অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া ঐ সকল অবস্থাতে সর্বতোভাবে অবিচলিত থাকারূপ বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল! অনন্য অনুরাগ একদিকে যেমন তাঁহাকে ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব তীব্র তপস্যায় লাগাইয়া তাঁহার যোগপ্রসূত অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিল, সংসারের এই সকল নানা অবস্থার সহিত পরিচয়ও আবার তেমনি অপর দিকে তাঁহাকে বাহ্য বর্তমান জগতের সকল প্রকার অবস্থাপন্ন লোকের ভিতরের ভাব ঠিক ঠিক ধরিয়া বুঝিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহারে কুশলী এবং তাহাদের সকল প্রকার সুখ-দুঃখের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, ভিতরের ও বাহিরের ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই ঠাকুরের গুরুভাব বা আচার্যভাব দিন দিন অধিকতর বিকশিত ও পরিস্ফুট হইতে দেখা গিয়াছিল।

তীর্থ-ভ্রমণে ঠাকুর কি শিখিয়াছিলেন; ঠাকুরের ভিতর দেব ও মানব উভয় ভাব ছিল

তীর্থ-ভ্রমণও যে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ ফল উপস্থিত করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যুগাচার্য ঠাকুরের দেশের ইতরসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হওয়ার আবশ্যক ছিল। মথুরের সহিত তীর্থ-ভ্রমণে যাইয়া উহা যে অনেকটা সংসিদ্ধ হইয়াছিল এ বিষয় নিঃসন্দেহ। কারণ, অন্তর্জগতে ঠাকুরের যে প্রজ্ঞাচক্ষু মায়ার সমগ্র আবরণ ভেদ করিয়া সকলের অন্তর্নিহিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দর্শন স্পর্শন সর্বদা করিতে সমর্থ হইত, বহির্জগতে লৌকিক ব্যবহারের সম্পর্কে আসিয়া উহাই আবার এখন এক কথায় লোকের ভিতরের ভাব ধরিতে এবং দুই-চারিটি ঘটনা দেখিয়াই সমাজের ও দেশের অবস্থা বুঝিতে বিশেষ পটু হইয়াছিল। অবশ্য বুঝিতে হইবে, ঠাকুরের সাধারণ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি, নতুবা যোগবলে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া যখন তিনি দিব্যদৃষ্টি-সহায়ে ব্যক্তিগত, সমাজগত বা প্রদেশগত অবস্থার দর্শন ও উপলব্ধি করিতেন এবং কোন্ উপায় অবলম্বনে তাহাদের বর্তমান দুর্দশার অবসান হইবে তাহা সম্যক নির্ধারণ করিতেন, তখন ইতরসাধারণের ন্যায় বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিয়া শুনিয়া তুলনায় আলোচনা করিয়া কোন বিষয় জানিবার পারে তিনি চলিয়া যাইতেন এবং ঐরূপে ঐ বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণের তাঁহার আর প্রয়োজনই হইত না! দেব-মানব ঠাকুরকে আমরা সাধারণ বাহ্যদৃষ্টি এবং অসাধারণ যোগদৃষ্টি—উভয় দৃষ্টি সহায়েই সকল বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ করিতে দেখিয়াছি! সেজন্য দেবভাব ও মনুষ্যভাব উভয়বিধ ভাবের সম্যক বিকাশের পরিচয় পাঠককে না দিতে পারিলে এ অলৌকিক চরিত্রের একদেশী ছবিমাত্রই পাঠকের মনে অঙ্কিত হইবে। তজ্জন্য ঐ উভয়বিধ ভাবেই এই দেব-মানবের জীবনালোচনা করিতে আমাদের প্রয়াস।

ঠাকুরের ন্যায় দিব্যপুরুষদিগের তীর্থপর্যটনের কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন

শাস্ত্রদৃষ্টিতে ঠাকুরের তীর্থ-ভ্রমণের আর একটি কারণও পাওয়া যায়। শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম পুরুষেরা তীর্থে যাইয়া ঐ সকল স্থানের তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ সকল স্থানে ঈশ্বরের বিশেষ দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে আগমন ও অবস্থান করেন বলিয়াই সেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা ঐ ভাবের পূর্বপ্রকাশ সমধিক বর্ধিত হইয়া উঠে এবং মানবসাধারণ সেখানে উপস্থিত হইলে অতি সহজেই ঈশ্বরের ঐ ভাবের কিছু না কিছু উপলব্ধি করে। সিদ্ধ পুরুষদের সম্বন্ধেই যখন শাস্ত্র এ কথা বলিয়াছেন তখন তদপেক্ষা সমধিক শক্তিমান ঠাকুরের ন্যায় অবতারপুরুষদিগের তো কথাই নাই! তীর্থ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাটি ঠাকুর অনেক সময় আমাদিগকে তাঁহার সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেন। বলিতেন—"ওরে, যেখানে অনেক লোকে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাঁদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ! যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাতকো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না—যখন ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।"

তীর্থ ও দেবস্থান দেখিয়া 'জাবর কাটিবার' উপদেশ

আবার ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশযুক্ত ঐ সকল স্থান দর্শনাদির পর ঠাকুর আমাদিগকে 'জাবর কাটিতে' শিক্ষা দিতেন। বলিতেন—"গরু যেমন পেট ভরে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বসে সেই সব খাবার উগ্রে ভাল করে চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে জেগে ওঠে সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়; দেখে এসেই সে সব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপ-রসে মন দিতে নাই; তাহলে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।"

কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিতে ঠাকুরের সঙ্গে একবার আমাদের কেহ কেহ গমন করিয়াছিলেন। পীঠস্থানের বিশেষ প্রকাশ এবং ঠাকুরের শরীর-মনে শ্রীশ্রীজগন্মাতার জীবন্ত প্রকাশ উভয় মিলিত হইয়া ভক্তদিগের প্রাণে যে এক অপূর্ব উল্লাস আনয়ন করিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। দর্শনাদি করিয়া প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে ভক্তদিগের একজনকে বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্বশুরালয়ে গমন এবং সে রাত্রি তথায় যাপন করিতে হইল। পরদিন তিনি যখন পুনরায় ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন তখন ঠাকুর তাঁহাকে পূর্বরাত্রি কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার পূর্বোক্তরূপে শ্বশুরালয়ে থাকিবার কথা শুনিয়া বলিলেন, "সে কিরে? মাকে দর্শন করে এলি, কোথায় তাঁর দর্শন, তাঁর ভাব নিয়ে জাবর কাটবি, তা না করে রাতটা কিনা বিষয়ীর মতো শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে এলি? দেবস্থান তীর্থস্থান দর্শনাদি করে এসে সেই সব ভাব নিয়ে থাকতে হয়, জাবর কাটতে হয়, তা নইলে ওসব ঈশ্বরীয় ভাব প্রাণে দাঁড়াবে কেন?"

ভক্তিভাব পূর্বে হৃদয়ে আনিয়া তবে তীর্থে যাইতে হয়

আবার ঈশ্বরীয় ভাব ভক্তিভরে হৃদয়ে পূর্ব হইতে পোষণ না করিয়া তীর্থাদিতে যাইলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, সে সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেকবার আমাদের বলিয়াছেন। তাঁহার বর্তমানকালে আমাদের অনেকে অনেক সময়ে তীর্থাদিভ্রমণে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন, "ওরে যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই।"[1] আবার বলিতেন—"যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়; আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে? অনেক সময়ে শোনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে বা অন্য কোথায় পালিয়ে গিয়েছে; তারপর আবার শুনতে পাওয়া যায়, সে সেখানে চেষ্টা-বেষ্টা করে একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখেছে ও টাকা পাঠিয়েছে! তীর্থে বাস করতে গিয়ে কত লোকে সেখানে আবার দোকান-পাট-ব্যবসা ফেঁদে বসে। মথুরের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে দেখি, এখানেও যা সেখানেও তাই; এখানকার আমগাছ তেঁতুলগাছ বাঁশঝাড়টি যেমন, সেখানকার সেগুলিও তেমনি। তাই দেখে হৃদুকে বলেছিলাম, 'ওরে হৃদু, এখানে আর তবে কি দেখতে এলুম রে! সেখানেও যা এখানেও তাই! কেবল, মাঠে-ঘাটের বিষ্ঠাগুলো দেখে মনে হয় এখানকার লোকের হজমশক্তিটা ওদেশের লোকের চেয়ে অধিক'!"[2]

স্বামী বিবেকানন্দের বুদ্ধগয়াগমনে তথায় গমনোৎসুক জনৈক ভক্তকে ঠাকুর যাহা বলেন

পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি, গলরোগের চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা ঠাকুরকে প্রথম কলিকাতায় শ্যামপুকুর নামক পল্লীস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে এবং পরে কলিকাতার কিছু উত্তরে অবস্থিত কাশীপুর নামক স্থানে একটি বাগানবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। কাশীপুরের বাগানে আসিবার কয়েকদিন পরেই স্বামী বিবেকানন্দ একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া অপর দুইটি ভ্রাতার সহিত বুদ্ধগয়ায় গমন করেন। সে সময় আমাদের ভিতর ভগবান বুদ্ধদেবের অদ্ভুত জীবন এবং সংসারবৈরাগ্য, ত্যাগ ও তপস্যার আলোচনা দিবারাত্র চলিতেছিল। বাগানবাটীর নিম্নতলের দক্ষিণ দিককার যে ছোট ঘরটিতে আমরা সর্বদা উঠাবসা করিতাম, তাহার দেওয়ালের গায়ে—যতদিন সত্যলাভ না হয় ততদিন একাসনে বসিয়া ধ্যান-ধারণাদি করিব, ইহাতে শরীর যায় যাক—বুদ্ধদেবের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক 'ললিতবিস্তর'-এর একটি শ্লোক লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। দিবারাত্র ঐ কথাগুলি চক্ষের সামনে থাকিয়া সর্বদা আমাদের স্মরণ

করাইয়া দিত, আমাদেরও সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভের জন্য ঐরূপে প্রাণপাত করিতে হইবে। আমাদেরও –

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥[3]

– করিতে হইবে। দিবারাত্র ঐরূপ বৈরাগ্যালোচনা করিতে করিতে স্বামীজী সহসা বুদ্ধগয়ায় চলিয়া যাইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কবে ফিরিবেন সে কথা কাহাকেও জানাইলেন না। কাজেই আমাদের কাহারও কাহারও মনে হইল তিনি বুঝি আর সংসারে ফিরিবেন না, আর বুঝি তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইব না! পরে সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি গৈরিক ধারণ করিয়া বুদ্ধগয়ায় গিয়াছেন। আমাদের সকলের মন তখন হইতে স্বামীজীর প্রতি এমন বিশেষ আকৃষ্ট যে একদণ্ড তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকা বিষম যন্ত্রণাদায়ক, কাজেই মন চঞ্চল হইয়া অনেকের অনুক্ষণ পশ্চিমে স্বামীজীর নিকট যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের কানেও সে কথা উঠিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন একজনের ঐ বিষয়ে সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া ঠাকুরকে তাহার কথা বলিয়াই দিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন—"কেন ভাবছিস? কোথায় যাবে সে (স্বামীজী)? কদিন বাহিরে থাকতে পারবে? দেখ না এল বলে।" তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু (যথার্থ ধর্ম) নেই; যা কিছু আছে সব (নিজের শরীর দেখাইয়া) এইখানে!" 'এইখানে'—কথাটি ঠাকুর বোধ হয় দুই ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যথা—তাঁহার নিজের ভিতরে ধর্মভাবের, ঈশ্বরীয় ভাবের বর্তমানে যেরূপ বিশেষ প্রকাশ রহিয়াছে সেরূপ আর কোথাও নাই; অথবা প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই ঈশ্বর রহিয়াছেন; নিজের ভিতর তাঁহার প্রতি ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি ভাব উদ্দীপিত না করিতে পারিলে বাহিরে নানাস্থানে ঘুরিয়াও কিছুই লাভ হয় না। ঠাকুরের অনেক কথারই এইরূপ দুই বা ততোধিক ভাবের অর্থ পাওয়া যায়। শুধু ঠাকুরের কেন? জগতে যত অবতারপুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কথাতেই ঐরূপ বহু ভাব পাওয়া যায় এবং মানবসাধারণ যাহার যেরূপ অভিরুচি, যাহার যেরূপ সংস্কার ঐ সকল কথার সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন, তিনি কিন্তু এক্ষেত্রে ঐগুলির প্রথম অর্থই বুঝিলেন এবং ঠাকুরের ভিতরে ঈশ্বরীয় ভাবের যেরূপ প্রকাশ, এমন আর কুত্রাপি নাই এ কথা দৃঢ় ধারণা করিয়া নিশ্চিত মনে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও বাস্তবিক কয়েকদিন পরেই পুনরায় কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

'যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে'

পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রী-ভক্তও এক সময়ে ঠাকুরের শরীর রক্ষা করিবার কিছুকাল পূর্বে তাঁহার নিকটে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া কিছুকাল তপস্যাদি করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুর সে সময় তাঁহাকে হাত নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "কেন যাবি গো? কি করতে যাবি? যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে—যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই।" স্ত্রী-ভক্তটি মনের অনুরাগে তখন ঠাকুরের সে কথা গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেবার তীর্থে যাইয়া তিনি কোন বিশেষ ফল যে লাভ করিতে পারেন নাই এ কথা আমরা তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অধিকন্তু ঠাকুরের সহিতও তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না, কারণ উহার অল্পকাল পরেই ঠাকুর শরীর-রক্ষা করিলেন।

ঠাকুরের সরল মন তীর্থে যাইয়া কি দেখিবে ভাবিয়াছিল

ভাবময় ঠাকুরের তীর্থে গমন বিশেষ ভাব লইয়া যে হইয়াছিল, এ কথা আমরা তাঁহার নিকট বহুবার শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, "ভেবেছিলাম, কাশীতে সকলে চব্বিশ ঘণ্টা শিবের ধ্যানে সমাধিতে আছে দেখতে পাব; বৃন্দাবনে সকলে গোবিন্দকে নিয়ে ভাবে প্রেমে বিহ্বল হয়ে রয়েছে দেখব। গিয়ে দেখি সবই বিপরীত!" ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব সরল মন সকল কথা পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় সরলভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করিত। আমরা সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেই বাল্যাবধি সংসারে শিক্ষালাভ করিয়াছি; আমাদের ক্রূর মনে সেরূপ বিশ্বাসের উদয় কিরূপে হইবে? কোন কথা সরলভাবে কাহাকেও বিশ্বাস

করিতে দেখিলে আমরা তাহাকে বোকা নির্বোধ বলিয়াই ধারণা করিয়া থাকি। ঠাকুরের নিকটেই প্রথমে শুনিলাম, "ওরে, অনেক তপস্যা, অনেক সাধনার ফলে লোকে সরল উদার হয়, সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না; সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।" আবার সরল বিশ্বাসী হইতে হইবে শুনিয়া কেহ পাছে বোকা বাঁদর হইতে হইবে ভাবিয়া বসে, এজন্য ঠাকুর বলিতেন, "ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন?" আবার বলিতেন, "সর্বদা মনে মনে বিচার করবি—কোনটা সৎ কোনটা অসৎ, কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য, আর অনিত্য জিনিসগুলো ত্যাগ করে নিত্য পদার্থে মন রাখবি।"

'ভক্ত হবি, তা ব'লে বোকা হবি কেন?' ঠাকুরের যোগানন্দ স্বামীকে ঐ বিষয়ে উপদেশ

ঐ দুই প্রকার কথার সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আমাদের অনেকে অনেক সময় তাঁহার নিকট তিরস্কৃতও হইয়াছে। স্বামী যোগানন্দ তখন গৃহত্যাগ করেন নাই। বাটীতে একখানি কড়ার আবশ্যক থাকায় বড়বাজারে একদিন একখানি কড়া কিনিয়া আনিতে যাইলেন। দোকানীকে ধর্মভয় দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, ঠিক ঠিক দাম নিয়ে ভাল জিনিস দিও, ফাটা ফুটো না হয়।" দোকানীও 'আজ্ঞা মশায় তা দেব বই কি', ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকে একখানি কড়া দিল; তিনি দোকানীর কথায় বিশ্বাস করিয়া উহা আর পরীক্ষা না করিয়াই লইয়া আসিলেন; কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন, কড়াখানি ফাটা। ঠাকুর সে কথা শুনিয়াই বলিলেন, "সে কি রে? জিনিসটা আনলি, তা দেখে আনলি নি? দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে—সে তো আর ধর্ম করতে বসে নি? তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি? ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিস দিলে কি না দেখে তবে দাম দিবি; ওজনে কম দিলে কি না তা দেখে নিবি; আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবি নি।" ঐরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা তাহার স্থান নহে। এখানে আমরা ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব সরলতার সহিত অদ্ভুত বিচারশীলতার কথাটির উল্লেখমাত্র করিয়াই পূর্বানুসরণ করি।

কাশীবাসীদিগের বিষয়ানুরাগদর্শনে ঠাকুর—'মা, তুই আমাকে এখানে কেন আনলি?'

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি এই তীর্থভ্রমণোপলক্ষে মথুর লক্ষ মুদ্রারও অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। মথুর কাশীতে আসিয়াই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রথমে মাধুকরী দেন; পরে একদিন তাঁহাদিগকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরিতোষপূর্বক ভোজন, প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র ও এক এক টাকা দক্ষিণা দেন; আবার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া এখানে পুনরাগমন করিয়া ঠাকুরের আজ্ঞায় একদিন 'কল্পতরু' হইয়া তৈজস, বস্ত্র, কম্বল, পাদুকা প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় ব্যবহার্য পদার্থসকলের মধ্যে যে যাহা চাহিয়াছিল তাহাকে তাহাই দান করেন। মাধুকরী দিবার দিনেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিবাদ গণ্ডগোল, এমন কি পরস্পরে মারামারি পর্যন্ত হইয়া যাইতে দেখিয়া ঠাকুরের মনে বিষম বিরাগ উপস্থিত হয় এবং বারাণসীতেও ইতরসাধারণকে অপর সকল স্থানের ন্যায় এইরূপে কামকাঞ্চনে রত থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে একপ্রকার হতাশ ভাব আসিয়াছিল। তিনি সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বলিয়াছিলেন, "মা, তুই আমাকে এখানে কেন আনলি? এর চেয়ে দক্ষিণেশ্বরে যে আমি ছিলাম ভাল।"

ঠাকুরের 'স্বর্ণময়ী কাশী'-দর্শন

এইরূপে সাধারণের ভিতর বিষয়ানুরাগ প্রবল দেখিয়া ব্যথিত হইলেও এখানে অদ্ভুত দর্শনাদি হইয়া ঠাকুরের শিব-মহিমা এবং কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। নৌকাযোগে বারাণসী প্রবেশকাল হইতেই ঠাকুর ভাব-নয়নে দেখিতে থাকেন শিবপুরী বাস্তবিকই সুবর্ণে নির্মিত—বাস্তবিকই ইহাতে মৃত্তিকা প্রস্তরাদির একান্ত অভাব—বাস্তবিকই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সাধু-ভক্তগণের কাঞ্চনতুল্য সমুজ্জ্বল, অমূল্য হৃদয়ের ভাবরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হইয়া ইহার বর্তমান আকারে প্রকাশ। সেই জ্যোতির্ময় ভাবঘন মূর্তিই ইহার নিত্য সত্য রূপ—আর বাহিরে যাহা দেখা যায় সেটা তাহারই ছায়ামাত্র।

কাশীকে ‘সুবর্ণ-নির্মিত’ কেন বলে?

স্থূল দৃষ্টিসহায়েও ‘সুবর্ণ-নির্মিত বারাণসী’ কথাটির একটা মোটামুটি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হয় না। কাশীর অসংখ্য মন্দির ও সৌধাবলী, কাশীর প্রস্তর-বাঁধানো ক্রোশাধিকব্যাপী গঙ্গাতট ও বিস্তীর্ণ-সোপানাবলী-সমন্বিত অগণিত স্নানের ঘাট, কাশীর প্রস্তর-মণ্ডিত তোরণ-ভূষিত অসংখ্য পথ, পয়ঃ-প্রণালী, বাপী, তড়াগ, কূপ, মঠ ও উদ্যানবাটিকা এবং সর্বোপরি কাশীর ব্রাহ্মণ, বিদ্যার্থী, সাধু ও দরিদ্রগণের পোষণার্থ অসংখ্য অন্নসত্রসকল দেখিয়া কে না বলিবে বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সর্বপ্রদেশ মিলিত হইয়া অজস্র সুবর্ণ-বর্ষণেই এ বিচিত্র শিবপুরী নির্মাণ করিয়াছে? ভারতের প্রায় ত্রিশ কোটি হৃদয়ের ভক্তিভাব এতকাল ধরিয়া এইরূপে এই নগরীতে যে সমভাবে মিলিত থাকিয়া ইহার এইরূপ বহিঃপ্রকাশ আনয়ন করিতেছে, এ কথা ভাবিয়া কাহার মন না স্তম্ভিত হইবে? কে না বিপুল ভাবপ্রবাহের অদম্য বেগ দেখিয়া মোহিত এবং উহার উৎপত্তিনির্ণয় করিতে যাইয়া আত্মহারা হইবে? কে না বিস্মিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে বলিবে—এ সৃষ্টি বাস্তবিকই অতুলনীয়, বাস্তবিকই ইহা মনুষ্যকৃত নহে, বাস্তবিকই অসহায় জীবের প্রতি দীনশরণ আর্তৈকত্রাণ শ্রীবিশ্বনাথের অপার করুণাই ইহার জন্ম দিয়াছে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শক্তিই শ্রীঅন্নপূর্ণারূপে এখানে চিরাধিষ্ঠিতা থাকিয়া অন্নবিতরণে জীবের অন্নময় ও প্রাণময় এবং আধ্যাত্মিক ভাববিতরণে তাহার মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় শরীরের পূর্ণ পুষ্টিবিধান করিতেছেন এবং দ্রুতপদে তাহাকে মুক্তি বা শ্রীবিশ্বনাথের সহিত ঐকাত্ম্যবোধে আনয়ন করিতেছেন! ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর এখানে আগমনমাত্রেই যে ঐ দিব্য হেমময় ভাবপ্রবাহ শিবপুরীর সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাইবেন এবং উহারই জমাট প্রকাশ-রূপে এ নগরীকে সুবর্ণময় বলিয়া উপলব্ধি করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

স্বর্ণময় কাশী দেখিয়া ঠাকুরের ঐ স্থান অপবিত্র করিতে ভয়

প্রকাশশীল পদার্থমাত্রই হিন্দুর নয়নে সত্ত্বগুণ-প্রসূত ও পবিত্র। আলোক হইতে পদার্থসকলের প্রকাশ, সেজন্য আলোক বা উজ্জ্বলতা আমাদের নিকট পবিত্র; দেবতার নিকট জ্যোৎপ্রদীপ[4] রাখা, দেবদেবীর সম্মুখে দীপ নির্বাণ না করা, এই সকল শাস্ত্র-নিয়ম হইতেই আমরা এ কথা বুঝিতে পারি। এজন্যই বোধ হয় আবার উজ্জ্বলপ্রকাশযুক্ত সুবর্ণাদি পদার্থসকলকে পবিত্র বলিয়া দেখিবার, শরীরের অধোভাগে সুবর্ণালঙ্কার-ধারণ না করিবার বিধিসমূহের উৎপত্তি। বারাণসী সর্বদা সুবর্ণময় দেখিতে পাইয়া শৌচাদি করিয়া সুবর্ণকে অপবিত্র করিতে হইবে বলিয়া বালকস্বভাব ঠাকুর প্রথম প্রথম ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এজন্য তিনি মথুরকে বলিয়া পালকির বন্দোবস্ত করিয়া কয়েকদিন অসীর পারে গমন ও তথায় (বারাণসীর বাহিরে) শৌচাদি সারিয়া আসিতেন। পরে ঐ ভাবের বিরামে আর ঐরূপ করিতে হইত না।

কাশীতে মরিলেই জীবের মুক্তি হওয়া সম্বন্ধে ঠাকুরের মণিকর্ণিকায় দর্শন

কাশীতে আর একটি বিশেষ দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। বারাণসীর মণিকর্ণিকাদি পঞ্চতীর্থ দর্শন করিতে অনেকেই গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে যাইয়া থাকেন। মথুরও ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তদ্রূপে গমন করিয়াছিলেন। মণিকর্ণিকার পাশেই কাশীর প্রধান শ্মশানভূমি। মথুরের নৌকা যখন মণিকর্ণিকা ঘাটের সম্মুখে আসিল তখন দেখা গেল শ্মশান চিতাধূমে ব্যাপ্ত—শবদেহসকল সেখানে দাহ হইতেছে। ভাবময় ঠাকুর সহসা সেদিকে দেখিয়াই একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া নৌকার বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং একেবারে নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। মথুরের পাণ্ডা ও নৌকার মাঝি-মাল্লারা লোকটি জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইবে ভাবিয়া ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু কাহাকেও আর ধরিতে হইল না; দেখা গেল ঠাকুর ধীর স্থির নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান আছেন এবং এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ ও হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া যেন সে স্থানটিকে শুদ্ধ জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছে। মথুর ও ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় সাবধানে ঠাকুরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাঝি-মাল্লারাও বিস্ময়পূর্ণনয়নে ঠাকুরের অদ্ভুত ভাব দূরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে

লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে দিব্য ভাবের বিরাম হইলে সকলে মণিকর্ণিকায় নামিয়া স্নানদানাদি যাহা করিবার করিয়া পুনরায় নৌকাযোগে অন্যত্র গমন করিলেন।

তখন ঠাকুর তাঁহার সেই অদ্‌ভুত দর্শনের কথা মথুর প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "দেখিলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে তারক-ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করিতেছেন!—সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার-বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপ বহুকল্পের যোগ-তপস্যায় যে অদ্বৈতানুভবের ভূমানন্দ জীবের আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা তাহাকে শ্রীবিশ্বনাথ সদ্য সদ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন।"

মথুরের সঙ্গে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা ঠাকুরের পূর্বোক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"কাশীখণ্ডে মোটামুটিভাবে লেখা আছে, এখানে মৃত্যু হইলে ৺বিশ্বনাথ জীবকে নির্বাণপদবী দিয়া থাকেন; কিন্তু কি ভাবে যে উহা দেন তাহা সবিস্তার লেখা নাই। আপনার দর্শনেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে উহা কিরূপে সম্পাদিত হয়। আপনার দর্শনাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কথারও পারে চলিয়া যায়।"

ঠাকুরের ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন

কাশীতে অবস্থানকালে ঠাকুর এখানকার খ্যাতনামা সাধুদেরও দর্শন করিতে যান। তন্মধ্যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে দেখিয়াই তাঁহার বিশেষ প্রীতি হইয়াছিল। স্বামীজীর অনেক কথা ঠাকুর অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন। বলিতেন, "দেখিলাম সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁহার শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন! তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে! উঁচু জ্ঞানের অবস্থা! শরীরের কোন হুঁশই নেই; রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য—সেই বালির ওপরেই সুখে শুয়ে আছেন! পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম। তখন কথা কন না—মৌনী। ইশারায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ঈশ্বর এক না অনেক?' তাতে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন—'সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো এক; নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক।' তাঁকে দেখিয়ে হৃদেকে বলেছিলাম, 'একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে'।"

শ্রীবৃন্দাবনে 'বাঁকাবিহারী'-মূর্তি ও ব্রজ-দর্শনে ঠাকুরের ভাব

কাশীতে কিছুকাল থাকিয়া ঠাকুর মথুরবাবুর সহিত বৃন্দাবনে গমন করেন। শুনিয়াছি বাঁকাবিহারী মূর্তি দর্শন করিয়া তথায় তাঁহার অদ্‌ভুত ভাবাবেশ হইয়াছিল—আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন! আবার সন্ধ্যাকালে রাখাল বালকগণ গরুর পাল লইয়া যমুনা পার হইয়া গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে দেখিতে দেখিতে তাহাদের ভিতর শিখিপুচ্ছধারী নবনীরদশ্যাম গোপালকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। ঠাকুর এখানে নিধুবন, গোবর্ধন প্রভৃতি ব্রজের কয়েকটি স্থানও দর্শন করিতে যান। ব্রজের এই সকল স্থান তাঁহার বৃন্দাবন অপেক্ষা অধিক ভাল লাগিয়াছিল এবং ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে দর্শন করিয়া এই সকল স্থানেই তাঁহার বিশেষ প্রেমের উদয় হইয়াছিল। শুনিয়াছি গোবর্ধনাদি দর্শন করিতে যাইবার কালে মথুর তাঁহাকে পালকিতে পাঠাইয়া দেন এবং দেবস্থানে ও দরিদ্রদিগকে দান করিতে করিতে যাইবেন বলিয়া পালকির এক পার্শ্বে একখানি বস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর টাকা আধুলি সিকি দু-আনি ইত্যাদি কাঁড়ি করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সকল স্থানে যাইতে যাইতেই ঠাকুর ভাবে প্রেমে এতদূর বিহ্বল হইয়া পড়েন যে ঐ সকল আর হাতে করিয়া তুলিয়া দান করিতে পারেন নাই! অগত্যা ঐ বস্ত্রের এক কোণ ধরিয়া টানিয়া ঐ সকল স্থানে স্থানে দরিদ্রদিগের ভিতর ছড়াইতে ছড়াইতে গিয়াছিলেন।

ব্রজে ঠাকুরের বিশেষ প্রীতি

ব্রজের এই সকল স্থানে ঠাকুর সংসারবিরাগী অনেক সাধককে কুপের[5] ভিতর পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া বাহিরের সকল বিষয় হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া জপ-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছিলেন। ব্রজের প্রাকৃতিক শোভা, ফল-ফুলে শোভিত ক্ষুদ্র গিরি-গোবর্ধন, মৃগ ও শিখিকুলের বনমধ্যে যথা তথা নিঃশঙ্ক বিচরণ, সাধু-তপস্বীদের নিরন্তর ঈশ্বরের চিন্তায় দিনযাপন এবং সরল ব্রজবাসীদের কপটতাশূন্য সশ্রদ্ধ ব্যবহার ঠাকুরের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাহার উপর নিধুবনে সিদ্ধপ্রেমিকা বর্ষীয়সী তপস্বিনী গঙ্গামাতার দর্শন ও মধুর সঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুর এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল ব্রজ ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইবেন না; এখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবেন।

নিধুবনের গঙ্গামাতা; ঠাকুরের ঐ স্থানে থাকিবার ইচ্ছা; পরে বুড়ো মার সেবা কে করিবে ভাবিয়া কলিকাতায় ফিরা

গঙ্গামাতার তখন প্রায় ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে। বহুকাল ধরিয়া ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রেমবিহ্বল ব্যবহার দেখিয়া এখানকার লোকে তাঁহাকে শ্রীরাধার প্রধানা সঙ্গিনী ললিতা সখী কোন কারণবশতঃ স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া জীবকে প্রেমশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অবতীর্ণা বলিয়া মনে করিত। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি ইনি দর্শনমাত্রেই ধরিতে পারিয়াছিলেন, ঠাকুরের শরীরে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় মহাভাবের প্রকাশ, এবং সেজন্য ইনি ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধিকাই স্বয়ং অবতীর্ণা ভাবিয়া 'দুলালী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। 'দুলালী'র এইরূপ অযত্ন-লভ্য দর্শন পাইয়া গঙ্গামাতা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহার এতকালের হৃদয়ের সেবা ও ভালবাসা আজ সফল হইল! ঠাকুরও তাঁহাকে পাইয়া চিরপরিচিতের ন্যায় তাঁহারই আশ্রমে সকল কথা ভুলিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রেমে এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, মথুর প্রভৃতির মনে ভয় হইয়াছিল ঠাকুর বুঝি আর তাঁহাদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন না! পরম অনুগত মথুরের মন এ ভাবনায় যে কিরূপ আকুল হইয়াছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। যাহা হউক, ঠাকুরের মাতৃভক্তিই পরিশেষে জয়লাভ করিল এবং তাঁহার ব্রজে থাকিবার সঙ্কল্প পরিবর্তন করিয়া দিল। ঠাকুর এ সম্বন্ধে আমাদের বলিয়াছিলেন, "ব্রজে গিয়ে সব ভুল হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল আর ফিরব না। কিন্তু কিছুদিন বাদে মার কথা মনে পড়ল, মনে হলো তাঁর কত কষ্ট হবে, কে তাঁকে বুড়ো বয়সে দেখবে, সেবা করবে। ঐ কথা মনে উঠায় আর সেখানে থাকতে পারলুম না।"

ঠাকুরের জীবনে পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ও গুণসকলের অপূর্ব সম্মিলন; সন্ন্যাসী হইয়াও ঠাকুরের মাতৃসেবা

বাস্তবিক যতই ভাবিয়া দেখা যায়, এ অলৌকিক পুরুষের সকল কথা ও চেষ্টা ততই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়, ততই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসকলের ইঁহাতে অপূর্বভাবে সম্মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। দেখ না, শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে শরীর-মন সর্বস্ব অর্পণ করিলেও ঠাকুর সত্যটি তাঁহাকে দিতে পারিলেন না, জগতের সকল ব্যক্তির সহিত লৌকিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াও নিজ জননীর প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যটি ভুলিতে পারিলেন না, পত্নীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধের নামগন্ধ কোনকালে না রাখিলেও গুরুভাবে তাঁহার সহিত সর্বকালে সপ্রেম সম্বন্ধ রাখিতে বিস্মৃত হইলেন না; ঠাকুরের এইরূপ অলৌকিক চেষ্টার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে! পূর্ব পূর্ব যুগের কোন্ আচার্য বা অবতারপুরুষের জীবনে এইরূপ অদ্ভুত বিপরীত চেষ্টার একত্র সমাবেশ ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়? কে না বলিবে এরূপ আর কখনও কোথায়ও দেখা যায় নাই? ঈশ্বরাবতার বলিয়া ইঁহাকে ধারণা করুক আর নাই করুক, কে না স্বীকার করিবে এরূপ দৃষ্টান্ত আধ্যাত্মিক জগতে আর একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? ঠাকুরের বর্ষীয়সী মাতাঠাকুরানী জীবনের শেষ কয়েক বৎসর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটেই বাস করিতেন এবং তাঁহার সকল প্রকার সেবা-শুশ্রূষা ঠাকুর নিজ হস্তে নিত্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন—এ কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। আবার সেই আরাধ্যা মাতার যখন দেহান্ত হইল তখন ঠাকুরকে শোকসন্তপ্ত হইয়া এতই কাতর ও অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা গিয়াছিল যে, সংসারে বিরল কাহাকেও কাহাকেও ঐরূপ করিতে দেখা যায়! মাতৃবিয়োগে ঐরূপ কাতর হইলেও কিন্তু তিনি যে সন্ন্যাসী, এ কথা ঠাকুর এক ক্ষণের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। সন্ন্যাসী হওয়ায় মাতার

ঔর্ধ্বদেহিক ও শ্রাদ্ধাদি করিবার নিজের অধিকার নাই বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দ্বারা উহা সম্পাদিত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিজনে বসিয়া মাতার নিমিত্ত রোদন করিয়াই মাতৃঋণের যথাসম্ভব পরিশোধ করিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদের কতদিন বলিয়াছিলেন, "ওরে, সংসারে বাপ মা পরম গুরু; যতদিন বেঁচে আছেন যথাশক্তি উঁহাদের সেবা করতে হয়, আর মরে গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়; যে দরিদ্র, কিছু নেই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নেই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাঁদতে হয়; তবে তাঁদের ঋণশোধ হয়! কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য বাপ মার আজ্ঞা লঙঘন করা চলে, তাতে দোষ হয় না; যেমন প্রহ্লাদ বাপ বললেও কৃষ্ণনাম নিতে ছাড়েনি; এমনকি, ধ্রুব মা বারণ করলেও তপস্যা করতে বনে গিয়েছিলেন; তাতে তাঁদের দোষ হয়নি।" এইরূপে ঠাকুরের মাতৃভক্তির ভিতর দিয়াও গুরুভাবের অদ্ভুত বিকাশ ও লোকশিক্ষা দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

সমাধিস্থ হইয়া শরীরত্যাগ হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের গয়াধামে যাইতে অস্বীকার; ঐরূপ ভাবের কারণ কি?

গঙ্গামাতার নিকট হইতে কষ্টে বিদায়গ্রহণ করিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমন করেন। আমরা শুনিয়াছি কয়েকদিন সেখানে থাকিবার পরে দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর সুবর্ণপ্রতিমা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে প্রেমে মোহিত হইয়াছিলেন। কাশী হইতে গয়াধামে যাইবার মথুরের ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর সেখানে যাইতে অমত করায় মথুর সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি ঠাকুরের পিতা গয়াধামে আগমন করিয়াই ঠাকুর যে তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন একথা স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং এইজন্যই জন্মিবার পর তাঁহার নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মদর্শনে প্রেমে বিহ্বল হইয়া তাঁহা হইতে পৃথকভাবে নিজ শরীরধারণের কথা পাছে একেবারে ভুলিয়া যান এবং তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত পুনরায় সম্মিলিত হন—এই ভয়েই ঠাকুর যে এখন মথুরের সহিত গয়ায় যাইতে অমত করিয়াছিলেন, এ কথাও তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে বলিয়াছেন। ঠাকুরের ধ্রুব ধারণা ছিল, যিনিই পূর্ব পূর্ব যুগে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই এখন তাঁহার শরীর আশ্রয় করিয়া ধরায় আগমন করিয়াছেন। সেজন্য, পূর্বোক্ত পিতৃস্বপ্নে পরিজ্ঞাত নিজ বর্তমান শরীরমনের উৎপত্তিস্থল গয়াধাম, এবং যে যে স্থলে অন্য অবতারপুরুষেরা লীলাসংবরণ করিয়াছিলেন সেই সেই স্থান দর্শন করিতে যাইবার কথায় তাঁহার মনে কেমন একটা অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হইতে দেখিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল স্থানে যাইলে তাঁহার শরীর থাকিবে না, এমন গভীর সমাধিস্থ হইবেন যে তাহা হইতে তাঁহার মন আর নিম্নে মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসিবে না! কারণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাসংবরণ-স্থল নীলাচল বা ৺পুরীধামে যাইবার কথাতেও ঠাকুর ঐরূপ ভাব অন্য সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুধু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কেন, ভক্তদের কাহাকেও যদি তিনি ভাব-নয়নে কোন দেববিশেষের অংশ বা বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন তবে ঐ দেবতার বিশেষ লীলাস্থলে যাইবার বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধেও ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিতেন। ঠাকুরের ঐ ভাবটি পাঠককে বুঝানো দুরূহ। উহাকে 'ভয়' বলিয়া নির্দেশ করাটা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ সামান্য সমাধিমান পুরুষেরাই যখন দেহী কিরূপে মৃত্যুকালে শরীরটা ছাড়িয়া যায় জীবৎকালেই তাহার অনুভব করিয়া মৃত্যুকে কৌমার যৌবনাদি দেহের পরিবর্তন-সকলের ন্যায় একটা পরিবর্তনবিশেষ বলিয়া দেখিতে পাইয়া নির্ভয় হইয়া থাকেন, তখন ইচ্ছামাত্রেই গভীরসমাধিমান অবতারপুরুষেরা যে একেবারে অভীঃ মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? উহাকে ইতরসাধারণের ন্যায় শরীরটা রক্ষা করিবার বা বাঁচিবার আগ্রহও বলিতে পারি না। কারণ, ইতরসাধারণে যে ঐরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে সেটা স্বার্থসুখ বা ভোগের জন্য। কিন্তু যাঁহাদের মন হইতে স্বার্থপরতা চিরকালের মতো ধুইয়া পুঁছিয়া গিয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে আর ও কথা খাটে না। তবে ঠাকুরের মনের পূর্বোক্ত ভাব আমরা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের অভিধানে, আমাদের মনে যে সকল ভাব উঠে তাহাই বুঝাইবার, প্রকাশ করিবার উপযোগী শব্দসমূহ পাওয়া যায়। ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষদিগের মনের অত্যুচ্চ দিব্য ভাবসকল প্রকাশ করিবার সে সকল শব্দের সামর্থ্য কোথায়? অতএব হে পাঠক, এখানে তর্কবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া ঠাকুর ঐ সকল বিষয় যে ভাবে বলিয়া যাইতেন তাহা

বিশ্বাসের সহিত শুনিয়া যাওয়া এবং কল্পনাসহায়ে ঐ উচ্চ ভাবের যথাসম্ভব ছবি মনে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

কার্য-পদার্থের কারণ-পদার্থে লয় হওয়াই নিয়ম

ঠাকুর বলিতেন এবং শাস্ত্রেও ইহার নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, যে প্রকাশ যেখান হইতে বা যে বস্তু বা ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকাশ পুনরায় সেই স্থলে বা সেই বস্তু বা ব্যক্তির বিশেষ সমীপাগত হইলে তাহাতেই লয় হইয়া যায়। ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি বা প্রকাশ; সেই জীব আবার জ্ঞানলাভ দ্বারা তাঁহার সমীপাগত হইলেই তাঁহাতে লীন হইয়া যায়! অনন্ত মন হইতে তোমার আমার ও সকলের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত মনের উৎপত্তি বা প্রকাশ; আমাদের ভিতর কাহারও সেই ক্ষুদ্র মন নির্লিপ্ততা, করুণা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের বৃদ্ধি করিতে করিতে সেই অনন্ত মনের সমীপাগত বা সদৃশ হইলেই তাহাতে লীন হইয়া যায়। স্থূল জগতেও ইহাই নিয়ম। সূর্য হইতে পৃথিবীর বিকাশ; সেই পৃথিবী আবার কোনরূপে সূর্যের সমীপাগত হইলেই তাহাতে লীন হইয়া যাইবে। অতএব বুঝিতে হইবে ঠাকুরের ঐরূপ ধারণার নিম্নে আমাদের অজ্ঞাত কি একটা ভাববিশেষ আছে এবং বাস্তবিক যদি ৺গদাধর বলিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষ থাকেন এবং ঠাকুরের শরীর-মনটার উৎপত্তি ও বিকাশ তাঁহা হইতে কোন কারণে হইয়া থাকে, তবে ঐ উভয় পদার্থ পুনরায় সমীপাগত হইলে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া একত্র মিলিত হইবে, এ কথায় যুক্তিবিরুদ্ধই বা কি আছে?

অবতারপুরুষদিগের জীবন-রহস্যের মীমাংসা করিতে কর্মবাদ সক্ষম নহে; উহার কারণ

অবতারপুরুষেরা যে ইতরসাধারণ জীবের ন্যায় নহেন, এ কথা আর যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইতে হয় না। তাঁহাদের ভিতর অচিন্ত্য কল্পনাতীত শক্তিপ্রকাশ দেখিয়াই জীব অবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের পূজাদান ও তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকে। মহর্ষি কপিলাদি ভারতের তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকগণ ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব শক্তিমান পুরুষদিগের জীবনরহস্য ভেদ করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কি কারণে তাঁহাদের ভিতর দিয়া ইতরসাধারণাপেক্ষা সমধিক শক্তিপ্রকাশ হয়, এ বিষয়ে নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা প্রথমেই দেখিলেন সাধারণ কর্মবাদ ইহার মীমাংসায় সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, ইতরসাধারণ পুরুষের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম স্বার্থসুখান্বেষণেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহাদের কৃত কার্যের আলোচনায় দেখা যায়, সে উদ্দেশ্যের একান্তাভাব। পরের দুঃখমোচনের বাসনাই ইঁহাদের ভিতর অদম্য উৎসাহ আনয়ন করিয়া ইঁহাদিগকে কার্যে প্রেরণ করিয়া থাকে এবং সে বাসনার সম্মুখে ইঁহারা নিজের সমস্ত ভোগসুখ এককালে বলি প্রদান করিয়া থাকেন। আবার পার্থিব মানযশলাভ যে ঐ বাসনার মূলে বর্তমান তাহাও দেখা যায় না। কারণ লোকৈষণা, পার্থিব মানযশ ইঁহারা কাকবিষ্ঠার ন্যায় সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দেখ না, নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় বহুকাল বদরিকাশ্রমে তপস্যায় কাটাইলেন, জগতের কল্যাণোপায়-নির্ধারণের জন্য। শ্রীরামচন্দ্র প্রাণের প্রতিমা সীতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন প্রজাদিগের কল্যাণের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক কার্যানুষ্ঠান করিলেন সত্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। বুদ্ধদেব রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিলেন জন্ম-জরা-মরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া। ঈশা প্রাণপাত করিলেন দুঃখশোকাকুল পৃথিবীতে প্রেম-স্বরূপ পরমপিতার প্রেমের রাজ্যস্থাপনার জন্য। মহম্মদ অধর্মের বিরুদ্ধেই তরবারি ধারণ করিলেন। শঙ্কর, অদ্বৈতানুভবেই যথার্থ শান্তি, জীবকে এ কথা বুঝাইতেই আপন শক্তি নিয়োগ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্য, একমাত্র শ্রীহরির নামেই জীবের কল্যাণকারী সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে জানিয়া সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া উদ্দাম তাণ্ডবে হরিনাম-প্রচারেই জীবনোৎসর্গ করিলেন। কোন্ স্বার্থ ইঁহাদিগকে ঐ সকল কার্যে প্রেরণ করিয়াছিল? কোন্ আত্মসুখ-লাভের জন্য ইঁহারা জীবনে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন?

মুক্তাত্মার শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণসকল অবতারপুরুষে বাল্যকালাবধি প্রকাশ দেখিয়া দার্শনিকগণের মীমাংসা; সাংখ্য-মতে তাঁহারা 'প্রকৃতি-লীন'-শ্রেণীভুক্ত

দার্শনিকগণ আরও দেখিলেন, অসাধারণ মানসিক অনুভবে মুক্তপুরুষদিগের শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহারা শাস্ত্র-দৃষ্টে স্বীকার করিয়া থাকেন, সে সমস্তও ইঁহাদের জীবনে বিশেষভাবে বিকশিত। কাজেই ঐ সকল পুরুষদিগকে বাধ্য হইয়াই এক নূতন শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে হইল। সাংখ্যকার কপিল বলিলেন, ইঁহাদের ভিতর এক প্রকার মহদুদার লোকৈষণা বা লোককল্যাণ-বাসনা থাকে। সেজন্য ইঁহারা পূর্ব পূর্ব জন্মের তপস্যাপ্রভাবে মুক্ত হইয়াও নির্বাণপদবীতে অবস্থান করেন না—প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকেন, বা প্রকৃতিগত সমস্ত শক্তিই তাঁহাদের শক্তি, এই প্রকার বোধে এক কল্পকাল অবস্থান করিয়া থাকেন; এবং এজন্যই ইঁহাদের মধ্যে যিনি যে কল্পে ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন তিনিই সে কল্পে অপর সাধারণ মানবের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন। কারণ প্রকৃতির ভিতর যত কিছু শক্তি আছে সে সমস্তই আমার বলিয়া যাঁহার বোধ হইবে তিনি সে সমস্ত শক্তিই ইচ্ছামতো প্রয়োগ ও সংহার করিতে পারিবেন। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র শরীর-মনে প্রকৃতির যে সকল শক্তি রহিয়াছে সে সকলকে আমার বলিয়া বোধ করিতেছি বলিয়াই আমরা যেমন উহাদের ব্যবহার করিতে পারিতেছি, তাঁহারাও তদ্রূপ প্রকৃতির সমস্ত শক্তিসমূহ তাঁহাদের আপনার বলিয়া বোধ করায় সে সমস্তই ইচ্ছামতো ব্যবহার করিতে পারিবেন। সাংখ্যকার কপিল এইরূপে সর্বকালব্যাপী এক নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও এককল্পব্যাপী সর্বশক্তিমান পুরুষসকলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

বেদান্ত বলেন, তাঁহারা 'আধিকারিক' এবং ঐ শ্রেণীর পুরুষদিগের ঈশ্বরাবতার ও নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটীরূপ দুই বিভাগ আছে

বেদান্তকার আবার একমাত্র ঈশ্বরপুরুষের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং তিনিই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন বলিয়া ঐ সকল বিশেষ শক্তিমান পুরুষদিগকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ অংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ পুরুষেরা লোককল্যাণকর এক একটি বিশেষ কার্যের জন্যই আবশ্যকমত জন্মগ্রহণ করেন এবং তদুপযোগী শক্তিসম্পন্নও হইয়া আসেন দেখিয়া ইঁহাদিগকে 'আধিকারিক' নাম প্রদান করিয়াছেন। 'আধিকারিক' অর্থাৎ কোন একটি কার্যবিশেষের অধিকার বা সেই কার্যটি সম্পন্ন করিবার ভার ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এইরূপ পুরুষসকলেও আবার উচ্চাবচ শক্তির প্রকাশ দেখিয়া এবং ইঁহাদের কাহারও কার্য সমগ্র পৃথিবীর সকল লোকের সর্বকাল কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত ও কাহারও কার্য একটি প্রদেশের বা তদন্তর্গত একটি দেশের লোকসমূহের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত দেখিয়া বেদান্তকার আবার এই সকল পুরুষের ভিতর কতকগুলিকে ঈশ্বরাবতার এবং কতকগুলিকে সামান্য-অধিকারপ্রাপ্ত নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষশ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকারের ঐ মতকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াই পুরাণকারেরা পরে কল্পনাসহায়ে অবতার-পুরুষদিগের প্রত্যেকে কে কতটা ঈশ্বরের অংশসম্ভূত ইহা নির্ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়া ঐ চেষ্টার একটু বাড়াবাড়ি করিয়া বসিয়াছেন এবং ভাগবতকার– এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।—১।৩।২৮ ইত্যাদি বচন প্রয়োগ করিয়াছেন।

আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে একস্থলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে গুরুভাবটি স্বয়ং ঈশ্বরেরই ভাব। অজ্ঞানমোহে পতিত জীবকে উহার পারে স্বয়ং যাইতে অক্ষম দেখিয়া তিনিই অপার করুণায় তাহাকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে আগ্রহবান হন। ঈশ্বরের সেই করুণাপূর্ণ আগ্রহ এবং তদ্ভাবাপন্ন হইয়া চেষ্টাদিই শ্রীগুরু ও গুরুভাব। ইতরসাধারণ মানবের ধরিবার বুঝিবার সুবিধার জন্য সেই গুরুভাব কখনও কখনও বিশেষ বিশেষ নরাকারে আমাদের নিকট আবহমানকাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল পুরুষকেই জগৎ অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। অতএব বুঝা যাইতেছে, অবতারপুরুষেরাই মানবসাধারণের যথার্থ গুরু।

আধিকারিক পুরুষদিগের শরীর-মন সাধারণ মানবাপেক্ষা ভিন্ন উপাদানে গঠিত; সেজন্য তাঁহাদের সঙ্কল্প ও কার্য সাধারণাপেক্ষা বিভিন্ন ও বিচিত্র

আধিকারিক পুরুষদিগের শরীর-মন সেজন্য এমন উপাদানে গঠিত দেখা যায় যে, তাহাতে ঐশ্বরিক ভাব-প্রেম ও উচ্চাঙ্গের শক্তিপ্রকাশ ধারণ ও হজম করিবার সামর্থ থাকে। জীব এতটুকু আধ্যাত্মিক শক্তি ও লোকমান্য পাইলেই অহঙ্কৃত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; আধিকারিক পুরুষেরা ঐ সকল শক্তি তদপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে অধিক পরিমাণে পাইলেও কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বুদ্ধিভ্রষ্ট ও অহঙ্কৃত হন না। জীব সকল প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমাধিতে আত্মানুভবের পরম আনন্দ একবার কোনরূপে পাইলে আর সংসারে কোন কারণেই ফিরিতে চাহে না, আধিকারিক পুরুষদিগের জীবনে সে আনন্দ যেমনি অনুভব হয়, অমনি মনে হয় অপর সকলকে কি উপায়ে এ আনন্দের ভাগী করিতে পারি। জীবের ঈশ্বর-দর্শনের পরে আর কোন কার্যই থাকে না। আধিকারিক পুরুষদিগের সেই দর্শনলাভের পরেই, যে বিশেষ কার্য করিবার জন্য তাঁহারা আসিয়াছেন তাহা ধরিতে বুঝিতে পারেন এবং সেই কার্য করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্য আধিকারিক পুরুষদিগের সম্বন্ধে নিয়মই এই যে, যতদিন না তাঁহারা যে কার্যবিশেষ করিতে আসিয়াছেন তাহা সমাপ্ত করেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের মনে সাধারণ মুক্তপুরুষদিগের মতো 'শরীরটা এখনি যায় যাক, ক্ষতি নাই', এরূপ ভাবের উদয় কখনো হয় না—মনুষ্যলোকে বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ঐ আগ্রহে ও জীবের বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কার্য শেষ হইলেই আধিকারিক পুরুষ উহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন এবং আর তিলার্ধও সংসারে না থাকিয়া পরম আনন্দে সমাধিতে দেহত্যাগ করেন। জীবের ইচ্ছামাত্রেই সমাধিতে শরীরত্যাগ তো দূরের কথা—জীবনের কার্য যে শেষ হইয়াছে এইরূপ উপলব্ধিই হয় না, এ জীবনে অনেক বাসনা পূর্ণ হইল না এইরূপ উপলব্ধিই হইয়া থাকে। অন্য সকল বিষয়েও তদ্রূপ প্রভেদ থাকে। সেইজন্যই আমাদের মাপকাঠিতে অবতার বা আধিকারিক পুরুষদিগের জীবন ও কার্যের উদ্দেশ্য মাপিতে যাইয়া আমাদিগকে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

'গয়ায় যাইলে শরীর থাকিবে না', 'জগন্নাথে যাইলে চিরসমাধিস্থ হইবেন'—ঠাকুরের এই সকল কথাগুলির ভাব কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শাস্ত্রের পূর্বোক্ত কথাগুলি পাঠকের কিছু কিছু জানা আবশ্যক। এজন্যই আমরা যত সহজে পারি সংক্ষেপে উহার আলোচনা এখানে করিলাম। ঠাকুরের কোন ভাবটিই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, পূর্বোক্ত আলোচনায় পাঠক ইহাও বুঝিতে পারিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি ঠাকুর মথুরের সহিত ৺গয়াধামে যাইতে অস্বীকার করেন। কাজেই সে যাত্রায় কাহারও আর গয়াদর্শন হইল না। বৈদ্যনাথ হইয়া কলিকাতায় সকলে প্রত্যাগমন করিলেন। বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের লোকসকলের দারিদ্র্য দেখিয়াই ঠাকুরের হৃদয় করুণাপূর্ণ হয় এবং মথুরকে বলিয়া তাহাদের পরিতোষপূর্বক একদিন খাওয়াইয়া প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র প্রদান করেন। এ কথার বিস্তারিত উল্লেখ আমরা লীলাপ্রসঙ্গে পূর্বেই একস্থলে করিয়াছি।[6]

ঠাকুরের নবদ্বীপ-দর্শন

কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থ ভিন্ন ঠাকুর একবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থল নবদ্বীপ দর্শন করিতেও গমন করিয়াছিলেন; সেবারেও মথুরবাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদের এক সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, অবতারপুরুষদিগের মনের সম্মুখেও সকল সময় সকল সত্য প্রকাশিত থাকে না। তবে আধ্যাত্মিক জগতের যে বিষয়ের তত্ত্ব তাঁহারা জানিতে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, অতি সহজেই তাহা তাঁহাদের মন-বুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে।

ঠাকুরের চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে পূর্বমত এবং নবদ্বীপে দর্শনলাভে ঐ মতের পরিবর্তন

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব সম্বন্ধে আমাদের ভিতর অনেকেই তখন সন্দিহান ছিলেন, এমনকি 'বৈষ্ণব' অর্থে 'ছোটলোক' এই কথাই বুঝিতেন এবং সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত ঠাকুরকে অনেক সময় ঐ বিষয়

জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। ঠাকুর তদুত্তরে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, "আমারও তখন তখন ঐ রকম মনে হতো রে, ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নামগন্ধ নেই—চৈতন্য আবার অবতার! ন্যাড়া-নেড়ীরা টেনে বুনে একটা বানিয়েছে আর কি!—কিছুতেই ও কথা বিশ্বাস হতো না। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ (দেবভাবের) দেখবার জন্য এখানে ওখানে বড় গোসাঁইয়ের বাড়ি, ছোট গোসাঁইয়ের বাড়ি, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না!—সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম! দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল; ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময়ে দেখতে পেলুম অদ্‌ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখনো দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মতো রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছুটে আসচে! অমনি 'ঐ এলোরে, এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভেতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম! জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেললে। এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে—বাস্তবিকই অবতার, ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ!" ঠাকুর 'ঢের সব দেখিয়ে' কথাগুলি এখানে ব্যবহার করিলেন, কারণ পূর্বেই একদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নগর-সঙ্কীর্তন-দর্শনের কথা আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। সে দর্শনের কথা আমরা লীলাপ্রসঙ্গে অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া এখানে আর করিলাম না।[7]

ঠাকুরের কালনায় গমন

পূর্বোক্ত তীর্থসকল ভিন্ন ঠাকুর আর একবার মথুরবাবুর সহিত কালনা গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পাদস্পর্শে বাংলার গঙ্গাতীরবর্তী অনেকগুলি গ্রাম যে তীর্থবিশেষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। কালনা তাহাদেরই ভিতর অন্যতম। আবার বর্ধমান রাজবংশের অষ্টাধিকশত শিব-মন্দির প্রভৃতি নানা কীর্তি এখানে বর্তমান থাকিয়া কালনাকে একটি বেশ জম-জমাট স্থান যে করিয়া তুলিয়াছে এ কথা দর্শনকারীমাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। ঠাকুরের কিন্তু এবার কালনা দর্শন করিতে যাওয়ার ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। এখানকার খ্যাতনামা সাধু ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল।

ভগবানদাস বাবাজীর ত্যাগ, ভক্তি ও প্রতিপত্তি

ভগবানদাস বাবাজীর তখন অশীতি বৎসরেরও অধিক বয়ঃক্রম হইবে। তিনি কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির কথা বাংলার আবালবৃদ্ধ অনেকেরই তখন শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। শুনিয়াছি একস্থানে একভাবে বসিয়া দিবারাত্র জপ-তপ-ধ্যান-ধারণাদি করায় শেষদশায় তাঁহার পদদ্বয় অসাড় ও অবশ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অশীতিবর্ষেরও অধিকবয়স্ক হইয়া শরীর অপটু ও প্রায় উত্থান-শক্তিরহিত হইলেও বৃদ্ধ বাবাজীর হরিনামে উদ্দাম উৎসাহ, ভগবৎপ্রেমে অজস্র অশ্রুবর্ষণ ও আনন্দ কিছুমাত্র না কমিয়া বরং দিন দিন বর্ধিতই হইয়াছিল। এখানকার বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে পাইয়া তখন বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছিল এবং ত্যাগী বৈষ্ণব-সাধুগণের অনেকে তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শ ও উপদেশে নিজ নিজ জীবন গঠিত করিয়া ধন্য হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি বাবাজীর দর্শনে যিনিই তখন যাইতেন, তিনিই তাঁহার বহুকালানুষ্ঠিত ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা ও ভক্তির সঞ্চিত প্রভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অপূর্ব আনন্দের উপলব্ধি করিয়া আসিতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে বাবাজী যে মতামত প্রকাশ করিতেন তাহাই তখন লোকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত। কাজেই সিদ্ধ বাবাজী তখন কেবল নিজের সাধনাতেই ব্যস্ত থাকিতেন না কিন্তু বৈষ্ণবসমাজের কিসে কল্যাণ হইবে, কিসে ত্যাগী বৈষ্ণবগণ ঠিক ঠিক ত্যাগের অনুষ্ঠানে ধন্য হইবে, কিসে ইতরসাধারণ সংসারী জীব শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত প্রেমধর্মের আশ্রয়ে আসিয়া শান্তিলাভ করিবে—এ সকলের আলোচনা ও অনুষ্ঠানে অনেককাল কাটাইতেন। বৈষ্ণবসমাজের কোথায় কি হইতেছে, কোথায় কোন্ সাধু ভাল বা মন্দ আচরণ করিতেছে—সকল কথাই লোকে বাবাজীর নিকট আনিয়া উপস্থিত করিত এবং তিনিও সে

সকল শুনিয়া বুঝিয়া তত্তৎ বিষয়ে যাহা করা উচিত তাহার উপদেশ করিতেন। ত্যাগ, তপস্যা ও প্রেমের জগতে চিরকালই কি যে এক অদৃশ্য সুদৃঢ় বন্ধন! লোকে বাবাজীর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে স্বতঃপ্রেরিত হইয়া ছুটিত। এইরূপে গুপ্তচরাদি সহায় না থাকিলেও সিদ্ধ বাবাজীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বৈষ্ণবসমাজের সর্বত্রানুষ্ঠিত কার্যেই পতিত হইত এবং ঐ সমাজগত প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার প্রভাব অনুভব করিত। আর, সে দৃষ্টি ও প্রভাবের সম্মুখে সরল বিশ্বাসীর উৎসাহ যেমন দিন দিন বর্ধিত হইয়া উঠিত, কপটাচারী আবার তেমনি ভীত কুণ্ঠিত হইয়া আপন স্বভাব-পরিবর্তনের চেষ্টা পাইত।

ঠাকুরের তপস্যাকালে ভারতে ধর্মান্দোলন

অনুরাগের তীব্র প্রেরণায় ঠাকুর যখন ঈশ্বরলাভের জন্য দ্বাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় লাগিয়াছিলেন এবং তাহাতে গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব বিকাশ হইতেছিল, তখন উত্তর ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই ধর্মের একটা বিশেষ আন্দোলন যে চলিয়াছিল এ কথার উল্লেখ আমরা লীলাপ্রসঙ্গের অন্য স্থলে করিয়াছি।[৪] কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী নানাস্থানের হরিসভাসকল এবং ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে শ্রীযুত দয়ানন্দ স্বামীজীর বেদধর্মের আন্দোলন—যাহা এখন আর্যসমাজে পরিণত হইয়াছে, বাংলায় বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ভাবের, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ও রাধাস্বামী মতের, গুজরাতে নারায়ণ স্বামী মতের—এইরূপে নানা স্থলে নানা ধর্মমতের উৎপত্তি ও আন্দোলন এই সময়েরই কিছু অগ্র-পশ্চাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ আন্দোলনের সবিস্তার আলোচনা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; কেবল কলিকাতার কলুটোলা নামক পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ একটি হরিসভায় ঠাকুরকে লইয়া যে ঘটনা হইয়াছিল তাহাই এখানে আমরা পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের কলুটোলার হরিসভায় গমন

ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া একদিন ঐ হরিসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; ভাগিনেয় হৃদয় তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ—যাঁহার কথা আমরা পূর্বে পাঠককে বলিয়াছি—সেদিন সেখানে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে ব্রতী ছিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে ভাগবত শুনিবার জন্যই ঠাকুর তথায় গমন করিয়াছিলেন; এ কথা কিন্তু আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে যাহাই হউক, ঠাকুর যখন সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন ভাগবতপাঠ হইতেছিল এবং উপস্থিত সকলে তন্ময় হইয়া সেই পাঠ শ্রবণ করিতেছিল। ঠাকুরও তদ্দর্শনে শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন।

ঐ সভায় ভাগবত পাঠ

কলুটোলার হরিসভার সভ্যগণ আপনাদিগকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একান্ত পদাশ্রিত মনে করিতেন এবং ঐ কথাটি অনুক্ষণ স্মরণ রাখিবার জন্য তাঁহারা একখানি আসন বিস্তৃত রাখিয়া উহাতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া পূজা, পাঠ প্রভৃতি সভার সমুদয় অনুষ্ঠান ঐ আসনের সম্মুখেই করিতেন। ঐ আসন 'শ্রীচৈতন্যের আসন' বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। সকলে ভক্তিভরে উহার সম্মুখে প্রণাম করিতেন এবং উহাতে কাহাকেও কখনও বসিতে দিতেন না। অন্য সকল দিবসের ন্যায় আজও পুষ্পমাল্যাদি-ভূষিত ঐ আসনের সম্মুখেই ভাগবতপাঠ হইতেছিল। পাঠক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকেই হরিকথা শুনাইতেছেন ভাবিয়া ভক্তিভরে পাঠ করিতেছিলেন এবং শ্রোতৃবৃন্দও তাঁহারই দিব্যাবির্ভাবের সম্মুখে বসিয়া হরিকথামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছি ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছিলেন। ঠাকুরের আগমনে শ্রোতা ও পাঠকের সে উল্লাস ও ভক্তিভাব যে শতগুণে সজীব হইয়া উঠিল, ইহা আর বলিতে হইবে না।

ঠাকুরের 'চৈতন্যাসন'-গ্রহণ

ভাগবতের অমৃতোপম কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং 'শ্রীচৈতন্যাসন'-এর অভিমুখে সহসা ছুটিয়া যাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন যে তাঁহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত হইল না! কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখের সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিসকলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় সেইপ্রকার ঊর্ধ্বোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ

দেখিয়া বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন ঠাকুর ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন! তাঁহার শরীর-মন এবং ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যের শরীর-মনের মধ্যে স্থূলদৃষ্টে দেশকাল এবং অন্য নানা বিষয়ের বিস্তর ব্যবধান যে রহিয়াছে, ভাবমুখে ঊর্ধ্বে উঠিয়া সে বিষয়ের কিছুমাত্র প্রত্যক্ষই তিনি আর তখন করিতেছেন না। পাঠক পাঠ ভুলিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; শ্রোতারাও ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ ধরিতে বুঝিতে না পারিলেও একটা অব্যক্ত দিব্য ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মুগ্ধ শান্ত হইয়া রহিলেন, ভাল-মন্দ কোন কথাই সে সময়ে কেহ আর বলিতে সমর্থ হইলেন না। ঠাকুরের প্রবল ভাবপ্রবাহে সকলেই তৎকালের নিমিত্ত অবশ হইয়া অনির্দেশ্য কোন এক প্রদেশে যেন ভাসিয়া চলিয়াছেন—এইরূপ একটা অনির্বচনীয় আনন্দের উপলব্ধি করিয়া প্রথম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরে ঐ অব্যক্তভাব-প্রেরিত হইয়া সকলে মিলিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া নামসঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সমাধিতত্ত্বের আলোচনার[9] পূর্বে একস্থলে আমরা বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের যে নামবিশেষের ভিতর অনন্ত দিব্য ভাবরাশির উপলব্ধি করিয়া মন সমাধিলীন হয়, সেই নামাবলম্বনেই আবার সে নিম্নে নামিয়া বহির্জগতের উপলব্ধি করিয়া থাকে—ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে আমরা প্রত্যহ বারংবার ইহা বিশেষভাবে দেখিয়াছি। এখনও তাহাই হইল; সঙ্কীর্তনে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে ঠাকুরের নিজশরীরের কতকটা হুঁশ আসিল এবং ভাবে প্রেমে বিভোর অবস্থায় কীর্তনসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি কখনও উদ্দাম মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন, আবার কখনও বা ভাবের আতিশয্যে সমাধিমগ্ন হইয়া স্থির নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টায় উপস্থিত সাধারণের ভিতর উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়া সকলেই কীর্তনে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখন 'শ্রীচৈতন্যের আসন' ঠাকুরের ঐরূপে অধিকার করাটা ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় হইয়াছে, এ কথার বিচার আর করে কে? এইরূপে উদ্দাম তাণ্ডবে বহুক্ষণ শ্রীহরির ও শ্রীমহাপ্রভুর গুণাবলীকীর্তনের পর সকলে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া সেদিনকার সে দিব্য অভিনয় সাঙ্গ করিলেন এবং ঠাকুরও অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐরূপ করায় বৈষ্ণবসমাজে আন্দোলন

ঠাকুরের দিব্যপ্রভাবে হরিনামতাণ্ডবে উচ্চভাবপ্রবাহে উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য মানবের দোষদৃষ্টি স্তব্ধীভূত হইয়া থাকিলেও তাঁহার সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পর আবার সকলে পূর্বের ন্যায় 'পুনর্মূষিক'ভাব প্রাপ্ত হইল। বাস্তবিক, জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ভক্তিসহায়ে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইতে যে সকল ধর্ম শিক্ষা দেয়, তাহাদের উহাই দোষ। ঐ সকল ধর্মপথের পথিকগণ শ্রীহরির নামসঙ্কীর্তনাদি-সহায়ে কিছুক্ষণের জন্য আধ্যাত্মিকভাবের উচ্চ আনন্দাবস্থায় অতি সহজে উঠিলেও পরক্ষণেই আবার তেমনি নিম্নে নামিয়া পড়েন। উহাতে তাঁহাদের বিশেষ দোষ নাই; কারণ উত্তেজনার পর অবসাদ আসাটা প্রকৃতির অন্তর্গত শরীর ও মনের ধর্ম। তরঙ্গের পরেই 'গোড়', উত্তেজনার পরেই অবসাদ আসাটাই প্রকৃতির নিয়ম। হরিসভার সভ্যগণও উচ্চ ভাবপ্রবাহের অবসাদে এখন নিজ নিজ পূর্বপ্রকৃতি ও সংস্কারের বশবর্তী হইয়া ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন! এক দল ঠাকুরের ভাবমুখে 'শ্রীচৈতন্যাসন' ঐরূপে গ্রহণ করার পক্ষ সমর্থন করিতে এবং অন্য দল ঐ কার্যের তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত হইলেন। উভয় দলে ঘোরতর দ্বন্দ্ব ও বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হইল, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইল না।

চৈতন্যাসন-গ্রহণের কথা শুনিয়া ভগবানদাসের বিরক্তি

ক্রমে ঐ কথা লোকমুখে বৈষ্ণবসমাজের সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভগবানদাস বাবাজীও উহা শুনিতে পাইলেন। শুধু শুনাই নহে, ভবিষ্যতে আবার ঐরূপ হইতে পারে—ভগবদ্ভাবের ভান করিয়া নামযশঃপ্রার্থী ধূর্ত ভণ্ডেরাও ঐ আসন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐরূপে অধিকার করিয়া বসিতে পারে ভাবিয়া হরিসভার সভ্যগণের কেহ কেহ তাঁহার নিকটে ঐ আসন ভবিষ্যতে কিভাবে রক্ষা করা কর্তব্য সে বিষয়ে মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত সিদ্ধ বাবাজী নিজ ইষ্টদেবতার আসন অজ্ঞাতনামা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে শুনা অবধি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন। এমনকি, ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার উদ্দেশে কটুকাটব্য বলিতে এবং তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হরিসভার সভ্যগণের দর্শনে বাবাজীর সেই বিরক্তি ও ক্রোধ যে এখন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল এবং ঐরূপ বিসদৃশ কার্য সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়ায় তাঁহাদিগকেও যে বাবাজী অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বিশেষ ভর্ৎসনা করিলেন, এ কথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পরে ক্রোধশান্তি হইলে ভবিষ্যতে আর যাহাতে কেহ ঐরূপ আচরণ না করিতে পারে, বাবাজী সে বিষয়ে সকল বন্দোবস্ত নির্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু যাঁহাকে লইয়া হরিসভার এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল তিনি ঐসকল কথার বিশেষ কিছু জানিতে পারিলেন না।

ঠাকুরের ভগবানদাসের আশ্রমে গমন

ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বতঃপ্রেরিত হইয়া ভাগিনেয় হৃদয় ও মথুরবাবুকে সঙ্গে লইয়া কালনায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যূষে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিলে মথুর থাকিবার স্থান প্রভৃতির বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইত্যবসরে হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া শহর দেখিতে বহির্গত হইলেন এবং লোকমুখে ঠিকানা জানিয়া ক্রমে ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

হৃদয়ের বাবাজীকে ঠাকুরের কথা বলা

বালকস্বভাব ঠাকুর পূর্বাপরিচিত কোন ব্যক্তির সম্মুখীন হইতে হইলে সকল সময়েই একটা অব্যক্ত ভয়লজ্জাদিভাবে প্রথম অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ঠাকুরের এ ভাবটি আমরা অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ হইল। হৃদয়কে অগ্রে যাইতে বলিয়া আপনি প্রায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। হৃদয় ক্রমে বাবাজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, "আমার মামা ঈশ্বরের নামে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়েন; অনেক দিন হইতেই ঐরূপ অবস্থা। আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।"

বাবাজীর জনৈক সাধুর কার্যে বিরক্তি-প্রকাশ

হৃদয় বলেন, বাবাজীর সাধনসম্ভূত একটি শক্তির পরিচয় নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি পাইয়াছিলেন। কারণ, প্রণাম করিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিবার পূর্বেই তিনি বাবাজীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আশ্রমে যেন কোন মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, বোধ হইতেছে।" কথাগুলি বলিয়া বাবাজী নাকি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়াও দেখিয়াছিলেন; কিন্তু হৃদয় ভিন্ন অপর কাহাকেও সে সময়ে আগমন করিতে না দেখিয়া সম্মুখাবস্থিত ব্যক্তিসকলের সহিত উপস্থিত প্রসঙ্গেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। জনৈক বৈষ্ণব সাধু কি অন্যায় কার্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য—এই প্রসঙ্গই তখন চলিতেছিল; এবং বাবাজী সাধুর ঐরূপ বিসদৃশ কার্যে বিষম বিরক্ত হইয়া—তাঁহার কণ্ঠী (মালা) কাড়িয়া লইয়া সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া দিবেন, ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপস্থিত মণ্ডলীর এক পার্শ্বে দীনভাবে উপবিষ্ট হইলেন। সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত থাকায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভাল করিয়া কাহারও নয়নগোচর হইল না। তিনি ঐরূপে আসিয়া বসিবামাত্র হৃদয় তাঁহার পরিচায়ক পূর্বোক্ত কথাগুলি বাবাজীকে নিবেদন করিলেন। হৃদয়ের কথায় বাবাজী উপস্থিত কথায় বিরত হইয়া ঠাকুরকে এবং তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের আগমন হইল, ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বাবাজীর লোকশিক্ষা দিবার অহঙ্কার

বাবাজী হৃদয়ের সহিত কথার অবসরে মালা ফিরাইতেছেন দেখিয়া হৃদয় বলিলেন, "আপনি এখনও মালা রাখিয়াছেন কেন? আপনি সিদ্ধ হইয়াছেন, আপনার উহা এখন আর রাখিবার প্রয়োজন তো নাই?" ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে হৃদয় বাবাজীকে ঐরূপ প্রশ্ন করেন বা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া করেন, তাহা আমাদের জানা নাই। বোধ হয় শেষোক্ত ভাবেই ঐরূপ করিয়াছিলেন। কারণ, ঠাকুরের সেবায় সর্বদা নিযুক্ত থাকিয়া এবং তাঁহার সহিত সমাজের উচ্চাবচ নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া হৃদয়েরও তখন তখন

উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এবং যখন যেমন তখন তেমন কথা কহিবার ও প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার ক্ষমতা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বাবাজী হৃদয়ের ঐরূপ প্রশ্নে প্রথম দীনতা প্রকাশ করিয়া পরে বলিলেন, "নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্য ও-সকল রাখা নিতান্ত প্রয়োজন; নতুবা আমার দেখাদেখি লোকে ঐরূপ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।"

বাবাজীর ঐরূপ বিরক্তি ও অহঙ্কার দেখিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশে প্রতিবাদ

চিরকাল শ্রীশ্রীজগন্মাতার উপর সকল বিষয়ে বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আসায় ঠাকুরের নির্ভরশীলতা এত সহজ, স্বাভাবিক ও মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, নিজে অহঙ্কারের প্রেরণায় কোন কাজ করা দূরে থাকুক, অপর কেহ ঐরূপ করিতেছে বা করিব বলিতেছে দেখিলে বা শুনিলে তাঁহার মনে একটা বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। সেইজন্যেই তিনি ঈশ্বরের দাসভাবে অতি বিরল সময়ে 'আমি' কথাটির প্রয়োগ করা ছাড়া অপর কোন ভাবে আমাদের ন্যায় ঐ শব্দের উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। অল্প সময়ের জন্যও যে ঠাকুরকে দেখিয়াছে সেও তাঁহার ঐরূপ স্বভাব দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছে, অথবা অন্য কেহ কোন কর্ম 'আমি করিব' বলায় তাঁহার বিষম বিরক্তিপ্রকাশ দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছে—ঐ লোকটা কি এমন কুকাজ করিয়াছে যাহাতে তিনি এতটা বিরক্ত হইতেছেন! ভগবানদাসের নিকটে আসিয়াই ঠাকুর প্রথম শুনিলেন তিনি কণ্ঠী ছিঁড়িয়া লইয়া একজনকে তাড়াইয়া দিব বলিতেছেন। আবার অল্পক্ষণ পরেই শুনিলেন তিনি লোকশিক্ষা দিবার জন্যই এখনও মালা-তিলকাদি-ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। বাবাজীর ঐরূপে বারংবার 'আমি তাড়াইব, আমি লোকশিক্ষা দিব, আমি মালা-তিলকাদি ত্যাগ করি নাই' ইত্যাদি বলায় সরলস্বভাব ঠাকুর আর মনের বিরক্তি আমাদের ন্যায় চাপিয়া সভ্যভব্য হইয়া উপবিষ্ট থাকিতে পারিলেন না। একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি? তুমি এখনও এত অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে? তুমি তাড়াইবে? তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে? যাঁহার জগৎ তিনি না শিখাইলে তুমি শিখাইবে?"—ঠাকুরের তখন সে অঙ্গাবরণ পড়িয়া গিয়াছে। কটিদেশ হইতে বস্ত্রও শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে এবং মুখমণ্ডল এক অপূর্ব দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! তিনি তখন একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, কাহাকে কি বলিতেছেন তাহার কিছুমাত্র যেন বোধ নাই! আবার ঐ কয়েকটি কথামাত্র বলিয়াই ভাবের আতিশয্যে তিনি একেবারে নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

বাবাজীর ঠাকুরের কথা মানিয়া লওয়া

সিদ্ধ বাবাজীকে এ পর্যন্ত সকলে মান্য-ভক্তিই করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিতে বা তাঁহার দোষ দেখাইয়া দিতে এ পর্যন্ত কাহারও সামর্থ্যে ও সাহসে কুলায় নাই। ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টা দেখিয়া তিনি প্রথম বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ইতরসাধারণ মানব যেমন ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে ক্রোধপরবশ হইয়া প্রতিহিংসা লইতেই প্রবৃত্ত হয়, বাবাজীর মনে সেরূপ ভাবের উদয় হইল না! তপস্যা-প্রসূত সরলতা তাঁহার সহায় হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাগুলির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিল! তিনি বুঝিলেন, বাস্তবিকই এ জগতে ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কর্তা নাই। অহঙ্কৃত মানব যতই কেন ভাবুক না সে সকল কার্য করিতেছে, বাস্তবিক কিন্তু সে অবস্থার দাসমাত্র; যতটুকু অধিকার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে ততটুকুমাত্রই সে বুঝিতে ও করিতে পারে। সংসারী মানব যাহা করে করুক, ভক্ত ও সাধকের তিলেকের জন্য ঐ কথা বিস্মৃত হইয়া থাকা উচিত নহে। উহাতে তাঁহার পথভ্রষ্ট হইয়া পতনের সম্ভাবনা। এইরূপে ঠাকুরের শক্তিপূর্ণ কথাগুলিতে বাবাজীর অন্তর্দৃষ্টি অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে নিজের দোষ দেখাইয়া বিনীত ও নম্র করিল। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীরে অপূর্ব ভাববিকাশ দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল ইনি সামান্য পুরুষ নহেন।

ঠাকুর ও ভগবানদাসের প্রেমালাপ ও মথুরের আশ্রমস্থ সাধুদের সেবা

পরে ভগবৎপ্রসঙ্গে সেখানে যে এক অপূর্ব দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিল এ কথা আমাদের সহজেই অনুমিত হয়। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুহুর্মুহুঃ ভাবাবেশ ও উদ্দাম আনন্দে বাবাজী মোহিত হইয়া দেখিলেন যে, যে মহাভাবের শাস্ত্রীয় আলোচনা ও ধারণায় তিনি এতকাল কাটাইয়াছেন তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে

নিত্য প্রকাশিত! কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা গভীর হইয়া উঠিল। পরে যখন বাবাজী শুনিলেন ইনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস, যিনি কলুটোলার হরিসভায় ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া শ্রীচৈতন্যাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন ইঁহাকেই আমি অযথা কটুকাটব্য বলিয়াছি—ভাবিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ ও পরিতাপের অবধি রহিল না। তিনি বিনীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। এইরূপে ঠাকুর ও বাবাজীর সেদিনকার প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হইল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কিছুক্ষণ পরে মথুরের সন্নিধানে আগমন করিয়া ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইয়া বাবাজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করিলেন। মথুরবাবুও উহা শুনিয়া বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং আশ্রমস্থ দেববিগ্রহের সেবা ও একদিন মহোৎসবাদির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

[1] অবতারপুরুষেরা অনেক সময় একইভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মহামহিম ঈশা এক সময়ে তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন – “To him who hath more, more shall be given and from him who hath little, that little shall be taken away.” অর্থাৎ যাহার অধিক ভক্তি-বিশ্বাস আছে তাহাকে আরও ঐ ভাব দেওয়া হইবে। আর যাহার ভক্তি-বিশ্বাস অল্প তাহার নিকট হইতে সেই অল্পটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইবে।

[2] ঠাকুর এ কথাগুলি অন্যভাবে বলিয়াছিলেন।

[3] ললিতবিস্তর ৯।৫৭।

[4] জাগ প্রদীপ।

[5] বাঁশ-খড়ে তৈয়ারি একজন মাত্র লোকের বাসোপযোগী ঘরকে এখানে কুপ বলে। একটি মোচার অগ্রভাগ কাটিয়া জমির উপর বসাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখিতে হয় কুপও দেখিতে তদ্রূপ।

[6] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, সপ্তম অধ্যায়ের শেষভাগ দেখ।

[7] সপ্তম অধ্যায়ের পূর্বভাগ দেখ।

[8] পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

[9] গুরুভাব – পূর্বার্ধ, সপ্তম অধ্যায় দেখ।

৪.৫. চতুর্থ অধ্যায়: গুরুভাব-সম্বন্ধে শেষ কথা

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

– গীতা, ৪।৬-৮

বেদে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে সর্বজ্ঞ বলায় আমাদের না বুঝিয়া বাদানুবাদ

বেদপ্রমুখ শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বজ্ঞ হন। সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহার মনে কোনরূপ মিথ্যা সঙ্কল্পের কখনও উদয় হয় না। তাঁহারা যখনই যে বিষয় জানিতে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সে বিষয় তখনই প্রকাশিত হয়, অথবা তদ্বিষয়ের তত্ত্ব তাঁহারা বুঝিতে পারেন। কথাগুলি শুনিয়া ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা পূর্বে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া কতই না মিথ্যা তর্কের অবতারণা করিয়াছি! বলিয়াছি, ঐ কথা যদি সত্য হয় তবে ভারতের পূর্ব পূর্ব যুগের ব্রহ্মজ্ঞেরা জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলেন কেন? হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্র মিলিত হইয়া যে জল হয়, এ কথা ভারতের কোন্ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন? তড়িৎশক্তির সহায়ে চার-পাঁচ ঘণ্টার ভিতরেই যে ছয় মাসের পথ আমেরিকাপ্রদেশের সংবাদ আমরা এখানে বসিয়া পাইতে পারি এ কথা তাঁহারা বলিয়া যান নাই কেন? অথবা যন্ত্রসাহায্যে মানুষ যে বিহঙ্গমের ন্যায় আকাশচারী হইতে পারে, এ কথাই বা জানিতে পারেন নাই কেন?

ঠাকুর উহা কি ভাবে সত্য বলিয়া বুঝাইতেন; "ভাতের হাঁড়ির একটি ভাত টিপে বুঝা, সিদ্ধ হয়েছে কি না"

ঠাকুরের নিকট আসিয়াই শুনিলাম, শাস্ত্রের *ঐ* কথা *ঐ*ভাবে বুঝিতে যাইলে তাহার কোন অর্থই পাওয়া যাইবে না; অথচ শাস্ত্র যেভাবে *ঐ* কথা বলিয়াছেন, সেভাবে দেখিলে উহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হইবে। এজন্য ঠাকুর শাস্ত্রের *ঐ* কথা দুই-একটি গ্রাম্য দৃষ্টান্তসহায়ে বুঝাইয়া বলিতেন, "হাঁড়িতে ভাত ফুটছে; চালগুলি সুসিদ্ধ হয়েছে কি না জান্তে তুই তার ভেতর থেকে একটা ভাত তুলে টিপে দেখলি যে হয়েছে–আর অমনি বুঝতে পারলি যে, সব চালগুলি সিদ্ধ হয়েছে। কেন? তুই তো ভাতগুলির সব এক একটি করে টিপে টিপে দেখলি না–তবে কি করে বুঝলি? *ঐ* কথা যেমন বোঝা যায়, তেমনি জগৎসংসারটা নিত্য কি অনিত্য, সৎ কি অসৎ–এ কথাও সংসারের দুটো-চারটে জিনিস পরখ (পরীক্ষা) করে দেখেই বোঝা যায়। মানুষটা জন্মাল, কিছুদিন বেঁচে রইল, তারপর মলো, গরুটাও–তাই; গাছটাও–তাই; এইরূপে দেখে দেখে বুঝলি যে, যে জিনিসেরই নাম আছে, রূপ আছে, সেগুলোরই এই ধারা। পৃথিবী, সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, সকলের নাম রূপ আছে, অতএব তাদেরও এই ধারা। এইরূপে জানতে পারলি, সমস্ত জগৎ-সংসারটারই এই স্বভাব। তখন জগতের ভিতরের সব জিনিসেরই স্বভাবটা জানলি–কি না? এইরূপে যখনি সংসারটাকে ঠিক ঠিক অনিত্য, অসৎ বলে বুঝবি, অমনি সেটাকে আর ভালবাসতে পারবি না–মন থেকে ত্যাগ করে নির্বাসনা হবি। আর যখনি ত্যাগ করবি, তখনি জগৎকারণ ঈশ্বরের দেখা পাবি। ঐরূপে যার ঈশ্বরদর্শন হলো, সে সর্বজ্ঞ হলো না তো কি হলো তা বল!"

কোন বিষয়ের উৎপত্তির কারণ হইতে লয় অবধি জানাই তদ্বিষয়ের সর্বজ্ঞতা; ঈশ্বর-লাভে জগৎ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ হয়

ঠাকুরের এত কথার পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম—ঠিক কথাই তো, একভাবে সর্বজ্ঞই তো সে হইল বটে! কোন একটা পদার্থের আদি মধ্য ও অন্ত দেখিতে পাওয়া এবং ঐ পদার্থটার উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে তাহা দেখিতে বা জানিতে পারাকেই তো আমরা সেই পদার্থের জ্ঞান বলিয়া থাকি। তবে পূর্বোক্তভাবে জগৎসংসারটাকে জানা বা বুঝাকেও জ্ঞান বলিতে হইবে। আবার ঐ জ্ঞান জগদন্তর্গত সকল পদার্থ সম্বন্ধেই সমভাবে সত্য। কাজেই উহাকে জগদন্তর্গত সব পদার্থের জ্ঞান বলিতে হয় এবং যাঁহার ঐরূপ জ্ঞান হয়, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ তো বাস্তবিকই বলা যায়। শাস্ত্র তো তবে ঠিকই বলিয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হন, একথাও সত্য। ঐকথার অর্থ। ঠাকুরের জীবন দেখিয়া ঐ সম্বন্ধে কি বুঝা যায়। "হাড়মাসের খাঁচায় মন আনতে পারলুম না!"

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সত্যসঙ্কল্প হন, সিদ্ধসঙ্কল্প হন, শাস্ত্রীয় ঐ বচনেরও তখন একটা মোটামুটি অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম। বুঝিতে পারিলাম যে, এক একটা বিষয়ে মনের সমগ্র চিন্তাশক্তি একত্রিত করিয়া অনুসন্ধানেই আমাদের তত্তদ্বিষয়ে জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ। তবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, যিনি আপন মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত এবং আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি যখনই যে কোন বিষয় জানিবার জন্য মনের সর্বশক্তি একত্রিত করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই অতি সহজে যে তিনি ঐ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন, এ কথা তো বিচিত্র নহে। তবে উহার ভিতর একটা কথা আছে—যিনি সমগ্র জগৎসংসারটাকে অনিত্য বলিয়া ধ্রুব ধারণা করিয়াছেন এবং সর্বশক্তির আকরস্বরূপ জগৎকারণ ঈশ্বরকে প্রেমে সাক্ষাৎসম্বন্ধেও ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহার রেলগাড়ি চালাইতে, মানুষমারা কলকারখানা নির্মাণ করিতে সঙ্কল্প বা প্রবৃত্তি হইবে কি না। যদি ঐরূপ সঙ্কল্প তাঁহাদের মনে উদিত হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলেই তো আর ঐরূপ কলকারখানা নির্মিত হইল না। ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে দেখিলাম, বাস্তবিকই ঐরূপ হয়। বাস্তবিকই তাঁহাদের ভিতর ঐরূপ প্রবৃত্তির উদয় হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। ঠাকুর কাশীপুরে দারুণ ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, এমন সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা, আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত মনঃশক্তি-প্রয়োগে রোগমুক্ত হইতে সজল-নয়নে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি ঐরূপ চেষ্টা বা সঙ্কল্প করিতে পারিলেন না! বলিলেন, ঐরূপ করিতে যাইয়া সঙ্কল্পের একটা দৃঢ়তা বা আঁট কিছুতেই মনে আনিতে পারিলেন না! বলিলেন, "এ হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর মনকে সচ্চিদানন্দ হতে ফিরিয়ে কিছুতেই আনতে পারলুম না! সর্বদা শরীরটাকে তুচ্ছ হেয় জ্ঞান করে যে মনটা জগদম্বার পাদপদ্মে চিরকালের জন্য দিয়েছি, সেটাকে এখন তা থেকে ফিরিয়ে শরীরটাতে আনতে পারি কি রে?"

ঐ বিষয় বুঝিতে ঠাকুরের জীবন হইতে আর একটি ঘটনার উল্লেখ। "মন উঁচু বিষয়ে রয়েচে, নীচে নামাতে পারলুম না"

আর একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে করিলে পাঠকের ঐ বিষয়টি বুঝা সহজ হইবে। বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে ঠাকুর একদিন আসিয়াছেন। বেলা তখন দশটা হইবে। ঠাকুরের এখানে সে দিন আসাটা পূর্ব হইতে স্থির ছিল। কাজেই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকগুলি যুবক ভক্ত তাঁহার দর্শনলাভের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কখনও ঠাকুরের সহিত এবং কখনও তাঁহাদের পরস্পরের ভিতরে নানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় দেখার কথায় ক্রমে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের কথা আসিয়া পড়িল। স্থূল চক্ষে যাহা দেখা যায় না, ঐরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থও উহার সহায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, একগাছি অতি ক্ষুদ্র রোমকে ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিলে একগাছি লাঠির মতো দেখায় এবং দেহের প্রত্যেক রোমগাছটি পেঁপের ডালের মতো ফাঁপা ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি নানা কথা শুনিয়া

ঠাকুর ঐ যন্ত্রসহায়ে দুই-একটি পদার্থ দেখিতে বালকের ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাজেই ভক্তগণ স্থির করিলেন, সেদিন অপরাহ্ণেই কাহারও নিকট হইতে ঐ যন্ত্র চাহিয়া আনিয়া ঠাকুরকে দেখাইবেন।

তখন অনুসন্ধানে জানা গেল, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ স্বামীজীর ভ্রাতা, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ—তিনি অল্প দিন মাত্রই ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—ঐরূপ একটি যন্ত্র মেডিকেল কলেজ হইতে পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ যন্ত্রটি আনয়ন করিয়া ঠাকুরকে দেখাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোক প্রেরিত হইল। তিনিও সংবাদ পাইয়া কয়েক ঘণ্টা পরে বেলা চারিটা আন্দাজ যন্ত্রটি লইয়া আসিলেন এবং উহা ঠিকঠাক করিয়া খাটাইয়া ঠাকুরকে তন্মধ্য দিয়া দেখিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

ঠাকুর উঠিলেন, দেখিতে যাইলেন, কিন্তু না দেখিয়াই আবার ফিরিয়া আসিলেন! সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "মন এখন এত উঁচুতে উঠে রয়েছে যে, কিছুতেই এখন তাকে নামিয়ে নিচের দিকে দেখতে পারছি না।" আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম—ঠাকুরের মন যদি নামিয়া আসে তজ্জন্য। কিন্তু কিছুতেই সেদিন আর ঠাকুরের মন ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে নামিল না—কাজেই তাঁহার আর সেদিন অণুবীক্ষণসহায়ে কোন পদার্থই দেখা হইল না। বিপিনবাবু আমাদের কয়েকজনকে ঐ সকল দেখাইয়া অগত্যা যন্ত্রটি ফিরাইয়া লইয়া যাইলেন।

ঠাকুরের দুই দিক দিয়া দুই প্রকারের সকল বস্তু ও বিষয় দেখা

দেহাদি-ভাব ছাড়াইয়া ঠাকুরের মন যখন যত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে বিচরণ করিত, তখন তাঁহার তত্তৎ ভূমি হইতে লব্ধ তত অসাধারণ দিব্যদর্শনসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইত এবং দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইয়া যখন তিনি সর্বোচ্চ অদ্বৈতভাবভূমিতে বিচরণ করিতেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দনাদি দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া দেহটা মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত এবং মনের চিন্তাকল্পনাদি সমস্ত ব্যাপারও সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া যাইয়া তিনি অখণ্ডসচ্চিদানন্দের সহিত এককালে অপৃথকভাবে অবস্থান করিতেন।

অদ্বৈত ভাবভূমি ও সাধারণ ভাবভূমি—১মটি হইতে ইন্দ্রিয়াতীত দর্শন; ২য়টি হইতে ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন

আবার ঐ সর্বোচ্চ ভাবভূমি হইতে নিম্নে নিম্নতর ভূমিতে ক্রমে ক্রমে নামিতে নামিতে যখন ঠাকুরের মানবসাধারণের ন্যায় 'এই দেহটা আমার'—পুনরায় এইরূপ ভাবের উদয় হইত, তখন তিনি আবার আমাদের ন্যায় চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, ত্বকদ্বারা স্পর্শ এবং মনের দ্বারা চিন্তা-সঙ্কল্পাদি করিতেন।

সাধারণ মানব ২য় প্রকারেই সকল বিষয় দেখে

পাশ্চাত্যের একজন প্রধান দার্শনিক[1] মানব মনের সমাধিভূমিতে ঐপ্রকারের আরোহণ-অবরোহণের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াই সাধারণ মানবের দেহান্তর্গত চৈতন্যও যে সকল সময় একাবস্থায় থাকে না, এইপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ মতই যে যুক্তিযুক্ত এবং ভারতের পূর্ব পূর্ব সকল ঋষিগণের অনুমোদিত, এ কথা আর বলিতে হইবে না। তবে সাধারণ মানব ঐ উচ্চতম অদ্বৈত-ভাবভূমিতে বহুকাল আরোহণ না করিয়া উহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়াদি-সহায়েই কেবলমাত্র জ্ঞানলাভ করা যায়, এই কথাটায় একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারে একপ্রকার নোঙর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। নিজ জীবনে তদ্বিপরীত করিয়া দেখাইয়া তাহার ঐ ভ্রম দূর করিতেই যে ঠাকুরের ন্যায় অবতারপ্রথিত জগদ্‌গুরু আধিকারিক পুরুষসকলের কালে কালে উদয়—এ কথাই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দিতেছেন।

ঠাকুরের দুই প্রকার দৃষ্টির দৃষ্টান্ত

সে যাহাই হউক, এখন বুঝা যাইতেছে যে, ঠাকুর সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আমাদের মতো কেবল একভাবেই দেখিতেন না। উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিসকলে আরোহণ করিয়া ঐসকল বস্তু ও ব্যক্তিকে যেমন দেখায়, তাহাও সর্বদা দেখিতে পাইতেন। তজ্জন্যই তাঁহার সংসারের কোন বিষয়েই আমাদের ন্যায় একদেশী মত ও ভাবাবলম্বী হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; এবং সেজন্যই তিনি আমাদের কথা ও ভাব ধরিতে বুঝিতে পারিলেও আমরা তাঁহার কথা ও ভাব বুঝিতে পারিতাম না। আমরা মানুষটাকে মানুষ বলিয়া, গরুটাকে গরু বলিয়া, পাহাড়টাকে পাহাড় বলিয়াই কেবল জানি। তিনি দেখিতেন মানুষটা, গরুটা, পাহাড়টা—মানুষ, গরু ও পাহাড় বটে; অধিকন্তু আবার দেখিতেন, সেই মানুষ, গরু ও পাহাড়ের ভিতর হইতে সেই জগৎকারণ অখণ্ডসচ্চিদানন্দ উঁকি মারিতেছেন! মানুষ, গরু ও পাহাড়রূপ আবরণে আবৃত হওয়ায় কোথাও তাঁহার অঙ্গ (প্রকাশ) অধিক দেখা যাইতেছে এবং কোথাও বা কম দেখা যাইতেছে এইমাত্র প্রভেদ। সেজন্যই ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি –

ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজের কথা ও দর্শন—"ভিন্ন ভিন্ন খোলগুলোর ভেতর থেকে মা উঁকি মারচে! রমণী বেশ্যাও মা হয়েছে!"

"দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিশের খোল যেমন হয়, দেখিসনি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য কাপড়ের, কোনটা চারকোণা, কোনটা গোল—সেই রকম। আর বালিশের ঐ সব রকম খোলের ভেতরে যেমন একই জিনিস তুলো ভরা থাকে—সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্বত সব খোলগুলোর ভেতরেই সেই এক অখণ্ডসচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাই রে, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারচেন! একটা অবস্থা হয়েছিল, যখন সদা-সর্বক্ষণ ঐ রকম দেখতুম। ঐ রকম অবস্থা দেখে বুঝতে না পেরে সকলে বোঝাতে, শান্ত করতে এল। রামলালের মা-টা সব কত কি বলে কাঁদতে লাগল; তাদের দিকে চেয়ে দেখছি কি যে, (কালীমন্দির দেখাইয়া) ঐ মা-ই নানা রকমে সেজে এসে ঐ রকম করচে! ঢং দেখে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম আর বলতে লাগলুম, 'বেশ সেজেচ!' একদিন কালীঘরে আসনে বসে মাকে চিন্তা করচি; কিছুতেই মার মূর্তি মনে আনতে পারলুম না। তারপর দেখি কি—রমণী বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান করতে আসত, তার মতো হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারচে! দেখে হাসি আর বলি, 'ওমা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে—তা বেশ, ঐরূপেই আজ পূজো নে!' ঐ রকম করে বুঝিয়ে দিলে—'বেশ্যাও আমি—আমি ছাড়া কিছু নেই!' আর একদিন গাড়ি করে মেছোবাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্চে, আর মোহিনী হয়ে লোকের মন ভুলুচ্চে! দেখে অবাক হয়ে বললুম, 'মা! তুই এখানে এইভাবে রয়েছিস?'—বলে প্রণাম করলুম!" উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া ঐরূপে সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। অতএব ঠাকুরের ঐসকল উপলব্ধির কথা বুঝিব কিরূপে?

ঠাকুরের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাধারণাপেক্ষা তীক্ষ্ণতা। উহার কারণ—ভোগসুখে অনাসক্তি। আসক্ত ও অনাসক্ত মনের কার্যতুলনা

আবার দেহাদি-ভাব লইয়া ঠাকুর যখন আমাদের ন্যায় সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিতেন, তখনও স্বার্থ-ভোগসুখ-স্পৃহার বিন্দুমাত্রও মনেতে না থাকায় ঠাকুরের বুদ্ধি ও দৃষ্টি আমাদিগের অপেক্ষা কত বিষয় অধিক ধরিতে এবং তলাইয়া বুঝিতেই না সক্ষম হইত! যে ভোগসুখটা লাভ করিবার প্রবল কামনা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে, খাইতে শুইতে দেখিতে শুনিতে বেড়াইতে ঘুমাইতে বা অপরের সহিত আলাপাদি করিতে—সকল সময়ে উহারই অনুকূল বিষয়সমূহ

আমাদের নয়নে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাসিত হয় এবং তজ্জন্য আমাদের মন উহার প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে উপেক্ষা করিয়া পূর্বোক্ত বিষয়সকলের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐরূপে উপেক্ষিত প্রতিকূল ব্যক্তি ও বিষয়সকলের স্বভাব জানিবার আর আমাদের অবসর হইয়া উঠে না। এইরূপে কতকগুলি বস্তু ও ব্যক্তিকেই আপনার করিয়া লইয়া বা নিজস্ব করিয়া লইবার চেষ্টাতেই আমরা জীবনটা কাটাইয়া দিয়া থাকি। এইজন্যই ইতরসাধারণ মানবের ভিতর জ্ঞানলাভ করিবার ক্ষমতার এত তারতম্য দেখা যায়। আমাদের সকলেরই চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেও ঐসকলের সমভাবে সকল বিষয়ে চালনা করিয়া জ্ঞানোপার্জন করিতে আমরা সকলে পারি কই? এইজন্যই আমাদের ভিতরে যাহাদের স্বার্থপরতা এবং ভোগস্পৃহা অল্প, তাহারাই অন্য সকলের অপেক্ষা সহজে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়।

ঠাকুরের মনের তীক্ষ্ণতার দৃষ্টান্ত

সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালেও ঠাকুরের দৃষ্টি যে কি তীক্ষ্ণ ছিল, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলে মন্দ হইবে না। আধ্যাত্মিক জটিল তত্ত্বসকল বুঝাইতে ঠাকুর সাধারণতঃ যে সকল দৃষ্টান্ত ও রূপকাদি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে ঐ তীক্ষ্ণদৃষ্টিমত্তার কতদূর পরিচয় যে পাওয়া যাইত, তাহা বলিবার নহে। উহার প্রত্যেকটির সহায়ে ঠাকুর যেন এক একটি জ্বলন্ত চিত্র দেখাইয়া ঐ জটিল বিষয় যে সম্ভবপর এ কথা শ্রোতার হৃদয়ে একেবারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেন!

সাংখ্য-দর্শন সহজে বুঝান—"বে-বাড়ির কর্তা-গিন্নী"

ধর, জটিল সাংখ্যদর্শনের কথা চলিয়াছে। ঠাকুর আমাদিগকে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বলিতে বলিতে বলিলেন, "ওতে বলে—পুরুষ অকর্তা, কিছু করেন না। প্রকৃতিই সকল কাজ করেন; পুরুষ প্রকৃতির ঐসকল কাজ সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দেখেন, প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোন কাজ করতে পারেন না।" শ্রোতারা তো সকলেই পণ্ডিত—অফিসের চাকুরে বাবু বা মুচ্ছুদ্দী, না হয় বড় জোর ডাক্তার, উকিল বা ডেপুটি, আর স্কুল-কলেজের ছোঁড়া; কাজেই ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়া সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। ভাবগতিক দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওই যে গো দেখনি, বে-বাড়িতে? কর্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আলবোলায় তামাক টানছে। গিন্নি কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে, একবার ওখানে বাড়িময় ছুটাছুটি করে এ কাজটা হলো কি না, ও কাজটা করলে কি না সব দেখচেন, শুনচেন, বাড়িতে যত মেয়েছেলে আসছে তাদের আদর অভ্যর্থনা করচেন আর মাঝে মাঝে কর্তার কাছে এসে হাতমুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্চেন—'এটা এইরকম করা হলো, ওটা এইরকম হলো, এটা করতে হবে, ওটা করা হবে না' ইত্যাদি। কর্তা তামাক টানতে টানতে সব শুনচেন আর 'হুঁ' 'হুঁ' করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্চেন! সেইরকম আর কি।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল এবং সাংখ্য-দর্শনের কথাও বুঝিতে পারিল!

ব্রহ্ম ও মায়া এক বুঝান—"সাপ চলছে ও সাপ স্থির"

পরে আবার হয়তো কথা উঠিল—"বেদান্তে বলে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক পদার্থ নহে; একই পদার্থ, কখনও পুরুষভাবে এবং কখনও বা প্রকৃতিভাবে থাকে।" আমরা বুঝিতে পারিতেছি না দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "সেটা কিরকম জানিস? যেমন সাপটা কখনো চলচে, আবার কখনো বা স্থির হয়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হয়ে আছে তখন হলো পুরুষভাব—প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। আর যখন সাপটা চলচে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে কাজ করছে!" ঐ চিত্রটি হইতে কথাটি বুঝিয়া সকলে ভাবিতে লাগিল, এত সোজা কথাটা বুঝিতে পারি নাই।

ঈশ্বর মায়াবদ্ধ নন–"সাপের মুখে বিষ থাকে, কিন্তু সাপ মরে না"

আবার হয়তো পরে কথা উঠিল, মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেতেই রহিয়াছেন, তবে কি ঈশ্বরও আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ? ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "না রে, ঈশ্বরের মায়া হলেও এবং মায়া ঈশ্বরে সর্বদা থাকলেও ঈশ্বর কখনও মায়াবদ্ধ হন না। এই দেখ না–সাপ যাকে কামড়ায় সেই মরে; সাপের মুখে বিষ সর্বদা রয়েছে, সাপ সর্বদা সেই মুখ দিয়ে খাচ্চে, ঢোক গিলচে, কিন্তু সাপ নিজে তো মরে না–সেই রকম!" সকলে বুঝিল, উহা সম্ভবপর বটে।

ঠাকুরের প্রকৃতিগত অসাধারণ পরিবর্তনসকল দেখিতে পাইয়া ধারণা–ঈশ্বর আইন বা নিয়ম বদলাইয়া থাকেন

ঐসকল দৃষ্টান্ত হইতেই বেশ বুঝা যায়, সাধারণ ভাবভূমিতে ঠাকুর যখন থাকিতেন তখন তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে কোনও পদার্থের কোনপ্রকার ভাবই লুক্কায়িত থাকিতে পারিত না। মানব-প্রকৃতির তো কথাই নাই, বাহ্য-প্রকৃতির অন্তর্গত যত কিছু পরিবর্তনও তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে আপন রূপ অপ্রকাশিত রাখিতে পারিত না। অবশ্য যন্ত্রাদিসহায়ে বাহ্য-প্রকৃতির যেসকল পরিবর্তন ধরা বুঝা যায়, আমরা সেসকলের কথা এখানে বলিতেছি না। আর এক আশ্চর্যের বিষয়, সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালে বাহ্য-প্রকৃতির অন্তর্গত পদার্থনিচয়ের যেসকল অসাধারণ পরিবর্তন বা বিকাশ লোকনয়নে সচরাচর পতিত হয় না, সেইগুলিই যেন অগ্রে ঠাকুরের নয়নের গোচরীভূত হইত! ঈশ্বরেচ্ছাতেই সৃষ্ট্যন্তর্গত সকল পদার্থের সকলপ্রকার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা তিনিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগদন্তর্গত বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ভাগ্যচক্রের নিয়ামক–এই ভাবটি ঠাকুরের প্রাণে প্রাণে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবার জন্যই যেন জগদম্বা ঠাকুরের সম্মুখে সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ঐ অসাধারণ প্রাকৃতিক বিকাশগুলি (exceptions) যখন তখন আনিয়া ধরিতেন! "যাঁহার আইন (Law) অথবা যিনি আইন করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে যে আইন পালটাইয়া আবার অন্যরূপ আইন করিতে পারেন"–ঠাকুরের ঐ কথাগুলির অর্থ আমরা তাঁহার বাল্যাবধি ঐরূপ দর্শন হইতেই স্পষ্ট পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ বিষয়ের কয়েকটি ঘটনা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

বজ্রনিবারক দণ্ডের কথায় ঠাকুরের নিজ দর্শন বলা–'তেতলা বাড়ির কোলে কুঁড়েঘর, তাইতে বাজ পড়লো'

আমরা তখন কলেজে তড়িৎশক্তি সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞানের বর্তমান যুগে আবিষ্কৃত বিষয়গুলির কিছু কিছু পড়িয়া মুগ্ধ হইতেছি। বালচপলতাবশে ঠাকুরের নিকটে একদিন ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া পরস্পর নানা কথা কহিতেছি। Electricity (তড়িৎ) কথাটির বারংবার উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, তোরা ও-কি বলছিস? ইলেক্টিক্টিক্ মানে কি?" ইংরেজী কথাটির ঐরূপ বালকের ন্যায় উচ্চারণ ঠাকুরের মুখে শুনিয়া আমরা হাসিতে লাগিলাম। পরে তড়িৎশক্তি-সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি তাঁহাকে বলিয়া বজ্রনিবারক দণ্ডের (Lightning Conductor) উপকারিতা, সর্বাপেক্ষা উচ্চ পদার্থের উপরেই বজ্রপতন হয়, এজন্য ঐ দণ্ডের উচ্চতা বাটীর উচ্চতাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়া উচিত–ইত্যাদি নানা কথা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলাম। ঠাকুর আমাদের সকল কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি যে দেখেছি, তেতলা বাড়ির পাশে ছোট চালাঘর–শালার বাজ্ তেতলায় না পড়ে তাইতে এসে ঢুকল! তার কি করলি বল! ও সব কি একেবারে ঠিকঠাক বলা যায় রে! তাঁর (ঈশ্বরের বা জগদম্বার) ইচ্ছাতেই আইন, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই উলটে পালটে যায়!" আমরাও সেবার মথুরবাবুর ন্যায় ঠাকুরকে প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Laws) বুঝাইতে যাইয়া ঠাকুরের ঐ প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া কি বলিব কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। বাজ্‌টা তেতলার দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, কি একটা অপরিজ্ঞাত কারণে সহসা তাহার গতি

পরিবর্তিত হইয়া চালায় গিয়া পড়িয়াছে, অথবা ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম একটি আধটিই হইতে দেখা যায়, অন্যত্র সহস্র স্থলে আমরা যেরূপ বলিতেছি সেইভাবে উচ্চ পদার্থেই বজ্রপতন হইয়া থাকে–ইত্যাদি নানা কথা আমরা ঠাকুরকে বলিলেও ঠাকুর প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মবশে ঘটিয়া থাকে এ কথা কিছুতেই বুঝিলেন না। বলিলেন, "হাজার জায়গায় তোরা যেমন বলচিস তেমনি না হয় হলো, কিন্তু দু-চার জায়গায় ঐরকম না হওয়াতেই ঐ আইন যে পালটে যায় এটা বোঝা যাচ্চে!"

রক্তজবার গাছে শ্বেতজবা-দর্শন

উদ্ভিদ-প্রকৃতির আলোচকেরা সর্বদা শ্বেত বা রক্তবর্ণের পুষ্পপ্রসবকারী উদ্ভিদসমূহে কখনও কখনও তদ্ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে বলিয়া গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন! কিন্তু ঐরূপ হওয়া এত অসাধারণ যে, সাধারণ মানব উহা কখনও দেখে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুরের জীবনে ঘটনা দেখ–মথুরবাবুর সহিত, প্রাকৃতিক নিয়ম সব সময় ঠিক থাকে না, ঈশ্বরেচ্ছায় অন্যরূপ হইয়া থাকে–এই বিষয় লইয়া যখন ঠাকুরের বাদানুবাদ হইয়াছে সেই সময়েই ঐরূপ একটি দৃষ্টান্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়া এবং মথুরবাবুকে উহা দেখাইয়া দেওয়া।

প্রকৃতিগত অসাধারণ দৃষ্টান্তগুলি হইতেই ঠাকুরের ধারণা–জগৎ-সংসারটা জগদম্বার লীলাবিলাস

ঐরূপ জীবন্ত প্রস্তর দেখা, মনুষ্য-শরীরের মেরুদণ্ডের শেষ ভাগের অস্থি (Coccyx) পশুপুচ্ছের মতো অল্পস্বল্প বাড়িয়া পরে আবার উহা কমিয়া যাইতে দেখা, স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে পুরুষশরীরকে স্ত্রীশরীরের ন্যায় যথাকালে সামান্যভাবে পুষ্পিত হইতে এবং পরে ঐ ভাবের প্রবলতা কমিয়া যাইলে উহা রহিত হইয়া যাইতে দেখা, প্রেতযোনি এবং দেবযোনিগত পুরুষসকলের সন্দর্শন করা প্রভৃতি ঠাকুরের জীবনে অনেক ঘটনা শুনিয়াছি। জগৎপ্রসূতি প্রকৃতিকে (Nature) আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে একেবারে বুদ্ধিশক্তিরহিত জড় বলিয়া ধারণা করিয়াছি বলিয়াই ঐসকল অসাধারণ ঘটনাবলীকে প্রকৃতির অন্তর্গত কার্যকারণসম্বন্ধবিচ্যুত সহসোৎপন্ন ঘটনাবলী (Natural aberrations) নাম দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসি এবং মনে করি প্রকৃতি যেসকল নিয়মে পরিচালিত, তাহার সকলগুলিই বুঝিতে পারিয়াছি। ঠাকুরের অন্যরূপ ধারণা ছিল। তিনি দেখিতেন–সমগ্র বাহ্যান্তঃ-প্রকৃতি জীবন্ত প্রত্যক্ষ জগদম্বার লীলাবিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাজেই ঐসকল অসাধারণ ঘটনাবলীকে তাঁহারই বিশেষ ইচ্ছাসম্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। আর কিছু না হইলেও ঠাকুরের মনে যে ঐরূপ ধারণায় আমাদের অপেক্ষা শান্তি ও আনন্দ অনেক পরিমাণে অধিক থাকিত, এ কথা আর বুঝাইতে হইবে না। ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ দৃষ্টান্তের কিছু কিছু উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি এবং পরেও করিব। এখন যাহা করা হইল, তাহা হইতেই পাঠক আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা পূর্বানুসরণ করি।

ঠাকুরের উচ্চ ভাবভূমি হইতে স্থানবিশেষে প্রকাশিত ভাবের জমাটের পরিমাণ বুঝা

প্রত্যেক বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঠাকুর পূর্বোক্ত প্রকারে দুই ভাবে দেখিয়া তবে তৎসম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিতেন। আমাদের ন্যায় কেবলমাত্র সাধারণ ভাবভূমি (ordinary plane of consciousness) হইতে দেখিয়াই যাহা হয় একটা মতামত স্থির করিতেন না। অতএব তীর্থভ্রমণ এবং সাধুসন্দর্শনও যে ঠাকুরের ঐ প্রকারে দুই ভাবে হইয়াছিল এ কথা আর বলিতে হইবে না। উচ্চ ভাবভূমি (higher plane of consciousness or super-consciousness) হইতে দেখিয়াই ঠাকুর, কোন্ তীর্থে কতটা পরিমাণে উচ্চ ভাবের জমাট আছে, অথবা মানব মনকে উচ্চ ভাবে আরোহণ করাইবার শক্তি কোন্ তীর্থের কতটা পরিমাণে আছে, তদ্বিষয়ে অনুভব করিতেন। ঠাকুরের রূপরসাদি-বিষয়সম্পর্কশূন্য সর্বদা দেবতুল্য পবিত্র মন ঐ সূক্ষ্ম বিষয় স্থির করিবার একটি অপূর্ব পরিচায়ক ও পরিমাপক যন্ত্র (detector) স্বরূপ ছিল। তীর্থে বা দেবস্থানে গমন করিলেই

উহা উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া সেইসকল স্থানের দিব্য প্রকাশ ঠাকুরের সম্মুখে প্রকাশিত করিত। উচ্চ ভাবভূমি হইতেই ঠাকুর কাশী স্বর্ণময় দেখিয়াছিলেন, কাশীতে মৃত্যু হইলে কি প্রকারে জীব সর্ববন্ধনবিমুক্ত হয়—তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে দিব্যভাবের বিশেষ প্রকাশ অনুভব করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে যে আজ পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সূক্ষ্মাবির্ভাব বর্তমান তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিসকল আবিষ্কার করা বিষয়ের প্রসিদ্ধি

কথিত আছে, বৃন্দাবনের দিব্যভাবপ্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেবই প্রথম অনুভব করেন। ব্রজের তীর্থাস্পদ স্থানসকল তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। ঐসকল স্থানে ভ্রমণকালে উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া তাঁহার মন যেখানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রকাশসকল অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিত, সেখানেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু পূর্ব যুগে বাস্তবিক সেইরূপ লীলা করিয়াছিলেন—এ কথায় রূপসনাতনাদি তাঁহার শিষ্যগণ প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং পরে তাঁহাদিগের মুখ হইতে শুনিয়া সমগ্র ভারতবাসী উহাতে বিশ্বাসী হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বোক্ত ভাবে বৃন্দাবনাবিষ্কারের কথা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ঐ প্রকার হওয়া যে সম্ভবপর, এ কথা একেবারেই মনে স্থান দিতাম না। উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া বস্তু বা ব্যক্তিসকলকে ঠাকুরের মনের ঐরূপে যথাযথ ধরিবার বুঝিবার ক্ষমতা দেখিয়াই এখন আমরা ঐ কথায় কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছি। ঠাকুরের জীবন হইতে ঐ বিষয়ের দুই-একটি দৃষ্টান্ত এখানে প্রদান করিলেই পাঠক আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ ঘটনা—বন-বিষ্ণুপুরে ৺মৃন্ময়ী দেবীর পূর্বমূর্তি ভাবে দর্শন

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় গ্রামে ছিল। ঠাকুর যে তথায় মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া সময়ে সময়ে কিছুকাল কাটাইয়া আসিতেন, এ কথা আমরা ইতঃপূর্বেই পাঠককে জানাইয়াছি। একবার ঐ স্থানে ঠাকুর রহিয়াছেন, এমন সময়ে হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামের সহিত গ্রামের এক ব্যক্তির বিষয়কর্ম লইয়া বচসা উপস্থিত হইল। বকাবকি ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হইল এবং রাজারাম হাতের নিকটেই একটি হুঁকা পাইয়া তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিল। আহত ব্যক্তি ফৌজদারী মকদ্দমা রুজু করিল এবং ঠাকুরের সম্মুখেই ঐ ঘটনা হওয়ায় এবং তাঁহাকে সাধু সত্যবাদী বলিয়া পূর্ব হইতে জানা থাকায় সে ব্যক্তি ঠাকুরকেই ঐ বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপে নির্বাচিত করিল। কাজেই সাক্ষ্য দিবার জন্য ঠাকুরকে বন-বিষ্ণুপুরে আসিতে হইল। পূর্ব হইতেই ঠাকুর রাজারামকে ঐরূপে ক্রোধান্ধ হইবার জন্য বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন; এখানে আসিয়া আবার বলিলেন, "ওকে (বাদীকে) টাকাকড়ি দিয়ে যেমন করে পারিস মকদ্দমা মিটিয়ে নে; নয়তো তোর ভাল হবে না; আমি তো আর মিথ্যা বলতে পারব না। জিজ্ঞাসা করলেই যা জানি ও দেখেছি সব কথা বলে দেব।" কাজেই রাজারাম ভয় পাইয়া মামলা আপসে মিটাইয়া ফেলিতে লাগিল।

ঠাকুরও সেই অবসরে বন-বিষ্ণুপুর শহরটি দেখিতে বাহির হইলেন।

বিষ্ণুপুর শহরের অবস্থা

এককালে ঐ স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। লাল-বাঁধ, কৃষ্ণ-বাঁধ প্রভৃতি বড় বড় দীঘি, অসংখ্য দেবমন্দির, যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরিষ্কার প্রশস্ত বাঁধানো পথসকল, বহুসংখ্যক বিপণিপূর্ণ বাজার, অসংখ্য ভগ্নমন্দির-স্তূপ এবং বহুসংখ্যক লোকের বাস এবং ব্যবসায়াদি করিতে গমনাগমনেই ঐ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিষ্ণুপুরের রাজারা এককালে বেশ প্রতাপশালী ধর্মপরায়ণ এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিষ্ণুপুর এককালে সঙ্গীতবিদ্যার চর্চাতেও প্রসিদ্ধ ছিল।

৺মদনমোহন

রূপসনাতনাদি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গগণের তিরোভাবের কিছুকাল পর হইতে রাজবংশীয়েরা বৈষ্ণবমতাবলম্বী হন। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ৺মদনমোহন বিগ্রহ পূর্বে এখানকার রাজাদেরই ঠাকুর ছিলেন। ৺গোকুলচন্দ্র মিত্র এখানকার রাজাদের এক সময়ে অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরটি দেখিয়া মোহিত হইয়া ঋণ পরিশোধকালে টাকা না লইয়া ঠাকুরটি চাহিয়া লইয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি।

৺মৃন্ময়ী

৺মদনমোহন ভিন্ন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ৺মৃন্ময়ী নাম্নী এক বহু প্রাচীন দেবীমূর্তিও ছিলেন। লোকে বলিত ৺মৃন্ময়ী দেবী বড় জাগ্রতা। রাজবংশীয়দের ভগ্নদশায় ঐ মূর্তি এক সময়ে এক পাগলিনী কর্তৃক ভগ্ন হয়। রাজবংশীয়েরা সেজন্য পূর্বমূর্তির মতো অন্য একটি নূতন মূর্তির পুনঃস্থাপনা করেন।

ঠাকুর এখানকার অপর দেবস্থানসকল দেখিয়া ৺মৃন্ময়ী দেবীকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে ভাবাবেশে ৺মৃন্ময়ীর মুখখানি দেখিতে পাইলেন। মন্দিরে যাইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত মূর্তিটি দেখিবার কালে দেখিলেন, ঐ মূর্তিটি তাঁহার ভাবকালে দৃষ্ট মূর্তিটির সদৃশ নহে। এইরূপ হইবার কারণ কিছুই বুঝিলেন না। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বাস্তবিকই নূতন মূর্তিটি পুরাতন মূর্তিটির মতো হয় নাই। নূতন মূর্তির কারিকর নিজ গুণপনা দেখাইবার জন্য উহার মুখখানি বাস্তবিক অন্য ভাবেই গড়িয়াছে এবং পুরাতন মূর্তিটির ভগ্ন মুখখানি এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে নিজালয়ে রক্ষিত হইতেছে। ইহার কিছুকাল পরে ঐ ভক্তিনিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ মুখখানি সংযোজিত করিয়া অন্য একটি মূর্তি গড়াইয়া লাল-বাঁধ দীঘির পার্শ্বে এক রমণীয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং উহার নিত্যপূজাদি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ঐরূপে ব্যক্তিগত ভাব ও উদ্দেশ্য ধরিবার ক্ষমতা—১ম দৃষ্টান্ত

সমীপাগত ব্যক্তিগণের আগমনের উদ্দেশ্য ও ভাব ধরিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তেরও এখানে উল্লেখ করা ভাল। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর নিজের পুত্রের মতো ভালবাসিতেন, এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরের সহিত, ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকের লম্বা বারান্দার উত্তরাংশে দাঁড়াইয়া নানা কথা কহিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, বাগানের ফটকের দিক হইতে একখানি জুড়িগাড়ি তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। গাড়িখানি ফিটন; মধ্যে কয়েকটি বাবু বসিয়া আছেন। দেখিয়াই কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তির গাড়ি বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে সে সময় কলিকাতা হইতে অনেকে আসিয়া থাকেন। ইঁহারাও সেইজন্যই আসিয়াছেন ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন না।

ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু গাড়ির দিকে পড়িবামাত্র তিনি ভয়ে জড়সড় হইয়া শশব্যস্তে অন্তরালে আপন ঘরে যাইয়া বসিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে ঢুকিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "যা—যা, ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস, এখন দেখা হবে না।" ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় বাহিরে আসিলেন। ইতোমধ্যে আগন্তুকেরাও নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে একজন সাধু থাকেন, না?" ব্রহ্মানন্দ স্বামী শুনিয়া ঠাকুরের নাম করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তিনি এখানে থাকেন। আপনারা তাঁহার নিকট কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন?" তাঁহাদের ভিতর এক ব্যক্তি বলিলেন, "আমাদের এক আত্মীয়ের বিষম পীড়া হইয়াছে; কিছুতেই সারিতেছে না। তাই ইনি (সাধু) যদি কোন ঔষধ দয়া করিয়া দেন, সেজন্য আসিয়াছি।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আপনারা ভুল শুনিয়াছেন। ইনি তো কখনও কাহাকেও ঔষধ দেন না। বোধ হয় আপনারা দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারীর

কথা শুনিয়াছেন। তিনি ঔষধ দিয়া থাকেন বটে। তিনি ঐ পঞ্চবটীতে কুটিরে আছেন। যাইলেই দেখা হইবে।”

আগন্তুকেরা ঐ কথা শুনিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে বলিলেন, “ওদের ভেতর কি যে একটা তমোভাব দেখলুম!—দেখেই আর ওদের দিকে চাইতে পারলুম না; তা কথা কইব কি! ভয়ে পালিয়ে এলুম!”

এইরূপে উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া ঠাকুরকে প্রত্যেক স্থান, বস্তু বা ব্যক্তির অন্তর্গত উচ্চাবচ ভাবপ্রকাশ উপলব্ধি করিতে আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাম। ঠাকুর যেরূপ দেখিতেন, ঐ সকলের ভিতরে বাস্তবিকই সেইরূপ ভাব যে বিদ্যমান, ইহা বারংবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াই আমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাসী হইয়াছি। তন্মধ্যে আরও দুই-একটি এখানে উল্লেখ করিয়া সাধারণ ভাবভূমি হইতে তিনি তীর্থাদিতে কি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই পাঠককে বলিতে আরম্ভ করিব।

ঐ বিষয়ে ২য় দৃষ্টান্ত—স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার দক্ষিণেশ্বরাগত সহপাঠিগণ

উদারচেতা স্বামী বিবেকানন্দের মন বাল্যকালাবধি পরদুঃখে কাতর হইত। সেজন্য তিনি যাহাতে বা যাঁহার সাহায্যে আপনাকে কোন বিষয়ে উপকৃত বোধ করিতেন, তাহা করিতে বা তাঁহার নিকটে ঐরূপ সাহায্য পাইবার জন্য গমন করিতে আপন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলকে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। লেখাপড়া ধর্মকর্ম সকল বিষয়েই স্বামীজীর মনের ঐ প্রকার রীতি ছিল। কলেজে পড়িবার সময় সহপাঠিদিগকে লইয়া নানা স্থানে নিয়মিত দিনে প্রার্থনা ও ধ্যানাদি-অনুষ্ঠানের জন্য সভা-সমিতি গঠন করা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভক্তাচার্য কেশবের সহিত স্বয়ং পরিচিত হইবার পরেই সহপাঠিদিগের ভিতর অনেককে উঁহাদের দর্শনের জন্য লইয়া যাওয়া প্রভৃতি যৌবনে পদার্পণ করিয়াই স্বামীজীর জীবনে অনুষ্ঠিত কার্যগুলি দেখিয়া আমরা পূর্বোক্ত বিষয়ের পরিচয় পাইয়া থাকি।

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রেমের পরিচয় পাওয়া অবধি নিজ সহপাঠী বন্ধুদিগকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া স্বামীজীর জীবনে একটা ব্রতবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা এ কথা বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন যে, বুদ্ধিমান স্বামীজী একদিনের আলাপে কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হইলেই তাহাকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইতেন। অনেকদিন পরিচয়ের ফলে যাহাদিগকে সৎস্বভাববিশিষ্ট এবং ধর্মানুরাগী বলিয়া বুঝিতেন, তাহাদিগকেই সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন।

‘চেষ্টা করলেই যার যা ইচ্ছা হ’তে পারে না’

স্বামীজী ঐরূপে অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবকেই তখন ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টি যে তাহাদের অন্তর দেখিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, এ কথা আমরা ঠাকুর ও স্বামীজী উভয়েরই মুখে সময়ে সময়ে শুনিয়াছি। স্বামীজী বলিতেন, “ঠাকুর আমাকে গ্রহণ করিয়া ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদিদানে আমার উপর যেরূপ কৃপা করিতেন, সেইরূপ কৃপা তাহাদিগকে না করায় আমি তাঁহাকে ঐরূপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিতাম। বালস্বভাববশতঃ অনেক সময় তাঁহার সহিত কোমর বাঁধিয়া তর্ক করিতেও উদ্যত হইতাম! বলিতাম, ‘কেন মহাশয়, ঈশ্বর তো আর পক্ষপাতী নন যে, একজনকে কৃপা করবেন এবং আর একজনকে কৃপা করবেন না? তবে কেন আপনি উহাদের আমার ন্যায় গ্রহণ করবেন না? ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সকলেই যেমন বিদ্বান পণ্ডিত হতে পারে, ধর্মলাভ ঈশ্বরলাভও যে তেমনি করতে পারে, এ কথা তো নিশ্চয়।’ তাহাতে ঠাকুর বলিতেন, ‘কি করব রে—আমাকে মা যে দেখিয়ে দিচ্চে, ওদের ভেতর ষাঁড়ের মতো পশুভাব রয়েছে, ওদের এ জন্মে ধর্মলাভ হবে না—তা আমি কি করব? তোর ও কি কথা? ইচ্ছা ও চেষ্টা করলেই কি লোকে এ জন্মে যা ইচ্ছা

তাই হতে পারে?' ঠাকুরের ও কথা তখন শোনে কে? আমি বলিতাম, 'সে কি মশায়, ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে যার যা ইচ্ছা তা হতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আমি আপনার ও কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না।' ঠাকুরের তাহাতেও ঐ কথা—'তুই বিশ্বাস করিস আর নাই করিস, মা যে আমায় দেখিয়ে দিচ্চে!' আমিও তখন তাঁর কথা কিছুতেই স্বীকার করতুম না। তার পর যত দিন যেতে লাগল, দেখে-শুনে তত বুঝতে লাগলুম—ঠাকুর যা বলেছেন তাই সত্য, আমার ধারণাই মিথ্যা।"

৩য় দৃষ্টান্ত—পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুরের জলপান করা

স্বামীজী বলিতেন—এইরূপে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়া তবে তিনি ঠাকুরের সকল কথায় ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রত্যেক কথা ও ব্যবহার ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার কথা আমরা স্বামীজীর নিকট হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার দিনে ঠাকুর স্বামীজীর নিকট হইতে শুনিয়া পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে দেখিতে গিয়াছিলেন।[2] শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে সাক্ষাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই যথার্থ ধর্মপ্রচারে সক্ষম, অপরসকল প্রচারক-নামধারীর বাগাড়ম্বর বৃথা—পণ্ডিতজীকে ঐরূপ নানা উপদেশদানের পর ঠাকুর পান করিবার জন্য এক গেলাস জল চাহিলেন। ঠাকুর যথার্থ তৃষ্ণার্ত হইয়া ঐরূপে জল চাহিলেন অথবা তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কারণ, ঠাকুর অন্য এক সময়ে আমাদের বলিয়াছিলেন যে, সাধু সন্ন্যাসী অতিথি ফকিরেরা কোন গৃহস্থের বাটীতে যাইয়া যাহা হয় কিছু খাইয়া না আসিলে তাহাতে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়; এবং সেজন্য তিনি যাহার বাটীতেই যান না কেন, তাহারা না বলিলে বা ভুলিয়া গেলেও স্বয়ং তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া কিছু না কিছু খাইয়া আসেন।

সে যাহা হউক, এখানে জল চাহিবামাত্র তিলক কণ্ঠি প্রভৃতি ধর্মলিঙ্গধারী এক ব্যক্তি সসম্ভ্রমে ঠাকুরকে এক গেলাস জল আনিয়া দিলেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ জল পান করিতে যাইয়া উহা পান করিতে পারিলেন না। নিকটস্থ অপর এক ব্যক্তি উহা দেখিয়া গেলাসের জলটি ফেলিয়া দিয়া আর এক গেলাস জল আনিয়া দিল এবং ঠাকুরও উহার কিঞ্চিৎ পান করিয়া পণ্ডিতজীর নিকট হইতে সেদিনকার মতো বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলে বুঝিল, পূর্বানীত জলে কিছু পড়িয়াছিল বলিয়াই ঠাকুর উহা পান করিলেন না।

স্বামীজী বলিতেন—তিনি তখন ঠাকুরের অতি নিকটেই বসিয়াছিলেন, সেজন্য বিশেষ করিয়া দেখিয়াছিলেন, গেলাসের জলে কুটোকাটা কিছুই পড়ে নাই, অথচ ঠাকুর উহা পান করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া স্বামীজী মনে মনে স্থির করিলেন, তবে বোধ হয় জল-গেলাসটি স্পর্শদোষদুষ্ট হইয়াছে! কারণ ইতঃপূর্বেই তিনি ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, যাহাদের ভিতর বিষয়-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, যাহারা জুয়াচুরি বাটপাড়ি এবং অপরের অনিষ্টসাধন করিয়া অসদুপায়ে উপার্জন করে এবং যাহারা কাম-কাঞ্চন-লাভের সহায় হইবে বলিয়া বাহিরে ধর্মের ভেক ধারণ করিয়া লোককে প্রতারিত করে, তাহারা কোনরূপ খাদ্যপানীয় আনিয়া দিলে তাঁহার হস্ত উহা গ্রহণ করিতে যাইলেও কিছুদূর যাইয়া আর অগ্রসর হয় না, পশ্চাতে গুটাইয়া আসে এবং তিনি উহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন!

স্বামীজী বলিতেন—ঐ কথা মনে উদিত হইবামাত্র তিনি ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য-নির্ধারণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন এবং ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে সেদিন তাঁহার সহিত আসিতে অনুরোধ করিলেও 'বিশেষ কোন আবশ্যক আছে, সেজন্য যাইতে পারিতেছি না' বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাইলে স্বামীজী পূর্বোক্ত ধর্মলিঙ্গধারী ব্যক্তির কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পূর্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাহাকে একান্তে ডাকিয়া তাহার অগ্রজের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে সে ব্যক্তি বিশেষ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, 'জ্যেষ্ঠের দোষের কথা কেমন করিয়া বলি' ইত্যাদি। স্বামীজী বলিতেন, "আমি তাহাতেই বুঝিয়া লইলাম।

পরে ঐ বাটীর অপর একজন পরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা জানিয়া ঐ বিষয়ে নিঃসংশয় হইলাম এবং অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম–ঠাকুর কেমন করিয়া লোকের অন্তরের কথা ঐরূপে জানিতে পারেন!”

ঠাকুরের মানসিক গঠন কি ভাবের ছিল এবং কোন্ বিষয়টির দ্বারা তিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে পরিমাপ করিয়া তাহাদের মূল্য বুঝিতেন

সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালে ঠাকুর যেরূপে সকল পদার্থের অন্তর্নিহিত গুণাগুণ ধরিতেন ও বুঝিতেন, তাহার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে তাঁহার মানসিক গঠন কি প্রকারের ছিল, তাহা বুঝিতে হইবে এবং পরে কোন্ পদার্থটিকে পরিমাপকস্বরূপে সর্বদা স্থির রাখিয়া তিনি অপর বস্তু ও বিষয়সকল পরিমাপ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহাও ধরিতে হইবে। লীলাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের কিছু কিছু আভাস আমরা পাঠককে ইতঃপূর্বেই দিয়াছি। অতএব এখন উহার সংক্ষেপ উল্লেখমাত্র করিলেই চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, ঠাকুরের মন পার্থিব কোন পদার্থে আসক্ত না থাকায় তিনি যখনই যাহা গ্রহণ বা ত্যাগ করিবেন মনে করিয়াছেন, তখনই উহা ঐ বিষয়ে সম্যক যুক্ত বা উহা হইতে সম্যক পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথক হইবার পর আজীবন আর ঐ বিষয়ের প্রতি একবারও ফিরিয়া দেখেন নাই। আবার ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব নিষ্ঠা, অদ্ভুত বিচারশীলতা এবং ঐকান্তিক একাগ্রতা তাঁহার মনের হস্ত সর্বদা ধারণ করিয়া উহাকে যাহাতে ইচ্ছা, যতদিন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা স্থিরভাবে রাখিয়াছে। একক্ষণের জন্যও উহাকে ঐ বিষয়ের বিপরীত চিন্তা বা কল্পনা করিতে দেয় নাই। কোন বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে যাইবামাত্র এ মনের একভাগ বলিয়া উঠিত, ‘কেন ঐরূপ করিতেছ তাহা বল।’ আর যদি ঐ প্রশ্নের যথাযথ যুক্তিসহ মীমাংসা পাইত তবেই বলিত, ‘বেশ কথা, ঐরূপ কর।’ আবার ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র ঐ মনের অন্য একভাগ বলিয়া উঠিত, ‘তবে পাকা করিয়া উহা ধর; শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, বিরামে কখনও উহার বিপরীত অনুষ্ঠান আর করিতে পারিবে না।’ তৎপরে তাঁহার সমগ্র মন এক তানে ঐ বিষয় গ্রহণ করিয়া তদনুকূল অনুষ্ঠান করিতে থাকিত এবং নিষ্ঠা প্রহরীস্বরূপে এরূপ সতর্কভাবে উহার ঐ বিষয়ক কার্যকলাপ সর্বদা দেখিত যে, সহসা ভুলিয়া ঠাকুর তদ্বিপরীতানুষ্ঠান করিতে যাইলে স্পষ্ট বোধ করিতেন ভিতর হইতে কে যেন তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে–ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে দিতেছে না। ঠাকুরের আজীবন সকল বস্তু ও ব্যক্তির সহিত ব্যবহারের আলোচনা করিলেই আমাদের পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত–“চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যায় আমার কাজ নেই”

দেখ না–বালক গদাধর কয়েকদিন পাঠশালে যাইতে না যাইতে বলিয়া বসিলেন, “ও চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যাতে আমার কাজ নাই, ও বিদ্যা আমি শিখব না!” ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার, ভ্রাতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া, কিছুকাল পরে বুঝাইয়া সুঝাইয়া কলিকাতায় আপনার টোলে, নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ঐ বিদ্যা শিখাইবার প্রয়াস পাইলেও ঠাকুরের অর্থকরী বিদ্যা সম্বন্ধে বাল্যকালের ঐ মত ঘুরাইতে পারিলেন না। শুধু তাহাই নহে, নিষ্ঠাচারী পণ্ডিত হইয়া টোল খুলিয়া যথাসাধ্য শিক্ষাদান করিয়াও পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইতে পারিলেন না বলিয়াই যে অনন্যোপায় অগ্রজের রানী রাসমণির দেবালয়ে পৌরোহিত্য-স্বীকার–এ কথাও ঠাকুরের নিকট লুক্কায়িত রহিল না এবং ধনীদিগের তোষামোদ করিয়া উপার্জনাপেক্ষা অগ্রজের ঐরূপ করা অনেক ভাল বুঝিয়া উহাকে তিনি অনুমোদনও করিলেন।

২য় দৃষ্টান্ত—ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শরীরের সন্ধিস্থলগুলিতে কাহারও যেন চাবি লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া—এই অনুভব ও শূলধারী এক ব্যক্তিকে দেখা

দেখ না—সাধনকালে ঠাকুর ধ্যান করিতে বসিবামাত্র তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল, তাঁহার শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থানগুলিতে খট্‌খট্‌ করিয়া আওয়াজ হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। তিনি যে ভাবে আসন করিয়া বসিয়াছেন, সেই ভাবে অনেকক্ষণ তাঁহাকে বসাইয়া রাখিবার জন্য কে যেন ভিতর হইতে ঐসকল স্থানে চাবি লাগাইয়া দিল। যতক্ষণ না আবার সে খুলিয়া দিল, ততক্ষণ হাত পা গ্রীবা কোমর প্রভৃতি স্থানের সন্ধিগুলি তিনি আমাদের মতো ফিরাইতে, ঘুরাইতে, যথা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলেও কিছুকাল আর করিতে পারিলেন না! অথবা দেখিলেন, শূলহস্তে এক ব্যক্তি নিকটে বসিয়া রহিয়াছে এবং বলিতেছে, 'যদি ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন অপর চিন্তা করিবি তো এই শূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!'

৩য় দৃষ্টান্ত—জগদম্বার পাদপদ্মে ফুল দিতে যাইয়া নিজের মাথায় দেওয়া ও পিতৃ তর্পণ করিতে যাইয়া উহা করিতে না পারা। নিরক্ষর ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভবসকলের দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র সপ্রমাণ হয়

দেখ না—পূজা করিতে বসিয়া আপনাকে জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞান করিতে বলিবামাত্র মন তাহাই করিতে লাগিল; জগদম্বার পাদপদ্মে বিল্বজবা দিতে যাইলেও ঠাকুরের হাত তখন কে যেন ঘুরাইয়া নিজ মস্তকের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিল!

অথবা দেখ—সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র মন সর্বভূতে এক অদ্বৈত ব্রহ্মদর্শন করিতেই থাকিল। অভ্যাসবশতঃ ঠাকুর ঐ কালে পিতৃতর্পণ করিতে যাইলে হাত আড়ষ্ট হইয়া গেল, অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া হাতে জল তুলিতেই পারিলেন না! অগত্যা বুঝিলেন, সন্ন্যাসগ্রহণে তাঁহার কর্ম উঠিয়া গিয়াছে! ঐরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অনাসক্তি, বিচারশীলতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এ মনের কত সহজ, কত স্বাভাবিক ছিল। আর বুঝা যায় যে, ঠাকুরের ঐরূপ দর্শনগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কথার অনুরূপ হওয়ায় শাস্ত্র যাহা বলেন তাহা সত্য। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—এবার ঠাকুরের নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ উহাই; হিন্দুর বেদবেদান্ত হইতে অপরাপর জাতির যাবতীয় ধর্মগ্রন্থে নিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকলের কথা যে সত্য এবং বাস্তবিকই যে মানুষ ঐসকল পথ দিয়া চলিয়া ঐরূপ অবস্থাসকল লাভ করিতে পারে, ইহাই প্রমাণিত করিবেন বলিয়া।

অদ্বৈতভাব লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ঐ ভাবে 'সব শেয়ালের এক রা।' শ্রীচৈতন্যের ভক্তি বাহিরের দাঁত ও অদ্বৈতজ্ঞান ভিতরের দাঁত ছিল। অদ্বৈতজ্ঞানের তারতম্য লইয়াই ঠাকুর ব্যক্তি ও সমাজে উচ্চাবচ অবস্থা স্থির করিতেন

ঠাকুরের মনের স্বভাব আলোচনা করিতে যাইয়া এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিয়া অদ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপলব্ধিই মানবজীবনের চরমে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার ঐ ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, 'সব শেয়ালের এক রা'; অর্থাৎ সকল শিয়ালই যেমন একভাবে শব্দ করে, তেমনি নির্বিকল্প ভূমিতে যাঁহারাই উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ ভূমি হইতে দর্শন করিয়া জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও ঠাকুর বলিতেন, "হাতির বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে মারবার জন্য এবং ভিতরের দাঁত নিজের খাবার জন্য, সেই রকম মহাপ্রভুর দ্বৈতভাব বাহিরের ও অদ্বৈতভাব ভিতরের জিনিস ছিল।" অতএব সর্বদা একরূপ অদ্বৈতভাবই যে ঠাকুরের সকল বিষয়ের পরিমাপক-স্বরূপ ছিল, এ কথা আর বলিতে হইবে না। ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমষ্টি সমাজকে যে ভাব ও অনুষ্ঠান ঐ ভূমির দিকে যত অগ্রসর করাইয়া দিত, ততই ঠাকুর ঐ ভাব ও অনুষ্ঠানকে অপর সকল ভাব ও অনুষ্ঠান হইতে উচ্চ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

স্বসংবেদ্য ও পরসংবেদ্য দর্শন

আবার ঠাকুরের আধ্যাত্মিকভাবপ্রসূত দর্শনগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের কতকগুলি স্বসংবেদ্য এবং কতকগুলি পরসংবেদ্য। অর্থাৎ উহাদের কতকগুলি ঠাকুরের নিজ শরীরাবদ্ধ মনের চিন্তাসকল, নিষ্ঠা ও অভ্যাসসহায়ে ঘনীভূত হইয়া মূর্তিধারণ করিয়া তাঁহার নিকট ঐরূপে প্রকাশিত হইত এবং ঠাকুর নিজেই দেখিতে পাইতেন; এবং কতকগুলি তিনি উচ্চ-উচ্চতর ভাবভূমিতে উঠিয়া নির্বিকল্প ভাবভূমির নিকটস্থ হইবার কালে বা ভাবমুখে অবস্থিত হইয়া দেখিয়া অপরের উহা অপরিজ্ঞাত হইলেও বর্তমানে বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং অপরে ঐসকলকে কালে বাস্তবিকই ঘটিতে দেখিত! ঠাকুরের প্রথম শ্রেণীর দর্শনগুলি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে অপরকে তাঁহার ন্যায় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাদিসম্পন্ন হইতে বা ঠাকুর যে ভূমিতে উঠিয়া ঐরূপ দর্শন করিয়াছেন, সেই ভূমিতে উঠিতে হইত, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলিকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হইলে লোকের বিশ্বাস বা অন্য কোনরূপ সাধনাদির আবশ্যক হইত না—ঐসকল যে সত্য, তাহা ফল দেখিয়া লোককে বিশ্বাস করিতেই হইত।

বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবস্থা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে না আসিয়া ঠাকুরের মন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না

সে যাহা হউক, ঠাকুরের মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি এবং এখন যেসকল কথা উপরে বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালেও ঐরূপ মন নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে। যেসকল বস্তু ও ব্যক্তির সম্পর্কে উহা একক্ষণের জন্যও উপস্থিত হইত, তৎসকলের স্বভাব রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উহা কখনও স্থির থাকিতে পারিত না। বাল্যকালে যেমন অর্থের জন্যই বর্তমান সময়ে পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রালোচনা এ কথা ধরিয়া 'চাল-কলা-বাঁধা' বিদ্যা শিখিল না, ঠাকুরের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে নানা লোকের সম্পর্কে আসিয়া ঐ মন তাহাদের সম্বন্ধে যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, অতঃপর তাহাই আমাদের আলোচনীয়।

সাধারণ ভাবভূমি হইতে ঠাকুর যাহা দেখিয়াছিলেন—শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর হইতে আরম্ভ হইয়া বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের পরস্পর বিদ্বেষ যে সমভাবেই চলিয়া আসিতেছিল, এ কথা আর বলিতে হইবে না। শ্রীরামপ্রসাদাদি বিরল কতিপয় শক্তি-সাধকেরা নিজ নিজ সাধনসহায়ে কালী ও কৃষ্ণকে এক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ বিদ্বেষ ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিলেও সর্বসাধারণে তাঁহাদের কথা বড় একটা গ্রহণ না করিয়া বিদ্বেষ-তরঙ্গেই যে গা ঢালিয়া রহিয়াছে, এ কথা উভয়পক্ষের পরস্পরের দেব-নিন্দাসূচক হাস্যকৌতুকাদিতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাল্যাবধি ঠাকুর ঐ বিষয়ের সহিত যে পরিচিত ছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। আবার উভয়পক্ষের শাস্ত্র-নিবদ্ধ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুর যখন উভয় পন্থাই সমান সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন শাক্ত-বৈষ্ণবের ঐ বিদ্বেষের কারণ যে ধর্মহীনতাপ্রসূত অভিমান বা অহঙ্কার, এ কথা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না।

নিজ পরিবারবর্গের ভিতর ঐ বিদ্বেষ দূর করিবার জন্য সকলকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করান

ঠাকুরের পিতা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন, এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরশিলাকে দৈবযোগে লাভ করিয়া বাটীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐরূপে বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিলেও কিন্তু বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিব ও বিষ্ণু উভয়ের উপর সমান অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইত। বাল্যকালে এক সময়ে শিব সাজিয়া তাঁহার ঐ ভাবে সমাধিস্থ হইয়া কয়েক ঘণ্টাকাল থাকার কথা প্রতিবেশিগণ এখনও বলিয়া ঐ স্থান দেখাইয়া দেয়। ঐ বিষয়ের পরিচায়কস্বরূপ আর একটি

কথারও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে; ঠাকুর আপন পরিবারবর্গের প্রত্যেককে এক সময়ে বিষ্ণুমন্ত্র ও শক্তিমন্ত্র উভয় মন্ত্রেই দীক্ষাগ্রহণ করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন হইতে বিদ্বেষভাব সম্যক দূরীভূত করিবার জন্যই ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ, এ কথাই আমাদের অনুমিত হয়।

সাধুদের ঔষধ দেওয়ার প্রথার উৎপত্তি ও ক্রমে উহাতে সাধুদের আধ্যাত্মিক অবনতি

বহু প্রাচীন যুগে মহারাজ ধর্মাশোক মানব-সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম ও বিদ্যাবিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এ কথা এখন সকলেই জানেন। মানব এবং গ্রাম্য পশুসকলের শারীরিক রোগনিবারণের জন্য তিনি হাসপাতাল, পিঁজরাপোলাদি ভারতের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন, ভেষজসকলের সংগ্রহ ও চাষ করিয়া সাধারণের সহজপ্রাপ্য করেন এবং বৌদ্ধ যতিদিগের সহায়ে ঔষধ ও ওষধিসকলের দেশ-দেশান্তরে প্রেরণ ও প্রচার করিয়াছিলেন। সাধুদিগের ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখা বোধ হয় ঐ কাল হইতেই অনুষ্ঠিত হয়। আবার তন্ত্রযুগে ঐ প্রথা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী যুগের সংহিতাকারেরা সাধুদের উহাতে আধ্যাত্মিক অবনতি দেখিয়া ঐ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করিলেও রক্ষণশীল ভারতে ঐ প্রথার এখনও উচ্ছেদ হয় নাই। দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে এবং তীর্থভ্রমণ করিবার সময় ঠাকুর অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে ঐভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ভোগসুখে চিরকালের নিমিত্ত পতিত হইতে দেখিয়া সাধুদের ভিতরেও যে ধর্মহীনতা অনুভব করেন, ইহা আমাদের স্পষ্ট বোধ হয়। কারণ, ঠাকুর আমাদের অনেককে অনেক সময়ে বলিতেন, “যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি তিলকের বিশেষ আড়ম্বর করে খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাঁইবোর্ট (signboard) মেরে নিজেকে বড় সাধু বলে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস করবিনি।”

কেবলমাত্র ভেকধারী সাধুদের সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

উপরোক্ত কথাটিতে কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, ঠাকুর ভণ্ড ও ভ্রষ্ট সাধুদিগকে দেখিয়া পাশ্চাত্যের জনসাধারণের মতো সাধুসম্প্রদায়সকল উঠাইয়া দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে করিতেন। কারণ, ঠাকুরকে আমরা ঐ কথা-প্রসঙ্গে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছি যে, একটা ভেকধারী সাধারণ পেট-বৈরাগী ও একজন চরিত্রবান গৃহীর ভিতর তুলনা করিলে পূর্বোক্তকেই বড় বলিতে হয়। কারণ, ও ব্যক্তি যোগ-যাগ কিছু না করিয়া কেবলমাত্র চরিত্রবান থাকিয়া যদি জন্মটা ভিক্ষা করিয়া কাটাইয়া যায়, তাহা হইলেও সাধারণ গৃহী ব্যক্তি অপেক্ষা এ জন্মে কত অধিক ত্যাগের পথে অগ্রসর হইয়া রহিল। ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করাই যে ঠাকুরের নিকট ব্যক্তিগত চরিত্রের ও অনুষ্ঠানের পরিমাপক ছিল, এ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপরোক্ত কথাগুলিই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

যথার্থ সাধুদের জীবন হইতেই শাস্ত্রসকল সজীব থাকে

যথার্থ নিষ্ঠাবান প্রেমিক বা জ্ঞানী সাধু যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন, ঠাকুরের নিকট যে বিশেষ সম্মান পাইতেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা লীলাপ্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে ভূরি ভূরি দিয়াছি। ভারতে সনাতন ধর্ম উঁহাদের উপলব্ধি-সহায়েই সজীব রহিয়াছে। উঁহাদের ভিতরে যাঁহারা ঈশ্বরদর্শনে সিদ্ধকাম হইয়া সর্বপ্রকার মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের দ্বারাই বেদাদি শাস্ত্র সপ্রমাণ হইয়া থাকে। কারণ, আপ্তপুরুষেই যে বেদের প্রকাশ, এ কথা বৈশেষিকাদি ভারতের সকল দর্শনকারেরাই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। অতএব গভীর-অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ঠাকুরের তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ কথা বুঝিয়া তাঁহাদের ঐরূপে সম্মান দেওয়াটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে।

যথার্থ সাধুদের ভিতরেও একদেশী ভাব দেখা

নিজ নিজ পথে নিষ্ঠা-ভক্তির সহিত অগ্রসর সাধুদিগকে ঠাকুর বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে স্বয়ং সর্বদা বিশেষ আনন্দানুভব করিলেও এক বিষয়ের অভাব তিনি তাঁহাদের

ভিতর সর্বদা দেখিতে পাইয়া সময়ে সময়ে নিতান্ত দুঃখিত হইতেন। দেখিতেন যে, তিনি সমান অনুরাগে সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমভাবে যোগদান করিলেও তাঁহারা সেইরূপ পারিতেন না। ভক্তিমার্গের সাধকসকলের তো কথাই নাই, অদ্বৈতপন্থায় অগ্রসর সন্ন্যাসী সাধকদিগের ভিতরেও তিনি ঐরূপ একদেশী ভাব দেখিতে পাইতেন। অদ্বৈতভূমির উদার সমভাব লাভ করিবার বহু পূর্বেই তাঁহারা অন্যসকল পন্থার লোকদিগকে হীনাধিকারী বলিয়া সমভাবে ঘৃণা বা বড় জোর এক প্রকার অহঙ্কৃত করুণার চক্ষে দেখিতে শিখিতেন। উদারবুদ্ধি ঠাকুরের একই লক্ষ্যে অগ্রসর ঐসকল ব্যক্তিদিগের ঐ প্রকার পরস্পর-বিদ্বেষ দেখিয়া যে বিশেষ কষ্ট হইত, এ কথা আর বলিতে হইবে না, এবং ঐ একদেশিতা যে ধর্মহীনতা হইতে উৎপন্ন, এ কথা বুঝিতে বাকি থাকিত না।

তীর্থে ধর্মহীনতার পরিচয় পাওয়া। আমাদের দেখা-শুনায় ও ঠাকুরের দেখা-শুনায় কত প্রভেদ

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বসিয়া ঠাকুর যে ধর্মহীনতা ও একদেশিতার পরিচয় গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেরই ভিতর প্রতিদিন পাইতেছিলেন, তীর্থে দেবস্থানে গমন করিয়া উহার কিছুই কম না দেখিয়া বরং সমধিক প্রতাপই দেখিতে পাইলেন। মথুরের দানগ্রহণ করিবার সময় ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ, কাশীস্থ কতকগুলি তান্ত্রিক সাধকের পূজানুষ্ঠান দেখিতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জগদম্বার পূজা নামমাত্র সম্পন্ন করিয়া কেবল কারণ-পানে ঢলাঢলি, দণ্ডী স্বামীদের প্রতিষ্ঠা ও নামযশলাভের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস, বৃন্দাবনে বৈষ্ণব বাবাজীদের সাধনার ভানে যোষিৎসঙ্গে কালযাপন প্রভৃতি সকল ঘটনাই ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে নিজ যথাযথ রূপ প্রকাশ করিয়া সমাজ এবং দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা বুঝাইতে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিল। অবশ্য নিজের ভিতর অতি গভীর নির্বিকল্প অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি না থাকিলে সুদ্ধ ঐসকল ঘটনা দেখাটা ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিত না। ঐ ভাবোপলব্ধি ইতঃপূর্বে করাতেই ঠাকুরের মনে ব্যক্তিগত ও সমাজগত মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা স্থির ছিল এবং উহার সহিত তুলনায় সকল বিষয় ধরা বুঝা সহজসাধ্য হইয়াছিল। অতএব যথার্থ উন্নতি, সভ্যতা, ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ঠা, যোগ, কর্ম প্রভৃতি প্রেরকভাবসমূহ কোন্ লক্ষ্যে মানবকে অগ্রসর করাইতেছে, অথবা উহাদের পরিসমাপ্তিতে মানব কোথায় যাইয়া কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইবে, তদ্বিষয় নিঃসংশয়রূপে জানাতেই ঠাকুরের সাধারণ ভাবভূমিতে থাকিবার কালে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ঐরূপে দেখা ও আলোচনা তাঁহাকে সকল বিষয়ে সত্যাসত্য-নির্ধারণে সহায়তা করিয়াছিল। বুঝ না—যথার্থ সাধুতার জ্ঞান না থাকিলে তিনি কোন্ সাধু কতদূর অগ্রসর তাহা ধরিতেন কিরূপে? তীর্থে ও দেবমূর্ত্যাদিতে বাস্তবিকই যে ধর্মভাব বহু লোকের চিন্তাশক্তি-সহায়ে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, এ কথা পূর্বে নিঃসংশয়রূপে না দেখিলে মহাসত্যনিষ্ঠ ঠাকুর জনসাধারণকে তীর্থাটন ও সাকারোপাসনায় অতি দৃঢ়তার সহিত প্রোৎসাহিত করিতেন কিরূপে? অথবা নানা ধর্মসকলের কোন্ দিকে গতি এবং কোথায় পরিসমাপ্তি তাহা জানা না থাকিলে ঐসকলের একদেশিতাটিই যে দূষণীয়, এ কথা ধরিতেন কিরূপে? আমরাও নিত্য সাধু, তীর্থ, দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি দেখি, ধর্ম ও শাস্ত্রমতসকলের অনন্ত কোলাহল শুনিয়া বধির হই, বুদ্ধিকৌশল এবং বাক্বিতণ্ডায় কখনও এ মতটি, কখনও ও মতটি সত্য বলিয়া মনে করি, জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া মানবের লক্ষ্য কখনও এটা কখনও ওটা হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি; অথচ কোন বিষয়েই একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিরন্তর সন্দেহে দোলায়মান থাকি এবং কখনও কখনও নাস্তিক হইয়া ভোগসুখলাভটাই জীবনে সারকথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি! আমাদের ঐরূপ দেখাশুনায়, আমাদের ঐরূপ আজ এক প্রকার, কাল অন্য প্রকার সিদ্ধান্তে আমাদিগকে কি এমন বিশেষ সহায়তা করে? ঠাকুরের পূর্বোক্তরূপ অদ্ভুত গঠন ও স্বভাববিশিষ্ট মন ছিল বলিয়া তিনি যাহা একবারমাত্র দেখিয়া ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আমাদের পশুভাবাপন্ন মন শত জন্মেও তাহা জগদ্গুরু

মহাপুরুষদিগের সহায়তা ব্যতীত বুঝিতে পারিবে কি না, বলিতে পারি না। জাতিগত সৌসাদৃশ্য উভয়ে সামান্যভাবে লক্ষিত হইলেও ঠাকুরের মনে ও আমাদের মনে যে কত প্রভেদ, তাহা প্রতি কার্যকলাপেই বেশ অনুমিত হয়। ভক্তিশাস্ত্র ঐজন্যই অবতারপুরুষদিগের মন সাধারণাপেক্ষা ভিন্ন উপাদানে—রজস্তমোরহিত শুদ্ধ সত্ত্বগুণে গঠিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ঠাকুরের নিজ উদার মতের অনুভব

এইরূপে দিব্য ও সাধারণ উভয় ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়াই দেশের বর্তমান ধর্মহীনতা, প্রচলিত ধর্মমতসকলের একদেশিতা, প্রত্যেক ধর্মমত সমভাবে সত্য হইলেও এবং বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবকে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চরমে একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিলেও পূর্বপূর্বাচার্যগণের তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বা দেশকাল-পাত্র-বিবেচনায় অপ্রচার ইত্যাদি—অভিনব মহাসত্যসকলের ধারণা ঠাকুর তীর্থাদি-দর্শন হইতেই বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। আর অনুভব করিয়াছিলেন যে, একদেশিত্বের গন্ধমাত্ররহিত বিদ্বেষসম্পর্কমাত্রশূন্য তাঁহার নিজভাব জগতের পক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার! উহা তাঁহারই নিজস্ব সম্পত্তি! তাঁহাকেই উহা জগৎকে দান করিতে হইবে!

'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ', একথা জগতে তিনিই যে প্রথমে অনুভব করিয়াছেন, ইহা ঠাকুরের ধরিতে পারা

"সর্ব ধর্মমতই সত্য—যত মত তত পথ"—এই মহদুদার কথা জগৎ ঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রথম শুনিয়া যে মোহিত হইয়াছে, এ কথা আমাদের অনেকে এখন জানিতে পারিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব যুগের ঋষি ও ধর্মাচার্যগণের কাহারও কাহারও ভিতরে ঐরূপ উদার ভাবের অন্ততঃ আংশিক বিকাশ তো দেখা গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, ঐসকল আচার্য নিজ নিজ বুদ্ধিসহায়ে প্রত্যেক মতের কতক কতক কাটিয়া ছাঁটিয়া ঐসকলের ভিতর যতটুকু সারাংশ বলিয়া স্বয়ং বুঝিতেন তৎ-সকলের মধ্যেই একটা সমন্বয়ের ভাব টানাটানি করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। ঠাকুর যেমন প্রত্যেক মতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া সমান অনুরাগে নিজ জীবনে উহাদের প্রত্যেকের সাধনা করিয়া তত্তৎমত-নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়া ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্বের কোন আচার্যই ঐ সত্য উপলব্ধি করেন নাই। সে যাহাই হউক, ঐ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল এই কথাই পাঠককে এখানে বলিতে চাহি যে, ঐ উদার ভাবের পরিচয় ঠাকুরের জীবনে আমরা বাল্যাবধিই পাইয়া থাকি। তবে তীর্থদর্শন করিয়া আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুর এ কথাটি নিশ্চয় করিয়া ধরিতে পারেন নাই যে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে ঐরূপ উদারতা একমাত্র তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং পূর্ব পূর্ব ঋষি আচার্য বা অবতারখ্যাত পুরুষসকলে এক একটি বিশেষ পথ দিয়া কেমন করিয়া লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে হয়, তদ্বিষয় জনসমাজে প্রচার করিয়া যাইলেও ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যে একই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, এ সংবাদ তাঁহাদের কেহই এ পর্যন্ত প্রচার করেন নাই। ঠাকুর বুঝিলেন সাধনকালে তিনি সর্বান্তঃকরণে সকল প্রকার বাসনা-কামনা শ্রীশ্রীজগন্মাতার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সংসারে, মায়ার রাজ্যে আর কখনও ফিরিবেন না বলিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া অদ্বৈতভাব-ভূমিতে অবস্থান করিলেও যে জগদম্বা তাঁহাকে তখন তাহা করিতে দেন নাই, নানা অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার শরীরটা এখনও রাখিয়া দিয়াছেন—তাহা এই কার্যের জন্য—যতদূর সম্ভব একদেশী ভাব জগৎ হইতে দূর করিবার জন্য, এবং জগৎও ঐ অশেষকল্যাণকর ভাব গ্রহণ করিবার জন্য তৃষ্ণার্ত হইয়া রহিয়াছে। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে কিরূপে আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহাই এখন পাঠককে বলিবার আমরা প্রয়াস পাইব।

জগৎকে ধর্মদান করিতে হইবে বলিয়াই জগদম্বা তাঁহাকে অদ্‌ভুতশক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, ঠাকুরের ইহা অনুভব করা

ধর্মবস্তুর উপলব্ধি যে বাক্যের বিষয় নহে—অনুষ্ঠানসাপেক্ষ, ঐ কথা ঠাকুরের বাল্যাবধিই ধারণা ছিল। আবার ঐ বস্তু যে বহুকালানুষ্ঠানে সঞ্চিত করিয়া অপরে সংক্রমিত করিতে বা অপরকে যথার্থই প্রদান করিতে পারা যায় ইহাও ঠাকুর সাধনকালে সময়ে সময়ে, এবং সিদ্ধিলাভ করিবার পরে অনেক সময় অনুভব করিতেছিলেন। ঐ কথার আমরা ইতঃপূর্বেই[3] অনেক স্থলে আভাস দিয়া আসিয়াছি। জগদম্বা কৃপা করিয়া তাঁহাতে যে ঐ শক্তি বিশেষভাবে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং মথুরপ্রমুখ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃপায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ আত্মহারা করিয়া ঐ শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণও ঠাকুর এ পর্যন্ত অনেক বার আপন জীবনে পাইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার ইতঃপূর্বে এই ধারণামাত্রই হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহার শরীর ও মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি ভাগ্যবানকেই কৃপা করিবেন—কি ভাবে বা কখন ঐ কৃপা করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং শিশুর ন্যায় মাতার উপর নিঃসঙ্কোচে নির্ভরশীল ঠাকুরের মন উহা বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই। কিন্তু ভারতকে ধর্মদান করিতে হইবে, জগতে ধর্মবন্যা খরস্রোতে প্রবাহিত করিতে হইবে, এ কথা তাঁহার মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। এখন হইতে জগদম্বা তাঁহার শরীর-মনকে আশ্রয় করিয়া ঐ নূতন লীলার আরম্ভ যে করিতেছেন, ঠাকুর এ কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু করিলেই বা উপায় কি? জগদম্বা কোন্ দিক দিয়া কি করাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছেন, তাহা না বুঝিতে দিলেই বা তিনি কি করিবেন? ‘মা আমার, আমি মার’—এ কথা সত্যসত্যই সর্বকালের জন্য বলিয়া তিনি যে বাস্তবিকই জগদম্বার বালক হইয়া গিয়াছেন! মার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহার যে বাস্তবিকই অপর কোনরূপ ইচ্ছার উদয় নাই! এক ইচ্ছা যাহা সময়ে সময়ে উদিত হইত—মাকে নানা ভাবে নানা পথ দিয়া জানিবেন, তাহাও যে ঐ মা-ই নানা সময়ে তাঁহার মনে তুলিয়া দিয়াছিলেন, এ কথাও মা তাঁহাকে ইতঃপূর্বে বিলক্ষণরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব এখনকার অভিনব অনুভবে জগদম্বার বালক সানন্দে মার মুখের প্রতিই চাহিয়া রহিল এবং জগন্মাতাই পূর্বের ন্যায় এখনও তাঁহাকে লইয়া খেলিতে লাগিলেন।

আমাদের ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া ঠাকুর আচার্য-পদবী গ্রহণ করেন নাই

তীর্থাদিদর্শনে পূর্বোক্ত সত্যসকলের অনুভবে ঠাকুর যে আমাদের ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া আচার্যপদবী লয়েন নাই এ কথা আমরা দিব্যপ্রেমিকা তপস্বিনী গঙ্গামাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবার ইচ্ছাতেই বেশ বুঝিতে পারি। ‘মার কাজ মা করেন, আমি জগতের কাজ করিবার, লোকশিক্ষা দিবার কে?’—এই ভাবটি ঠাকুরের মনে আজীবন যে কি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা কল্পনাসহায়েও এতটুকু বুঝিতে পারি না। কিন্তু ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার জগদম্বার কার্যের যথার্থ যন্ত্রস্বরূপ হওয়া, ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার ভাবমুখে নিরন্তর স্থিতি, ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহাতে শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ এবং ঐরূপ হওয়াতেই তাঁহার মনে ঐ গুরুভাব ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব অভিনবাকার ধারণ করিয়া এখন পূর্বোক্তরূপে প্রকাশ পাওয়া! এতদিন গুরুভাবের আবেশকালে ঠাকুর আত্মহারা হইয়া পড়িয়া তাঁহার শরীর-মনাশ্রয়ে যে কার্য হইত তাহা নিষ্পন্ন হইয়া যাইবার পর তবে ধরিতে বুঝিতে পারিতেন—এখন তাঁহার শরীর-মন ঐ ভাবের নিরন্তর ধারণ ও প্রকাশে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়া উহাই তাঁহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়া, তিনি না চাহিলেও, তাঁহাকে যথার্থ আচার্যপদবীতে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিল। পূর্বে দীন সাধক বা বালকভাবই ঠাকুরের মনের সহজাবস্থা ছিল; ঐ ভাবাবলম্বনেই তিনি অনেক কাল অবস্থিতি করিতেন; এবং গুরুভাবের প্রকাশ তাঁহাতে স্বল্পকালই হইত। এখন তদ্বিপরীত হইয়া গুরুভাবেরই অধিক কাল অবস্থিতি এবং দীন সাধক বা বালক-ভাবের তাঁহাতে অল্পকাল স্থিতি হইতে লাগিল।

ঐ বিষয়ে প্রমাণ—ভাবমুখে ঠাকুরের জগদম্বার সহিত কলহ

অহঙ্কৃত হইয়া আচার্যপদবীগ্রহণ যে ঠাকুরের মনের নিকট এককালে অসম্ভব ছিল তাহার পরিচয় আমরা অনেক দিন ঠাকুরের ভাবাবেশে জগদম্বার সহিত বালকের ন্যায় কলহে পাইয়াছি। ফুল্ল শতদলের সৌরভে মধুকরপঙক্তির ন্যায় ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যখন অশেষ জনতা হইতেছিল তখন একদিন আমরা যাইয়া দেখি ঠাকুর ভাবাবস্থায় মার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "কচ্ছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? (আমার) নাইবার খাবার সময় নেই! (ঠাকুরের তখন গলদেশে ব্যথা হইয়াছে। নিজের শরীর লক্ষ্য করিয়া) একটা তো ভাঙা ঢাক! এত করে বাজালে কোন দিন ফুটো হয়ে যাবে যে! তখন কি করবি?"

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমরা তাঁহার নিকট বসিয়া আছি। সেটা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। ইহার কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রতাপ হাজরার মাতার পীড়ার সংবাদ আসায় ঠাকুর তাহাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া মাতার সেবা করিতে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন—সেদিনও আমরা উপস্থিত ছিলাম। অদ্য সংবাদ আসিয়াছে প্রতাপচন্দ্র দেশে না যাইয়া বৈদ্যনাথ দেওঘরে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ঐ সংবাদে একটু বিরক্তও হইয়াছেন। এ কথা সে কথার পর ঠাকুর আমাদিগকে একটি সঙ্গীত গাহিতে বলিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। সেদিনও ঠাকুর ঐ ভাবাবেশে জগদম্বার সহিত বালকের ন্যায় বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "অমন সব আদাড়ে লোককে এখানে আনিস কেন? (একটু চুপ করিয়া) আমি অত পারব না। এক সের দুধে এক-আধপো জলই থাক্—তা নয়, এক সের দুধে পাঁচ সের জল! জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে গেল! তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জ্বাল ঠেলতে পারব না। অমন সব লোককে আর আনিসনি।" কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ঐ কথা মাকে বলিতেছেন, তাহার কি দুরদৃষ্ট—এ কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম! মার সহিত ঐরূপ বিবাদ ঠাকুরের নিত্য উপস্থিত হইত; তাহাতে দেখা যাইত যে, যে আচার্যপদবীর সম্মানের জন্য অন্য সকলে লালায়িত, ঠাকুর তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে মাকে নিত্য তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে বলিতেন।

ঠাকুরের অনুভব: "সরকারী লোক—আমাকে জগদম্বার জমিদারির যেখানে যখনই গোলমাল হইবে সেখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে"

এইরূপে ইচ্ছাময়ী জগদম্বা নিজ অচিন্ত্য লীলায় তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত উপলব্ধিসকল আজীবন করাইয়া তাঁহার ভিতর যে মহদুদার আধ্যাত্মিক ভাবের অবতারণা করাইয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে জগতে অন্য কোন আচার্য মহাপুরুষেই আর করেন নাই—এ কথাটি ঠাকুরকে বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে, অপরকে কৃতার্থ করিবার জন্য ঠাকুরের ভিতরে ধর্মশক্তি তিনি যে কতদূর সঞ্চিত রাখিয়াছেন এবং ঐ শক্তি অপরে সংক্রমণের জন্য তাঁহাকে যে কি অদ্ভুত যন্ত্রস্বরূপ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ও জগন্মাতা ঠাকুরকে এই সময়ে দেখাইয়া দেন! ঠাকুর সবিস্ময়ে দেখিলেন—বাহিরে চতুর্দিকে ধর্মাভাব, আর ভিতরে মার লীলায় ঐ অভাবপূরণের জন্য অদৃষ্টপূর্ব শক্তি-সঞ্চয়! দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আবার মা এ যুগে অজ্ঞান-মোহরূপ দুর্দান্ত-রক্তবীজ-বধে রণরঙ্গে অবতীর্ণা! আবার জগৎ মার অহৈতুকী করুণার খেলা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবে এবং অনন্তগুণময়ী কোটী-ব্রহ্মাণ্ড-নায়িকার জয়স্তুতি করিতে যাইয়া বাক্য খুঁজিয়া পাইবে না! উত্তাপের আতিশয্যে মেঘের উদয়, হ্রাসের শেষে স্ফীতির উদয়, দুর্দিনের অবসানে সুদিনের উদয় এবং বহুলোকের বহুকালসঞ্চিত প্রাণের অভাবে জগদম্বার অহৈতুকী করুণা ঘনীভূত হইয়া এইরূপেই গুরুভাবের জীবন্ত সচল বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হয়! জগদম্বা কৃপায়

ঠাকুরকে ঐ কথা বুঝাইয়া আবার কৃপা করিয়া দেখাইলেন, ঠাকুরকে লইয়া তাঁহার ঐরূপ লীলা বহুযুগে বহুবার হইয়াছে!—পরেও আবার বহুবার হইবে! সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি নাই। ‘সরকারি লোক—আমাকে জগদম্বার জমিদারীর যেখানে যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে।’—ঠাকুরের ঐসকল কথার অনুভব এখন হইতেই যে হইয়াছিল এ বিষয় আমরা ঐরূপে বেশ বুঝিতে পারি।

নিজ ভক্তগণকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের প্রাণ ব্যাকুল হওয়া

‘যত মত তত পথ’-রূপ উদার মতের উদয় জগদম্বাই ‘লোকহিতায়’ কৃপায় তাঁহাতে করিয়াছেন এ কথা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের বিচারশীল মন আর একটি বিষয় অনুসন্ধানে যে এখন হইতে অগ্রসর হইয়াছিল এ কথা স্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন্ ভাগ্যবানেরা তাঁহার শরীর-মনাশ্রয়ে অবস্থিত সাক্ষাৎ মার নিকট হইতে ঐ নবীনোদার ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ জীবনগঠনে ধন্য হইবে, কাহারা মার নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্তমান যুগের অভিনব লীলার সহায়ক হইয়া অপরকে ঐ ভাব গ্রহণ করাইয়া কৃতার্থ করিবে, কাহাদিগকে মা ঐ মহৎ কার্যানুষ্ঠানের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন—এইসকল কথা বুঝিবার, জানিবার ইচ্ছায় তাঁহার মন এ সময় ব্যাকুল হইয়া উঠে। মথুরের সহিত ঠাকুরের প্রেমসম্বন্ধ-বিচারকালে ঠাকুরের নিজ ভক্তগণকে দর্শনের কথা পূর্বে আমরা বলিয়াছি।[4] জগদম্বার অচিন্ত্য লীলায় পৃথিবীর সকল বিষয়ে এতকাল সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে অবস্থিত ঠাকুরের মনে তাহাদের পূর্বদৃষ্ট মুখগুলি এখন উজ্জ্বল জীবন্ত ভাব ধারণ করিল! তাহারা কতগুলি হইবে—কবে, কতদিনে মা তাহাদের এখানে আনয়ন করিবেন—তাহাদের কাহার দ্বারা মা কোন্ কাজ করাইয়া লইবেন, মা তাহাদিগকে তাঁহার ন্যায় ত্যাগী করিবেন অথবা গৃহধর্মে রাখিবেন—সংসারে এ পর্যন্ত দুই-চারি জনই তাঁহাকে লইয়া মার এই অপূর্ব লীলার কথা অল্প-স্বল্প মাত্র বুঝিয়াছে, আগত ব্যক্তিদিগের কেহও কি জগদম্বার ঐ লীলার কথা যথাযথ সম্যক বুঝিতে পারিবে অথবা আংশিক বুঝিয়াই চলিয়া যাইবে—এইরূপ নানা কথার তোলাপাড়া করিয়াই যে এ অদ্ভুত সন্ন্যাসী মনের এখন দিন কাটিতে লাগিল, এ কথা তিনি পরে অনেক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। বলিতেন, “তোদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠত, এমনভাবে মোচড় দিত যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হতো! লোকের সামনে, কি মনে করবে ভেবে, কাঁদতে পারতুম না; কোন রকমে সামলে-সুমলে থাকতুম! আর যখন দিন গিয়ে রাত আসত, মার ঘরে, বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আরও একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলিনি ভেবে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির উপরের ছাদে উঠে ‘তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে’ বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। মনে হতো পাগল হয়ে যাব! তারপর কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই! আর আগে দেখেছিলাম বলে তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি অমনি চিনতে পারলুম! তারপর পূর্ণ যখন এল, তখন মা বললে ‘ঐ পূর্ণতে তুই যারা সব আসবে বলে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হলো। ঐ থাকের (শ্রেণীর) লোকের কেউ আসতে আর বাকি রইল না।’ মা দেখিয়ে বলে দিলে, ‘এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ’।” অদ্ভুত দর্শন—অদ্ভুত তাহার সফলতা! আমরা ঠাকুরের ঐসকল কথার অর্থ কতদূর কি বুঝিতে পারি? ঠাকুরের এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের পূর্বোক্ত কথাসকল যে স্বকপোলকল্পিত নহে, পাঠককে উহা বুঝাইবার জন্যই ঠাকুরের ঐ কথাগুলির এখানে উল্লেখ করিলাম।

ঠাকুরের ধারণা—‘যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে; যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে’

এইরূপে নিজ উদার মতের অনুভব করিবার এবং গ্রহণের অধিকারী কাহারা, এ কথা নির্ণয় করিতে যাইয়া ঠাকুরের আর একটি কথারও ধারণা উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর উহা আমাদিগকে

স্বয়ং অনেক সময় বলিতেন। বলিতেন, “যার শেষ জন্ম সে-ই এখানে আসবে—যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।” কথাগুলি শুনিয়া কত লোক কত কি যে ভাবিয়াছে তাহা বলিয়া উঠা দায়। কেহ উহা একেবারে অযুক্তিকর সিদ্ধান্ত করিয়াছে; কেহ ভাবিয়াছে, উহা ঠাকুরের ভক্তি-বিশ্বাস-প্রসূত অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র; কেহ বা ঐসকলে ঠাকুরের মস্তিষ্কবিকৃতি অথবা অহঙ্কারের পরিচয় পাইয়াছে; কেহ বা—আমরা বুঝিতে না পারিলেও ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন উহা বাস্তবিকই সত্য, এইরূপ বুঝিয়া তৎসম্বন্ধে যুক্তিতর্কের অবতারণা করাটা বিশ্বাসের হানিকর ভাবিয়া চক্ষুকর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিয়াছে; আবার কেহ বা—ঠাকুর যদি উহা কখনও বুঝান তো বুঝিব, ভাবিয়া উহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই একটা পাকা না করিয়া উহার সপক্ষে বা বিপক্ষে যে যাহা বলিতেছে, তাহা অবিচলিত চিত্তে শুনিয়া যাইতেছে। কিন্তু অহঙ্কার-সম্পর্ক-মাত্রশূন্য স্বাভাবিক সহজ ভাবেই যে জগদম্বা ঠাকুরকে নিজ উদার মতের অনুভব ও যথার্থ আচার্য-পদবীতে আরূঢ় করাইয়াছিলেন, এ কথা যদি আমরা পাঠককে বুঝাইতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে তাঁহার ঐ কথাগুলির অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। শুধু তাহাই নহে, একটু তলাইয়া দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন যে ঐ কথাগুলিই ঠাকুরের সহজ স্বাভাবিক ভাবে বর্তমান উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থালাভবিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণস্বরূপ।

জগদম্বার প্রতি একান্ত নির্ভরেই ঠাকুরের ঐরূপ ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়

জগদম্বার বালক ঠাকুর নিজ শরীর-মনের অন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া বর্তমানে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চয় ও শক্তি-সংক্রমণ-ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার নিজ চেষ্টার ফলে, এ কথা তিলেকের জন্যও তাঁহার জননীগত-প্রাণ-মনে উদিত হয় নাই। উহাতে তিনি অচিন্ত্যলীলাময়ী জগজ্জননীর খেলাই দেখিয়াছিলেন এবং দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। অঘটনঘটনপটীয়সী মা নিরক্ষর শরীর-মনটাকে আশ্রয় করিয়া এ কি বিপুল খেলার আয়োজন করিয়াছেন!—মূককে বাগ্মী করা, পঙ্গুর দ্বারা সুমেরু উল্লঙ্ঘন করানো প্রভৃতি মার যে-সকল লীলা দেখিয়া লোকে মোহিত হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্তন করে, বর্তমান লীলা যে ঐসকলকে শতগুণে সহস্রগুণে অতিক্রম করিতেছে! মার এ লীলায় বেদ বাইবেল পুরাণ কোরানাদি যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র প্রমাণিত, ধর্ম প্রতিষ্ঠিত এবং জগতের যে অভাব পূর্বে কোন যুগে কেহই দূর করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহা চিরকালের মতো বাস্তবিক অন্তর্হিত! ধন্য মা, ধন্য লীলাময়ী ব্রহ্মশক্তি! এইরূপ ভাবনার উদয়ই ঠাকুরের ঐ দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিল। মার কথায়, মার অনন্ত করুণায় ও অচিন্ত্য শক্তিতে একান্ত বিশ্বাসেই ঠাকুরের মন ঐ দর্শনকে ধ্রুবসত্য বলিয়া ধরিয়া ঐ লীলার প্রসার কতদূর, কাহারা উহার সহায়ক এবং শক্তিবীজ কিরূপ হৃদয়েই বা রোপিত হইবে—এইসকল প্রশ্ন পর পর জিজ্ঞাসা করিয়া উহার ফলস্বরূপ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে দেখা এবং যাহার শেষ জন্ম, যে ঈশ্বরকে পাইবার জন্য একবারও মনে প্রাণে ডাকিয়াছে সেই ব্যক্তিই মার এই অপূর্বোদার নূতন ভাব-গ্রহণের অধিকারী, এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, উহা জগজ্জননীর উপর ঠাকুরের ঐকান্তিক বিশ্বাসের ফলেই আসিয়াছিল। মার উপর নির্ভরশীল বালকের ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন অন্যরূপ করিবার আর উপায়ই ছিল না এবং ঐরূপ করাতে ঠাকুরের অহঙ্কারের লেশমাত্রও মনে উদিত হয় নাই।

ঠাকুরের ঐ কথার অর্থ

অতএব ‘যার শেষ জন্ম সে-ই এখানে আসবে, ঈশ্বরকে যে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে’—ঠাকুরের এই কথাগুলির ভিতর ‘এখানে’ কথাটির অর্থ যদি আমরা ‘মার অভিনব উদার ভাবে’ এইরূপ করি, তাহা হইলে বোধ হয় অযুক্তিকর হইবে না এবং কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু ঐ অর্থ স্বীকার করিলেই আবার অন্য প্রশ্ন উঠিবে—তাহারা কি জগদম্বার ‘যত মত তত পথ’-রূপ উদার ভাবে আপনা হইতে উপস্থিত হইবে অথবা জগদম্বা যাঁহাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া জগতে ঐ ভাব প্রথম প্রচার করিলেন, তাঁহার সহায়ে

উপস্থিত হইবে?—এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের বোধে, প্রশ্নকর্তার নিজের প্রাণে বা অপর কাহারও প্রাণে ঐ ভাব ঠিক ঠিক অনুভূতি করিবার ফল দেখিয়াই করা উচিত এবং যতদিন না ঐ দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন চুপ করিয়া থাকাই ভাল। তবে পাঠক যদি আমাদের ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করেন তো বলিতে হয়, ঠিক ঠিক ঐ ভাবানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে জগদম্বা যাঁহাকে ঐ ভাবময় করিয়া জগতের জন্য সংসারে প্রথম আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনও তোমার যুগপৎ লাভ হইবে এবং তাঁহার 'নির্মাণমোহ' মূর্তিতে প্রাণের ভক্তি-শ্রদ্ধা তুমি আপনা হইতেই ঢালিয়া দিবে। ঠাকুর উহা প্রার্থনা করিবেন না–অপরেও কেহ তোমায় ঐরূপ করিতে বলিবেন না, কিন্তু তুমি জগদম্বার প্রতি প্রেমে আপনিই উহা করিয়া ফেলিবে! এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

গুরুভাবের ঘনীভূতাবস্থাকেই তন্ত্র দিব্যভাব বলিয়াছে। দিব্যভাবে উপনীত গুরুগণ শিষ্যকে কিরূপে দীক্ষা দিয়া থাকেন

জগদম্বার ইচ্ছায় গুরুভাব কাহারও ভিতর কিঞ্চিন্মাত্রও সহজ বা ঘনীভূত হইলে ঐ পুরুষের কার্যকলাপ, বিহার, ব্যবহার এবং অপরের প্রতি অহৈতুকী করুণাপ্রকাশ সকলই মানববুদ্ধির অগম্য এক অদ্‌ভুতাকার যে ধারণ করে, ভারতের তন্ত্রকার এ কথা বারংবার বলিয়াছেন। ঐ ভাবের ঐরূপ বিকাশকে তন্ত্র দিব্যভাব আখ্যা প্রদান করেন এবং ঐ দিব্যভাবে ভাবিত পুরুষদিগের অপরকে শিক্ষাদীক্ষাদিদান শাস্ত্রবিধিবদ্ধ নিয়মসকলের বহির্ভূত অসম্ভাবিত উপায়ে হইয়া থাকে, এ কথাও বলেন। কাহারও প্রতি করুণায় তাঁহারা ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই ঐ ব্যক্তিতে ধর্মশক্তি সম্যক জাগ্রত করিয়া তদ্দণ্ডেই সমাধিস্থ করিতে পারেন; অথবা আংশিকভাবে ঐ শক্তিকে তাহাদের ভিতর জাগ্রত করিয়া এ জন্মেই যাহাতে উহা সম্যকভাবে জাগরিতা হয় ও সাধককে যথার্থ ধর্মলাভে কৃতার্থ করে, তাহাও করিয়া দিতে পারেন। তন্ত্র বলেন, গুরুভাবের ঈষৎ ঘনীভূতাবস্থায় আচার্য শিষ্যকে 'শাক্তী' দীক্ষাদানে এবং বিশেষ ঘনীভূতাবস্থায় 'শাম্ভবী' দীক্ষাদানে সমর্থ হইয়া থাকেন। আর, সাধারণ গুরুদেরই শিষ্যকে 'মান্ত্রী' বা 'আণবী' দীক্ষাদান তন্ত্রনির্দিষ্ট। 'শাক্তী' ও 'শাম্ভবী' দীক্ষা সম্বন্ধে রুদ্রযামল, ষড়ন্বয় মহারত্ন, বায়বীয় সংহিতা, সারদা, বিশ্বসার প্রভৃতি সমস্ত তন্ত্র এক কথাই বলিয়াছেন। আমরা এখানে বায়বীয় সংহিতার শ্লোকগুলি উদ্‌ধৃত করিলাম। যথা –

শাম্ভবী চৈব শাক্তী চ মান্ত্রী চৈব শিবাগমে।

দীক্ষোপদিশ্যতে ত্রেধা শিবেন পরমাত্মনা॥

গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি।

সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তোর্দীক্ষা সা শাম্ভবী মতা॥

শাক্তী জ্ঞানবতী দীক্ষা শিষ্যদেহং প্রবিশ্যতি।

গুরুণা জ্ঞানমার্গেন ক্রিয়তে জ্ঞানচক্ষুষা॥

মান্ত্রী ক্রিয়াবতী দীক্ষা কুম্ভমণ্ডলপূর্বিকা।

* * *

শ্রীগুরুর দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণমাত্রেই শিষ্যের জ্ঞানের উদয় হওয়াকে শাম্ভবী দীক্ষা বলে; এবং গুরুর শক্তি শিষ্য-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ভিতর জ্ঞানের উদয় করিয়া দেওয়াকেই শাক্তী দীক্ষা কহে

অর্থাৎ—আগমশাস্ত্রে পরমাত্মা শিব তিন প্রকার দীক্ষার উপদেশ করিয়াছেন, যথা—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। শাম্ভবী দীক্ষায় শ্রীগুরু-দর্শন, স্পর্শন বা সম্ভাষণ (প্রণামাদি) মাত্রেই জীবের তদ্দণ্ডে জ্ঞানোদয় হয়। শাক্তী দীক্ষায় জ্ঞানচক্ষু গুরু দিব্যজ্ঞান-সহায়ে শিষ্যের ভিতর নিজ শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার প্রাণে ধর্মভাব জাগ্রত করাইয়া দেন। মান্ত্রী দীক্ষায় মণ্ডল-অঙ্কন, ঘটস্থাপন এবং দেবতার পূজাদিপূর্বক শিষ্যের কর্ণে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দিতে হয়।

রুদ্রযামল বলেন—শাক্তী ও শাম্ভবী দীক্ষা সদ্যোমুক্তিবিধায়িনী! যথা –

শাক্তী চ শাম্ভবী চান্যা সদ্যোমুক্তিবিধায়িনী।

* * *

সিদ্ধৈঃ স্বশক্তিমালোক্য তয়া কেবলয়া শিশোঃ।

নিরুপায়ং কৃতা দীক্ষা শাক্তেয়ী পরিকীর্তিতা॥

অভিসন্ধিং বিনাচার্যশিষ্যয়োরুভয়োরপি।

দেশিকানুগ্রহেণৈব শিবতা-ব্যক্তিকারিণী॥

অর্থাৎ—সিদ্ধপুরুষেরা কোনরূপ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে শিষ্যের ভিতর যে দিব্যজ্ঞানের উদয় করেন, তাহাকেই শাক্তী দীক্ষা কহে। শাম্ভবী দীক্ষায় আচার্য ও শিষ্যের মনে দীক্ষা প্রদান ও গ্রহণ করিব, পূর্ব হইতে এরূপ কোন সঙ্কল্প থাকে না। পরস্পরের দর্শন-মাত্রেই আচার্যের হৃদয়ে সহসা করুণার উদয় হইয়া শিষ্যকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয় এবং উহাতেই শিষ্যের ভিতর অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞানোদয় হইয়া সে শিষ্যত্ব স্বীকার করে।

ঐরূপ দীক্ষায় কালাকাল-বিচারের আবশ্যকতা নাই

পুরশ্চরণোল্লাস তন্ত্র বলেন, ঐ প্রকার দীক্ষায় শাস্ত্রনির্দিষ্ট কালাকাল বিচারেরও আবশ্যকতা নাই। যথা –

দীক্ষায়াং চঞ্চলাপাঙ্গি ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ।

সদ্‌গুরোর্দর্শনাদেব সূর্যপর্বে চ সর্বদা॥

শিষ্যমাহূয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে।

তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিৎ ন বিচার্যং কদাচন॥

অর্থাৎ—হে চঞ্চলনয়নি পার্বতি, বীর ও দিব্যভাবাপন্ন গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণে কালবিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। উত্তরায়ণকালে সদ্‌গুরুর দর্শনলাভ হইলে এবং তিনি কৃপা করিয়া শিষ্যকে দীক্ষা দিতে আহ্বান করিলে লগ্নাদিবিচার না করিয়াই উহা লইবে।

দিব্যভাবাপন্ন গুরুগণের মধ্যে ঠাকুর সর্বশ্রেষ্ঠ—উহার কারণ

সাধারণ দিব্যভাবাপন্ন গুরুর সম্বন্ধেই শাস্ত্র যখন ঐরূপ ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন, তখন এ অলৌকিক ঠাকুরের জগদম্বার হস্তে সর্বদা যন্ত্রস্বরূপ থাকিয়া অহৈতুকী করুণায় অপরকে শিক্ষাদান ও ধর্মশক্তি-সঞ্চারের প্রকার আমরা কেমন করিয়া নির্ণয় করিতে পারিব! কারণ, জগন্মাতা কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীর-মনাশ্রয়ে এখন যে কেবল তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবের খেলাই শুধু দেখাইতে লাগিলেন তাহা নহে, কিন্তু দিব্যভাবাপন্ন যাবতীয় গুরুগণ 'যত মত তত পথ'-রূপ যে উদার ভাবের সাধন ও উপলব্ধি এ কাল পর্যন্ত কখনও করেন নাই, সেই মহদুদার

ভাবের প্রকাশও তিনি এখন হইতে ঠাকুরের ভিতর দিয়া জগদ্ধিতায় করিতে লাগিলেন। তাই বলিতেছি, অতঃপর ঠাকুরের জীবনে এক নূতনাধ্যায় এখন হইতে আরম্ভ হইল।

অবতারমহাপুরুষগণের ভিতরে সকল সময় সকল শক্তি প্রকাশিত থাকে না। ঐ বিষয়ে প্রমাণ

ভক্তিমান শ্রোতা হয়তো আমাদের ঐ কথায় কুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিবেন—তোমাদের ও-সকল কি প্রকার কথা? ঠাকুরকে যদি ঈশ্বরাবতার বলিয়াই নির্দেশ কর, তবে তাঁহার ঐ ভাব বা শক্তিপ্রকাশ যে কখনও ছিল না, এ কথা আর বলিতে পার না। ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি—ভ্রাতঃ, ঠাকুরের কথা-প্রমাণেই আমরা ঐরূপ বলিতেছি। নরদেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বরাবতারদিগেরও সকল প্রকার ঈশ্বরীয় ভাব ও শক্তিপ্রকাশ সর্বদা থাকে না; যখন যেটির আবশ্যক হয়, তখনই সেটি আসিয়া উপস্থিত হয়। কাশীপুরের বাগানে বহুকাল ব্যাধির সহিত সংগ্রামে ঠাকুরের শরীর যখন অস্থিচর্মসার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাঁহার অন্তরের ভাব ও শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন:

"মা দেখিয়ে দিচ্ছে কি যে, (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর এখন এমন একটা শক্তি এসেছে যে, এখন আর কাহাকেও ছুঁয়ে দিতেও হবে না; তোদের বলব ছুঁয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাতেই অপরের চৈতন্য হয়ে যাবে! মা যদি এবার (শরীর দেখাইয়া) এটা আরাম করে দেন তো দরজায় লোকের ভিড় ঠেলে রাখতে পারবি না—এত সব লোক আসবে। এত খাটতে হবে যে, ঔষধ খেয়ে গায়ের ব্যথা সারাতে হবে!"

ঠাকুরের ঐ কথাগুলিতেই বুঝা যায়, ঠাকুর স্বয়ং বলিতেছেন যে, যে শক্তিপ্রকাশ তাঁহাতে পূর্বে কখনও অনুভব করেন নাই তাহাই তখন ভিতরে অনুভব করিতেছিলেন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে দেওয়া যাইতে পারে।

ঠাকুরের ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্রের সহিত মিলন এবং উহার পরেই তাঁহার নিজ ভক্তগণের আগমন

দিব্যভাবের আবেগে ঠাকুর এখন ভক্তদিগকে ব্যাকুলচিত্তে পূর্বোক্ত প্রকারে ডাকিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। যেখানে সংবাদ পৌঁছিলে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা প্রায় সকল ভক্তগণ জানিতে পারিবে, জগদম্বা তাঁহাকে সে কথা প্রাণে প্রাণে বলিয়া বেলঘরিয়ার উদ্যানে লইয়া যাইয়া ভক্তপ্রবর শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। ঐ ঘটনার অল্পদিন পর হইতে ঠাকুরের কৃপাসম্পদের বিশেষভাবে অধিকারী, ভাবাবস্থায় পূর্বে দৃষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ভক্তসকলের একে একে আগমন হইতে থাকে। তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের দিব্যভাবে লীলার কথা ঠাকুর বলাইলে আমরা অন্য সময় বলিবার চেষ্টা করিব। এখন ঐ অদৃষ্টপূর্ব দিব্যভাবাবেশে তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার সময় নিজ ভক্তগণকে লইয়া যেরূপে কয়েকটি দিন কাটাইয়াছিলেন, দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাহারই ছবি পাঠকের নয়নগোচর করিয়া আমরা গুরুভাবপর্বের উপসংহার করি।

[1] Ralph Waldo Emerson – "Consciousness ever moves along a graded plane."

[2] পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

[3] গুরুভাব – পূর্বার্ধের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায় দেখ।

[4] গুরুভাব – পূর্বার্ধের ৭ম অধ্যায় দেখ।

৪.৬. পঞ্চম অধ্যায়: ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ–১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবযাত্রা

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

– গীতা, ৯/৩১

ঠাকুরে দেব ও মানব উভয় ভাবের সম্মিলন

দিব্যভাবমুখে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্‌ভুত চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে হইলে ভক্তসঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। কিরূপে কতভাবে ঠাকুর তাঁহার নানা প্রকৃতির ভক্তবৃন্দের সহিত প্রতিদিন উঠা-বসা, কথাবার্তা, হাসি-তামাশা–ভাব ও সমাধিতে থাকিতেন, তাহা শুনিতে ও তলাইয়া বুঝিতে হইবে, তবেই তাঁহার ঐ ভাবের লীলা একটু-আধটু বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব ভক্তগণকে লইয়া ঠাকুরের ঐরূপ কয়েকদিনের লীলাকথাই আমরা এখন পাঠককে উপহার দিব।

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, এ অলোকসামান্য মহাপুরুষের অতি সামান্য চেষ্টাদিও উদ্দেশ্যবিহীন বা অর্থশূন্য ছিল না। এমন অপূর্ব দেব- ও মানব-ভাবের একত্র সম্মিলন আর কোথাও দেখা দুর্লভ–অন্ততঃ পৃথিবীর নানা স্থানে এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া আমাদের চক্ষে আর একটিও পড়ে নাই! কথায় বলে–'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।' ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ভাগ্যে তাহাই হইয়াছে। গলার অসুখের চিকিৎসা করাইবার জন্য ভক্তেরা যখন ঠাকুরকে কিছুদিন কলিকাতায় শ্যামপুকুরে আনিয়া রাখেন, তখন শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া আমাদিগকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন।

শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দর্শন

শ্রীযুত বিজয় ইহার কিছুদিন পূর্বে ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ দর্শন পান এবং উহা আপনার মাথার খেয়াল কি না জানিবার জন্য সম্মুখাবস্থিত দৃষ্ট মূর্তির শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বহুক্ষণ ধরিয়া স্বহস্তে টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়া যাচাইয়া লন–সে কথাও ঐদিন ঠাকুরের ও আমাদের সম্মুখে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন।

শ্রীযুত বিজয়–দেশ-বিদেশ পাহাড়-পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু-মহাত্মা দেখলাম, কিন্তু (ঠাকুরকে দেখাইয়া) এমনটি আর কোথাও দেখলাম না; এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, তারই কোথাও দু-আনা, কোথাও এক-আনা, কোথাও এক-পাই, কোথাও আধ-পাই মাত্র; চার-আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।

ঠাকুর–(মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে) বলে কি!

শ্রীযুত বিজয়–(ঠাকুরকে) সেদিন ঢাকাতে যেরূপ দেখেছি, তাতে আপনি 'না' বললে আমি আর শুনি না, অতি সহজ হয়েই আপনি যত গোল করেছেন। কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর; যখনি ইচ্ছা তখনি এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি। আসতে কোন কষ্ট নাই–নৌকা, গাড়ি যথেষ্ট; ঘরের পাশে এরূপে এত সহজে আপনাকে পাওয়া যায় বলেই আমরা আপনাকে বুঝলাম না। যদি কোন পাহাড়ের চুড়োয় বসে থাকতেন, আর পথ হেঁটে অনাহারে গাছের শিকড় ধরে উঠে আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তাহলে আমরা আপনার কদর করতাম; এখন মনে করি ঘরের পাশেই যখন এইরকম, তখন না জানি বাহিরে দূর-দূরান্তরে আরও কত ভাল ভাল সব আছে; তাই আপনাকে ফেলে ছুটোছুটি করে মরি, আর কি!

ঠাকুরের ভক্তদের সহিত অলৌকিক আচরণে তাহাদের মনে কি হইত

বাস্তবিকই ঐরূপ! করুণাময় ঠাকুর, তাঁহার নিকট যাহারা আসিত, তাহাদের প্রায় সকলকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেন, একবার গ্রহণ করিলে তাহারা ছাড়াছাড়ি করিলেও আর ছাড়িতেন না এবং কখনও কোমল, কখনও কঠোর হস্তে তাহাদের জন্মজন্মার্জিত সংস্কার-রাশিকে শুষ্ক, দগ্ধ করিয়া নিজের নূতন নূতন ভাবে অদৃষ্টপূর্ব, অমৃতময় ছাঁচে নূতন করিয়া গঠন করিয়া তাহাদের চিরশান্তির অধিকারী করিতেন! ভক্তেরা আপন আপন জীবন-কথা খুলিয়া বলিলে, এ কথার আর সন্দেহ থাকিবে না। সেজন্য দেখিতে পাই, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ স্বগৃহে অবস্থানকালে কোন সময়ে সাংসারিক দুঃখকষ্টে অভিভূত হইয়া এবং এতদিন ধরিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন থাকিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইলাম না, ঠাকুর কিছুই করিয়া দিলেন না–ভাবিয়া অভিমানে লুকাইয়া গৃহত্যাগে উদ্যত হইলে, ঠাকুর তখন তাঁহাকে তাহা করিতে দিতেছেন না। দৈবশক্তি-প্রভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গে আনিয়াছেন এবং পরে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ভাবাবেশে গান ধরিয়াছেন–"কথা কহিতেও ডরাই, না কহিতেও ডরাই; আমার মনে সন্দ হয়, বুঝি তোমায় হারাই–হা, রাই!" এবং নানা প্রকারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতেছেন। আবার দেখি–'বকল্মা'-লাভে কৃতার্থ হইয়াও যখন শ্রীযুত গিরিশ পূর্বসংস্কারের প্রতাপ স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হইতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, "এ কি ঢোঁড়া সাপে তোকে ধরেছে রে শালা? জাত সাপে ধরেছে–পালিয়ে বাসায় গেলেও মরে থাকতে হবে! দেখিস নে? ব্যাঙগুলোকে যখন ঢোঁড়া সাপে ধরে, তখন ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ করে হাজার ডাক ডেকে তবে ঠাণ্ডা হয় (মরে যায়), কোনটা বা ছাড়িয়ে পালিয়েও যায়; কিন্তু যখন কেউটে গোখরোতে ধরে তখন ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ তিন ডাক ডেকেই আর ডাকতে হয় না, সব ঠাণ্ডা। যদি কোনটা দৈবাৎ পালিয়েও যায় তো গর্তে ঢুকে মরে থাকে।–এখানকার সেইরূপ জানবি!" কিন্তু কে তখন ঠাকুরের ঐসব কথা ও ব্যবহারের মর্ম বুঝে? সকলেই ভাবিত ঠাকুরের মতো পুরুষ বুঝি সর্বত্রই বর্তমান। ঠাকুর যেমন সকলের সকল আবদার সহিয়া বরাভয়হস্তে সকলের দ্বারে অযাচিত হইয়া ফিরিতেছেন, সর্বত্র বুঝি এইরূপ। করুণাময় ঠাকুরের স্নেহের অঞ্চলে আবৃত থাকিয়া ভক্তদের তখন জোর কত, আবদার কত, অভিমানই বা কত! প্রায় সকলেরই মনে হইত ধর্মকর্মটা অতি সোজা সহজ জিনিস। যখনি ধর্মরাজ্যের যে ভাব দর্শনাদি লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখনি তাহা পাইব–নিশ্চিত। ঠাকুরকে একটু ব্যাকুল হইয়া জোর করিয়া ধরিলেই হইল–ঠাকুর তখনি উহা অনায়াসে স্পর্শ, বাক্য বা কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারাই লাভ করাইয়া দিবেন! ঐ বিষয়ে কতই বা দৃষ্টান্ত দিব! লেখাপড়ার ভিতর দিয়া কটাই বা বলা যায়!

স্বামী প্রেমানন্দের ভাবসমাধি-লাভের ইচ্ছায় ঠাকুরকে ধরায় তাঁহার ভাবনা ও দর্শন

শ্রীযুত বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) ইচ্ছা হইল, তাঁহার ভাবসমাধি হউক। ঠাকুরকে যাইয়া কান্নাকাটি করিয়া বিশেষভাবে ধরিলেন–"আপনি করে দিন।" ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মাকে বলব; আমার ইচ্ছাতে কি হয় রে?"—ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুরের সে কথা কে শোনে? বাবুরামের ঐ এক কথা–'আপনি করে দিন।' এইরূপ আবদারের কয়েকদিন পরেই শ্রীযুত বাবুরামকে কার্যবশতঃ নিজেদের বাটী আঁটপুরে যাইতে হইল। সেটা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এদিকে ঠাকুর তো ভাবিয়া আকুল–কি করিয়া বাবুরামের ভাবসমাধি হইবে! একে বলেন, ওকে বলেন, "বাবুরাম ঢের করে কাঁদাকাটা করে গেছে যেন তার ভাব হয়–কি হবে? যদি না হয়, তবে সে আর এখানকার (আমার) কথা মানবেনি।" তারপর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) বলিলেন, "মা, বাবুরামের যাতে একটু ভাবটাব হয়, তাই করে দে।" মা বলিলেন, "ওর ভাব হবে না; ওর জ্ঞান হবে।" ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বাণী শুনিয়া আবার ভাবনা। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে বলিলেনও–"তাইতো বাবুরামের কথা মাকে বললুম, তা মা বললে, 'ওর ভাব

হবেনি, ওর জ্ঞান হবে’; তা যাই হোক, একটা কিছু হয়ে তার মনে শান্তি হলেই হলো; তার জন্যে মনটা কেমন করচে—অনেক কাঁদাকাটা করে গেছে”—ইত্যাদি। আহা, সে কতই ভাবনা, যাহাতে বাবুরামের কোনরূপে সাক্ষাৎ ধর্মোপলব্ধি হয়! আবার সেই ভাবনার কথা বলিবার সময় ঠাকুরের কেমন বলা—“এটা না হলে ও (বাবুরাম) আর মানবেনি।”—যেন তাহার মানা-না-মানার উপর ঠাকুরের সকলই নির্ভর করিতেছে!

ঠাকুরের ভক্তদের সম্বন্ধে এত ভাবনা কেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। হাজরার ঠাকুরকে ভাবিতে বারণ করায় তাঁহার দর্শন ও উত্তর

আবার কখনও কখনও বলা হইত—“আচ্ছা, বল দেখি, এই সব এদের (বালক ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) জন্যে এত ভাবি কেন? এর কি হলো, ওর কি হলো না, এত সব ভাবনা হয় কেন? এরা তো সব ইস্কুল বয় (School boy); কিছুই নেই—এক পয়সার বাতাসা দিয়ে যে আমার খবরটা নেবে, সে শক্তি নেই; তবু এদের জন্যে এত ভাবনা কেন? কেউ যদি দুদিন না এসেচে তো অমনি তার জন্যে প্রাণ আঁচোড়-পাঁচোড় করে, তার খবরটা জানতে ইচ্ছা হয়—এ কেন?” জিজ্ঞাসিত বালক হয়তো বলিল, “তা কি জানি মশাই কেন হয়। তবে তাদের মঙ্গলের জন্যই হয়।”

ঠাকুর—কি জানিস, এরা সব শুদ্ধসত্ত্ব; কাম-কাঞ্চন এদের এখনও স্পর্শ করেনি, এরা যদি ভগবানে মন দেয় তো তাঁকে লাভ করতে পারবে, এই জন্যে! এখানকার (আমার) যেন গাঁজাখোরের স্বভাব; গাঁজাখোরের যেমন একলা খেয়ে তৃপ্তি হয় না—এক টান টেনেই কলকেটা অপরের হাতে দেওয়া চাই, তবে নেশা জমে—সেই রকম। তবু আগে আগে নরেন্দরের জন্যে যেমনটা হতো, তার মতো এদের কারুর জন্য হয় না। দুদিন যদি (নরেন্দ্রনাথ) আসতে দেরি করেছে তো বুকের ভিতরটায় যেন গামছায় মোচড় দিত! লোকে কি বলবে বলে ঝাউতলায়[1] গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। হাজরা[2](এক সময়ে) বলেছিল, ‘ও কি তোমার স্বভাব? তোমার পরমহংস অবস্থা; তুমি সর্বদা তাঁতে (শ্রীভগবানে) মন দিয়ে সমাধি লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে; তা না, নরেন্দ্র এল না কেন, ভবনাথের কি হবে—এ সব ভাব কেন?’ শুনে ভাবলুম—ঠিক বলেছে, আর অমনটা করা হবেনি; তারপর ঝাউতলা থেকে আসচি আর (শ্রীশ্রীজগদম্বা) দেখাচ্ছে কি, যেন কলকাতাটা সামনে, আর লোকগুলো সব কাম-কাঞ্চনে দিনরাত ডুবে রয়েছে ও যন্ত্রণা ভোগ কচ্চে। দেখে দয়া এল। মনে হলো, লক্ষগুণ কষ্ট পেয়েও যদি এদের মঙ্গল হয়, উদ্ধার হয় তো তা করব। তখন ফিরে এসে হাজরাকে বললুম—‘বেশ করেছি, এদের জন্যে সব ভেবেছি, তোর কি রে শালা?’

স্বামী বিবেকানন্দের ঠাকুরকে ঐ বিষয় বারণ করায় তাঁহার দর্শন ও উত্তর

“নরেন্দর একবার বলেছিল, ‘তুমি অত নরেন্দর নরেন্দর কর কেন? অত নরেন্দর নরেন্দর করলে তোমায় নরেন্দ্রের মতো হতে হবে। ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে হরিণ হয়েছিল।’ নরেন্দরের কথায় খুব বিশ্বাস কি না? শুনে ভয় হলো! মাকে বললুম। মা বললে, ‘ও ছেলেমানুষ; ওর কথা শুনিস কেন? ওর ভেতর নারায়ণকে দেখতে পাস, তাই ওর দিকে টান হয়!’ শুনে তখন বাঁচলুম! নরেন্দরকে এসে বললুম, ‘তোর কথা আমি মানি না; মা বলেছে তোর ভেতর নারায়ণকে দেখি বলেই তোর উপর টান হয়, যেদিন তা না দেখতে পাব, সেদিন থেকে তোর মুখও দেখব না রে শালা’।” এইরূপে অদ্ভুত ঠাকুরের অদ্ভুত ব্যবহারের প্রত্যেকটিরই অর্থ ছিল, আর আমরা তাহা না বুঝিয়া বিপরীত ভাবিলে পাছে আমাদের অকল্যাণ হয়, সেজন্য এইরূপে বুঝাইয়া দেওয়া ছিল।

ঠাকুরের গুণী ও মানী ব্যক্তিকে সম্মান করা–উহার কারণ

গুণীর গুণের কদর, মানীর মানরক্ষা ঠাকুরকে সর্বদাই করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন, "ওরে, মানীকে মান না দিলে ভগবান রুষ্ট হন; তাঁর (শ্রীভগবানের) শক্তিতেই তো তারা বড় হয়েছে, তিনিই তো তাদের বড় করেছেন–তাদের অবজ্ঞা করলে তাঁকে (শ্রীভগবানকে) অবজ্ঞা করা হয়।" তাই দেখিতে পাই, যখনই ঠাকুর কোথাও কোন বিশেষ গুণী পুরুষের খবর পাইতেন, অমনি তাঁহাকে কোন-না-কোন উপায়ে দর্শন করিতে ব্যস্ত হইতেন। উক্ত পুরুষ যদি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে তো কথাই নাই, নতুবা স্বয়ং তাঁহার নিকট অনাহূত হইয়াও গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন, প্রণাম ও আলাপ করিয়া আসিতেন। বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাশীধামের প্রসিদ্ধ বীণকার মহেশ, শ্রীবৃন্দাবনে সখীভাবে ভাবিতা গঙ্গামাতা, ভক্তপ্রবর কেশব সেন–ঐরূপ আরও কত লোকেরই নাম না উল্লেখ করা যাইতে পারে–ইঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণের কথা শুনিয়া দর্শন করিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া ঠাকুর স্বয়ং উঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঠাকুর অভিমানরহিত হইবার জন্য কতদূর করিয়াছিলেন

অবশ্য ঠাকুরের ঐরূপে অযাচিত হইয়া কাহারও দ্বারে উপস্থিত হওয়াটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে, কারণ 'আমি এত বড়লোক, আমি অপরের নিকট এইরূপে যাইলে খেলো হইতে হইবে, মর্যাদাহানি হইবে'–এ সব ভাব তো ঠাকুরের মনে কখনও উদিত হইত না। অহঙ্কার অভিমানটাকে তিনি যে একেবারে ভস্ম করিয়া গঙ্গায় বিসর্জন দিয়াছিলেন! কালীবাটীতে কাঙালী-ভোজনের পর কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি মাথায় করিয়া বহিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া স্বহস্তে ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়াছিলেন; সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত কোন সময়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কালীবাটীর চাকর-বাকরদিগের শৌচাদির জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট ছিল, তাহাও এক সময়ে স্বহস্তে ধৌত করিয়া নিজ কেশ দ্বারা মুছিতে মুছিতে[3] জগদম্বার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, উহাদের চাইতে বড় এ ভাব আমার যেন কখনও না হয়!' তাই ঠাকুরের জীবনের অদ্ভুত নিরভিমানতা দেখিলেও আমাদের বিস্ময়ের উদয় হয় না, কিন্তু অপর সাধারণের যদি এতটুকু অভিমান কম দেখি তো 'কি আশ্চর্য' বলিয়া উঠি! কারণ, ঠাকুর তো আর আমাদের এ সংসারের লোক ছিলেন না!

ঠাকুরের অভিমানরাহিত্যের দৃষ্টান্ত: কৈলাস ডাক্তার ও ত্রৈলোক্যবাবু সম্বন্ধীয় ঘটনা

ঠাকুর কালীবাটীর বাগানে কোঁচার খুঁটটি গলায় দিয়া বেড়াইতেছেন, জনৈক বাবু তাঁহাকে সামান্য মালী-জ্ঞানে বলিলেন, "ওহে, আমাকে ঐ ফুলগুলি তুলিয়া দাও তো।" ঠাকুরও দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্রূপ করিয়া দিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন! মথুরবাবুর পুত্র পরলোকগত ত্রৈলোক্যবাবু এক সময়ে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদুর (হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়) উপর বিরক্ত হইয়া হৃদয়কে অন্যত্র গমন করিতে হুকুম করেন। সে সময় নাকি ঠাকুরেরও আর কালীবাটীতে থাকিবার আবশ্যকতা নাই–রাগের মাথায় তিনি এইরূপ ভাব অপরের নিকট প্রকাশ করেন। ঠাকুরের কানে ঐ কথা উঠিবামাত্র তিনি হাসিতে হাসিতে গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন। প্রায় গেট পর্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময় ত্রৈলোক্যবাবু আবার অমঙ্গল-আশঙ্কায় ভীত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'আপনাকে তো আমি যাইতে বলি নাই, আপনি কেন যাইতেছেন', ইত্যাদি বলিয়া ঠাকুরকে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও যেন কিছুই হয় নাই, এরূপভাবে পূর্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আপনার কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিলেন!

বিষয়ী লোকের বিপরীত ব্যবহার

এরূপ আরও কত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐসকল ব্যবহারে আমরা যত আশ্চর্য না হই, সংসারের অপর কেহ যদি অতটাও না করিয়া এতটুকু ঐরূপ কাজ করে তো একেবারে ধন্য ধন্য করি! কেন না, আমরা মুখে বলি আর নাই বলি মনের ভিতরে ভিতরে একেবারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছি যে, সংসারে থাকিতে গেলেই 'নিজের কোলে ঝোল টানিতে হইবে', দুর্বলকে সবল হস্তে সরাইয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আপনার কথা ষোল কাহন করিয়া ডঙ্কা বাজাইতে হইবে, নিজের দুর্বলতাগুলি অপরের চক্ষুর অন্তরালে যত পারি লুকাইয়া রাখিতে হইবে, আর সরলভাবে ভগবানের বা মানুষের উপর ষোল আনা বিশ্বাস করিলে একেবারে 'কাজের বার' হইয়া 'বয়ে' যাইতে হইবে! হায় রে সংসার, তোমার আন্তর্জাতিক নীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ব্যক্তিগত ধর্মনীতি—সর্বত্রই এইরূপ। তোমার 'দিল্লীকা লাড্ডু' যে খাইয়াছে সে তো পশ্চাত্তাপ করিতেছেই—যে না খাইয়াছে সেও তদ্রূপ করিতেছে।

ঠাকুরের প্রকট হইবার সময় ধর্মান্দোলন ও উহার কারণ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ সময়ে ঠাকুরের বিশেষ প্রকট ভাব। তাঁহার অদ্ভুত আকর্ষণে তখন নিত্য কত নূতন নূতন লোক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছে। কলিকাতার ছোট বড় সকলে তখন 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস'-এর নাম শুনিয়াছে এবং অনেকে তাঁহাকে দর্শনও করিয়াছে। আর কলিকাতার জনসাধারণের মন অধিকার করিয়া ভিতরে ভিতরে যেন একটা ধর্মস্রোত নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে।[4] হেথায় হরিসভা, হোথায় ব্রাহ্মসমাজ, হেথায় নামসঙ্কীর্তন, হোথায় ধর্মব্যাখ্যা ইত্যাদিতে তখন কলিকাতা নগরী পূর্ণ। অপর সকলে ঐ বিষয়ের কারণ না বুঝিলেও ঠাকুর বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ ভক্তের নিকটই ঐ কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন, আমাদের তো কথাই নাই। জনৈক স্ত্রী-ভক্ত বলেন, ঠাকুর একদিন তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ওগো, এই যে সব দেখছ, এত হরিসভা-টরিসভা এ সব জানবে (নিজ শরীর দেখাইয়া) এইটের জন্যে। এ সব কি ছিল? কেমন এক রকম সব হয়ে গিয়েছিল! (পুনরায় নিজ শরীর দেখাইয়া) এইটে আসার পর থেকে এ সব এত হয়েছে, ভিতরে ভিতরে একটা ধর্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে!" আবার এক সময়ে ঠাকুর আমাদের বলিয়াছিলেন, "এই যে দেখছ সব ইয়াং বেঙ্গল (Young Bengal) এরা কি ভক্তি-টক্তির ধার ধারত? মাথা নুইয়ে পেরণামটা (প্রণাম) করতেও জানত না! মাথা নুইয়ে আগে পেরণাম করতে করতে তবে এরা ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে। কেশবের বাড়িতে দেখা করতে গেলুম, দেখি চেয়ারে বসে লিখছে। মাথা নুইয়ে পেরণাম করলুম, তাতে অমনি ঘাড় নেড়ে একটু সায় দিলে! তারপর আসবার সময় একেবারে ভূঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পেরণাম করলুম। তাতে হাত জোড় করে একবার মাথায় ঠেকাল। তারপর যত যাওয়া-আসা হতে লাগল ও কথাবার্তা শুনতে লাগল, আর মাথা হেঁট করে পেরণাম করতে লাগলুম তত ক্রমে ক্রমে তার মাথা নীচু হয়ে আসতে লাগল। নইলে আগে আগে ওরা কি এ সব ভক্তি-টক্তি করা জানত, না মানত!"

পণ্ডিত শশধরের ঐ সময়ে কলিকাতায় আগমন ও ধর্মব্যাখ্যা

নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়া যখন খুব জমজমাট চলিয়াছে, সেই সময়েই পণ্ডিত শশধরের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করিতে কলিকাতায় আগমন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিক দিয়া হিন্দুদিগের নিত্যকর্তব্য অনুষ্ঠানগুলি বুঝাইবার চেষ্টা। 'নানা মুনির নানা মত' কথাটি সর্ব বিষয়ে সকল সময়েই সত্য; পণ্ডিতজীর বৈজ্ঞানিক ধর্মব্যাখ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রোতার হুড়াহুড়ির অভাব ছিল না। আফিসের ফেরতা বাবু-ভায়া ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের ভিড় লাগিয়া যাইত। আল্বার্ট হলে স্থানাভাবে ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সকলেই স্থির, উদ্‌গ্রীব—কোনরূপে পণ্ডিতজীর অপূর্ব ধর্মব্যাখ্যা যদি কতকটাও

শুনিতে পায়! আমাদের মনে আছে, আমরাও একদিন কিছুকাল ঐভাবে দাঁড়াইয়া দুই-পাঁচটা কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম এবং ভিড়ের ভিতর মাথা গুঁজিয়া কোনরূপে প্রৌঢ়বয়স্ক পণ্ডিতজীর কৃষ্ণশ্মশ্রুরাজি-শোভিত সুন্দর মুখখানি এবং গৈরিকরুদ্রাক্ষশোভিত বক্ষঃস্থলের কিয়দংশের দর্শন পাইয়াছিলাম। কলিকাতার অনেক স্থলেই তখন ঐ এক আলোচনা–শশধর পণ্ডিতের ধর্মব্যাখ্যা!

ঠাকুরের শশধরকে দেখিবার ইচ্ছা

বলে 'কথা কানে হাঁটে', কাজেই দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের কথা পণ্ডিতজীর নিকটে এবং পণ্ডিতজীর গুণপনা ঠাকুরের নিকটে পৌঁছিতে বড় বিলম্ব হইল না! ভক্তদিগেরই কেহ কেহ আসিয়া ঠাকুরের নিকট গল্প করিতে লাগিলেন, "খুব পণ্ডিত, বলেনও বেশ! বত্রিশাক্ষরী হরিনামের সেদিন দেবীপক্ষে অর্থ করিলেন, শুনিয়া সকলে 'বাহবা বাহবা' করিতে লাগিল, ইত্যাদি।" ঠাকুরও ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "বটে? ঐটি বাবু একবার শুনতে ইচ্ছা করে।" এই বলিয়া ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিবার ইচ্ছা ভক্তদিগের নিকট প্রকাশ করেন।

ঠাকুরের শুদ্ধ মনে উদিত বাসনাসমূহ সর্বদা সফল হইত

দেখা যাইত, ঠাকুরের শুদ্ধ মনে যখন যে বাসনার উদয় হইত, তাহা কোন না কোন উপায়ে পূর্ণ হইতই হইত। কে যেন ঐ বিষয়ের যত প্রতিবন্ধকগুলি ভিতরে ভিতরে সরাইয়া দিয়া উহার সফল হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত! পূর্বে শুনিয়াছিলাম বটে, কায়মনোবাক্যে সত্যপালন ও শুদ্ধ পবিত্র ভাব মনে নিরন্তর রাখিতে রাখিতে মানুষের এমন অবস্থা হয় যে, তখন সে আর কোন অবস্থায় কোন প্রকার মিথ্যা ভাব চেষ্টা করিয়াও মনে আনিতে পারে না–যাহা কিছু সঙ্কল্প তাহার মনে উঠে সে সকলই সত্য হয়। কিন্তু সেটা মানুষের শরীরে যে এতদূর হইতে পারে, তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ঠাকুরের মনের সঙ্কল্পসকল অতর্কিতভাবে সিদ্ধ হইতে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াই ঐ কথাটায় আমাদের ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মে। তাই কি ঐ বিষয়ে পুরাপুরি বিশ্বাস আমাদের ঠাকুরের শরীর বিদ্যমানে জন্মিয়াছিল? তিনি বলিয়াছিলেন, "কেশব, বিজয়ের ভিতরে দেখলাম এক-একটি বাতির শিখার মতো (জ্ঞানের) শিখা জ্বলছে, আর নরেন্দরের ভিতর দেখি জ্ঞান-সূর্য রয়েছে! কেশব একটা শক্তিতে জগৎ মাতিয়েছে, নরেনের ভিতর অমন আঠারটা শক্তি রয়েছে।"–এ সব তাঁর নিজের সঙ্কল্পের কথা নয়, ভাবাবেশে দেখাশুনার কথা; কিন্তু ইহাতেই কি তখন বিশ্বাস ঠিক ঠিক দাঁড়াইত? কখনও ভাবিতাম–হবেও বা, ঠাকুর লোকের ভিতর দেখিতে পান; তিনি যখন বলিতেছেন, তখন ইহার ভিতর কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে; আবার কখনও ভাবিতাম, জগদ্বিখ্যাত বাগ্মী ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন কোথা, আর শ্রীযুত নরেন্দ্রের মতো একটা স্কুলের ছোঁড়া কোথা! ইহা কি কখনও হইতে পারে? ঠাকুরের দেখাশুনার কথার উপরেই যখন ঐরূপ সন্দেহ আসিত, তখন 'এইটি ইচ্ছা হয়' বলিয়া ঠাকুর যখন তাঁহার মনোগত সঙ্কল্পের কথা বলিতেন তখন উহা ঘটিবার পক্ষে যে সন্দেহ আসিত না, ইহা কেমন করিয়া বলি।

* * * *

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবযাত্রার সময় ঠাকুর যথায় যথায় গমন করেন

পণ্ডিত শশধরের সম্বন্ধে ঠাকুরের সহিত ঐরূপ কথাবার্তা হইবার কয়েকদিন পরেই রথযাত্রা উপস্থিত। নয় দিন ধরিয়া রথোৎসব নির্দিষ্ট থাকায় উহা 'নবযাত্রা' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নবযাত্রার সময় ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। এই বৎসরেরই সোজা-রথের দিন প্রাতে ঠাকুরের ঠনঠনিয়ায় শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে নিমন্ত্রণরক্ষায় গমন এবং সেখান হইতে অপরাহ্নে পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাওয়া, সন্ধ্যার পর ঠাকুরের বাগবাজারে শ্রীযুত বলরামবাবুর বাটীতে রথোৎসবে যোগদান এবং সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া পরদিন প্রাতে কয়েকটি ভক্তসঙ্গে নৌকায় করিয়া

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পুনরাগমন। ইহার কয়েকদিন পরেই আবার পণ্ডিত শশধর আলমবাজার বা উত্তর বরাহনগরের একস্থলে ধর্ম-সম্বন্ধিনী বক্তৃতা করিতে আসিয়া সেখান হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করেন। তৎপরে উলটা রথের দিন প্রাতে ঠাকুরের পুনরায় বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে আগমন এবং সেদিন রাত ও তৎপর দিন রাত তথায় ভক্তগণের সঙ্গে সানন্দে অবস্থান করিয়া তৃতীয় দিবস প্রাতে 'গোপালের মা' প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। উলটা রথের দিনে পণ্ডিত শশধরও ঠাকুরকে দর্শন করিতে বলরামবাবুর বাটীতে স্বয়ং আগমন করেন ও সজলনয়নে করজোড়ে ঠাকুরকে পুনরায় নিবেদন করেন, "দর্শন-চর্চা করিয়া আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; আমায় একবিন্দু ভক্তি দান করুন।" ঠাকুরও তাহাতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতজীর হৃদয় ঐ দিন স্পর্শ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের কথাগুলি পাঠককে এখানে সবিস্তারে বলিলে মন্দ হইবে না।

ঈশানবাবুর পরিচয়

পূর্বেই বলিয়াছি রথের দিন প্রাতে ঠাকুর কলিকাতায় ঠনঠনিয়ায় ঈশানবাবুর বাটীতে আগমন করেন, সঙ্গে শ্রীযুত যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), হাজরা প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত। শ্রীযুত ঈশানের মতো দয়ালু, দানশীল ও ভগবদ্বিশ্বাসী ভক্তের দর্শন সংসারে দুর্লভ। তাঁহার আটটি পুত্র, সকলেই কৃতবিদ্য। তৃতীয় পুত্র সতীশ শ্রীযুত নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) সহপাঠী। শ্রীযুত সতীশের পাখোয়াজে অতি সুমিষ্ট হাত থাকায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের সুকণ্ঠের তান অনেক সময় ঐ বাটীতে শুনিতে পাওয়া যাইত। ঈশানবাবুর দয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে একদিন বলেন যে, উহা পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা কিছুতেই কম ছিল না। স্বামীজী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, ঈশানবাবু নিজের অন্নব্যঞ্জনাদি কতদিন (বাটীতে তখন কিছু আহার্য প্রস্তুত না থাকায়) অভুক্ত ভিখারীকে সমস্ত অর্পণ করিয়া যাহা-তাহা খাইয়া দিন কাটাইয়া দিলেন। আর অপরের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিয়া উহা দূর করা নিজের সাধ্যাতীত দেখিয়া কতদিন যে তিনি (স্বামীজী) অশ্রুজল বিসর্জন করিতে তাঁহাকে (ঈশানবাবুকে) দেখিয়াছেন, তাহাও বলিতেন। শ্রীযুত ঈশান যেমন দয়ালু, তেমনি জপ-পরায়ণও ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে নিয়মপূর্বক উদয়াস্ত জপ করার কথাও আমরা অনেকে জানিতাম। জাপক ঈশান ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় ও অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। আমাদের মনে আছে, জপ সমাধান করিয়া ঈশান যখন ঠাকুরের চরণে একদিন সন্ধ্যাকালে প্রণাম করিতে আসিলেন, তখন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ ঈশানের মস্তকে প্রদান করিলেন। পরে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া জোর করিয়া ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, "ওরে বামুন, ডুবে যা, ডুবে যা" (অর্থাৎ কেবল ভাসা ভাসা জপ না করিয়া শ্রীভগবানের নামে তন্ময় হইয়া যা)। ইদানীং প্রাতের পূজা ও জপেই শ্রীযুত ঈশানের প্রায় অপরাহ্ণ চারিটা হইয়া যাইত। পরে কিঞ্চিৎ লঘু আহার করিয়া অপরের সহিত কথাবার্তা বা ভজন-শ্রবণাদিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া পুনরায় সান্ধ্য জপে উপবেশন করিয়া কত ঘণ্টা কাল কাটাইতেন। আর বিষয়কর্ম দেখার ভার পুত্রেরাই লইয়াছিল। ঠাকুর ঈশানের বাটীতে মধ্যে মধ্যে শুভাগমন করিতেন এবং ঈশানও কলিকাতায় থাকিলে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন। নতুবা, পবিত্র দেবস্থান ও তীর্থাদি-দর্শনে যাইয়া তপস্যায় কাল কাটাইতেন।

এ বৎসর (১৮৮৫ খ্রীঃ) রথের দিনে শ্রীযুত ঈশানের বাটীতে আগমন করিয়া ঠাকুরের ভাটপাড়ার কতকগুলি ভট্টাচার্যের সহিত ধর্মবিষয়ক নানা কথাবার্তা হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে পণ্ডিতজীর কথা শুনিয়া এবং তাঁহার বাসা অতি নিকটে জানিতে পারিয়া ঠাকুর শশধরকে ঐ দিন দেখিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর কলিকাতাগমন-সংবাদ স্বামীজী প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, যাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণে তিনি ধর্মবক্তৃতাদানে আগমন করেন তাঁহাদের সহিত স্বামীজীর পূর্ব হইতেই আলাপ-পরিচয় ছিল এবং কলেজ স্ট্রীটস্থ তাঁহাদের বাসভবনে স্বামীজীর গতায়াতও ছিল। আবার পণ্ডিতজীর আধ্যাত্মিক ধর্মব্যাখ্যাগুলি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া ধারণা হওয়ায় তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁহাকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া দিবার প্রয়াসেও স্বামীজীর ঐ বাটীতে

গমনাগমন এই সময়ে কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, এইরূপে স্বামীজীই পণ্ডিতজীর সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুরকে উহা বলেন এবং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিতদর্শনে লইয়া যান। পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুর সেদিন পণ্ডিতজীকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে 'চাপরাস' বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্মপ্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং কখনও কখনও প্রচারকের অভিমান-অহঙ্কার বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজীকে এই প্রথম দর্শনকালেই বলিয়াছিলেন। এইসকল জ্বলন্ত শক্তিপূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই যে পণ্ডিতজী কিছুকাল পরে প্রচারকার্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যাপীঠে তপস্যায় গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।

যোগানন্দ স্বামীর আচার-নিষ্ঠা

পণ্ডিতজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সেদিন শ্রীযুত যোগেনের সহিত সন্ধ্যাকালে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। যোগেন তখন আহারাদিতে বিশেষ 'আচারী', কাহারও বাটীতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন না। কাজেই নিজ বাটীতে সামান্য জলযোগমাত্র করিয়াই ঠাকুরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে কোথাও খাইতে অনুরোধ করেন নাই; কারণ, যোগেনের নিষ্ঠাচারিতার বিষয় ঠাকুরের অজ্ঞাত ছিল না। কেবল বলরামবাবুর শ্রদ্ধাভক্তি ও ঠাকুরের উপরে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার বাটীতে ফলমূল-দুগ্ধ-মিষ্টান্নাদিগ্রহণ শ্রীযুত যোগেন পূর্বাবধি করিতেন—এ কথাও ঠাকুর জানিতেন। সেজন্য পৌঁছিবার কিছু পরেই ঠাকুর বলরাম প্রভৃতিকে বলিলেন, "ওগো, এর (যোগেনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয়নি, একে কিছু খেতে দাও।" বলরামবাবুও যোগেনকে সাদরে অন্দরে লইয়া যাইয়া জলযোগ করাইলেন। ভাবসমাধিতে আত্মহারা ঠাকুরের ভক্তদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেক বিষয়ে কতদূর লক্ষ্য থাকিত, তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত বলিয়া আমরা এ কথার এখানে উল্লেখ করিলাম।

বলরাম বসুর বাটীতে রথোৎসব

বলরামবাবুর বাটীতে রথে ঠাকুরকে লইয়া আনন্দের তুফান ছুটিত। অদ্য সন্ধ্যার পরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া অন্দরের ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আনা হইল। এবং বস্ত্রপতাকাদি দ্বারা ইতঃপূর্বেই সজ্জিত ছোট রথখানিতে বসাইয়া আবার পূজা করা হইল। বলরামবাবুর পুরোহিতবংশজ ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুত ফকীরই ঐ পূজা করিলেন।

শ্রীযুত ফকীর বলরামবাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও আশ্রয়দাতার একমাত্র শিশুপুত্র রামকৃষ্ণের পাঠাভ্যাসাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। ইনি বিশেষ নিষ্ঠাপরায়ণ ও ভক্তিমান ছিলেন এবং ঠাকুরের প্রথম দর্শনাবধি তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুর কখনও কখনও ইঁহার মুখ হইতে স্তোত্রাদি শুনিতে ভালবাসিতেন এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃত কালীস্তোত্র কিরূপে ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথাগুলি সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিয়া আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা একদিন ইঁহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ দিন সন্ধ্যার সময় ফকীরকে নিজ কক্ষের উত্তর দিকের বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া স্পর্শও করেন এবং ধ্যান করিতে বলেন। ফকীরের উহাতে অদ্‌ভুত দর্শনাদি হইয়াছিল।

এইবার সঙ্কীর্তন করিতে করিতে রথের টান আরম্ভ হইল। ঠাকুর স্বয়ং রথের রশি ধরিয়া অল্পক্ষণ টানিলেন। পরে ভাবাবেশে তালে তালে সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে ভাবমত্ত হুঙ্কার ও নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তখন আত্মহারা—ভগবদ্ভক্তিতে উন্মাদ! বাহিরবাটীর দোতলার চকমিলান বারাণ্ডাটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকক্ষণ অবধি এইরূপ নৃত্য, কীর্তন ও রথের টান হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমতী রাধারানী, শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং পরিশেষে

তদ্ভক্তবৃন্দ, সকলের পৃথক পৃথক নামোল্লেখ করিয়া জয়কার দিয়া প্রণামান্তে কীর্তন সাঙ্গ হইল। পরে রথ হইতে ৺জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে অবরোহণ করাইয়া ত্রিতলে (চিলের ছাদের ঘরে) সাতদিনের মতো স্থানান্তরিত করিয়া স্থাপন করা হইল। ইহার অর্থ—রথে চড়িয়া ৺জগন্নাথদেব যেন অন্যত্র আসিয়াছেন; সাতদিন পরে পুনঃ এখান হইতে রথে চড়িয়া আপনার পূর্বস্থানে গমন করিবেন। ৺জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে পূর্বোক্ত স্থানে রাখিয়া ভোগনিবেদন করিবার পর অগ্রে ঠাকুর ও পরে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার সহিত আগত যোগেন সে রাত্রি বলরামবাবুর বাটীতেই রহিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা অনেকেই যে যাঁহার স্থানে চলিয়া গেলেন।

স্ত্রী-ভক্তদিগের ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ

পরদিন প্রাতে ৮টা বা ৯টার সময় নৌকা ডাকা হইল—ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিবেন। নৌকা আসিলে ঠাকুর অন্দরে যাইয়া ৺জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া এবং ভক্তপরিবারবর্গের প্রণাম স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বাহিরবাটীর দিকে আসিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের পূর্বদিকে রন্ধনশালার সম্মুখে ছাদের শেষ পর্যন্ত আসিয়া বিষণ্ণমনে ফিরিয়া যাইলেন; কারণ এ অদ্‌ভুত জীবন্ত ঠাকুরকে ছাড়িতে কাহার প্রাণ চায়? উক্ত ছাদ হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তিন-চারিটি সিঁড়ি উঠিলেই একটি দ্বার এবং ঐ দরজাটি পার হইয়া বাহিরের দ্বিতলের চকমিলান বারাণ্ডা। সকল স্ত্রী-ভক্তেরা ঐ ছাদের শেষ পর্যন্ত আসিয়া ফিরিলেও একজন যেন আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের চকমিলান বারাণ্ডাবধি আসিলেন—যেন বাহিরে অপরিচিত পুরুষেরা সব আছে, সে বিষয়ে আদৌ হুঁশ নাই।

ঠাকুরের অন্যমনে চলা ও জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের আত্মহারা হইয়া পশ্চাতে আসা

ঠাকুর স্ত্রী-ভক্তদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তে ভাবাবেশে এমন গোঁ-ভরে বরাবর চলিয়া আসিতেছিলেন যে, মেয়েরা যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতদূর আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের একজন যে এখনও ঐ ভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ হুঁশ ছিল না। ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ-ভরে চলা যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারিবেন; অপরকে উহা বুঝানো কঠিন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী, কেবল দ্বাদশবর্ষই বা বলি কেন আজন্ম একাগ্রতা অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের মন-বুদ্ধি এমন একনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল যে, যখন যেখানে বা যে কার্যে রাখিতেন তাঁহার মন তখন ঠিক সেখানেই থাকিত—চারিপাশে উঁকিঝুঁকি একেবারেই মারিত না। আর শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি এমন বশীভূত হইয়া গিয়াছিল যে, মনে যখন যে ভাবটি বর্তমান, উহারাও তখন কেবলমাত্র সেই ভাবটিই প্রকাশ করিত! একটুও এদিক ওদিক করিতে পারিত না। এ কথাটি বুঝানো বড় কঠিন। কারণ, আপন আপন মনের দিকে চাহিলেই আমরা দেখিতে পাই, নানা প্রকার পরস্পর-বিপরীত ভাবনা যেন এককালে রাজত্ব করিতেছে এবং উহাদের ভিতর যেটি অভ্যাসবশতঃ অপেক্ষাকৃত প্রবল, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নিষেধ না মানিয়া তাহারই বশে ছুটিয়াছে। ঠাকুরের মনের গঠন আর আমাদের মনের গঠন এতই বিভিন্ন!

ঠাকুরের ঐরূপ অন্যমনে চলিবার আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত; ঐরূপ হইবার কারণ

দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও অনেক কথা এখানে বলা যাইতে পারে। দক্ষিণেশ্বরে আপনার ঘর হইতে ঠাকুর মা কালীকে দর্শন করিতে চলিলেন। ঘরের পূর্বের দালানে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া ঠাকুর বাটীর উঠানে নামিয়া একেবারে সিধা মা কালীর মন্দিরের দিকে চলিলেন। ঠাকুরের থাকিবার ঘর হইতে মা কালীর মন্দিরে যাইতে অগ্রে শ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দির পড়ে; যাইবার সময় ঠাকুর উক্ত মন্দিরে উঠিয়া শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মা কালীর মন্দিরে যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা কখনও করিতে পারিতেন না। একেবারে সরাসরি মা কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রণামাদি করিয়া পরে ফিরিয়া আসিবার কালে ঐ মন্দিরে উঠিতেন। আমরা তখন তখন ভাবিতাম, ঠাকুর মা

কালীকে অধিক ভালবাসেন বলিয়াই বুঝি ঐরূপ করেন। পরে একদিন ঠাকুর নিজেই বলিলেন, "আচ্ছা, এ কি বল্ দেখি? মা কালীকে দেখতে যাব মনে করেছি তো একেবারে সিধে মা কালীর মন্দিরে যেতে হবে। এদিক ওদিক ঘুরে বা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে উঠে যে প্রণাম করে যাব, তা হবে না। কে যেন পা টেনে সিধে মা কালীর মন্দিরে নিয়ে যায়—একটু এদিক ওদিক বেঁকতে দেয় না! মা কালীকে দেখার পর, যেথা ইচ্ছা যেতে পারি—এ কেন বল্ দেখি?" আমরা মুখে বলিতাম, 'কি জানি মশাই'; আবার মনে মনে ভাবিতাম, 'এও কি হয়? ইচ্ছা করিলেই আগে রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করে যেতে পারেন। মা কালীকে দেখবার ইচ্ছাটা বেশি হয় বলেই বোধ হয় অন্যরূপ ইচ্ছা হয় না' ইত্যাদি; কিন্তু এ-সব কথা সহসা ভাঙিয়া বলিতেও পারিতাম না। ঠাকুরই আবার কখনও কখনও ঐ বিষয়ের উত্তরে বলিতেন, "কি জানিস? যখন যেটা মনে হয় করব, সেটা তখনই করতে হবে—এতটুকু দেরি সয় না।" কে জানে তখন, একনিষ্ঠ মনের এই প্রকার গতি ও চেষ্টাদি, এবং ঠাকুরের মনটার অন্তঃস্তর অবধি সমস্তটা বহুকাল ধরিয়া একনিষ্ঠ হইয়া একেবারে একভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে—উহাতে অন্য ভাবকে আশ্রয় করিয়া বিপরীত তরঙ্গরাজি আর উঠেই না। আবার কখনও কখনও বলিতেন, "দেখ, নির্বিকল্প অবস্থায় উঠলে তখন তো আর আমি-তুমি, দেখা-শুনা, বলা-কহা কিছুই থাকে না; সেখান থেকে দুই-তিন ধাপ নেমে এসেও এতটা ঝোঁক থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিস নিয়ে ব্যবহার চলে না। তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারি সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সেসকলের দিকে যায় না, এক জায়গা থেকেই মুখে উঠবে। এমন সব অবস্থা হয়! তখন ভাত ডাল তরকারি পায়েস সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়!" আমরা এই সমরস অবস্থার দুই-তিন ধাপ নীচের কথা শুনিয়াই অবাক হইয়া থাকিতাম। আবার বলিতেন, "এমন একটা অবস্থা হয়, তখন কাউকে ছুঁতে পারি না। (ভক্তদের সকলকে দেখাইয়া) এদের কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি।"—আমাদের ভিতর কে-ই বা তখন এ কথার মর্ম বুঝে যে, শুদ্ধসত্ত্ব গুণটা তখন ঠাকুরের মনে এতটা বেশি হয় যে, এতটুকু অশুদ্ধতার স্পর্শ সহ্য করিতে পারেন না! পুনরায় বলিতেন, "ভাবে আবার একটা অবস্থা হয়, তখন খালি (শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজকে দেখাইয়া) ওকে ছুঁতে পারি; ও যদি তখন ধরে[5] তো কষ্ট হয় না। ও খাইয়ে দিলে তবে খেতে পারি।" যাক্ এখন সেসব কথা। পূর্বকথার অনুসরণ করি।

স্ত্রী-ভক্তটিকে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আহ্বান

ঠাকুর গোঁ-ভরে চলিতে চলিতে বাহিরের বারাণ্ডায় (যেখানে পূর্বরাত্রে রথ টানা হইয়াছিল) আসিয়া হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, সেই স্ত্রী-ভক্তটি ঐরূপে তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছেন। দেখিয়াই দাঁড়াইলেন এবং 'মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী' বলিয়া বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভক্তটিও ঠাকুরের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'চ না গো মা, চ না!' কথাগুলি এমনভাবে বলিলেন এবং ভক্তটিও এমন এক আকর্ষণ অনুভব করিলেন যে, আর দিক্বিদিক্ না দেখিয়া (উঁহার বয়স তখন ত্রিশ বৎসর হইবে এবং গাড়ি-পালকিতে ভিন্ন এক স্থান হইতে অপর স্থানে কখনও ইহার পূর্বে যাতায়াত করেন নাই) ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। কেবল একবারমাত্র ছুটিয়া বাটীর ভিতর যাইয়া বলরামবাবুর গৃহিণীকে বলিয়া আসিলেন, "আমি ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চললুম।" পূর্বোক্ত ভক্তটি এইরূপে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন শুনিয়া আর একটি স্ত্রী-ভক্তও সকল কর্ম ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এদিকে ঠাকুর ভাবাবেশে স্ত্রী-ভক্তটিকে ঐরূপে আসিতে বলিয়া আর পশ্চাতে না চাহিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন, ছোট নরেন প্রভৃতি বালক ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া সরাসরি নৌকায় যাইয়া বসিলেন। স্ত্রী-ভক্ত দুইটিও ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিয়া বাহিরের পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িলেন। নৌকা ছাড়িল।

নৌকায় যাইতে যাইতে স্ত্রী-ভক্তের প্রশ্নে ঠাকুরের উত্তর–"ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাকবে"

যাইতে যাইতে স্ত্রী-ভক্তটি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "ইচ্ছা হয় খুব তাঁকে ডাকি, তাঁতে ষোল আনা মন দি, কিন্তু মন কিছুতেই বাগ মানে না–কি করি?"

ঠাকুর–তাঁর উপর ভার দিয়ে থাক না গো! ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থাকতে হয়–সেটা কি জান? পাতাখানা পড়ে আছে; য্যান্নে হাওয়াতে নিয়ে যাচ্চে ত্যান্নে উড়ে যাচ্চে, সেই রকম; এই রকম করে তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাকতে হয়–চৈতন্যবায়ু য্যান্নে মনকে ফেরাবে, ত্যান্নে ফিরবে, এই আর কি।

এইরূপ প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে নৌকা কালীবাটীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। নৌকা হইতে নামিয়াই ঠাকুর কালীঘরে[6] যাইলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা কালীবাটীর উত্তরে অবস্থিত নহবতখানায়[7] শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকটে যাইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মা কালীকে প্রণাম করিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ ও ক্ষত শরীরে দেবতাস্পর্শনিষেধ-সম্বন্ধে ভক্তদের প্রমাণ পাওয়া

এদিকে ঠাকুর বালক ভক্তগণসঙ্গে মা কালীর মন্দিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে আসিয়া বসিলেন এবং মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন –

ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনি।

মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনি॥

শরীরে শারীরি যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,

গুণভেদে মহামন্ত্রে তিনগ্রাম-সঞ্চারিণি॥

আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর

মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনি॥

বিশুদ্ধে হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে

তান মান লয় সুরে ত্রিসপ্ত-সুরভেদিনি॥

শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়

তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনি॥

নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার সামনে বসিয়া ঠাকুর এইরূপে গাহিতেছেন, সঙ্গী ভক্তেরা কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে উহা শুনিয়া মোহিত হইয়া রহিয়াছেন। গাহিতে গাহিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গান থামিয়া গেল, মুখের অদৃষ্টপূর্ব হাসি যেন সেই স্থানে আনন্দ ছড়াইয়া দিল–ভক্তেরা নিস্পন্দ হইয়া এখন ঠাকুরের শ্রীমূর্তিই দেখিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের শরীর একটু হেলিয়াছে দেখিয়া পাছে পড়িয়া যান ভাবিয়া শ্রীযুত ছোট নরেন তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি স্পর্শ করিবামাত্র ঠাকুর যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ছোট নরেন তাঁহার স্পর্শ ঠাকুরের এখন অভিমত নয় বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল মন্দিরাভ্যন্তর হইতে ঠাকুরের পূর্বোক্ত অব্যক্ত কষ্টসূচক শব্দ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ধারণ করিলেন। কতক্ষণ

এইভাবে থাকিয়া নাম শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের ধীরে ধীরে বাহ্য চৈতন্য হইল; কিন্তু তখনও যেন বিপরীত নেশার ঝোঁকে সহজভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। পা বেজায় টলিতেছে।

এই অবস্থায় কোন রকমে হামা দেওয়ার মতো করিয়া ঠাকুর নাটমন্দিরের উত্তরের সিঁড়িগুলি দিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে নামিতে লাগিলেন ও ছোট শিশুর মতো বলিতে লাগিলেন, "মা, পড়ে যাব না—পড়ে যাব না?" বাস্তবিকই তখন ঠাকুরকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন একটি ছোট তিন-চারি বৎসরের ছেলে, মার দিকে চাহিয়া ঐ কথাগুলি বলিতেছেন, আর মার নয়নে নয়ন রাখিয়া ভরসান্বিত হইয়াই সিঁড়িগুলি নামিতে পারিতেছেন! অতি সামান্য বিষয়েও এমন অপরূপ নির্ভরের ভাব আর কি কোথাও দেখিতে পাইব?

ভাবাবেশে কুণ্ডলিনী-দর্শন ও ঠাকুরের কথা

প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুর এইবার নিজ কক্ষে আসিয়া পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় যাইয়া বসিলেন—তখনও ভাবাবিষ্ট। সে ভাব আর ছাড়ে না—কখনও একটু কমে, আবার বাড়িয়া বাহ্যচৈতন্য লুপ্তপ্রায় হয়! এইরূপে কতক্ষণ থাকার পর ভাবাবস্থায় ঠাকুর সঙ্গী ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সাপ দেখেছ? সাপের জ্বালায় গেলুম!" আবার তখনি যেন ভক্তদের ভুলিয়া সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীকেই (তাঁহাকেই যে ঠাকুর বর্তমান ভাবাবস্থায় দেখিতেছিলেন এ কথা আর বলিতে হইবে না) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তুমি এখন যাও বাবু; ঠাক্‌রুণ, তুমি এখন সর; আমি তামাক খাব, মুখ ধোব, দাঁতন হয়নি"—ইত্যাদি। এইরূপে কখনও ভক্তদিগের সহিত এবং কখনও ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্তির সহিত কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ক্রমে সাধারণ মানবের মতো বাহ্যচৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন।

ভাবভঙ্গে আগত ভক্তেরা সব কি খাইবে বলিয়া ঠাকুরের চিন্তা ও স্ত্রী-ভক্তদের বাজার করিতে পাঠান

সাধারণ মানবের ন্যায় যখন থাকিতেন, তখন ঠাকুরের ভক্তদিগের নিমিত্তই চিন্তা। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন ঘরে কিছু তরিতরকারি আছে কি না। শ্রীশ্রীমা তদুত্তরে 'কিছুই নাই' বলিয়া পাঠাইলে ঠাকুরের আবার ভাবনা হইল, 'কে এখন বাজারে যায়'; কারণ, বাজার হইতে কিছু শাকসবজি কিনিয়া না আনিলে কলিকাতা হইতে আগত স্ত্রী-পুরুষ ভক্তেরা খাইবে কি দিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রী-ভক্ত দুইটিকে বলিলেন, "বাজার করতে যেতে পারবে?" তাঁহারাও বলিলেন, 'পারব' এবং বাজারে যাইয়া দুটো বড় বেগুন, কিছু আলু ও শাক কিনিয়া আনিলেন; শ্রীশ্রীমা ঐসকল রন্ধন করিলেন। কালীবাড়ী হইতেও ঠাকুরের নিত্য বরাদ্দ এক থাল মা কালীর প্রসাদ আসিল। পরে ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে ঠাকুরের ভাবাবস্থার সময় শ্রীযুত ছোট নরেন ধরিতে যাইলে ঠাকুরের ওরূপ কষ্ট কেন হইল, সে কথার অনুসন্ধানে কারণ জানিতে পারা গেল। ছোট নরেনের মস্তকের বাঁ দিককার রগে একটি ছোট আব্ হইয়াছিল ও ক্রমে সেটি বড় হইতেছিল। সেটা পরে যন্ত্রণাদায়ক হইবে বলিয়া ডাক্তারেরা ঔষধ দিয়া ঐ স্থানটিতে ঘা করিয়া দিয়াছিল। পূর্বে শুনিয়াছিলাম বটে, শরীরে ক্ষত থাকিলে দেবমূর্তি স্পর্শ করিতে নাই, কিন্তু কথাটার সত্যতা যে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এইরূপে প্রমাণিত হইবে, তাহা আর কে ভাবিয়াছিল! দেবভাবে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইলেও ঠাকুর যে কি অন্তর্নিহিত দৈবশক্তিবলে ঐরূপ করিয়া উঠিলেন, তাহা বুঝা সাধ্যায়ত্ত না হইলেও তাঁহার যে বাস্তবিকই কষ্ট হইয়াছিল, এ কথা নিঃসন্দেহ। ছোট নরেনকে ঠাকুর কত শুদ্ধস্বভাব বলিতেন তাহা আমাদের জানা ছিল এবং সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর অপরসকলের ন্যায় তাঁহাকে শরীরে ঐরূপ ক্ষতস্থান থাকিলেও ছুঁইতেছেন, পদস্পর্শ করিতে দিতেছেন ও তাঁহার সহিত একত্র বসা-দাঁড়ানো করিতেছেন। অতএব তিনিই বা কেমন করিয়া

জানিবেন, ভাবের সময় ঠাকুর ঐরূপে তাঁহার স্পর্শ সহ্য করিতে পারিবেন না? যাহা হউক, তদবধি তিনি যত দিন না উক্ত ক্ষতটি আরাম হইল, তত দিন আর ভাবাবস্থার সময় ঠাকুরকে স্পর্শ করিতেন না।

ঠাকুরের সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গে সমস্ত দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া ভক্তেরা যে যাঁহার বাটীর দিকে চলিলেন। স্ত্রী-লোক দুইটিও ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পদব্রজে কলিকাতায় আসিলেন।

বালকস্বভাব ঠাকুরের বালকের ন্যায় ভয়

পূর্বোক্ত ঘটনাগুলির পরে দুই-তিন দিন গত হইয়াছে! আজ পণ্ডিত শশধর ঠাকুরকে দর্শন করিতে অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিবেন। বালকস্বভাব ঠাকুরের অনেক সময় বালকের ন্যায় ভয়ও হইত। বিশেষ কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন শুনিলেই ভয় পাইতেন। ভাবিতেন, তিনি তো লেখাপড়া কিছুই জানেন না, তাহার উপর কখন কিরূপ ভাবাবেশ হয় তাহার তো কিছুই ঠিক-ঠিকানা নাই, আবার তাহার উপর ভাবের সময় নিজের শরীরেরই হুঁশ থাকে না তো পরিধেয় বস্ত্রাদির!—এরূপ অবস্থায় আগন্তুক কি ভাবিবে ও বলিবে! আমাদের মনে হইত, আগন্তুক যাহাই কেন ভাবুক না, তাহাতে তাঁহার আসিয়া গেল কি? তিনি তো নিজেই বার বার কত লোককে শিক্ষা দিতেছেন, 'লোক না পোক (কীট); লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়।' তবে কি ইনি নামযশের কাঙালী? কিন্তু যাচাইয়া দেখিতে যাইলেই, দেখিতাম—বালক যেমন কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়, আবার একটু পরিচয় হইলে সেই ব্যক্তিরই কাঁধে পিঠে চড়িয়া চুল টানিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে নানারূপ মিষ্ট অত্যাচার করে—ঠাকুরের এই ভাবটিও ঠিক তদ্রূপ। নতুবা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির সহিত তিনি যেরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, নামযশের কিছুমাত্র ইচ্ছা ভিতরে থাকিলে তিনি তাঁহাদের সহিত কখনই ঐভাবে কথা কহিতে পারিতেন না।[৪]

আবার কখনও কখনও দেখা গিয়াছে, ঠাকুর আগন্তুকের পাছে অকল্যাণ হয় ভাবিয়া ভয়ও পাইতেন। কারণ তাঁহার আচরণ ও ব্যবহার প্রভৃতি বুঝিতে পারুক বা নাই পারুক তাহাতে ঠাকুরের কিছু আসিয়া যাইত না সত্য; কিন্তু বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক যদি ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিত, তাহাতে তাহারই অকল্যাণ নিশ্চিত জানিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভয় পাইতেন। তাই শ্রীযুত গিরিশ অভিমান-আবদারে কোন সময়ে ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার প্রতি নানা কটূক্তি প্রয়োগ করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ওরে, ও আমাকে যা বলে বলুকগে, আমার মাকে কিছু বলেনি তো?" যাক এখন সে কথা।

শশধর পণ্ডিতের দ্বিতীয় দিবস ঠাকুরকে দর্শন

পণ্ডিত শশধর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন শুনিয়া ঠাকুরের আর ভয়ের সীমা-পরিসীমা নাই। শ্রীযুত যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), শ্রীযুত ছোট নরেন ও আর আর অনেককে বলিলেন, "ওরে, তোরা তখন (পণ্ডিতজী যখন আসিবেন) থাকিস!" ভাবটা এই যে, তিনি মূর্খ মানুষ, পণ্ডিতের সহিত কথা কহিতে কি বলিতে কি বলিবেন, তাই আমরা সব উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিতজীর সহিত কথাবার্তা কহিব ও ঠাকুরকে সামলাইব! আহা, সে ছেলেমানুষের মতো ভয়ের কথা অপরকে বুঝানো দুষ্কর। কিন্তু পণ্ডিত শশধর যখন বাস্তবিক উপস্থিত হইলেন, তখন ঠাকুর যেন আর একজন! হাস্যপ্রস্ফুরিতাধরে স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার অর্ধবাহ্যদশার মতো অবস্থা হইল এবং পণ্ডিত শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি পণ্ডিত, তুমি কিছু বল।"

শশধর–মহাশয়, দর্শন-শাস্ত্র পড়িয়া আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; তাই আপনার নিকটে আসিয়াছি ভক্তিরস পাইব বলিয়া; অতএব আমি শুনি, আপনি কিছু বলুন।

ঠাকুর–আমি আর কি বলব, বাবু! সচ্চিদানন্দ যে কি (পদার্থ) তা কেউ বলতে পারে না! তাই তিনি প্রথম হলেন অর্ধনারীশ্বর। কেন?—না, দেখাবেন বলে যে পুরুষ প্রকৃতি দুই-ই আমি। তারপর তা থেকে আরও এক থাক নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।

ঐরূপে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক নিগূঢ় কথাসকল বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া পণ্ডিত শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর–সচ্চিদানন্দে যতদিন মন না লয় হয় ততদিন তাঁকে ডাকা ও সংসারের কাজ করা দুই-ই থাকে। তারপর তাঁতে মন লয় হলে, আর কোন কাজ করবার প্রয়োজন থাকে না। যেমন ধর কীর্তন গাইছে–'নিতাই আমার মাতা (মত্ত) হাতি।' যখন প্রথম গান ধরেছে তখন গানের কথা, সুর, তাল, মান, লয়–সকল দিকে মন রেখে ঠিক করে গাইছে। তারপর যেই গানের ভাবে মন একটু লয় হয়েছে তখন কেবল বলছে–'মাতা হাতি, মাতা হাতি।' পরে যেই আরও মন ভাবে লয় হলো অমনি খালি বলছে–'হাতি, হাতি।' আর, যেই মন আরও ভাবে লয় হলো অমনি 'হাতি' বলতে গিয়ে 'হা –' (বলেই হাঁ করে রইল)!

ঠাকুর ঐরূপে 'হা –' পর্যন্ত বলিয়াই ভাবাবেশে একেবারে নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া গেলেন এবং ঐ প্রকার অবস্থায় প্রায় পনর মিনিট কাল প্রসন্নোজ্জ্বলবদনে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবসানে আবার শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

ঠাকুর–ওগো পণ্ডিত, তোমায় দেখলুম।[9] তুমি বেশ লোক। গিন্নী যেমন রেঁধেবেড়ে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা ধুতে, কাপড় কাচতে যায়, আর হেঁশেল-ঘরে ফেরে না–তুমিও তেমনি সকলকে তাঁর কথা বলে কয়ে যে যাবে, আর ফিরবে না!

পণ্ডিত শশধর ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া, 'সে আপনাদের অনুগ্রহ'–বলিয়া ঠাকুরের পদধূলি বারংবার গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ঐসকল কথা শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিত, ও আর্দ্র হৃদয়ে ভগবদ্বস্তু জীবনে লাভ হইল না ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ঐ দিনের কথা জনৈক ভক্তকে নিজে যেমন বলিয়াছিলেন

আমাদের একজন পরম বন্ধু পণ্ডিত শশধরের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পরদিন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে, ঠাকুর যেভাবে ঐ বিষয় তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন–তাহাই আমরা এখন এখানে বলিব।

ঠাকুর–ওগো, দেখছই তো এখানে ওসব (লেখাপড়া) কিছু নেই, মুখ্যু-শুখ্যু মানুষ, পণ্ডিত দেখা করতে আসবে শুনে বড় ভয় হলো। এই তো দেখছ, পরনের কাপড়েরই হুঁশ থাকে না, কি বলতে কি বলব ভেবে একেবারে জড়সড় হলুম! মাকে বললুম, 'দেখিস, মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর (শাস্ত্র) মাস্তর কিছুই জানি না, দেখিস।' তারপর একে বলি 'তুই তখন থাকিস', ওকে বলি 'তুই তখন আসিস–তোদের সব দেখলে তবু ভরসা হবে।' পণ্ডিত যখন এসে বসল তখনও ভয় রয়েছে–চুপ করে বসে তার দিকেই দেখছি, তার কথাই শুনছি, এমন সময় দেখছি কি–যেন তার (পণ্ডিতের) ভেতরটা মা দেখিয়ে দিচ্ছে–শাস্তর (শাস্ত্র) মাস্তর পড়লে কি হবে, বিবেক বৈরাগ্য না হলে ওসব কিছুই নয়! তার পরেই সড় সড় করে (নিজ শরীর দেখাইয়া) একটা মাথার দিকে উঠে গেল আর ভয়-ডর সব কোথা চলে গেল! একেবারে বিভ্ভুল হয়ে গেলুম! মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভিতর থেকে যেন একটা কথার ফোয়ারা বেরুতে লাগল–

এমনটা বোধ হতে লাগল! যত বেরুচ্চে, তত ভেতর থেকে যেন কে ঠেলে ঠেলে যোগান দিচ্চে! ও দেশে (কামারপুকুরে) ধান মাপবার সময় যেমন একজন 'রামে রাম, দুইয়ে দুই' করে মাপে, আর একজন তার পেছনে বসে রাশ (ধানের রাশি) ঠেলে দেয়, সেইরূপ। কিন্তু কি যে সব বলেছি, তা কিছুই জানি না! যখন একটু হুঁশ হলো তখন দেখছি কি যে, সে (পণ্ডিত) কাঁদছে, একেবারে ভিজে গেছে! ঐ রকম একটা আবস্থা (অবস্থা) মাঝে মাঝে হয়। কেশব যেদিন খবর পাঠালে, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে, একজন সাহেবকে (ভারতভ্রমণে আগত পাদ্রি কুক্) সঙ্গে করে নিয়ে আসচে, সেদিনও ভয়ে কেবলই ঝাউতলার দিকে (শৌচে) যাচ্চি! তারপর যখন তারা এল আর জাহাজে উঠলুম, তখন এই রকমটা হয়ে গিয়েছিল! আর কত কি বলেছিলুম! পরে এরা (আমাদের দেখাইয়া) সব বললে, 'খুব উপদেশ দিয়েছিলেন।' আমি কিন্তু বাবু কিছুই জানিনি!

ঠাকুরের অলৌকিক ব্যবহার দেখিয়া অন্যান্য অবতারের সম্বন্ধে প্রচলিত ঐরূপ কথাসকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়

অদ্ভুত ঠাকুরের এই প্রকার অদ্ভুত অবস্থার কথা কেমন করিয়া বুঝিব? আমরা অবাক হইয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম মাত্র। কি এক অদৃষ্টপূর্ব শক্তি যে তাঁহার শরীর-মনটাকে আশ্রয় করিয়া এইসকল অপূর্ব লীলার বিস্তার করিত, অভূতপূর্ব আকর্ষণে যাহাকে ইচ্ছা টানিয়া আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিত ও ধর্মরাজ্যের উচ্চতর স্তরসমূহে আরোহণে সামর্থ্য প্রদান করিত, তাহা দেখিয়াও বুঝা যাইত না। তবে ফল দেখিয়া বুঝা যাইত, সত্যই ঐরূপ হইতেছে, এই পর্যন্ত। কতবারই না আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াছি, অতি দ্বেষী ব্যক্তি দ্বেষ করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট আসিয়াছে এবং ঠাকুরও ঐ শক্তিপ্রভাবে আত্মহারা হইয়া ভাবাবেশে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন, আর সেই ক্ষণ হইতে তাহার ভিতরের স্বভাব আমূল পরিবর্তিত হইয়া সে নব জীবনলাভে ধন্য হইয়াছে। বেশ্যা মেরীকে স্পর্শমাত্রে ঈশা নূতন জীবন দান করিলেন, ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্য কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিলেন ও তাহার ভিতরের সংশয়, অবিশ্বাস প্রভৃতি পাষণ্ড ভাবসকল দলিত হইয়া সে ভক্তিলাভ করিল। ভগবদবতারদিগের জীবনপাঠে ঐসকল ঘটনার বর্ণনা দেখিয়া পূর্বে পূর্বে ভাবিতাম, শিষ্য-প্রশিষ্যগণের গোঁড়ামি ও দলপুষ্টি করিবার হীন ইচ্ছা হইতেই ঐরূপ মিথ্যা কল্পনাসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়া ধর্মরাজ্যের যথাযথ সত্যলাভের পথে বিষম অন্তরায়স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে! আমাদের মনে আছে, হরিনামে শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত, নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা'-নামক গ্রন্থে এ কথাটি সত্য বলিয়া স্বীকৃত দেখিয়া আমরা তখন ভাবিয়াছিলাম, গ্রন্থকারের মস্তিষ্কের কিছু গোল হইয়াছে! কি কূপমণ্ডুকই না আমরা তখন ছিলাম এবং ঠাকুরের দর্শন না পাইলে কি দুর্দশাই না আমাদের হইত! ঠাকুরের দর্শন পাইয়া এখন 'ছাইতে না জানি গোড় চিনি' অন্ততঃ এ অবস্থাটাও হইয়াছে। এখন নিজের পাজি মন যে নানা সন্দেহ তুলিয়া বা অপরে যে নানা কথা কহিয়া একটা যাহা-তাহাকে ধর্ম বলিয়া বুঝাইয়া যাইবে, সেটার হাত হইতে অন্ততঃ নিষ্কৃতি পাইয়াছি; আর ভক্তিবিশ্বাসাদি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় যে হাতে হাতে অপরকে সাক্ষাৎ দেওয়া যায়, এ কথাটিও এখন জানিতে পারিয়া 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু' ঠাকুরের কৃপাকণালাভে অমৃতত্ব পাইব ধ্রুব, বুঝিয়া আশাপথ চাহিয়া পড়িয়া আছি

[1] রানী রাসমণির কালীবাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ঝাউবৃক্ষগুলি। উদ্যানের ঐ অংশ শৌচাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকায় ঐ দিকে কেহ অন্য কোন কারণে যাইত না।

[2] শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র হাজরা।

[3] ঠাকুরের সাধনকালে নিজের শরীরের দিকে আদৌ দৃষ্টি না থাকায় মাথায় বড় বড় চুল হইয়াছিল ও ধূলি লাগিয়া উহা আপনা-আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল।

[4] চতুর্থ অধ্যায় দেখ।

[5] ভাবাবেশ হইলে ঠাকুরের শরীর-জ্ঞান না থাকায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি (হাত, মুখ, গ্রীবা ইত্যাদি) বাঁকিয়া যাইত এবং কখনও বা সমস্ত শরীরটা হেলিয়া পড়িয়া যাইবার মতো হইত। তখন নিকটস্থ ভক্তেরা ঐসকল অঙ্গাদি ধরিয়া ধীরে ধীরে যথাযথভাবে সংস্থিত করিয়া দিতেন এবং পাছে ঠাকুর পড়িয়া গিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হন, এজন্য তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতেন। আর যে দেবদেবীর ভাবে ঠাকুরের ঐ অবস্থা, সেই দেবদেবীর নাম তখন তাঁহার কর্ণকুহরে শুনাইতে থাকিতেন, যথা – কালী কালী, রাম রাম, ওঁ ওঁ বা ওঁ তৎ সৎ ইত্যাদি। ঐরূপ শুনাইতে শুনাইতে তবে ধীরে ধীরে ঠাকুরের আবার বাহ্য চৈতন্য আসিত। যে ভাবে ঠাকুর যখন আবিষ্ট ও আত্মহারা হইতেন, সেই নাম ভিন্ন অপর নাম শুনাইলে তাঁহার বিষম যন্ত্রণাবোধ হইত।

[6] মা কালীর মন্দিরকে ঠাকুর 'কালীঘর' ও রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরকে 'বিষ্ণুঘর' বলিতেন।

[7] এই নহবতখানার নিম্নের ঘরে শ্রীশ্রীমা শয়ন করিতেন এবং সকল প্রকার দ্রব্যাদি রাখিতেন। নিম্নের ঘরের সম্মুখের রকে রন্ধনাদি হইত। উপরের ঘরে দিনের বেলায় কখনও কখনও উঠিতেন এবং কলিকাতা হইতে আগতা স্ত্রী-ভক্তদিগের সংখ্যা অধিক হইলে শয়ন করিতে দিতেন।

[8] মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন, "তা বাবু, আমি কিন্তু তোমায় রাজা বলতে পারব না; মিথ্যা কথা বলব কিরূপে?" আবার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন নিজের কথা বলিতে বলিতে যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত আপনার তুলনা করেন, তখন ঠাকুর বিশেষ বিরক্তির সহিত তাঁহার ঐরূপ বুদ্ধির নিন্দা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত কৃষ্ণদাস পালও যখন জগতের উপকার করা ছাড়া আর কোন ধর্মই নাই ইত্যাদি বলিয়া ঠাকুরের সহিত তর্ক উত্থাপন করেন, তখন ঠাকুর বিশেষ বিরক্তির সহিত তাঁহার বুদ্ধির দোষ দর্শাইয়া দেন।

[9] অর্থাৎ সমাধিসহায়ে উচ্চভূমিতে উঠিয়া তোমার অন্তরে কিরূপ পূর্বসংস্কারসকল আছে তাহা দেখিলাম।

৪.৭. ষষ্ঠ অধ্যায়: ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ–গোপালের মার[1] পূর্বকথা

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।

বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্।

স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীল-কুঞ্চিত-মূর্ধজম্।

* * *

বল্লবীবদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতম্॥

– শ্রীগোপালস্তোত্র

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

– গীতা, ৭/২১

"And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me."—*Matthew XVIII-5*

গোপালের মার ঠাকুরকে প্রথম দর্শন

গোপালের মা ঠাকুরকে প্রথম কবে দেখিতে আসেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না–তবে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র বা বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যখন আমরা তাঁহাকে প্রথম দেখি, তখন তিনি প্রায় ছয় মাস ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেছেন ও তাঁহার সহিত শ্রীভগবানের বালগোপাল-ভাবে অপূর্ব লীলাও চলিতেছে। আমাদের বেশ মনে আছে–সেদিন গোপালের মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে গঙ্গাজলের জালা ছিল, তাহারই নিকটে দক্ষিণ-পূর্বাস্য হইয়া অর্থাৎ ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন; বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইলেও বুঝিতে পারা কঠিন, কারণ বৃদ্ধার মুখে বালিকার আনন্দ! আমাদের পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি গি-র ছেলে? তুমি তো আমাদের গো। ওমা, গি-র ছেলে আবার ভক্ত হয়েছে! গোপাল এবার আর কাউকে বাকি রাখবে না; এক এক করে সব্বাইকে টেনে নেবে! তা বেশ, পূর্বে তোমার সহিত মায়িক সম্বন্ধ ছিল, এখন আবার তার চেয়ে অধিক নিকট সম্বন্ধ হলো" ইত্যাদি–সে আজ চব্বিশ বৎসরের কথা।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ; আকাশ যতদূর পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইতে হয়। এ বৎসর আবার কার্তিকের গোড়া থেকেই শীতের একটু আমেজ দেয়–আমাদের মনে আছে। এই নাতিশীতোষ্ণ হেমন্তেই বোধ হয় গোপালের মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শন লাভ করেন। পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কামারহাটিতে গঙ্গাতীরে যে ঠাকুরবাটী ও বাগান আছে, সেখান হইতে নৌকায় করিয়া তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। তাঁহারা, বলিতেছি–কারণ গোপালের মা সেদিন একাকী আসেন নাই; উক্ত উদ্যানস্বামীর বিধবা পত্নী, কামিনী নাম্নী তাঁহার একটি দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার সহিত, গোপালের মার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম তখন কলিকাতায় অনেকের নিকটেই পরিচিত। ইঁহারাও এই অলৌকিক ভক্ত-সাধুর কথা শুনিয়া অবধি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। কার্তিক মাসে শ্রীবিগ্রহের নিয়ম-সেবা করিতে হয়, সেজন্য গোবিন্দবাবুর পত্নী বা গিন্নীঠাকুরানী ঐ সময়ে কামারহাটির উদ্যানে প্রতি বৎসর বাস করিয়া স্বয়ং উক্ত সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। কামারহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বর আবার দুই বা তিন মাইল মাত্র হইবে–অতএব আসিবার বেশ সুবিধা। কামারহাটির গিন্নী এবং গোপালের মাও সেই সুযোগে রানী রাসমণির কালীবাটীতে উপস্থিত হন।

ঠাকুর সেদিন ইঁহাদের সাদরে স্বগৃহে বসাইয়া ভক্তিতত্ত্বের অনেক উপদেশ দেন ও ভজন গাহিয়া শুনান এবং পুনরায় আসিতে বলিয়া বিদায় দেন। আসিবার কালে গিন্নী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার কামারহাটির ঠাকুরবাড়িতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুরও সুবিধামতো একদিন যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বাস্তবিক ঠাকুর সেদিন গিন্নীর ও গোপালের মার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "আহা, চোখমুখের কি ভাব–ভক্তি-প্রেমে যেন ভাসচে–প্রেমময় চক্ষু! নাকের তিলকটি পর্যন্ত সুন্দর।" অর্থাৎ তাঁহাদের চাল-চলন, বেশভূষা ইত্যাদিতে ভিতরের ভক্তিভাবই যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, অথচ লোকদেখানো কিছুই নাই।

পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কলিকাতার কোন এক বিখ্যাত সওদাগরি আপিসে মুৎসদ্দি ছিলেন। সেখানে কার্যদক্ষতা ও উদ্যমশীলতায় অনেক সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু কিছুকাল পরে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। তাঁহার একমাত্র পুত্র উহার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। থাকিবার মধ্যে ছিল দুই কন্যা–ভূত ও নারাণ[2] এবং তাহাদের সন্তানসন্ততি। এদিকে বিষয় নিতান্ত অল্প নহে–কাজেই শেষ জীবনে গোবিন্দবাবুর ধর্মালোচনা ও পুণ্যকর্মেই কাল কাটিত। বাড়িতে রামায়ণ-মহাভারতাদি কথা দেওয়া, কামারহাটির বাগানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ সমারোহে স্থাপন করা, ভাগবতাদি শাস্ত্রের পারায়ণ, সস্ত্রীক তুলাদণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র প্রভৃতিকে দান ইত্যাদি অনেক সৎকার্য তিনি করিয়া যান। বিশেষতঃ আবার কামারহাটির বাগানে শ্রীবিগ্রহের পূজোপলক্ষে তখন বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই থাকিত এবং অতিথি-অভ্যাগত, দীন-দরিদ্র সকলকেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীউর প্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হইত।

তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী

গোবিন্দবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার সতী-সাধ্বী রমণীও শ্রীবিগ্রহের ঐরূপ সমারোহে সেবা অনেক দিন পর্যন্ত চালাইয়া আসিতেছিলেন! পরে নানা কারণে বিষয়ের অধিকাংশ নষ্ট হইল। তজ্জন্য শ্রীবিগ্রহের সেবার যাহাতে ত্রুটি না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্যই গোবিন্দবাবুর গৃহিণী এখন স্বয়ং এখানে থাকিয়া ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা থাকিতেন। গিন্নী সেকেলে মেয়ে, জীবনে শোকতাপও ঢের পাইয়াছেন, কাজেই–ধর্মানুষ্ঠানেই শান্তি, এ কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তবু পোড়া মায়া কি সহজে ছাড়ে–মেয়ে, জামাই, সমাজ, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদিও দেখিয়া চলিতে হইত। স্বামীর মৃত্যুর দিন হইতে নিজে কিন্তু কঠোর নিয়ম, উপবাস, শ্রীবিগ্রহের সেবা, জপ, ধ্যান, দান ইত্যাদি লইয়াই থাকিতেন।

বালবিধবা অঘোরমণি তাঁহার পুরোহিত-বংশ।

কামারহাটির ঠাকুরবাড়ির অতি নিকটেই গোবিন্দবাবুর পুরোহিতবংশের বাস। পুরোহিত নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। 'গোপালের মাতা' ইঁহারই ভগিনী–পূর্ব নাম অঘোরমণি দেবী–বালিকা বয়সে বিধবা হওয়ায় পিত্রালয়েই চিরকাল বাস। গিন্নী বা গোবিন্দবাবুর পত্নীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়া অবধি অঘোরমণির ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরসেবাতেই কাল কাটিতে থাকে। ক্রমে অনুরাগের আধিক্যে গঙ্গাতীরে ঠাকুরবাড়িতেই বাস করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় তিনি গিন্নীর অনুমতি লইয়া মেয়েমহলের একটি ঘরে আসিয়াই বসবাস করিলেন; পিত্রালয়ে দিনের মধ্যে দুই-একবার যাইয়া দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন মাত্র।

গিন্নীর যেমন কঠোর ব্রহ্মচর্য ও তপানুষ্ঠানে অনুরাগ, অঘোরমণিরও তদ্রূপ; সেজন্য উভয়ের মধ্যে মানসিক চিন্তা ও ভাবের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। বাহিরে কিন্তু বিষয়ের অধিকারিণী গিন্নীকে সামাজিক মানসম্ভ্রমাদি দেখিয়া চলিতে হইত, অঘোরমণির কিছুই না থাকায় সেসব

কিছুই দেখিতে হইত না। আবার নিজের পেটের একটাও না থাকায় জঞ্জালও কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে বোধ হয় অলঙ্কারাদি স্ত্রীধনবিক্রয়ে প্রাপ্ত পাঁচ-সাত শত টাকা; তাহাও কোম্পানীর কাগজ করিয়া গিন্নীর নিকট গচ্ছিত ছিল। উহার সুদ লইয়া এবং সময়ে সময়ে বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলে মূলধনে যতদূর সম্ভব অল্পস্বল্প হস্তক্ষেপ করিয়াই অঘোরমণির দিন কাটিত। অবশ্য গিন্নীও সকল বিষয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতার পরিবারবর্গকে সাহায্য করিতেন।

অঘোরমণির আচারনিষ্ঠা

অঘোরমণি কড়ে রাঁড়ী—স্বামীর সুখ কোন দিনই জীবনে জানেন নাই। মেয়েরা বলে "ওরা সব যত্নী রাঁড়ী, নুনটুকু পর্যন্ত ধুয়ে খায়"—অঘোরমণিও বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাহাই। বেজায় আচার-বিচার! আমরা জানি, একদিন তিনি রন্ধন করিয়া বোক্নো হইতে ভাত তুলিয়া পরমহংসদেবের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন প্রকারে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সে ভাত আর খাওয়া হইল না এবং ভাতের কাঠিটিও গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল! তিনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন, ইহা সেই সময়ের কথা।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে দুই-তিনটি উনুন পাতা ছিল। শ্রীশ্রীকালীমাতার ভোগরাগ সাঙ্গ হইতে অনেক বিলম্ব হইত, কখনও কখনও আড়াই প্রহর বেলা হইয়া যাইত। পরমহংসদেবের শরীর অসুস্থ থাকিলে—আর তাঁহার তো পেটের অসুখাদি নিত্য লাগিয়াই থাকিত—পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানী ঐ উনুনে সকাল সকাল দুটি ঝোলভাত তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতেন। যেসকল ভক্তেরা ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত ডালরুটি ঐ উনুনে তৈয়ারি হইত। আবার কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিলারা ঠাকুরের দর্শনে আসিয়া মাতাঠাকুরানীর সহিত ঐ নহবতখানায় সমস্ত দিন থাকিতেন এবং কখনও কখনও সেখানে রাত্রিযাপনও করিতেন—তাঁহাদের আহারাদিও শ্রীশ্রীমা ঐ উনুনে প্রস্তুত করিতেন। অঘোরমণি—অথবা ঠাকুর যেমন তাঁহাকে প্রথম প্রথম নির্দেশ করিতেন, 'কামারহাটির বামুনঠাকরুন বা বামনী'—যেদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন সেদিন ঠাকুরের ঝোল-ভাত রাঁধার পর শ্রীশ্রীমাকে গোবর, গঙ্গাজল প্রভৃতি দিয়া তিনবার উনুন পাড়িয়া দিতে হইত, তবে তাহাতে ব্রাহ্মণীর বোক্নো চাপিত! এতদূর বিচার ছিল।

গোবিন্দবাবুর ঠাকুরবাটীতে বাস ও তপস্যা

'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' আবার ছেলেবেলা হইতে বড় অভিমানিনী। কাহারও কথা এতটুকু সহ্য করিতে পারিতেন না—অর্থসাহায্যের জন্য হাত পাতা তো দূরের কথা। তাহার উপর আবার অন্যায় দেখিলেই লোকের মুখের উপর বলিয়া দিতে কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা ছিল না—কাজেই খুব অল্প লোকের সহিত তাঁহার বনিবনাও হইত। গিন্নী যে ঘরখানিতে তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে বাগানের দক্ষিণপ্রান্তে। ঘরের দক্ষিণের তিনটি জানালা দিয়া সুন্দর গঙ্গাদর্শন হইত এবং উত্তরে ও পশ্চিমে দুইটি দরজা ছিল। ব্রাহ্মণী ঐ ঘরে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন ও দিবারাত্র জপ করিতেন। এইরূপে ঐ ঘরে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল ব্রাহ্মণীর সুখে-দুঃখে কাটিয়া যাইবার পর তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শন তিনি লাভ করেন।

ব্রাহ্মণীর পিতৃকুল বোধ হয় শাক্ত ছিল—শ্বশুরকুল কি ছিল বলিতে পারি না—কিন্তু তাঁহার নিজের বরাবর বৈষ্ণবপদানুগা ভক্তি ছিল ও গুরুর নিকট হইতে গোপালমন্ত্র-গ্রহণ হইয়াছিল। গিন্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতাও বোধ হয় তাঁহার ঐ বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল। কারণ, মালপাড়ার গোস্বামিবংশীয়েরাই গোবিন্দবাবুর গুরুবংশ এবং উঁহাদের দুই-একজন কামারহাটির ঠাকুরবাটী হওয়া পর্যন্ত প্রায়ই ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন। কিন্তু মায়িক সম্বন্ধে সন্তান-বাৎসল্যের আস্বাদ এ জন্মে কিছুমাত্র না পাইয়াও কেমন করিয়া যে অঘোরমণির বাৎসল্যরতিতে এত নিষ্ঠা হয়

এবং শ্রীভগবানকে পুত্রস্থানীয় করিয়া গোপালভাবে ভজনা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার মীমাংসা হওয়া কঠিন। অনেকেই বলিবেন পূর্বজন্ম ও সংস্কার—যাহাই হউক, ঘটনা কিন্তু সত্য।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্ত্রীলোকদিগের ধর্মনিষ্ঠা বিভিন্নভাবে প্রকাশ

বিলাত আমেরিকায় সংসারে দুঃখ-কষ্ট পাইয়া বা অপর কোন কারণে স্ত্রীলোকদিগের ভিতর ধর্মনিষ্ঠা আসিলেই উহা দান, পরোপকার এবং দরিদ্র ও রোগীর সেবারূপ কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। দিবারাত্র সৎকর্ম করা—ইহাই তাহাদের লক্ষ্য হয়। আমাদের দেশে উহার ঠিক বিপরীত। কঠোর ব্রহ্মচর্য, তপশ্চরণ, আচার এবং জপাদির ভিতর দিয়াই ঐ ধর্মনিষ্ঠা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সংসার-ত্যাগ এবং অন্তর্মুখীনতার দিকে অগ্রসর হওয়াই দিন দিন তাহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের এ জীবনে দর্শনলাভ করা জীবের সাধ্য এবং উহাতে যথার্থ শান্তি—এ কথা এ দেশের জলবায়ুতে বর্তমান থাকিয়া স্ত্রীপুরুষের অস্থিমজ্জায় পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কাজেই 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী'র একান্ত বাস ও তপশ্চরণ অন্য দেশের আশ্চর্যের বিষয় হইলেও এ দেশে সহজ ভাব।

অঘোরমণির ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই কামারহাটির ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন—কেন, কি কারণে এবং উহা কতদূর গড়াইবে, সে কথা অবশ্য কিছুই অনুভব করিতেও পারেন নাই; কিন্তু 'ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধু-ভক্ত এবং ইঁহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব'—এইরূপ ভাবে কেমন একটা অব্যক্ত টানের উদয় হইয়াছিল। গিন্নীও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে সমাজে নিন্দা করে এই ভয়ে আর আসিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাহার উপর মেয়ে-জামাইদের জন্য তাঁহাকে অনেক কাল আবার পটলডাঙ্গার বাটীতেও কাটাইতে হইত। সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বর অনেক দূর এবং আসিতে হইলে সকলকে জানাইয়া সাজ-সরঞ্জাম করিয়া আসিতে হয়—কাজেই আর বড় একটা আসা হইত না।

ব্রাহ্মণীর ও-সব ঝঞ্ঝাট তো নাই—কাজেই প্রথম দর্শনের অল্পদিন পরে জপ করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিবার ইচ্ছা হইবামাত্র দুই-তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ, আমার জন্য কি এনেছ দাও।" গোপালের মা বলেন, "আমি তো একেবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন করে সে 'রোঘো' (খারাপ) সন্দেশ বার করি—এঁকে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্চে—আবার তাই ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!" ভয়ে লজ্জায় কিছু না বলিতে পারিয়া সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরও উহা মহা আনন্দ করিয়া খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল-নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে-খাড়ার তরকারি—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।" গোপালের মা বলেন, "ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, এইরূপে কেবল খাবার কথাই হতে লাগল; আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেছি—কেবল খাইখাই; কেবল খাইখাই; আমি গরিব কাঙাল লোক—কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক, আর আসব না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েচি, অমনি যেন পেছন থেকে তিনি টানতে লাগলেন। কোন মতে এগুতে আর পারি না। কত করে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি।" ইহার কয়েকদিন পরেই আবার 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' চচ্চড়ি হাতে করিয়া তিন মাইল হাঁটিয়া পরমহংসদেবের দর্শনে উপস্থিত! ঠাকুরও পূর্বের ন্যায় আসিবামাত্র উহা চাহিয়া খাইয়া "আহা কি রান্না, যেন সুধা, সুধা" বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গোপালের

মার সে আনন্দ দেখিয়া চোখে জল আসিল। ভাবিলেন—তিনি গরিব কাঙাল বলিয়া তাঁহার এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন।

এইরূপে দুই-চারি মাস ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত হইতে লাগিল। যে দিন যা রাঁধেন, ভাল লাগিলেই তাহা পরের বারে ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার সময় ব্রাহ্মণী কামারহাটি হইতে লইয়া আসেন। ঠাকুরও তাহা কত আনন্দ করিয়া খান, আবার কখনও বা কোন সামান্য জিনিস, যেমন সুষনি শাক সস্‌সড়ি, কলমি শাক চচ্চড়ি ইত্যাদি আনিবার জন্য অনুরোধ করেন। কেবল 'এটা এনো, ওটা এনো' আর 'খাইখাই'র জ্বালায় বিরক্ত হইয়া গোপালের মা কখনও কখনও ভাবেন, "গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হলো? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল খেতে চায়! আর আসব না।" কিন্তু সে কি এক বিষম টান! দূরে গেলেই আবার কবে যাব, কতক্ষণে যাব, এই মনে হয়।

ঠাকুরের গোবিন্দবাবুর বাগানে আগমন

ইতোমধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও একবার কামারহাটিতে গোবিন্দবাবুর বাগানে গমন করেন এবং তথায় শ্রীবিগ্রহের সেবাদি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন। সেবার তিনি সেখানে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কীর্তনাদি করিয়া প্রসাদ পাইবার পর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন। কীর্তনের সময় তাঁহার অদ্‌ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া গিন্নী ও সকলে বিশেষ মুগ্ধ হন। তবে গোস্বামিপাদদিগের মনে পাছে প্রভুত্ব হারাইতে হয় বলিয়া একটু ঈর্ষা-বিদ্বেষ আসিয়াছিল কিনা বলা সুকঠিন। শুনিতে পাই ঐরূপই হইয়াছিল।

অঘোরমণির অলৌকিক বালগোপাল-মূর্তি-দর্শনে অবস্থা

'কামারহাটির ব্রাহ্মণী'র বহুকালের অভ্যাস—রাত্রি ২টায় উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া ৩টার সময় হইতে জপে বসা। তারপর বেলা আটটা-নয়টার সময় জপ সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া স্নান ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীর দর্শন ও সেবাকার্যে যথাসাধ্য যোগদান করা। পরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদি হইয়া গেলে দুই-প্রহরের সময় আপনার নিমিত্ত রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হওয়া। পরে আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াই পুনরায় জপে বসা ও সন্ধ্যায় আরতিদর্শন করিবার পর পুনরায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত জপে কাটানো। পরে একটু দুধ পান করিয়া কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম! স্বভাবতই তাঁহার বায়ুপ্রধান ধাত ছিল—নিদ্রা অতি অল্পই হইত। কখনও কখনও বুক ধড়ফড় ও প্রাণ কেমন কেমন করিত। ঠাকুর শুনিয়া বলেন, "ও তোমার হরিবাই—ওটা গেলে কি নিয়ে থাকবে? যখন ওরূপ হবে তখন কিছু খেও।"

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ—শীত ঋতু অপগত হইয়া কুসুমাকর সরস বসন্ত আসিয়া উপস্থিত। পত্র-পুষ্প-গীতিপূর্ণ বসুন্ধরা এক অপূর্ব উন্মত্ততায় জাগরিতা। ঐ উন্মত্ততার ইতরবিশেষ নাই—আছে কিন্তু জীবের প্রবৃত্তির। যাহার যেরূপ সু বা কু প্রবৃত্তি ও সংস্কার, তাহার নিকট উহা সেইভাবে প্রকাশিতা। সাধু সদ্বিষয়ে নব-জাগরণে জাগরিত, অসাধু অন্যরূপে—ইহাই প্রভেদ।

এই সময়ে 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বামদিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণহস্তটি মুঠো করার মতো দেখা যাইতেছে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট জীবন্ত! ভাবিলেন, "এ কি? এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন করে হেথায় এলেন?" গোপালের মা বলেন, "আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐ কথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'গোপাল' বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসছে! তারপর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি,

অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশমাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এত বড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখ-পানে চেয়ে (সে কি রূপ, আর কি চাউনি!) বললে, 'মা, ননী দাও'! আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা। চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম–সে তো এমন চিৎকার নয়, বাড়িতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হতো। কেঁদে বললুম, 'বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা!' কিন্তু সে অদ্‌ভুত গোপাল কি তা শোনে–কেবল 'খেতে দাও' বলে। কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুকনো নারকেল-লাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বললুম, 'বাবা, গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।'"

ঐ অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আগমন

"তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমন সকাল হলো অমনি পাগলিনীর মতো ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চলল–কাঁধে মাথা রেখে! এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলচে!"

অঘোরমণি যে দিন ঐরূপে সহসা নিজ উপাস্য দেবতার দর্শনলাভে ভাবে প্রেমে উন্মত্তা হইয়া কামারহাটির বাগান হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট প্রত্যূষে আসিয়া উপস্থিত হন সে দিন সেখানে আমাদের পরিচিতা অন্য একটি স্ত্রী-ভক্তও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিব। তিনি বলেন:

"আমি তখন ঠাকুরের ঘরটি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করচি–বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। এমন সময় শুনতে পেলুম বাহিরে কে 'গোপাল', 'গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে ঠাকুরের ঘরের দিকে আসচে। গলার আওয়াজটা পরিচিত–ক্রমেই নিকট হতে লাগল। চেয়ে দেখি গোপালের মা!–এলোথেলো পাগলের মতো, দুই চক্ষু যেন কপালে উঠেছে, আঁচলটা ভূঁয়ে লুটুচ্চে, কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই!–এমনিভাবে ঠাকুরের ঘরে পূর্ব দিককার দরজাটি দিয়ে ঢুকচে। ঠাকুর তখন ঘরের ভিতর ছোট তক্তাপোশখানির উপর বসেছিলেন।

"গোপালের মাকে ঐরূপ দেখে আমি তো একেবারে হাঁ হয়ে গেছি–এমন সময় তাঁকে দেখে ঠাকুরেরও ভাব হয়ে গেল। ইতোমধ্যে গোপালের মা এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়ল এবং ঠাকুরও ছেলের মতো তার কোলে গিয়ে বসলেন! গোপালের মার দুই চক্ষে তখন দরদর করে জল পড়চে; আর যে ক্ষীর সর ননী এনেছিল তাই ঠাকুরের মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্চে। আমি তো দেখে অবাক আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, কারণ ইহার পূর্বে কখনও তো ঠাকুরকে ভাব হয়ে কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতে দেখি নাই; শুনেছিলাম বটে ঠাকুরের গুরু বামনীর কখনও কখনও যশোদার ভাব হতো আর ঠাকুরও তখন গোপালভাবে তার কোলে উঠে বসতেন। যা হোক, গোপালের মার ঐ অবস্থা আর ঠাকুরের ভাব দেখে আমি তো একেবারে আড়ষ্ট! কতকক্ষণ পরে ঠাকুরের সে ভাব থামল এবং তিনি আপনার চৌকিতে উঠে বসলেন। গোপালের মার কিন্তু সে ভাব আর থামে না! আনন্দে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে' ইত্যাদি পাগলের মতো বলে আর ঘরময় নেচে নেচে বেড়ায়! ঠাকুর তাই দেখে হেসে আমাকে বললেন–'দেখ, দেখ, আনন্দে ভরে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে!' বাস্তবিকই ভাবে গোপালের মার ঐরূপ দর্শন হতো; ও যেন আর এক মানুষ হয়ে যেত! আর একদিন খাবার সময় ভাবে প্রেমে গদগদ হয়ে আমাদের সকলকে গোপাল বলে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়েছিল। আমি আমাদের সমান ঘরে মেয়ের বিয়ে দি নাই বলে আমায় মনে

মনে একটু ঘেন্না করত—সেদিন তার জন্যেই বা গোপালের মার কত অনুনয়-বিনয়! বললে, ‘আমি কি আগে জানি যে তোর ভেতর এতখানি ভক্তি-বিশ্বাস! যে গোপাল ভাবের সময় প্রায় কাউকে ছুঁতে পারে না, সে কি না আজ ভাবাবেশে তোর পিঠের উপর গিয়ে বসল! তুই কি সামান্যি’!” বাস্তবিকই সেদিন ঠাকুর গোপালের মাকে দেখিয়া সহসা গোপালভাবাবিষ্ট হইয়া প্রথম এই স্ত্রী-ভক্তটির পৃষ্ঠদেশে এবং পরে গোপালের মার ক্রোড়ে কিছুক্ষণের জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন।

অঘোরমণি ঐরূপ ভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ভাবের আধিক্যে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেদিন কত কি কথাই না বলিলেন! “এই যে গোপাল আমার কোলে”, “ঐ তোমার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ভেতরে ঢুকে গেল”, “ঐ আবার বেরিয়ে এল”, “আয় বাবা, দুঃখিনী মার কাছে আয়”—ইত্যাদি বলিতে বলিতে দেখিলেন চপল গোপাল কখনও বা ঠাকুরের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, আবার কখনও বা উজ্জ্বল বালক-মূর্তিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব বাল্যলীলাতরঙ্গতুফান তুলিয়া তাঁহাকে বাহ্যজগতের কঠোর শাসন, নিয়ম প্রভৃতি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল! সে প্রবল ভাবতরঙ্গে পড়িয়া কেই বা আপনাকে সামলাইতে পারে!

ঠাকুরের ঐ অবস্থা দুর্লভ বলিয়া প্রশংসা করা এবং তাঁহাকে শান্ত করা

অদ্য হইতে অঘোরমণি বাস্তবিকই ‘গোপালের মা’ হইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মার ঐরূপ অপরূপ অবস্থা দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, শান্ত করিবার জন্য তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং ঘরে যত কিছু ভাল ভাল খাদ্য-সামগ্রী ছিল সে সব আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। খাইতে খাইতেও ভাবের ঘোরে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল, “বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এজন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েচে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েচে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করচো!” ইত্যাদি।

সমস্ত দিন কাছে রাখিয়া স্নানাহার করাইয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে কামারহাটি পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিবার সময় ভাবদৃষ্ট বালক গোপালও পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণীর কোলে চাপিয়া চলিল। ঘরে ফিরিয়া গোপালের মা পূর্বাভ্যাসে জপ করিতে বসিলেন, কিন্তু সেদিন আর কি জপ করা যায়? যাঁহার জন্য জপ, যাঁহাকে এতকাল ধরিয়া ভাবা—সে যে সম্মুখে নানা রঙ্গ, নানা আবদার করিতেছে! ব্রাহ্মণী শেষে উঠিয়া গোপালকে কাছে লইয়া তক্তাপোশের উপর বিছানায় শয়ন করিল! ব্রাহ্মণীর যাহাতে তাহাতে শয়ন—মাথায় দিবার একটা বালিশও ছিল না। এখন শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই—গোপাল শুধু-মাথায় শুইয়া খুঁতখুঁত করে! অগত্যা ব্রাহ্মণী আপনার বাম বাহূপরি গোপালের মাথা রাখিয়া তাহাকে কোলের গোড়ায় শোয়াইয়া কত কি বলিয়া ভুলাইতে লাগিল—“বাবা, আজ এইরকমে শো; রাত পোয়ালেই কাল কলকেতা গিয়ে ভূতোকে (গিন্নীর বড় মেয়ে) বলে তোমায় বিচি ঝেড়ে বেছে নরম বালিশ করিয়ে দেব”, ইত্যাদি।

পূর্বেই বলিয়াছি গোপালের মা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া গোপালকে উদ্দেশে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন, সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে! এইরূপে মায়ে-পোয়ে কাঠকুড়ানো হইল—তাহার পর রান্না। রান্নার সময়ও দুরন্ত গোপাল কখনও কাছে বসিয়া, কখনও পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল, কত কি বলিতে লাগিল, কত কি আবদার করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণীও কখনও মিষ্ট কথায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন, কখনও বকিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের গোপালের মাকে বলা—‘তোমার সব হয়েছে’

পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পর গোপালের মা একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নহবতে—যেখানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী থাকিতেন—যাইয়া জপ করিতে বসিলেন। নিয়মিত জপ সাঙ্গ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন ঠাকুর পঞ্চবটী হইতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর গোপালের মাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “তুমি এখনও অত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে (দর্শনাদি)!”

গোপালের মা—জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে?

ঠাকুর—সব হয়েছে।

গোপালের মা—সব হয়েছে?

ঠাকুর—হাঁ, সব হয়েছে।

গোপালের মা—বল কি, সব হয়েছে?

ঠাকুর—হাঁ, তোমার আপনার জন্য জপ তপ সব করা হয়ে গেছে, তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হয় তো করতে পার।

গোপালের মা—তবে এখন থেকে যা কিছু করব সব তোমার, তোমার, তোমার।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গোপালের মা কখনও কখনও আমাদিগকে বলিতেন, “গোপালের মুখে ঐ কথা সেদিন শুনে থলি মালা সব গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলুম। গোপালের কল্যাণের জন্য করেই জপ করতুম। তারপর অনেক দিন বাদে আবার একটা মালা নিলুম। ভাবলুম—একটা কিছু তো করতে হবে? চব্বিশ ঘণ্টা করি কি? তাই গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই!”

এখন হইতে গোপালের মা-র জপ-তপ সব শেষ হইল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ঘন ঘন আসা-যাওয়া বাড়িয়া গেল। ইতঃপূর্বে তাঁহার যে এত খাওয়া-দাওয়ায় আচার-নিষ্ঠা ছিল সেসবও এই মহাভাবতরঙ্গে পড়িয়া দিন দিন কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গোপাল তাঁহার মন-প্রাণ এককালে অধিকার করিয়া বসিয়া কতরূপে তাঁহাকে যে শিক্ষা দিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আর নিষ্ঠাই বা রাখেন কি করিয়া?—গোপাল যে যখন তখন খাইতে চায়, আবার নিজে খাইতে খাইতে মার মুখে গুঁজিয়া দেয়! তাহা কি ফেলিয়া দেওয়া যায়? আর ফেলিয়া দিলে সে যে কাঁদে! ব্রাহ্মণী এই অপূর্ব ভাবতরঙ্গে পড়িয়া অবধি বুঝিয়াছিলেন যে, উহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই খেলা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার ‘নবীন-নীরদশ্যাম, নীলেন্দীবরলোচন’ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ! কাজেই তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়ানো, তাঁহার প্রসাদ খাওয়া ইত্যাদিতে আর দ্বিধা রহিল না।

এইরূপে অনবরত দুই মাস কাল কামারহাটির ব্রাহ্মণী গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিবারাত্র বুকে পিঠে করিয়া একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন! ভাবরাজ্যে এইরূপ দীর্ঘকাল বাস করিয়া ‘চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম’-এর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দর্শন মহাভাগ্যবানেরই সম্ভবে। একে তো শ্রীভগবানে বাৎসল্যরতিই জগতে দুর্লভ—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞানের লেশমাত্র মনে থাকিতে উহার উদয় অসম্ভব—তাহার উপর সেই রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সহায়ে ঘনীভূত হইয়া শ্রীভগবানের এইরূপ দর্শনলাভ করা যে আরও কত দুর্লভ তাহা সহজে অনুমিত হইবে। প্রবাদ আছে, ‘কলৌ জাগর্তি গোপালঃ’, ‘কলৌ জাগর্তি কালিকা’—তাই বোধ হয় অদ্যাপি শ্রীভগবানের ঐ দুই ভাবের এইরূপ জ্বলন্ত উপলব্ধি কখনও কখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার খুব হয়েছে। কলিতে এরূপ অবস্থা বরাবর থাকলে, শরীর থাকে না।" বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছাই ছিল, বাৎসল্যরতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণীর ভাবপূত শরীর লোকহিতায় আরও কিছুদিন এ সংসারে থাকে। পূর্বোক্ত দুইমাসের পর গোপালের মার দর্শনাদি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া গেল। তবে একটু স্থির হইয়া বসিয়া গোপালের চিন্তা করিলেই পূর্বের ন্যায় দর্শন পাইতে লাগিলেন।

[1] দিব্য-ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরকে বিশিষ্ট সাধক-ভক্তগণের সহিত কিরূপ লীলা করিতে দেখিয়াছি তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত গোপালের মা-র অদ্‌ভুত দর্শনাদির কথা পাঠককে এখানে উপহার দিতেছি। যাঁহারা মনে করিবেন আমরা উহা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা উহাতে মুন্সীয়ানা কিছুমাত্র ফলাই নাই – এমনকি ভাষাতে পর্যন্ত নহে। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদিগের নিকট হইতে যেমন সংগ্রহ করিয়াছি প্রায় তেমনই ধরিয়া দিয়াছি। আবার উহা সংগ্রহও করিয়াছি এমন সব লোকের নিকট হইতে, যাঁহারা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ যথাযথ বলিবার প্রয়াস পান, না পারিলে অনুতপ্তা হন এবং 'কামারহাটির বামনীর' স্তাবক হওয়া দূরে যাউক, কখনও কখনও তদনুষ্ঠিত কোন কোন আচরণের তীব্র সমালোচনাও আমাদের নিকট করিয়াছেন।

[2] যজ্ঞেশ্বরী ও নারায়ণী।

৪.৮. সপ্তম অধ্যায়: ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ–১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পুনর্যাত্রা ও গোপালের মার শেষকথা

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

– শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৯।২২

বলরাম বসুর বাটীতে পুনর্যাত্রা উপলক্ষ্যে উৎসব

'কামারহাটির ব্রাহ্মণী'র গোপালরূপী শ্রীভগবানের দর্শনের কিছুকাল পরে রথের সময় ঠাকুর কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন–বাগবাজারের বলরাম বসুর বাটীতে ভক্তদের ভিড় লাগিয়াছে–বলরামবাবুও আনন্দে আটখানা হইয়া সকলকে সমুচিত আদর-অভ্যর্থনা করিতেছেন। বসুজ মহাশয় পুরুষানুক্রমে বনিয়াদি ভক্ত–এক পুরুষে নয়। ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার ও তৎপরিবারবর্গের উপর অসীম।

ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন দেখিবার সাধ ও তদ্দর্শন। বলরাম বসুকে উহার ভিতর দর্শন করা

ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনা–এক সময়ে ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করা দেখিবার সাধ হইলে ভাবাবস্থায় তদ্দর্শন হয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার–অসীম জনতা, হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ততা! আর সেই উন্মাদ-তরঙ্গের ভিতর উন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদনী আকর্ষণ! সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন–উহারই ভিতর যে কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিতে চির-অঙ্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তি-জ্যোতিঃপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি তাহাদের অন্যতম। বলরামবাবু যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হন, সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন–এ ব্যক্তি সেই লোক।

বলরামের নানাস্থানে ঠাকুর-সেবার ও শুদ্ধ অন্নের কথা

বসুজ মহাশয়ের কোঠারে (উড়িষ্যার অন্তর্গত) জমিদারি ও শ্যামচাঁদবিগ্রহের সেবা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ও শ্যামসুন্দরের সেবা আছে এবং কলিকাতার বাটীতেও ৺জগন্নাথদেবের বিগ্রহ[1] ও সেবাদি আছে। ঠাকুর বলিতেন, "বলরামের শুদ্ধ অন্ন–ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা–ওর বাপ সব ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে–ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।" বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরামবাবুর অন্নই (ভাত) তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আসিতেন, সেদিন মধ্যাহ্নভোজন বলরামের বাটীতেই হইত! ব্রাহ্মণ ভক্তদিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহারও বাটীতে কোনদিন অন্নগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ–তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্য কথা।

ঠাকুরের চারিজন রসদ্দার ও বলরামবাবুর সেবাধিকার

অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের অতি সামান্য নিত্যনৈমিত্তিক চেষ্টাদিতেও কেমন একটু অলৌকিকত্ব, নূতনত্ব থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত যাঁহারা একদিনও সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার মর্ম বিশেষরূপে বুঝিবেন। বলরামবাবুর অন্ন খাইতে পারা সম্বন্ধেও একটু তলাইয়া দেখিলেই উহাই উপলব্ধি হইবে। সাধনকালে ঠাকুর এক সময় জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া

বলেন, "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনি—রসে বশে রাখিস"; জগদম্বাও তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার রসদ (খাদ্যাদি) যোগাইবার নিমিত্ত চারিজন রসদ্দার প্রেরিত হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন—ঐ চারিজনের ভিতর রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ প্রথম ও শম্ভু মল্লিক দ্বিতীয় ছিলেন। সিমলার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে (যাহাকে ঠাকুর কখনও 'সুরেন্দর' ও কখনও 'সুরেশ' বলিয়া ডাকিতেন) 'অর্ধেক রসদ্দার' অর্থাৎ সুরেন্দ্র পুরা একজন রসদ্দার নয়—বলিতেন; মথুরানাথের ও শম্ভুবাবুর সেবা চক্ষে দেখা আমাদের ভাগ্যে হয় নাই—কারণ, আমরা তাঁহাদের পরলোকপ্রাপ্তির অনেক পরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। তবে ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। বলরামবাবুকে ঠাকুর তাঁহার রসদ্দারদিগের অন্যতম বলিয়া কখনও নির্দিষ্ট করিয়াছেন এ কথা মনে হয় না; কিন্তু তাঁহার যেরূপ সেবাধিকার দেখিয়াছি তাহা আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা মথুরবাবু ভিন্ন অপর রসদ্দারদিগের সেবাধিকার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সেসব কথা অপর কোন সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন এইটুকুই বলি যে, বলরামবাবু যেদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন, সেইদিন হইতে ঠাকুরের অদর্শন-দিন পর্যন্ত ঠাকুরের নিজের যাহা কিছু আহার্যের প্রয়োজন হইত, প্রায় সে সমস্তই যোগাইতেন—চাল, মিছরি, সুজি, সাগু, বার্লি, ভার্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি; এবং সুরেন্দ্র বা 'সুরেশ মিত্তির' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরের সেবাদির নিমিত্ত যেসকল ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত লেপ, বালিশ ও ডাল-রুটির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

কি গূঢ় সম্বন্ধে যে এইসকল ব্যক্তি ঠাকুরের সহিত সম্বদ্ধ ছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ কারণে ইঁহারা এই উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হন, তাহাই বা কে বলিবে? আমরা এই পর্যন্তই বুঝিয়াছি যে, ইঁহারা মহাভাগ্যবান—জগদম্বার চিহ্নিত ব্যক্তি! নতুবা লোকোত্তরপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের বর্তমান লীলায় ইঁহারা এইরূপে বিশেষ সহায়ক হইয়া জন্মাধিকার লাভ করিতেন না! নতুবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত মনে ইঁহাদের মুখের ছবি এরূপ ভাবে অঙ্কিত থাকিত না, যাহাতে তিনি দর্শনমাত্রেই তা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা এখানকার, এই বিশেষ অধিকার লইয়া আসিয়াছে!"

ঠাকুর 'আমি' 'আমার' শব্দের পরিবর্তে সর্বদা 'এখানে' 'এখানকার' বলিতেন। উহার কারণ

'ইহারা আমার' না বলিয়া ঠাকুর 'এখানকার' বলিতেন, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপাপবিদ্ধ মনে অহং-বুদ্ধি এতটুকুও স্থান পাইত না। তাই 'আমি', 'আমার' এই কথাগুলি প্রয়োগ করা তাঁহার পক্ষে বড়ই কঠিন ছিল! কঠিন ছিলই বা বলি কেন? তিনি ঐ দুই শব্দ আদৌ বলিতে পারিতেন না। যখন নিতান্তই বলিতে হইত, তখন 'শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস বা সন্তান আমি'—এই অর্থে বলিতেন, এবং উহাও পূর্ব হইতে ঐ ভাব ঠিক ঠিক মনে আসিলে তবেই বলা চলিত, সেজন্য কথোপকথনকালে কোন স্থলে 'আমার' বলিতে হইলে ঠাকুর নিজ শরীর দেখাইয়া 'এখানকার' এই কথাটি প্রায়ই বলিতেন—ভক্তেরাও উহা হইতে বুঝিয়া লইতেন; যথা, 'এখানকার লোক', 'এখানকার ভাব নয়' ইত্যাদি বলিলেই আমরা বুঝিতাম, তিনি 'তাঁহার লোক নয়', 'তাঁহার ভাব নয়' বলিতেছেন।

রসদ্দারেরা কে কি ভাবে কতদিন ঠাকুরের সেবা করে

যাক এখন সে কথা—এখন আমরা রসদ্দারদের কথাই বলি—প্রথম রসদ্দার মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় দেড়জনের ভিতর শম্ভুবাবু মথুরবাবুর শরীরত্যাগের কিছু পর হইতে কেশববাবু প্রমুখ কলিকাতার ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার

কিছু পূর্ব পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন এবং অর্ধ-রসদ্দার সুরেশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের ছয়-সাত বৎসর পূর্ব হইতে চারি-পাঁচ বৎসর পর পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে বরাহনগরে মুন্সীবাবুদিগের পুরাতন ভগ্ন জীর্ণ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মঠ—যাহা আজ বেলুড় মঠে পরিণত—এই সুরেশবাবুর আগ্রহে এবং ব্যয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। হিসাবে বাকি আর দেড়জন রসদ্দার—কোথায় তাঁহারা? আমাদের প্রসঙ্গোক্ত বলরামবাবু ও যে আমেরিকা-নিবাসিনী মহিলা (মিসেস্ সারা সি বুল) শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীকে বেলুড় মঠ স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন—তাঁহারাই কি ঐ দেড়জন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ স্বামীজীর অদর্শনে এ কথা এখন আর কে মীমাংসা করিবে?

'বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা'

বলরামবাবু দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পর্যন্ত প্রতি বৎসর রথের সময় ঠাকুরকে বাটীতে লইয়া আসেন। বাগবাজার রামকান্ত বসু স্ট্রীটে তাঁহার বাটী অথবা তাঁহার ভ্রাতা কটকের প্রসিদ্ধ উকিল রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের বাটী। বলরামবাবু তাঁহার ভ্রাতার বাটীতেই থাকিতেন—বাটীর নম্বর ৫৭। এই ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট বাটীতে ঠাকুরের যে কতবার শুভাগমন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুর কখনও কখনও রহস্য করিয়া 'মা কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন, কলিকাতার বসুপাড়ার এই বাটীকে তাঁহার দ্বিতীয় কেল্লা বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন, "বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা"—কর্তা গিন্নী হইতে বাটীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ। প্রায় অনেক পরিবারেই দেখা যায়, যদি একজন কি দুইজন ধার্মিক তো অপর সকলে আর একরূপ, বিজাতীয়; এ পরিবারে কিন্তু সেটি নাই। সকলেই একজাতীয় লোক! পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ধর্মানুরাগী পরিবার বোধ হয় অল্পই পাওয়া যায়—তাহার উপর আবার পরিবারস্থ সকলের এইরূপ এক বিষয়ে অনুরাগ থাকা এবং পরস্পর পরস্পরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা, ইহা দেখিতে পাওয়া কদাচ কখনও হয়। কাজেই এই পরিবারবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয় কেল্লাস্বরূপ হইবে এবং এখানে আসিয়া যে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ পাইবেন ইহা বিচিত্র নহে।

বলরামের বাটীতে রথোৎসব আড়ম্বরশূন্য ভক্তির ব্যাপার

পূর্বেই বলিয়াছি, এই বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ছিল, কাজেই রথের সময় রথটানাও হইত; কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই। বাড়ি সাজানো, বাদ্যভাণ্ড, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—এ সবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ, বাহিরবাটীর দোতলার চকমিলান বারাণ্ডায় চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত—একদল কীর্তনীয়া আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য—সে আর অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইবে? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা! এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কীর্তনের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন। তারপর অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙিত এবং ভক্তেরা দুই-চারি জন ব্যতীত যে যাঁহার বাটীতে চলিয়া যাইতেন। লেখকের এই আনন্দ-সম্ভোগ জীবনে একবারমাত্রই হইয়াছিল—ঐ বারেই গোপালের মাকে এই বাটীতে ঠাকুরের কথায় আনিতে পাঠানো হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের উলটা রথের কথাই

আমরা এখানে বলিতেছি। ঠাকুর এই বৎসর ঐ দিন এখানে আসিয়া বলরামবাবুর বাটীতে দুই দিন দুই রাত থাকিয়া তৃতীয় দিনে বেলা আটটা-নয়টার সময় নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।

স্ত্রী-ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের অপূর্ব সম্বন্ধ

আজ ঠাকুর প্রাতেই এ বাটীতে আসিয়াছেন। বাহিরে কিছুক্ষণ বসার পর তাঁহাকে অন্দরে জলযোগ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল। বাহিরে দু-চারটি করিয়া অনেকগুলি পুরুষ-ভক্তের সমাগম হইয়াছে, ভিতরেও নিকটবর্তী বাটীসকল হইতে ঠাকুরের যত স্ত্রী-ভক্ত সকলে আসিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেই বলরামবাবুর আত্মীয়া বা পরিচিতা এবং তাঁহার বাটীতে যখনই পরমহংসদেব উপস্থিত হইতেন বা তিনি নিজে যখনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিতে যাইতেন, তখনই ইঁহাদের সংবাদ দিয়া বাটীতে আনাইতেন বা আনাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ভাবিনী ঠাকরুন, অসীমের মা, গনুর মা ও তাঁর মা—এইরূপ এর মা, ওর পিসী, এর ননদ, ওর পড়শী প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের আজ সমাগম হইয়াছে।

এইসকল সতী সাধ্বী ভক্তিমতী স্ত্রীলোকদিগের সহিত কামগন্ধহীন ঠাকুরের যে কি এক মধুর সম্বন্ধ ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইঁহাদের অনেকেই ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা বলিয়া তখনি জানেন। সকলেরই ঠাকুরের উপর এইরূপ বিশ্বাস। আবার কোন কোন ভাগ্যবতী উহা গোপালের মার ন্যায় দর্শনাদি দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কাজেই ঠাকুরকে ইঁহারা আপনার হইতেও আপনার বলিয়া জানেন এবং তাঁহার নিকট কোনরূপ ভয়-ডর বা সঙ্কোচ অনুভব করেন না। ঘরে কোনরূপ ভাল খাবার-দাবার তৈয়ার করিলে তাহা পতিপুত্রদের আগে না দিয়া ইঁহারা ঠাকুরের জন্য আগে পাঠান বা স্বয়ং লইয়া যান। ঠাকুর থাকিতে এইসকল ভদ্রমহিলারা কতদিন যে পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় নিজেদের বাটীতে গতায়াত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। কোন দিন সন্ধ্যার পর, কোন দিন রাত দশটায়, আবার কোন দিন বা উৎসব-কীর্তনাদি সাঙ্গ হইতে ও দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিতে রাত দুই প্রহরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে! ইঁহাদের কাহাকেও ঠাকুর ছেলেমানুষের মতো কত আগ্রহের সহিত নিজের পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগের ঔষধ জিজ্ঞাসা করিতেন; কেহ তাঁহাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া হাসিলে বলিতেন, "তুই কি জানিস? ও কত বড় ডাক্তারের স্ত্রী—ও দু-চারটে ঔষধ জানেই জানে।" কাহারও ভাবপ্রেম দেখিয়া বলিতেন, "কৃপাসিদ্ধ গোপী"। কাহারও মধুর রান্না খাইয়া বলিতেন, "ও বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী, সুক্তোয় সিদ্ধহস্ত" ইত্যাদি।

ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদিগকে গোপালের মার দর্শনের কথা বলা ও তাঁহাকে আনিতে পাঠান

ঠাকুর জল খাইতে খাইতে আজ এইসকল স্ত্রীলোককে 'গোপালের মা'র সৌভাগ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ওগো, সেই যে কামারহাটি থেকে বামনের মেয়েটি আসে, যার গোপালভাব—তার সব কত কি দর্শন হয়েছে; সে বলে, গোপাল তার কাছ থেকে হাত পেতে খেতে চায়। সেদিন ঐসব কত কি দেখে শুনে ভাবে প্রেমে উন্মাদ হয়ে উপস্থিত। খাওয়াতে-দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হলো! থাকতে বললুম, কিন্তু থাকল না। যাবার সময়ও সেইরূপ উন্মাদ—গায়ের কাপড় খুলে ভূঁয়ে লুটিয়ে যাচ্চে, হুঁশ নেই। আমি আবার কাপড় তুলে দিয়ে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দি! খুব ভক্তি-বিশ্বাস—বেশ! তাকে এখানে আনতে পাঠাও না।"

বলরামবাবুর কানে ঐ কথা উঠিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ কামারহাটি হইতে 'গোপালের মা'কে আনিতে লোক পাঠাইলেন—কারণ, আসিবার সময় যথেষ্ট আছে; ঠাকুর আজ কাল তো এখানেই থাকিবেন।

অপরাহ্ণে ঠাকুরের সহসা গোপাল-ভাবাবেশ ও পরক্ষণেই গোপালের মার আগমন

জলযোগ সাঙ্গ হইলে ঠাকুর বাহিরে আসিয়া বসিলেন ও ভক্তদের সহিত নানা কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঠাকুরের মধ্যাহ্নভোজন হইয়া গেল—ভক্তেরাও সকলে প্রসাদ পাইলেন। একটু বিশ্রামের পর ঠাকুর বাহিরে হলঘরে বসিয়া ভক্তদের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁহার ভাবাবেশ হইল। আমরা সকলেই বালগোপালের ধাতুময়ী মূর্তি দেখিয়াছি—দুই জানু ও এক হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও এক হাত তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে যেন কাহারও মুখপানে সাহ্লাদ-সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি চাহিতেছে! ভাবাবেশে ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ঠিক সেইরূপ সংস্থান হইয়া গেল, কেবল চক্ষু দুটি যেন বাহিরের কিছুই দেখিতেছে না, এইরূপ ভাবে অর্ধনিমীলিত অবস্থায় রহিল; ঠাকুরের এইরূপ ভাবাবস্থারম্ভ হইবার একটু পরেই গোপালের মারও গাড়ি আসিয়া বলরামবাবুর বাটীর দরজায় দাঁড়াইল। এবং গোপালের মাও উপরে আসিয়া ঠাকুরকে আপনার ইষ্টরূপে দর্শন করিলেন! উপস্থিত সকলে গোপালের মার ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা এইরূপ গোপাল-ভাবাবেশ হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে বহু ভাগ্যবতী জ্ঞানে সম্মান ও বন্দনা করিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন 'কি ভক্তি, ভক্তির জোরে ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপাল-রূপ ধারণ করিলেন', ইত্যাদি। গোপালের মা বলিলেন, "আমি কিন্তু বাবু ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়ুবে—ও মা, ও কি! একেবারে যেন কাঠ! আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নেই!" বাস্তবিকই ভাবসমাধিতে ঠাকুরের ঐরূপ বাহ্যজ্ঞান-হারানো প্রথম যেদিন তিনি দেখেন, সেদিন ভয়ে ডরে কাতরা হইয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বলিয়াছিলেন, "ও বাবা, তুমি অমন হলে কেন?"—সে কামারহাটিতে ঠাকুর যেদিন প্রথম গিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভাবাবেশে যখন যাহা করিতেন তাহাই সুন্দর দেখাইত। উহার কারণ

আমরা যখন ঠাকুরের নিকট যাই, ঠাকুরের বয়স তখন ঊনপঞ্চাশের কাছাকাছি—বোধ হয় ঊনপঞ্চাশ হইতে পাঁচ ছয় মাস বাকি আছে; গোপালের মাও ঐ সময়েই যান। ঠাকুরের কাছে যাইবার পূর্বে মনে হইত ছোট ছেলে নাচে, অঙ্গভঙ্গি করে, তা লোকের বেশ লাগে, কিন্তু একটা বুড়ো মিন্সে, সাজোয়ান মরদ যদি ঐরূপ করে, তাহলে লোকের বিরক্তিকর বা হাস্যোদ্দীপকই হয়। 'গণ্ডারের খেমটি নাচ কি কারো ভাল লাগে?'—স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসিয়া দেখি সব উলটো ব্যাপার। বয়সে প্রৌঢ় হলেও ঠাকুর নাচেন, গান করেন, কত হাবভাব দেখান—কিন্তু তাঁর সকলগুলিই কি মিষ্ট! বাস্তবিক 'একটা বুড়ো মিনসেকে নাচিলে যে এত ভাল দেখায়, এ কথা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই!'—গিরিশবাবু এ কথাটি বলিতেন। আজ বলরামবাবুর বাড়িতে এই যে তাঁহার গোপাল-ভাবাবেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান বালগোপালের ন্যায় হইল, তাহাই বা কত সুন্দর! কেন যে ঐরূপ সুন্দর বোধ হইত, তাহা তখন বুঝিতাম না—কেবল সুন্দর ইহাই অনুভব করিতাম। এখন বুঝি যে, যে ভাব যখন তাঁহার ভিতরে আসিত তাহা তখন পুরাপুরিই আসিত, তাঁহার ভিতর এতটুকু আর অন্য ভাব থাকিত না—এতটুকু 'ভাবের ঘরে চুরি' বা লোক-দেখানো ভাব থাকিত না। সে ভাবে তিনি তখন একেবারে অনুপ্রাণিত, তন্ময় বা (তিনি নিজে যেমন রহস্য করিয়া বলিতেন) ডাইলুট (dilute) হইয়া যাইতেন; কাজেই তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া বালকের অভিনয় করিতেছেন বা পুরুষ হইয়া স্ত্রীর অভিনয় করিতেছেন—এ কথা লোকের মনে আর উদয় হইতেই পাইত না! ভিতরের প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া শরীরটাকে যেন এককালে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত!

পুনর্যাত্রা-শেষে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আগমন

ভক্তসঙ্গে আনন্দে দুই দিন দুই রাত ঠাকুরের বলরামবাবুর বাটীতে কাটিয়াছে। আজ তৃতীয় দিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন। বেলা আন্দাজ ৮টা কি ৯টা হইবে—ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। স্থির হইল, গোপালের মা ও অন্য একজন স্ত্রী-ভক্তও (গোলাপ-মাতা) ঐ নৌকায় ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন; তদ্ভিন্ন দুই-একজন বালক-ভক্ত, যাঁহারা ঠাকুরের পরিচর্যার জন্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও যাইবেন। বোধ হয় শ্রীযুত কালী (স্বামী অভেদানন্দ) উঁহাদের অন্যতম।

ঠাকুর বাটীর ভিতরে যাইয়া জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া এবং ভক্ত-পরিবারের প্রণাম গ্রহণ করিয়া নৌকায় যাইয়া উঠিলেন। গোপালের মা প্রভৃতিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। বলরামবাবুর পরিবারবর্গের অনেকে ভক্তি করিয়া গোপালের মাকে কাপড় ইত্যাদি এবং তাঁহার অভাব আছে জানিয়া রন্ধনের নিমিত্ত হাতা, বেড়ী প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্য তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সে পুঁটুলি বা মোটটি নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। নৌকা ছাড়িল।

নৌকায় যাইবার সময় ঠাকুরের গোপালের মা-র পুঁটুলি দেখিয়া বিরক্তি। ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের যেমন ভালবাসা তেমনি কঠোর শাসনও ছিল

যাইতে যাইতে পুঁটুলি দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসায় জানিলেন—উহা গোপালের মার; ভক্ত-পরিবারেরা তাঁহাকে যেসকল দ্রব্যাদি দিয়াছেন, তাহারই পুঁটুলি। শুনিয়াই ঠাকুরের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। গোপালের মাকে কিছু না বলিয়া অপর স্ত্রী-ভক্ত গোলাপ-মাতাকে লক্ষ্য করিয়া ত্যাগের বিষয়ে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "যে ত্যাগী সে-ই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে শুধুহাতে চলে আসে, সে ভগবানের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে।"—ইত্যাদি। সেদিন যাইতে যাইতে ঠাকুর গোপালের মার সহিত একটিও কথা কহিলেন না, আর বার বার ঐ পুঁটুলিটির দিকে দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ঐ ভাব দেখিয়া গোপালের মার মনে হইতে লাগিল, পুঁটুলিটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দি। একদিকে ঠাকুরের যেমন পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ভাবে ভক্তদের সহিত হাসি তামাসা ঠাট্টা খেলাধুলা ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি কঠোর শাসন। কাহারও এতটুকুও বেচাল দেখিতে পারিতেন না। ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র জিনিসের তত্ত্বাবধান ছিল, কাহারও অতি সামান্য ব্যবহার বে-ভাবের হইলে অমনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িত ও যাহাতে উহার সংশোধন হয়, তাহার চেষ্টা আসিত। চেষ্টারও বড় একটা বেশি আড়ম্বর করিতে হইত না, একবার মুখ ভারী করিয়া তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথা না কহিলেই সে ছটফট করিত ও স্বকৃত দোষের জন্য অনুতপ্ত হইত। তাহাতেও যে নিজের ভুল না শোধরাইত, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে দুই-একটি সামান্য তিরস্কারই তাহার মতি স্থির করিতে যথেষ্ট হইত! অদ্ভুত ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তের সহিত অদৃষ্টপূর্ব ব্যবহার ও শিক্ষাদান এইরূপেই চলিত—প্রথম অমানুষী ভালবাসায় তাহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার, তাহার পর যাহা কিছু বলিবার কহিবার—দুই চারি কথায় বলা বা বুঝানো।

ঠাকুরের বিরক্তি-প্রকাশে গোপালের মার কষ্ট ও শ্রীশ্রীমার তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়াই গোপালের মা নহবতে শ্রীশ্রীমার নিকট ব্যাকুল হইয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "অ বৌমা, গোপাল এইসব জিনিসের পুঁটুলি দেখে রাগ করেছে; এখন উপায়? তা এ-সব আর নিয়ে যাব না, এইখানে বিলিয়ে দিয়ে যাই।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অপার দয়া—বুড়িকে কাতর দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "উনি বলুনগে। তোমায় দেবার তো কেউ নেই, তা তুমি কি করবে মা—দরকার বলেই তো এনেচ?"

গোপালের মা তত্রাচ তাহার মধ্য হইতে একখানা কাপড় ও আরও কি কি দুই-একটি জিনিস বিলাইয়া দিলেন এবং ভয়ে ভয়ে দুই-একটি তরকারি স্বহস্তে রাঁধিয়া ঠাকুরকে ভাত খাওয়াইতে

গেলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁহাকে অনুতপ্তা দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না। আবার গোপালের মার সহিত হাসিয়া কথা কহিয়া পূর্ববৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। গোপালের মাও আশ্বস্তা হইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বৈকালে কামারহাটি ফিরিলেন।

গোপালের মার ঠাকুরে ইষ্ট-বুদ্ধি দৃঢ় হইবার পর যেরূপ দর্শনাদি হইত

পূর্বে বলিয়াছি, গোপালের মার ভাবঘন গোপালমূর্তির প্রথম দর্শনের দুই মাস পরে সে দর্শন আর সদাসর্বক্ষণ হইত না। তাহাতে কেহ না মনে করিয়া বসেন যে, উহার পরে তাঁহার কালেভদ্রে কখনও গোপালমূর্তির দর্শন হইত। কারণ, প্রতি দিনই তিনি দিনের মধ্যে দুই-দশ বার গোপালের দর্শন পাইতেন। যখনই দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইত তখনই পাইতেন, আবার যখনই কোন বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার প্রয়োজন তখন গোপাল সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইয়া সঙ্কেতে, কথায় বা নিজে হাতেনাতে করিয়া দেখাইয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিতে প্রবৃত্ত করিতেন। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বার বার মিশিয়া যাইয়া তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভিন্ন। খাইবার ও শুইবার জিনিস চাহিয়া-চিন্তিয়া লইয়া কিভাবে তাঁহার সেবা করা উচিত তাহা শিখাইয়াছিলেন। আবার কোন কোন বিশেষ বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদিগের সহিত একত্র বিহার করিয়া বা তাঁহাদের সহিত অন্য কোনরূপ আচরণ করিয়া দেখাইয়া নিজ মাতাকে বুঝাইয়াছিলেন, ইঁহারা ও তিনি অভেদ—ভক্ত ও ভগবান এক। কাজেই তাঁহাদের ছোঁয়ান্যাপা বস্তুভোজনেও তাঁহার দ্বিধা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবে ইষ্টদেব-বুদ্ধি দৃঢ় হইবার পর হইতে আর তাঁহার বড় একটা গোপালমূর্তির দর্শন হইত না। যখন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই দেখিতে পাইতেন, এবং ঐ মূর্তির ভিতর দিয়াই বালগোপালরূপী ভগবান তাঁহাকে যত কিছু শিক্ষা দিতেন। প্রথম প্রথম ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই অশান্তি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "গোপাল, তুমি আমায় কি করলে, আমার কি অপরাধ হলো, কেন আর আমি তোমায় আগেকার মতো (গোপালরূপে) দেখতে পাই না?" ইত্যাদি। তাহাতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দেন, "ওরূপ সদাসর্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে শরীর থাকে না; একুশ দিন মাত্র শরীরটা থেকে তারপর শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ে যায়।" বাস্তবিক প্রথম দর্শনের পর দুই মাস গোপালের মা সর্বদাই একটা ভাবের ঘোরে থাকিতেন। রান্না-বাড়া, স্নান-আহার, জপ-ধ্যান প্রভৃতি যাহা কিছু করিতেন, সব যেন পূর্বের বহুকালের অভ্যাস ছিল ও করিতে হয় বলিয়া; তাঁহার শরীরটা অভ্যাসবশে আপনা-আপনি ঐসকল কোন রকমে সারিয়া লইত এই পর্যন্ত! কিন্তু তিনি নিজে সদাসর্বক্ষণ যেন একটা বিপরীত নেশার ঝোঁকে থাকিতেন, কাজেই এভাবে শরীর আর কয়দিন থাকে? দুই মাসও যে ছিল, ইহাই আশ্চর্য! দুই মাস পরে সে নেশার ঝোঁক অনেকটা কাটিয়া গেল। কিন্তু গোপালকে পূর্বের ন্যায় না দেখিতে পাওয়ায় আবার এক বিপরীত ব্যাকুলতা আসিল। বায়ুপ্রধান ধাত—বায়ু বাড়িয়া শরীরে বুকের ভিতর একটা দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেইজন্যই বলেন, "বাই বেড়ে বুক যেন আমার করাত দিয়ে চিরচে!" ঠাকুর তাহাতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "ও তোমার হরিবাই; ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গো? ও থাকা ভাল; যখন বেশি কষ্ট হবে তখন কিছু খেয়ো।" এই কথা বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নানারূপ ভাল ভাল জিনিস সেদিন খাওয়াইয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিকটে মাড়োয়ারী ভক্তদের আসা-যাওয়া

কলিকাতা হইতে আমরা মেয়ে-পুরুষে অনেকে ঠাকুরকে যেমন দেখিতে যাইতাম অনেকগুলি মাড়োয়ারী মেয়ে-পুরুষও তেমনি সময়ে সময়ে দেখিতে আসিত। তাহারা সকলে অনেকগুলি গাড়িতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিত এবং গঙ্গাস্নান করিয়া পুষ্পচয়ন ও শিবপূজাদি সারিয়া পঞ্চবটীতে আড্ডা করিত। পরে ঐ গাছতলায় উনুন খুঁড়িয়া ডাল, লেট্টি, চুরমা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে নিবেদনপূর্বক আগে ঠাকুরকে সেইসব খাবার দিয়া যাইত এবং পরে

আপনারা প্রসাদ পাইত। ইহাদের ভিতর আবার অনেকে ঠাকুরের নিমিত্ত বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, ছোয়ারা, থালা-মিছরি, আঙুর, বেদানা, পেয়ারা, পান প্রভৃতি লইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। কারণ, তাহারা আমাদের অনেকের মতো ছিল না, রিক্তহস্তে সাধুর আশ্রমে বা দেবতার স্থানে যে যাইতে নাই এ কথা সকলেই জানিত, এবং সেজন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিতই আসিত।

কামনা-করিয়া-দেওয়া জিনিস ঠাকুর গ্রহণ ও ভোজন করিতে পারিতেন না। ভক্তদেরও উহা খাইতে দিতেন না

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু তাহাদের দু-একজনের ছাড়া ঐসকল মাড়োয়ারীপ্রদত্ত জিনিসের কিছুই স্বয়ং গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, "ওরা যদি একখিলি পান দেয় তো তার সঙ্গে ষোলটা কামনা জুড়ে দেয়—'আমার মকদ্দমায় জয় হোক, আমার রোগ ভাল হোক, আমার ব্যবসায়ে লাভ হোক' ইত্যাদি!" ঠাকুর নিজে তো ঐসকল জিনিস খাইতেনই না, আবার ভক্তদেরও ঐসকল খাবার খাইতে দিতেন না। তবে, ডাল রুটি ইত্যাদি রাঁধা খাবার, যাহা তাহারা ঠাকুর-দেবতাকে ভোগ দিয়া তাঁহাকে দিয়া যাইত, 'প্রসাদ' বলিয়া নিজেও তাহা কখনও একটু-আধটু গ্রহণ করিতেন এবং আমাদের সকলকেও খাইতে দিতেন। তাহাদের দেওয়া ঐসকল মিছরি, মেওয়া প্রভৃতি খাইবার অধিকারী ছিলেন একমাত্র নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দজী)। ঠাকুর বলিতেন, "ওর (নরেন্দ্রের) কাছে জ্ঞান-অসি রয়েছে—খাপখোলা তরোয়াল, ওর ওসব খেলে কিছুই দোষ হবে না, বুদ্ধি মলিন হবে না।" তাই ঠাকুর ভক্তদের ভিতর যাহাকে পাইতেন তাহাকে দিয়া ঐসব খাবার নরেন্দ্রনাথের বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। যেদিন কাহাকেও পাইতেন না, সেদিন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র মা কালীর ঘরের পূজারী রামলালকে দিয়াই পাঠাইয়া দিতেন। আমরা রামলালদাদার নিকট শুনিয়াছি, নিত্য নিত্য ঐরূপ লইয়া যাইতে পাছে রামলাল বিরক্ত হয় তাই একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর রামলালকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কিরে, তোর কলিকাতায় কোন দরকার নাই?"

রামলাল—আজ্ঞে, আমার কলিকাতায় আর কি দরকার! তবে আপনি বলেন তো যাই।

মাড়োয়ারীদের-দেওয়া খাদ্যদ্রব্য নরেন্দ্রনাথকে পাঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ—না তাই বলছিলাম; বলি, অনেকদিন বেড়াতে-টেড়াতে যাসনি, তাই যদি বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা হয়ে থাকে। তা একবার যা না। যাস তো ঐ টিনের বাক্সয় পয়সা আছে, নিয়ে বরাহনগর থেকে শেয়ারের গাড়িতে করে যাস। তা না হলে রোদ লেগে অসুখ করবে। আর ঐ মিছরি, বাদামগুলো নরেন্দ্রকে দিয়ে আসবি ও তার খবরটা নিয়ে আসবি—সে অনেকদিন আসেনি; তার খবরের জন্য মনটা 'আটু-পাটু' কচ্চে।

রামলালদাদা বলেন, "আহা, সে কত সঙ্কোচ, পাছে আমি বিরক্ত হই!" বলা বাহুল্য, রামলালদাদাও ঐরূপ অবসরে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়া ভক্তদের আনন্দবর্ধন করিতেন।

গোপালের মাকে ঠাকুরের মাড়োয়ারীদের প্রদত্ত মিছরি দেওয়া

আজ অনেকগুলি মাড়োয়ারী ভক্ত ঐরূপে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। পূর্বের ন্যায় ফল, মিছরি ইত্যাদি ঠাকুরের ঘরে অনেক জমিয়াছে। এমন সময় গোপালের মা ও কতকগুলি স্ত্রী-ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত। গোপালের মাকে দেখিয়া ঠাকুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে ছেলে যেমন মাকে পাইয়া কত প্রকারে আদর করে, তেমনি করিতে লাগিলেন। গোপালের মার শরীরটা দেখাইয়া সকলকে বলিলেন, "এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে ভরা; হরিময় শরীর!" গোপালের মাও চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর ঐরূপে পায়ে হাত দিতেছেন বলিয়া একটুও সঙ্কুচিতা হইলেন না!

পরে ঘরে যত কিছু ভাল ভাল জিনিস ছিল, সব আনিয়া ঠাকুর বৃদ্ধাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে যাইলে ঠাকুর ঐরূপ করিতেন ও খাওয়াইতেন! গোপালের মা তাঁহাকে একদিন বলেন, "গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালবাস কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ–তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছ।

গোপালের মা–আগে–কবে খাইয়েছি?

শ্রীরামকৃষ্ণ–জন্মান্তরে।

সমস্ত দিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গোপালের মা যখন কামারহাটি ফিরিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তখন ঠাকুর মাড়োয়ারীদের দেওয়া যত মিছরি আনিয়া গোপালের মাকে দিলেন ও সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিলেন। গোপালের মা বলিলেন, "অত মিছরি সব দিচ্ছ কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ–(গোপালের মার চিবুক সাদরে ধরিয়া) ওগো, ছিলে গুড়, হলে চিনি, তারপর হলে মিছরি! এখন মিছরি হয়েছ–মিছরি খাও আনন্দ কর।

মাড়োয়ারীদের মিছরি ঐরূপে গোপালের মাকে ঠাকুর দেওয়াতে সকলে অবাক হইয়া রহিল–বুঝিল, ঠাকুরের কৃপায় এখন আর গোপালের মার মন কিছুতেই মলিন হইবার নয়। গোপালের মা আর কি করেন, অগত্যা ঐ মিছরিগুলি লইয়া গেলেন, নতুবা গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ছাড়েন না; আর শরীর থাকিতে তো সকল জিনিসেরই প্রয়োজন–গোপালের মা যেমন কখনও কখনও আমাদের বলিতেন, "শরীর থাকতে সব চাই–জিরেটুকু মেথিটুকু পর্যন্ত, এমন দেখিনি!"

দর্শনের কথা অপরকে বলিতে নাই

গোপালের মা পূর্বাবধি জপ-ধ্যান করিতে করিতে যাহা কিছু দেখিতেন সব ঠাকুরকে আসিয়া বলিতেন; তাহাতে ঠাকুর বলিতেন, "দর্শনের কথা কাহাকেও বলতে নাই, তা হলে আর হয় না।" গোপালের মা তাহাতে এক দিবস বলেন, "কেন? সে সব তো তোমারি দর্শনের কথা, তোমায়ও বলতে নাই?" ঠাকুর তাহাতে বলেন, "এখানকার দর্শন হলেও আমাকে বলতে নাই।" গোপালের মা বলিলেন, 'বটে?' তদবধি তিনি আর দর্শনাদির কথা কাহারও নিকট বড় একটা বলিতেন না। সরল উদার গোপালের মার শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিতেন তাহাতেই একেবারে পাকা বিশ্বাস হইত। আর সংশয়াত্মা আমরা? আমাদের ঠাকুরের কথা যাচাই করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া গেল–জীবনে পরিণত করিয়া ঐসকলের ফলভোগে আনন্দ করা আর ঘটিয়া উঠিল না!

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ঠাকুরের গোপালের মা-র পরিচয় করিয়া দেওয়া

এই সময় একদিন গোপালের মা ও শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ স্বামীজী) উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথের তখনও ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদে বেশ ঝোঁক। ঠাকুরদেবতা–পৌত্তলিকতায় বিশেষ বিদ্বেষ; তবে এটা ধারণা হইয়াছে যে, পুতুলমূর্তি-টূর্তি অবলম্বন করিয়াও লোক নিরাকার সর্বভূতস্থ ভগবানে কালে পৌঁছায়। ঠাকুরের রহস্যবোধটা খুব ছিল। একদিকে এই সর্বগুণান্বিত সুপণ্ডিত মেধাবী বিচারপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত নরেন্দ্রনাথ এবং অপরদিকে গরিব কাঙালী নামমাত্রাবলম্বনে শ্রীভগবানের দর্শন ও কৃপাপ্রয়াসী সরলবিশ্বাসী গোপালের মা–যিনি কখনও লেখাপড়া জ্ঞানবিচারের ধার দিয়াও যান নাই–উভয়কে একত্রে পাইয়া এক মজা বাধাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী যেরূপে বালগোপালরূপী ভগবানের দর্শন পান এবং তদবধি গোপাল যেভাবে তাঁহার সহিত লীলাবিলাস করিতেছেন, সে সমস্ত কথা শ্রীযুত নরেন্দ্রের নিকটে গোপালের মাকে বলিতে বলিলেন। গোপালের মা ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাতে কিছু দোষ হবে না তো, গোপাল?" পরে ঐ বিষয়ে ঠাকুরের আশ্বাস পাইয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে গদ্‌গদস্বরে গোপালরূপী শ্রীভগবানের প্রথম দর্শনের পর হইতে দুই মাস কাল পর্যন্ত যত লীলাবিলাসের

কথা আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া গোপাল তাঁহার কোলে উঠিয়া কাঁধে মাথা রাখিয়া কামারহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সারা পথ আসিয়াছিল, আর তাহার লাল টুকটুকে পা দুখানি তাঁহার বুকের উপর ঝুলিতেছিল তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন; ঠাকুরের অঙ্গে কেমন মাঝে মাঝে প্রবেশ করিয়া আবার নির্গত হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল; শুইবার সময় বালিশ না পাইয়া বারবার খুঁতখুঁত করিয়াছিল; রাঁধিবার কাঠ কুড়াইয়াছিল এবং খাইবার জন্য দৌরাত্ম্য করিয়াছিল—সকল কথা সবিস্তার বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে বুড়ি ভাবে বিভোর হইয়া গোপালরূপী শ্রীভগবানকে পুনরায় দর্শন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের বাহিরে কঠোর জ্ঞানবিচারের আবরণ থাকিলেও ভিতরটা চিরকালই ভক্তিপ্রেমে ভরা ছিল—তিনি বুড়ির ঐরূপ ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির কথা শুনিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। আবার বলিতে বলিতে বুড়ি বারবার নরেন্দ্রনাথকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমরা পণ্ডিত বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙালী কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—তোমরা বল, আমার এসব তো মিথ্যা নয়?" নরেন্দ্রনাথও বারবার বুড়িকে আশ্বাস দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "না, মা, তুমি যা দেখেছ সে সব সত্য!" গোপালের মা যে ব্যাকুল হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার কারণ, বোধ হয় তখন আর তিনি পূর্বের ন্যায় সর্বদা শ্রীগোপালের দর্শন পাইতেন না বলিয়া।

গোপালের মা-র নিমন্ত্রণে ঠাকুরের কামারহাটির বাগানে গমন ও তথায় প্রেতযোনিদর্শন

এই সময়ে ঠাকুর একদিন শ্রীযুত রাখালকে (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) সঙ্গে লইয়া কামারহাটিতে গোপালের মার নিকট আসিয়া উপস্থিত—বেলা দশটা আন্দাজ হইবে। কারণ, গোপালের মার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল, নিজ হস্তে ভাল করিয়া রন্ধন করিয়া একদিন ঠাকুরকে খাওয়ান। বুড়ি তো ঠাকুরকে পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। যাহা যোগাড় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই জলযোগের জন্য দিয়া জল খাওয়াইয়া বাবুদের বৈঠকখানার ঘরে ভাল করিয়া বিছানা পাতিয়া তাঁহাকে বসাইয়া নিজে কোমর বাঁধিয়া রাঁধিতে গেলেন। ভিক্ষা-সিক্ষা করিয়া নানা ভাল ভাল জিনিস যোগাড় করিয়াছিলেন।—নানা প্রকার রান্না করিয়া মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে বেশ করিয়া খাওয়াইলেন এবং বিশ্রামের জন্য মেয়েমহলের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরখানিতে আপনার লেপখানি পাতিয়া, ধোপদোস্ত চাদর একখানি তাহার উপর বিছাইয়া ভাল করিয়া বিছানা করিয়া দিলেন! ঠাকুরও তাহাতে শয়ন করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শ্রীযুত রাখালও ঠাকুরের পার্শ্বেই শয়ন করিলেন, কারণ রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর ঠিক ঠিক নিজের সন্তানের মতো দেখিতেন এবং তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার সর্বদা করিতেন।

এই সময়ে ঐ স্থানে এক অদ্‌ভুত ব্যাপার ঠাকুর দেখেন। তাঁহার নিজের মুখ হইতে শোনা বলিয়াই তাহা আমরা এখানে বলিতে সাহসী হইতেছি, নতুবা ঐ কথা চাপিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। ঠাকুরের দিনে-রেতে নিদ্রা অল্পই হইত, কাজেই তিনি স্থির হইয়া শুইয়া আছেন; আর রাখাল মহারাজ তাঁহার পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় ঠাকুর বলেন, "একটা দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল; তারপর দেখি ঘরের কোণে দুটো মূর্তি! বিটকেল চেহারা, পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে নাড়ি-ভুঁড়িগুলো ঝুলচে; আর মুখ, হাত, পা মেডিকেল কলেজে যেমন একবার মানুষের হাড়গোড় সাজানো দেখেছিলাম (মানব-অস্থি-কঙ্কাল) ঠিক সেইরকম। তারা আমাকে অনুনয় করে বলচে, 'আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদের (নিজেদের অবস্থার কথা মনে পড়ে বোধ হয়!) বড় কষ্ট হচ্চে!' এদিকে তারা ঐরূপ কাকুতি-মিনতি কচ্চে, ওদিকে রাখাল ঘুমুচ্চে। তাদের কষ্ট হচ্চে দেখে বেটুয়া ও গামছাখানা নিয়ে চলে আসবার জন্য উঠচি, এমন সময় রাখাল জেগে বলে উঠল, 'ওগো, তুমি কোথায় যাও?' আমি তাকে 'পরে সব বলব' বলে তার হাত ধরে নীচে নেমে এলাম ও বুড়িকে (তার তখন খাওয়া হয়েছে মাত্র) বলে নৌকায় গিয়ে উঠলাম। তখন রাখালকে সব বলি—এখানে দুটো ভূত

আছে। বাগানের পাশেই কামারহাটির কল—ঐ কলের সাহেবরা খানা খেয়ে হাড়গোড়গুলো যা ফেলে দেয় তাই শোঁকে (কারণ ঘ্রাণ লওয়াই উহাদের ভোজন করা!) ও ঐ ঘরে থাকে! বুড়িকে ও কথার কিছু বললুম না—তাকে ঐ বাড়িতেই সদাসর্বক্ষণ একলা থাকতে হয়—ভয় পাবে।”

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের গোপালের মাকে ক্ষীর খাওয়ান ও বলা—তাঁহার মুখ দিয়া গোপাল খাইয়া থাকেন

কলিকাতার যে রাস্তাটি বাগবাজার গঙ্গার ধার দিয়া পুল পার হইয়া উত্তরমুখো বরাবর বরাহনগর বাজার পর্যন্ত গিয়াছে, সেই রাস্তার উপরেই মতিঝিল বা কলিকাতার বিখ্যাত ধনী পরলোকগত মতিলাল শীলের উদ্যান-সম্মুখস্থ ঝিল। ঐ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে রাস্তায় মিলিয়াছে তাহার পূর্বে রাস্তার অপর পারেই রানী কাত্যায়নীর (লালাবাবুর পত্নী) জামাতা ৺কৃষ্ণগোপাল ঘোষের উদ্যানবাটী। ঐ বাগানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আট মাস কাল বাস করিয়া (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত) ভক্তদিগের স্থূলনেত্রের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হন। ঐ উদ্যানই তাঁহাদিগের নিকট ‘কাশীপুরের বাগান’ নামে অভিহিত হইয়া সকলের মনে কতই না হর্ষ-শোকের উদয় করিয়া দেয়! তোমরা বলিবে—ঠাকুর তো তখন রোগশয্যায়, তবে হর্ষ আবার কিসের? আপাতদৃষ্টিতে রোগশয্যা বটে, কিন্তু ঠাকুরের দেবশরীরে ঐ প্রকার রোগের বাহ্যিক বিকাশ তাঁহার ভক্তদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র সম্মিলিত করিয়া কি এক অদৃষ্টপূর্ব প্রণয়বন্ধনে যে গ্রথিত করিয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, সন্ন্যাসী, গৃহী, জ্ঞানী, ভক্ত—এইসকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ ভক্তদিগের ভিতর এখানেই স্পষ্টীকৃত হয়; আবার ইহারা সকলেই যে এক পরিবারের অন্তর্গত, এ ধারণার সুদৃঢ় ভিত্তি এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কত লোকই যে এখানে আসিয়া ধর্মালোক অপরোক্ষানুভব করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এখানেই শ্রীমান নরেন্দ্রনাথের সাধনায় নির্বিকল্পসমাধি-অনুভব, এখানেই নরেন্দ্রপ্রমুখ দ্বাদশজন বালকভক্তের ঠাকুরের শ্রীহস্ত হইতে গৈরিকবসন-লাভ, আবার এখানেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি অপরাহ্ণে (বেলা তিনটা হইতে চারটার ভিতর) উদ্যানপথে শেষদিন পরিভ্রমণ করিতে নামিয়া ভক্তবৃন্দের সকলকে দেখিয়া ঠাকুরের অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং ‘আমি আর তোমাদের কি বলব, তোমাদের চৈতন্য হোক!’ বলিয়া সকলের বক্ষ শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করেন! দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের নিত্য জনতা হইত! এখানেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ঠাকুরের আহার্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি সেবায় নিত্য নিযুক্তা থাকিতেন এবং গোপালের মা প্রমুখ ঠাকুরের সকল স্ত্রী-ভক্তেরা তাঁহার নিকট আসিয়া ঠাকুরের ও তদীয় ভক্তগণের সেবায় সহায়তা করিতেন—কেহ কেহ রাত্রিযাপনও করিয়া যাইতেন। অতএব কাশীপুর উদ্যানে ভক্তদিগের অপূর্ব মেলার কথা অনুধাবন করিয়া আমাদের মনে হয়, জগদম্বা এক অদৃষ্টপূর্ব মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত করিবেন বলিয়াই ঠাকুরের দেবশরীরে ব্যাধির সঞ্চার করিয়াছিলেন। এখানে ঠাকুরের নিত্যনূতন লীলা ও নূতন নূতন ভক্তসকলের সমাগম দেখিয়া এবং ঠাকুরের সদানন্দমূর্তি ও নিত্য অদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাশ দর্শন করিয়া অনেক পুরাতন ভক্তেরও মনে হইয়াছিল, ঠাকুর লোকহিতের নিমিত্ত একটা রোগের ভান করিয়া রহিয়াছেন মাত্র—ইচ্ছামাত্রেই ঐ রোগ দূরীভূত করিয়া পূর্বের ন্যায় সুস্থ হইবেন।

* * *

কাশীপুরের উদ্যান—ঠাকুরের বার্লি, ভার্মিসেলি, সুজি প্রভৃতি তরল পদার্থ আহারে দিন কাটিতেছে। একদিন তিনি পালোদেওয়া ক্ষীর—যেমন কলিকাতায় নিমন্ত্রণবাটীতে খাইতে পাওয়া যায়—খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—কেহই তাহাতে ওজর-আপত্তি করিল না, কারণ দুধে সিদ্ধ সুজি বা বার্লি যখন খাওয়া চলিতেছে, তখন পালোমিশ্রিত ক্ষীর একটু খাইলে আর অসুখ অধিক কি বাড়িবে?

ডাক্তারেরাও অমত করিলেন না। অতএব স্থির হইল–শ্রীযুত যোগীন্দ্র (যোগানন্দ স্বামীজী) আগামীকাল ভোরে কলিকাতা গিয়া ঐরূপ ক্ষীর একখানা কিনিয়া আনিবেন।

যোগীন্দ্র বা যোগেন ঠিক সময়ে রওনা হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, 'বাজারের ক্ষীরে পালো ছাড়া আরো কত কি ভেজাল মিশানো থাকে–ঠাকুরের খেলে অসুখ বাড়বে না তো?' ভক্তদের সকলেই ঠাকুরকে প্রাণের প্রাণস্বরূপে দেখিতেন, কাজেই সকলের মনেই ঠাকুরের অসুখ হওয়া অবধি ঐ এক চিন্তাই সর্বদা থাকিত। যোগেনের সেইজন্যই নিশ্চয় ঐরূপ চিন্তার উদয় হইল। আবার ভাবিলেন–কিন্তু ঠাকুরকে তো ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসেন নাই, অতএব কোন ভক্তের দ্বারা ঐরূপ ক্ষীর তৈয়ার করিয়া লইয়া যাইলে তিনি তো বিরক্ত হইবেন না? সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে যোগানন্দ বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে পৌঁছিলেন এবং আসার কারণ জিজ্ঞাসায় সকল কথা বলিলেন। সেখানে ভক্তেরা সকলে বলিলেন, 'বাজারের ক্ষীর কেন? আমরাই পালো দিয়ে ক্ষীর করে দিচ্ছি; কিন্তু এ-বেলা তো নিয়ে যাওয়া হবে না, কারণ করতে দেরি হবে। অতএব তুমি এ-বেলা এখানে খাওয়া-দাওয়া কর, ইতোমধ্যে ক্ষীর তৈয়ার হয়ে যাবে। বেলা তিনটার সময় নিয়ে যেও।' যোগেনও ঐ কথায় সম্মত হইয়া ঐরূপ করিলেন এবং বেলা প্রায় চারিটার সময় ক্ষীর লইয়া কাশীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধ্যাহ্নেই ক্ষীর খাইবেন বলিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে যাহা খাইতেন তাহাই খাইলেন। পরে যোগেন আসিয়া পৌছিলে সকল কথা শুনিয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়া যোগেনকে বলিলেন, "তোকে বাজার থেকে কিনে আনতে বলা হলো, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছা, তুই কেন ভক্তদের বাড়ি গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এইরূপে ক্ষীর নিয়ে এলি? তারপর ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক, ও কি খাওয়া চলবে–ও আমি খাব না।" বাস্তবিকই তিনি তাহা স্পর্শও করিলেন না–শ্রীশ্রীমাকে উহা সমস্ত গোপালের মাকে খাওয়াইতে বলিয়া বলিলেন, "ভক্তের দেওয়া জিনিস, ওর ভেতর গোপাল আছে, ও খেলেই আমার খাওয়া হবে।"

গোপালের মা-র বিশ্বরূপ-দর্শন

ঠাকুরের অদর্শন হইলে গোপালের মার আর অশান্তির সীমা রহিল না। অনেকদিন আর কামারহাটি ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। একলা নির্জনেই থাকিতেন। পরে পুনরায় পূর্বের ন্যায় ঠাকুরের দর্শনাদি পাইয়া সে ভাবটার শান্তি হইল। ঠাকুরের অদর্শনের পরেও গোপালের মার ঐরূপ দর্শনাদির কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। তন্মধ্যে একবার গঙ্গার অপর পারে মাহেশের রথযাত্রা দেখিতে যাইয়া সর্বভূতে শ্রীগোপালের দর্শন পাইয়া তাঁহার বিশেষ আনন্দ হয়। তিনি বলিতেন–তখন রথ, রথের উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, যাহারা রথ টানিতেছে, সেই অপার জনসঙ্ঘ সকলই দেখেন তাঁহার গোপাল!–ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র! এইরূপে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের দর্শনাভাস পাইয়া ভাবে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। জনৈকা স্ত্রী-বন্ধুর নিকট তিনি নিজে উহা বলিবার সময় বলিয়াছিলেন, "তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না–নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম।"

বরাহনগর মঠে গোপালের মা

এখন হইতে প্রাণে কিছুমাত্র অশান্তি হইলেই তিনি বরাহনগর মঠে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের নিকট আসিতেন এবং আসিলেই শান্তি পাইতেন। যেদিন তিনি মঠে আসিতেন সেদিন সন্ন্যাসী ভক্তেরা তাঁহাকেই ঠাকুরকে ভোগ দিয়া খাওয়াইতে অনুরোধ করিতেন। গোপালের মাও সানন্দে দুই-একখানা তরকারি নিজ হাতে রাঁধিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতেন। মঠ যখন আলমবাজারে ও পরে গঙ্গার অপর পারে নীলাম্বরবাবুর বাটীতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখনও গোপালের মা এইরূপে ঐ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন থাকিয়া কখনও কখনও আনন্দ করিতেন–কখনও এক-আধদিন রাত্রিযাপনও করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য মহিলাগণ-সঙ্গে গোপালের মা

শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর সারা (Mrs. Sara C. Bull), জয়া[2](Miss J. MacLeod) ও নিবেদিতা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁহারা একদিন গোপালের মাকে কামারহাটিতে দর্শন করিতে যান এবং তাঁহার কথায় ও আদরে বিশেষ আপ্যায়িতা হন! আমাদের মনে আছে, গোপালের মা সেদিন তাঁহার গোপালকে তাঁহাদের ভিতরেও অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করেন, আপনার বিছানায় সাদরে বসাইয়া মুড়ি, নারিকেল-লাড়ু প্রভৃতি যাহা ঘরে ছিল তাহা খাইতে দেন ও জিজ্ঞাসিতা হইয়া তাঁহার দর্শনাদির কথা তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বলেন। তাঁহারাও উহা সানন্দে ভক্ষণ ও তাঁহার ঐসকল কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং ঐ মুড়ির কিছু আমেরিকায় লইয়া যাইবেন বলিয়া চাহিয়া লন।

সিস্টার নিবেদিতার ভবনে গোপালের মা

গোপালের মার অদ্‌ভুত জীবনকথা শুনিয়া সিস্টার নিবেদিতা এতই মোহিতা হন যে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন গোপালের মার শরীর অসুস্থ ও বিশেষ অপটু হওয়ায় তাঁহাকে বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে আনা হয়, তখন তাঁহাকে বাগবাজারস্থ নিজ ভবনে (১৭ নং বসুপাড়া) লইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোপালের মাও তাঁহার আগ্রহে স্বীকৃতা হইয়া তথায় গমন করেন; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার ধীরে ধীরে সকল বিষয়েরই দ্বিধা শ্রীগোপালজী দূরীভূত করিয়া দেন। উহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে–দক্ষিণেশ্বরে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ একদিন মা কালীর প্রসাদী পাঁঠা এক বাটি খাইয়া হস্ত ধৌত করিতে যাইলে ঠাকুর জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে ঐ স্থান পরিষ্কার করিতে বলেন। গোপালের মা তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুরের ঐ কথা শুনিবামাত্র তিনি (গোপালের মা) ঐসকল হাড়গোড়-উচ্ছিষ্টাদি তৎক্ষণাৎ নিজহস্তে সরাইয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করেন! ঠাকুর উহা দেখিয়া আনন্দে পূর্বোক্ত স্ত্রী-ভক্তকে বলেন, "দেখ, দেখ, দিন দিন কি উদার হয়ে যাচ্ছে!"

গোপালের মার শরীরত্যাগ

সিস্টার নিবেদিতার ভবনে এখন হইতে গোপালের মা বাস করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর মানস-কন্যা নিবেদিতাও মাতৃনির্বিশেষে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত নিকটবর্তী কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে করিয়া দেওয়া হইল। আহারের সময় গোপালের মা তথায় যাইয়া দুটি ভাত খাইয়া আসিতেন এবং রাত্রে লুচি ইত্যাদি ঐ ব্রাহ্মণ-পরিবারের কেহ স্বয়ং গোপালের মার ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেন। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর বাস করিয়া গোপালের মা গঙ্গাগর্ভে শরীরত্যাগ করেন। তাঁহাকে তীরস্থ করিবার সময় নিবেদিতা পুষ্প, চন্দন, মাল্যাদি দিয়া তাঁহার শয্যাদি স্বহস্তে সুন্দরভাবে ঢাকিয়া সাজাইয়া দেন, একদল কীর্তনীয়া আনয়ন করেন এবং স্বয়ং অনাবৃতপদে সাশ্রুনয়নে সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীর পর্যন্ত গমন করিয়া যে দুই দিন গঙ্গাতীরে গোপালের মা জীবিতা ছিলেন, সেই দুই দিন তথায়ই রাত্রিযাপন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই অথবা সন ১৩১৩ সালের ২৪ আষাঢ় ব্রাহ্মমুহূর্তে উদীয়মান সূর্যের রক্তিমাভায় যখন পূর্বগগন রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিতেছে এবং নীলাম্বরতলে দুই-চারিটি ক্ষীণপ্রভা তারকা ক্ষীণজ্যোতি চক্ষুর ন্যায় পৃথিবীপানে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, যখন শৈলসুতা ভাগীরথী জোয়ারে পূর্ণা হইয়া ধবল তরঙ্গে দুই কূল প্লাবিত করিয়া মৃদুমধুর নাদে প্রবাহিতা, সেই সময়ে গোপালের মার শরীর সেই তরঙ্গে অর্ধনিমজ্জিতাবস্থায় স্থাপিত করা হইল এবং তাঁহার পূত প্রাণপঞ্চ শ্রীভগবানের অভয়পদে মিলিত হইল ও তিনি অভয়ধাম প্রাপ্তা হইলেন।

আত্মীয়েরা কেহ নিকটে না থাকায় বেলুড়মঠের জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীই গোপালের মার মৃত শরীরের সৎকার করিয়া দ্বাদশ দিন নিয়মরক্ষা করিলেন।

গোপালের মা-র কথার উপসংহার

শোকসন্তপ্তহৃদয়া সিস্টার নিবেদিতা ঐ দ্বাদশ দিন গত হইলে গোপালের মা-র পরিচিতা পল্লীস্থ অনেকগুলি স্ত্রীলোককে নিজ স্কুলবাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া কীর্তন ও উৎসবাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

গোপালের মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে ছবিখানি এতদিন পূজা করিয়াছিলেন, তাহা বেলুড়মঠে ঠাকুরঘরে রাখিবার জন্য দিয়া যান এবং ঐ ঠাকুরসেবার জন্য দুইশত টাকাও ঐ সঙ্গে দিয়া গিয়াছিলেন।

শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্ব হইতে তিনি আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সর্বদা গৈরিকবসনই ধারণ করিতেন।

[1] এই বিগ্রহ এখন কোঠারে আছেন।

[2] পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ইঁহাদের ঐ নামে ডাকিতেন এবং ইঁহাদের সরলতা, ভক্তি, বিশ্বাসাদি দেখিয়া বিশেষ প্রীতা হইয়াছিলেন।

৪.৯. পরিশিষ্ট: ঠাকুরের মানুষভাব

(ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সন ১৩১৪ সালের ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে আহূত সভায় পঠিত প্রবন্ধ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগবিভূতিসকলের কথা শুনিয়াই সাধারণ মানবের তাঁহার প্রতি ভক্তি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবভাব সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন; এমনকি, অনেকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরের কারণ অনুসন্ধান করিলে তাঁহার অমানুষ যোগবিভূতিসকলই উহার মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন তুমি তাঁহাকে মান?—এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুদূরের ঘটনাবলী ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বসিয়া দেখিতে পাইতেন, স্পর্শ করিয়া কঠিন কঠিন শারীরিক ব্যাধিসমূহ কখনও কখনও আরাম করিয়াছেন, দেবতাদের সহিতও তাঁহার সর্বদা বাক্যালাপ হইত এবং তাঁহার বাক্য এতদূর অমোঘ ছিল যে, মুখপদ্ম হইতে কোন অসম্ভব কথা বাহির হইলেও বহিঃপ্রকৃতির ঘটনাবলীও ঠিক সেইভাবে পরিবর্তিত এবং নিয়মিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাজদ্বারে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তাঁহার কৃপাকণা ও আশীর্বাদ-লাভে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষিত এবং বিশেষ সম্মানিত পর্যন্ত হইয়াছিল; অথবা কেবলমাত্র-রক্তকুসুমোৎপাদী বৃক্ষে শ্বেত কুসুমেরও আবির্ভাব হইয়াছিল, ইত্যাদি।

অথবা বলেন যে, তিনি মনের কথা বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রত্যেক মানবশরীরের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মনের চিন্তা, গঠন এবং প্রবৃত্তিসমূহ পর্যন্তও দেখিতে পাইত, তাঁহার কোমল করস্পর্শমাত্রেই চঞ্চলচিত্ত ভক্তের চক্ষে ইষ্টমূর্ত্যাদির আবির্ভাব হইত অথবা গভীর ধ্যান এবং অধিকারিবিশেষে নির্বিকল্প সমাধির দ্বার পর্যন্ত উন্মুক্ত হইত।

কেহ কেহ আবার বলেন যে, কেন তাঁহাকে মানি, তাহা আমি জানি না, কি এক অদ্ভুত জ্ঞান এবং প্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ যে তাঁহাতে দেখিয়াছি, তাহা জীবিত বা পরিচিত মনুষ্যকুলের তো কথাই নাই, বেদপুরাণাদিগ্রন্থনিবদ্ধ, জগৎপূজ্য আদর্শসমূহেও দেখিতে পাই না!—উহারাও তাঁহার পার্শ্বে আমার চক্ষে হীনজ্যোতিঃ হইয়া যায়। এটা আমার মনের ভ্রম কি না তাহা বলিতে অক্ষম, কিন্তু আমার চক্ষু সেই উজ্জ্বল প্রভায় ঝলসিয়া গিয়াছে এবং মন তাঁহার প্রেমে চিরকালের মতো মগ্ন হইয়াছে, ফিরাইবার চেষ্টা করিলেও ফিরে না, বুঝাইলেও বুঝে না; জ্ঞান তর্ক যুক্তি যেন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এইটুকুমাত্র আমি বলিতে সক্ষম –

“দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে;

তব গতি নাহি জানি।

মম গতি–তাহাও না জানি।

কেবা চায় জানিবারে?

ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত

জপ তপ সাধন ভজন,

আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে,

আছে মাত্র জানাজানি-আশ,

তাও প্রভু কর পার।”

– স্বামী বিবেকানন্দ

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে অপর মানব-সাধারণ স্থূল বাহ্যিক বিভূতি অথবা সূক্ষ্ম মানসিক বিভূতির জন্যই তাঁহাতে ভক্তি-বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া থাকে। স্থূলদৃষ্টি মানব মনে করে যে, তাঁহাকে মানিলে তাহারও রোগাদি আরোগ্য হইবে, অথবা তাহারও সঙ্কট-বিপদাদির সময়ে বাহ্যিক ঘটনাসমূহ তাহার অনুকূলে নিয়মিত হইবে। স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার মনের ভিতর যে এই স্বার্থপরতার স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না।

দ্বিতীয়শ্রেণীমধ্যগত কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মদৃষ্টি মানবও তাঁহার কৃপায় দূরদর্শনাদি বিভূতি লাভ করিবে, তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া গোলোকাদি স্থানে বাস করিবে অথবা আরও কিঞ্চিৎ সমুন্নতদৃষ্টি হইলে সমাধিস্থ হইয়া জন্ম-জরাদি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এইজন্যই তাঁহাকে মানিয়া থাকে। স্বকীয় প্রয়োজনসিদ্ধি যে এই বিশ্বাসেরও মূলে বর্তমান, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

সত্য হইলেও ঐ সকলের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ সকাম ভক্তি উন্নতির হানিকর

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ দৈববিভূতিনিচয়ের ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেও অথবা নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধি-প্রয়োজনরূপ সকাম ভক্তিও যে তাঁহাতে অর্পিত হইয়া অশেষ মঙ্গলের কারণ হয়, এ বিষয়ে সন্দিহান না হইলেও তত্তদ্বিষয়-আলোচনা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তাঁহার মনুষ্যভাবের চিত্র কথঞ্চিৎ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করাই অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য।

সকাম ভক্তি–নিজের কোনরূপ অভাবপূরণের জন্য ভক্তি, ভক্তকে সত্যদৃষ্টির উচ্চ সোপানে উঠিতে দেয় না। স্বার্থপরতা সর্বকালে ভয়ই প্রসব করিয়া থাকে এবং ঐ ভয়ই আবার মানবকে দুর্বল হইতে দুর্বলতর করিয়া ফেলে। স্বার্থলাভও আবার মানবমনে অহঙ্কার এবং কখনও কখনও আলস্যবৃদ্ধি করিয়া তাহার চক্ষু আবৃত করে এবং তজ্জন্য সে যথার্থ সত্যদর্শনে সমর্থ হয় না। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর ভিতর যাহাতে ঐ দোষ প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ধ্যানাদির অভ্যাসে দূরদর্শনাদি কোনরূপ মানসিক শক্তির নূতন বিকাশ হইয়াছে জানিলেই পাছে ঐ ভক্তের মনে অহঙ্কার প্রবেশলাভ করিয়া তাহাকে ভগবান-লাভরূপ উদ্দেশ্যহারা করে, সেজন্য তিনি তাহাকে কিছুকাল ধ্যানাদি করিতে নিষেধ করিতেন, ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঐ প্রকার বিভূতিসম্পন্ন হওয়াই যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়, ইহা তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু দুর্বল মানব নিজের লাভ-লোকসান না খতাইয়া কিছু করিতে বা কাহাকেও মানিতে অগ্রসর হয় না এবং ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন হইতে ত্যাগ শিক্ষা না করিয়া নিজের ভোগসিদ্ধির জন্যই ঐ মহৎ জীবন আশ্রয় করিয়া থাকে। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার অলৌকিক তপস্যা, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সত্যানুরাগ, তাঁহার বালকের ন্যায় সরলতা এবং নির্ভর–এইসকল যেন তাঁহার ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এইরূপ মনে করে। আমাদের মনুষ্যত্বের অভাবই ঐ প্রকার হইবার কারণ এবং সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনুষ্যভাবের আলোচনাই আমাদের অশেষ কল্যাণকর।

যথার্থ ভক্তি ভক্তকে উপাস্যের অনুরূপ করিবে

ভক্তি যৎকিঞ্চিৎ ও যথার্থ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তকে উপাস্যের অনুরূপ করিয়া তুলে। সর্বজাতির সর্বধর্মগ্রন্থেই এ কথা প্রসিদ্ধ। ক্রুশারূঢ় ঈশার মূর্তিতে সমাধিস্থ-মন ভক্তের হস্তপদ হইতে রুধির-নির্গমন, শ্রীমতীর বিরহদুঃখানুভব-নিমগ্নমন শ্রীচৈতন্যের বিষম গাত্রদাহ এবং কখনও বা মৃতবৎ অবস্থাদি, ধ্যানস্তিমিত বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে বৌদ্ধ ভক্তের বহুকালব্যাপী নিশ্চেষ্টাবস্থান প্রভৃতি ঘটনাই ইহার নিদর্শন। প্রত্যক্ষও দেখিয়াছি, মনুষ্যবিশেষে প্রযুক্ত ভালবাসা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানুষকে তাহার প্রেমাস্পদের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছে; তাহার বাহ্যিক হাবভাব-চালচলনাদি

এবং তাহার মানসিক চিন্তাপ্রণালীও সমূলে পরিবর্তিত হইয়া তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে! শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তিও তদ্রূপ যদি আমাদের জীবনকে দিন দিন তাঁহার জীবনের কথঞ্চিৎও অনুরূপ না করিয়া তুলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভক্তি এবং ভালবাসা তত্তন্নামের যোগ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি আমরা সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হইতে সক্ষম? একের সম্পূর্ণরূপে অপরের ন্যায় হওয়া জগতে কখনও কি দেখা গিয়াছে? উত্তরে আমরা বলি, সম্পূর্ণ একরূপ না হইলেও এক ছাঁচে গঠিত পদার্থনিচয়ের ন্যায় নিশ্চিত হইতে পারে। ধর্মজগতে প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচসদৃশ। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরাও সেই সেই ছাঁচে গঠিত হইয়া অদ্যাবধি সেইসকল বিভিন্ন ছাঁচের রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মানুষ অল্পশক্তি; ঐসকল ছাঁচের কোন একটির মতো হইতে তাহার আজীবন চেষ্টাতেও কুলায় না। ভাগ্যক্রমে কেহ কখনও কোন একটি ছাঁচের যথার্থ অনুরূপ হইলে আমরা তাঁহাকে সিদ্ধ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। সিদ্ধ মানবের চালচলন, ভাষা, চিন্তা প্রভৃতি শারীরিক এবং মানসিক সকল বৃত্তিই সেই ছাঁচপ্রবর্তক মহাপুরুষের সদৃশ হইয়া থাকে। সেই মহাপুরুষের জীবনে যে মহাশক্তির প্রথম অভ্যুদয় দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইয়াছিল, তাঁহার দেহমন সেই শক্তির কথঞ্চিৎ ধারণ, সংরক্ষণ এবং সঞ্চারের পূর্ণাবয়ব যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ-প্রণোদিত ধর্মশক্তিনিচয়ের সংরক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন জাতি আবহমানকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

অবতারপুরুষের জীবনালোচনায় কোন্ কোন্ অপূর্ব বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়

ধর্মজগতে যে-সকল মহাপুরুষ অদৃষ্টপূর্ব নূতন ছাঁচের জীবন দেখাইয়া যান, তাঁহাদিগকেই জগৎ অদ্যাবধি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। অবতার ধর্মজগতে নূতন মত, নূতন পথ আবিষ্কার করেন; স্পর্শমাত্রেই অপরে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করেন। তাঁহার দৃষ্টি কখনও অনিত্য সংসারে কামকাঞ্চনের কোলাহলের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তাঁহার জীবন-পর্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অপরকে পথ দেখাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিজের ভোগসাধন বা মুক্তিলাভও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হয় না। কিন্তু অপরের দুঃখে সহানুভূতি, অপরের উপর গভীর প্রেমই তাঁহাকে কার্যে প্রেরণ করিয়া অপরের দুঃখনিবারণের পথ-আবিষ্করণের হেতু হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেবকান্তি যতদিন না দেখিয়াছিলাম, ততদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারখ্যাত মহাপুরুষগণের জীবনবেদ পাঠ করিতে একপ্রকার অসমর্থ ছিলাম। তাঁহাদের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী দলপুষ্টির জন্য শিষ্যপরম্পরারচিত প্ররোচনাবাক্য বলিয়া মনে হইত; অবতার সভ্যজগতের বিশ্বাসবহির্ভূত কিম্ভূত-কিমাকার কাল্পনিক প্রাণিবিশেষ বলিয়াই অনুমিত হইত। অথবা ঈশ্বরের অবতার হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও সেইসকল অবতারমূর্তিতে যে আমাদেরই ন্যায় মনুষ্যভাবসকল বর্তমান, এ কথা বিশ্বাস হইত না। তাঁহাদের শরীরে যে আমাদের মতো রোগাদি হইতে পারে, তাঁহাদের মনে যে আমাদেরই মতো হর্ষশোকাদি বিদ্যমান, তাঁহাদিগের ভিতরে যে আমাদেরই ন্যায় প্রবৃত্তিনিচয়ের দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতে পারে, তাহা ধারণা হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র স্পর্শেই সে বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছে। অবতারশরীরে দেব এবং মানুষভাবের অদ্‌ভুত সম্মিলনের কথা আমরা সকলেই পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার পূর্বে কোন মানবে যে বালকত্ব এবং কঠোর মনুষ্যত্বের একত্র সামঞ্জস্যে অবস্থান হইতে পারে, এ কথা ভাবি নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় বালকস্বভাবই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল। অজ্ঞান বালক সকলেরই প্রেমের আস্পদ এবং সকলেই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতঃ ত্রস্ত হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া লোকের মনে ঐরূপ ভাবের স্ফূর্তি হইয়া তাঁহাদিগকে মোহিত ও আকৃষ্ট করিত। কথাটি কিছু সত্য হইলেও আমাদের ধারণা—পরমহংসদেবের শুদ্ধ বালকভাবেই যে জনসাধারণ আকৃষ্ট হইত তাহা নহে; কিন্তু হর্ষ ও প্রীতির সহিত দর্শকের মনে

তৎসময়ে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় দেখিয়া মনে হয়, কুসুমকোমল বালক-পরিচ্ছদে আবৃত ভিতরের বজ্রকঠোর মনুষ্যত্বই ঐ আকর্ষণের কারণ। ভারতের যশস্বী কবি অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের লোকোত্তর চরিত্র-বর্ণনায় লিখিয়াছেন –

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

সেই কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধেও প্রতি পদে বলিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকভাব এক অতি অভিনব পদার্থ। অসীম সরলতা, অপার বিশ্বাস, অশেষ সত্যানুরাগ সে বালকের মনে সর্বদা প্রকাশিত থাকিলেও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানব তাহাতে কেবল নির্বুদ্ধিতা এবং বিষয়বুদ্ধিরাহিত্যেরই পরিচয় পাইত। সকল লোকের কথাতেই তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস, বিশেষতঃ ধর্মলিঙ্গধারীদের কথায়! দেশের এবং নিজ গ্রামের প্রচলিত ভাবসকলও তাঁহাতে এই অদ্‌ভুত বালকত্ব পরিস্‌ফুট করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম

শস্যশ্যামলাঙ্গে হরিৎসমুদ্রপ্রতীকাশ অথবা তদভাবে ধূসর মৃত্তিকাসমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত বিস্তীর্ণ বহুযোজনব্যাপী প্রান্তর–তন্মধ্যে বংশ, বট, খর্জুর, আম্র, অশ্বত্থাদি বৃক্ষাচ্ছাদিত কৃষককুলের মৃত্তিকানির্মিত সুপরিচ্ছন্ন দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় শোভমান পর্ণকুটিররাজি, সুনীল পত্রাচ্ছাদিত বৃহৎতালবৃক্ষরাজিমণ্ডলিত ভ্রমরমুখরিত পদ্মসমাচ্ছন্ন হালদারপুকুরাদিনামাখ্যাত বৃহৎ সরোবরনিচয়, 'বুড়োশিবাদি' নামা প্রথিতযশ দেবাধিষ্ঠিত ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগৃহ, অদূরে পুরাতন গড়মান্দারণ দুর্গের ভগ্নস্তূপরাজি; প্রান্তে ও পার্শ্বে অস্থিসমাকুল বহুপ্রাচীন শ্মশান, তৃণাচ্ছাদিত গোচরভূমি, নিবিড় আম্রকানন, বক্রসঞ্চরণশীল ভূতির খাল খ্যাত ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী এবং সমগ্র গ্রামের অর্ধেকেরও অধিক বেষ্টন করিয়া বর্তমান বর্ধমান হইতে পুরীধামে যাইবার যাত্রিসমাকুল সুদীর্ঘ রাজপথ–ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর।

বালক রামকৃষ্ণের বিচিত্র কার্যকলাপ

শ্রীচৈতন্য এবং তৎশিষ্যগণ-প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মই এখানে প্রবল। কৃষক-প্রজাকুল তাহাদের পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে অথবা দিনান্তে কার্যাবসানে তাঁহাদেরই রচিত পদাবলীগানে আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রমাপনোদন করে। সরল পদ্যময় বিশ্বাসই এ ধর্মের মূলে, এবং জীবন-সংগ্রামের কঠোর তরঙ্গসমূহ হইতে সুদূরে বর্তমান এই গ্রামের ন্যায় বালকের হৃদয়ও ঐরূপ বিশ্বাস এবং ধর্মের বিশেষ অনুকূলভূমি। বালক রামকৃষ্ণের বালকত্ব কিন্তু এখানেও অদ্‌ভুত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তাহার বিচিত্র কার্যসকলে না হইলেও, উদ্দেশ্যের গভীরতা এবং একতানতা দেখিয়া সকলে অবাক হইত। 'রামনামে মানব নির্মল হয়'–কথকমুখে এ কথা শুনিয়া কখনও বা এ বালক দুঃখিতচিত্তে জল্পনা করিত–তবে কথকঠাকুরের অদ্যাবধি শৌচের আবশ্যক হয় কেন? কখনও বা একবারমাত্র যাত্রাদি শুনিয়া তাহার সকল অঙ্গ আয়ত্ত করিয়া বয়স্যগণসঙ্গে আম্রকাননমধ্যে উহার পুনরভিনয় করিত! গ্রামান্তর-গন্তুকাম পথিক বালকের সে অদ্‌ভুত অভিনয় ও সঙ্গীত-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গন্তব্য পথে যাইতে ভুলিয়া যাইত! প্রতিমাগঠন, দেবচিত্রাদিলিখন, অপরের হাবভাব অনুকরণ, সঙ্গীত, সঙ্কীর্তন, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আয়ত্তীকরণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গভীর অনুভবে এ বালকের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। তাঁহার শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, কৃষ্ণনীরদাবৃত গগনে উড্ডীন ধবল বলাকারাজি দেখিয়াই তিনি প্রথম সমাধিস্থ হন; তাঁহার বয়স তখন ছয়-সাত বৎসর মাত্র!

যখন যে ভাব হৃদয়ে আসিত, সেই ভাবে তন্ময় হওয়াই এ বালক-মনের বিশেষ লক্ষণ ছিল। প্রতিবেশীরা এখনও এক বণিকের গৃহপ্রাঙ্গণ নির্দেশ করিয়া গল্প করে, কিরূপে একদিন ঐ স্থানে

হরপার্বতী-সংবাদের অভিনয়কালে অভিনেতা সহসা পীড়িত হইয়া অপারগ হইলে রামকৃষ্ণকে সকলে অনুরোধ করিয়া শিব সাজাইয়া অভিনয় করাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি ঐ সাজে সজ্জিত হইয়া এমনই ঐ ভাবে মগ্ন হইয়াছিলেন যে, বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞামাত্র ছিল না! এইসকল ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যায় যে, বালক হইলেও বালকের চিত্তচাঞ্চল্য তাহাতে আশ্রয় করে নাই। দর্শন বা শ্রবণ দ্বারা কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেই তাহার ছবি তাঁহার মনে এরূপ সুদৃঢ়-অঙ্কিত হইত যে, ঐ প্রেরণায় উহার সম্পূর্ণ আয়ত্তীকরণ এবং অভিনবরূপে পুনঃপ্রকাশ না করিয়া স্থির থাকা এ বালকের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তাঁহার সত্যান্বেষণ

গ্রন্থাদি না পড়িলেও বাহ্যজগতের সংঘর্ষে এ বালকের ইন্দ্রিয়নিচয় স্বল্পকালেই সমুচিত প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। যাহা সত্য, প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইব—যাহা শিখিব, তাহা কার্যে প্রয়োগ করিব—এবং অসত্য না হইলে জগতের কোন বস্তুই ঘৃণার চক্ষে দেখিব না, ইহাই এ বালক-মনের মূল মন্ত্র ছিল। যৌবনের প্রথম উদ্‌গম—অদ্‌ভুত-মেধাসম্পন্ন বালক রামকৃষ্ণ শিক্ষার জন্য টোলে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু বালকত্বের সাঙ্গ হইল না। সে ভাবিল, এ কঠোর অধ্যয়ন, রাত্রিজাগরণ, টীকাকারের চর্বিতচর্বণ প্রভৃতি কিসের জন্য? ইহাতে কি বস্তুলাভ হইবে? মন ঐপ্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণ ফল টোলের আচার্যকে দেখাইয়া বলিল, তুমিও ঐরূপ সরল শব্দনিচয়ের কুটিল অর্থকরণে সুপটু হইবে, তুমিও উহার ন্যায় ধনী ব্যক্তির তোষামোদাদিতে বিদায়াদি সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবে; তুমিও ঐরূপ শাস্ত্রনিবদ্ধ সত্যসকল পাঠ করিবে এবং করাইবে, কিন্তু চন্দনভারবাহী খরের ন্যায় তাহাদিগের অনুভব জীবনে করিতে পারিবে না। বিচারবুদ্ধি বলিল, এই চালকলা-বাঁধা বিদ্যার প্রয়োজন নাই। যাহাতে মানবজীবনের গূঢ়রহস্যসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ সত্য অনুভব করিতে পার, সেই পরাবিদ্যার সন্ধান কর। রামকৃষ্ণ পাঠ ছাড়িলেন এবং আনন্দ-প্রতিমা দেবীমূর্তির পূজাকার্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু এখানেও শান্তি কোথায়? মন বলিল, সত্যই কি ইনি আনন্দঘনমূর্তি জগজ্জননী অথবা পাষাণপ্রতিমা মাত্র? সত্যই কি ইনি ভক্তি-সমাহৃত পত্রপুষ্পফলমূলাদি গ্রহণ করেন? সত্যই কি মানব ইঁহার কৃপাকটাক্ষলাভে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া দিব্যদর্শন লাভ করে?—অথবা, মানবমনের বহুকালসঞ্চিত কুসংস্কাররাজি কল্পনাসহায়ে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া ছায়াময়ী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং মানব ঐরূপে আপনি আবহমানকাল ধরিয়া প্রতারিত হইয়া আসিতেছে? প্রাণ এ সন্দেহ-নিরসনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং তীব্র বৈরাগ্যের অঙ্কুর বালকমনে ধীরে ধীরে উদ্‌গত হইল। বিবাহ হইল, কিন্তু ঐ প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া সাংসারিক সুখভোগ তাঁহার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। নিত্য নানা উপায়ে মন ঐ প্রশ্নসমাধানেই নিযুক্ত রহিল এবং বিবাহ, সংসার, বিষয়বুদ্ধি, উপার্জন, ভোগসুখ এবং আবশ্যকীয় আহার-বিহারাদি পর্যন্ত নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইল। সুদূর কামারপুকুরে যে বালকত্ব বিষয়বুদ্ধির পরিহাসের বিষয় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বালকত্বই দক্ষিণেশ্বর দেবমন্দিরে নিতান্ত প্রস্ফুটিত হইয়া সেই বিষয়বুদ্ধির আরও অধিক উপেক্ষণীয় বাতুল বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু এ বাতুলতায় উদ্দেশ্যহীনতা বা অসম্বদ্ধতা কোথায়? ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিব, স্পর্শ করিব, পূর্ণভাবে আস্বাদন করিব—ইহাই কি ইহার বিশেষ লক্ষণ নহে? যে লৌহময়ী ধারণা, অপরাজিত অধ্যবসায় এবং উদ্দেশ্যের ঋজুতা ও একতানতা কামারপুকুরে বালক রামকৃষ্ণের বালকত্বে অভিনব শ্রী প্রদান করিয়াছিল, তাহাই এখন আপাতদৃষ্টে বাতুল রামকৃষ্ণের বাতুলত্বকে এক অদ্‌ভুত অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার করিয়া তুলিল।

দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রবল মানসঝটিকা বহিতে লাগিল। অন্তঃপ্রকৃতির সে ভীষণ সংগ্রামে অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতির তুমুল তরঙ্গাঘাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনতরীর অস্তিত্বও তখন সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বীরহৃদয় আসন্ন-মৃত্যু সম্মুখেও কম্পিত হইল না, গন্তব্য পথ ছাড়িল না—ভগবদনুরাগ ও বিশ্বাস-সহায়ে ধীরস্থিরভাবে নিজ পথে অগ্রসর হইল। সংসারের

কামকাঞ্চনময় কোলাহল এবং লোকে যাহাকে ভালমন্দ, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্যাদি বলে—সেসকল কতদূরে পড়িয়া রহিল—ভাবের প্রবল তরঙ্গ উজানপথে ঊর্ধ্বে ছুটিতে লাগিল! সে প্রবল তপস্যা, সে অনন্ত ভাবরাশির গভীর উচ্ছ্বাসে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবলিষ্ঠ দেহ ও মন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া নূতন আকার, নূতন শ্রী ধারণ করিল! এইরূপে মহাসত্য, মহাভাব, মহাশক্তি ধারণ ও সঞ্চারের সম্পূর্ণাবয়ব যন্ত্র গঠিত হইল।

ঐ সত্যান্বেষণের ফল

হে মানব! শ্রীরামকৃষ্ণের এ অদ্‌ভুত বীরত্বকাহিনী তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? তোমার স্থূল দৃষ্টিতে পরিমাণ ও সংখ্যাধিক্য লইয়াই পদার্থের গুরুত্ব বা লঘুত্ব গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে সূক্ষ্ম শক্তি, স্বার্থগন্ধ পর্যন্ত বিদূরিত করিয়া অহঙ্কারকে সমূলে উৎপাটিত করে, যাহার বলে ইচ্ছা করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র স্বার্থচেষ্টা শরীর-মনের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে, সে শক্তিপরিচয় তুমি কোথায় পাইবে? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ধাতুস্পর্শমাত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের হস্ত আড়ষ্ট হইয়া তদ্ধাতুগ্রহণে অসমর্থ হইত; পত্র পুষ্প প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুজাত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বত্বাধিকারীর বিনানুমতিতে গ্রহণ করিলে নিত্যাভ্যস্ত পথ দিয়া আসিতে আসিতে তিনি পথ হারাইয়া বিপরীতে গমন করিতেন; গ্রন্থিপ্রদান করিলে সে গ্রন্থি যতক্ষণ না উন্মুক্ত করিতেন, ততক্ষণ তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ থাকিত—বহু চেষ্টাতেও বহির্গত হইত না; সুকোমল রমণীস্পর্শে তাঁহার কূর্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়সঙ্কোচাদি হইত!—এসকল শারীরিক বিকার যে পবিত্রতম মানসিক ভাবনিচয়ের বাহ্য অভিব্যক্তি, আজন্ম স্বার্থদৃষ্টিপটু মানব-নয়ন তাহাদের দর্শন কোথায় পাইবে? আমাদের দূরপ্রসারী কল্পনাও কি এ শুদ্ধতম ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়? 'ভাবের ঘরে চুরি' করিতেই আমরা আজীবন শিখিয়াছি। যথার্থ গোপন করিয়া কোনরূপে ফাঁকি দিয়া বড়লোক হইতে পারিলে বা নাম কিনিতে পারিলে আমাদের মধ্যে কয়জন পশ্চাৎপদ হয়? তাহার পর সাহস। একবার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দশবার আঘাত করা অথবা অগ্নিউদ্গারকারী তোপসম্মুখে ধাবিত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণবিসর্জন, এ সাহস করিতে না পারিলেও শুনিয়া আমাদের প্রীতির উদ্দীপন হয়, কিন্তু যে সাহসে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পৃথিবী ও স্বর্গের ভোগসুখ এবং নিজের শরীর ও মন পর্যন্ত, জগতের অপরিচিত অজ্ঞাত অনুপলব্ধ ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে সাহসের কিঞ্চিৎ ছায়ামাত্রও আমরা কি অনুভবে সমর্থ? যদি পার তবে হে বীর শ্রোতা, তুমি আমার এবং সকলের পূজনীয় মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিয়াছ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সামান্য কথার গভীর অর্থ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি তুচ্ছ কথাসকল বা অতি ক্ষুদ্র কার্যসমূহও কি গভীর ভাবে পূর্ণ থাকিত, তাহা স্বয়ং না বুঝাইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। সমাধিভঙ্গের পরেই অনেক সময়ে যে তিনি নিত্যপরিচিত বস্তু বা ব্যক্তিসমূহের নামোল্লেখ ও স্পর্শ করিতেন অথবা কোন খাদ্যদ্রব্যবিশেষের উল্লেখ করিয়া ভক্ষণ-পানাদি করিবেন বলিতেন, তাহার গূঢ় রহস্য একদিন আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "সাধারণ মানবের মন গুহ্য, লিঙ্গ এবং নাভি-সমাশ্রিত সূক্ষ্ম স্নায়ুচক্রেই বিচরণ করে। কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে ঐ মন কখনও কখনও হৃদয়সমাশ্রিত চক্রে উঠিয়া জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্ময় রূপাদির দর্শনে অল্প আনন্দানুভব করে। নিষ্ঠার একতানতা বিশেষ অভ্যস্ত হইলে কণ্ঠসমাশ্রিত চক্রে উহা উঠিয়া থাকে এবং তখন যে বস্তুতে সম্পন্ননিষ্ঠ হইয়াছে তাহার কথা ছাড়া অপর কোন বিষয়ের আলোচনা তাহার পক্ষে অসম্ভবপ্রায় হয়। এখানে উঠিলেও সে মন নিম্নাবস্থিত চক্রসমূহে পুনর্গমন করিয়া ঐ নিষ্ঠা এককালে ভুলিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু যদি কখনও কোন প্রকারে প্রবল একনিষ্ঠা-সহায়ে কণ্ঠের ঊর্ধ্বদেশস্থ ভ্রূমধ্যাবস্থিত চক্রে তাহার গমন হয়, তখন সে সমাধিস্থ হইয়া যে আনন্দ অনুভব করে, তাহার নিকট নিম্ন চক্রাদির বিষয়ানন্দ-উপভোগ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়; এখান হইতে আর তাহার পতনাশঙ্কা থাকে না। এখান হইতেই কিঞ্চিন্মাত্র আবরণে আবৃত পরমাত্মার জ্যোতিঃ তাঁহার

সম্মুখে প্রকাশিত হয়। পরমাত্মা হইতে ঈষন্মাত্র ভেদ রক্ষিত হইলেও এখানে উঠিলেই অদ্বৈতজ্ঞানের বিশেষ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই চক্র ভেদ করিতে পারিলেই ভেদাভেদজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান হয়। আমার মন তোদের শিক্ষার জন্য কণ্ঠাশ্রিত চক্র পর্যন্ত নামিয়া থাকে, এখানেও ইহাকে কোনরূপে জোর করিয়া রাখিতে হয়। ছয় মাস কাল ধরিয়া পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করাতে ইহার গতি স্বভাবতই সেই দিকে প্রবাহিত রহিয়াছে। এটা করিব, ওটা খাইব, একে দেখিব, ওখানে যাইব ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাতে নিবদ্ধ না রাখিলে উহাকে নামানো বড় কঠিন হইয়া পড়ে এবং না নামিলে কথাবার্তা, চলাফেরা, খাওয়া ও শরীররক্ষা ইত্যাদি সকলই অসম্ভব। সেইজন্যই সমাধিতে উঠিবার সময়ই আমি কোন না কোন একটা ক্ষুদ্র বাসনা, যথা—তামাক খাব বা ওখানে যাব ইত্যাদি করিয়া রাখি, তত্রাপি অনেক সময়ে ঐ বাসনা বার বার উল্লেখ করায় তবে মন এইটুকু নামিয়া আইসে।”

দৈনন্দিন জীবনে যে সকল বিষয়ের তাঁহাতে পরিচয় পাওয়া যাইত

পঞ্চদশীকার এক স্থানে বলিয়াছেন, সমাধিলাভের পূর্বে মানব যে অবস্থায় যে ভাবে থাকে, সমাধিলাভের পরে সমধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াও নিজের সে অবস্থা পরিবর্তন করিতে তাহার অভিরুচি হয় না। কেন না, ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত আর সকল বস্তু বা অবস্থাই তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্বোক্ত প্রবল ধর্মানুরাগ প্রবাহিত হইবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যে ভাবে চালিত হইত, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যসমূহে পাওয়া যাইত। তাহার দুই-চারিটি উল্লেখ করা এখানে অযুক্তিকর হইবে না।

শরীর, বস্ত্র, বিছানা প্রভৃতি অতি পরিষ্কার রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। যে জিনিসটি যেখানে রাখা উচিত, সে জিনিসটি ঠিক সেইখানে নিজে রাখিতে এবং অপরকেও রাখিতে শিখাইতে ভালবাসিতেন, কেহ অন্যরূপ করিলে বিরক্ত হইতেন। কোনস্থানে যাইতে হইলে গামছা বেটুয়া প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যাদি ঠিক ঠিক লওয়া হইয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার কালেও কোন জিনিস লইয়া আসিতে ভুল না হয়, সেজন্য সঙ্গী শিষ্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। যে সময় যে কাজ করিব বলিতেন, তাহা ঠিক সেই সময়ে করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। যাহার হস্ত হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, মিথ্যাকথন হইবার ভয়ে সে ভিন্ন অপর কাহারও হস্ত হইতে ঐ বস্তু কখনও গ্রহণ করিতেন না। তাহাতে যদি দীর্ঘকাল অসুবিধাভোগ করিতে হইত, তাহাও স্বীকার করিতেন। ছিন্ন বস্ত্র, ছত্র বা পাদুকাদি কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে, সমর্থ হইলে নূতন ক্রয় করিতে উপদেশ করিতেন এবং অসমর্থ হইলে কখনও কখনও নিজেও ক্রয় করিয়া দিতেন। বলিতেন, ওরূপ বস্ত্র-ব্যবহারে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া ও হতশ্রী হয়। অভিমান-অহঙ্কারসূচক বাক্য তাঁহার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হওয়া এককালে অসম্ভব ছিল। নিজের ভাব বা মত বলিতে হইলে নিজ শরীর নির্দেশ করিয়া ‘এখানকার ভাব’, ‘এখানকার মত’ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। শিষ্যবর্গের হাত পা চোখ মুখ প্রভৃতি শারীরিক সকল অঙ্গের গঠন এবং তাহাদের চাল-চলন আহার-বিহার নিদ্রা প্রভৃতি কার্যকলাপ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তিনিচয়ের গতি, কোন্ প্রবৃত্তির কতদূর আধিক্য, ইত্যাদি, এরূপ স্থির করিতে পারিতেন যে, তাহার ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। আমাদের বোধ হয় প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-দুঃখাদি জীবনানুভবের সহিত তাঁহার যে প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল, তাহাই উহার কারণ। সহানুভূতি ও ভালবাসা বা প্রেম দুইটি বিভিন্ন বস্তু হইলেও শেষোক্তের বাহ্যিক লক্ষণ প্রথমটির সহিত বিশেষ বিভিন্ন নহে। সেইজন্য সহানুভূতিকে প্রেম বলিয়া ভাবা বিশেষ বিচিত্র নহে। প্রত্যেক বস্তু ভাবিবার কালে উহাতে তন্ময় হওয়া তাঁহার মনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। ঐ গুণ

থাকাতেই তিনি প্রত্যেক শিষ্যের মনের অবস্থা ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেন এবং ঐ চিত্তের উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাও ঠিক ঠিক বিধান করিতে পারিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকত্ব-বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, শৈশবকাল হইতে তিনি তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কতদূর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন; ঐ শিক্ষাই যে পরে মনুষ্যচরিত্রগঠনে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শিষ্যবর্গও যাহাতে সকল স্থানে সকল বিষয়ে ঐরূপে ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার করিতে শিখে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক কার্যই বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে নিত্য উপদেশ করিতেন। বিচারবুদ্ধিই বস্তুর গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া মনকে যথার্থ ত্যাগের দিকে অগ্রসর করাইবে, এ কথা তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি। বুদ্ধিহীনের অথবা একদেশী বুদ্ধিমানের আদর তাঁহার নিকট কখনই ছিল না। সকলেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে, "ভগবদ্ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন?" অথবা "একঘেয়ে হসনি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়, এখানে ঝোলেও খাব, ঝালেও খাব, অম্বলেও খাব—এই ভাব।" একদেশী বুদ্ধিকেই তিনি একঘেয়ে বুদ্ধি বা একঘেয়ে ভাব বলিতেন। "তুই তো বড় একঘেয়ে"—ভগবদ্ভাবের বিশেষ কোনটিতে কোন শিষ্য আনন্দানুভব না করিতে পারিলে পূর্বোক্ত কথাগুলিই তাঁহার বিশেষ তিরস্কারবাক্য ছিল। ঐ তিরস্কারবাক্য এরূপভাবে বলিতেন যে, উহার প্রয়োগে শিষ্যকে লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে হইত। ঐ উদার সার্বজনীন ভাবের প্রেরণাতেই যে তিনি সকল ধর্মমতের সর্বপ্রকার ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 'যত মত তত পথ' এই সত্য-নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মপ্রচার কিভাবে কতদূর হইয়াছে ও পরে হইবে

ফুল ফুটিল। দেশদেশান্তরের মধুপকুল মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। রবিকরস্পর্শে নিজ হৃদয় সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া ফুল্লকমল তাহাদের পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করিতে কৃপণতা করিল না। পাশ্চাত্য-শিক্ষাসংস্পর্শমাত্রহীন, ভারত-প্রচলিত কুসংস্কারখ্যাত ধর্মভাবে গঠিতজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মমধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত-আস্বাদ জগৎ পূর্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? যে মহান ধর্মশক্তি তিনি সঞ্চিত করিয়া শিষ্যবর্গে সঞ্চারিত করিয়াছেন, যাহার প্রবল উচ্ছ্বাসে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্মকে জ্বলন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে এবং সর্বধর্মমতের অন্তরে এক অপরিবর্তনীয় জীবন্ত সনাতনধর্ম-স্রোত প্রবাহিত দেখিতেছে—সে শক্তির অভিনয় জগৎ পূর্বে আর কখনও কি অনুভব করিয়াছে? পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বায়ুসঞ্চরণের ন্যায় সত্য হইতে সত্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্যজীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং একদিন না একদিন সেই অনন্ত অপার অবাঙ্মনসোগোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণকাম হইবে—এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্বে আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভারতের, এবং ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি ভারত-ভিন্ন দেশের, ধর্মাচার্যেরা ধর্মজগতের যে একদেশী ভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণবালক নিজ জীবনে সম্পূর্ণরূপে সেই ভাব বিনষ্ট করিয়া বিপরীত ধর্মমতসমূহের প্রকৃত সমন্বয়রূপ অসাধ্যসাধনে সমর্থ হইল—এ চিত্র আর কখনও কেহ কি দেখিয়াছে? হে মানব, ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উচ্চাসন যে কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা নির্ণয়ে যদি সক্ষম হইয়া থাক তো বল, আমরা কিন্তু ঐ বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, নির্জীব ভারত তাঁহার পদস্পর্শে সমধিক পবিত্র ও জাগ্রত হইয়াছে এবং জগতের গৌরব ও আশার স্থল অধিকার করিয়াছে—তাঁহার মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করায় নরও দেবকুলের পূজ্য হইয়াছে এবং যে শক্তির উদ্বোধন তাঁহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র লীলাভিনয়ের কেবল আরম্ভমাত্রই শ্রীবিবেকানন্দে জগৎ অনুভব করিয়াছে!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে গুরুভাবপর্বে উত্তরার্ধ সম্পূর্ণ

৫.১. ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

নিবেদন

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত প্রথম পরিচয়ের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চিকিত্সার্থ কলিকাতায় আগমনপূর্বক শ্যামপুকুরে অবস্থানকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী ইহাতে যথাসম্ভব সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঠাকুর এই কালে নিরন্তর দিব্যভাবারূঢ় থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত ব্যবহার ও প্রতি কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। আবার, এখন হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকাল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) জীবনের সহিত ঈদৃশ মধুর সম্বন্ধে চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিল যে, উহার কথা আলোচনা করিতে যাইলে সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের জীবন-কথা উপস্থিত হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থখানির "ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ" নামে অভিহিত হওয়াই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে।

ঠাকুরের জীবন-লীলা-প্রসঙ্গ যখন প্রথম লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করি তখন আমরা এতদূর অগ্রসর হইতে পারিব, এ কথা কল্পনায় আনিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য কৃপায় উহাও সম্ভবপর হইল! অতএব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বারংবার প্রণামপূর্বক আমরা গ্রন্থখানি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইতি –

বিনীত –

গ্রন্থকার

শুক্লা দ্বিতীয়া

২০ ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশীপুর-উদ্যানে থাকাকালীন ঘটনাবলীর কিয়দংশ ১৩২৬ সালে 'উদ্বোধন'-এর শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ইতঃপূর্বে কোন পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নাই। এই সংস্করণে পুস্তকের শেষাংশে পরিশিষ্টাকারে সেগুলি সংযোজিত হইল। ইতি –

বিনীত –

প্রকাশক

১৩ আশ্বিন,

১৩৪২ সন

৫.২. পূর্বকথা

দিব্যভাবের বিশেষ প্রকাশ ঠাকুরের জীবনে কতকাল ছিল–তন্নির্ণয়

৺ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠান করিয়া ঠাকুর নিজ সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, একথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উহা সন ১২৮০ সালে, ইংরাজী ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তিনি দিব্যভাবের প্রেরণায় জীবনের সকল কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। ঠাকুরের বয়স তখন আটত্রিশ বৎসর ছিল। সুতরাং ঊনচল্লিশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁহার জীবনে ঐ ভাব নিরন্তর প্রবাহিত ছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার চেষ্টাসমূহ এই কালে অদৃষ্টপূর্ব অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য-শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম-সংস্থাপনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, পূর্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্যার অন্তে ঠাকুর নিজ শক্তির এবং জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; পরে, ইহকালসর্বস্ব পাশ্চাত্যভাবসমূহের প্রবল প্রেরণায় ভারতে যে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল তন্নিবারণ ও সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়া দ্বাদশবৎসরান্তে উক্ত ব্রতের উদ্যাপনপূর্বক সংসার হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য তিনি যেরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুরের জীবনের শেষ দ্বাদশ বর্ষে ঐ ভাবের বিশেষ প্রকাশ কেন বলা যায়

পাঠক হয়তো আমাদিগের পূর্বোক্ত কথায় স্থির করিবেন যে, ঊনচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ঠাকুর সাধকের ভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন; তাহা নহে। 'গুরুভাব'-শীর্ষক গ্রন্থে আমরা ইতঃপূর্বে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, গুরু নেতা বা ধর্মসংস্থাপকের পদবী স্বভাবতঃ গ্রহণপূর্বক যাঁহারা মানবের হিতসাধন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত জগতে পূজ্য হইয়াছেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদিগের জীবনে ঐসকল গুণের স্ফূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ঠাকুরের জীবনে বাল্যকাল হইতে আমরা ঐসকল ভাবের পরিচয় পাইয়া থাকি–যৌবনে, সাধনকালে উহাদের প্রেরণায় তিনি অনেক কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন এ কথা বুঝিতে পারি–এবং সাধনাবস্থার অবসানে, তাঁহার বত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীযুত মথুরের সহিত তীর্থপর্যটনকালে এবং পরে, উহাদিগের সহায়ে প্রায় সকল কার্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে পাই। অতএব সন ১২৮১ সাল হইতে তাঁহাতে দিব্যভাবের প্রকাশ এবং তাঁহার ধর্মসংস্থাপনকার্যে মনোনিবেশ বলিয়া যে এখানে নির্দেশ করিতেছি তাহার কারণ, এখন হইতে তিনি দিব্যভাবের নিরন্তর প্রেরণায়, পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞানমূলক যে শিক্ষা ও সভ্যতা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত-ভারতীকে প্রতিদিন বিপরীত-ভাবাপন্ন করিয়া সনাতন ধর্মমার্গ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজী শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বদা নিযুক্ত থাকিয়া জনসাধারণের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন।

দিব্যভাবের সহায়ে ঠাকুর পাশ্চাত্য ভাব-বন্যার গ্লানি হইতে ভারতকে মুক্ত করিয়াছেন

ঐরূপ করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরকৃপায় ঠাকুরের অলৌকিক আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবময় জীবন উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলে ভারতের নিজ জাতীয়ত্বের এবং সনাতন ধর্মের এককালে লোপসাধন হইত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, ঠাকুর নিজ জীবনে যাবতীয় সম্প্রদায়ের ধর্মমত সাধনপূর্বক 'যত মত তত পথ'-রূপ সত্যের আবিষ্কার করিয়া যেমন পৃথিবীস্থ সর্বদেশের সর্বজাতির কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের সম্মুখে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর নিজ আদর্শজীবন অতিবাহিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই কালে

ধর্মসংস্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাশ্চাত্যভাবরূপ বন্যা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় বিষম সঙ্কটে ভারত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব সনাতন ধর্মের সহিত পূর্বপ্রচলিত সর্বপ্রকার ধর্মমতকে সংযুক্ত করিয়া অধিকারিভেদে তাহাদিগের সম-সমান প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করা যেমন তাঁহার জীবনের বিশেষ কার্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রবল স্রোতে নিমজ্জনোন্মুখ ভারতের উদ্ধারসাধন তাঁহার জীবনের ঐরূপ দ্বিতীয় কার্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। সন ১২৪২ সাল বা ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয় এবং ঐ বৎসরেই ঠাকুর জন্ম-পরিগ্রহ করেন। অতএব পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষভাগ যে শক্তির দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং যাহার সহায়ে ভারত নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণভাগকে মাত্র নিজস্ব করিয়া লইবে, বিধাতার বিধানে তদুভয় শক্তির ভারতে যুগপৎ উদয় দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

দিব্যভাবের প্রকাশ মানব-জীবনে কখন উপস্থিত হয়

আধ্যাত্মিক রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ মানবজীবনে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব ঈশ্বরকৃপায় মুক্ত হইয়া উক্ত ভাবের সামান্যমাত্র-আস্বাদনেই সমর্থ হইয়া থাকে। কারণ, মানব যখন শমদমাদি গুণসমূহ শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় বিনায়াসে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, পরমাত্মার প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাহার ক্ষুদ্র আমিত্ববোধ যখন চিরকালের নিমিত্ত অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-সাগরে বিলীন হইয়া থাকে, নির্বিকল্প সমাধিতে ভস্মীভূত হইয়া তাহার মন-বুদ্ধি যখন সর্বপ্রকার মলিনতা পরিহারপূর্বক শুদ্ধসাত্ত্বিক বিগ্রহে পরিণত হয় এবং তাহার অন্তরের অনাদি বাসনাপ্রবাহ জ্ঞানসূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে এককালে বিশুষ্ক হইয়া যখন নবীন সংস্কার ও কর্মপুঞ্জের উৎপাদনে আর সমর্থ হয় না—তখনই তাহাতে দিব্যভাবের উদয় হইয়া তাহার জীবন কৃতার্থ হইয়া থাকে। অতএব দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশে চিরপরিতৃপ্ত ব্যক্তির দর্শনলাভ যেমন অতীব বিরল, তেমনি আবার ঐরূপ ব্যক্তির কার্যকলাপ কোনপ্রকার অভাববোধ হইতে প্রসূত না হওয়ায় উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া প্রতীত হইয়া সাধারণ মন-বুদ্ধির নিকটে চিরকাল দুর্বোধ্য থাকে। সুতরাং দিব্যভাবের স্বরূপ যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে কেবলমাত্র দিব্যভাবারূঢ় ব্যক্তিই সমর্থ হয়েন এবং উক্ত ভাবের প্রেরণায় যে-সকল অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়, সে-সকলের আলোচনা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত না করিলে তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র মর্মগ্রহণও আমাদের ন্যায় মন-বুদ্ধির কখনও সম্ভবপর হয় না।

অবতারপুরুষদিগের জীবনে ঐ স্বভাবের বিশেষ প্রকাশ থাকায় তাঁহাদিগের চরিত্র এত দুর্বোধ্য ও রহস্যময়

দিব্যভাবের পূর্ণপ্রকাশ একমাত্র অবতার-পুরুষসকলেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস ঐ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করে। ঐজন্যই অবতারচরিত্র আমাদিগের নিকটে চির-রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক, আমরা কল্পনা-সহায়ে মায়ারহিত ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থার আংশিক চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারি, কিন্তু ঐ অবস্থায় যাঁহারা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সর্বদা অবস্থান করেন, তাঁহারা কি ভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে—কখনও আমাদিগের ন্যায় এবং কখনও অসীম শক্তিসম্পন্ন দেবতার ন্যায়—কার্যাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা ধরিতে বুঝিতে পারি না। আমাদিগের মন-বুদ্ধি দূরে থাকুক, কল্পনা পর্যন্ত ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সর্বতোভাবে পরাজয়স্বীকার করে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই কালের কার্যাবলীর সম্যক আলোচনা যে সম্ভবপর নহে, তাহা আর বলিতে হইবে না। সুতরাং তাঁহার এই কালের কার্যপরম্পরার উল্লেখমাত্র করিয়া উহাদিগের সফলতাদর্শনে যেটি যে উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বলিয়া আমরা ধারণা করিয়াছি, তাহাই কেবল পাঠককে বলিয়া যাইব। কার্যের গুরুত্ব দেখিয়াই আমরা কারণের মহত্ত্বের সর্বত্র পরিমাণ করিয়া থাকি। ঠাকুরের এই কালের কার্যাবলীর অলৌকিকত্ব অনুধাবন করিয়া তাঁহার অন্তরে দিব্যভাবের

কতদূর অদৃষ্টপূর্ব প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদিগের বিলম্ব হইবে না।

উক্ত ভাবাবলম্বনে ঠাকুর যে-সকল কার্য করিয়াছেন তাহাদিগের সাতটি প্রধান বিভাগ-নির্দেশ

দিব্যভাবারূঢ় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কার্যসকল অতঃপর কেবলমাত্র ধর্মসংস্থাপনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলেও, উহাদিগের মধ্যে সাতটি প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায় –

১ম। তিনি তাঁহার সতী সাধ্বী সহধর্মিণীর ধর্মজীবন অপূর্বভাবে গঠিত করিয়া তাঁহাকে অপরে ধর্মশক্তিসঞ্চারের প্রবল কেন্দ্রস্বরূপা করিয়া তুলিয়াছিলেন।

২য়। উচ্চাদর্শে জীবন পরিচালিত করিয়া যে-সকল ব্যক্তি তৎকালে কলিকাতা মহানগরীতে ধর্মবিষয়ে নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎপূর্বক নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে তাঁহাদিগের জীবন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

৩য়। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সর্ববিধ সম্প্রদায়ের পিপাসু ব্যক্তিসকলকে ধর্মালোকপ্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

৪র্থ। যোগদৃষ্টিসহায়ে পূর্বপরিদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে নিজ সকাশে আগমন করিতে দেখিয়া অধিকারিভেদে শ্রেণীবিভাগপূর্বক তাহাদিগের ধর্মজীবন গঠন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৫ম। ঐসকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ঈশ্বরলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগরূপ ব্রতে দীক্ষিত করিয়া সংসারে নিজ অভিনব উদার মতপ্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ। কলিকাতা-নিবাসী নিজ ভক্তগণের বাটীতে পুনঃপুনঃ আগমনপূর্বক ধর্মালাপ ও কীর্তনাদি-সহায়ে তাহাদিগের পরিবারবর্গের এবং পল্লীবাসিগণের জীবনে ধর্মভাব বিশেষভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন।

৭ম। অপূর্ব প্রেমবন্ধনে নিজ ভক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এমন অদ্ভুত একপ্রাণতা আনয়ন করিয়াছিলেন যে, উহার ফলে তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ক্রমে এক উদার ধর্মসঙ্ঘে স্বভাবতঃ পরিণত হইয়াছিল।

উক্ত সাত প্রকারের কার্যাবলীর মধ্যে প্রথমোক্তটি ঠাকুর কিরূপে সন ১২৮০ সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে 'সাধকভাব'-শীর্ষক গ্রন্থের শেষভাগে বলিয়াছি। উহার পরবৎসরে সন ১২৮১ সালে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কিভাবে দ্বিতীয় প্রকারের কার্যাবলী আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমরা আলোচনা করিয়াছি। আবার পূর্বোক্ত বিভাগের তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর কার্যাবলীর সামান্য পরিচয় আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের উত্তরার্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমাধ্যায়ে পাঠককে প্রদান করিয়াছি। অতএব অবশিষ্ট প্রকারের কার্যসকল তিনি কখন কিভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা সর্বাগ্রে আলোচনা করিব।

৫.৩. প্রথম অধ্যায়–প্রথম পাদ: ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মগণের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরে কলিকাতার জনসাধারণ ঠাকুরের কথা জানিতে পারিয়াছিল। গুণগ্রাহী কেশব প্রথম দর্শনের দিন হইতেই যে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হইলেও তাঁহার হৃদয় যথার্থ ঈশ্বর-ভক্তিতে পূর্ণ ছিল এবং অমৃতময় ভক্তিরসের একাকী সম্ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাণীতে তিনি জীবনপথে যতই নূতন আলোক দেখিতে লাগিলেন, ততই ঐ কথা মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে জানাইয়া তাহারা সকলেও যাহাতে তাঁহার ন্যায় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সোৎসাহে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেইজন্য দেখা যায়, পূর্বোক্ত সমাজের ইংরাজী ও বাংলা যাবতীয় পত্রিকা, যথা–'সুলভ সমাচার', 'সানডে মিরর্', 'থিইস্টিক্ কোয়ার্টার্লি রিভিউ' প্রভৃতি এখন হইতে ঠাকুরের পূত চরিত, সারগর্ভ বাণী ও ধর্মবিষয়ক মতামতের আলোচনায় পূর্ণ। বক্তৃতা এবং একত্র উপাসনার পরে বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে সম্বোধনপূর্বক উপদেশ-প্রদানকালেও কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম-নেতাগণ অনেক সময়ে ঠাকুরের বাণীসকল আবৃত্তি করিতেছেন। আবার অবসর পাইলেই তাঁহারা কখনও দু-চারিজন অন্তরঙ্গের সহিত এবং কখনও বা সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সদালাপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুরের ব্রাহ্মগণের সহিত সপ্রেম সম্বন্ধ

ব্রাহ্মনেতাগণের ধর্মপিপাসা ও ঈশ্বরানুরাগদর্শনে আনন্দিত হইয়া যাহাতে তাঁহারা সাধনসমুদ্রে এককালে ডুবিয়া যাইয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ-দর্শনরূপ রত্নলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে পথ দেখাইতে ঠাকুর এখন বিশেষভাবে যত্নপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত হরি-কথা ও কীর্তনে তিনি এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কেশবের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। ঐরূপে উক্ত সমাজস্থ বহু পিপাসু ব্যক্তির সহিত তিনি ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কেশব ভিন্ন কোন কোন ব্রাহ্মগণের বাটীতেও কখনও কখনও উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দবর্ধন করিতেন। সিঁদুরিয়াপটির মণিমোহন মল্লিক, মাথাঘষা গলির জয়গোপাল সেন, বরাহনগরস্থ সিঁতি নামক পল্লীর বেণীমাধব পাল, নন্দনবাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের বাটীতে উৎসবকালে এবং অন্য সময়ে তাঁহার গমনাগমনের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। কখনও কখনও এমনও হইয়াছে যে, বেদী হইতে উপদেশপ্রদানকালে তাঁহাকে সহসা মন্দিরমধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীযুত কেশব উহা সম্পূর্ণ না করিয়াই বেদী হইতে নামিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাণীশ্রবণে ও তাঁহার সহিত কীর্তনানন্দে সেই দিনের উপাসনার উপসংহার করিয়াছেন।

ঠাকুর তাঁহাদিগের মতের লোক–ব্রাহ্মদিগের এইরূপ ধারণা হইবার কারণ

স্ব স্ব সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের সহিতই মানব অকপটে মিলিত হইতে এবং নিঃসঙ্কোচ-আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে ঐরূপভাবে মিলিত হইতে এবং আনন্দ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মনেতাগণ যে ঠাকুরকে এখন তাঁহাদিগের ভাবের ও মতের লোক বলিয়া স্থির করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। হিন্দুদিগের শাক্ত-বৈষ্ণবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁহাকে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত ঐরূপে যোগদান ও আনন্দ করিতে দেখিয়া অনেক সময়ে ঐরূপ করিয়াছেন। কারণ সর্বভাবের উৎপত্তি এবং সমন্বয়ভূমি 'ভাবমুখ'-এ অবস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর ঐরূপ করিতে পারিতেন–এ কথা তখন কে বুঝিবে? কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগের সহিত নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান ও কীর্তনাদিতে তন্ময়

হইয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহারা যেখানে অন্ধকার দেখিতেছেন সেখানে অপূর্ব আলোক সত্য সত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিগণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাঁহারা এ কথাও বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার ন্যায় তন্ময় হইতে না পারিলে ঐরূপ দর্শন ও আনন্দানুভব কখনও সম্ভবপর নহে।

ব্রাহ্ম সাধকদিগকে ঠাকুরের সাধনপথে অগ্রসর করা

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থ অনেকগুলি ব্যক্তির সত্যানুরাগ, ত্যাগশীলতা এবং ধর্মপিপাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে নিজ জীবনাদর্শে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণ যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, তিনি তাঁহাদিগকে চিরকাল পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে অকাতরে সাহায্য প্রদান করিতেন। আবার যথার্থই ঈশ্বরভক্ত সকলকে ঠাকুর এক পৃথক জাতি বলিয়া সর্বদা নির্দেশ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্রে পান-ভোজন করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না। অতএব কেশব এবং তাঁহার পার্ষদগণ, যথা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চিরঞ্জীব শর্মা, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণকে তিনি যে এখন পরম স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আধ্যাত্মিক সহায়তা করিতে উদ্যত হইবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্র পান-ভোজনে সঙ্কুচিত হইবেন না, এ কথা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাব-সহায়ে ইঁহারা যে জাতীয় ধর্মাদর্শ হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন এবং অনেক সময়ে সমাজ-সংস্কারকেই ধর্মানুষ্ঠানের চূড়ান্ত জ্ঞান করিয়া বসিতেছেন, এ কথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি সেজন্য তাঁহাদিগের ভিতরে যথার্থ সাধনানুরাগ প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সমাজ তাঁহাদিগের সহিত ঐ পথে অগ্রসর হউক বা না হউক, একমাত্র ঈশ্বর-লাভকেই তাঁহাদিগকে জীবনোদ্দেশ্যরূপে অবলম্বন করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে, শ্রীযুত কেশব সদলবলে তৎপ্রদর্শিত মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন—মধুর মাতৃনামে ঈশ্বরকে সম্বোধন ও তাঁহার মাতৃত্বের উপাসনা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল এবং উক্ত সমাজের সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়ে ঠাকুরের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। শুদ্ধ তাহা নহে; কিন্তু ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া হিন্দুদিগের যে আদর্শ ও অনুষ্ঠানসকল হইতে ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করিয়াছিল, সে-সকলের মধ্যে অনেক বিষয় ভাবিবার এবং শিখিবার আছে—উক্ত সমাজের নেতাগণ এ কথাও ঠাকুরের জীবনালোকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মগণকে 'ল্যাজা-মুড়ো' বাদ দিয়া তাঁহার কথা গ্রহণ করিতে বলিবার কারণ

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত কেশব ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার সকল প্রকার ভাব ও উপদেশ যে যথাযথ বুঝিতে পারিবেন না এবং যাহা বুঝিতে পারিবেন তাহাও সম্যক গ্রহণ করা তাঁহাদিগের রুচিকর হইবে না—এ বিষয় ঠাকুর পূর্ব হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপদেশপ্রদানকালে কোন কথা বলিবার পরে ঐ বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি সেজন্য প্রায়ই বলিতেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার 'ল্যাজা-মুড়ো' বাদ দিয়া গ্রহণ করিও।" আবার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক ব্যক্তির নিকটে সমাজসংস্কার এবং ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন জীবনোদ্দেশ্যের স্থল অধিকার করিয়াছে—এ কথা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। ঐ বিষয় তিনি অনেক সময়ে রহস্যচ্ছলে প্রকাশও করিতেন। বলিতেন –

ঠাকুরের রহস্যচ্ছলে শিক্ষাপ্রদান

"কেশবের ওখানে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের উপাসনা দেখিলাম। অনেকক্ষণ ভগবদ্-ঐশ্বর্যের কথাবার্তার পরে বলিল—'এইবার আমরা তাঁহার (ঈশ্বরের) ধ্যান করি।' ভাবিলাম কতক্ষণ না জানি ধ্যান করিবে! ওমা! দু-মিনিট চোক্ বুজিতে না বুজিতেই হইয়া গেল।—এইরকম ধ্যান

করিয়া কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? যখন তাহারা সব ধ্যান করিতেছিল, তখন সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। পরে কেশবকে বলিলাম, 'তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখিলাম, কি মনে হইল জান?—দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখনও কখনও হনুমানের পাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে–যেন কত ভাল, কিছু জানে না। কিন্তু তা নয়, তাহারা তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে–কোন্ গৃহস্থের চালে লাউ বা কুমড়োটা আছে, কাহার বাগানে কলা বা বেগুন হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই উপ্ করিয়া সেখানে গিয়া পড়িয়া সেইগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া উদরপূর্তি করে। অনেকের ধ্যান দেখিলাম ঠিক সেইরকম!' সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিল।"

ঐরূপে রহস্যচ্ছলে শিক্ষাপ্রদান তিনি কখনও কখনও আমাদিগকেও করিতেন। আমাদের স্মরণ আছে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার সম্মুখে ভজন গাহিতেছিলেন। স্বামীজী তখন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসনা ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। "(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে" ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনি অনুরাগের সহিত তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে– "ভজন-সাধন তাঁর, কর রে নিরন্তর"; ঠাকুর ঐ কথাগুলি স্বামীজীর মনে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য সহসা বলিয়া উঠিলেন, "না, না, বল–'ভজন-সাধন তাঁর, কর রে দিনে দুবার'–কাজে যাহা করিবি না, মিছামিছি তাহা কেন বলিবি?" সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, স্বামীজীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।

ব্রাহ্মগণকে শিক্ষাপ্রদান–ঐশ্বর্যজ্ঞানে ঈশ্বরকে আপনার করা যায় না

আর এক সময় ঠাকুর উপাসনাসম্বন্ধে কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা তাঁহার (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্যের কথা অত করিয়া বল কেন? সন্তান কি তাহার বাপের সম্মুখে বসিয়া 'বাবার আমার কত বাড়ি, কত ঘোড়া, কত গরু, কত বাগ-বাগিচা আছে' এই সব ভাবে? অথবা, বাবা তাহার কত আপনার, তাহাকে কত ভালবাসে, ইহা ভাবিয়া মুগ্ধ হয়? ছেলেকে বাপ খাইতে পরিতে দেয়, সুখে রাখে, তাহাতে আর কি হইয়াছে? আমরা সকলেই তাঁহার (ঈশ্বরের) সন্তান, অতএব তিনি যে আমাদের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যথার্থ ভক্ত সেইজন্য ঐসকল কথা না ভাবিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়া তাঁহার উপর আবদার করে, অভিমান করে, জোর করিয়া তাঁহাকে বলে, 'তোমাকে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে, আমাকে দেখা দিতেই হইবে।' অত করিয়া ঐশ্বর্য ভাবিলে, তাঁহাকে খুব নিকটে, খুব আপনার বলিয়া ভাবা যায় না, তাঁহার উপর জোর করা যায় না। তিনি কত মহান, আমাদের নিকট হইতে কত দূরে, এইরূপ ভাব আসে। তাঁহাকে খুব আপনার বলিয়া ভাব, তবে তো হইবে (তাঁহাকে পাওয়া যাইবে)।"

ঈশ্বরের স্বরূপের অন্ত নির্দেশ করা যায় না

ঈশ্বরলাভের জন্য সাধন-ভজন ও বিষয়বাসনা-ত্যাগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা করা ভিন্ন ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ অন্য একটি বিষয়ও জানিতে পারিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের ধর্মপ্রচারকগণের মুখে এবং ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর কখনও সাকার হইতে পারেন না, অতএব কোন সাকার মূর্তিতে তাঁহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া পূজোপাসনাদি করায় মহাপাপ হয়। কিন্তু "নিরাকার জল জমিয়া সাকার বরফ হওয়ার ন্যায় নিরাকার সচ্চিদানন্দের ভক্তিহিমে জমিয়া সাকার হওয়া", "শোলার আতা দেখিয়া যথার্থ আতা মনে পড়ার ন্যায় সাকারমূর্তি-অবলম্বনে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞানে পৌঁছানো"– ইত্যাদি প্রতীকোপাসনার কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, 'পৌত্তলিকতা' নামে নির্দেশ করিয়া তাঁহারা যে কার্যটাকে এতদিন নিতান্ত যুক্তিহীন ও হেয় ভাবিয়া আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বলিবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। তদুপরি যেদিন ঠাকুর, 'অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ বিরাট-জগতের অভিন্নতা' কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের

নিকটে প্রতিপাদন করিলেন, সেদিন যে তাঁহারা সাকারোপাসনাকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করিলে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের একাংশমাত্রই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ঈশ্বর-স্বরূপকে কেবলমাত্র সাকার বলিয়া নির্দিষ্ট করায় যে দোষ হয়, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ বলিয়া উহাকে নির্দেশ করিলে তদ্রূপ দোষ হয়। কারণ, ঈশ্বর সাকার-জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিরাকার সগুণ-ব্রহ্মস্বরূপে জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন, আবার সর্বগুণের অতীত থাকিয়া ঈশ্বর জীব, জগৎ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তুর নামরূপযুক্ত প্রকাশের ভিত্তি-স্বরূপ হইয়া সতত অবস্থান করিতেছেন। "ঈশ্বর-স্বরূপে ইতি করিতে নাই–তিনি সাকার, তিনি নিরাকার (সগুণ) এবং তাহা ছাড়া তিনি আরও যে কি, তাহা কে জানিতে বলিতে পারে?" ঠাকুরের এই সামান্য উক্তির ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে পাইয়া কেশবপ্রমুখ সকলে সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সমাজের রূপ-পরিবর্তন

ঐরূপে সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসে, ইংরাজী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, ঠাকুরের পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিবার পর হইতে তিন বৎসরের কিঞ্চিদধিককাল পর্যন্ত কেশব-পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পাশ্চাত্যভাবের মোহ হইতে দিন দিন বিমুক্ত হইয়া নবীনাকার ধারণ করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকের সাধনানুরাগ সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিল। পরে সন ১২৮৪ সালে, ইংরাজী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মার্চ তারিখে, শ্রীযুত কেশব তাঁহার কন্যাকে কুচবিহার প্রদেশের মহারাজের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। বিবাহকালে কন্যার বয়সের যে সীমা ব্রাহ্মসমাজ ইতঃপূর্বে স্থির করিয়াছিল, কেশব-দুহিতার বয়স তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন থাকায় উক্ত বিবাহ লইয়া সমাজে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং পাশ্চাত্যানুকরণে সমাজসংস্কারপ্রিয়তারূপ শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া এখন হইতে উহা 'ভারতবর্ষীয়' ও 'সাধারণ'-নামক দুই ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের উপর ঠাকুরের প্রভাব কিন্তু ঐ ঘটনায় নিরস্ত হইল না। তিনি উভয় পক্ষকে সমান আদর করিতে লাগিলেন এবং উভয় পক্ষের পিপাসু ব্যক্তিগণই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক পথে সহায়তালাভ করিতে লাগিল।

ঠাকুরের আবিষ্কৃত তত্ত্বের কিয়দংশ গ্রহণপূর্বক কেশবের 'নববিধান' আখ্যাপ্রদান ও প্রচার

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদলের নেতা শ্রীযুত কেশব এখন হইতে দ্রুতপদে সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন এখন হইতে সুগভীর হইয়া উঠিয়াছিল। হোম, অভিষেক, মুণ্ডন, কাষায়ধারণাদি স্থূল ক্রিয়াসকলের সহায়ে মানব-মন আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম ও উচ্চ স্তরসমূহে আরোহণে সমর্থ হয়, এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি ঐসকলের স্বল্পবিস্তর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জীবন্ত ভাবময় তনুতে নিত্য বিদ্যমান এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক এক বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রস্রবণ-স্বরূপে সতত অবস্থান করিতেছেন, এ কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের ভাব যথাযথ উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি কখনও একের, কখনও অন্যের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্বপ্রকার 'ভেক্' ধারণপূর্বক সকল মতের সাধনা করিয়াছিলেন শুনিয়াই যে কেশবের পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। ঐরূপে সাধনসমূহের স্বল্পবিস্তর অনুষ্ঠানপূর্বক 'যত মত, তত পথ'-রূপ ঠাকুরের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের বিষয় শ্রীযুত কেশব যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই কুচবিহার-বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে 'নববিধান' আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি উক্ত বিধানের ঘনীভূত মূর্তি জানিয়া কতদূর শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন তাহা প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ।

আমাদিগের মধ্যে অনেকে দেখিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি 'জয় বিধানের জয়', 'জয় বিধানের জয়' এ কথা বারংবার উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন। 'নববিধান' প্রচারের প্রায় চারি বৎসর পরে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান না করিলে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমে কত সুগভীর হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

ঠাকুর কেশবকে কতদূর আপনার জ্ঞান করিতেন

ঠাকুর শ্রীযুত কেশবকে এতদূর পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন যে, এক সময়ে তাঁহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া, তাঁহার আরোগ্যের নিমিত্ত শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে ডাব-চিনি মানত করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া অতিশয় কৃশ দেখিয়া নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই; পরে বলিয়াছিলেন, "বসরাই গোলাপের গাছে বড় ফুল হইবে বলিয়া মালী কখনও কখনও উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া উহার শিকড় পর্যন্ত মাটি হইতে বাহির করিয়া রোদ ও হিম খাওয়ায়। তোমার শরীরের এই অবস্থা মালী (ঈশ্বর) সেইজন্যই করিয়াছেন।" আবার তাঁহার শেষ পীড়ার অন্তে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার শরীর-রক্ষার কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া ঠাকুর তিনদিন কাহারও সহিত কথাবার্তা না কহিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন, "কেশবের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে!" শ্রীযুত কেশবের পরিবারবর্গের স্ত্রী-পুরুষ সকলে ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং কখনও কখনও তাঁহাকে 'কমল কুটির'-এ লইয়া যাইয়া এবং কখনও বা দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন। মাঘোৎসবে তাঁহার সহিত ভগবদালাপ ও কীর্তনাদিতে একদিন আনন্দ করা কেশবের জীবৎকালে নববিধান সমাজের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে শ্রীযুত কেশব কখনও কখনও জাহাজে করিয়া সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথী-বক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কীর্তনাদি-আনন্দে মগ্ন হইতেন।

ঠাকুরের প্রভাবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত-পরিবর্তন ও ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ

কুচবিহার-বিবাহ লইয়া বিচ্ছিন্ন হইবার পরে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী 'সাধারণ' সমাজের আচার্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিজয় ইতিপূর্বে সত্যপরায়ণতা এবং সাধনানুরাগের জন্য কেশবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। আচার্য কেশবের ন্যায় ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের পরে বিজয়কৃষ্ণেরও সাধনানুরাগ বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। ঐ পথে অগ্রসর হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার নানা নূতন আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঈশ্বরের সাকার প্রকাশে তিনি বিশ্বাসবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্বে বিজয় যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন দীর্ঘ শিখা, সূত্র এবং নানা কবচাদিতে তাঁহার অঙ্গ ভূষিত ছিল; সত্যের অনুরোধে বিজয় সেইসকল একদিনে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদলে যোগদান করিয়াছিলেন। কুচবিহার-বিবাহের পরে সত্যের অনুরোধে তিনি নিজ গুরুতুল্য কেশবকে বর্জন করিয়াছিলেন। আবার সেই সত্যের অনুরোধে তিনি এখন তাঁহার সাকার বিশ্বাস লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে আপনাকে পৃথক করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার বৃত্তিলোপ হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহাতে কিছুমাত্র অবসন্ন হয়েন নাই। শ্রীযুত বিজয় ঠাকুরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের কথা এবং কখনও কখনও অদ্ভুতভাবে তাঁহার দর্শন পাইবার বিষয় অনেক সময় আমাদের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে উপগুরু অথবা অন্য কোনভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, গয়াধামে আকাশগঙ্গার পাহাড়ে কোন সাধু কৃপা করিয়া নিজ যোগশক্তি-সহায়ে তাঁহাকে সহসা সমাধিস্থ করিয়া দেন ও তাঁহার গুরুপদবী গ্রহণ করেন, এ কথাও আমরা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঠাকুরের সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার যে অতি

উচ্চ ধারণা ছিল তাহাতে সংশয় নাই এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার স্বমুখ হইতে আমরা যেসকল কথা শুনিয়াছি, তাহা গ্রন্থের অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি।[1]

বিজয় অতঃপর সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন

ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইবার পরে বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক গভীরতা দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। কীর্তনকালে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা তাঁহার উচ্চাবস্থার কথা এইরূপ শুনিয়াছি—"যে ঘরে প্রবেশ করিলে লোকের ঈশ্বরসাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার পার্শ্বের ঘরে পৌঁছিয়া বিজয় দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত করাঘাত করিতেছে!"—আধ্যাত্মিক গভীরতালাভের পরে শ্রীযুত বিজয় অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের শরীররক্ষার প্রায় চৌদ্দবৎসর পরে ৺পুরীধামে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

'শিব-রামের যুদ্ধ' কথায় কেশব ও বিজয়ের মনোমালিন্য দূর হওয়া

কুচবিহার-বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিশেষ মনান্তর লক্ষিত হইত। এক দলের সহিত অন্য দলের কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উভয় দলের সাধনানুরাগী ব্যক্তিগণ কিন্তু পূর্বের ন্যায় সমভাবে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, এ কথার আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কেশব ও বিজয় উভয়েই একদিন এই সময়ে নিজ নিজ অন্তরঙ্গগণের সহিত সহসা ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক দল অন্য দলের আসিবার কথা না জানাতেই অবশ্য ঐরূপ হইয়াছিল এবং পূর্ববিরোধ স্মরণ করিয়া উভয় দলের মধ্যে একটা সঙ্কোচের ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। কেশব এবং বিজয়ের মধ্যেও ঐ সঙ্কোচ বিদ্যমান দেখিয়া ঠাকুর সেদিন তাঁহাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন –

"দেখ, ভগবান শিব এবং রামচন্দ্রের মধ্যে এক সময়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। শিবের গুরু রাম এবং রামের গুরু শিব—এ কথা প্রসিদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধান্তে তাঁহাদিগের পরস্পরে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেতাদির সঙ্গে রামের চেলা বাঁদরগণের আর কখনও মিলন হইল না। ভূতে-বাঁদরে লড়াই সর্বক্ষণ চলিতে লাগিল। (কেশব ও বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তোমাদিগের পরস্পরে এখন আর মনোমালিন্য রাখা উচিত নহে, উহা ভূত ও বাঁদরগণের মধ্যেই থাকুক।"

ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মসঙঘ ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া আচার্য শিবনাথের দক্ষিণেশ্বর-গমনে বিরত হওয়া

তদবধি কেশব ও বিজয়ের মধ্যে পুনরায় কথাবার্তা চলিয়াছিল। শ্রীযুত বিজয় নিজ অভিনব আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলের অনুরোধে সাধারণসমাজ পরিত্যাগ করিলে উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার উপর একান্ত বিশ্বাসবান ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার সহিত চলিয়া আসিলেন। সাধারণ-সমাজ ঐ কারণে এইকালে বিশেষ ক্ষীণ হইয়াছিল। আচার্য শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রীই এখন ঐ দলের নেতা হইয়া সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবনাথ ইতঃপূর্বে অনেক বার ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু বিজয় সমাজ ছাড়িবার পরে শিবনাথ বিষম সমস্যায় নিপতিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের উপদেশ-প্রভাবেই বিজয়কৃষ্ণের ধর্মভাব-পরিবর্তন এবং পরিণামে সমাজ-পরিত্যাগ—এ কথা অনুধাবন করিয়া তিনি এক্ষণে ঠাকুরের নিকটে পূর্বের ন্যায় যাওয়া-আসা রহিত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতে সাধারণ-সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শিবনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধারণ-সমাজে যোগদান করিলেও কিন্তু স্বামীজী মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত কেশবের এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিতেন। স্বামীজী বলিতেন, আচার্য শিবনাথকে তিনি এই সময়ে ঠাকুরের নিকটে

না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘন ঘন গমন করিলে তাঁহার দেখাদেখি ব্রাহ্মসঙ্ঘের অন্য সকলেও ঐরূপ করিবে এবং পরিণামে উক্ত দল ভাঙিয়া যাইবে। স্বামীজী বলিতেন, ঐরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া শ্রীযুত শিবনাথ এই সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতে বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভাবসমাধি প্রভৃতি স্নায়ুদৌর্বল্য হইতে উপস্থিত হইয়াছে!—অত্যধিক শারীরিক কঠোরতার অনুষ্ঠানে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে! ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া শিবনাথকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।[2]

ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব সম্বন্ধে আচার্য প্রতাপচন্দ্রের কথা

সে যাহা হউক, ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মসঙ্ঘে যে সাধনানুরাগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে 'নববিধান' এবং 'সাধারণ' উভয় সমাজের ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে যাহাতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এরূপভাবে জীবনগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গলাভের পর, সমাজে আধ্যাত্মিক ভাব-পরিণতি কিরূপ ও কতদূর হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইঁহাকে দেখিবার আগে আমরা ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা কি বুঝিতাম?—কেবল গুণ্ডামি করিয়া বেড়াইতাম। ইঁহার দর্শনলাভের পরে বুঝিয়াছি যথার্থ ধর্মজীবন কাহাকে বলে।" শ্রীযুত প্রতাপের সঙ্গে সেদিন আচার্য চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

নববিধান-সমাজে ঠাকুরের প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হইলেও বিজয়কৃষ্ণ যতদিন আচার্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত সাধারণসমাজেও উহা স্বল্প দেখা যাইত না। বিজয়ের সহিত অনেকগুলি ধর্মপিপাসুর সমাজপরিত্যাগের পর হইতে উক্ত সমাজে ঐ প্রভাব হ্রাস হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া সমাজ-সংস্কার, দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতির অনুষ্ঠানেই আপনাকে প্রধানতঃ নিযুক্ত রাখিয়াছে। হ্রাস হইলেও উক্ত প্রভাব যে একেবারেই লুপ্ত হয় নাই, তাহার নিদর্শন সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসে, বেদান্ত-চর্চায় এবং প্রেততত্ত্বাদির (Spiritualism) অনুশীলনে দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাঙ্গের কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের বৈদিক মতের অনুশীলনও যে সাধারণসমাজস্থ কোন কোন ব্যক্তি করিয়া থাকেন এবং ধ্যানাদি-সহায়ে শারীরিক ব্যাধি-নিবারণের চেষ্টা করেন, এ বিষয়েও আমরা জ্ঞাত হইয়াছি।

ব্রহ্মসঙ্গীতে ঠাকুরের প্রভাব

নববিধান-সমাজের আচার্য চিরঞ্জীব শর্মা ব্রহ্মসঙ্গীতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, এ কথা বলিতে হইবে না। কিন্তু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায়, ঠাকুরের নানাপ্রকার দর্শন, ভাব ও সমাধি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভাবোদ্দীপক পদগুলি রচনায় সমর্থ হইয়াছেন। ঐরূপ কয়েকটি পদের[3] প্রথম অংশ মাত্র আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি –

(১) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।

(২) গভীর সমাধি-সিন্ধু অনন্ত অপার।

(৩) চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে।

(৪) চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।

(৫) আমায় দে মা পাগল করে।

সুকবি আচার্য চিরঞ্জীব শর্মা ঐরূপ পদসকল রচনা দ্বারা সমগ্র বঙ্গবাসীর এবং দেশের সাধককুলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখিয়াই যে তিনি ঐসকল পদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতেও সংশয় নাই। আচার্য চিরঞ্জীব সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে আমরা ঠাকুরকে অনেক সময় সমাধিস্থ হইতে দেখিয়াছি।

ব্রাহ্মধর্ম ঈশ্বরলাভের অন্যতম পথ বলিয়া ঠাকুরের ঘোষণা

ঐরূপে ব্রাহ্মসমাজ এইকালে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপের উপাসনা উক্ত সমাজে যে ভাবে প্রচারিত হয়, তাহাকে ঠাকুর কখনও কখনও 'কাঁচা নিরাকার ভাব' বলিয়া নির্দেশ করিলেও[4] যথার্থ বিশ্বাসের সহিত ঐ ভাবে উপাসনা করিলে সাধক ঈশ্বরলাভে সমর্থ হয়েন—এ কথা তাঁহার মুখে আমরা বারংবার শ্রবণ করিয়াছি; কীর্তনান্তে ঈশ্বর ও তাঁহার সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণকে প্রণাম করিবার কালে তিনি 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম' বলিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীকে প্রণাম করিতে কখনও ভুলিতেন না। উহাতেই বুঝা যায়, ভগবদিচ্ছায় ঈশ্বরলাভের জন্য জগতে প্রচারিত অন্য সকল মত বা পথের ন্যায় ব্রাহ্মধর্মকেও তিনি এক পথ বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিতেন। তবে পাশ্চাত্য ভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলী যাহাতে যথার্থ আধ্যাত্মিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল; এবং সমাজসংস্কারাদি কার্যসকল প্রশংসনীয় ও অবশ্যকর্তব্য হইলেও ঐসকল কার্য যাহাতে তাঁহাদিগের সমাজে মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনভজনাদি হেয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিতেন। ব্রাহ্মসমাজই ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অনুশীলন করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের চিত্ত দক্ষিণেশ্বরে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তিলাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকে ঐ বিষয়ের জন্য 'নববিধান' ও 'সাধারণ' উভয় ব্রাহ্মসমাজের নিকটেই চিরঋণে আবদ্ধ। বর্তমান লেখক আবার তদুভয় সমাজের নিকট অধিকতর ঋণী। কারণ, উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে আধ্যাত্মিকভাবে চরিত্রগঠনে তাহাকে ঐ সমাজদ্বয়ই সাহায্য করিয়াছিল। অতএব ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মমণ্ডলী বা সমাজরূপী ত্রি-রত্নকে স্বরূপতঃ এক জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে আমরা পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের আনন্দ করা সম্বন্ধে যে দুইটি বিশেষ চিত্র স্বচক্ষে দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই এক্ষণে পাঠককে উপহার দিতেছি।

[1] গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ৫ম অধ্যায় দেখ।
[2] গুরুভাব, উত্তরার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ।
[3] নববিধান-সমাজের সঙ্গীত-পুস্তকসকলে পাঠক পদগুলি দেখিতে পাইবেন।
[4] গুরুভাব, পূর্বার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ।

৫.৪. প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ: মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাহ্মোৎসব

ঘটনার সময় নির্ণয়

আমাদের বেশ মনে আছে সেটা হেমন্তকাল; গ্রীষ্মসন্তপ্তা প্রকৃতি তখন বর্ষার স্নানসুখে পরিতৃপ্তা হইয়া শারদীয় অঙ্গরাগ ধারণপূর্বক শীতের উন্মেষ অনুভব করিতেছিলেন এবং স্নিগ্ধ শীতল নিজাঙ্গে সযত্নে বসন টানিয়া দিতেছিলেন। হেমন্তেরও তিন ভাগ তখন অতীতপ্রায়। এই সময়ের একদিনের ঘটনা আমরা এখানে বিবৃত করিতেছি। ঠাকুরের পরমভক্ত আমাদিগের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু[1] সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহার প্রথামত পঞ্জিকাপার্শ্বে ঐ তারিখ চিহ্নিত করিয়া ঐ কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জানিয়াছি, ঘটনা, সন ১২৯০ সালের ১১ অগ্রহায়ণ, সোমবারে, ইংরাজী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তারিখে উপস্থিত হইয়াছিল।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের সহিত পরিচয়

তখন কলিকাতার ‘সেন্ট জেভিয়ার্স’ কলেজে আমরা অধ্যয়ন করি এবং ইতঃপূর্বে দুই-তিনবার মাত্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পুণ্য দর্শনলাভ করিয়াছি। কোন কারণে কলেজ বন্ধ থাকায় আমরা[2] ঐ দিবস অপরাহ্নে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইব বলিয়া পরামর্শ স্থির করিয়াছিলাম। স্মরণ আছে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কালে আরোহীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় ঠাকুরের নিকট যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল; আমাদিগের ন্যায় অল্পদিন ঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছেন। এ কথাও স্মরণ হয়, নৌকামধ্যে অন্য এক আরোহী আমাদের মুখে ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলে বৈকুণ্ঠনাথ বিষম ঘৃণার সহিত তাহার কথার উত্তর দিয়া তাহাকে নিরুত্তর করেন। যখন গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা ২টা বা ২৷৷টা হইবে।

বাবুরামের সহিত প্রথম আলাপ

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন, “তাইতো, তোমরা আজ আসিলে; আর কিছুক্ষণ পরে আসিলে দেখা হইত না; আজ কলিকাতায় যাইতেছি, গাড়ি আনিতে গিয়াছে; সেখানে উৎসব, ব্রাহ্মদের উৎসব। যাহা হউক, দেখা যে হইল ইহাই ভাল, বস। দেখা না পাইয়া ফিরিয়া যাইলে মনে কষ্ট হইত।”

ঘরের মেজেতে একটি মাদুরে আমরা উপবেশন করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়, আপনি যেখানে যাইতেছেন সেখানে আমরা যাইলে কি প্রবেশ করিতে দিবে না?” ঠাকুর বলিলেন, “তাহা কেন? ইচ্ছা হইলে তোমরা অনায়াসে যাইতে পার–সিঁদুরিয়াপটি মণি মল্লিকের বাটী।” একজন নাতিকৃশ গৌরবর্ণ রক্তবস্ত্র-পরিহিত যুবক ঐ সময় গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, “ওরে, এদের মণি মল্লিকের বাটীর নম্বরটা বলিয়া দে তো।” যুবক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “৮১নং চিৎপুর রোড, সিঁদুরিয়াপটি।” যুবকের বিনীত স্বভাব ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি দেখিয়া আমাদের মনে হইল তিনি ঠাকুরবাড়ির কোন ভট্টাচার্যের পুত্র হইবেন। কিন্তু দুই-এক মাস পরে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া বাহির হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, আমাদের ধারণা ভুল হইয়াছিল। জানিয়াছিলাম, তাঁহার নাম বাবুরাম; বাটী তারকেশ্বরের নিকটে আঁটপুরে; কলিকাতায় কম্বুলিয়াটোলায় বাসাবাটীতে আছেন; মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া অবস্থান করেন। বলা বাহুল্য, ইনিই এক্ষণে স্বামী প্রেমানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিত।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঠাকুর বাবুরামকে নিজ গামছা, মশলার বটুয়া ও বস্ত্রাদি লইতে বলিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রণামপূর্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। বাবুরাম পূর্বোক্ত দ্রব্যসকল লইয়া গাড়ির অন্যদিকে উপবিষ্ট হইলেন। অন্য এক ব্যক্তিও সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম তাঁহার নাম প্রতাপচন্দ্র হাজরা।

ঠাকুর চলিয়া যাইবার পরেই আমরা সৌভাগ্যক্রমে একখানি গহনার নৌকা পাইয়া কলিকাতায় বড়বাজার ঘাটে উত্তীর্ণ হইলাম এবং উৎসব সন্ধ্যাকালে হইবে ভাবিয়া এক বন্ধুর বাসায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নবপরিচিত বৈকুণ্ঠনাথ যথাকালে উৎসবস্থলে দেখা হইবে বলিয়া কার্যবিশেষ সম্পন্ন করিতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইলেন।

মণি মল্লিকের বৈঠকখানায় অপূর্ব কীর্তন

প্রায় ৪টার সময় আমরা অন্বেষণ করিয়া মণিবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করায় এক ব্যক্তি আমাদিগকে উপরে বৈঠকখানায় যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঘরখানি উৎসবার্থে পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়াছে এবং

কয়েকটি ভক্ত পরস্পর কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মধ্যাহ্নে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়া গিয়াছে, সায়াহ্নে পুনরায় উপাসনা ও কীর্তনাদি হইবে এবং স্ত্রীভক্তদিগের অনুরোধে ঠাকুরকে কিছুক্ষণ হইল অন্দরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

উপাসনাদির বিলম্ব আছে শুনিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলাম। পরে সন্ধ্যা সমাগতা হইলে পুনরায় উৎসবস্থলে আগমন করিলাম। বাটীর সম্মুখের রাস্তায় পৌঁছিতেই মধুর সঙ্গীত ও মৃদঙ্গের রোল আমাদের কর্ণগোচর হইল। তখন কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে বুঝিয়া আমরা দ্রুতপদে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা বলিবার নহে। ঘরের ভিতরে-বাহিরে লোকের ভিড় লাগিয়াছে। প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে এবং পশ্চিমের ছাদে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে, সেই ভিড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করা এককালে অসাধ্য। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া গৃহমধ্যে ভক্তিপূর্ণ স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে; পার্শ্বে কে আছে না আছে তাহার সংজ্ঞা-মাত্র নাই। সম্মুখের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ অসম্ভব বুঝিয়া আমরা পশ্চিমের ছাদ দিয়া ঘুরিয়া বৈঠকখানার উত্তরের এক দ্বারপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। লোকের জনতা এখানে কিছু কম থাকায় কোনরূপে গৃহমধ্যে মাথা গলাইয়া দেখিলাম—অপূর্ব দৃশ্য!

ঠাকুরের অপূর্ব নৃত্য

গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখনও দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখনও বা ঐরূপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াস-গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গ-সংযমরাহিত্য নাই; আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখনও ধীরভাবে এবং কখনও দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর—ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। ঐরূপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখনও বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন; কখনও বা তাঁহার পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়া যাইতেছিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল; আবার কখনও বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, মৃদু-বৈরাগ্যবানকে তীব্রবৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান করিতেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেই ক্ষণের জন্য কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রমিত হইয়া তাহাদিগকে ভাববিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের তো কথাই নাই, অন্য ব্রাহ্ম-ভক্ত-সকলের অনেকেও সেদিন মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। আর সুকণ্ঠ আচার্য চিরঞ্জীব সেদিন একতারাসহায়ে 'নাচ্ রে আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে'—ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ঐরূপে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক কাল কীর্তনানন্দে অতিবাহিত হইলে, 'এমন মধুর

হরিনাম জগতে আনিল কে’ [3]—এই পদটি গীত হইয়া সকল ধর্মসম্প্রদায় ও ভক্ত্যাচার্যদিগকে প্রণাম করিয়া সেই অপূর্ব কীর্তনের বেগ সেদিন শান্ত হইয়াছিল।

আমাদের স্মরণ আছে, কীর্তনান্তে সকলে উপবিষ্ট হইলে ঠাকুর আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ‘হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে’ [4]—এই সঙ্গীতটি গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ভাবাবিষ্ট হইয়া উহা দুই-তিনবার মধুরভাবে গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রূপরসাদি বিষয় হইতে মন উঠাইয়া লইয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের পরম শান্তিলাভ হয়, এই প্রসঙ্গে ঠাকুর সম্মুখস্থ লোকদিগকে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। স্ত্রীভক্তেরাও তখন বৈঠকখানাগৃহের পূর্বভাগে চিকের আড়ালে থাকিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া উত্তরলাভে আনন্দিতা হইতে লাগিলেন। ঐরূপে প্রশ্ন সমাধান করিতে করিতে ঠাকুর প্রসঙ্গোত্থিত বিষয়ের দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিবার জন্য মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) নাম আরম্ভ করিলেন এবং একের পর অন্য করিয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-ভক্তগণ-রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত গাহিতে থাকিলেন। উহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত গীত কয়েকটি যে তিনি গাহিয়াছিলেন ইহা আমাদের বেশ স্মরণ আছে –

(১) মজল আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

(২) শ্যামাপদ-আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল।

(৩) এসব খ্যাপা মায়ের খেলা।

(৪) মন বেচারীর কি দোষ আছে।

তারে কেন দোষী কর মিছে॥

(৫) আমি ঐ খেদে খেদ করি।

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি॥

বিজয় গোস্বামীর সহিত ঠাকুরের রহস্যালাপ

ঠাকুর যখন ঐরূপে মার নাম করিতেছিলেন তখন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ গৃহান্তরে যাইয়া কতকগুলি ভক্তের নিকটে তুলসীদাসী রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। সায়াহ্ন-উপাসনার সময় উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উক্ত কার্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া তিনি এখন পুনরায় বৈঠকখানাগৃহে উপস্থিত হইলেন। বিজয়কে দেখিয়াই ঠাকুর বালকের ন্যায় রঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বিজয়ের আজকাল সঙ্কীর্তনে বিশেষ আনন্দ। কিন্তু সে যখন নাচে তখন আমার ভয় হয় পাছে ছাদসুদ্ধ উলটে যায়! (সকলের হাস্য)। হাঁগো, ঐরূপ একটি ঘটনা আমাদের দেশে সত্য সত্য হয়েছিল। সেখানে কাঠ-মাটি দিয়েই লোকে দোতলা করে। এক গোস্বামী শিষ্যবাড়ি উপস্থিত হয়ে ঐরূপ দোতলায় কীর্তন আরম্ভ করেন। কীর্তন জমতেই নাচ আরম্ভ হলো। এখন, গোস্বামী ছিলেন (বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) তোমারই মতন একটু হৃষ্টপুষ্ট। কিছুক্ষণ নাচবার পরেই ছাদ ভেঙে তিনি একেবারে একতলায় হাজির! তাই ভয় হয়, পাছে তোমার নাচে সেইরূপ হয়।” (সকলের হাস্য)। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের গেরুয়া বস্ত্রধারণ লক্ষ্য করিয়া এইবার বলিতে লাগিলেন, “আজকাল এঁর (বিজয়ের) গেরুয়ার উপরেও খুব অনুরাগ। লোকে কেবল কাপড়-চাদর গেরুয়া করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা মায় জুতা জোড়াটা পর্যন্ত গেরুয়ায় রাঙিয়েছে। তা ভাল, একটা অবস্থা হয় যখন ঐরূপ করতে ইচ্ছা হয়—গেরুয়া ছাড়া অন্য কিছু পরতে ইচ্ছা হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই গেরুয়া সাধককে

স্মরণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে ব্রতী হয়েছে।” গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এইবার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করিলেন, “ওঁ শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি হউক তোমার।”

ঠাকুরের ভক্তের প্রতি ভালবাসা

ঠাকুর যখন মা-র নাম করিতেছিলেন, তখন আর একটি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহাতে বুঝিতে পারা যায়, অন্তর্মুখে সর্বদা অবস্থান করিলেও তাঁহার বহির্বিষয় লক্ষ্য করিবার শক্তি কতদূর তীক্ষ্ণ ছিল। গান গাহিতে গাহিতে বাবুরামের মুখের প্রতি দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, সে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছে। তাঁহার অগ্রে সে কখনই ভোজন করিবে না এ কথা জানিয়া, তিনি নিজে খাইবেন বলিয়া কতকগুলি সন্দেশ ও এক গেলাস জল আনয়ন করাইয়াছিলেন, এবং উহার কণামাত্র স্বয়ং গ্রহণপূর্বক অধিকাংশ শ্রীযুত বাবুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট উপস্থিত ভক্তসকলে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

বিজয় প্রণাম করিয়া সায়াহ্নের উপাসনা করিতে নিম্নে আসিবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে আহার করিতে অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা ঐ অবকাশে শ্রীযুক্ত বিজয়ের উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম উঠানেই একত্রে উপাসনার অধিবেশন হইয়াছে এবং উহার উত্তরপার্শ্বের দালানে বেদিকার উপরে বসিয়া আচার্য বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তসকলের সহিত সমস্বরে ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের মহিমা স্মরণপূর্বক উপাসনা আরম্ভ করিতেছেন। উপাসনাকার্য ঐরূপে কিছুক্ষণ চলিবার পরে ঠাকুর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং অন্যসকলের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া উহাতে যোগদান করিলেন। প্রায় দশ-পনর মিনিট তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার জন্য গাড়ি আনয়ন করিতে বলিলেন। পরে হিম লাগিবার ভয়ে মোজা, জামা ও কানঢাকা টুপি ধারণ করিয়া তিনি বাবুরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে সভাস্থল পরিত্যাগপূর্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙঘকে সম্বোধন করিয়া যথারীতি উপদেশপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত অবকাশে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া আমরাও গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

মণি মল্লিকের ভক্ত-পরিবার

ঐরূপে ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুর যেভাবে আনন্দ করিতেন তাহার পরিচয় আমরা এই দিবসে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মণিবাবু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যে তৎকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধতি অনুসারে দৈনিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেন, ইহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। ইঁহারই পরিবারস্থ একজন রমণী উপাসনাকালে মন স্থির করিতে পারেন না জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কাহার কথা ঐ কালে মনে উদিত হয় বল দেখি?” রমণী অল্পবয়স্ক নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালনপালন করিতেছেন এবং তাহারই কথা তাঁহার অন্তরে সর্বদা উদিত হয় জানিতে পারিয়া, ঠাকুর তাঁহাকে ঐ বালককেই বাল-শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি জানিয়া সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। রমণী ঠাকুরের ঐরূপ উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে করিতে কিছুকালের মধ্যেই ভাবসমাধিস্থা হইয়াছিলেন। এ কথা আমরা ‘লীলাপ্রসঙ্গ’-এর অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।[5] সে যাহা হউক, ঠাকুরকে আমরা অন্য এক দিবস কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তকে লইয়া অন্যত্র আনন্দ করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই চিত্রই এখন পাঠকের সম্মুখে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

[1] বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুত বলরাম বসু।

[2] কুমিল্লানিবাসী শ্রীযুত বরদাসুন্দর পাল এবং চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়ানিবাসী শ্রীযুত হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)।

[3] গীতটি আমাদের যতদূর মনে আছে নিম্নে প্রদান করিতেছি –
এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে।
এ নাম নিতাই এনেছে, না হয় গৌর এনেছে,
না হয় শান্তিপুরের অদ্বৈত সেই এনেছে।
[4] হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
(একবার) লুটয় অবনীতল হরি হরি বলে কাঁদ্ রে।
(গতি কর কর বলে)
গভীর নিনাদে হরি হরি নামে গগন ছাও রে।
নাচ হরি বলে দুবাহু তুলে হরিনাম বিলাও রে।
(লোকের দ্বারে দ্বারে)
হরি-প্রেমানন্দরসে, অনুদিন ভাস রে।
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম,
(যত) নীচ বাসনা নাশ রে।
(প্রেমানন্দে মেতে)
[5] গুরুভাব, পূর্বার্ধ – প্রথম অধ্যায় দেখ।

৫.৫. প্রথম অধ্যায়–তৃতীয় পাদ: জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

জয়গোপাল সেনের বাটী

সিঁদুরিয়াপটির মণিমোহনের বাটীতে ঠাকুরের কীর্তনানন্দ ও ভাবাবেশ দেখিয়া আমরাই যে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব নূতন আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা নহে, বন্ধুবর বরদাসুন্দরও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং আবার কবে কোথায় আসিয়া ঠাকুর ঐরূপে আনন্দ করিবেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ চেষ্টা ফলবতী হইতে বিলম্ব হয় নাই। কারণ, উহার দুই দিবস পরে ১৩ অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ২৮ নভেম্বর, বুধবার প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "আজ অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কমল-কুটিরে কেশববাবুকে দেখিতে আসিবেন এবং পরে সন্ধ্যাকালে মাথাঘষা পল্লীর জয়গোপাল সেনের বাটীতে আগমন করিবেন, দেখিতে যাইবে কি?" শ্রীযুত কেশব তখন বিশেষ অসুস্থ, এ কথা আমাদিগের জানা ছিল। সুতরাং আমাদিগের ন্যায় অপরিচিত ব্যক্তি কমল-কুটিরে গমন করিলে বিরক্তির কারণ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আমরা সন্ধ্যায় শ্রীযুত জয়গোপালের বাটীতেই ঠাকুরকে দেখিতে যাইবার কথা স্থির করিলাম।

মাথাঘষা পল্লী বড়বাজারের কোন অংশের নাম হইবে ভাবিয়া আমরা সেখানেই প্রথমে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে শ্রীযুত জয়গোপালের ভবনে পৌঁছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মণিমোহনের বাটীতে উৎসবের দিনের ন্যায় আজও বৈকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। কারণ, বেশ মনে আছে, রাস্তায় কাদা ভাঙিতে ভাঙিতে

আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছিলাম। এ কথাও স্মরণ হয় যে, মণিমোহনের বাটীর ন্যায় জয়গোপালবাবুর ভবনও পশ্চিমদ্বারী ছিল এবং পূর্বমুখী হইয়া আমরা উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রবেশ করিয়াই এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া আমরা ঠাকুর আসিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনিও তাহাতে আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া পূর্বের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রশস্ত বৈঠকখানায় যাইতে বলিয়াছিলেন। দ্বিতলে উক্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত; বসিবার জন্য মেঝেতে ঢালাও বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে এবং উহারই একাংশে ঠাকুর কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত-পরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নববিধান-সমাজের আচার্যদ্বয় শ্রীযুত চিরঞ্জীব শর্মা ও শ্রীযুত অমৃতলাল বসু যে তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন, এ কথা স্মরণ হয়। তদ্ভিন্ন গৃহস্বামী শ্রীযুত জয়গোপাল ও তাঁহার ভ্রাতা, পল্লীবাসী তাঁহার বন্ধু দুই-তিনজন এবং ঠাকুরের সহিত সমাগত তাঁহার দুই-একটি ভক্তও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মনে হয়, 'হুট্‌কো' বলিয়া ঠাকুর যাঁহাকে নির্দেশ করিতেন, সেই 'ছোটগোপাল' নামক যুবক ভক্তটিকেও সেদিন তথায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। ঐরূপে দশ-বারোজন মাত্র ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকটে সেদিন উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম, অদ্যকার সম্মিলন সাধারণের জন্য নহে এবং এখানে আমাদিগের এইরূপে আসাটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। সেজন্য সকলকে আহার করিতে ডাকিবার কিছু পূর্বে আমরা এখান হইতে সরিয়া পড়িব, এইরূপ পরামর্শ যে আমরা স্থির করিয়াছিলাম, এ কথা স্মরণ হয়।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রণাম করিলাম এবং "তোমরা এখানে কেমন করিয়া আসিলে"—তাঁহার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "সংবাদ পাইয়াছিলাম আপনি আজ এখানে আসিবেন, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।" তিনি ঐরূপ উত্তরশ্রবণে প্রসন্ন হইলেন বলিয়া বোধ হইল এবং আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। তখন নিশ্চিন্তমনে উপবিষ্ট হইয়া আমরা সকলকে লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহার উপদেশ-গর্ভ কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম।

ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালী

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ইতঃপূর্বে অল্পকালমাত্র লাভ করিলেও তাঁহার অমৃতময়ী বাণীর অপূর্ব আকর্ষণ আমরা প্রথম দিন হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। উহার কারণ তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও এখন বুঝিতে পারি, তাঁহার উপদেশ দিবার প্রণালী কতদূর স্বতন্ত্র ছিল। উহাতে আড়ম্বর ছিল না, তর্কযুক্তির ছটা, অথবা বাছা বাছা বাক্যবিন্যাস ছিল না, স্বল্পভাবকে ভাষার সাহায্যে ফেনাইয়া অধিক দেখাইবার প্রয়াস ছিল না, কিংবা দার্শনিক সূত্রকারদিগের ন্যায় স্বল্পাক্ষরে যতদূর সাধ্য অধিক ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাও ছিল না। ভাবময় ঠাকুর ভাষার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতেন কি না বলিতে পারি না, তবে যিনি তাঁহার কথা একদিনও শুনিয়াছেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন অন্তরের ভাব শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য তিনি কিরূপে তাঁহাদিগের জীবনে নিত্যপরিচিত পদার্থ ও ঘটনাসকলকে উপমাস্বরূপে অবলম্বন করিয়া চিত্রের পর চিত্র আনিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ধারণ করিতেন। শ্রোতৃবর্গও উহাতে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যেন তাঁহাদিগের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার কথার সত্যতায় এককালে নিঃসন্দেহ ও পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেন। ঐসকল চিত্র তাঁহার মনে তখনি তখনি কিরূপে উদিত হইত, এই বিষয় অনুধাবন করিতে যাইয়া আমরা তাঁহার অপূর্ব স্মৃতিকে, অদ্‌ভুত মেধাকে, তীক্ষ্ণ দর্শনশক্তিকে অথবা অদৃষ্টপূর্ব প্রত্যুত্‌পন্নমতিত্বকে কারণস্বরূপে নির্দেশ করিয়া থাকি। ঠাকুর কিন্তু একমাত্র মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপাকেই উহার কারণ বলিয়া সর্বদা নির্দেশ করিতেন; বলিতেন, "মায়ের উপরে যে একান্ত নির্ভর করে, মা তাহার অন্তরে বসিয়া যাহা বলিতে হইবে, তাহা অভ্রান্ত ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলাইয়া থাকেন; এবং স্বয়ং তিনি (শ্রীশ্রীজগদম্বা) ঐরূপ করেন বলিয়াই তাহার জ্ঞানভাণ্ডার কখনও শূন্য হইয়া যায় না। মা তাহার অন্তরে জ্ঞানের রাশি ঠেলিয়া

দিয়া সর্বদা পূর্ণ করিয়া রাখেন; সে যতই কেন ব্যয় করুক না, উহা কখনও শূন্য হইয়া যায় না।" ঐ বিষয়টি বুঝাইতে যাইয়া তিনি একদিন নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন -

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর উত্তর পার্শ্বেই ইংরাজ-রাজের বারুদ-গুদাম বিদ্যমান আছে। কতকগুলি সিপাহী তথায় নিয়ত-পাহারা দিবার জন্য থাকে। উহারা সকলে ঠাকুরকে নিরতিশয় ভক্তি করিত এবং কখনও কখনও তাঁহাকে তাহাদিগের বাসায় লইয়া যাইয়া ধর্মবিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন তাহারা প্রশ্ন করিল, 'সংসারে মানব কিভাবে থাকিলে তাহার ধর্মলাভ হইবে?' অমনি দেখিতেছি কি, কোথা হইতে সহসা একটি ঢেঁকির চিত্র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। ঢেঁকিতে শস্য কুটা হইতেছে এবং একজন সন্তর্পণে উহার গড়ে শস্যগুলি ঠেলিয়া দিতেছে, দেখিয়াই বুঝিলাম, মা বুঝাইয়া দিতেছেন, ঐরূপে সতর্কভাবে সংসারে থাকিতে হইবে। ঢেঁকির গড়ের সম্মুখে বসিয়া যে শস্য ঠেলিয়া দিতেছে, তাহার যেমন সর্বদা দৃষ্টি আছে, যাহাতে তাহার হাতের উপর ঢেঁকির মুষলটি না পড়ে, সেইরূপ সংসারের প্রত্যেক কাজ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, ইহা আমার সংসার বা আমার কাজ নহে, তবেই বন্ধনে পড়িয়া আহত ও বিনষ্ট হইবে না। ঢেঁকির ছবি দেখিবামাত্র, মা মনে ঐ কথার উদয় করিয়া দিলেন এবং উহাই তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারাও উহা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। লোকের সহিত কথা বলিবার কালে ঐরূপ ছবিসকল সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

তাঁহার উপদেশপ্রণালীর অন্য বিশেষত্ব

ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালীতে অন্য বিশেষত্ব যাহা লক্ষিত হইত, তাহা এই যে—তিনি বাজে বকিয়া কখনও শ্রোতার মন গুলাইয়া দিতেন না। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের বিষয় ও উদ্দেশ্য ধরিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্ত-বাক্যে উহার উত্তর প্রদান করিতেন এবং উহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পূর্বোক্তভাবেই উপমাস্বরূপে চিত্রসকল তাহার সম্মুখে ধারণ করিতেন। উপদেশ-প্রণালীর এই বিশেষত্বকে আমরা সিদ্ধান্ত-বাক্যের প্রয়োগ বলিয়া নির্দেশ করিতেছি; কারণ প্রশ্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে তিনি যাহা মনে জ্ঞানে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই কেবলমাত্র বলিতেন, এবং ঐ বিষয়ের অপর কোনরূপ মীমাংসা যে হইতে পারে না, এ কথা তিনি মুখে না বলিলেও তাঁহার অসঙ্কোচ বিশ্বাসে উহা শ্রোতার মনে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া যাইত। পূর্ব শিক্ষা ও সংস্কারবশতঃ যদি কোন শ্রোতা তাঁহার সাধনালব্ধ মীমাংসাগুলি গ্রহণ না করিয়া বিরুদ্ধ তর্কযুক্তির অবতারণা করিত, তাহা হইলে অনেক স্থলে তিনি "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়া নাও না", বলিয়া নিরস্ত হইতেন। ঐরূপে কখনও তিনি শ্রোতার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপপূর্বক কাহারও ভাবভঙ্গে উদ্যত হইতেন না। ভগবদিচ্ছায় শ্রোতা উন্নত অবস্থান্তরে যতদিন না পৌঁছিতেছে, ততদিন প্রশ্নোক্ত বিষয়ের যথার্থ সমাধান তাহার দ্বারা হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়াই কি তিনি নিবৃত্ত হইতেন?—বোধ হয়।

আবার তাঁহার সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল হৃদয়ঙ্গম করাইতে ঠাকুর পূর্বোক্তভাবে কেবলমাত্র উপমা ও চিত্রসকলের উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু প্রশ্নোক্ত বিষয়ের তিনি যে মীমাংসা প্রদান করিতেছেন, অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধকেরাও তৎসম্বন্ধে ঐরূপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতাদি গাহিয়া এবং কখনও কখনও শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তসকল শ্রোতাকে শুনাইয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, উহাতে উক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এবং উহার দৃঢ় ধারণাপূর্বক সে তদনুসারে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইত।

উপলব্ধি-রহিত বাক্যচ্ছটায় ঠাকুরের বিরক্তি

আর একটি কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গের চরমেই সাধক উপাস্যের সহিত নিজ অভেদত্ব উপলব্ধি করিয়া অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা ঠাকুর বারংবার

আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। "শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান এক (পদার্থ)"—"সেখানে (চরম অবস্থায়) সব শিয়ালের এক রা (একই প্রকারের উপলব্ধির কথা বলা)"—ইত্যাদি তাঁহার উক্তিসকল ঐ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে। ঐরূপে অদ্বৈতবিজ্ঞানকে চরম বলিয়া নির্দেশ করিলেও তিনি রূপরসাদি বিষয়ভোগে নিরন্তর ব্যস্ত সংসারী মানব-সাধারণকে বিশিষ্টাদ্বৈত-তত্ত্বের কথাই সর্বদা উপদেশ করিতেন এবং কখনও কখনও দ্বৈতভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কথাও বলিতে ছাড়িতেন না। ভিতরে ঈশ্বরে তাদৃশ অনুরাগ এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকলের উপলব্ধি নাই, অথচ মুখে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতের উচ্চ উচ্চ কথাসকল উচ্চারণ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখিলে তাঁহার বিষম বিরক্তি উপস্থিত হইত এবং কখনও কখনও অতি কঠোর বাক্যে তাহাদিগের ঐরূপ কার্যকে নিন্দা করিতে তিনি সঙ্‌কুচিত হইতেন না। আমাদিগের বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পঞ্চদশী-টশী পড়েছ?" বৈকুণ্ঠ তাহাতে উত্তর করেন, "সে কার নাম মহাশয়, আমি জানি না।" শুনিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঁচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে ঐসব পড়ে আসে; কিছু করবে না, অথচ আমার হাড় জ্বালায়।"

সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর-সাধনা সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ

পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন, অদ্য শ্রীযুত জয়গোপালের বাটীতে ঠাকুরকে এক ব্যক্তি 'সংসারে আমরা কিরূপে থাকিলে ঈশ্বর-কৃপার অধিকারী হইতে পারিব'—এইরূপ প্রশ্নবিশেষ করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মত তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং তিন-চারিটি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে গাহিয়া ঐ কথার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথার সারসংক্ষেপ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

মানব যতদিন সংসারটাকে 'আমার' বলিয়া দেখিয়া কার্যানুষ্ঠান করে, ততদিন উহাকে অনিত্য বলিয়া বোধ করিলেও সে উহাতে আবদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং ইচ্ছা করিলেও উহা হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখিতে পায় না। ঐরূপ বলিয়াই ঠাকুর গাহিয়াছিলেন, "এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে; ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জানতে পারে" ইত্যাদি। অতএব এই অনিত্য সংসারকে ভগবানের সহিত যোগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—এক হাতে তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া থাকিয়া অপর হাতে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহার (ঈশ্বরের), আমার নহে। ঐরূপ করিলে মায়া-মমতাদিতে কষ্ট পাইতে হইবে না এবং যাহা কিছু করিতেছি, তাঁহার কর্মই করিতেছি, এইরূপ ধারণার উদয় হইয়া মন তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইবে। পূর্বোক্ত কথাগুলি বুঝাইতে ঠাকুর গাহিলেন, "মন রে কৃষিকাজ জান না" ইত্যাদি। গীত সাঙ্গ হইলে আবার বলিতে লাগিলেন, "ঐরূপে ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সংসার করিলে ক্রমে ধারণা হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহারই (ঈশ্বরের) অংশ। তখন সাধক পিতা-মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরীজ্ঞানে সেবা করিবে, পুত্র-কন্যার ভিতর বালগোপাল ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ দেখিবে, অপর সকলকে নারায়ণের অংশ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ব্যবহার করিবে। ঐরূপ ভাব লইয়া যিনি সংসার করেন, তিনিই আদর্শ-সংসারী এবং তাঁহার মন হইতে মৃত্যুভয় এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তি বিরল হইলেও একেবারে যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে।" পরে, ঐরূপ আদর্শে উপনীত হইবার উপায় নির্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "বিবেক-বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে যাইয়া সংযত চিত্তে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয়; তবেই মানব পূর্বোক্ত আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারে।" [1] ঐরূপে উপায় নির্দেশ করিয়া ঠাকুর নিম্নলিখিত রামপ্রসাদী গীতটি গাহিয়াছিলেন, 'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' আবার, 'বিবেক-বুদ্ধি' কথাটি প্রয়োগ করিয়াই ঠাকুর উহা কাহাকে

বলে, সে কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐরূপ বুদ্ধির সহায়ে সাধক ঈশ্বরকে নিত্য ও সারবস্তু বলিয়া গ্রহণ করে এবং রূপরসাদির সমষ্টিভূত জগৎকে অনিত্য ও অসার জানিয়া পরিত্যাগ করে। ঐরূপে নিত্য বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার পরে কিন্তু ঐ বুদ্ধিই তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, যিনি নিত্য তিনিই লীলায় জীব ও জগৎরূপ নানা মূর্তি ধারণ করিয়াছেন এবং ঐরূপ বুঝিয়াই সাধক চরমে ঈশ্বরকে নিত্য ও লীলাময় উভয়ভাবে দেখিতে সমর্থ হয়।

কীর্তনানন্দ

অনন্তর আচার্য চিরঞ্জীব একতারা-সহায়ে “আমায় দে মা পাগল করে” সঙ্গীতটি গাহিতে লাগিলেন এবং সকলে তাঁহার অনুসারী হইয়া উহার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঐরূপে কীর্তন আরম্ভ হইলে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন অন্য সকলেও ঠাকুরকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কীর্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ গানটি সাঙ্গ করিয়া শ্রীযুত চিরঞ্জীব “চিদাকাশে হ’ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় রে” গানটি আরম্ভ করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত উক্ত গীতটি গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিবার পর, ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিয়া সেদিনকার কীর্তন শান্ত হইল ও সকলে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই দিনেও ঠাকুর মধুরভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুত মণিমোহনের বাটীতে তাঁহার যেরূপ বহুকালব্যাপী গভীর ভাবাবেশ দেখিয়াছিলাম, অদ্য এখানে ততটা হয় নাই। কীর্তনান্তে উপবেশন করিয়া ঠাকুর শ্রীযুত চিরঞ্জীবকে বলিয়াছিলেন, “তোমার এ গানটি (‘চিদাকাশে হ’ল’ ইত্যাদি)[2]যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন কেহ উহা গাহিবামাত্র (ভাবাবিষ্ট হইয়া) দেখিতাম, এত বড় জীবন্ত পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হইতেছে!”

অনন্তর শ্রীযুত কেশবের ব্যাধি সম্বন্ধে শ্রীযুত জয়গোপাল ও চিরঞ্জীবের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা হইতে লাগিল। আমাদের স্মরণ আছে, শ্রীযুত রাখালের[3] শরীর সম্প্রতি খারাপ হইয়াছে, এই কথা ঠাকুর এই সময়ে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত জয়গোপাল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রকে যে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং ব্রাহ্মসঙ্ঘের সকলের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহ। কলিকাতার নিকটবর্তী বেলঘরিয়া নামক স্থানে ইঁহার উদ্যানে শ্রীযুত কেশব কখনও কখনও সদলবলে যাইয়া সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতেন এবং ঐ উদ্যানে ঐরূপ এক সময়ে ঠাকুরের সহিত প্রথম সম্মিলিত হইয়াই তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিকতা ক্রমে গভীরভাব ধারণ করিয়া উহাতে নববিধানরূপ সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। জয়গোপালও ঐদিন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কখনও দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট গমন করিয়া, কখনও বা নিজ বাটীতে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া ধর্মালাপে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুরের কলিকাতায় আসিবার গাড়িভাড়ার অনেকাংশ শ্রীযুত জয়গোপাল এক সময়ে বহন করিতেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

অনন্তর রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐদিন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

[1] ঠাকুরের অদ্যকার কথার সারসংক্ষেপের কিয়দংশের জন্য আমরা শ্রদ্ধাস্পদ ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-কারের নিকট ঋণী রহিলাম।

[2] চিদাকাশে হ’ল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে
(জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময়।
(আহা) চারিদিকে ঝলমল, করে ভক্ত-গ্রহদল,

ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময়। (হরি)
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি,
নব-বিধান বসন্ত-সমীরণ বয়;
(কিবা) ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়।
ভবসিন্ধু-জলে, 'বিধান' -কমলে,
আনন্দময়ী বিরাজে;
(কিবা) আবেশে আকুল, ভক্ত-অলিকুল,
পিয়ে সুধা তার মাঝে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন, ভুবনমোহন চিত্তবিনোদন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়া মগন;
(কিবা) অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়। (রে)
[3] স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে এখন যিনি শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসঙেঘ পরিচিত আছেন।

৫.৬. দ্বিতীয় অধ্যায়: পূর্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে ঠাকুরও কিছু শিখিয়াছিলেন

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য কেশবচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ, চিরঞ্জীব, অমৃতলাল, গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি নেতাসকল ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও সঙ্গলাভে স্বধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগরূপ আদর্শের মহত্ত্ব বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতঃপূর্বে অনেকটা বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের সংসর্গে আসিয়া অপরোক্ষ-বিজ্ঞানসম্পন্ন, ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কি কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণভক্তবৃন্দের অনেকে ঐ কথায় 'না' শব্দ উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে সর্বত্র আদানপ্রদানের নিয়ম চির-বর্তমান। একান্ত অনভিজ্ঞ তরলমতি বালককে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া কোন্ ভাবে উপদেশ দিলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি উপদিষ্ট বিষয় শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে, তাহার পূর্বসংস্কারসমূহ ঐ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার পথে কতদূর সহায় বা অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, এবং তৎসমুদয়ের অপনোদনই বা কিরূপে হওয়া সম্ভব ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা শিক্ষা করিয়া থাকি। অতএব পাশ্চাত্যভাব ও শিক্ষারূপ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া ঠাকুর যে কিছুই শিক্ষা করেন নাই, এ কথা বলা নিঃসংশয় যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদিগের ধারণা সেজন্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমরা বলি, ব্রাহ্মসমাজ ও সঙেঘকে নিজ অলৌকিক সাধনলব্ধ ভাব ও আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসমূহ প্রদান করিতে যাইয়া ঠাকুর অনেক কথা স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব উহার ফলে তিনি কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এখানে কর্তব্য।

পাশ্চাত্য ভাবসহায়ে ভারতবাসীর জীবন কতদূর পরিবর্তিত হইতেছে তাহার পরিচয়প্রাপ্তি

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে আসিবার পূর্বে ঠাকুর পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষার প্রভাব হইতে বহু দূরে নিজ জীবন যাপন করিতেছেন। পুণ্যবতী রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার নিকটে এ পর্যন্ত যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই তিনি সকাম প্রবৃত্তিমার্গে অথবা ভারতের সনাতন 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'-রূপ আদর্শ অবলম্বনে জীবন পরিচালিত করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট দেখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত মথুরানাথকে কিঞ্চিৎ বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন দেখিতে পাইলেও উক্ত ভাবে শিক্ষিত প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনই যে ঐরূপ বিপরীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, এ কথা ধারণা করিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। কারণ, তাঁহার পুণ্য-সঙ্গলাভে মথুরানাথের প্রকৃতি স্বল্পকালেই পরিবর্তিত হওয়ায় ঐ বিষয়ে চিন্তা করিবার তাঁহার আবশ্যকতাই হয় নাই। অতএব ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে আসিয়া, এবং ধর্মলাভে সচেষ্ট হইলেও, ভারতের প্রাচীন ত্যাগাদর্শ হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত দেখিয়াই তাঁহার মন উহার কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিল, এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা বর্তমান ভারতবাসীর জীবনে কিরূপ বিপরীত ভাবরাশি আনয়ন করিতেছে, তদ্বিষয়ে পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য মনীষিগণের শিক্ষার সহিত না মিলাইয়া ইহারা ভারতের ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল গ্রহণ করিবে না

ঠাকুর বোধ হয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন্ত ও সাক্ষাৎ-উপলব্ধ ধর্মভাবসকলের পরিচয় পাইয়া কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ স্বল্পকালেই ঐসকল সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াও যখন তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ছাড়াইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল, উক্ত প্রভাব তাঁহাদিগের মনে কতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন, পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মনীষিগণ ইঁহাদের অন্তরে গুরুর স্থান চিরকালের নিমিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের ভাব ও কথার সহিত না মিলাইয়া ইঁহারা ভারতের আপ্তকাম ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল কখনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্যই ঠাকুর ইঁহাদিগকে উপদেশ দিবার পরেই বলিতেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে গ্রহণ কর।" ইঁহাদিগের ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তিনি ইঁহাদিগকে ঐরূপে স্বাধীনতাপ্রদান করাতেই ইঁহারা তাঁহার ভাব ও প্রত্যক্ষসকল যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য।

জগদম্বার ইচ্ছায় ঐরূপ হইয়াছে জানিয়া ঠাকুরের নিশ্চিন্ত ভাব

ভারতের ঋষিদিগের সমষ্টীভূত ভাবঘনমূর্তি ঠাকুর কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। কারণ, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাকেই যিনি জগতের সর্ববিধ ঘটনার হেতু বলিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণপূর্বক যিনি আপনাকে সর্বাবস্থায় পরিচালিত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, সংসারের কোন ঘটনা তাঁহাকে কখনও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঐশী শক্তি মায়া নিজ স্বরূপ দেখাইয়া-বুঝাইয়া চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অচল অটল শান্তির অধিকারী করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই ভারতে পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই ব্রাহ্মপ্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যভাবের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলীস্বরূপ হওয়ার কথা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐরূপ দুর্বলতায় বিরক্তিপ্রকাশ অথবা তাঁহাদিগকে নিজ অপার স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিবেন কিরূপে? সুতরাং ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের ইঁহারা যতটা পারেন লউন, কালে শ্রীশ্রীজগদম্বা এমন লোক আনয়ন করিবেন—যিনি উক্ত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবেন, এ কথা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবিজ্ঞানের সমগ্র গ্রহণে ব্রাহ্মগণ অশক্ত বুঝিয়া ঠাকুর কি করিয়াছিলেন

আবার, ব্রাহ্মগণ তাঁহার সকল কথা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলের অংশমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। কিন্তু, ঈশ্বরার্থে সর্বস্ব ত্যাগ না করিলে তাঁহার পুণ্যদর্শন কখনই লাভ হইবে না–যত মত তত পথ–প্রত্যেক পথের চরমেই উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদত্বপ্রাপ্তি–মন মুখ এক করাই সাধন–এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া সদসৎ বিচারপূর্বক সর্বথা ফলকামনারহিত হইয়া সংসারে কর্তব্যকর্মসকলের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার পথ, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক জগতের সকল গূঢ় তত্ত্বই তিনি তাঁহাদিগের নিকটে সর্বদা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেন। কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্যপালন না করিলে দেহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হওয়া এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চ উপলব্ধিসকল প্রত্যক্ষ করা কখনও সম্ভবে না, এ কথা কেশবপ্রমুখ কাহাকেও কাহাকেও বুঝাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে তৎকরণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপে সকল কথা বারংবার বলিবার বুঝাইবার পরেও অনেকের ঐসকল ধারণা হইতেছে না দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইলে হৃদয়ে নূতন ভাব গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব–"কাঁটি উঠিবার পরে পাখিকে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম শিখাইতে প্রয়াস করিলে প্রায়ই উহা ব্যর্থ হয়" এবং পাশ্চাত্যের ইহকালসর্বস্ব জড়বাদের প্রভাবেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, রূপরসাদিভোগের ভাব যাহাদিগের মনে একবার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, ভারতের সনাতন ত্যাগাদর্শ গ্রহণপূর্বক তাহারা কখনও উহা জীবনে সম্যক পরিণত করিতে পারিবে না। সেইজন্যই তাঁহার প্রাণে এখন ব্যাকুল প্রার্থনার উদয় হইয়াছিল, 'মা, তোর ত্যাগী ভক্তদিগকে আনিয়া দে, যাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোর কথা বলিয়া আনন্দ করিতে পারি!' অতএব দৃঢ়সংস্কারবিহীন বালকদিগের মনই তাঁহার ভাব ও কথা সম্পূর্ণ গ্রহণপূর্বক উহাদিগের সত্যতা উপলব্ধি করিতে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইবে, এ কথা ঠাকুর এখন হইতে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে না।

ব্রাহ্মগণের দ্বারা কলিকাতাবাসীর মন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া; রাম ও মনোমোহনের আগমন ও আশ্রয়লাভ

সে যাহা হউক, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃগণ ঠাকুরের অভিনব আধ্যাত্মিক ভাব যতদূর গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহার ফলে তাঁহাদিগের ভিতর যে পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিতে কলিকাতার জনসাধারণের বিলম্ব হয় নাই। আবার, কেশবপ্রমুখ ব্যক্তিগণ যখন ব্রাহ্মমণ্ডলী-পরিচালিত সংবাদপত্র-সকলে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মতের অলৌকিকত্ব এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাণীসকলের কিছু কিছু প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন কলিকাতার জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পুণ্য-দর্শনলাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তসকল ঐরূপেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীযুত কেশবের সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের প্রায় চারি বৎসর পরে সন ১২৮৫ সালের, ইংরাজী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত মনোমোহন মিত্র নামক ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তদ্বয় কেশব-পরিচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার কথা পাঠ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ইঁহাদিগের জীবনে কিরূপ যুগান্তর ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুত রামচন্দ্র তৎকৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত'-শীর্ষক পুস্তকে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে এ কথা বলিলেই চলিবে যে, ঈশ্বরার্থে কাম-কাঞ্চন-ত্যাগরূপ ঠাকুরের জীবনাদর্শ সম্যক গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রভাবে ত্যাগের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে দুঃখোপার্জিত অর্থের অকাতর ব্যয় দেখিয়াই গৃহী ব্যক্তির ভক্তি-বিশ্বাসের তারতম্য অনেকাংশে নিরূপণ করিতে পারা যায়। প্রথমে গুরু এবং পরে ইষ্টস্থানে ঠাকুরকে বসাইয়া শ্রীযুত রামচন্দ্র তাঁহাকে ও তদ্ভক্তসকলকে কলিকাতার সিমলা নামক পল্লীস্থ নিজ ভবনে পুনঃপুনঃ আনয়নপূর্বক উৎসবাদিতে যেরূপ অকাতরে ব্যয় করিতেন, তাহা হইতে বুঝা যাইত, তাঁহার বিশ্বাস-ভক্তি ক্রমে

কত গভীর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কখনও বলিতেন, "রামকে এখন এত মুক্তহস্ত দেখিতেছ, যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন এমন কৃপণ ছিল যে, বলিবার নহে; এলাচ আনিতে বলিয়াছিলাম, তাহাতে একদিন এক পয়সার শুকনো এলাচ আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিল! রামের স্বভাবের কতদূর পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা ইহা হইতে বুঝ।"

ঠাকুরের অদ্ভুত দর্শন ও রাখালচন্দ্রের আগমন

ঠাকুর যখন আপনার জ্ঞানে রাম ও মনোমোহনকে নিজ অভয় আশ্রয়ে চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অহৈতুকী করুণার অধিকারী হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কতদূর কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। সংসারে ঐরূপ আশ্রয় যে কখনও পাওয়া সম্ভব, এ কথা তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সুতরাং তাঁহারা যে এখন নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব সকলকে উক্ত আশ্রয় গ্রহণ করাইতে প্রয়াসী হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? দেখিতেও পাওয়া যায়, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের বৎসরকালমধ্যেই তাঁহারা নিজ নিজ আত্মীয়-পরিজনবর্গকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ঐরূপে সন ১২৮৮ সালের শেষ ভাগ ইংরাজী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের লীলাসহচর ত্যাগী ভক্তবৃন্দ একে একে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে সুপরিচিত স্বামী ব্রহ্মানন্দই ঠাকুরের নিকটে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন।[1] পূর্বজীবনে ইঁহার নাম শ্রীরাখালচন্দ্র ছিল, শ্রীযুত মনোমোহনের ভগ্নীর সহিত ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উক্ত বিবাহের স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার পুত্র!'—শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'সে কি?—আমার আবার ছেলে কি?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন 'সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক!"

রাখালের বালকভাব

শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে অন্য এক সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন-চারি বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত! বাড়ি তো দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না। তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, সেজন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া এক-একবার বাড়িতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল; প্রথম প্রথম নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল—যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে; পরে যখন দেখিল, এখানে ধনী, বিদ্বান লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্য কখনও কখনও এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।"

রাখালের পত্নী

"শ্বশুরবাড়ির তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা সম্বন্ধে কখনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ, মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা, সকলের এখানে আসা-যাওয়া ছিল। রাখাল আসিবার কিছুকাল পরে যেদিন মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা বধূকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিল, সেদিন মনে হইল বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না তো?—ভাবিয়া, তাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইতে মাথার কেশ পর্যন্ত শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম এবং বুঝিলাম ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনও হইবে না। তখন

সন্তুষ্ট হইয়া নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে) বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।”

রাখালের বালকভাবের হানি

“আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, সে-ই অবাক হইয়া যাইত! আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি!—তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না! তখনি কিন্তু বলিয়াছিলাম বড় হইয়া স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিলে তাহার এই বালকের ন্যায় ভাবটি আর থাকিবে না।”

রাখালকে শাসন

“অন্যায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন কালীঘর হইতে প্রসাদী মাখন আনিলে সে ক্ষুধিত হইয়া আপনিই উহা লইয়া খাইয়াছিল! তাহাতে বলিয়াছিলাম, ‘তুই তো ভারি লোভী, এখানে আসিয়া কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করিবি, তাহা না হইয়া আপনিই মাখন লইয়া খাইলি?’ সে ভয়েই জড়সড় হইয়া গিয়াছিল ও আর কখনও ঐরূপ করে নাই।”

রাখালের মনে হিংসা ও ঠাকুরের ভয়

“রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখনও কখনও তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) যাহাদের এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।”

রাখালের শ্রীবৃন্দাবন গমন

“এখানে আসিবার প্রায় তিন বৎসর পরে রাখালের শরীর অসুস্থ হওয়ায় সে বলরামের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিল। উহার কিছু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তখন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ‘মা, ও (রাখাল) ছেলেমানুষ, বুঝে না, তাই কখনও কখনও অভিমান করে, যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান হইতে কিছুদিনের জন্য সরাইয়া দিস, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস।’ উহার অল্পকাল পরেই তাহার বৃন্দাবনে যাওয়া হয়।”

রাখালের অসুস্থতায় ঠাকুরের ভয়

“বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, ইতঃপূর্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল! যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীরত্যাগ করে। সেইজন্য ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মা-র নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন। ঐরূপে রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।” [2]

রাখালের ভবিষ্যৎ জীবন

ঐরূপে ঠাকুর তাঁহার প্রথমলব্ধ বালকভক্ত-সম্বন্ধে কত সময় কত বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মা তাঁহাকে তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক ধীর গম্ভীর সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ক্রমে ঈশ্বরার্থে সংসারের সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের আগমন

শ্রীমদ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের তিন-চারি মাস পরেই পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

[1] ত্যাগী ভক্তদের কেহ কেহ পূর্বেও আসিয়াছিলেন – 'কথামৃত', ১ম ভাগ, ৬ পৃঃ; 'লীলাপ্রসঙ্গ – সাধকভাব', পরিশিষ্ট, ২২ পৃঃ; 'ঐ গুরুভাব, পূর্বার্ধ', ২৯ পৃঃ; 'ভক্ত মনোমোহন', ৩২ পৃঃ; স্বামী তুরীয়ানন্দের ১৯।৯।১৭ তাঃ-এর পত্র দ্রষ্টব্য। – প্রঃ

[2] শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাসকল ঠাকুর একই সময়ে আমাদিগের নিকট না বলিলেও পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা ঐসকল এখানে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া দিলাম।

৫.৭. তৃতীয় অধ্যায়: নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

দিব্যভাবারূঢ় ঠাকুরের মানসিক অবস্থার আলোচনা

বেদপ্রমুখ শাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বজ্ঞ হয়েন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন–ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের এইকালের আচরণ দেখিয়া পূর্বোক্ত শাস্ত্রবাক্য ধ্রুবসত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দেখা যায়, তিনি যে এখন কেবলমাত্র ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ উভয় ভাবের এবং ব্রহ্মশক্তি মায়ার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত হইয়া সকলপ্রকার সংশয় ও মলিনতার পরপারে গমনপূর্বক স্বয়ং সদানন্দে অবস্থান করিতেছেন তাহা নহে; কিন্তু ভাবমুখে সর্বদা অবস্থানপূর্বক মায়ার রাজ্যের যে গূঢ় রহস্য যখনই জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন তখনই তাহা জানিতে পারিতেছেন। তাঁহার সুসূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মনের সম্মুখে উহা আর নিজস্বরূপ গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ঐরূপ হইবারই কথা। কারণ, ভাবমুখ ও মায়াধীশ ঈশ্বরের বিরাট মন–যাহাতে বিশ্বরূপ-কল্পনা কখনও প্রকাশিত এবং কখনও বিলুপ্তভাবে অবস্থান করে–উভয় একই পদার্থ; এবং যিনি আপনার ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রমপূর্বক উহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বিরাট মনে উদিত সমুদয় কল্পনাই তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়। উক্ত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগের আগমনের পূর্বেই নিজ পূর্ব পূর্ব জন্মসকলের কথা জানিয়া লইয়াছিলেন। বিরাট মনের কোন্ বিশেষ লীলাপ্রকাশের জন্য তাঁহার বর্তমান শরীরধারণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত লীলার পুষ্টির জন্য কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর সাধক ব্যক্তি ঈশ্বরেচ্ছায় জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন, এ কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই লীলাপ্রকাশে তাঁহাকে অল্পাধিক সহায়তা করিবেন এবং কাঁহারাই বা তাহার ফলভোগীমাত্র হইয়া কৃতার্থ হইবেন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ঐসকল ভক্তের আগমন-কাল সন্নিকটে জানিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মায়ার রাজ্যের অন্তরে থাকিয়া পূর্বোক্ত গূঢ় রহস্যসকল যিনি জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

সুরেন্দ্রের বাটীতে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের পরস্পরকে প্রথম দর্শন

নিজ চিহ্নিত ভক্তসকলের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া দিব্যভাবারূঢ় ঠাকুর এই কালে তাহাদিগের জন্য কিরূপ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের তাঁহার নিকটে প্রথমাগমনের কথা অনুধাবন করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন,

ঠাকুরের নিকটে তাঁহার আগমনের প্রায় সমসমান কালে কলিকাতার সিমলা নামক পল্লীনিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শ্রীযুত সুরেন্দ্র ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং স্বল্পকালেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্য নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পরস্পর পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা ঐরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন সন ১২৮৮ সালের হেমন্তের শেষভাগ–ইং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হইবে; এবং অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক নরেন্দ্রনাথ ঐ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্.এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে ঠাকুরের আমন্ত্রণ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবামাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে নিকটে আহ্বানপূর্বক সুগায়ক যুবকের পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিবস তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সকাশে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে স্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত দুই-একটি কথা কহিয়া অবিলম্বে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের বিবাহ করিতে অসম্মতি ও দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্.এ. পরীক্ষা হইয়া গেল এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা শহরের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, পাত্রী শ্যামবর্ণা ছিল বলিয়া তাঁহার পিতা উক্ত বিবাহে দশ সহস্র মুদ্রা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্তপ্রমুখ নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়বর্গ তাঁহার পিতার প্রেরণায় তাঁহাকে উক্ত বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিষম আপত্তিতে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই। রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের পিতার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে চিকিৎসক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। ধর্মভাবের প্রেরণা হইতে নরেন্দ্র বিবাহ করিলেন না, একথা বুঝিতে পারিয়া তিনি তখন তাঁহাকে একদিবস বলিয়াছিলেন, "যদি ধর্মলাভ করিতে তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থলে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে চল।" প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথও তাঁহাকে এই সময়ে একদিবস তাঁহার সহিত গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত হইয়া দুই-তিনজন বয়স্য সমভিব্যাহারে সুরেন্দ্রনাথের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল

নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঐ দিবস ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা তিনি একদিন সংক্ষেপে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন –

"পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থেই ইতর-সাধারণের মতো একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলগা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করিয়া টানিয়া

রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে!

"মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে সেদিন দুই-চারিজন আলাপী ছোকরাও আসিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়; ভোগের দিকেই দৃষ্টি।"

নরেন্দ্রের গান

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙলা গান সে দুই-চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' [1] গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।"

নরেন্দ্রকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের ব্যাকুলতা

"পরে সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে, বলিবার নহে। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা যেন কে গামছা নিংড়াইবার মতো জোর করিয়া নিংড়াইতেছে! তখন আপনাকে আর সামলাইতে পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশের ঝাউতলায়, যেখানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া 'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম! খানিকটা এইরূপে কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম! ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ঐরূপ হইয়াছিল! আর সব ছেলেরা যারা এখানে আসিয়াছে, তাদের কাহারও কাহারও জন্য কখনও কখনও মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে।"

ঠাকুরের ঐ দিবসের কথা ও ব্যবহার সম্বন্ধে নরেন্দ্রের বিবরণ

নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া ঠাকুরের মনে যে অপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার অনেকটা ঢাকিয়া যে তিনি ঐরূপে আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ একদিন উক্ত দিবসের কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন –

"গান তো গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তরে-হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারাণ্ডার থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল; সুতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারান্দায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!'—ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মতো আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি!"

নরেন্দ্রের পুনরায় আসিবার প্রতিশ্রুতি

"আমি তো তাঁহার ঐরূপ আচরণে একেবারে নির্বাক–স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ তো একেবারে উন্মাদ–না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে খাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইগে', তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও।'–বলিয়া সকলগুলি আমাকে খাওয়াইয়া তবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকটে একাকী আসিবে?' তাঁহার ঐরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আসিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।"

প্রথম দর্শনে ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের ধারণা–ইনি অর্ধোন্মাদ কিন্তু ঈশ্বরার্থে যথার্থই সর্বস্বত্যাগী

"বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চালচলনে, কথাবার্তায় অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মতো কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল সত্য সত্যই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন। 'তোমাদিগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাদিগের সহিত যেমন কথা কহিতেছি, এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু ঐরূপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চক্ষের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য ঐরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরূপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরূপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে দেখা দেন'–তাঁহার মুখে ঐসকল কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্মপ্রচারকসকলের ন্যায় কল্পনা বা রূপকের সহায়তা লইয়া ঐরূপ বলিতেছেন না, সত্য সত্যই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। তখন তাঁহার ইতঃপূর্বের আচরণের সহিত ঐসকল কথার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া এবারক্রম্বিপ্রমুখ ইংরাজ দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে যে-সকল অর্ধোন্মাদের (monomaniac) উল্লেখ করিয়াছেন, সেইসকল দৃষ্টান্ত মনে উদিত হইল এবং দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম, ইনিও ঐরূপ হইয়াছেন। ঐরূপ নিশ্চয় করিয়াও কিন্তু ইঁহার ঈশ্বরার্থে অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলাম না। নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐজন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণবন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।"

যাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুরের মনে ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাঁহার পূর্বকথা পাঠকের জানিবার স্বতই কৌতূহল হইবে, এজন্য আমরা এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নরেন্দ্রের এই কালের ধর্মানুষ্ঠান

শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন কেবলমাত্র বিদ্যার্জনে এবং সঙ্গীতশিক্ষায় কালযাপন করিতেছিলেন না– কিন্তু ধর্মভাবের তীব্র প্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনে ও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিরামিষভোজী হইয়া ভূমি অথবা কম্বলশয্যায় রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ের সন্নিকটে তদীয় মাতামহীর একখানি ভাড়াটিয়া বাটী ছিল; প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইতে উহার বহির্ভাগের দ্বিতলের একটি ঘরেই তিনি প্রধানতঃ বাস করিতেন। যখন কোন কারণে সেখানে

থাকার অসুবিধা হইত তখন উক্ত বাটীর নিকটে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গ হইতে দূরে পৃথকভাবে অবস্থানপূর্বক তিনি নিজ উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সদাশয় পিতা ও বাটীর অন্যান্য সকলে জানিত, বাটীতে বহু পরিবারের নানা গণ্ডগোলে পাঠাভ্যাসের সুবিধা হয় না বলিয়াই তিনি পৃথক অবস্থান করেন।

ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমন

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মসমাজেও গমনাগমন করিতেছিলেন এবং নিরাকার সগুণ-ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার ধ্যানে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেন। তর্কযুক্তিসহায়ে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠামাত্র করিয়াই তিনি ইতরসাধারণের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব পুণ্যসংস্কারসমূহের প্রেরণায় তাঁহার প্রাণ তাঁহাকে নিরন্তর বলিতেছিল—যদি শ্রীভগবান সত্য সত্যই থাকেন তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বানে তিনি কখনও নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া রাখিবেন না, তাঁহাকে লাভ করিবার পথ তিনি নিশ্চয়ই করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদিগের স্মরণ আছে এক সময়ে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন –

নরেন্দ্রের অদ্‌ভুত কল্পনাদ্বয়

"যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত প্রতি রাত্রে শয়ন করিলেই দুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধন-জন-সম্পদ ঐশ্বর্যাদি লাভ হইয়াছে, সংসারে যাহাদের বড় লোক বলে তাহাদিগের শীর্ষস্থানে যেন আরূঢ় হইয়া রহিয়াছি, মনে হইত ঐরূপ হইবার শক্তি আমাতে সত্য সত্যই রহিয়াছে। আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভরপূর্বক কৌপীনধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া কাল কাটাইতেছি। মনে হইত ইচ্ছা করিলে আমি ঐভাবে ঋষিমুনিদের ন্যায় জীবনযাপনে সমর্থ। ঐরূপে দুই প্রকারে জীবন নিয়মিত করিবার ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। ভাবিতাম ঐরূপেই মানব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, আমি ঐরূপই করিব। তখন ঐ প্রকার জীবনের সুখ ভাবিতে ভাবিতে ঈশ্বরচিন্তায় মন নিমগ্ন হইত এবং ঘুমাইয়া পড়িতাম। আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যহ অনেক দিন পর্যন্ত ঐরূপ হইয়াছিল!"

নরেন্দ্রের স্বাভাবিক ধ্যানানুরাগ

ধ্যানকেই নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের একমাত্র প্রশস্ত পথরূপে এই বয়সেই স্বতঃ ধারণা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার পূর্বসংস্কারজ জ্ঞান বলিয়া বেশ বুঝা যায়। তাঁহার বয়স যখন চারি-পাঁচ বৎসর হইবে তখন সীতারাম, মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃন্ময়মূর্তিসকল বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনয়নপূর্বক পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়া উহাদিগের সম্মুখে ধ্যানের ভানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে চাহিয়া দেখিতেন, ইতোমধ্যে তাঁহার মাথায় সুদীর্ঘ জটা লম্বিত হইয়া বৃক্ষাদির মূলের ন্যায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল কিনা—কারণ বাটীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের নিকটে তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, ধ্যান করিতে করিতে মুনিঋষিদের মাথায় জটা হয় এবং উহা ঐপ্রকারে মাটির ভিতর নামিয়া যায়। তাঁহার পূজনীয়া মাতা বলিতেন, ঐ সময়ে এক দিবস নরেন্দ্রনাথ হরি নামক এক প্রতিবেশী বালকের সহিত সকলের অজ্ঞাতে বাটীর এক নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এত অধিক কাল ঐরূপ ধ্যানের ভানে বসিয়াছিলেন যে, সকলে বালকের অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল পথ হারাইয়া বালক কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে বাটীর ঐ অংশ অর্গলবদ্ধ দেখিয়া একজন উহা ভাঙিয়া প্রবেশ করিয়া দেখে—বালক তখন নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বাল্য-কল্পনা হইলেও উহা হইতে বুঝা যায় শ্রীযুত নরেন্দ্র কিরূপ অদ্‌ভুত সংস্কার লইয়া সংসারে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রায় কেহই জানিতেন না যে, তিনি নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিয়া থাকেন। কারণ রাত্রিতে সকলে শয়ন করিবার পরে গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া তিনি ধ্যান করিতে বসিতেন এবং কখনও কখনও উহাতে এতদূর নিমগ্ন হইতেন যে, সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইবার পরে তাঁহার ঐ বিষয়ের জ্ঞান হইত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে ঐ অনুরাগবৃদ্ধি

এই কালের কিছু পূর্বের একটি ঘটনায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের ধ্যান করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। বয়স্যবর্গের সহিত তিনি একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের পূজ্যপাদ আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি যুবকগণকে সেদিন সাদরে নিকটে বসাইয়া অনেক সদুপদেশ প্রদানপূর্বক নিত্য ঈশ্বরের ধ্যানাভ্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, তোমাতে যোগীর লক্ষণসকল প্রকাশিত রহিয়াছে, তুমি ধ্যানাভ্যাস করিলে যোগশাস্ত্রনির্দিষ্ট ফলসকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করিবে। মহর্ষির পুণ্য চরিত্রের জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধাবান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঐরূপ কথায় তিনি যে এখন হইতে ধ্যানাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নরেন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা

বাল্যকাল হইতেই নানা বিষয়ে নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্বে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমগ্র সূত্রগুলি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এক বৃদ্ধ আত্মীয় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া পিতৃপুরুষের নামাবলী, দেবদেবীস্তোত্রসমূহ এবং উক্ত ব্যাকরণের সূত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সকালে তিনি রামায়ণের সমগ্র পালা কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাড়ার কোন স্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে শুনিলেই তথায় উপস্থিত হইতেন। শুনা যায় তাঁহার বাটীর নিকটে এক স্থলে এক রামায়ণ-গায়ক একদিবস পালাবিশেষ গাহিতে গাহিতে উহার কোন অংশ স্মরণ করিতে পারিতেছিলেন না, নরেন্দ্র তাঁহাকে উহা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিয়া তাঁহার নিকট বিশেষ সমাদর ও কিছু মিষ্টান্ন লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ শুনিতে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ তখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন, শ্রীরামচন্দ্রের দাস মহাবীর হনুমান তাঁহার প্রতিশ্রুতিমতো গান শুনিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন কিনা! শ্রুতিধরের ন্যায় নরেন্দ্রনাথের প্রবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ ছিল। কোন বিষয় একবার শুনিলেই উহা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। আবার ঐরূপে একবার কোন বিষয় আয়ত্ত হইলে তাঁহার স্মৃতি হইতে উহা কখনও অপসারিত হইত না। সেজন্য শৈশব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতরসাধারণ বালকের ন্যায় ছিল না। বাল্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরে দৈনিক পাঠাভ্যাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "তিনি বাটীতে আসিলে আমি ইংরাজী, বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলি তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া কোন্ পুস্তকের কোথা হইতে কতদূর পর্যন্ত সেদিন আয়ত্ত করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া যদৃচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকিতাম। মাস্টার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরূপভাবে পুস্তকগুলির ঐসকল স্থানের বানান, উচ্চারণ ও অর্থাদি দুই-তিনবার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐসকল আমার আয়ত্ত হইয়া যাইত।" বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার দুই-তিনমাস মাত্র থাকিবার কালে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকসকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন; অন্য সময়ে আপন অভিরুচিমত অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। ঐরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ইংরাজী ও বাংলার সমগ্র সাহিত্য ও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে কখনও কখনও অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে, একদিন তিনি পূর্বোক্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "প্রবেশিকা

পরীক্ষার আরম্ভের দুই-তিনদিন মাত্র থাকিতে দেখি জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই; তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলাম!" ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।

নরেন্দ্রের পড়িবার ঝোঁক

অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ কাল কাটাইতেন শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি নভেল-নাটকাদি পড়িয়াই সময় নষ্ট করিতেন। এক এক সময়ে এক এক বিষয়ের পুস্তকপাঠে তাঁহার একটা প্রবল আগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন ঐ বিষয়ক যত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সকল আয়ত্ত করিয়া লইতেন। যেমন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের আরম্ভ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসসমূহ পড়িবার তাঁহার বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যান, এলফিনস্টোন-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থসকল পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—এফ.এ. পড়িবার কালে ন্যায়শাস্ত্রের যত প্রকারের ইংরাজী গ্রন্থ ছিল, যথা—হোয়েটলি, জেভন্স, মিল প্রমুখ গ্রন্থকারগণের পুস্তকসকল একে একে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বি.এ. পড়িবার কালে ইংল্যাণ্ডের ও ইউরোপের সকল প্রদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিবার তাঁহার একান্ত বাসনা হইয়াছিল—এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে।

দ্রুত পাঠ করিবার শক্তি

এইরূপে বহু গ্রন্থপাঠের ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কাল হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথের দ্রুত পাঠের শক্তি বিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "এখন হইতে কোন পুস্তক পাঠ করিতে বসিলে উহার প্রতি ছত্র পর পর পড়িয়া গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিবার আমার আবশ্যক হইত না। প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করিলেই উহার ভিতর কি বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতাম। ক্রমে ঐ শক্তি পরিণত হইয়া প্রতি প্যারাও আর পড়িবার আবশ্যক হইত না। প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণ পড়িয়াই বুঝিয়া ফেলিতাম। আবার পুস্তকের যেখানে গ্রন্থকার কোন বিষয় তর্ক-যুক্তির দ্বারা বুঝাইতেছেন সেখানে প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা যুক্তিবিশেষ বুঝাইতে যদি চারি-পাঁচ বা ততোধিক পৃষ্ঠা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত যুক্তির প্রারম্ভমাত্র পড়িয়াই ঐ পৃষ্ঠাসকল বুঝিতে পারিতাম।"

নরেন্দ্রের তর্কশক্তি

বহু পাঠ ও গভীর চিন্তার ফলে শ্রীযুত নরেন্দ্র এই কালে বিষম তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা তর্ক কখনও করিতেন না, মনে জ্ঞানে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তর্কের দ্বারা সর্বত্র তাহারই সমর্থন করিতেন। কিন্তু তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহার বিপরীত কোন প্রকার ভাব বা মত কেহ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিলে তিনি চুপ করিয়া উহা কখনও শুনিয়া যাইতে পারিতেন না। কঠোর যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডন করিয়া বাদীকে নিরস্ত করিতেন। বিরল ব্যক্তিই তাঁহার যুক্তিসকলের নিকট মস্তক অবনত করিত না! আবার তর্কে পরাজিত হইয়া অনেকে যে তাঁহাকে সুনয়নে দেখিত না, এ কথা বলা বাহুল্য। তর্ককালে বাদীর দুই-চারিটি কথা শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে কিরূপ যুক্তিসহায়ে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবে এবং উহার উত্তর তাঁহার মনে পূর্ব হইতেই যোগাইয়া থাকিত। তর্ককালে বাদীকে নিরস্ত করিতে ঐরূপ তীক্ষ্ণ যুক্তিপ্রয়োগ তাঁহার মনে কিরূপে উদিত হয় এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে কয়টা নূতন চিন্তাই বা আছে! সেই কয়টা জানা থাকিলে এবং তাহাদিগের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি এ পর্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই কয়টা আয়ত্ত থাকিলে বাদীকে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ বাদী যে কথা যেভাবেই সমর্থন করুক না, উহা ঐসকলের মধ্যে পড়িবেই পড়িবে।

জগৎকে কোন বিষয়ে নূতন ভাব ও চিন্তা প্রদান করিতে সমর্থ এমন ব্যক্তি বিরল জন্মগ্রহণ করেন।”

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদৃষ্টপূর্ব মেধা ও গভীর চিন্তাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সকল বিষয় স্বল্পকালে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। সেজন্য পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহার ও বয়স্যবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার অবকাশের অভাব হইত না। লোকে তাঁহাকে ঐরূপে অনেককাল কাটাইতে দেখিয়া ভাবিত, তাঁহার লেখাপড়ায় আদৌ মন নাই। ইতরসাধারণ অনেক বালক তাঁহার দেখাদেখি আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে যাইয়া কখনও কখনও আপনাদিগের পাঠাভ্যাসের ক্ষতি করিয়া বসিত।

নরেন্দ্রের ব্যায়াম-অভ্যাসে অনুরাগ

জ্ঞানার্জনের ন্যায় ব্যায়াম-অভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে অশেষ অনুরাগ ছিল। পিতা তাঁহাকে শৈশবে একটি ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি অশ্বচালনায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন জিম্ন্যাস্টিক, কুস্তি, মুদ্‌গরহেলন, যষ্টিক্রীড়া, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি যে-সকল বিদ্যা শারীরিক বলের ও শক্তিপ্রয়োগকৌশলের উৎকর্ষসাধন করে প্রায় সেই সকলেই তিনি অল্পবিস্তর পারদর্শী হইয়াছিলেন। শ্রীযুত নবগোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তখন তখন পূর্বোক্ত বিদ্যাসকলের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের পারদর্শিতার পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক পারিতোষিক প্রদান করা হইত। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ কখনও কখনও উক্ত পরীক্ষা প্রদানেও অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বয়স্যপ্রীতি ও সাহস

বাল্যকাল হইতে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বয়স্যপ্রীতি ও অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত। ছাত্রজীবনে এবং পরে তাঁহাকে দলপতি ও নেতৃত্বপদে আরূঢ় করাইতে ঐ গুণদ্বয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সাত-আট বৎসর বয়সকালে একদিন তিনি বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতার দক্ষিণে মেটেবুরুজ নামক স্থলে লক্ষ্নৌ প্রদেশের ভূতপূর্ব নবাব ওয়াজিদ্ আলি সাহেবের পশুশালা-সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। বালকগণ আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া চাঁদপাল ঘাট হইতে একখানি টাপুরে ডিঙি যাতায়াতের জন্য ভাড়া করিয়াছিল। ফিরিবার কালে তাহাদিগের একজন অসুস্থ হইয়া নৌকামধ্যে বমন করিয়া ফেলিল। মুসলমান মাঝি তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া চাঁদপাল ঘাটে নৌকা লাগাইবার পরে তাহাদিগকে বলিল, নৌকা পরিষ্কার করিয়া না দিলে তাহাদিগের কাহাকেও নামিতে দিবে না। বালকেরা তাহাকে অপরের দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইতে বলিয়া উহার নিমিত্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে চাহিলেও সে উহাতে সম্মত হইল না। তখন বচসা উপস্থিত হইয়া ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায়, ঘাটে যত নৌকার মাঝি ছিল, সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বালকগণ উহাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মাঝিদিগের সহিত বচসার গোলযোগে তিনি পাশ কাটাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন। নিতান্ত বালক দেখিয়া মাঝিরা তাঁহার ঐ কার্যে বাধা দিল না। তীরে দাঁড়াইয়া ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইতেছে দেখিয়া তিনি এখন বয়স্যবর্গকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দুইজন ইংরাজ সৈনিকপুরুষ ময়দানে বায়ুসেবনের জন্য অনতিদূরে রাস্তা দিয়া গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন ও অভিবাদনপূর্বক তাঁহাদিগের হস্তধারণ করিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও, দুই-চারিটি কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা যথাসম্ভব বুঝাইতে বুঝাইতে ঘটনাস্থলে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শন অল্পবয়স্ক বালকের ঐরূপ কার্যে সদাশয় সৈনিকদ্বয়ের হৃদয় মুগ্ধ হইল। তাঁহারা অবিলম্বে নৌকাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন এবং হস্তস্থিত বেত্র উঠাইয়া বালকদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মাঝিকে আদেশ

করিলেন। পল্টনের গোরা দেখিয়া মাঝিরা ভয়ে যে যাহার নৌকায় সরিয়া পড়িল এবং নরেন্দ্রনাথের বয়স্যবর্গও অব্যাহতি পাইল। নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে সৈনিকদ্বয় সেদিন তাঁহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে থিয়েটার দেখিতে যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত না হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৌশলে 'সিরাপিস্' নামক রণতরী-দর্শনের অনুজ্ঞালাভ

বাল্যজীবনের অন্যান্য ঘটনাও নরেন্দ্রনাথের অশেষ সাহসের পরিচয় প্রদান করে। ঐরূপ দুই-একটির এখানে উল্লেখ করা প্রসঙ্গবিরুদ্ধ হইবে না। ভূতপূর্ব ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যে বৎসর 'প্রিন্স অব ওয়েল্স'রূপে ভারত-পরিভ্রমণে আগমন করেন, সেই বৎসর নরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দশ-বার বৎসর ছিল। ব্রিটিশরাজের 'সিরাপিস' নামক একখানি বৃহৎ রণতরী ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং আদেশপত্র গ্রহণপূর্বক কলিকাতার বহু ব্যক্তি ঐ তরীর অভ্যন্তর দেখিতে গিয়াছিল। বালক নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত উহা দেখিতে অভিলাষী হইয়া আদেশপত্র পাইবার আশায় একখানি আবেদন লিখিয়া চৌরঙ্গীর আফিসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বাররক্ষক বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন আবেদনকারীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। তখন অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে তিনি, যাঁহারা ভিতরে যাইয়া আদেশপত্র লইয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত আফিসের ত্রিতলের এক বারান্দায় গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ঐখানেই সাহেব আবেদন গ্রহণপূর্বক আদেশ দিতেছেন। তখন ঐ স্থানে গমন করিবার অন্য কোন পথ আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, উক্ত বারান্দার পশ্চাতের ঘরে সাহেবের পরিচারকদিগের যাইবার জন্য বাটীর অন্যদিকে একপার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত লৌহময় সোপান রহিয়াছে। কেহ দেখিতে পাইলে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তদবলম্বনে ত্রিতলে উঠিয়া যাইলেন এবং সাহেবের গৃহের ভিতর দিয়া বারান্দায় প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, সাহেবের চারিদিকে আবেদনকারীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং সাহেব সম্মুখস্থ টেবিলে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত আদেশপত্রসকলে সহি করিয়া যাইতেছেন। তিনি তখন সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং যথাকালে আদেশপত্র পাইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া অন্য সকলের ন্যায় সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া আফিসের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

আখড়ায় ট্রাপিজ খাটাইবার কালে বিভ্রাট

সিমলা-পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা দিবার জন্য তখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের উপরে একটি জিম্ন্যাস্টিকের আখড়া ছিল। হিন্দুমেলা-প্রবর্তক শ্রীযুত নবগোপাল মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটীর অতি সন্নিকটে থাকায় নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য আগমনপূর্বক ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক নবগোপালবাবুর সহিত পূর্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহাদিগের উপরেই তিনি আখড়ার কার্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখড়ায় একদিন ট্রাপিজ (দোলনা) খাটাইবার জন্য বালকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুময় ফ্রেম খাড়া করিতে পারিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য দেখিতে রাস্তায় লোকের ভিড় হইয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান ইংরাজ 'সেলার'-কে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। সেও তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া বালকদিগের সহিত যোগদান করিল। তখন দড়ি বাঁধিয়া বালকেরা ট্রাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উত্তোলন করিতে লাগিল এবং সাহেব পদদ্বয় গর্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। ঐরূপে কার্য বেশ অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের দারুময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার

এক পদ সহসা উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্য ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধিরস্রাব হইতেছে দেখিয়া সকলে তাহাকে মৃত স্থির করিয়া পুলিস-হাঙ্গামার ভয়ে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। কেবল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই-একজন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়-উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের বস্ত্র ছিন্ন ও আর্দ্র করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জলসেচন ও ব্যজন করিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাহেবের চৈতন্য হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া সম্মুখস্থ 'ট্রেনিং একাডেমি' নামক স্কুলগৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া শয়ন করাইয়া, নবগোপালবাবুকে শীঘ্র একজন ডাক্তার লইয়া আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আঘাত সাঙ্ঘাতিক নহে, এক সপ্তাহের শুশ্রূষায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে সাহেব ঐ কালের মধ্যেই সুস্থ হইল। তখন পল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে চাঁদা সংগ্রহপূর্বক সাহেবকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া নরেন্দ্রনাথ বিদায় করিলেন। ঐরূপ বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।

নরেন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা

বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত নরেন্দ্র সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহার উক্ত নিষ্ঠা বিশেষ বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "মিথ্যা কথা হইবে বলিয়া ছেলেদের কখনও জুজুর ভয় দেখাই নাই, এবং বাটীতে কেহ ঐরূপ করিতেছে দেখিলে তাহাকে বিষম তিরস্কার করিতাম। ইংরাজী পড়িয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে বাচনিক সত্যনিষ্ঠা তখন এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল।"

নির্দোষ আনন্দপ্রিয়তা

সুদৃঢ় শরীর, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অদ্ভুত মেধা ও পবিত্রতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিয়ত সদানন্দে থাকিতে দেখা যাইত। ব্যায়াম, সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্যশিক্ষা, বয়স্যবর্গের সহিত নির্দোষ রঙ্গ-পরিহাস প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যাপারেই তিনি নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতেন। বাহিরের লোকে তাঁহার ঐরূপ আনন্দের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহার চরিত্রে দোষকল্পনা করিয়া বসিত। তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ কিন্তু লোকের প্রশংসা বা নিন্দায় কখনও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। লোকের অযথা নিন্দাবাদকে অপ্রমাণিত করিতে তাঁহার গর্বিত হৃদয় কখনও নিজ মস্তক নত করিত না।

দরিদ্রের প্রতি নরেন্দ্রনাথের দয়া

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা নরেন্দ্রনাথের আজীবন স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার শৈশবকালে বাটীতে ভিক্ষুক আসিয়া বস্ত্র, তৈজসাদি যাহা চাহিত, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া বসিতেন। বাটীর লোকেরা উহা জানিতে পারিয়া বালককে তিরস্কার করিতেন এবং ভিক্ষুককে পয়সা দিয়া ঐসকল ছাড়াইয়া লইতেন। কয়েকবার ঐরূপ হওয়ায় মাতা একদিন বালক নরেন্দ্রকে বাটীর দ্বিতলে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জনৈক ভিক্ষুক ঐ সময়ে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় বালক গবাক্ষ দিয়া তাহার মাতার কয়েকখানি উত্তম বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া বসিয়াছিল।

নরেন্দ্রের ক্রোধ

মাতা বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে নরেন্দ্রের একটা বড় দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কখনও তাহার ক্রোধ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সে যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইত এবং বাটীর

আসবাবপত্র ভাঙিয়া চুরিয়া তছনছ করিত। পুত্রকামনায় কাশীধামে ৺বীরেশ্বরের নিকট বিশেষ মানত করিয়াছিলাম। ৺বীরেশ্বর বোধ হয় তাঁহার একটা ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! না হইলে ক্রোধ হইলে সে অমন ভূতের মতো অশান্ত ব্যবহার করে কেন?" বালকের ঐরূপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ঔষধ বাহির করিয়াছিলেন। যখন দেখিতেন, তাহাকে কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, তখন ৺বীরেশ্বরকে স্মরণ করিয়া শীতল জল দুই-এক ঘড়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিতেন। বালকের ক্রোধ উহাতে এককালে প্রশমিত হইত! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথ একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম-কর্ম করিতে আসিয়া আর কিছু না হউক ক্রোধটা তাঁহার (ঈশ্বরের) কৃপায় আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি। পূর্বে ক্রুদ্ধ হইলে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতাম, এবং পরে উহার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতাম। এখন কেহ নিষ্কারণে প্রহার করিলে অথবা নিতান্ত অপকার করিলেও তাহার উপর পূর্বের ন্যায় বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় না।"

নরেন্দ্রের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সমসমান উৎকর্ষ

মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের সমসমান উৎকর্ষপ্রাপ্তি সংসারে বিরল লোকের দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহাদের ঐরূপ হয় তাঁহারাই মনুষ্যসমাজে কোন না কোন বিষয়ে নিজ মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। আবার আধ্যাত্মিক জগতে যাঁহারা নিজ অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়া যান, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সহিত কল্পনাশক্তির প্রবৃদ্ধিও বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথের জীবনালোচনায় পূর্বোক্ত কথা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

নরেন্দ্রের প্রথম ধ্যানতন্ময়তা—রায়পুর যাইবার পথে

নরেন্দ্রনাথের পিতা এক সময়ে বিষয়কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অধিক কাল তথায় থাকিতে হইবে বুঝিয়া নিজ পরিবারবর্গকে তিনি কিছুকাল পরে ঐ স্থানে আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার ভার ঐ কালে নরেন্দ্রনাথের উপরই অর্পিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রের বয়স তখন চৌদ্দ-পনের বৎসর মাত্র ছিল। ভারতের মধ্যপ্রদেশে তখন রেল হয় নাই, সুতরাং রায়পুর যাইতে হইলে শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একপক্ষেরও অধিক কাল গো-যানে করিয়া যাইতে হইত। ঐরূপে অশেষ শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হইলেও নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, বনস্থলীর অপূর্ব সৌন্দর্য-দর্শনে উক্ত কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই তাঁহার মনে হয় নাই এবং অযাচিত হইয়াও যিনি ধরিত্রীকে ঐরূপ অনুপম বেশভূষায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অসীম শক্তি ও অনন্ত প্রেমের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐ কালে যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মৃতি-পত্রে চিরকালের জন্য দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নতশীর্ষ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ দিয়া সেদিন আমাদিগকে যাইতে হইয়াছিল। পথের দুই পার্শ্বেই গিরিশৃঙ্গসকল গগন স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান; নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা ফল-পুষ্প-সম্ভারে অবনত হইয়া পর্বত-পৃষ্ঠের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে; মধুর কাকলিতে দিক পূর্ণ করিয়া নানা বর্ণের বিহগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন অথবা আহার-অন্বেষণে কখনও কখনও ভূমিতে অবতরণ করিতেছে,—ঐসকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে গো-যানসকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থলে উপস্থিত হইল যেখানে পর্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, একপার্শ্বের পর্বতগাত্রে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাট রহিয়াছে এবং ঐ অন্তরালকে পূর্ণ করিয়া মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শন-স্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে! তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা-

রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন ত্রিজগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্য সংজ্ঞার এককালে লোপ হইল। কতক্ষণ ঐভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। গো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।" প্রবল কল্পনাসহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম।

নরেন্দ্রের সন্ন্যাসী পিতামহ

নরেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদানপূর্বক আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বহু শাখায় বিভক্ত সিমলার দত্তপরিবারেরা কলিকাতার প্রাচীন বংশসকলের মধ্যে অন্যতম ছিল। ধনে, মানে এবং বিদ্যাগৌরবে এই বংশ মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহস্থদিগের অগ্রণী ছিল। নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ শ্রীযুত রামমোহন দত্ত ওকালতি করিয়া বেশ উপার্জনক্ষম হইয়াছিলেন এবং বহুগোষ্ঠী-পরিবৃত হইয়া সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি লেনস্থ নিজ ভবনে সসম্মানে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র দুর্গাচরণ পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও স্বল্পবয়সে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। শুনা যায়, বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাধু-সন্ন্যাসি-ভক্ত ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি তাঁহাকে শাস্ত্র-অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখিয়া স্বল্পকালে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহ করিলেও দুর্গাচরণের সংসারে আসক্তি ছিল না। নিজ উদ্যানে সাধুসঙ্গেই তাঁহার অনেক কাল অতিবাহিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতামহ শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষাপূর্বক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার স্বল্পকাল পরেই চিরদিনের মতো গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও বিধাতার নির্বন্ধে শ্রীযুত দুর্গাচরণ নিজ সহধর্মিণী ও আত্মীয়বর্গের সহিত দুইবার স্বল্পকালের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ যখন দুই-তিন বৎসরের হইবে, তখন তাঁহার সহধর্মিণী ও আত্মীয়বর্গ বোধ হয় তাঁহারই অন্বেষণে ৺কাশীধামে গমনপূর্বক কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। রেলপথ না থাকায় সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা তখন নৌকাযোগেই কাশীতে আসিতেন। দুর্গাচরণের সহধর্মিণীও ঐরূপ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে শিশু বিশ্বনাথ একস্থানে নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার মাতাই উহা সর্বাগ্রে দর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে ঝম্প-প্রদান করিয়াছিলেন। অশেষ চেষ্টায় পরে সংজ্ঞাশূন্য মাতাকে জলগর্ভ হইতে নৌকায় উঠাইতে যাইয়া দেখা গেল, তিনি নিজ সন্তানের হস্ত তখনও দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঐরূপে মাতার অপার স্নেহই সেইবার বিশ্বনাথের প্রাণ-রক্ষার হেতু হইয়াছিল।

কাশী পৌঁছিবার পরে শ্রীযুত দুর্গাচরণের সহধর্মিণী নিত্য ৺বিশ্বনাথদর্শনে গমন করিতেন। বৃষ্টি হইয়া পথ পিচ্ছিল হওয়ায় একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে তিনি সহসা পড়িয়া যাইলেন। ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে জনৈক সন্ন্যাসী উহা দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সযত্নে উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে মন্দিরের সোপানে বসাইয়া, শরীরের কোন স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র দুর্গাচরণ ও তাঁহার সহধর্মিণী পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন এবং সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ দ্বিতীয়বার তাঁহার দিকে না দেখিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শাস্ত্রে বিধি আছে, প্রব্রজ্যাগ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পরে সন্ন্যাসী ব্যক্তি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' নিজ জন্মভূমি সন্দর্শন করিবেন। শ্রীযুত দুর্গাচরণ ঐজন্য দ্বাদশ বৎসর পরে একবার কলিকাতায় আগমনপূর্বক জনৈক পূর্ববন্ধুর ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার আগমন-বার্তা তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে প্রচারিত না হয়। সংসারী বন্ধু সন্ন্যাসী দুর্গাচরণের ঐ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে তাঁহার আত্মীয়দিগকে ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহারা সদলবলে আসিয়া একপ্রকার জোর করিয়া শ্রীযুত

দুর্গাচরণকে বাটীতে লইয়া যাইলেন। দুর্গাচরণ ঐরূপে বাটীতে যাইলেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া গৃহমধ্যে এক কোণে বসিয়া রহিলেন। শুনা যায়, একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র তিনি ঐরূপে একাসনে বসিয়াছিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার পূর্বের ন্যায় রুদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন দেখা গেল, সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন।

নরেন্দ্রের পিতা বিশ্বনাথ

শ্রীযুত দুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ বয়োবৃদ্ধির সহিত ফারসী ও ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভপূর্বক কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি হইয়াছিলেন। তিনি দানশীল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং বেশ উপার্জন করিলেও কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃধর্ম পুত্রে অনুগত হইয়াই বোধ হয় তাঁহাকে সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী হইতে দেয় নাই। বাস্তবিক, অনেক বিষয়েই বিশ্বনাথের স্বভাব সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ছিল না। তিনি কল্যকার ভাবনায় কখনও ব্যস্ত হইতেন না, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন, স্নেহপরায়ণ হইলেও বিদেশে দূরে অবস্থানকালে অনেক দিন পর্যন্ত আত্মীয়-পরিজনের কিছুমাত্র সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন–ঐরূপ অনেক বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

বিশ্বনাথের সঙ্গীত-প্রিয়তা

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতা সুকণ্ঠ ছিলেন এবং রীতিমত শিক্ষা না করিয়াও নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি সুন্দর গাহিতে পারিতেন। সঙ্গীতচর্চাকে নির্দোষ আমোদ বলিয়া ধারণা ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথকে বিদ্যার্জনের সহিত সঙ্গীত শিখিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারিসকলের ভজনগান একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াই সুর-তাল-লয়ের সহিত সম্যক আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

বিশ্বনাথের মুসলমানী আচার-ব্যবহার

খ্রীষ্টান-পুরাণ বাইবেলপাঠে এবং ফারসি কবি হাফেজের বয়েৎসকল আবৃত্তি করিতে শ্রীযুত বিশ্বনাথের বিশেষ প্রীতি ছিল। মহামহিম ঈশার পুণ্য চরিতের দুই-এক অধ্যায় তাঁহার নিত্যপাঠ্য ছিল, এবং উহার ও হাফেজের প্রেমগর্ভ কবিতাসকলের কিছু কিছু তিনি নিজ স্ত্রীপুত্রদিগকে কখনও কখনও শ্রবণ করাইতেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্নৌ, লাহোর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানসকলে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহারের কিছু-কিছুর প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিত্য পলান্নভোজন করার প্রথা বোধ হয় ঐরূপেই তাঁহার পরিবারমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল।

বিশ্বনাথের রঙ্গরস-প্রিয়তা

শ্রীযুত বিশ্বনাথ একদিকে যেমন ধীর গম্ভীর ছিলেন, আবার তেমনি রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। পুত্রকন্যার মধ্যে কেহ কখনও অন্যায় আচরণ করিলে তিনি তাহাকে কঠোর বাক্যে শাসন না করিয়া তাহার ঐরূপ আচরণের কথা তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এমনভাবে প্রচার করাইয়া দিতেন, যাহাতে সে আপনিই লজ্জিত হইয়া আর কখনও ঐরূপ করিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ একদিন কোন বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে দুই-একটি কটু কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজন্য কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বয়স্যবর্গের সহিত উঠা-বসা করিতেন, তাহার দ্বারের উপরিভাগে একখণ্ড কয়লা দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া

দিয়াছিলেন–‘নরেনবাবু তাঁহার মাতাকে অদ্য এইসকল কথা বলিয়াছেন।’ নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বয়স্যবর্গ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িত এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেক দিন পর্যন্ত নিজ অপরাধের জন্য বিষম সঙ্কোচ অনুভব করিতেন।

বিশ্বনাথের দানশীলতা

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়কে প্রতিপালন করিতেন। অন্নদানে তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দূরসম্পর্কীয় কেহ কেহ তাঁহার অন্নে জীবনধারণ করিয়া আলস্যে কাল কাটাইত, কেহ কেহ আবার নেশা-ভাঙ খাইয়া জীবনের অবসাদ দূর করিত। নরেন্দ্রনাথ বড় হইয়া ঐসকল অযোগ্য ব্যক্তিকে দানের জন্য পিতাকে অনেক সময় অনুযোগ করিতেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাহাকে বলিতেন, “মনুষ্যজীবন যে কতদূর দুঃখময়, তাহা তুই এখন কি বুঝিবি? যখন বুঝিতে পারিবি, তখন ঐ দুঃখের হস্ত হইতে ক্ষণিক মুক্তির জন্য যাহারা নেশা-ভাঙ করে, তাহাদিগকে পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখিতে পারিবি!”

বিশ্বনাথের মৃত্যু

বিশ্বনাথের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা হইয়াছিল। তাহারা সকলেই অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিল। কন্যাগুলির অনেকেই কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভ করে নাই। তিন-চারি কন্যার পরে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হওয়ায় তিনি পিতামাতার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে নরেন্দ্রনাথ যখন বি.এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা সহসা হৃদ্রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।[2] তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা এককালে নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের মাতা

নরেন্দ্রনাথের মাতা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর মহত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র সুরূপা এবং দেবভক্তিপরায়ণা ছিলেন না, কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমতী এবং কার্যকুশলা ছিলেন। তাঁহার পতির সুবৃহৎ সংসারের সমস্ত কার্যের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। শুনা যায়, তিনি অবলীলাক্রমে উহার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া বয়নাদি শিল্পকার্য সম্পন্ন করিবার মতো অবসর করিয়া লইতেন। রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থপাঠ-ভিন্ন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর না হইলেও নিজ স্বামী ও পুত্রাদির নিকট হইতে তিনি অনেক বিষয় মুখে মুখে এমন শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথা কহিলে তাঁহাকে শিক্ষিতা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। একবারমাত্র শুনিয়াই তিনি কোন বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং বহু পূর্বের কথা ও বিষয়সকল তাঁহার কল্যসংঘটিত ব্যাপারসকলের ন্যায় স্মরণ থাকিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে দারিদ্র্যে পতিতা হইয়া তাঁহার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তখন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষণ্ন দেখা যাইত না। ঐ স্বল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সকল বন্দোবস্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে, লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক ব্যয় অনেক অধিক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক, পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী তখন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। সংসারনির্বাহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই–অথচ তাঁহার সুখপালিতা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্রসকলের ভরণপোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্বাহ করিতে হইবে–তাঁহার পতির সহায়ে যে-সকল আত্মীয়গণ বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সাহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া তাঁহারা ন্যায্য অধিকারসকলেরও লোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প–তাঁহার অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ

কাজকর্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—ঐরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী যেরূপ ধীর-স্থিরভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার স্বতই উদয় হয়। ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদিগকে পরে পাঠকের সম্মুখে তাঁহার এই কালের পারিবারিক অভাব প্রভৃতির কথার উত্থাপন করিতে হইবে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয় বিবৃত করিতে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, আমরা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার আগমনের কথা এখন পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হই।

[1] মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।
সত্যপথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন
গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ,
তাই বলি মন রেখরে প্রহরী
শম দম দুইজনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ
সে পান্থনিবাসিগণে।
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন ডরে যাঁর শাসনে।

[2] পিতার মৃত্যু বি.এ. পরীক্ষার পরে হয়। অষ্টম অধ্যায়ের ৭ম প্যারা দ্রঃ।

৫.৮. চতুর্থ অধ্যায়: নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক বলিয়া ধারণা করিয়াও দ্বিতীয়বার নরেন্দ্রের ঠাকুরের নিকটে আসিতে বিলম্ব করিবার কারণ

যথার্থ পুরুষকারসম্পন্ন স্থিরলক্ষ্যবিশিষ্ট পুরুষসকলে অপরের মহত্ত্বের পরিচয় পাইলে মুক্তকণ্ঠে উহা স্বীকারপূর্বক প্রাণে অপূর্ব উল্লাস অনুভব করিতে থাকেন। আবার সেই মহত্ত্ব যদি কখনও কাহারও মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব অভাবনীয় রূপে প্রকাশিত দেখেন তবে তচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া তাঁহাদিগের মন কিছুকালের জন্য মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ হইলেও কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাদিগকে নিজ গন্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিয়া ঐ পুরুষের অনুকরণে কখনও প্রবৃত্ত করে না। অথবা বহুকালব্যাপী সঙ্গ, সাহচর্য ও প্রেমবন্ধন ব্যতীত তাঁহাদিগের জীবনের কার্যকলাপ ঐ পুরুষের বর্ণে সহসা রঞ্জিত হইয়া উঠে না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম দর্শনলাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথের ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ এবং মন ও মুখের একান্ত ঐক্যদর্শনে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইলেও নরেন্দ্রের হৃদয় জীবনের আদর্শরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সহসা সম্মত হয় নাই। সুতরাং বাটীতে ফিরিবার পরে তাঁহার মনে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব চরিত্র ও আচরণ কয়েক দিন ধরিয়া পুনঃপুনঃ উদিত হইলেও নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে তাঁহার নিকটে পুনরায় গমনের কথা তিনি দূর ভবিষ্যতের গর্ভে ঠেলিয়া রাখিয়া আপন কর্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঠাকুরকে অর্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করাই যে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল, এ কথা বুঝিতে পারা যায়। আবার, ধ্যানাভ্যাস এবং কলেজে পাঠ ব্যতীত নরেন্দ্র তখন নিত্য সঙ্গীত ও ব্যায়াম-চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন—তদুপরি বয়স্যবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণে কলিকাতায় নানা স্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা-সমিতিসকল গঠন করিতেছিলেন। সুতরাং সহস্র কর্মে রত নরেন্দ্রনাথের মনে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা কয়েক পক্ষ চাপা পড়িয়া থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দৈনন্দিন কর্ম তাঁহাকে ঐরূপে ভুলাইয়া রাখিলেও তাঁহার স্মৃতি ও সত্যনিষ্ঠা অবসর পাইলেই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী গমনপূর্বক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। সেজন্যই প্রথম দর্শনের প্রায় মাসাবধিকাল পরে আমরা শ্রীযুত নরেন্দ্রকে এক দিবস একাকী পদব্রজে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে গমন করিতে দেখিতে পাইয়া থাকি। উক্ত দিবসের কথা তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, আমরা সেইভাবেই উহা এখানে পাঠককে বলিতেছি –

নরেন্দ্রের দ্বিতীয়বার আগমন ও ঠাকুরের প্রভাবে সহসা অদ্‌ভুত প্রত্যক্ষানুভূতি

"দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দূরে তাহা ইতিপূর্বে গাড়ি করিয়া একবারমাত্র যাইয়া বুঝিতে পারি নাই। বরাহনগরে দাশরথি সান্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ী প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকটে পূর্ব হইতে যাতায়াত ছিল। ভাবিয়াছিলাম রাসমণির বাগান তাহাদের বাটীর নিকটেই হইবে, কিন্তু যত যাই পথ যেন আর ফুরাইতে চাহে না! যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কোনরূপে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম এবং একেবারে ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি পূর্বের ন্যায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত ছোট তক্তপোশখানির উপর একাকী আপন মনে বসিয়া আছেন—নিকটে কেহই নাই। আমাকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই এক প্রান্তে বসাইলেন। বসিবার পরেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম, তিনি যেন কেমন একপ্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। ভাবিলাম, পাগল বুঝি পূর্বদিনের ন্যায় আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে। ঐরূপ ভাবিতে না ভাবিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া

চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, ‘ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!’ অদ্‌ভুত পাগল আমার ঐ কথা শুনিয়া খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তদ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, ‘তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে!’ আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ঐরূপে স্পর্শ করিয়া ঐ কথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম, এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।”

ঐরূপ প্রত্যক্ষের কারণান্বেষণে ও ভবিষ্যতে পুনরায় ঐরূপে অভিভূত না হইয়া পড়িবার জন্য নরেন্দ্রের চেষ্টা

“বলিতে এত বিলম্ব হইলেও ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল এবং উহার দ্বারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি হইল? দেখিলাম তো উহা এই অদ্‌ভুত পুরুষের প্রভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া সহসা লয় হইল। পুস্তকে Mesmerism (মোহিনী ইচ্ছাশক্তিসঞ্চারণ) ও Hypnotism (সম্মোহনবিদ্যা) সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, উহা কি ঐরূপ কিছু একটা? কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্তে প্রাণ সায় দিল না। কারণ, দুর্বল মনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐসকল অবস্থা আনয়ন করেন; কিন্তু আমি তো ঐরূপ নহি, বরং এতকাল পর্যন্ত বিশেষ বুদ্ধিমান ও মানসিকবলসম্পন্ন বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আসিতেছি। বিশিষ্ট গুণশালী পুরুষের সঙ্গলাভপূর্বক ইতরসাধারণে যেমন মোহিত এবং তাঁহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া পড়ে, আমি তো ইঁহাকে দেখিয়া সেইরূপ হই নাই; বরং প্রথম হইতেই ইঁহাকে অর্ধোন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তবে আমার সহসা ঐরূপ হইবার কারণ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; প্রাণের ভিতর একটা বিষম গোল বাঁধিয়া রহিল। মহাকবির কথা মনে পড়িল—‘পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, মানব-বুদ্ধি-প্রসূত দর্শনশাস্ত্র যাহাদিগের স্বপ্নেও রহস্যভেদের কল্পনা করিতে পারে না।’ মনে করিলাম, উহাও ঐরূপ একটা; ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, উহার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং দৃঢ় সংকল্প করিলাম, অদ্‌ভুত পাগল নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া আর যেন কখনও ভবিষ্যতে আমার মনের উপর আধিপত্য লাভপূর্বক ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিতে না পারে।”

ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নানা জল্পনা ও তাঁহাকে বুঝিবার সঙ্কল্প

“আবার ভাবিতে লাগিলাম, ইচ্ছামাত্রেই এই পুরুষ যদি আমার ন্যায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের দৃঢ়সংস্কারময় গঠন ঐরূপে ভাঙিয়া-চুরিয়া কাদার তালের মতো করিয়া উহাকে আপন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইঁহাকে পাগলই বা বলি কিরূপে? কিন্তু প্রথম দর্শনকালে আমাকে একান্তে লইয়া যাইয়া যেরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন সেই-সকলকে ইঁহার পাগলামির খেয়াল ভিন্ন সত্য বলিয়া কিরূপে মনে করিতে পারি? সুতরাং পূর্বোক্ত অদ্‌ভুত উপলব্ধির কারণ যেমন খুঁজিয়া পাইলাম না, শিশুর ন্যায় পবিত্র ও সরল এই পুরুষের সম্বন্ধেও কিছু একটা স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্কসহায়ে প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, অদ্য সেই স্বভাবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ফলে, মনে পুনরায় প্রবল সঙ্কল্পের উদয় হইল, যেরূপে পারি এই অদ্‌ভুত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথা যথাযথভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে।”

নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার

“ঐরূপে নানা চিন্তা ও সঙ্কল্পে সেদিন আমার সময় কাটিতে লাগিল। ঠাকুর কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া গেলেন এবং পূর্ব দিবসের ন্যায় নানাভাবে আমাকে

আদর-যত্ন করিয়া খাওয়াইতে ও সকল বিষয়ে বহুকালের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয় বা সখাকে বহুকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের যেরূপ হইয়া থাকে, আমার সহিত তিনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। খাওয়াইয়া, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গ-পরিহাস করিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার ঐরূপ ভালবাসা ও ব্যবহারও আমার স্বল্প চিন্তার কারণ হয় নাই। ক্রমে অপরাহ্ণ অতীতপ্রায় দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটে সেদিনকার মতো বিদায় যাচ্ঞা করিলাম। তিনি যেন তাহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া 'আবার শীঘ্র আসিবে, বল' বলিয়া পূর্বের ন্যায় ধরিয়া বসিলেন। সুতরাং সেদিনও আমাকে পূর্বের ন্যায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল।"

নরেন্দ্রনাথের তৃতীয়বার আগমন

উহার কতদিন পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে ঠাকুরের ভিতরে পূর্বোক্তরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবার পরে, তাঁহাকে জানিবার বুঝিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনার উদয় দেখিয়া মনে হয়, এবার দক্ষিণেশ্বরে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। উক্ত আগ্রহই তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিল, তবে কলেজের অনুরোধে উহা সপ্তাহকাল বিলম্বে হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কোন বিষয় অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি মনে একবার জাগিয়া উঠিলে নরেন্দ্রনাথের আহার-বিহার ও বিশ্রামাদির দিকে লক্ষ্য থাকিত না এবং যতক্ষণ না ঐ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন ততক্ষণ তাঁহার প্রাণে শান্তি হইত না। অতএব ঠাকুরকে জানিবার সম্বন্ধে তাঁহার মন যে এখন ঐরূপ হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আবার পাছে তাঁহার পূর্বের ন্যায় ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীযুত নরেন্দ্র যে নিজ মনকে বিশেষভাবে দৃঢ় ও সতর্ক করিয়া তৃতীয় দিবসে ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন এ কথাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঘটনা কিন্তু তথাপি অভাবনীয় হইয়াছিল। ঠাকুরের ও শ্রীযুত নরেন্দ্রের নিকটে তৎসম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই এখন পাঠককে বলিতেছি।

সমাধিস্থ ঠাকুরের স্পর্শে নরেন্দ্রের বাহ্যসংজ্ঞার লোপ

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ঠাকুর ঐদিন নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সহিত শ্রীযুত যদুলাল মল্লিকের পার্শ্ববর্তী উদ্যানে বেড়াইতে যাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যদুলালের মাতা ও তিনি স্বয়ং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং উদ্যানের প্রধান কর্মচারীর প্রতি তাঁহাদিগের আদেশ ছিল যে, তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর যখনই উদ্যানে বেড়াইতে আসিবেন তখনই গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা-ঘর তাঁহার বসিবার নিমিত্ত খুলিয়া দিবে। ঐ দিবসেও ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত উদ্যানে ও গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে ঐ ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র অনতিদূরে বসিয়া ঠাকুরের উক্ত অবস্থা স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুর পূর্বদিনের ন্যায় সহসা আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। নরেন্দ্র পূর্ব হইতে সতর্ক থাকিয়াও ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পূর্বদিনের মতো না হইয়া উহাতে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল! কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহার পুনরায় চৈতন্য হইল তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন!

বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইবার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্রের ভিতরে সেদিন কিরূপ অনুভব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে কোন কথা বলেন নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিশেষ রহস্যের কথা বলিয়া তিনি উহা আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিবস ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, নরেন্দ্রের উহা স্মরণ না থাকিবারই কথা। ঠাকুর বলিয়াছিলেন –

ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত নরেন্দ্রকে ঠাকুরের নানা প্রশ্ন

"বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইলে নরেন্দ্রকে সেদিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে), কতদিন এখানে (পৃথিবীতে) থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐসকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম তাহার ঐকালের উত্তর-সকল তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। সে-সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে। উহা হইতেই কিন্তু জানিয়াছি, সে (নরেন্দ্র) যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ়সঙ্কল্পসহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে! নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের অদ্ভুত দর্শন

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের ইতঃপূর্বে যে-সকল দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। পাঠকের সুবিধার জন্য উহা আমরা এখানেই বলিতেছি। কারণ, ঠাকুরের নিকট উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেই তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল! ঠাকুর বলিয়াছিলেন –

"একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে; চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকলে পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের কথা ও মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেব-শিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীর-মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি!" [1]

অদ্ভুত প্রত্যক্ষের ফলে নরেন্দ্রের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারণা

সে যাহা হউক, ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নরেন্দ্রের মনে দ্বিতীয়বার ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি যে এককালে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এ কথা বলা বাহুল্য। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এই দুরতিক্রমণীয় দৈবশক্তির নিকটে তাঁহার মন ও বুদ্ধির শক্তি কতদূর অকিঞ্চিৎকর! ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার ইতঃপূর্বের অর্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা পরিবর্তিত হইল, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রথম উপস্থিত হইবার দিবসে তিনি তাঁহাকে একান্তে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে-সকলের অর্থ ও উদ্দেশ্য যে এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর দৈবশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ। ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ন্যায় মানবের মনকে ফিরাইয়া তিনি উচ্চপথে চালিত করিতে পারেন; তবে বোধ হয়, ভগবদিচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ একীভূত হওয়াতেই সকলের সম্বন্ধে তাঁহার মনে ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না; এবং এই অলৌকিক পুরুষের ঐরূপ অযাচিত কৃপালাভ তাঁহার পক্ষে স্বল্প ভাগ্যের কথা নহে।

উহার ফলে নরেন্দ্রের গুরুবিষয়ক ধারণার পরিবর্তন

পূর্বোক্ত মীমাংসায় নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়াছিল এবং ইতঃপূর্বের অনেকগুলি ধারণাও তাঁহাকে উহার অনুসরণে পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। আপনার ন্যায় দুর্বল, স্বল্প দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানবকে অধ্যাত্মজগতের পথপ্রদর্শক বা শ্রীগুরুরূপে গ্রহণ করিতে এবং নির্বিচারে তাঁহার সকল কথা-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ইতঃপূর্বে তাঁহার একান্ত আপত্তি ছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ ধারণা সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে না। পূর্বোক্ত দুই দিবসের ঘটনার ফলে তাঁহার ঐ ধারণা বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিলেন, বিরল হইলেও সত্য সত্যই এমন মহাপুরুষসকল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করেন যাঁহাদিগের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম ও পবিত্রতা সাধারণ মানবের ক্ষুদ্র মনবুদ্ধিপ্রসূত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া থাকে, সুতরাং ইঁহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের মঙ্গল সাধিত হয়। ফলতঃ, ঠাকুরকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও তিনি নির্বিচারে তাঁহার সকল কথা গ্রহণে এখনও সম্মত হয়েন নাই।

ঠাকুরের সংসর্গে নরেন্দ্রের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাববৃদ্ধি

ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না, পূর্বসংস্কারবশতঃ এই ধারণা নরেন্দ্রনাথের মনে বাল্যকাল হইতেই প্রবল ছিল। তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেও তন্মধ্যগত দাম্পত্য-জীবনসংস্কার-সম্বন্ধীয় সভা-সমিতিতে যোগদানে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সর্বস্বত্যাগী ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অপূর্ব শক্তির পরিচয়লাভে তাঁহাতে উক্ত ত্যাগের ভাব এখন হইতে বিশেষরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

পরীক্ষা না করিয়া ঠাকুরের কোন কথা গ্রহণ না করিবার নরেন্দ্রের সঙ্কল্প

কিন্তু সর্বাপেক্ষা একটি বিষয় এখন হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এরূপ শক্তিশালী মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া মানব-মন অর্ধপরীক্ষা, অথবা পরীক্ষা না করিয়াই, তাঁহার সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসে। উহা হইতে আপনাকে বাঁচাইতে হইবে। সেজন্য পূর্বোক্ত দুই দিবসের ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার মনে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হইলেও তিনি এখন হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, বিশেষ পরীক্ষাপূর্বক স্বয়ং অনুভব বা প্রত্যক্ষ না করিয়া তাঁহার অদ্‌ভুত দর্শন-সম্বন্ধীয় কোন কথা কখনও গ্রহণ করিবেন না, ইহাতে তাঁহার অপ্রিয়ভাজন হইতে হয় তাহাও স্বীকার। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব অদৃষ্টপূর্ব তত্ত্বসকল গ্রহণ করিবার জন্য মনকে সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে একদিকে তিনি যেমন যত্নশীল হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ঠাকুরের প্রত্যেক অদ্‌ভুত দর্শন ও ব্যবহারের কঠোর বিচারে আপনাকে এখন হইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের অতঃপর অনুষ্ঠান

নরেন্দ্রনাথের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ইহা সহজেই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, প্রথম দিবসের যে-সকল কথার জন্য তিনি ঠাকুরকে অর্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেই কেবলমাত্র সেই-সকল কথার অর্থবোধ হয়। কিন্তু তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসু যুক্তিপরায়ণ মন ঐ কথা সহসা স্বীকার করে কিরূপে? সুতরাং ঈশ্বর যদি কখনও তাঁহাকে ঐসকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য প্রদান করেন তখন উহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি উহাদিগের সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির করিতে অগ্রসর না হইয়া, কেমন করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিয়া স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইবেন, এখন হইতে ঠাকুরের নিকট আগমন-পূর্বক তদ্বিষয় শিক্ষা ও আলোচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের বর্তমান মানসিক অবস্থা

তেজস্বী মন কোনরূপ নূতনত্ব-গ্রহণকালে নিজ পূর্বমতের পরিবর্তন করিতে আপনার ভিতরে একটা প্রবল বাধা অনুভব করিতে থাকে। নরেন্দ্রনাথেরও এখন ঠিক ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে সম্যক গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না, এবং আকৃষ্ট অনুভব করিয়াও তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ঐরূপ চেষ্টার ফলে কতদূর কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

[1] ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব সরল ভাষায় উক্ত দর্শনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই ভাষার যথাযথ প্রয়োগ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা তাঁহার ভাষা যথাসাধ্য রাখিয়া আমরা উহা এখানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। দর্শনোক্ত দেবশিশু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অন্য এক সময়ে জানিয়াছিলাম, ঠাকুর স্বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

৫.৯. পঞ্চম অধ্যায়: ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রের পূর্ব-জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষসমূহ—নিদ্রার পূর্বে জ্যোতিঃদর্শন

আমরা বলিয়াছি, অদ্ভুত পুণ্যসংস্কারসমূহ লইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য অপর-সাধারণ হইতে ভিন্ন ভাবের প্রত্যক্ষসকল তাঁহার জীবনে নানা বিষয়ে ইতঃপূর্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নরেন্দ্র বলিতেন—"আজীবন, নিদ্রা যাইব বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভ্রূমধ্যভাগে এক অপূর্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাইতাম এবং এক মনে উহার নানারূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে থাকিতাম। উহা দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া লোকে যেভাবে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, আমি সেইভাবে শয্যায় শয়ন করিতাম। ঐ অপূর্ব বিন্দু নানা বর্ণে পরিবর্তিত ও বর্ধিত হইয়া ক্রমে

বিম্বাকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া যাইয়া আপাদমস্তক শুভ্র-তরল জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত!—ঐরূপ হইবামাত্র চেতনালুপ্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইতাম! আমি জানিতাম, ঐরূপেই সকলে নিদ্রা যায়। বহুকাল পর্যন্ত ঐরূপ ধারণা ছিল। বড় হইয়া যখন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঐ জ্যোতির্বিন্দু প্রথমেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং উহাতেই চিত্ত একাগ্র করিতাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে কয়েকজন বয়স্যের সহিত যখন নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলাম, তখন ধ্যান করিবার কালে কাহার কিরূপ দর্শন ও উপলব্ধি উপস্থিত হইল, পরস্পরে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতাম। ঐ সময়ে তাহাদিগের কথাতেই বুঝিয়াছিলাম, ঐরূপ জ্যোতিঃদর্শন তাহাদিগের কখনও হয় নাই এবং তাহাদিগের কেহই আমার ন্যায় পূর্বোক্তভাবে নিদ্রা যায় না!”

দেশ-কাল-পাত্রবিশেষ-দর্শনে পূর্বস্মৃতির উদয়

“আবার বাল্যকাল হইতে সময়ে সময়ে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানবিশেষ দেখিবামাত্র মনে হইত উহাদিগের সহিত আমি বিশেষ পরিচিত, ইতিপূর্বে কোথায় উহাদিগকে দেখিয়াছি! স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতাম, কিছুতেই মনে আসিত না—কিন্তু কোনমতে ধারণা হইত না যে, উহাদিগকে ইতিপূর্বে দেখি নাই! প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ হইত! হয়তো, বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কোন স্থানে নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে এমন সময় তাহাদিগের মধ্যে একজন একটা কথা বলিল, অমনি সহসা মনে হইল—তাই তো এই গৃহে, এইসকল ব্যক্তির সহিত, এই বিষয় লইয়া আলাপ যে ইতিপূর্বে করিয়াছি এবং তখনও যে এই ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিয়াছিল! কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিতাম না—কোথায়, কবে ইহাদিগের সহিত ইতিপূর্বে এইরূপ আলাপ হইয়াছিল! পুনর্জন্মবাদের বিষয় যখন অবগত হইলাম তখন ভাবিয়াছিলাম, তবে বুঝি জন্মান্তরে ঐসকল দেশ ও পাত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, এবং তাহারই আংশিক স্মৃতি কখনও কখনও আমার অন্তরে ঐরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। পরে বুঝিয়াছি, ঐ বিষয়ের ঐরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। এখন[1] মনে হয়, ইহজন্মে যে-সকল বিষয় ও ব্যক্তির সহিত আমাকে পরিচিত হইতে হইবে, জন্মিবার পূর্বে সেইসকলকে চিত্রপরম্পরায় আমি কোনরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং উহারই স্মৃতি, জন্মিবার পরে, আমার অন্তরে আজীবন সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে।”

ঠাকুরের দৈবীশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া নরেন্দ্রের জল্পনা ও বিস্ময়

ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং সমাধিস্থ হইবার কথা নানা লোকের[2] নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কোনরূপ অবস্থান্তর বা অদ্‌ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইবে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াইল। দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে আগমন করিয়া উপর্যুপরি দুই দিন তাঁহার যেরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইল তাহার তুলনায় তাঁহার পূর্বপরিদৃষ্ট প্রত্যক্ষসকল নিতান্ত ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার ইয়ত্তা করিতে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি পরাভব স্বীকার করিল। সুতরাং ঠাকুরের বিষয় অনুধাবন করিতে যাইয়া তিনি এখন বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঠাকুরের অচিন্ত্য দৈবীশক্তি-সহায়েই যে তাঁহার ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এ বিষয়ে সংশয় করিবার তিনি বিন্দুমাত্র কারণও অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই, এবং মনে মনে ঐ বিষয়ে যতই আলোচনা করিয়াছিলেন ততই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্র কতদূর উচ্চ অধিকারী ছিলেন

বাস্তবিক ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহসা যেরূপ অদ্‌ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শাস্ত্র বলেন, স্বল্পশক্তিসম্পন্ন সামান্য-অধিকারী

মানবের জীবনে ঐরূপ প্রত্যক্ষ বহুকালের ত্যাগ ও তপস্যায় বিরল উপস্থিত হয় এবং কোনরূপে একবার উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুর ভিতরে ঈশ্বরপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইয়া সে এককালে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। নরেন্দ্র যে ঐরূপ করেন নাই–ইহা স্বল্প বিস্ময়ের কথা নহে; এবং উহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কতদূর উচ্চ অধিকারী ছিলেন। অতি উচ্চ আধার ছিলেন বলিয়াই ঐ ঘটনায় তিনি এককালে আত্মহারা হইয়া পড়েন নাই, এবং সংযত থাকিয়া ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও আচরণের পরীক্ষা ও কারণ নির্ণয়ে আপনাকে বহুকাল পর্যন্ত নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিভূত না হইলেও এবং এককালে বশ্যতা স্বীকার না করিলেও, তিনি এখন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুর কতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন

প্রথম সাক্ষাতের দিবস হইতে ঠাকুরও অন্যপক্ষে নরেন্দ্রনাথের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। অপরোক্ষবিজ্ঞানসম্পন্ন মহানুভব গুরু সুযোগ্য শিষ্যকে দেখিবামাত্র আপনার সমুদয় জীবন-প্রত্যক্ষ তাহার অন্তরে ঢালিয়া দিবার আকুল আগ্রহে যেন এককালে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে গভীর আগ্রহের পরিমাণ হয় না, সে স্বার্থগন্ধশূন্য অহেতুক অধৈর্য, পূর্ণসংযত-আত্মারাম গুরুগণের হৃদয়ে কেবলমাত্র দৈব প্রেরণাতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রেরণাবশেই জগদ্‌গুরু মহাপুরুষগণ উত্তম অধিকারী শিষ্যকে দেখিবামাত্র অভয় ব্রহ্মজ্ঞপদবীতে আরূঢ় করাইয়া তাহাকে আপ্তকাম ও পূর্ণ করিয়া থাকেন।[3]

প্রথম দিবসে নরেন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞ-পদবীতে আরূঢ় করাইবার ঠাকুরের চেষ্টা

নরেন্দ্রনাথ যেদিন দক্ষিণেশ্বরে একাকী আগমন করেন, ঠাকুর যে ঐদিন তাঁহাকে এককালে সমাধিস্থ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞপদবীতে আরূঢ় করাইতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। কারণ, উহার তিন-চারি বৎসর পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র যখন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য ঠাকুরের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আমাদিগের সম্মুখে অনেক সময় বলিতেন, "কেন? তুই যে তখন বলিয়াছিলি তোর বাপ-মা আছে, তাদের সেবা করিতে হইবে?" আবার কখনও বা বলিতেন, "দেখ, একজন মরিয়া ভূত হইয়াছিল। অনেককাল একাকী থাকায় সঙ্গীর অভাব অনুভব করিয়া সে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কোন স্থানে মরিয়াছে শুনিলেই সে সেখানে ছুটিয়া যাইত। ভাবিত, এইবার বুঝি তার একজন সঙ্গী জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃত ব্যক্তি গঙ্গাবারি-স্পর্শে বা অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় একাকী কালযাপন করিত। ঐরূপে সে ভূতের সঙ্গীর অভাব আর কিছুতেই ঘুচে নাই। আমারও ঠিক ঐরূপ দশা হইয়াছে। তোকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম এইবার বুঝি আমার একটি সঙ্গী জুটিল–কিন্তু তুইও বলিলি, তোর বাপ-মা আছে। কাজেই আমার আর সঙ্গী পাওয়া হইল না!" ঐরূপে ঐ দিবসের ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অতঃপর নরেন্দ্রনাথের সহিত অনেক সময় রঙ্গ-পরিহাস করিতেন।

নরেন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসের অদ্‌ভুত প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ

সে যাহা হউক, সমাধিস্থ হইবার উপক্রমে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইতে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন যেরূপে নিরস্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। ঘটনা ঐরূপ হওয়ায় নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে তিনি যাহা দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদিগের অনুমান, সেইজন্যই তিনি নরেন্দ্র তৃতীয় দিবস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে শক্তিবলে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নানা রহস্যকথা তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজ প্রত্যক্ষসকলের সহিত উহাদিগের

ঐক্য দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুমান সত্য হইলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পূর্বোক্ত দুই দিবসে একই প্রকারের সমাধি-অবস্থা লাভ করেন নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত দুই দিবসে তাঁহার দুই বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঠাকুরের ভয়

নরেন্দ্রনাথকে পূর্বোক্তভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুর একভাবে নিশ্চিন্ত হইলেও, তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না। কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন, যে-সকল গুণ বা শক্তিপ্রকাশের মধ্যে একটির বা দুইটির মাত্র অধিকারী হইয়া মানব সংসারে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ঐরূপ আঠারোটি শক্তিপ্রকাশ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, এবং ঈশ্বর, জগৎ ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে চরম-সত্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র উহাদিগকে সম্যকরূপে আধ্যাত্মিক পথে নিযুক্ত করিতে না পারিলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপ হইলে নরেন্দ্র অন্য সকল নেতাদিগের ন্যায় এক নবীন মত ও দলের সৃষ্টিমাত্র করিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া যাইবে; কিন্তু বর্তমান যুগ-প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য যে উদার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধি ও প্রচার আবশ্যক, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিয়া জগতের যথার্থ কল্যাণসাধন করা তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং নরেন্দ্র যাহাতে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সদৃশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারেন, সেজন্য এখন হইতে ঠাকুরের প্রাণে অসীম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর সর্বদা বলিতেন—গেঁড়ে, ডোবা প্রভৃতি যে-সকল জলাধারে স্রোত নাই সেখানেই যেমন দল বা নানারূপ উদ্ভিজ্জ-দামের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে আংশিক সত্যমাত্রকে মানব পূর্ণ সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে, সেখানেই দল বা গণ্ডিনিবদ্ধ সঙ্ঘসকলের উদয় হইয়া থাকে। অসাধারণ মেধা ও মানসিক-গুণসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ বিপথে গমন করিয়া পাছে ঐরূপ করিয়া বসেন, এই ভয়ে ঠাকুর কতরূপে তাঁহাকে পূর্ণসত্যের অধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

ঠাকুরের নরেন্দ্রের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণ

অতএব দেখা যাইতেছে, নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার প্রথম হইতেই ঠাকুর নানা কারণে তাঁহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন এবং যতদিন না তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রের আর পূর্বোক্তভাবে বিপথে গমন করিবার সম্ভাবনা নাই, ততদিন পর্যন্ত উক্ত আকর্ষণ তাঁহাতে সহজ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে নাই। ঐসকল কারণের অনুধাবনে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, উহাদের কতকগুলি নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজ অদ্ভুত দর্শনসমূহ হইতে সম্ভূত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টগুলি, পাছে নরেন্দ্র কালধর্মপ্রভাবে দারৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার মহৎ জীবনের চরমলক্ষ্যসাধনে আংশিকভাবে অসমর্থ হন, এই ভয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

উক্ত আকর্ষণ উপস্থিত হওয়া যেন স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী

বহুকালব্যাপী ত্যাগ ও তপস্যার ফলে ক্ষুদ্র 'অহং মম'-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় জগৎ-কারণের সহিত নিত্য অদ্বৈতভাবে অবস্থিত ঠাকুর ঈশ্বরের জনকল্যাণসাধনরূপ কর্মকে আপনার বলিয়া অনুক্ষণ উপলব্ধি করিতেছিলেন। উহারই প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি-নাশ-রূপ সুমহৎ কার্য তাঁহার শরীর-মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া সাধিত হয়, ইহাই বিরাটেচ্ছার অভিপ্রেত। আবার উহারই প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র স্বার্থসুখসাধনের জন্য শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগে

পূর্বোক্ত জনকল্যাণসাধনরূপ কর্মে তাঁহাকে সহায়তা করিতেই আগমন করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থশূন্য নিত্যমুক্ত নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ হইবে এবং তাঁহার প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? অতএব আপাতদৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আকর্ষণ দেখিয়া বিস্ময়ের উদয় হইলেও, উহা যে স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী তাহা স্বল্পচিন্তার ফলেই বুঝিতে পারা যায়।

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা সাংসারিক ভাবের নহে

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কতদূর নিকটাত্মীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং কিরূপ তন্ময়ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন তাহার আভাস প্রদান করা একপ্রকার সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়া থাকে। সংসারী মানব যে-সকল কারণে অপরকে আপনার জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণ করিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র এখানে বর্তমান ছিল না; কিন্তু নরেন্দ্রের বিরহে এবং মিলনে ঠাকুরের যেরূপ ব্যাকুলতা এবং উল্লাস দর্শন করিয়াছি তাহার বিন্দুমাত্রেরও দর্শন অন্যত্র কোথাও আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নিষ্কারণে একজন অপরকে যে এতদূর ভালবাসিতে পারে, ইহা আমাদিগের ইতঃপূর্বে জ্ঞান ছিল না! নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অদ্‌ভুত প্রেম দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, কালে সংসারে এমন দিন আসিবে যখন মানব মানবের মধ্যে ঈশ্বরপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সত্য সত্যই ঐরূপ নিষ্কারণে ভালবাসিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।

উক্ত ভালবাসা সম্বন্ধে স্বামী প্রেমানন্দের কথা

ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী প্রেমানন্দ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ইতঃপূর্বে সপ্তাহ বা কিঞ্চিদধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে আসিতে না পারায় ঠাকুর তাঁহার জন্য কিরূপ উৎকণ্ঠিতচিত্তে তখন অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে তিনি মোহিত হইয়া ঐ বিষয়ে আমাদের নিকট অনেকবার কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন –

স্বামী প্রেমানন্দের প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও ঠাকুরকে নরেন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠিত দর্শন

"স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত হাটখোলার ঘাটে নৌকায় উঠিতে যাইয়া ঐদিন রামদয়ালবাবুকে তথায় দেখিতে পাইলাম। তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন জানিয়া আমরা একত্রেই এক নৌকায় উঠিলাম এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় রানী রাসমণির কালীবাটীতে পৌঁছিলাম। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি মন্দিরে ৺জগদম্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া 'এখানটায় সিঁড়ি, উঠিতে হইবে—এখানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতঃপূর্বেই তাঁহার ভাববিভোর হইয়া বাহ্যসংজ্ঞা হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এজন্য ঠাকুরকে এখন ঐরূপে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া বুঝিলাম তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তপোশখানির উপর উপবেশন করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসাপূর্বক আমার মুখ ও হস্ত-পদাদির লক্ষণপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত আমার হাতখানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুক্ষণ নিজহস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বেশ'। ঐরূপে কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। উহার পরে রামদয়ালবাবুকে শ্রীযুত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, 'সে অনেকদিন এখানে আসে নাই, তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, একবার আসিতে বলিও।'"

ঠাকুরের সারারাত্র দারুণ উৎকণ্ঠা দর্শনে প্রেমানন্দের চিন্তা

"ধর্মবিষয়ক নানা কথাবার্তায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকে–উঠানের উত্তরে যে বারান্দা আছে তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য ঘরের ভিতরেই শয্যা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল অতীত হইতে-না-হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের ন্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়ালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো, ঘুমুলে?' আমরা উভয়ে শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'আজ্ঞে না।' উহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে; তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো; সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ; তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।' রামদয়ালবাবু কিছুকাল পূর্ব হইতেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেছিলেন, সেজন্য ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ঠাকুরের ঐরূপ বালকের ন্যায় আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন, এবং রাত্রি পোহাইলেই নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিবেন ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র প্রশমন হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও, পরক্ষণেই ঐ কথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকটে পুনরায় আগমনপূর্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার কি অদ্‌ভুত ভালবাসা এবং যাহার জন্য ইনি ঐরূপ করিতেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর! সেই রাত্রি ঐরূপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল। পরে রজনী প্রভাত হইলে মন্দিরে যাইয়া ৺জগদম্বাকে দর্শন করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্বক আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।"

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠনাথের কথা

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু[4] দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ অনেক দিন আসেন নাই বলিয়া ঠাকুর বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বলেন, "সেদিন ঠাকুরের মন যেন নরেন্দ্রময় হইয়া রহিয়াছে, মুখে নরেন্দ্রের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্য কথা নাই! আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বগুণী; আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন; তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না!'–বলিতে বলিতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য এককালে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রবিরহে মাতা যেরূপ কাতরা হন সেইরূপে অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুতেই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এবং আমরা তাঁহার এরূপ ব্যবহারে কি ভাবিব মনে করিয়া ঘরের উত্তরদিকে বারান্দায় দ্রুতপদে চলিয়া যাইলেন, এবং 'মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাকতে পারি না', ইত্যাদি রুদ্ধস্বরে বলিতে বলিতে বিষম ক্রন্দন করিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া কাতর-করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'এত কাঁদলাম, কিন্তু নরেন্দ্র তো এল না; তাকে একবার দেখবার জন্য প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্ছে; কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বুঝে না'–এইরূপ বলিতে বলিতে আবার অস্থির হইয়া তিনি গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বুড়ো মিনসে, তার জন্য এইরূপে অস্থির হয়েছি ও কাঁদচি দেখে লোকেই বা কি বলবে, বল দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না, কিন্তু অপরে দেখে কি ভাববে, বল দেখি? কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পাচ্ছি না!' নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয়ই নরেন্দ্র দেবতুল্য পুরুষ হইবেন, নতুবা তাঁহার প্রতি ঠাকুরের এত টান কেন? পরে ঠাকুরকে শান্ত করিবার জন্য বলিতে

লাগিলাম, ‘তাই তো মহাশয়, তার ভারি অন্যায়, তাকে না দেখে আপনার এত কষ্ট হয়–এ কথা জেনেও সে আসে না!’ এই ঘটনার কিছুকাল পরে অন্য এক দিবসে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের বিরহে ঠাকুরকে যেমন অধীর দেখিয়াছি তাঁহার সহিত মিলনে আবার তাঁহাকে তেমনি উল্লসিত হইতে দেখিয়াছি। পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিথিদিবসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভক্তগণ সেদিন তাঁহাকে নূতন বস্ত্র, সচন্দন-পুষ্প-মাল্যাদি পরাইয়া মনোহর সাজে সাজাইয়াছিল। তাঁহার ঘরের পূর্বে, বাগানের দিকের বারান্দায় কীর্তন হইতেছিল। ঠাকুর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে কখনও কিছুক্ষণের জন্য ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন, কখনও বা এক একটি মধুর আখর দিয়া কীর্তন জমাইয়া দিতেছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্র না আসায় তাঁহার আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে চারিদিকে দেখিতেছিলেন এবং আমাদিগকে বলিতেছিলেন, ‘তাই তো নরেন্দ্র আসিল না!’ বেলা প্রায় দুই প্রহর, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া সভামধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার স্কন্ধে বসিয়া গভীর ভাবাবিষ্ট হইলেন। পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথায় ও তাঁহাকে আহারাদি করাইতে ব্যাপৃত হইলেন। সেদিন তাঁহার আর কীর্তন শুনা হইল না।”

ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইয়াও নরেন্দ্রের অচল থাকা তাঁহার উচ্চাধিকারিত্বের পরিচয়

ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র যে দেবদুর্লভ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহাতে অবিচলিত থাকিয়া তিনি যে যথার্থ সত্যলাভের আশায় ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সত্যানুরাগ তাঁহার ভিতরে কতদূর প্রবল ছিল। অন্যপক্ষে ঠাকুর যে নরেন্দ্রের ঐরূপ ভাবে ক্ষুণ্ণ না হইয়া শিষ্যের কল্যাণের নিমিত্ত পরীক্ষা প্রদানপূর্বক তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সকল বিষয় উপলব্ধি করাইয়া দিতে পরম আহ্লাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিরভিমানিত্ব এবং মহানুভবত্বের কথা অনুধাবন করিয়া বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ঐরূপে নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধের কথা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই একপক্ষে পরীক্ষা করিয়া লইবার এবং অন্যপক্ষে পরীক্ষা প্রদানপূর্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল উপলব্ধি করাইয়া দিবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইব, এবং বুঝিতে পারিব, যথার্থ গুরু উচ্চ অধিকারী ব্যক্তির ভাব রক্ষা করিয়া কিরূপে শিক্ষাদানে অগ্রসর হন ও পরিণামে কিরূপে তাহার হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও পূজার স্থল অধিকার করিয়া বসেন।

[1] এই অদ্‌ভুত প্রত্যক্ষের কথা শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, এবং শেষ জীবনে তিনি উহার সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন।

[2] আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে শ্রীযুত নরেন্দ্র কলিকাতার জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইন্স্টিটিউশন নামক বিদ্যালয় হইতে এফ.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উদারচেতা সুপণ্ডিত হেস্টি সাহেব তখন উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন এবং ছাত্রদিগের সহিত সরল সপ্রেম আচরণের জন্য নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। সাহিত্যের অধ্যাপক সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় হেস্টি সাহেব একদিন এফ.এ. ক্লাসের ছাত্রবৃন্দকে সাহিত্য অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি তাহাদিগকে উক্ত অবস্থার কথা যথাবিধি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে

একাগ্রতা হইতে উক্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে; ঐপ্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওয়া যায় – একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি – তাঁহার উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।” ঐরূপে হেস্টি সাহেবের নিকট হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের কথা প্রথম শ্রবণ করিবার পরে সুরেন্দ্রনাথের আলয়ে তাঁহার প্রথম দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মসমাজে ইতঃপূর্বে গতিবিধি থাকায় তিনি ঠাকুরের কথা ঐ স্থানেও শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

[3] শাস্ত্রে ইহা শাম্ভবী দীক্ষা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাম্ভবী দীক্ষার বিস্তারিত বিবরণের জন্য ‘গুরুভাব, উত্তরার্ধ – ৪র্থ অধ্যায়’ দ্রষ্টব্য।

[4] শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।

৫.১০. ষষ্ঠ অধ্যায়–প্রথম পাদ: ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

নরেন্দ্র ঠাকুরের পূতসঙ্গ কতকাল লাভ করিয়াছিলেন

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের পূত সহবাসলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। পাঠক হয়তো ইহাতে বুঝিবেন যে, আমরা বলিতেছি তিনি ঐ কয় বর্ষ নিরন্তর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহা নহে। কলিকাতাবাসী অন্য সকল ভক্তগণের ন্যায় তিনিও ঐ কয় বৎসর বাটী হইতেই ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিয়াছিলেন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, প্রথম হইতে ঠাকুরের অশেষ ভালবাসার অধিকারী হওয়ায় ঐ কয় বৎসর তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে এক বা দুই দিবস তথায় গমন এবং অবসর পাইলেই দুই-চারি দিন বা ততোধিক কাল তথায় অবস্থান করা নরেন্দ্রনাথের জীবনে ক্রমে একটা প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সময়ে ঐ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার প্রতি প্রথম হইতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ নিয়ম বড় একটা ভঙ্গ করিতে দেন নাই। কোন কারণে নরেন্দ্রনাথ এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে না আসিতে পারিলে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য এককালে অধীর হইয়া উঠিতেন এবং উপর্যুপরি সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে নিজ সকাশে আনয়ন করিতেন, অথবা স্বয়ং কলিকাতায় আগমনপূর্বক তাঁহার সহিত কয়েক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেন। আমাদের যতদূর জানা আছে, ঠাকুরের

সহিত পরিচিত হইবার পরে প্রথম দুই বৎসর ঐরূপে নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিতভাবে গমনাগমনের বড় একটা ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু বি.এ. পরীক্ষা দিবার পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পিতার সহসা মৃত্যু হইয়া সংসারের সমস্ত ভার যখন তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল, তখন নানা কারণে কিছুদিনের জন্য তিনি পূর্বোক্ত নিয়ম ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের উক্ত কালের আচরণের পাঁচটি বিভাগ

সে যাহা হউক, উক্ত পাঁচ বৎসর কাল ঠাকুর যেভাবে নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে উহাতে পাঁচটি প্রধান বিভাগ নয়নগোচর হয় –

১ম–দেখা যায়, ঠাকুর তাঁহার অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের ন্যায় উচ্চ অধিকারী আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিরল, এবং বহুকালসঞ্চিত গ্লানি দূরপূর্বক সনাতনধর্মকে যুগপ্রয়োজনসাধনানুযায়ী করিয়া সংস্থাপনরূপ যে কার্যে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ সহায়তা করিবার জন্যই শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন।

২য়–অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসায় তিনি নরেন্দ্রনাথকে চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৩য়–নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এবং জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার নিকটে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে নাই।

৪র্থ–নানাভাবে শিক্ষা প্রদানপূর্বক তিনি নরেন্দ্রনাথকে উক্ত সুমহান জীবনোদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী যন্ত্রস্বরূপে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

৫ম–শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইলে অপরোক্ষ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন নরেন্দ্রনাথকে তিনি, কিরূপে ধর্মসংস্থাপনকার্যে অগ্রসর হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্বক পরিণামে উক্ত কার্যের এবং নিজ সঙ্ঘের ভার তাঁহার হস্তে নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করিয়াছিলেন।

অদ্ভুত দর্শন হইতে ঠাকুরের নরেন্দ্রের উপর বিশ্বাস ও ভালবাসা

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বর আগমনের স্বল্পকাল পূর্বে তদীয় মহত্ত্ব-পরিচায়ক কয়েকটি অদ্ভুত দর্শন ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি-সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল। উহাদিগের প্রভাবেই তিনি নরেন্দ্রকে প্রথম হইতে অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐ বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ে আজীবন সমভাবে প্রবাহিত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতএব বুঝা যাইতেছে, বিশ্বাস ও ভালবাসার ভিত্তিতে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে শিক্ষাপ্রদান ও সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার কারণ

প্রশ্ন হইতে পারে, যোগদৃষ্টি-সহায়ে নরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এবং জীবনোদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াও ঠাকুর তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, মায়ার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া দেহধারণ করিলে মানবসাধারণের কা কথা–ঠাকুরের ন্যায় দেব-মানবদিগের দৃষ্টিও স্বল্পবিস্তর পরিচ্ছিন্ন হইয়া দৃষ্ট-বিষয়ে ভ্রম-সম্ভাবনা উপস্থিত করে। সেজন্যই কখনও কখনও ঐরূপ পরীক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে। ঠাকুর আমাদিগকে ঐ বিষয় বুঝাইতে যাইয়া বলিতেন, "খাদ না থাকিলে গড়ন হয় না", অথবা বিশুদ্ধ স্বর্ণের সহিত অন্য ধাতু মিলিত না করিলে যেমন উহাতে অলঙ্কার গঠন করা চলে না, সেইরূপ জ্ঞানপ্রকাশক শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত রজঃ ও তমোগুণ কিঞ্চিন্মাত্র মিলিত না হইলে উহা হইতে অবতার-পুরুষদিগের ন্যায় দেহ-মনও উৎপন্ন হইতে পারে না। ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা

ইতঃপূর্বে দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় অদ্‌ভুত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়া অলৌকিক দর্শনসমূহ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইলেও, তিনি কত সময়ে ঐসকল দর্শন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তবে উহাদিগকে নিশ্চিন্তমনে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাঁহার যে-সকল অদ্‌ভুত দর্শন এখন উপস্থিত হইয়াছিল সে-সকলকেও তিনি যে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি আছে?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে যেভাবে দেখিতেন

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আচরণের পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগ পূর্বোক্তরূপে নির্দিষ্ট হইলেও, উহাদিগের মধ্যে বিশ্বাস ও ভালবাসা, পরীক্ষা এবং শিক্ষাপ্রদানরূপ তিনটি বিভাগের কার্য যে প্রায় যুগপৎ আরব্ধ হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হয়। উক্ত তিন বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের কার্যের, অথবা নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিচয় আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে সংক্ষেপে দিয়াছি। ঐ বিষয়ের আরও অনেক কথা আমাদিগকে পরে বলিতে হইবে। কারণ, এখন হইতে ঠাকুরের জীবন নরেন্দ্রনাথের জীবনের সহিত যেরূপ বিশেষভাবে জড়িত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত অন্য কোন ভক্তের জীবনের সহিত উহা ইতঃপূর্বে আর কখনও ঐরূপে মিলিত হয় নাই। কথিত আছে, ভগবান ঈশা তাঁহার কোন শিষ্যপ্রবরের সহিত মিলিত হইবামাত্র বলিয়াছিলেন, “পর্বতসদৃশ অচল অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই পুরুষের জীবনকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া আমি আমার আধ্যাত্মিক মন্দির গঠিত করিয়া তুলিব!” নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের মনেও ঐরূপ ভাব দৈবপ্রেরণায় প্রথম হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাঁহার বালক, তাঁহার সখা, তাঁহার আদেশ পালন করিতেই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তাঁহার ও তাহার জীবন পূর্ব হইতে চিরকালের মতো প্রণয়িযুগলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমবন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!—তবে, ঐ প্রেম উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেম—যাহা প্রেমাস্পদকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াও যুগে যুগে আপনার করিয়া রাখে, যাহাতে আপনার জন্য কিছু না চাহিয়া পরস্পর পরস্পরকে যথাসর্বস্বদানেই কেবলমাত্র পরিতৃপ্তিলাভ করে। বাস্তবিক ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা অহেতুক প্রেমের যেরূপ অভিনয় দেখিয়াছি, সংসার ইতঃপূর্বে আর কখনও ঐরূপ দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই অলৌকিক প্রেমাভিনয়ের কথা পাঠককে যথাযথভাবে বুঝাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? তথাপি সত্যানুরোধে উহার আভাসপ্রদানের চেষ্টামাত্র করিয়া আমরা নরেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের সর্বপ্রকার আচরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নরেন্দ্রের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমধারণা

ঠাকুরের একনিষ্ঠা, ত্যাগ এবং পবিত্রতা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার প্রতি প্রথম দিন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ঠাকুরও বোধ হয় তেমনি যুবক নরেন্দ্রের অসীম আত্মবিশ্বাস, তেজস্বিতা এবং সত্যপ্রিয়তা-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রথম দর্শন হইতে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। যোগদৃষ্টি-সহায়ে নরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা গণনায় না আনিয়া যদি আমরা এই পুরুষপ্রবরের পরস্পরের প্রতি অদ্‌ভুত আকর্ষণের কারণ-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে পূর্বোক্ত কথাই প্রতীয়মান হয়। অন্তর্দৃষ্টিশূন্য জনসাধারণ শ্রীযুত নরেন্দ্রের অদ্‌ভুত আত্মবিশ্বাসকে দম্ভ বলিয়া, অসীম তেজস্বিতাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া এবং কঠোর সত্যপ্রিয়তাকে মিথ্যাভান অথবা অপরিণত বুদ্ধির নিদর্শন বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। লোকপ্রশংসালাভে তাঁহার একান্ত উদাসীনতা, স্পষ্টবাদিতা, সর্ববিষয়ে নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন ব্যবহার এবং সর্বোপরি কোন কার্য কাহারও ভয়ে গোপন না করা হইতেই তাহারা যে ঐরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল, এ কথা নিঃসন্দেহ। আমাদের মনে আছে, শ্রীযুত নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে তাঁহার জনৈক প্রতিবেশী তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “এই বাটীতে একটা ছেলে আছে, তাহার মতো ত্রিপণ্ড ছেলে কখনও দেখি নাই;

বি.এ. পাশ করেছে বলে যেন ধরাকে সরা দেখে, বাপ-খুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই চুরুট খেতে খেতে চলল—এইরূপ সকল বিষয়ে!”

ঠাকুরের নিকট হইতে গ্রন্থকারের নরেন্দ্রের প্রশংসা-শ্রবণ

উহার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একদিন—বোধ হয় সেদিন আমরা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তাঁহার পুণ্য-দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলাম—আমরা নরেন্দ্রনাথের গুণানুবাদ এইরূপে শুনিতে পাইয়াছিলাম—রতন নামক যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটীর প্রধান কর্মচারীর সহিত কথা কহিতে কহিতে আমাদিগকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাস করিয়াছে (এফ.এ. পাস দিবার জন্য সেই বৎসর আমরা প্রস্তুত হইতেছিলাম), শিষ্ট, শান্ত; কিন্তু নরেন্দ্রের মতো একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না!—যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে! সে রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না!—আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ—টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোক-কান টিপে কোন রকমে দু-তিনটে পাস করেছে, ব্যস, এই পর্যন্ত—ঐ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে-খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?” ঐরূপ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার মানসে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মহাশয়, নরেন্দ্র কোথায় থাকে?” তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “নরেন্দ্র বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, বাড়ি সিমলায়।” পরে কলিকাতায় ফিরিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, আমরা ইতঃপূর্বে প্রতিবেশীর নিকট হইতে যাহার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত নিন্দাবাদ শুনিয়াছিলাম সেই যুবকই ঠাকুরের বহুপ্রশংসিত নরেন্দ্রনাথ! বিস্মিত হইয়া আমরা সেদিন ভাবিয়াছিলাম, বাহিরের কতকগুলি কার্যমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা সময়ে সময়ে অপরের সম্বন্ধে কতদূর অন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়া বসি!

প্রথম দর্শনদিবসে নরেন্দ্রের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভ্রমধারণা

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। ঠাকুরের শ্রীমুখে নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ গুণানুবাদ শুনিবার কয়েক মাস পূর্বে জনৈক বন্ধুর ভবনে শ্রীযুত নরেন্দ্রের দর্শনলাভ একদিন আমাদিগের ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁহাকে দর্শনমাত্রই করিয়াছিলাম, ভ্রমধারণাবশতঃ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হই নাই। কিন্তু তাঁহার সেইদিনকার কথাগুলি এমন গভীরভাবে আমাদিগের স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, এতকাল পরেও উহাদিগকে যেন কাল শুনিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া থাকে। কথাগুলি বলিবার পূর্বে যে অবস্থায় আমরা উহাদিগকে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস পাঠককে দেওয়া কর্তব্য; নতুবা শ্রীযুত নরেন্দ্রের সম্বন্ধে সেদিন আমাদিগের কেন ভ্রমধারণা উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা বুঝিতে পারা যাইবে না।

জনৈক বন্ধুর ভবনে নরেন্দ্রকে প্রথম দেখা

যে বন্ধুর আলয়ে আমরা সেদিন শ্রীযুত নরেন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম, তিনি তখন কলিকাতার সিমলাপল্লীস্থ গৌরমোহন মুখার্জী লেনে নরেন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখেই একটি দ্বিতলবাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। স্কুলে পড়িবার কালে আমরা চারি-পাঁচ বৎসর সহপাঠী ছিলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার দুই বৎসর পূর্বে তিনি বিলাত যাইবেন বলিয়া বোম্বাই পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সমুদ্রপারে গমনে অসমর্থ হইয়া একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন

এবং মধ্যে মধ্যে বাঙলায় প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া পুস্তকসকল প্রণয়ন করিতেছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ ঘটনার পরে নানা লোকের মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাঁহার স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে এবং নানা অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ঘটনা সত্য বা মিথ্যা নির্ধারণ করিবার জন্যই আমরা সেদিন সহসা তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

ঐ কালে নরেন্দ্রের বাহ্যিক আচরণ

ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া আমরা বাহিরের ঘরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে একজন যুবক সহসা সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ একটি তাকিয়ায় অর্ধশায়িত হইয়া একটি হিন্দী গীতের একাংশ গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন। যতদূর মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, কারণ, 'কানাই' ও 'বাঁশরী' এই দুইটি শব্দ কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল। শৌখিন না হইলেও, যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ, কেশের পারিপাট্য এবং উন্মনা দৃষ্টির সহিত 'কালার বাঁশরী'র গান ও আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ সুনয়নে দেখিতে পাইলাম না। গৃহমধ্যে আমরা যে বসিয়া রহিয়াছি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার এবং পরে তামাকু সেবন করিতে দেখিয়া আমরা ধারণা করিয়া বসিলাম, আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুচর এবং এইরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়াই তাঁহার অধঃপতন হইয়াছে। সে যাহা হউক, গৃহমধ্যে আমাদের অস্তিত্ব দেখিয়াও তিনি ঐরূপ বিষম উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া আপন ভাবে থাকায়, আমরাও তাঁহার সহিত পরিচয়ে অগ্রসর হইলাম না।

বন্ধুর সহিত নরেন্দ্রের সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলাপ

কিছুক্ষণ পরে আমাদিগের বাল্যবন্ধু বাহিরে আসিলেন এবং বহুকাল পরে পরস্পরে সাক্ষাৎলাভ করিলেও, আমাদিগের দুই-একটি কথামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই পূর্বোক্ত যুবকের সহিত সানন্দে নানা বিষয়ের আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঐরূপ উদাসীনতা ভাল লাগিল না। তথাপি সহসা বিদায়গ্রহণ করাটা ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া, সাহিত্যসেবী বন্ধু যুবকের সহিত ইংরাজী ও বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে যে বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তদ্বিষয়ে শ্রবণ করিতে লাগিলাম। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাবপ্রকাশক হইবে, এই বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ভ করিলেও, মনুষ্যজীবনের যে-কোন প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, সকল প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করিবার পক্ষ আমাদিগের বন্ধু অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং যুবক ঐ পক্ষ খণ্ডনপূর্বক তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, সু বা কু যে কোন প্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি সুরুচিসম্পন্ন এবং কোন প্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য যুবক তখন 'চসর' (Chaucer) হইতে আরম্ভ করিয়া যত খ্যাতনামা ইংরাজী ও বাঙলা সাহিত্যিকের পুস্তকসকলের উল্লেখ করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাঁহারা সকলেই ঐরূপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। উপসংহারে যুবক বলিয়াছিলেন, "সু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শবিশেষকে প্রকাশ করিতেই সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে–They idealise what is apparently real. পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল

অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে–They want to realise the ideal.—ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা সর্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। ঐরূপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি–সেজন্যই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।”

উহার পরে ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের মহত্ত্বের পরিচয়লাভ

যুবকের ঐ প্রকার গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য এবং পাণ্ডিত্যে সেদিন চমৎকৃত হইলেও, আমাদিগের বন্ধুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া তাঁহার কথায় ও কাজে মিল নাই ভাবিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। অনন্তর বিদায় গ্রহণপূর্বক আমরা সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রীযুত নরেন্দ্রের গুণানুবাদশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং পূর্বপরিদৃষ্ট যুবককে ঠাকুরের বহুপ্রশংসিত নরেন্দ্রনাথ বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম।

প্রথম দেখা হইতে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে বুঝিতে পারা

গতানুগতিক স্বভাবসম্পন্ন সাধারণ মানব ঐরূপে নরেন্দ্রনাথের বাহ্য আচরণসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে দাম্ভিক, উদ্ধত এবং অনাচারী প্রভৃতি বলিয়া অনেক সময় ধারণা করিয়া বসিলেও ঠাকুর কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কখনও ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয়েন নাই। প্রথম দর্শনকাল হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নরেন্দ্রের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানসিক শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ বিশাল আত্মবিশ্বাস হইতে সমুদিত হয়, তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বাধীন আচরণ তাঁহার স্বাভাবিক আত্মসংযমের পরিচায়ক ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাঁহার লোকমান্যে উদাসীনতা তদীয় পূত স্বভাবের আত্মপ্রসাদ হইতেই সমুত্থিত হইয়া থাকে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কালে নরেন্দ্রের অসাধারণ স্বভাব সহস্রদল কমলের ন্যায় পূর্ণবিকশিত হইয়া নিজ অনুপম গৌরব ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তাপদগ্ধ সংসারের সংঘর্ষে আসিয়া তাঁহার ঐ দম্ভ ও ঔদ্ধত্য অসীম করুণাকারে পরিণত হইবে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব আত্মবিশ্বাস হতাশ প্রাণে বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাঁহার স্বাধীন আচরণ সংযমরূপ সীমায় সর্বদা অবস্থিত থাকিয়া যথার্থ স্বাধীনতালাভের উহাই একমাত্র পথ বলিয়া অপরকে নির্দেশ করিবে।

উচ্চ আধার বুঝিয়া নরেন্দ্রকে প্রকাশ্যে প্রশংসা

সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই ঠাকুর সকলের নিকটে শতমুখে নরেন্দ্রের প্রশংসা করিতেছেন! প্রকাশ্যভাবে সর্বদা প্রশংসালাভ করিলে দুর্বল মনে অহঙ্কার প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশের পথে অগ্রসর করে, এ কথা বিশেষভাবে জানিয়াও যে তিনি নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহার কারণ–তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন নরেন্দ্রের হৃদয়-মন ঐরূপ দুর্বলতা হইতে অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করিতেছে। ঐ বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন –

নরেন্দ্রের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

মহামনস্বী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মনেতৃগণ ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত হইয়া একদিন একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। যুবক নরেন্দ্রও তথায় উপবিষ্ট আছেন। ঠাকুর ভাবমুখে অবস্থিত হইয়া প্রসন্নমনে কেশব ও বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাহার ভাবী জীবনের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানসপটে সহসা অঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং উহার সহিত কেশবপ্রমুখ ব্যক্তিদিগের পরিণত

জীবনের তুলনা করিয়া তিনি পরম স্নেহে নরেন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সভাভঙ্গ হইলে বলিলেন, "দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরের জ্ঞান-সূর্য উদিত হইয়া মায়া-মোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে!" অন্তর্দৃষ্টিশূন্য দুর্বলচেতা মানব ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ঐরূপ প্রশংসা লাভ করিলে, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত। নরেন্দ্রের মনে কিন্তু উহাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের উদয় হইল। তাঁহার অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন উহাতে আপনার ভিতরে ডুবিয়া যাইয়া, শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের অশেষ গুণরাজির সহিত নিজ তাৎকালিক মানসিক অবস্থার নিরপেক্ষ তুলনায় প্রবৃত্ত হইল, এবং আপনাকে ঐরূপ প্রশংসালাভের অযোগ্য দেখিয়া ঠাকুরের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—"মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার ঐরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয় এবং কোথায় আমার ন্যায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া!—আপনি তাঁহাদিগের সহিত আমার তুলনা করিয়া আর কখনও ঐরূপ কথাসকল বলিবেন না।" ঠাকুর উহাতে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি করব রে, তুই কি ভাবিস আমি ঐরূপ বলিয়াছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা তো আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাই, তাই বলিয়াছি।"

নরেন্দ্রের ঐ কথার প্রতিবাদ

'মা দেখাইয়াছেন ও বলাইয়াছেন' বলিলেই ঠাকুর ঐরূপ স্থলে নরেন্দ্রের হস্তে সর্বদা নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা নহে। তাঁহার ঐরূপ দর্শনসকলের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া স্পষ্টবাদী নির্ভীক নরেন্দ্র অনেক সময়ে বলিয়া বসিতেন, "মা দেখাইয়া থাকেন, অথবা আপনার মাথার খেয়ালে ঐসকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আমার ঐরূপ হইলে আমি নিশ্চয় বুঝিতাম, আমার মাথার খেয়ালে ঐরূপ দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে যে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক স্থলে প্রতারিত করে। তদুপরি বিষয়বিশেষ-দর্শনের বাসনা যদি আমাদিগের মনে সতত জাগরিত থাকে, তাহা হইলে তো কথাই নাই, উহারা (ইন্দ্রিয়গ্রাম) আমাদিগকে পদে পদে প্রতারিত করিয়া থাকে। আপনি আমাকে স্নেহ করেন এবং সকল বিষয়ে আমাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করেন—সেইজন্য হয়তো আপনার ঐরূপ দর্শনসকল আসিয়া উপস্থিত হয়।"

নরেন্দ্রের তর্কশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা

ঐরূপ বলিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞানে স্বসংবেদ্য দর্শনসমূহ-সম্বন্ধে যেসকল অনুসন্ধান ও গবেষণা আছে এবং যেরূপে তাহাদিগকে ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রমাণিত করা হইয়াছে, সেইসকল বিষয় নানা দৃষ্টান্তসহায়ে ঠাকুরকে বুঝাইতে সময়ে সময়ে অগ্রসর হইতেন। ঠাকুরের মন যখন উচ্চ ভাবভূমিতে অবস্থান করিত, তখন নরেন্দ্রের ঐরূপ বাল-সুলভ চেষ্টাকে সত্যনিষ্ঠার পরিচায়কমাত্র ভাবিয়া তিনি তাহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইতেন। কিন্তু সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে নরেন্দ্রের তীক্ষ্ণ যুক্তিসকল ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন সরল মনকে অভিভূত করিয়া কখনও কখনও বিষম ভাবাইয়া তুলিত। তখন মুগ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেন, 'তাইতো, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র তো মিথ্যা বলিবার লোক নহে; তাহার ন্যায় দৃঢ় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিসকলের মনে সত্য ভিন্ন মিথ্যা সঙ্কল্পের উদয় হয় না, এ কথা শাস্ত্রেও আছে; তবে কি আমার দর্শনসমূহে ভ্রমসম্ভাবনা আছে?' আবার ভাবিতেন, 'কিন্তু আমি তো ইতঃপূর্বে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাই এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বারংবার আশ্বাসও পাইয়াছি, তবে সত্যপ্রাণ নরেন্দ্র আমার

দর্শনসকল মাথার খেয়ালে উপস্থিত হয়, এ কথা বলে কেন?—কেন তাহার মন বলিবামাত্র ঐসকলকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে না?'

ঐরূপ ভাবনায় পতিত হইয়া মীমাংসার জন্য ঠাকুর অবশেষে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং "ওর (নরেন্দ্রের) কথা শুনিস কেন? কিছুদিন পরে ও (নরেন্দ্র) সব কথা সত্য বলে মানবে"—তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এইরূপ আশ্বাস-বাণী শুনিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে একদিনের ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠকের পূর্বোক্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত—সাধারণ সমাজে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে দেখিতে আসা

তখন কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া ব্রাহ্মগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা কয়েক বৎসর হইল হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ শ্রীযুত কেশবের নিকট সময়ে সময়ে গমনাগমন করিলেও সাধারণ সমাজেই নিয়মিতভাবে যোগদানপূর্বক রবিবাসরীয় উপাসনাকালে তথায় ভজনাদি করিতেছেন। কোন কারণবশতঃ নরেন্দ্র এই সময়ে দুই-এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর প্রতিদিন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষাপূর্বক নিরাশ হইয়া স্থির করিলেন, স্বয়ং কলিকাতায় যাইয়া অদ্য নরেন্দ্রকে দেখিয়া আসিবেন। পরে মনে পড়িল, সেদিন রবিবার—নরেন্দ্র যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোথাও গমন করে এবং কলিকাতায় যাইয়াও তাহার দেখা না পান? তখন স্থির করিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সান্ধ্যোপাসনাকালে সে ভজন গাহিতে নিশ্চিত উপস্থিত হইবে, সেখানে যাইলেই তাহাকে দেখিতে পাইব। আবার ভাবিলেন, সহসা সমাজে ঐরূপে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মভক্তগণের অসন্তোষের কারণ হইব না তো? পরক্ষণেই মনে হইল—কেন, কেশবের সমাজে ঐরূপ কয়েকবার উপস্থিত হইয়াও তো তাহাদিগের সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষ দেখি নাই এবং বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি সাধারণ সমাজের নেতৃগণ তো দক্ষিণেশ্বরে ঐরূপে ইতঃপূর্বে অনেক সময় আসিয়াছেন? ঠাকুরের সরল মন ঐরূপ সরলভাবে ঐ কথা মীমাংসা করিবার কালে একটি বিষয় স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইল। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতের পরিবর্তন লক্ষ্যপূর্বক শিবনাথ-প্রমুখ সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণের অনেকে যে তাঁহার নিকটে পূর্বের ন্যায় গমনাগমন ক্রমশঃ ছাড়িয়া দিতেছেন, এ কথা ঠাকুরের মনে ক্ষণকালের জন্যও উদিত হইল না। না হইবারই কথা—কারণ, ঈশ্বরের প্রতি তীব্র অনুরাগে মানব-মন উচ্চ ভাব-ভূমিকায় আরোহণপূর্বক তাঁহার পূর্ণ কৃপাসৌভাগ্যলাভে যত অগ্রসর হইবে, ততই তাহার ইতঃপূর্বের ধর্মমতসকল ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইবে, এ বিষয়ে সত্যতা তিনি আজীবন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মগণ সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই এতকাল সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, অতএব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকলের ইতি নির্দেশ করিতে তাঁহারা যে এখন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইবেন, এ কথা তিনি বুঝিবেন কিরূপে?

তাঁহার তথায় আগমনের ফল

সন্ধ্যা সমাগতা। শত ব্রাহ্মভক্তের পূত হৃদয়োচ্ছ্বাস 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মন্ত্রসহায়ে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইতে লাগিল। ক্রমে উপাসনা ও ধ্যান পরিসমাপ্ত করিয়া ঈশ্বরানুরাগ ও আধ্যাত্মিক ঐকান্তিকতা বৃদ্ধির জন্য আচার্য বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে সম্বোধনপূর্বক উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে অর্ধবাহ্য-অবস্থাপন্ন ঠাকুর ব্রাহ্মমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বেদিকায় উপবিষ্ট আচার্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে ইতঃপূর্বে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহসা আগমনের বার্তা সঙ্ঘমধ্যে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না এবং ইতঃপূর্বে যাঁহারা তাঁহাকে কখনও দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা বেঞ্চির উপরে উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ঐরূপে সঙ্ঘমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে দেখিয়া আচার্য নিজ কার্যসাধনে বিরত হইলেন এবং ভজনমণ্ডলীমধ্যে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুর যে জন্য সহসা

তথায় উপস্থিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বেদীস্থ আচার্য বা সমাজস্থ অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে সাদরাহ্বান করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে বিজয়কৃষ্ণ-প্রমুখ ব্রাহ্মগণের মধ্যে পূর্বোক্ত মতদ্বৈধ আনয়নের কারণরূপে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার প্রতি সাধারণ শিষ্টাচার প্রদর্শনেও সেদিন উদাসীন হইয়া রহিলেন।

জনতানিবারণ জন্য গ্যাস-নির্বাণ করা

ঠাকুর এদিকে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার উক্ত অবস্থা দেখিবার জন্য উপস্থিত জনসাধারণের আগ্রহবৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব-বিশৃঙ্খলতার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না; এবং উহা নিবারণ করা অসম্ভব দেখিয়া জনতা ভাঙিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-গৃহের প্রায় সমস্ত গ্যাসালোক নির্বাপিত করা হইল। ফলে মন্দিরের বাহিরে আসিবার জন্য অন্ধকারে জনতামধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

নরেন্দ্রের ঠাকুরকে কোনরূপে বাহিরে আনয়ন ও দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছাইয়া দেওয়া

সমাজস্থ কেহ ঠাকুরকে সাদরে গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র ইতঃপূর্বে মর্মাহত হইয়াছিলেন। অন্ধকারে কিরূপে তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে আনয়ন করিবেন, তদ্বিষয়ে তিনি এখন বিষম চিন্তিত হইলেন। অতঃপর ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইবামাত্র মন্দিরের পশ্চাতের দ্বার দিয়া তিনি তাঁহাকে কোনরূপে বাহিরে আনয়নপূর্বক তাঁহার সহিত গাড়িতে উঠিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র বলিতেন, "আমার জন্য ঠাকুরকে সেদিন ঐরূপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া মনে কতদূর দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব। ঐ কার্যের জন্য তাঁহাকে সেদিন কত না তিরস্কার করিয়াছিলাম। তিনি কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনায় ক্ষুণ্ণ হওয়া বা আমার কথায় কর্ণপাত করা, কিছুই করেন নাই।"

তাহাকে ভালবাসিবার জন্য নরেন্দ্রের ঠাকুরকে তিরস্কার ও তাঁহার জগন্মাতার বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হওয়া

"আমার প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি ঐরূপে আপনার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না দেখিয়া তাঁহার উপর বিষম কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও কখনও কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। বলিতাম– পুরাণে আছে, ভরত রাজা 'হরিণ' ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পরে হরিণ হইয়াছিল, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার আমার বিষয়ে অত চিন্তা করার পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক হওয়া উচিত! বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর আমার ঐসকল কথা শুনিয়া বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'ঠিক বলেছিস; তাই তো রে, তাহলে কি হবে, আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না।' দারুণ বিমর্ষ হইয়া ঠাকুর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) ঐ কথা জানাইতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না; মা বললেন–তুই ওকে (নরেন্দ্রকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস, যেদিন ওর (নরেন্দ্রের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।' ঐরূপে আমি ইতঃপূর্বে যত কথা বুঝাইয়াছিলাম, ঠাকুর সেইসকলকে এক কথায় সেইদিন উড়াইয়া দিয়াছিলেন।"

৫.১১. ষষ্ঠ অধ্যায়–দ্বিতীয় পাদ: ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

নরেন্দ্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের বাণী

নরেন্দ্রনাথের পবিত্র হৃদয়-মন উচ্চভাবসমূহকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা কার্যে অগ্রসর হয়, ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এ কথা প্রথম দিন হইতে ধরিতে সক্ষম হইয়াছিল। নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের দৈনন্দিন আচরণসকল সেজন্যই অন্য ভাবের হইতে নিত্য দেখা যাইত। ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া আহার, বিহার, শয়ন, নিদ্রা, জপ, ধ্যানাদি সর্ববিধ বিষয়ে যে ঠাকুর নানা নিয়ম স্বয়ং পালনপূর্বক নিজ ভক্তসকলকে ঐরূপ করিতে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন, তিনিই আবার নিঃসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে এ কথা বারংবার স্পষ্ট বলিতেন, নরেন্দ্র ঐ নিয়মসকলের ব্যতিক্রম করিলেও তাহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় হইবে না! 'নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ'–'নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ'–'নরেন্দ্রের ভিতরে জ্ঞানাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া সর্বপ্রকার আহার্যদোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, সেজন্য যেখানে-সেখানে যাহা-তাহা ভোজন করিলেও তাহার মন কলুষিত বা বিক্ষিপ্ত হইবে না'– 'জ্ঞানখড়্গ-সহায়ে সে মায়াময় সমস্ত বন্ধনকে নিত্য খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, মহামায়া সেজন্য তাহাকে কোন মতে নিজায়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না'–নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঐরূপ কত কথাই না আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে নিত্য শুনিতে পাইয়া তখন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতাম।

মারোয়াড়ী ভক্তদিগের আনীত আহার্য নরেন্দ্রকে দান

মারোয়াড়ী ভক্তগণ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া মিছরি, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া যাইল। ঠাকুর ঐসকলের কিছুমাত্র স্বয়ং গ্রহণ করিলেন না, সমীপাগত কোন ভক্তকেও দিলেন না, বলিলেন, "উহারা (মারোয়াড়ীরা) নিষ্কামভাবে দান করিতে আদৌ জানে না, সাধুকে এক খিলি পান দিবার সময়েও ষোলটা কামনা তাহার সহিত জুড়িয়া দেয়, ঐরূপ সকাম দাতার অন্ন-ভোজনে ভক্তির হানি হয়!" সুতরাং প্রশ্ন উঠিল– তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্যসকল কি করা যাইবে? ঠাকুর বলিলেন, "যা, নরেন্দ্রকে ঐসকল দিয়ে আয়, সে ঐসকল খাইলেও তাহার কোন হানি হইবে না!"

নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনে নরেন্দ্রের ভক্তিহানি হইবে না

নরেন্দ্র হোটেলে খাইয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিল, "মহাশয়, আজ হোটেলে সাধারণে যাহাকে অখাদ্য বলে, খাইয়া আসিয়াছি।" ঠাকুর বুঝিলেন, নরেন্দ্র বাহাদুরী প্রকাশের জন্য ঐ কথা বলিতেছে না, কিন্তু সে ঐরূপ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে বা তাঁহার গৃহস্থিত ঘটি বাটি প্রভৃতি পাত্রসকল ব্যবহার করিতে দিতে যদি তাঁহার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে পূর্ব হইতে সাবধান হইতে পারিবেন, এজন্য ঐরূপ বলিতেছে। ঐরূপ বুঝিয়া বলিলেন, "তোর তাহাতে দোষ লাগিবে না; শোর গোরু খাইয়া যদি কেহ ভগবানে মন রাখে, তাহা হইলে উহা হবিষ্যান্নের তুল্য, আর শাকপাতা খাইয়া যদি বিষয়-বাসনায় ডুবে থাকে, তাহা হইলে উহা শোর গোরু খাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে বড় নহে। তুই অখাদ্য খাইয়াছিস তাহাতে আমার কিছুই মনে হইতেছে না, কিন্তু (অন্য সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগের কেহ যদি আসিয়া ঐ কথা বলিত, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারিতাম না!"

ঠাকুরের ভালবাসায় নরেন্দ্রের উন্নতি ও আত্মবিক্রয়

ঐরূপে প্রথম দর্শনকাল হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকটে যেরূপ ভালবাসা, প্রশংসা ও সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে যথাযথ বুঝানো একপ্রকার সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। মহানুভব শিষ্যের আন্তরিক শক্তির এতদূর সম্মান রাখিয়া তাহার সহিত সর্ববিষয়ে আচরণ করা জগদ্‌গুরুগণের জীবনেতিহাসে অন্যত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ঠাকুর অন্তরের সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে না বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, সকল বিষয়ে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেন, তাঁহার সহিত তর্ক করাইয়া সমীপাগত ব্যক্তিসকলের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের বল পরীক্ষা করিয়া লইতেন, এবং সম্যকরূপে পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহাকে কখনও অনুরোধ করিতেন না। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ শ্রীযুত নরেন্দ্রের আত্মবিশ্বাস, পুরুষকার, সত্যপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধাভক্তিকে স্বল্পকালের মধ্যেই শতধারে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল এবং তাঁহার অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় চতুর্দিকে অবস্থানপূর্বক অসীম স্বাধীনতাপ্রিয় নরেন্দ্রকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে সর্বত্র সকল প্রকার প্রলোভন ও হীন আচরণের হস্ত হইতে নিত্য রক্ষা করিয়াছিল। ঐরূপে প্রথম দর্শন-দিবসের পরে বৎসরকাল অতীত হইতে না হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রেমে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের অহেতুক প্রেমপ্রবাহ তাঁহাকে ধীরে ধীরে ঐ পথে কতদূর অগ্রসর করিয়াছে, তাহা কি তখন তিনি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন?—বোধ হয় নহে। বোধ হয়, ঠাকুরের অপার্থিব প্রেমলাভে অননুভূতপূর্ব বিশুদ্ধ আনন্দে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকিত বলিয়া উহা যে কতদূর দুর্লভ দেববাঞ্ছিত পদার্থ, তাহা স্বার্থপর কঠোর সংসারের সংঘর্ষে আসিয়া তুলনায় বিশেষরূপে বুঝিতে তখনও তাঁহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। পূর্বোক্ত কথাসকল পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে কয়েকটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলে মন্দ হইবে না:

শ্রীযুত ম–র সহিত নরেন্দ্রের তর্ক বাধাইয়া দেওয়া

ঠাকুরের নিকটে শ্রীযুত নরেন্দ্রের আগমনের কয়েক মাস পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা শ্রীযুত 'ম' দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। বরাহনগরে অবস্থান করায় কিরূপে তখন তাঁহার কয়েকবার উপর্যুপরি ঠাকুরের নিকট আসিবার সুবিধা হইয়াছিল, ঠাকুরের দুই-চারিটি জ্ঞানগর্ভ শ্লেষপূর্ণ বাক্য তাঁহার জ্ঞানাভিমান বিদূরিত করিয়া কিরূপে তাঁহাকে চিরকালের মতো বিনীত শিক্ষার্থীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ঐসকল কথা তিনি তৎপ্রণীত গ্রন্থের স্থানবিশেষে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "ঐ কালে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম। পঞ্চবটীতলে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে ঠাকুর সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হস্তধারণপূর্বক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'আজ তোর বিদ্যা-বুদ্ধি বুঝা

যাবে; তুই তো মোটে আড়াইটা পাস করিয়াছিস, আজ সাড়ে তিনটা পাস[1] করা মাস্টার এসেছে; চল, তার সঙ্গে কথা কইবি।' অগত্যা ঠাকুরের সহিত যাইতে হইল এবং ঠাকুরের ঘরে যাইয়া শ্রীযুত ম-র সহিত পরিচিত হইবার পরে নানা বিষয়ে আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। ঐরূপে আমাদিগকে কথা কহিতে লাগাইয়া দিয়া ঠাকুর চুপ করিয়া বসিয়া আমাদিগের আলাপ শুনিতে ও আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীযুত ম–সেদিন বিদায় গ্রহণপূর্বক চলিয়া যাইলে বলিলেন, 'পাস করিলে কি হয়, মাস্টারটার মাদীভাব[2]; কথা কহিতেই পারে না!' ঠাকুর ঐরূপে আমাকে সকলের সহিত তর্কে লাগাইয়া দিয়া তখন রঙ্গ দেখিতেন।"

ভক্ত শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বোধ হয়, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ইনি ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেন। কিন্তু কর্মস্থল পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে থাকায় পূজাদির অবকাশ ভিন্ন অন্য সময়ে ইনি ঠাকুরের নিকটে বড় একটা আসিতে পারিতেন না। কেদারনাথ ভক্ত সাধক ছিলেন এবং বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত ভাব অবলম্বন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভজন-কীর্তনাদি শুনিলে তাঁহার দু-নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। ঠাকুর সেজন্য সকলের নিকটে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কেদারনাথের ভগবৎপ্রেম দেখিয়া ঢাকার বহু লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিত। অনেকে আবার তাঁহার উপদেশমত ধর্মজীবন-গঠনে অগ্রসর হইত। শুনা যায়, ঠাকুরের নিকটে যখন বহু লোকের সমাগম হইতে থাকে, তখন ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি এক সময়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, 'মা, আমি আর এত বকতে পারি না; তুই কেদার, রাম, গিরিশ ও বিজয়কে[3] একটু একটু শক্তি দে, যাতে লোকে তাদের কাছে গিয়ে কিছু শেখবার পরে এখানে (আমার নিকটে) আসে এবং দুই-এক কথাতেই চৈতন্যলাভ করে!'–কিন্তু উহা অনেক পরের কথা।

কেদারের তর্কশক্তি ও নরেন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচয়

কিছুকালের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত কেদার ঐ কালে কলিকাতায় আগমনপূর্বক ঠাকুরের নিকটে মধ্যে মধ্যে আসিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও সাধক ভক্তকে নিকটে পাইয়া পরম উৎসাহে তাঁহার সহিত ধর্মালাপ করিতে এবং সমীপাগত অন্যান্য ভক্তগণকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছিলেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র এই সময় একদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া কেদারনাথকে দেখিতে পাইলেন এবং ভজন গাহিবার কালে তাঁহার ভাবাবেগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে কেদারের সহিতও ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য নরেন্দ্রনাথের তর্ক বাধাইয়া দিয়াছিলেন। কেদার আপনার ভাবে মন্দ তর্ক করিতেন না এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর বাক্যের অযৌক্তিকতা সময়ে সময়ে তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্যপ্রয়োগে নির্দেশ করিয়া দিতেন। বাদীকে এক দিন তিনি যে কথাগুলি বলিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুরের বিশেষ মনোজ্ঞ হওয়ায় ঐরূপ প্রশ্ন কেহ পুনরায় তাঁহার নিকটে উত্থাপিত করিলে ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন, কেদার ঐরূপ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেয়। বাদী সেদিন প্রশ্ন উঠাইয়াছিল, ভগবান যদি সত্যসত্যই দয়াময় হয়েন, তবে তাঁহার সৃষ্টিতে এত দুঃখকষ্ট অন্যায় অত্যাচারাদি সৃজন করিয়াছেন কেন? যথেষ্ট অন্ন উৎপন্ন না হওয়ায় সময়ে সময়ে সহস্র সহস্র লোকের দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু হয় কেন? কেদার তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "দয়াময় হইয়াও ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে দুঃখ কষ্ট, অপমৃত্যু ইত্যাদি রাখিবার কথা যেদিন স্থির করিয়াছিলেন, সেদিনকার মিটিং-এ (সভায়) আমাকে আহ্বান করেন নাই; সুতরাং কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে পারিব?" কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ যুক্তিতে সকলের সম্মুখে কেদারকে অদ্য নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

ঠাকুরের জিজ্ঞাসায় কেদারের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নিজমত প্রকাশ

কেদার বিদায়গ্রহণ করিবার পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি রে, কেমন দেখলি? কেমন ভক্তি বল দেখি, ভগবানের নামে একেবারে কেঁদে ফেলে! হরি বলতে যার চোখে ধারা বয়, সে জীবন্মুক্ত; কেদারটি বেশ—নয়?" পবিত্র-হৃদয় তেজীয়ান নরেন্দ্রনাথ ধর্মলাভ অথবা অন্য যে-কোন কারণে হউক, যাহারা পুরুষ শরীর ধারণপূর্বক নারীসুলভ ভাব অবলম্বন করে, তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। দৃঢ়সঙ্কল্প ও উদ্যমসহায় না হইয়া পুরুষ রোদন-মাত্রকে আশ্রয়পূর্বক ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে, এ কথা তাঁহার নিকটে পুরুষত্বের অবমাননা বলিয়া সর্বদা প্রতীত হইত। ঈশ্বরে একান্ত নির্ভর করিলেও পুরুষ চিরকাল পুরুষই থাকিবে এবং পুরুষের ন্যায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে, তাঁহার এইরূপ মত ছিল। সুতরাং ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথা সম্পূর্ণহৃদয়ে অনুমোদন করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "তা মহাশয়, আমি কেমন করিয়া জানিব? আপনি (লোক-চরিত্র) বুঝেন, আপনি বলিতে পারেন। নতুবা কান্নাকাটি দেখিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝা যায় না। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে চোখ দিয়া অমন কত জল পড়ে! আবার শ্রীমতীর বিরহসূচক কীর্তনাদি শুনিয়া যাহারা কাঁদে, তাহাদের অধিকাংশ নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত বিরহের কথা স্মরণ বা আপনাতে ঐ অবস্থার আরোপ করিয়া কাঁদে, তাহাতে সন্দেহ নাই! ঐরূপ অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার ন্যায় ব্যক্তিগণের মাথুর কীর্তন শুনিলেও অন্যের ন্যায় সহজেই কাঁদিবার প্রবৃত্তি কখনই আসিবে না।" ঐরূপে শ্রীযুত নরেন্দ্র যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, জিজ্ঞাসিত হইলে তাহা ঠাকুরের নিকটে সর্বদা নির্ভয় অন্তরে প্রকাশ করিতেন। ঠাকুরও উহাতে সর্বদা প্রসন্ন ভিন্ন কখনও রুষ্ট হইতেন না। কারণ, অন্তর্দর্শী ঠাকুর নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, সত্যপ্রাণ নরেন্দ্রের ভাবের ঘরে কিছুমাত্র চুরি নাই।

সাকারোপাসনার জন্য নরেন্দ্রের তিরস্কার, রাখালের ভয় ও ঠাকুরের কথায় উভয়ের মধ্যে পুনরায় প্রীতিস্থাপন

ঠাকুরের দর্শনলাভের স্বল্পকাল পূর্বে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই উপাসনা ও ধ্যানধারণা করিবেন, এই মর্মে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে এই সময়ে তিনি সহি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া উক্ত সমাজ-প্রচলিত সামাজিক আচারব্যবহারাদি অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। শ্রীযুত রাখাল এই কালের পূর্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন। শিশুর ন্যায় কোমল-প্রকৃতিসম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেন্দ্রনাথের সপ্রেম ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনিও ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের পূর্বোক্তপ্রকার অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরেই রাখালচন্দ্র ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতার্থ হয়েন এবং তাঁহার উপদেশে সাকারোপাসনার সুপ্ত প্রীতি রাখালের অন্তরে পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠে। উহার কয়েক মাস পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আসিতে আরম্ভ করেন এবং রাখালচন্দ্রকে তথায় দেখিয়া পরম প্রীত হয়েন। কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, রাখালচন্দ্র ঠাকুরের সহিত মন্দিরে যাইয়া দেববিগ্রহসকলকে প্রণাম করিতেছেন। সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র উহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া রাখালচন্দ্রকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া তীব্র অনুযোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া পুনরায় মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে দূষিত হইতে হইয়াছে।" কোমল-প্রকৃতি রাখাল বন্ধুর ঐরূপ কথায় নীরব রহিলেন এবং তদবধি কিছু কাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ঠাকুর রাখালচন্দ্রের ঐরূপ হইবার কারণ জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে মিষ্টবাক্যে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ, রাখালকে আর কিছু বলিসনি, সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়; তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা কি করবে, বল; সকলে কি প্রথম হইতে নিরাকার ধারণা করিতে পারে?" শ্রীযুত নরেন্দ্রও তদবধি রাখালের প্রতি দোষারোপ করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী করিতে ঠাকুরের চেষ্টা ও নরেন্দ্রের প্রতিবাদ

নরেন্দ্রনাথকে উত্তম অধিকারী জানিয়া প্রথম দিন হইতে ঠাকুর তাঁহাকে অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান করিতে প্রযত্ন করিতেন। দক্ষিণেশ্বর আসিলেই তিনি তাঁহাকে অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন। নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের দ্বৈতভাবে উপাসনায় নিযুক্ত নরেন্দ্রনাথের চক্ষে ঐসকল গ্রন্থ তখন নাস্তিক্য-দোষদুষ্ট বলিয়া মনে হইত। ঠাকুরের অনুরোধে একটু-আধটু পাঠ করিবার পরেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিতেন, "ইহাতে আর নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম-মরণশীল যাবতীয় পদার্থ সকলই ঈশ্বর–ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর কথা অন্য কি হইবে? গ্রন্থকর্তা ঋষিমুনিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এমন সকল কথা লিখিবেন কিরূপে?" ঠাকুর স্পষ্টবাদী নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ কথা শুনিয়া হাসিতেন এবং সহসা তাঁহার ঐরূপ ভাবে আঘাত না করিয়া বলিতেন, "তা তুই ঐ কথা এখন নাই বা নিলি, তা বলে মুনিঋষিদের নিন্দা ও ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিস কেন? তুই সত্যস্বরূপ ভগবানকে ডাকিয়া যা, তারপর তিনি তোর নিকটে যে ভাবে প্রকাশিত হইবেন, তাহাই বিশ্বাস করিবি।" কিন্তু ঠাকুরের ঐ কথা নরেন্দ্র বড় একটা শুনিতেন না। কারণ, যুক্তি দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠা হয় না, তাহাই তাঁহার নিকট তখন মিথ্যা বলিয়া মনে হইত এবং সর্বপ্রকার মিথ্যার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সুতরাং ঠাকুর ভিন্ন অন্য অনেকের নিকটেও কথাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতে এবং সময়ে সময়ে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

প্রতাপচন্দ্র হাজরা

প্রতাপচন্দ্র হাজরা নামক এক ব্যক্তি তখন দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানে অবস্থান করিতেন। প্রতাপের সাংসারিক অবস্থা পূর্বের ন্যায় সচ্ছল ছিল না। সেজন্য ধর্মলাভে প্রযত্ন করিলেও অর্থকামনা তাঁহার অন্তরে অনেক সময় আধিপত্য লাভ করিত। সুতরাং তাঁহার ধর্মাচরণের মূলে প্রায়ই সকাম ভাব থাকিত। কিন্তু বাহিরে ঐ কথা কাহাকেও জানিতে দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্বদা নিষ্কামভাবে উপাসনার উচ্চ উচ্চ কথাসকল লোকের নিকটে বলিয়া প্রশংসালাভে উদ্যত হইতেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ধর্ম-কর্ম করিবার কালে প্রতি পদে নিজ লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল এবং বোধ হয়, জপ-তপাদির দ্বারা কোনপ্রকার সিদ্ধাই লাভ করিয়া নিজ অর্থকামনা পূরণ করিবেন, এ কথাও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিত। ঠাকুর প্রথম দিন হইতেই তাঁহার অন্তরের ঐ প্রকার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং উহা ত্যাগ করিয়া যথার্থ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। দুর্বলচেতা হাজরা ঠাকুরের ঐ কথা কেবল যে লইতে পারেন নাই তাহা নহে, কিন্তু ভ্রমধারণা, অহঙ্কার এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় ঠাকুরের দর্শনকামনায় আগত ব্যক্তিসকলের নিকটে অবসর পাইলেই প্রচার করিতেন যে, তিনিও স্বয়ং একটা কম সাধু নহেন। ঐরূপ করিলেও বোধ হয় তাঁহার অন্তরে সৎ হইবার যথার্থ ইচ্ছা একটু-আধটু ছিল। কারণ, ঠাকুর তাঁহার ঐ প্রকার কার্যকলাপের কথা নিত্য জানিতে পারিলেও এবং উহার জন্য কখনও কখনও তীব্র তিরস্কার করিলেও তাঁহাকে তথা হইতে এককালে তাড়াইয়া দেন নাই। তবে তিনি আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সহিত অধিক মিশামিশি করিতে সতর্ক করিয়া দিতেন; বলিতেন, "হাজরা শালার ভারী পাটোয়ারী বুদ্ধি, ওর কথা শুনিসনি।"

হাজরা মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তায় নরেন্দ্রের প্রসন্নতা

অন্যান্য দোষ-গুণের সহিত হাজরা মহাশয়ের অন্তরে সহসা কোন বিষয় বিশ্বাস করিব না, এ ভাবটিও ছিল। তাঁহার ন্যায় স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের তুলনায় তাঁহার বুদ্ধিও মন্দ ছিল না। সেজন্য নরেন্দ্রনাথের ন্যায় ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন পাশ্চাত্য সন্দেহবাদী দার্শনিকগণের মতামত আলোচনা করিতেন, তখন তিনি উহার কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান নরেন্দ্র ঐজন্য

তাঁহার উপর প্রসন্ন ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই অবকাশমত দুই-এক ঘণ্টাকাল হাজরা মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া কাটাইতেন। নরেন্দ্রনাথের প্রখর বুদ্ধির সম্মুখে হাজরার মস্তক সর্বদা অবনত হইত। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীযুত নরেন্দ্রের কথাগুলি শুনিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। হাজরার প্রতি নরেন্দ্রের ঐরূপ সদয় ভাব দেখিয়া আমরা অনেকে রহস্য করিয়া বলিতাম, "হাজরা মহাশয় হচ্চেন নরেন্দ্রের 'ফেরেণ্ড' (friend)।"

নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আগমনে ঠাকুরের আচরণ

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর অনেক সময় তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন! পরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত পরমানন্দে তাঁহার সহিত ধর্মালাপে নিযুক্ত থাকিতেন। ঐ সময়ে তিনি যেন নানা কথায় ও চেষ্টায় উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে প্রযত্ন করিতেন। কখনও বা ঐরূপ সময়ে তাঁহার গান (ভজন) শুনিবার ইচ্ছা হইত এবং নরেন্দ্রের সুমধুর কণ্ঠ শুনিবামাত্র পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। নরেন্দ্রনাথের গান কিন্তু ঐজন্য থামিত না, তন্ময় হইয়া তিনি কয়েক ঘণ্টা কাল একের পর এক অন্য গীত গাহিয়া যাইতেন। ঠাকুর আবার অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া হয়তো নরেন্দ্রনাথকে কোন একটি বিশেষ সঙ্গীত গাহিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু সর্বশেষে নরেন্দ্রের মুখ হইতে 'যো কুছ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়' সঙ্গীতটি না শুনিলে তাঁহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইত না। পরে অদ্বৈতবাদের নানা রহস্য, যথা—জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ ইত্যাদি কথায় কতক্ষণ অতিবাহিত হইত। এইরূপে নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের তুফান ছুটিত।

অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে নরেন্দ্রের হাজরার নিকটে জল্পনা ও ঠাকুরের তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ

ঠাকুর ঐরূপে নরেন্দ্রনাথকে এক দিবস অদ্বৈতবিজ্ঞানের জীবব্রহ্মের ঐক্যসূচক অনেক কথা বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র ঐসকল কথা মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না এবং ঠাকুরের কথা সমাপ্ত হইলে হাজরা মহাশয়ের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে পুনরায় ঐসকল কথার আলোচনাপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "উহা কি কখনও হইতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যাহা কিছু দেখিতেছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর?" হাজরা মহাশয়ও নরেন্দ্রনাথের সহিত যোগদান করিয়া ঐরূপ ব্যঙ্গ করায় উভয়ের মধ্যে হাস্যের রোল উঠিল। ঠাকুর তখনও অর্ধবাহ্যদশায় ছিলেন। নরেন্দ্রকে হাসিতে শুনিয়া তিনি বালকের ন্যায় পরিধানের কাপড়খানি বগলে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং 'তোরা কি বলছিস রে' বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

উহার ফলে নরেন্দ্রের অদ্‌ভুত দর্শন

নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "ঠাকুরের ঐদিনকার অদ্‌ভুত স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্য সত্যই দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই! ঐরূপ দেখিয়াও কিন্তু নীরব রহিলাম, ভাবিলাম—দেখি কতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ভাব থাকে। কিন্তু সেই ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমিল না। বাটীতে ফিরিলাম, সেখানেও তাহাই—যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম, সে সকলই তিনি, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন করিতেছেন, সে-সকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে! দুই-এক গ্রাস খাইয়াই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। 'বসে আছিস কেন রে, খা না'—মায়ের ঐরূপ কথায় হুঁশ হওয়ায় আবার খাইতে আরম্ভ করিলাম। ঐরূপ খাইতে, শুইতে, কলেজ যাইতে, সকল সময়েই ঐরূপ দেখিতে লাগিলাম এবং সর্বদা কেমন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম। রাস্তায়

চলিয়াছি, গাড়ি আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু অন্য সময়ের ন্যায় উহা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না!—মনে হইত, উহাও যাহা আমিও তাহাই! হস্ত-পদ এই সময়ে সর্বদা অসাড় হইয়া থাকিত এবং আহার করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি হইত না। মনে হইত যেন অপর কেহ খাইতেছে। খাইতে খাইতে সময়ে সময়ে শুইয়া পড়িতাম এবং কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আবার খাইতে থাকিতাম। এক একদিন ঐরূপে অনেক অধিক খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহার জন্য কোনরূপ অসুখও হইত না!—মা ভয় পাইয়া বলিতেন, 'তোর দেখছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অসুখ হয়েছে'—কখনও কখনও বলিতেন, 'ও আর বাঁচবে না'। যখন পূর্বোক্ত আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমিয়া যাইত, তখন জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত! হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে লৌহরেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল, অথবা সত্যকার! হস্ত-পদের অসাড়তার জন্য মনে হইত, পক্ষাঘাত হইবে না তো? ঐরূপে কিছুকাল পর্যন্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম উহাই অদ্বৈতবিজ্ঞানের আভাস! তবে তো শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা নহে! তদবধি অদ্বৈততত্ত্বের উপরে আর কখনও সন্দিহান হইতে পারি নাই।"

নরেন্দ্রের সহিত গ্রন্থকারের একদিবস আলাপের ফল

অন্য একটি আশ্চর্য ঘটনাও আমরা নরেন্দ্রনাথের নিকটে সময়ান্তরে শুনিতে পাইয়াছিলাম। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে, যখন তাঁহার সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগের নিকটে ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের অনুমান ঘটনাটি এই কালে হইয়াছিল। সেজন্য এইখানেই ঐ বিষয়ে পাঠককে বলিতেছি। আমাদিগের স্মরণ আছে, বেলা দুই প্রহরের কিছু পূর্বে সেদিন আমরা সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটস্থ নরেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীও সেদিন আমাদিগের সঙ্গে ছিলেন। প্রথম দর্শন-দিন হইতে আমরা নরেন্দ্রের প্রতি যে দিব্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, বিধাতার নিয়োগে উহা সেদিন সহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতঃপূর্বে আমরা ঠাকুরকে একজন ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অদ্যকার প্রাণস্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অন্তরে নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, মহামহিম শ্রীচৈতন্য ও ঈশা প্রভৃতি জগদ্‌গুরু মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যে-সকল অলৌকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তদ্রূপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিত্যই ঘটিতেছে—ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই তিনি শরণাগত ব্যক্তির সংস্কারবন্ধন মোচনপূর্বক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিস্থ করিয়া দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন, অথবা তাহার জীবনগতি আধ্যাত্মিক পথে এরূপভাবে প্রবর্তিত করিতেছেন যে, অচিরে ঈশ্বরদর্শন উপস্থিত হইয়া চিরকালের মতো সে কৃতার্থ হইতেছে! আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যানুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া অন্তরের অদ্‌ভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্নরকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন –

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়!

চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়!

(তোরা কে নিবি রে আয়!)

প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!

প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু

নদে ভেসে যায়!

(গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে)

নদে ভেসে যায়!"

নরেন্দ্রের অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ

গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন আপনাকে আপনি সম্বোধনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "সত্য সত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন! কি অদ্ভুত শক্তি! (কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পরে বলিতেছেন) রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন! সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন!"

গ্রন্থকারের বাসস্থানে আসিয়া নরেন্দ্রের অপূর্ব উপলব্ধি

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া তামসী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও হইতেছে না।—কারণ, নরেন্দ্রের জ্বলন্ত ভাবরাশি মরমে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা আনিয়া দিয়াছে—যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে স্বপ্নরাজ্যে অপসৃত হইয়াছে, আর অহৈতুকী কৃপার প্রেরণায় অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সান্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্রপ্রবর্তন-করারূপ সত্য—যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনাসম্ভূত—তাহা তখন জীবন্ত সত্য হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে!—সময় কোথা দিয়া কিরূপে পলাইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সহসা শুনিতে পাইলাম রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময়ে নরেন্দ্র বলিলেন, "চল, তোমাদিগকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি।" যাইতে যাইতে আবার পূর্বের ন্যায় কথাসকলের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় আমরা এতদূর তন্ময় হইয়া যাইলাম যে, চাঁপাতলার নিকটে বাটীতে পৌঁছিবার পরে মনে হইল, শ্রীযুত নরেন্দ্রকে এতদূর আসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। সুতরাং বাটীতে আহ্বান করিয়া কিছু জলযোগ করাইবার পরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের বাটী পর্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম। সেদিনকার আর একটি কথাও বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়াই শ্রীযুত নরেন্দ্র সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "এ বাড়ি যে আমি ইতঃপূর্বে দেখিয়াছি! ইহার কোথা দিয়া কোথা যাইতে হয়, কোথায় কোন্ ঘর আছে, সে সকলি যে আমার পরিচিত—আশ্চর্য!" নরেন্দ্রনাথের জীবনে সময়ে সময়ে ঐরূপ অনুভব আসিবার কথা এবং উহার কারণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি। সেজন্য এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

[1] নরেন্দ্রনাথ তখন বি.এ. পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত ম বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন (বি.এল.) পড়িতেছিলেন - সেই কথাই ঠাকুর ঐরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন।

[2] ঠাকুর এ স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

[3] শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

৫.১২. সপ্তম অধ্যায়: ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের অদ্‌ভুত লোক-পরীক্ষা

অসাধারণ লক্ষণসমূহ দর্শনে উত্তম অধিকারী স্থির করিয়া প্রথম মিলনের দিবস হইতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নিজ অদৃষ্টপূর্ব অহেতুক ভালবাসায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরে সময়ে সময়ে পরীক্ষাপূর্বক আধ্যাত্মিক সর্ববিষয়ে শিক্ষাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এ কথা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। অতএব কিভাবে কতরূপে ঠাকুর নরেন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদাভাস এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া দলভঙ্গ হইবার উপক্রমে ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি পরীক্ষা না করিয়া যাহাকে তাহাকে লইয়া দলবৃদ্ধি কর, সুতরাং তোমার দল ভাঙিয়া যাইবে ইহাতে আশ্চর্য কি? পরীক্ষা না করিয়া আমি কখনও কাহাকেও গ্রহণ করি না।" বাস্তবিক, সমীপাগত ভক্তগণকে তাহাদিগের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ঠাকুর কতরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মনে হয়, নিরক্ষর বলিয়া যিনি জনসমাজে আপনাকে পরিচিত করিয়াছেন, লোকচরিত্র বুঝিবার এই সকল অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব উপায় তিনি কোথা হইতে কেমনে আয়ত্ত করিয়াছিলেন! মনে হয়, উহা কি তাঁহার পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যার ইহজন্মে স্বয়ংপ্রকাশ—অথবা, সাধন-প্রভাবে ঋষিকুলের ন্যায় অতীন্দ্রিয়দর্শিত্ব ও সর্বজ্ঞত্বলাভের ফল—অথবা, অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকটে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া যে নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন, সেই বিশেষত্বের কারণেই তাঁহার ঐরূপ জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল? ঐরূপ নানা কথার মনে উদয় হইলেও ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিতে আমরা সম্প্রতি অগ্রসর হইতেছি না, কিন্তু ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ যতদূর সম্ভব প্রদানপূর্বক পাঠকের উপরে ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পণ করিতেছি।

পরীক্ষা-প্রণালীর সাধারণ বিধি

লোকচরিত্র অবগত হইবার জন্য ঠাকুরকে যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি, তদ্বিষয়ক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই উহাদিগের অদ্‌ভুত অলৌকিকত্ব পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে; কিন্তু ঐরূপ করিবার পূর্বে উহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তি ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহার প্রতি একপ্রকার বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। ঐরূপ করিয়া যদি তাহার প্রতি তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত সাধারণভাবে ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাহাকে তাঁহার নিকটে যাওয়া-আসা করিতে বলিতেন। যত দিন যাইত এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যত গমনাগমন করিতে থাকিত ততই তিনি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠনভঙ্গী, মানসিক ভাবসমূহ, কাম-কাঞ্চনাসক্তি ও ভোগতৃষ্ণার পরিমাণ এবং তাঁহার প্রতি তাহার মন কিভাবে কতদূর আকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, চালচলন ও কথাবার্তায় প্রকাশিত এই সকল বিষয়ে তন্ন তন্ন লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণায় উপস্থিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐরূপে দুই-চারি দিন দর্শনের ফলেই তিনি ঐ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে এককালে নিঃসন্দেহ হইতেন। পরে ঐ ব্যক্তির অন্তরের নিগূঢ় কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহার যোগপ্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে উহা জানিয়া লইতেন। ঐ

সম্বন্ধে তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "রাত্রিশেষে একাকী অবস্থানকালে যখন তোদের কল্যাণ চিন্তা করিতে থাকি, তখন মা (জগদম্বা) সব কথা জানাইয়া ও দেখাইয়া দেন–কে কতদূর উন্নতিলাভ করিল, কাহার কিসের জন্য (ধর্মবিষয়ে) উন্নতি হইতেছে না, ইত্যাদি!" ঠাকুরের উক্ত কথায় পাঠক যেন না ভাবিয়া বসেন, তাঁহার যোগদৃষ্টি কেবলমাত্র ঐ সময়েই উন্মীলিত হইত। তাঁহার অন্যান্য কথায় বুঝিতে পারা যায়, ইচ্ছামাত্র তিনি উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণপূর্বক সকল সময়েই ঐরূপ দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইতেন; যথা–"কাঁচের আলমারির দিকে দেখিলেই যেমন তাহার ভিতরের পদার্থসমূহ নয়নগোচর হয়, তেমনি মানুষের দিকে তাকাইলেই তাহার অন্তরের চিন্তা, সংস্কারাদি সকল বিষয় দেখিতে পাইয়া থাকি!"–ইত্যাদি।

উচ্চ অধিকারীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে ঠাকুরের অনুরূপ ভাবাবেশ

ঠাকুর পূর্বোক্তভাবে লোকচরিত্র অবগত হইতে সাধারণতঃ অগ্রসর হইলেও বিশেষ বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের স্বল্পবিস্তর ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। দেখা যায়, তাহাদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ তিনি দৈবপ্রেরণায় উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে অবস্থিত হইয়াই করিয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, অদৃষ্টপূর্ব সাধনাবলে ঠাকুরের শরীর-মন, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি ধারণ ও জ্ঞাপনের বিচিত্র যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ কথা এককালে বর্ণে বর্ণে সত্য। আমরা নিয়ত দেখিতে পাইতাম, যাহার ভিতর যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব বর্তমান থাকিত তাহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তর কোন এক দিব্য প্রেরণায় সহসা অনুরূপ ভাবে রঞ্জিত হইয়া উঠিত; এবং পূর্ব কর্ম ও সংস্কারবশে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে যতদূর আরূঢ় হইয়াছে, তাহার আগমনমাত্রেই তাঁহার অন্তর স্বভাবতঃ ঐ ভূমিতে আরোহণ করিয়া আগন্তুকের অন্তরের কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিত। নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমনকালে ঠাকুরের যে-সকল উপলব্ধি আমরা ইতঃপূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাদিগের সহায়েই পাঠক আমাদিগের ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

পরীক্ষা-প্রণালীর চারি বিভাগ

ঐরূপ হইলেও লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের জন্য ঠাকুর যে সাধারণ বিধি সর্বদা অবলম্বন করিতেন, তাহা যে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেন না, তাহা নহে। সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে তাহাদিগের চালচলন, কথাবার্তাদি তিনি উহার সহায়ে সমভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং অন্যে পরে কা কথা, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথকেও তিনি ঐরূপে পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। অতএব ঐ বিষয়ের সহিত পাঠককে পরিচিত করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। ভক্তদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর যে উপায়সমূহ অবলম্বন করিতেন, তাহাদিগের মধ্যে চারিটি প্রধান বিভাগ নয়নগোচর হয়। আমরা ইতঃপূর্বেই ঐ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছি। অতএব ঐ বিভাগ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের উল্লেখপূর্বক দৃষ্টান্তসহায়ে উহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে এখন প্রবৃত্ত হইতেছি:

(১) শারীরিক লক্ষণসমূহ দর্শনে অন্তরের সংস্কারনির্ণয়

১ম–শারীরিক লক্ষণসমূহ দেখিয়া ঠাকুর সমীপাগত ব্যক্তিগণের অন্তরের প্রবল পূর্বসংস্কারসমূহ নির্ণয় করিতেন।

মনের প্রত্যেক সুব্যক্ত চিন্তা, ক্রিয়ারূপে পরিণত হইবার সহিত আমাদিগের মস্তিষ্কে এবং শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে এক একটা দাগ অঙ্কিত করিয়া যায়–বর্তমান যুগের শরীর ও মনোবিজ্ঞান ঐ বিষয় অনেকাংশে প্রমাণিত করিয়া আমাদিগকে এখন ঐ কথায় শ্রদ্ধাবান করিতেছে। বেদপ্রমুখ শাস্ত্রসকল কিন্তু ঐ কথা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুর শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শনাদি সকল শাস্ত্র সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'–ব্যক্তিবিশেষের অন্তরের চিন্তাপ্রবাহ কু বা সু পথে চলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও পরিবর্তিত হইয়া অনুরূপ

আকার ধারণ করিতে থাকে। সেইজন্য শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন দেখিয়া লোকের চরিত্রনির্ণয় করা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদকথা আমাদিগের ভিতর প্রচলিত আছে, এবং বিবাহ, দীক্ষাদান প্রভৃতি স্থলে কন্যা ও শিষ্যের হস্ত-পদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবয়বের এবং সর্বশরীরের গঠনপ্রকার দেখা একান্ত কর্তব্য বলিয়া একাল পর্যন্ত পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

ঐ বিষয়ে ঠাকুরের অদ্‌ভুত জ্ঞান

সর্বশাস্ত্রে বিশ্বাসবান ঠাকুর যে সুতরাং নিজ শিষ্যবর্গের শরীর ও অবয়বাদির গঠনপ্রকার লক্ষ্য করিবেন, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু কথাচ্ছলে সময়ে সময়ে তিনি ঐ বিষয়ে এত কথা আমাদিগকে বলিতে থাকিতেন যে, নির্বাক হইয়া আমরা চিন্তা করিতাম–ঐ সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা তিনি কোথা হইতে লাভ করিলেন! ভাবিতাম প্রাচীনকালে ঐ বিষয়ে কোন বৃহৎ গ্রন্থ কি বিদ্যমান ছিল–যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া তিনি ঐসকল কথা জানিতে পারিয়াছেন? কিন্তু একাল পর্যন্ত ঐরূপ কোন গ্রন্থ নয়নগোচর করা দূরে থাকুক, উহার নাম পর্যন্ত শুনিতে না পাওয়ায় ঐরূপ চিন্তা দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সুতরাং বিস্মিত হইয়া শুনিতে থাকিতাম, ঠাকুর স্ত্রী বা পুরুষ-শরীরের প্রত্যেক অবয়ব ও ইন্দ্রিয়ের গঠনপ্রকার নিত্য পরিদৃষ্ট বিশেষ বিশেষ পদার্থের গঠনের ন্যায় হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া ঐরূপ হইবার ফলাফল বলিয়া যাইতেছেন। যথা, মানবের চক্ষুর কথা তুলিয়া উহা কাহারও পদ্মপত্রের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও যোগীর বা দেবতার ন্যায় ইত্যাদি বলিয়া বলিতেন–"পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে সদ্ভাব ও সাধুভাব থাকে; বৃষের ন্যায় চক্ষু যাহার তাহার কাম প্রবল হয়, যোগীর চক্ষু ঊর্ধ্বদৃষ্টিসম্পন্ন রক্তিমাভ হয়; দেবচক্ষু অধিক বড় হয় না, কিন্তু টানা বা আকর্ণবিস্‌তৃত হয়। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে তাহাকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করা অথবা চোখের কোণ দিয়া দেখা যাহাদিগের স্বভাব, তাহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান।" অথবা শরীরের সাধারণ গঠন-প্রকারের কথা তুলিয়া বলিতেন, "ভক্তিমান ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃ কোমল ও তাহার হস্তপদাদির গ্রন্থিসকল শিথিল হয় (অর্থাৎ সহজে ফিরানো-ঘুরানো যায়); কৃশ হইলেও তাহার শরীরে অস্থি, পেশী প্রভৃতি এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যাহাতে অধিক কোণ দেখা যায় না।" বুদ্ধিমান বলিয়া কাহাকেও নির্ণয় করিয়া তাহার বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা সৎ কিংবা অসৎ বিষয়ে–এ কথা স্থির করিতে ঠাকুর ঐ কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত হস্তখানি নিজহস্তে ধারণপূর্বক তাহাকে উহা শিথিলভাবে রক্ষা করিতে বলিয়া উহার গুরুত্ব বা ভার উপলব্ধি করিতেন এবং মানব-সাধারণের হস্তের ঐ অংশের গুরুত্ব অপেক্ষা যদি উহার ভার অল্প বোধ হইত, তাহা হইলে তাহাকে সুবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। শ্রীযুত প্রেমানন্দ স্বামীর[1] দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনদিবসে ঠাকুর তাঁহার হস্তধারণপূর্বক ঐরূপে ওজন করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কি জন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন তাহা তিনি সেদিন না বলায় আমরাও ঐ স্থানে ঐ বিষয়ে কিছু বলি নাই। ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি সৎ অথবা অসৎ এ বিষয় জানিবার জন্য যে ঠাকুর ঐরূপ করিতেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা নিম্নলিখিতভাবে অন্য এক দিবস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

হস্তের ওজনের তারতম্যে সদসৎ বুদ্ধি-নির্ণয়

গলরোগে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুর যখন কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে লেখকের পরলোকগত কনিষ্ঠ সহোদর[2] একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া সেদিন বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং নিকটে বসাইয়া তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসাপূর্বক ধর্মবিষয়ক নানা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে লেখক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ছেলেটি তোর ভাই?" লেখক ঐ কথা স্বীকার করিলে আবার বলিয়াছিলেন, "বেশ ছেলে, তোর চেয়ে এর বুদ্ধি বেশি; দেখি সদ্‌বুদ্ধি কি অসদ্‌বুদ্ধি"–বলিয়াই তাহার দক্ষিণ হস্তের পূর্বোক্ত অংশ ধারণপূর্বক ওজন করিতে করিতে

বলিলেন, "সদ্‌বুদ্ধি"। পরে লেখককে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, (কনিষ্ঠকে দেখাইয়া) "ইহাকেও টানব না কি রে? (ইহার মনকে সংসারের প্রতি উদাসীন করিয়া ঈশ্বরমুখী করিয়া দিব না কি) কি বলিস?" লেখক বলিয়াছিল, "বেশ তো মহাশয়, তাহাই করুন।" ঠাকুর তাহাতে ক্ষণকাল চিন্তাপূর্বক বলিলেন, "না—থাক; একটাকে নিয়েছি, আবার এটাকেও নিলে তোর বাপ-মার বড় কষ্ট হবে—বিশেষতঃ তোর মার; জীবনে অনেক শক্তিকে[3] রুষ্টা করেছি, এখন আর কাজ নাই।" এই বলিয়া ঠাকুর তাহাকে সদুপদেশ প্রদান ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া সেদিন বিদায় করিয়াছিলেন।

শারীরিক নিত্যক্রিয়াসকলের বিভিন্নতায় সংস্কার-ভিন্নতার সূচনা

ঠাকুর বলিতেন, শরীরের অবয়বাদির গঠনপ্রকারের ন্যায় নিদ্রা শৌচাদি শারীরিক সামান্য ক্রিয়াসকলও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সেইজন্য বহুদর্শী ব্যক্তিগণ ঐসকল হইতেও ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রনির্ণয়ের ইঙ্গিত পাইয়া থাকেন। যথা নিদ্রা যাইবার কালে সকলের নিঃশ্বাস সমভাবে পড়ে না, ভোগীর একভাবে এবং ত্যাগীর অন্যভাবে পড়িয়া থাকে; শৌচাদি গমনকালে ভোগীর মূত্রের ধারা বামে হেলিয়া যায় এবং ত্যাগীর দক্ষিণে হেলিয়া পড়ে। যোগীর মল শূকরে স্পর্শ করে না—ইত্যাদি।

দ্বারবান্ হনুমান সিং

পূর্বোক্ত বিষয়ে একটি ঘটনাও ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। হনুমান সিং নামক এক ব্যক্তি মথুরবাবুর আমলে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির-রক্ষার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। দ্বারবানদিগের অন্যতম হইলেও হনুমান সিং-এর মর্যাদা অধিক ছিল। কারণ, সে কেবল একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান মাত্র ছিল না, কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান ভক্তসাধক ছিল। মহাবীরমন্ত্রের উপাসক হনুমান সিংকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার পদগ্রহণ-মানসে অন্য একজন পালোয়ান একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও শারীরিক বল প্রভৃতি দেখিয়াও হনুমান তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইতে নিরস্ত হইল না। দিন স্থির হইল এবং মথুরবাবুপ্রমুখ ব্যক্তিগণ উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয় বিচারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

প্রতিযোগিতার দিনের সপ্তাহকাল পূর্ব হইতে নবাগত মল্ল রাশীকৃত পুষ্টিকর খাদ্যভোজনে ও ব্যায়ামাদির অভ্যাসে লাগিয়া রহিল। হনুমান সিং কিন্তু ঐরূপ না করিয়া নিত্য যেমন করিত সেরূপ প্রাতঃস্নানপূর্বক সমস্ত দিন ইষ্টমন্ত্রজপে এবং দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিল। সকলে ভাবিল, হনুমান ভীত হইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে। ঠাকুর তাহাকে ভালবাসিতেন, সেজন্য প্রতিযোগিতার পূর্বদিবসে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্যায়াম ও পুষ্টিকর আহারাদির দ্বারা শরীরকে প্রস্তুত করিয়া লইলে না, নূতন মল্লের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিবে কি?" হনুমান ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক কহিল, "আপনার কৃপা থাকে তো আমি নিশ্চয় জয়লাভ করিব; কতকগুলা আহার করিলেই শরীরে বলাধান হয় না, উহা হজম করা চাই; আমি গোপনে নবাগত মল্লের মল দেখিয়া বুঝিয়াছি, সে হজমশক্তির অতিরিক্ত আহার করিতেছে।" ঠাকুর বলিতেন, প্রতিযোগিতার দিবসে হনুমান সিং সত্য সত্যই ঐ ব্যক্তিকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল!

শারীরিক অবয়বগঠন ও ক্রিয়াদর্শনে বিদ্যা ও অবিদ্যাশক্তির নির্ণয়

পুরুষ-শরীরের ন্যায় স্ত্রী-শরীরের অবয়বসকলের গঠনপ্রকার সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেক কথা বলিতেন এবং উহা লক্ষ্য করিয়া রমণীগণের কতকগুলিকে দেবীভাবসম্পন্না বা বিদ্যাশক্তি এবং কতকগুলিকে আসুরীভাবাপন্না বা অবিদ্যাশক্তি বলিয়া নির্দেশ করিতেন। বলিতেন—"ভোজন, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বিদ্যাশক্তিদিগের স্বভাবতঃ অল্প হইয়া থাকে। স্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ ও আলাপ করিতে তাঁহাদিগের প্রাণে বিশেষ উল্লাস উপস্থিত হয়। উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রদানপূর্বক ইঁহারা নীচ প্রবৃত্তি ও হীন কার্যের হস্ত হইতে পতিকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন

এবং পরিণামে ঈশ্বর লাভ করিয়া যাহাতে তিনি নিজ জীবন ধন্য করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা প্রদান করেন। অবিদ্যাশক্তিদিগের স্বভাব ও কার্য সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। আহার-নিদ্রাদি শারীরিক সকল ব্যাপার তাহাদিগের অধিক হইতে দেখা যায়, এবং তাহার সুখসম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে পতি যাহাতে মনোনিবেশ না করেন, তদ্বিষয়ই তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হয়। পতি ইহাদিগের নিকটে পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিলে ইহারা রুষ্ট ভিন্ন কখনও তুষ্ট হয় না।” যে ইন্দ্রিয়বিশেষের সহায়ে রমণীগণ মাতৃত্বপদ-গৌরব লাভ করিয়া থাকেন, তাহার বাহ্যিক আকার হইতে অন্তরের ভোগাসক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে বলিয়া ঠাকুর কখনও কখনও নির্দেশ করিতেন। বলিতেন, উহা নানা আকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন কোন আকার পাশব প্রবৃত্তির স্বল্পতার বিশেষ পরিচায়ক। আবার বলিতেন, যাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ পিপীলিকার ন্যায় উচ্চ তাহাদিগের অন্তরে উক্ত প্রবৃত্তি প্রবল থাকে।

নরেন্দ্রের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

এরূপে শরীরের গঠনপ্রকার দেখিয়া মানবের প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্বন্ধে কত কথা ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের উপায়সকলের মধ্যে অন্যতম বলিয়া উহা তাঁহার নিকটে সর্বদা পরিগণিত হইত এবং নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ সকল ভক্তকেই উহার সহায়ে তিনি অল্পবিস্তর পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। ঐরূপে পরীক্ষাপূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিয়াছিলেন, “তোর শরীরের সকল স্থানই সুলক্ষণাক্রান্ত, কেবল দোষের মধ্যে নিদ্রা যাইবার কালে নিঃশ্বাসটা কিছু জোরে পড়ে। যোগীরা বলেন, অত জোরে নিঃশ্বাস পড়িলে অল্পায়ু হয়।”

(২) সামান্য কার্যে প্রকাশিত মানসিক ভাব দ্বারা এবং (৩) ঐরূপ কার্য দ্বারা প্রকাশিত কামকাঞ্চনাসক্তির তারতম্য বুঝিয়া অন্তরের সংস্কার-নিরূপণ

২য় ও ৩য়–সামান্য সামান্য কার্যে প্রকাশিত মানসিক ভাব ও কামকাঞ্চনাসক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখাই ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক প্রকৃতি-পরিজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় বলিয়া ঠাকুরের নিকটে পরিগণিত হইত। ব্যক্তিবিশেষের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন হইতে ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিষয়সকল কিছুকাল পর্যন্ত নীরবে লক্ষ্য মাত্র করিয়া যাইতেন। পরে নিজ মণ্ডলীমধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া যেদিন হইতে স্থির করিতেন, সেদিন হইতে নানাভাবে উপদেশদানে এবং আবশ্যক হইলে কখনও কখনও মিষ্ট তিরস্কারসহায়ে তাহাকে উক্ত দোষসকল পরিহার করাইতে সচেষ্ট হইতেন। আবার মণ্ডলীমধ্যে গ্রহণপূর্বক সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থ কোন্ ভাবে জীবনগঠন করিতে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করিবেন তদ্বিষয়েও তিনি পূর্ব হইতে স্থির করিয়া লইতেন। সেজন্য সমীপাগত ব্যক্তিকে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করিতেন–সে বিবাহিত কি না, তাহার বাটীতে মোটা ভাতকাপড়ের অভাব আছে কি না, অথবা সে সংসার ত্যাগ করিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভার লইতে পারিবে এমন কোন নিকট আত্মীয় আছে কি না।

বালকদিগের সম্বন্ধে ঠাকুরের ধারণা

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা সর্বদা লক্ষিত হইত। বলিতেন, “ইহাদিগের মন এখনও স্ত্রী-পুত্র মান-যশাদির ভিতর ছড়াইয়া পড়ে নাই, (উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে) ইহারা সহজেই ষোল আনা মন ঈশ্বরে দিতে পারিবে।” সেইজন্য ইহাদিগের ভিতরে ধর্মভাব প্রবেশ করাইয়া দিবার তাঁহার বিশেষ প্রযত্ন ছিল। নানা দৃষ্টান্তসহায়ে তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, “মন সরিষার পুঁটুলির মতো, একবার ছড়াইয়া পড়িলে উহার সব দানাগুলি একত্র করা একপ্রকার অসম্ভব”, “কাঁটি উঠিলে পাখিকে ‘রাধাকৃষ্ণ’ নাম বলানো দুঃসাধ্য”– “কাঁচা টালির উপরে গরুর খুরের ছাপ পড়িলে সহজেই মুছিয়া ফেলা যায়, কিন্তু টালি পোড়াইবার

পরে ঐ ছাপ আর তুলিয়া ফেলা যায় না” ইত্যাদি। ঐ কারণে সংসারানভিজ্ঞ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেই তিনি বিশেষভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগের মনের স্বাভাবিক গতি প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির দিকে তাহা বুঝিয়া লইতেন এবং উপযুক্ত বুঝিলে তাহাদিগকে শেষোক্ত পথে পরিচালিত করিতেন।

সমীপাগত ভক্তগণের প্রতিকার্য লক্ষ্য করা

ঐরূপে কথাপ্রসঙ্গে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব অবগত হইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু সে ব্যক্তি কতদূর সরল ও সত্যনিষ্ঠ, মুখে যাহা বলে কার্যে সে তাহার কতদূর অনুষ্ঠান করে, বিচারপূর্বক সে প্রতিকার্যের অনুষ্ঠান করে কিনা এবং উপদিষ্ট বিষয়ের ধারণাই বা সে কতদূর কিরূপ করিয়া থাকে প্রভৃতি নানা বিষয় তাহার প্রতিকার্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকিতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক পূর্বোক্ত বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্তনিচয়

কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার পরে জনৈক বালককে তিনি একদিন সহসা বলিয়া বসিলেন, “তুই বিবাহ করিস না কেন?” সে উত্তর করিল, “মহাশয়, মন বশীভূত হয় নাই, এখন বিবাহ করিলে স্ত্রীর প্রতি আসক্তিতে হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইতে হইবে, যদি কখনও কামজিৎ হইতে পারি তখন বিবাহ করিব।” ঠাকুর বুঝিলেন, অন্তরে আসক্তি প্রবল থাকিলেও বালকের মন নিবৃত্তিমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে—বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “যখন কামজিৎ হইবি তখন আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।”

জনৈক বালকের সহিত একদিন দক্ষিণেশ্বরে নানা বিষয়ের কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, “এটা কি বল দেখি? কোমরে কিছুতেই (সর্বদা) কাপড় রাখতে পারি না—থাকে না, কখন খুলে পড়ে গেছে জানতেও পারি না! বুড়ো মিনসে উলঙ্গ হয়ে বেড়াই! কিন্তু লজ্জাও হয় না! পূর্বে পূর্বে কে দেখচে না দেখচে সে কথার এককালে হুঁশ থাকত না—এখন যারা দেখে তাদের কাহারও কাহারও লজ্জা হয় বুঝে কোলের উপর কাপড়খানা ফেলে রাখি। তুই লোকের সামনে আমার মতো (উলঙ্গ) হয়ে বেড়াতে পারিস?” সে বলিল, “মহাশয়, ঠিক বলিতে পারি না, আপনি আদেশ করিলে বস্ত্রত্যাগ করিতে পারি।” তিনি বলিলেন, “কই যা দেখি, মাথায় কাপড়খানা জড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির উঠানে একবার ঘুরে আয় দেখি।” বালক বলিল, “তাহা করিতে পারিব না, কিন্তু কেবলমাত্র আপনার সম্মুখে ঐরূপ করিতে পারি।” ঠাকুর তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, “ঐ কথা আরও অনেকে বলে—বলে, ‘তোমার সামনে পরিধানের কাপড় ফেলিয়া দিতে লজ্জা করে না, কিন্তু অপরের সামনে করে’!”

গঙ্গায় বান

ঠাকুরের বসনত্যাগের কথাপ্রসঙ্গে অন্য একদিনের ঘটনা আমাদিগের মনে আসিতেছে। জ্যোৎস্না-বিধৌতা যামিনী, বোধ হয় সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া হইবে। রাত্রে শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর শয্যাত্যাগপূর্বক ‘ওরে, বান দেখবি আয়’ বলিয়া সকলকে ডাকিতে ডাকিতে পোস্তার উপরে ছুটিলেন এবং নদীর শান্ত শুভ্র জলরাশি ফেনশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গাকারে পরিণত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিপরীত দিকে প্রচণ্ডবেগে আগমনপূর্বক পোস্তার উপরে লাফাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যখন আমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন তখন আমাদিগের তন্দ্রা আসিয়াছে, উহার ঘোরে উঠিয়া পরিহিত বস্ত্রাদি সামলাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে সামান্য বিলম্ব হইয়াছিল। সুতরাং আমরা পোস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতে বান চলিয়া যাইল, কেহ উহার সামান্য দর্শন পাইল, কেহ বা তাহাও পাইল না। ঠাকুর এতক্ষণ আপন আনন্দেই বিভোর ছিলেন, বান

চলিয়া যাইলে আমাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি রে, কেমন বান দেখলি?" এবং আমরা কাপড় পরিতে বান চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "দূর শালারা, তোদের কাপড় পরবার জন্য কি বান অপেক্ষা করবে? আমার মতো কাপড় ফেলিয়া চলিয়া আসিলি না কেন?"

ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সকল কর্মের অনুষ্ঠান

'বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কি না', 'চাকুরি করিবি কি না'—ঠাকুরের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগের কেহ কেহ বলিত, "বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, মহাশয়, কিন্তু চাকুরি করিতে হইবে।" অশেষ স্বাধীনতাপ্রিয় ঠাকুরের নিকটে কিন্তু ঐ কথা বিষম বিসদৃশ লাগিত। তিনি বলিতেন, "যদি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালনই করিবি না, তবে আজীবন অপরের চাকর হইয়া থাকিবি কেন?" ষোল-আনা মনপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনা কর—সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মানবের তদপেক্ষা মহৎ কার্য অন্য কিছুই আর হইতে পারে না এবং ঐরূপ করা একান্ত অসম্ভব বুঝিলে বিবাহ করিয়া ঈশ্বরলাভকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য স্থিরপূর্বক সৎপথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ কর—ইহাই তাঁহার মত ছিল। সেইজন্য আধ্যাত্মিক রাজ্যে উত্তম বা মধ্যম অধিকারী বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে তিনি বুঝিতে পারিতেন তাহাদিগের কেহ বিবাহ করিয়াছে অথবা বিশেষ কারণ ব্যতীত ইতরসাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জনের জন্য চাকুরি স্বীকারপূর্বক বা নাম-যশের প্রত্যাশী হইয়া সংসারের অন্য কোন প্রকার কার্যে নিযুক্ত হইয়া নিজ শক্তি ক্ষয় করিতেছে শুনিলে তিনি প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার বালকভক্তদিগের অন্যতম জনৈক[4] চাকুরি স্বীকার করিয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তুই তোর বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণের জন্য করিতেছিস তাই, নতুবা চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিস শুনিলে তোর মুখ দেখিতে পারিতাম না।" অপর জনৈক[5] বিবাহ করিয়া কাশীপুরের বাগানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহার যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইয়াছে এইরূপভাবে তাহার গ্রীবা ধারণপূর্বক অজস্র রোদন করিতে করিতে বারংবার বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ভুলিয়া যেন একেবারে (সংসারে) ডুবিয়া যাসনি!"

সরল ঈশ্বরবিশ্বাস ও নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন পদার্থ, সদসদ্বিচারসম্পন্ন হইতে হইবে

বিশ্বাস ব্যতিরেকে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, নবানুরাগের প্রেরণায় ঐ কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্বক আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন যাহাতে তাহাতে এবং যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইত। ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্র তিনি ঐ বিষয় বুঝিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। বাস্তবিক, বিশ্বাস-অবলম্বনে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে বলিলেও তিনি কাহাকেও কোন দিন সদসৎ বিচার ত্যাগ করিতে বলেন নাই। সদসদ্বিচারসম্পন্ন হইয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইবে এবং ইষ্টানিষ্ট বিচার না করিয়া সাংসারিক কোন কর্মও করিতে উদ্যত হইবে না, ইহাই তাঁহার মত ছিল বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তাঁহার আশ্রিতবর্গের মধ্যে জনৈক[6] একদিন দোকানীকে ধর্মভয় দেখাইয়া বাজার হইতে একখানি লোহার কড়া কিনিয়া বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্বক দেখিলেন, দোকানী তাঁহাকে ফাটা কড়া দিয়াছে! ঠাকুর ঐ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "(ঈশ্বর-) ভক্ত হইতে হইবে বলিয়া কি নির্বোধ হইতে হইবে? দোকানী কি দোকান ফাঁদিয়া ধর্ম করিতে বসিয়াছে, যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করিয়া কড়াখান একবার না দেখিয়াই লইয়া চলিয়া আসিলি? আর কখনও ঐরূপ করিবি না। কোন দ্রব্য কিনিতে হইলে পাঁচ দোকান ঘুরিয়া তাহার উচিত মূল্য জানিবি, দ্রব্যটি লইবার কালে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবি, আবার যে-সকল দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তাহার ফাউটি পর্যন্ত না গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবি না।"

অধিকারিভেদে ঠাকুরের দয়াবান্ ও নির্মম হইবার উপদেশ

ধর্মলাভ করিতে আসিয়া কোন কোন প্রকৃতিতে দয়ার ভাবটি এত অধিক পরিবর্ধিত হইয়া উঠে যে, পরিণামে উহাই তাহার বন্ধনের এবং কখনও কখনও ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার কারণ হইয়া পড়ে। কোমল-হৃদয় নরনারীই অনেক সময় ঐরূপ হইয়া থাকে। ঠাকুর সেইজন্য ঐরূপ নরনারীকে কঠোর হইবার জন্য এবং তদ্বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্টদিগকে কোমল হইতে সর্বদা উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের মধ্যে জনৈকের[7] হৃদয় অতি কোমল ছিল। বিশিষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার ক্রোধের উদয় হইতে বা তাঁহাকে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে আমরা কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও এবং বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও মাতার চক্ষে জল দেখিতে না পারিয়া তিনি সহসা একদিন আপনাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আশ্রয় এবং আশ্বাসবাক্যই তাঁহাকে উক্ত কর্মনিবন্ধন প্রাণে দারুণ অনুতাপ ও হতাশ ভাবের উদয় হইতে সে যাত্রায় রক্ষা করিয়াছিল। ঐরূপ অযথা কোমলতা ও দয়ার ভাব সংযত করিয়া যাহাতে তিনি প্রতিকার্য বিচারপূর্বক সম্পাদন করেন তদ্বিষয়ে ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সামান্য সামান্য বিষয়ের সহায়ে ঠাকুর কিরূপে তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন, দুই-একটি ঘটনার উল্লেখেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুরের বস্ত্রাদি যাহাতে রক্ষিত হইত তাহাতে একটি আরসোলা বাসা করিয়াছে, এক দিবস দেখিতে পাওয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন, "আরসোলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেল।" পূর্বোক্ত ব্যক্তি ঐরূপ আদেশ পাইয়া আরসোলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন, কিন্তু না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। আসিবামাত্র ঠাকুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, আরসোলাটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিস তো?" তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না মহাশয়, ছাড়িয়া দিয়াছি।" ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "আমি তোকে মারিয়া ফেলিতে বলিলাম, তুই কি না সেটাকে ছাড়িয়া দিলি! যেমনটি করিতে বলিব ঠিক সেইরূপ করিবি, নতুবা ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয়সকলেও নিজের মতে চলিয়া পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হইবে।"

স্বামী যোগানন্দকে ঐ বিষয়ক শিক্ষা

কলিকাতা হইতে গহনার নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে শ্রীযুত যোগেন একদিন অন্য এক আরোহীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি রানী রাসমণির কালীবাটীতে ঠাকুরের নিকট যাইতেছেন। ঐ কথা শুনিয়াই ঐ ব্যক্তি অকারণে ঠাকুরের নিন্দা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "ঐ এক ঢং আর কি; ভাল খাচ্চেন, গদিতে শুচ্চেন আর ধর্মের ভান করে যত সব স্কুলের ছেলের মাথা খাচ্চেন" ইত্যাদি। ঐরূপ কথাসকল শুনিয়া যোগেন মর্মাহত হইলেন; ভাবিলেন, তাহাকে দুই-চারিটি কথা শুনাইয়া দেন। পরক্ষণেই নিজ শান্ত প্রকৃতির প্রেরণায় তাঁহার মনে হইল, ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় পাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কত লোকে কত প্রকার বিপরীত ধারণা ও নিন্দাবাদ করিতেছে, তিনি তাহার কি করিতে পারেন। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির কথার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। যোগেন ভাবিয়াছিলেন, নিরভিমান ঠাকুর–যাঁহাকে স্তুতি-নিন্দায় কেহ কখনও বিচলিত হইতে দেখে নাই–ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। ফল কিন্তু অন্যরূপ হইল। তিনি ঐ ঘটনা ভিন্ন আলোকে দেখিয়া যোগেনের ঐ বিষয়ে আচরণ সম্বন্ধে বলিয়া বসিলেন, "আমার অযথা নিন্দা করিল, আর তুই কি না তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া আসিলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস?—গুরুনিন্দাকারীর মাথা কাটিয়া ফেলিবে, অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করিলি না!"

ঐরূপ ঘটনাস্থলে নিরঞ্জনকে ঠাকুরের অন্যপ্রকার উপদেশ

ঐরূপ অন্য একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ঠাকুরের শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি কতদূর অনুসারী হইত। শ্রীযুত নিরঞ্জনের স্বভাবতঃ উগ্র প্রকৃতি ছিল। গহনার নৌকায় করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে আরোহীসকলকে পূর্বোক্তরূপে

ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিতে শুনিয়া তিনি প্রথমে উহার তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত হইলেন এবং তাহাতে উহারা নিরস্ত না হওয়াতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। নিরঞ্জনের শরীর বিশেষ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি বিলক্ষণ সন্তরণপটু ছিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃপ্ত মূর্তির সম্মুখে সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল এবং অশেষ অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিন্দাকারীরা তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে নিরস্ত করিল। ঠাকুর ঐ কথা পরে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইতে আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মতো, হইয়াই মিলাইয়া যায়। হীনবুদ্ধি লোকে কত কি অন্যায় কথা বলে, তাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করিতে গেলে উহাতেই জীবনটা কাটাইতে হয়! ঐরূপ স্থলে ভাবিবি লোক না পোক্ (কীট) এবং উহাদিগের কথা উপেক্ষা করিবি। ক্রোধের বশে কি অন্যায় করিতে উদ্যত হইয়াছিলি ভাব দেখি! দাঁড়ি-মাঝিরা তোর কি অপরাধ করিয়াছিল যে, সেই গরিবদের উপরেও অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলি!"

স্ত্রী-ভক্তদিগকেও ঠাকুরের ঐভাবে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত

পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রী-ভক্তগণের সম্বন্ধেও ঠাকুর স্বাভাবিক প্রকৃতি বুঝিয়া ঐরূপে উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, বিশেষ কোমলস্বভাবা কোন রমণীকে একদিন তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—"যদি বুঝ তোমার পরিচিত কোন ব্যক্তি অশেষ আয়াস স্বীকারপূর্বক তোমাকে সকল বিষয়ে সহায়তা করিলেও নিজ দুর্বল চিত্তকে রূপজ মোহ হইতে সংযত করিতে না পারিয়া তোমার জন্য কষ্টভোগ করিতেছে, সেই স্থলে তোমার কি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে হইবে, অথবা কঠোরভাবে তাহার বক্ষে পদাঘাতপূর্বক চলিয়া আসিয়া চিরকালের মতো তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে? অতএব বুঝ, যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে দয়া করা চলে না। দয়াপ্রকাশের একটা সীমা আছে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে উহা কর্তব্য।"

হরিশের কথা

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা আমাদিগের মনে আসিতেছে। হরিশ বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ। বাটীতে সুন্দরী স্ত্রী, শিশুপুত্র এবং মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে কয়েকবার আসিতে-না-আসিতে তাহার মন বিশেষভাবে বৈরাগ্যপ্রবণ হইয়া উঠিল! তাহার সরল স্বভাব, একনিষ্ঠা এবং শান্তভাব দেখিয়া ঠাকুরও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আশ্রয় দান করিলেন। তদবধি ঠাকুরের সেবা ও ধ্যানজপপরায়ণ হইয়া হরিশ দক্ষিণেশ্বরেই অধিকাংশ কাল কাটাইতে লাগিল। অভিভাবকদিগের তাড়না, শ্বশুরালয়ের সাদরাহ্বান, স্ত্রীর ক্রন্দন কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সে কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একপ্রকার মৌনাবলম্বনপূর্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঠাকুর তাহার শান্ত একনিষ্ঠ প্রকৃতির দিকে আমাদিগের চিত্তাকর্ষণের জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "মানুষ যারা, জ্যান্তে মরা—যেমন হরিশ!"

'দয়াপ্রকাশের স্থান উহা নহে'

একদিন সংবাদ আসিল, সংসারের সকল কর্ম পরিত্যাগপূর্বক সাধনভজন লইয়া থাকাতে হরিশের বাটীর সকলে বিশেষ সন্তপ্ত হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে বহুকাল না দেখিতে পাইয়া শোকে অধীরা হইয়া একপ্রকার অন্নজল ত্যাগ করিয়াছে। হরিশ ঐ কথা শুনিয়া পূর্ববৎ নীরব রহিল। কিন্তু ঠাকুর তাহার মন জানিবার জন্য তাহাকে বিরলে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোর স্ত্রী অত কাতর হইয়াছে, তা তুই একবার বাটীতে যাইয়া তাহাকে দেখা দিয়া আয় না কেন? তাহাকে দেখিবার কেহ নাই বলিলেই হয়,[৪]তাহার উপরে একটু দয়া করিলে ক্ষতি কি?" হরিশ সকাতরে বলিল, "মহাশয়, দয়াপ্রকাশের স্থান উহা নহে। ঐ স্থলে দয়া করিতে যাইলে মায়ামোহে অভিভূত

হইয়া জীবনের প্রধান কর্তব্য ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আপনি ঐরূপ আদেশ করিবেন না।” ঠাকুর তাহার ঐ কথায় পরম প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তদবধি হরিশের ঐ কথাগুলি মধ্যে মধ্যে আমাদিগের নিকটে উল্লেখ করিয়া তাহার বৈরাগ্যের প্রশংসা করিতেন।

দৈনিক সামান্য কার্যসকল লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান

ঐরূপে সামান্য সামান্য দৈনিক কার্যসকলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগের অন্তরের দোষ-গুণ পরিজ্ঞাত হইবার বিষয়ে ঠাকুরের সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিরঞ্জনকে অধিক পরিমাণে ঘৃত ভোজন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “অত ঘি খাওয়া!—শেষে কি লোকের ঝি-বউ বার করবি?” জনৈক অধিক নিদ্রা যাইত বলিয়া কিছুকাল ঠাকুরের অসন্তোষভাজন হইয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র-অধ্যয়নের ঝোঁকে পড়িয়া জনৈক তাঁহার নিষেধ অবহেলা করায় বলিয়াছিলেন, “কোথায় একে একে বাসনা ত্যাগ করিবি তাহা নহে, বাসনা-জালের বৃদ্ধি করিতেছিস, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ আর কেমন করিয়া হইবে?” প্রসঙ্গান্তরে ঐরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আমরা ইতঃপূর্বে সময়ে সময়ে পাঠকের নয়নগোচর করিয়াছি, সুতরাং ঐ বিষয়ে অধিক কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

(৪) তাঁহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রকাশ উপলব্ধি করিবার দিকে ব্যক্তিবিশেষ কতদূর অগ্রসর হইতেছে ঠাকুরের তাহা লক্ষ্য করা

আশ্রিত ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক প্রকৃতি পূর্বোক্ত উপায়সকলের সহায়ে পরিজ্ঞাত হইয়া উহার দোষভাগ ধীরে ধীরে পরিবর্তনের চেষ্টামাত্র করিয়া ঠাকুর ক্ষান্ত হইতেন না—কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য কতদূর সংসিদ্ধ হইল তদ্বিষয় বারংবার অনুসন্ধান করিতেন। তদ্ভিন্ন ঐরূপ কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে এক বিশেষ উপায় সর্বদা অবলম্বন করিতে দেখা যাইত। উপায়টি ইহাই:

৪র্থ—ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার নিকটে প্রথম আসিবার কালে যে শ্রদ্ধা বা ভক্তিভাবের প্রেরণায় উপস্থিত হইত, সেই ভাবটি দিন দিন বর্ধিত হইতেছে কি না তদ্বিষয় অনুসন্ধান করা ঠাকুরের রীতি ছিল। ঐ বিষয় জানিবার জন্য তিনি কখনও কখনও নিজ আধ্যাত্মিক অবস্থা বা আচরণবিশেষের সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তি কতদূর কিরূপ বুঝিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, কখনও বা তাঁহার সকল কথায় সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে কি না তাহা লক্ষ্য করিতেন, আবার কখনও বা নিজ সঙ্ঘমধ্যস্থ যে-সকল ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে মিলিত হইলে তাহার ভাব গভীরতা প্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা উপায়ে তাহাকে সহায়তা করিতেন। ঐরূপে যতদিন না ঐ ব্যক্তি অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় তাঁহাকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত ততদিন পর্যন্ত তিনি তাহার ধর্মলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না।

শেষোক্ত উপায়ের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ নির্ণয় ঠাকুরের পক্ষে স্বাভাবিক কেন

পূর্বোক্ত কথাগুলিতে পাঠক বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বল্প চিন্তার ফলে বুঝিতে পারা যায় উহাতে বিস্ময়ের কারণ যে কিছুমাত্র নাই তাহা নহে, কিন্তু ঐরূপ করাই ঠাকুরের পক্ষে নিতান্ত যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক ছিল। বুঝিতে পারা যায়, তিনি আপনাতে অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিকতাপ্রকাশের কথা সত্য সত্যই জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐরূপ আচরণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ‘লীলাপ্রসঙ্গ’-এর অন্যত্র আমরা পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, দীর্ঘকালব্যাপী অলৌকিক তপস্যা ও ধ্যানসমাধি-সহায়ে ঠাকুরের অন্তরে অভিমান-অহঙ্কার সর্বথা বিনষ্ট হইয়া যখন তাঁহাতে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা এককালে তিরোহিত হইয়াছিল তখন অখণ্ড স্মৃতি ও অনন্ত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি

করাইয়াছিল—তাঁহার শরীর-মনাশ্রয়ে যেরূপ অভিনব আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, সংসারে ঐরূপ ইতঃপূর্বে আর কখনও কুত্রাপি হয় নাই। সুতরাং, ঐ কথা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উক্ত আদর্শের আলোকে যে ব্যক্তি নিজ জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পাইবে তাহারই বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ সুগম ও সহজসাধ্য হইবে এ বিষয়ে তাঁহাকে স্বতঃবিশ্বাস স্থাপন করিতে হইয়াছিল। ঐজন্য সমীপাগত ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিষয় বুঝিয়াছে কি না এবং তৎপ্রদর্শিত মহদুদার ভাবাশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনগঠনে সচেষ্ট হইয়াছে কি না তদ্বিষয় তিনি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

অন্তরের পূর্বোক্ত ধারণা ঠাকুর নানাভাবে আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, "নবাবী আমলের মুদ্রা বাদশাহী আমলে চলে না", "আমি যেরূপে বলিতেছি সেইরূপে যদি চলিয়া যাস, তাহা হইলে সোজাসুজি গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া যাইবি", "যাহার শেষ জন্ম—যাহার সংসারে পুনঃপুনঃ আগমনের ও জন্ম-মরণের শেষ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই এখানে আসিবে এবং এখানকার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে",[9] "তোমার ইষ্ট (উপাস্য দেব) (আপনাকে দেখাইয়া) ইহার ভিতরে আছেন, ইহাকে ভাবিলেই তাঁহাকে ভাবা হইবে"।—ইত্যাদি।

আশ্রিতগণের অন্তরে পূর্বোক্ত ভাবের উদয় হইয়া দিন দিন উহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতেছে কি না তদ্বিষয় ঠাকুর কিরূপে অন্বেষণাদি করিতেন, ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন:

'আমাকে কি মনে হয়'—ঠাকুরের এই প্রশ্নে নানা ভক্তের নানা মত প্রকাশ

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অহৈতুকী কৃপালাভ করিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারা প্রত্যেকেই বিদিত আছেন, তিনি তাঁহাদিগকে বিরলে অথবা দুই-চারিজন ভক্তের সম্মুখে সময়ে সময়ে সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, "আচ্ছা, আমাকে তোমার কি মনে হয় বল দেখি?" দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল গমনপূর্বক তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হইবার পরেই সচরাচর ঐ প্রশ্নের উদয় হইত। তাহা বলিয়া প্রথম দর্শনে অথবা উহার স্বল্পকাল পরে ঐ প্রশ্ন তিনি যে কাহাকেও কখনও করেন নাই, তাহা নহে। যে-সকল ভক্তের আগমনের কথা তিনি তাহাদিগের আসিবার বহু পূর্বে যোগদৃষ্টিসহায়ে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহারা কেহ কেহ আসিবামাত্র তিনি ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা জ্ঞাত আছি। ঐরূপে পৃষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রিতগণের প্রত্যেকে তাঁহাকে কত প্রকার উত্তর প্রদান করিত, তাহা বলিবার নহে। কেহ বলিত, 'আপনি যথার্থ সাধু'—কেহ বলিত, 'যথার্থ ঈশ্বরভক্ত'—কেহ 'মহাপুরুষ'—কেহ 'সিদ্ধপুরুষ'—কেহ 'ঈশ্বরাবতার'—কেহ 'স্বয়ং শ্রীচৈতন্য'—কেহ 'সাক্ষাৎ শিব'—কেহ 'ভগবান'—ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজপ্রত্যাগত কেহ কেহ—যাহারা ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাসবান ছিল না—বলিয়াছিল, "আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ ভক্তাগ্রণীদিগের সমতুল্য, ঈশ্বরপ্রেমিক।" আবার খ্রীষ্টান-ধর্মাবলম্বী উইলিয়মস্[10] নামক এক ব্যক্তি ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে 'নিত্যচিন্ময়বিগ্রহ ঈশ্বরপুত্র ঈশামসি' বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরদাতাগণ ঠাকুরকে কতদূর বুঝিত বলিতে পারি না, কিন্তু ঐসকল বাক্য দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে নিজ নিজ মনোভাব যে যথাযথ ব্যক্ত করিত, তাহা বলা বাহুল্য। ঠাকুরও তাহাদিগের ঐ প্রকার উত্তরসকল পূর্বোক্ত আলোকে দেখিয়া যাহার যে প্রকার ভাব তাহার প্রতি সেই প্রকার আচরণ ও উপদেশাদি প্রদান করিতেন। কারণ, ভাবময় ঠাকুর কখনও কাহারও ভাব নষ্ট না করিয়া উহার পরিপুষ্টিতে যাহাতে সেই ব্যক্তি দেশকালাতীত সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের উপলব্ধি করিতে পারে তদ্বিষয়ে সর্বদা সহায়তা করিতেন। তবে উত্তরদাতা তাঁহার প্রশ্নে আপন অন্তরের ধারণা প্রকাশ করিতেছে অথবা অপরের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কথা কহিতেছে এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত।

ঐ বিষয়ক ১ম দৃষ্টান্ত—ভক্ত পূর্ণচন্দ্র ও 'ছেলেধরা মাস্টার'

পূর্ণ[11] যখন ঠাকুরের নিকটে প্রথম আগমন করে তখন তাহাকে নিতান্ত বালক বলিলেই হয়। বোধ হয়, তাহার বয়স তখন সবেমাত্র তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা সংস্থাপিত শ্যামবাজারের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও স্বভাবত ঈশ্বরানুরাগী দেখিতে পাইলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া আসিতেছিলেন। ঐরূপে তেজচন্দ্র, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, (ছোট) নরেন, প্রমথ (পলটু) প্রভৃতি বাগবাজার-অঞ্চলের অনেকগুলি বালককে তিনি একে একে ঠাকুরের আশ্রয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐজন্য আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রহস্য করিয়া তাঁহাকে ‘ছেলেধরা মাস্টার’ বলিয়া নির্দেশ করিত এবং ঠাকুরও উহা শুনিয়া কখনও কখনও হাসিতে হাসিতে বলিতেন, “তাঁহার ঐ নাম উপযুক্ত হইয়াছে!” বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াইবার কালে পূর্ণের সুন্দর স্বভাব ও মধুর আলাপে তাঁহার চিত্ত একদিন আকৃষ্ট হইল এবং উহার অনতিকাল পরেই তিনি ঠাকুরের সহিত বালকের পরিচয় করাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বন্দোবস্ত গোপনেই করা হইল। কারণ, পূর্ণের অভিভাবকেরা বিশেষ কড়া মেজাজের লোক ছিলেন—ঐ কথা জানিতে পারিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষেরই লাঞ্ছিত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। অতএব যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসিয়া পূর্ণ গাড়ি ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইয়া স্কুলের ছুটি হইবার পূর্বেই প্রত্যাগমনপূর্বক অন্যদিনের ন্যায় বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছিল।

পূর্ণের আগমনে ঠাকুরের প্রীতি ও তাহার উচ্চাধিকার সম্বন্ধে কথা

পূর্ণকে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এবং পরম স্নেহে তাহাকে উপদেশপ্রদান ও জলযোগাদি করাইয়া দিয়া ফিরিবার কালে বলিয়া দিয়াছিলেন, “তোর যখনই সুবিধা হইবে চলিয়া আসিবি, গাড়ি করিয়া আসিবি, যাতায়াতের ভাড়া এখান হইতে দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে।” পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার—নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) নীচেই পূর্ণের ঐ বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে! এখানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহুপূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের (শ্রেণীর) ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল—অতঃপর ঐরূপ আর কেহ এখানে আসিবে না।”

পূর্ণের সহিত ঠাকুরের সপ্রেম আচরণ

পূর্ণেরও সেদিন অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধবিষয়ক পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া তাহাকে এককালে স্থির ও অন্তর্মুখী করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার দুনয়নে অজস্র আনন্দধারা বিগলিত হইয়াছিল। অভিভাবকদিগের ভয়ে বহু চেষ্টায় আপনাকে সামলাইয়া তাহাকে সেদিন বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল। তদবধি পূর্ণকে দেখিবার এবং খাওয়াইবার জন্য ঠাকুরের প্রাণে বিষম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন এবং যে ব্যক্তি উহা লইয়া যাইত তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন, সে যেন লুকাইয়া ঐসকল তাহার হস্তে দিয়া আসে—কারণ, বাটীতে ঐ কথা প্রকাশ হইলে তাহার উপর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা।

ঠাকুরের পূর্ণকে দেখিবার আগ্রহ ও তাহার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে জিজ্ঞাসা— ‘আমাকে তোর কি মনে হয়?’

পূর্ণের সহিত দেখা করিবার আগ্রহে আমরা ঠাকুরকে সময়ে সময়ে দরদরিত ধারে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। তাঁহার ঐরূপ আচরণে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “পূর্ণের উপরে এই টান (আকর্ষণ) দেখিয়াই তোরা অবাক হয়েছিস, নরেন্দ্রের (বিবেকানন্দের) জন্য প্রথম প্রথম প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইত ও যেরূপ ছটফট করিতাম, তাহা দেখিলে না জানি কি হতিস!” সে যাহা হউক, পূর্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেই ঠাকুর এখন হইতে মধ্যাহ্নে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং বাগবাজারে বলরাম বসুর

ভবনে অথবা তদ্ঞ্চলের অন্য কোন ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রেরণপূর্বক তাহাকে বিদ্যালয় হইতে ডাকাইয়া আনিতেন। ঐরূপ কোন স্থলেই পূর্ণ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন দ্বিতীয়বার লাভ করিয়াছিল এবং সেদিন সে এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুর সেদিন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয়, বল দেখি?" ভক্তিগদগদ হৃদয়ের অপূর্ব প্রেরণায় অবশ হইয়া পূর্ণ উহাতে বলিয়া উঠিয়াছিল, "আপনি ভগবান–সাক্ষাৎ ঈশ্বর!"

পূর্ণের উত্তরে ঠাকুরের আনন্দ ও তাহাকে উপদেশ

বালক পূর্ণ দর্শনমাত্রেই যে তাঁহাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, এ কথা জানিয়া ঠাকুরের সেদিন বিস্ময় ও আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদপূর্বক শক্তিপূত মন্ত্রসহিত সাধনরহস্যের উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনপূর্বক আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমানুষ, বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, সে কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিল, বল দেখি? আরও কেহ কেহ দিব্য সংস্কারের প্রেরণায় পূর্ণের মতো ঐ প্রশ্নের ঐরূপ উত্তর দিয়াছে! উহা নিশ্চয় পূর্বজন্মকৃত সংস্কার। ইহাদিগের শুদ্ধ সাত্ত্বিক অন্তরে সত্যের ছবি স্বভাবত পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া উঠে!"

সংসারী পূর্ণের মহত্ত্ব

ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল– কিন্তু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যাহারা সম্বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তাহার অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা, নিরভিমানিতা ও সর্বপ্রকারে আত্মত্যাগের সম্বন্ধে এক বাক্যে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত–বৈকুণ্ঠনাথকে ঠাকুরের ঐ বিষয়ক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর

আশ্রিত ভক্তগণকে পূর্বোক্তভাবে প্রশ্ন করা বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্তের আমরা এখানে উল্লেখ করিব। দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরে আমাদিগের সুপরিচিত জনৈক ব্যক্তিকে ঠাকুর একদিবস নিজ গৃহস্থিত মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তনের ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, "সকলে কেমন ঈশ্বরীয় ভাবে বিভোর হয়েছে দেখছিস?"

ঐ ব্যক্তি–ওরা সব ছোট লোক, মহাশয়।

ঠাকুর–সে কিরে? ও কথা বলতে আছে!

ঐ ব্যক্তি–হাঁ মহাশয়, আমার নদীয়ায় বাড়ি, আমি জানি বষ্টুম ফষ্টুম ছোটলোকে হয়।

ঠাকুর–তোর নদীয়ায় বাড়ি, তবে তোকে আর একটা প্রণাম।[12] আচ্ছা, রাম প্রভৃতি (আপনাকে দেখাইয়া) ইহাকে অবতার বলে, তোর কি মনে হয়, বল দেখি?

ঐ ব্যক্তি–তারা তো ভারী ছোট কথা বলে, মহাশয়!

ঠাকুর–সে কিরে? ভগবানের অবতার বলে, আর তুই বলচিস ছোট কথা বলে!

ঐ ব্যক্তি–হাঁ মহাশয়, অবতার তো তাঁর (ঈশ্বরের) অংশ, আমার আপনাকে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া মনে হয়।

ঠাকুর–বলিস কিরে?

ঐ ব্যক্তি–ঐরূপ মনে হয়, তা কি করব বলুন? আপনি শিবের ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নিত্য চেষ্টা করিলেও উহা কিছুতেই পারি না! ধ্যান করিতে বসিলেই আপনার প্রসন্ন মুখখানি

সম্মুখে জ্বলজ্বল করিতে থাকে, উহাকে সরাইয়া শিবকে কিছুতেই মনে আনিতে পারি না, ইচ্ছাও হয় না! সুতরাং আপনাকে শিব বলিয়া ভাবি।

ঠাকুর–(হাসিতে হাসিতে) বলিস কিরে! আমি কিন্তু জানি, আমি তোর একগাছি ছোট কেশের সমান (উভয়ের হাস্য)। যাহোক, তোর জন্য বড় ভাবনা ছিল, আজ নিশ্চিন্ত হইলাম।

শেষোক্ত কথাগুলি ঠাকুর কেন বলিলেন, তাহা ঐ ব্যক্তি তখন বুঝিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। আমাদিগের জানা আছে, ঐরূপ স্থলে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন–এই কথা বুঝিয়াই আমাদিগের প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহার ঐরূপ কথাসকল বুঝিবার প্রবৃত্তি থাকিত না! এখন বুঝিতে পারি, তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে জানিয়াই ঠাকুর ঐ ব্যক্তিকে ঐ দিবস ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

কথায় ও কার্যে যাহার মিল নাই তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই

আশ্রিত ভক্তগণ তদীয় সর্বপ্রকার আচরণ তন্নতন্নভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া যাহাতে তাঁহাকে ঐরূপে গ্রহণ করে তজ্জন্য ঠাকুরের বিশেষ প্রযত্ন ছিল। কারণ, প্রায়ই তিনি আমাদিগকে বলিতেন, "সাধুকে দিনে দেখিবি, রাত্রে দেখিবি, তবে সাধুকে বিশ্বাস করিবি।" সাধু অপরকে যাহা শিক্ষা দেয় স্বয়ং তাহা অনুষ্ঠান করে কি না তদ্বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন–কথায় এবং কার্যে, মন ও মুখে যাহার মিল নাই, তাহার কথায় কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। ঐ প্রসঙ্গে একটি গল্পও তাঁহাকে কখনও কখনও বলিতে শুনিয়াছি।

ঐ বিষয়ে ঠাকুরের গল্প–বৈদ্য ও অসুস্থ বালক

কোন ব্যক্তির স্বল্পবয়স্ক পুত্র সর্বদা অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইত। পিতা তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে গ্রামান্তরে এক বিখ্যাত বৈদ্যের নিকট লইয়া যাইল। বৈদ্য বালককে পরীক্ষাদি করিয়া তাহার রোগনির্ণয় করিলেন, কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থা সেদিন না করিয়া তাহাকে পরদিবসে পুনরায় আসিতে বলিলেন।

পিতা পুত্রকে লইয়া ঐদিন উপস্থিত হইলে বৈদ্য বালককে বলিলেন, "তুমি গুড় খাওয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে, ঔষধ খাইবার প্রয়োজন নাই।" পিতা ঐ কথা শুনিয়া বলিল, "মহাশয়, ঐ কথা তো কাল বলিলেই পারিতেন; তাহা হইলে এতটা কষ্ট করিয়া আজি এতদূর আসিতে হইত না!" বৈদ্য তাহাতে বলিলেন, 'কি জান, কল্য আমার এখানে কয়েক কলসি গুড় ছিল–দেখিয়াছিলে বোধ হয়। কাল যদি বালককে গুড় খাইতে নিষেধ করিতাম, তাহা হইলে সে ভাবিত কবিরাজ লোক মন্দ নয়, নিজে এত গুড় খাইতেছে আর আমাকে কি না গুড় খাইতে নিষেধ করিতেছে। ঐরূপ ভাবিয়া সে আমার কথায় শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক কিছুমাত্র বিশ্বাস করিত না। সেজন্য গুড়ের কলসি সরাইবার পূর্বে তাহাকে ঐ কথা বলি নাই।'

ভক্তগণের ঠাকুরকে পরীক্ষা

ঠাকুরের ঐরূপ শিক্ষার প্রেরণায় আমরা সকলে তাঁহার আচরণসমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম। কেহ কেহ আবার উহার প্রভাবে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না! ফলে দেখা গিয়াছে, নিজ নিজ বিশ্বাসভক্তি বৃদ্ধির জন্য সরলান্তঃকরণে আমরা তাঁহার উপরে যে যাহা আবদার-অত্যাচার করিয়াছি, সে সকলই তিনি প্রসন্নমনে সহ্য করিয়াছেন। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তপাঠে পাঠকের ঐ কথা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১ম দৃষ্টান্ত–যোগানন্দ স্বামীর কথা

যোগানন্দ স্বামীজীর সম্বন্ধে কোন কথা আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঘটনাটি তাঁহাকে লইয়াই হইয়াছিল এবং তাঁহারই নিকটে আমরা পরে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীযুত যোগানন্দের পরিচয় সংক্ষেপে পাঠককে প্রথমে প্রদানপূর্বক আমরা উহা বলিতে প্রবৃত্ত হইব। যোগানন্দের পূর্বনাম যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিল। সুবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা নবীনচন্দ্র এককালে ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই বাস করিতেছিলেন। যোগীন্দ্রের বাল্যকালে এবং তৎপূর্বে তাঁহার বাসভবন ভারত-ভাগবতাদি গ্রন্থপাঠে, পূজা ও কীর্তনাদিতে সর্বদা মুখরিত থাকিত। ঠাকুর বলিতেন, সাধনকালে তিনি বহু বার ঐ ভবনে হরিকথা শুনিতে গিয়াছিলেন এবং কর্তাদিগের কাহারও কাহারও সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যোগীন্দ্র কৈশোরকাল অতিক্রম করিতে না করিতে গৃহবিসংবাদ এবং অন্য নানা কারণে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সম্পত্তি নষ্ট হইয়া চৌধুরীবংশীয়েরা দিন দিন নিঃস্ব হইয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রের পুণ্য সংস্কারসমূহ ও বুদ্ধিমত্তা

যোগীন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ধীর, বিনয়ী ও মধুর প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। অসাধারণ শুভ সংস্কারসকল লইয়া তিনি সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালে তাঁহার সর্বদা মনে হইত তিনি পৃথিবীর লোক নহেন, এখানে তাঁহার আবাস নহে, অতি দূরের কোন এক নক্ষত্রপুঞ্জে তাঁহার যথার্থ আবাস এবং সেখানেই তাঁহার পূর্বপরিচিত সঙ্গীসকল এখনও রহিয়াছে! আমরা তাঁহাকে কখনও ক্রোধ করিতে দেখি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'আমাদিগের ভিতর যদি কেহ সর্বতোভাবে কামজিৎ থাকে তো সে যোগীন।' সরলভাবে সকলকে বিশ্বাস করিবার জন্য ঠাকুরের নিকটে কখনও কখনও তিরস্কৃত হইলেও যোগীন্দ্র নির্বোধ ছিলেন না; এবং সর্বদা শান্তভাবে নিজ কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার বিচারশীল মন সকলের সকল কার্য লক্ষ্যপূর্বক তাহাদিগের সম্বন্ধে যে-সকল মতামত স্থির করিত তাহা সত্য ভিন্ন প্রায় মিথ্যা হইত না। সেইজন্য যোগীন্দ্রের বুদ্ধিমান বলিয়া একটু অহঙ্কার ছিল বলিয়া বোধ হয়।

ঠাকুরের কথা—যোগীন্দ্র ঈশ্বরকোটি ভক্ত

দক্ষিণেশ্বরে বসবাস থাকায় যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে যোগীন ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথম আগমনদিবসে ঠাকুর ইঁহাকে দেখিয়া ইঁহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে ধর্মলাভ করিতে আসিবে বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে বহুপূর্বে দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবলমাত্র তাঁহাদিগের অন্যতম নহেন, কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদম্বার কৃপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগেরও অন্যতম।

যোগীন্দ্রের বিবাহ, মনস্তাপ ও ঠাকুরের নিকটে গমনে বিরত হওয়ায় ঠাকুরের কৌশলপূর্বক তাহাকে আনয়ন ও সান্ত্বনা

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি মাতার করুণ ক্রন্দনে যোগীন সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহসা বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "বিবাহ করিয়াই মনে হইল ঈশ্বরলাভের আশা করা এখন বিড়ম্বনামাত্র; যে ঠাকুরের প্রথম শিক্ষা কামিনীকাঞ্চনত্যাগ তাঁহার কাছে আর কিসের জন্য যাইব; হৃদয়ের কোমলতায় জীবনটা নষ্ট করিয়াছি, উহা আর ফিরিবার নহে; এখন যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। পূর্বে ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যাইতাম, ঐ ঘটনার পরে এককালে যাওয়া বন্ধ করিলাম এবং দারুণ হতাশা ও মনস্তাপে দিন কাটাইতে লাগিলাম। ঠাকুর কিন্তু ছাড়িলেন না। বারংবার লোক প্রেরণ করিয়া ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এবং তাহাতেও যাইলাম না দেখিয়া অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। কালীবাটীর এক ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিবার নিমিত্ত

আমাকে বিবাহের পূর্বে কয়েকটি মুদ্রা দিয়াছিলেন। দ্রব্যটির মূল্য প্রদান করিয়া দুই-চারি আনা পয়সা উদ্‌বৃত্ত হইয়াছিল। দ্রব্যটি লোক মারফত তাঁহাকে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, উদ্‌বৃত্ত পয়সা শীঘ্র পাঠাইতেছি। ঠাকুর উহা জানিতে পারিয়া একদিন কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্বক আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তুই কেমন লোক? লোকে জিনিস কিনিতে দিলে তাহার হিসাব দেওয়া, বাকি পয়সা ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, কবে দিবি তাহার একটা সংবাদ পাঠানো পর্যন্ত নাই!' ঐ কথায় আমার হৃদয়ে বিষম অভিমান জাগিয়া উঠিল; ভাবিলাম, ঠাকুর আমাকে এতদিন পরে জুয়াচোর মনে করিলেন! থাক, আজ কোনরূপে যাইয়া এই গণ্ডগোল মিটাইয়া দিয়া আসিব; পরে কালীবাড়ির দিক আর মাড়াইব না। হতাশা, অনুতাপ, অভিমান, অপমানাদি নানা ভাবে মৃতকল্প হইয়া অপরাহ্নে কালীবাড়িতে যাইলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, ঠাকুর পরিধানের কাপড়খানি বগলে ধারণ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া যেন ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বেগে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহ করিয়াছিস, তাহাতে ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকিলে লাখটা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না; যদি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস—তাহাকে ও তোকে সেইরূপ করিয়া দিব; আর যদি সংসারত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস, তাহা হইলে তাহাই করিয়া দিব!' অর্ধবাহ্যদশায় অবস্থিত ঠাকুরের ঐ কথাগুলি একেবারে প্রাণের ভিতরে স্পর্শ করিল এবং ইতঃপূর্বের হতাশ অন্ধকার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনিও সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্বোক্ত হিসাব ও উদ্‌বৃত্ত পয়সার কথা যখন তুলিতে যাইলাম তখন সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।" গৃহত্যাগী উদাসীনের ভাব লইয়া যোগীন্দ্র সংসারে আসিয়াছিলেন, বিবাহ করিয়াও তাঁহার ঐ ভাব কিছুমাত্র পরিবর্তিত হইল না। পূর্বের ন্যায় ঠাকুরের সেবায় ও আশ্রয়েই তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। পুত্রকে বিষয়কর্ম ও অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া পিতামাতা অনুযোগ করিতে লাগিলেন। যোগীন বলিতেন, "ঐরূপ অনুযোগের কালে মাতা একদিন বলিলেন, 'যদি উপার্জনে মন দিবি না তবে বিবাহ করিলি কেন?' বলিলাম, 'আমি তো ঐ সময়ে তোমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলাম বিবাহ করিব না; তোমার ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়াই তো পরিশেষে ঐ কার্যে সম্মত হইলাম।' মাতা ক্রুদ্ধা হইয়া ঐ কথায় বলিয়া বসিলেন, 'ওটা কি আবার একটা কথা!—ভিতরে ইচ্ছা না হইলে তুই আমার জন্য বিবাহ করিয়াছিস, ইহা কি সম্ভবে?' তাঁহার ঐ কথায় এককালে নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হা ভগবান! যাঁহার কষ্ট না দেখিতে পারিয়া তোমাকে ছাড়িতে উদ্যত হইলাম, তিনিই এই কথা বলিলেন! দূর হোক, এই সংসারে মন ও মুখে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কাহারও নাই। সেইদিন হইতে সংসারে এককালে বীতরাগ উপস্থিত হইল। ঐ ঘটনার পর হইতে ঠাকুরের নিকটে মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকিতে লাগিলাম।"

যোগীন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস

ঠাকুরের নিকটে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিয়া যোগীন্দ্র একদিন দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমাগত ভক্তগণের সকলেই একে একে বিদায় গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ ভবনে চলিয়া গেল। কোনরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাত্রে লোকাভাবে ঠাকুরের কষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া তিনি সেদিন বাটীতে ফিরিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ঠাকুরও যোগীনের ঐরূপ করায় বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। ঈশ্বরীয় আলাপে ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখন জলযোগ করিলেন এবং যোগীন্দ্রের ভোজন শেষ হইলে তাঁহাকে গৃহমধ্যেই শয়ন করিতে বলিয়া স্বয়ং শয্যাগ্রহণ করিলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে ঠাকুরের বহির্গমনের ইচ্ছা উপস্থিত হওয়ায় তিনি যোগীনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। কাঁচা ঘুম ভাঙাইলে কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহাকে না ডাকিয়া তিনি একাকী পঞ্চবটী-অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ঝাউতলায় চলিয়া যাইলেন।

ঠাকুরের প্রতি সন্দেহ

যোগীন্দ্র চিরকাল স্বল্পনিদ্র ছিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহের দ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং শয্যায় ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি এত রাত্রে কোথায় গমন করিয়াছেন। গাড়ু প্রভৃতি জলপাত্রসকল যথাস্থানে রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি তবে বাহিরে পাদচারণ করিতেছেন। যোগীন্দ্র বাহিরে আসিলেন, জ্যোৎস্নালোকের সাহায্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল—তবে কি ঠাকুর নহবতে নিজ পত্নীর নিকটে শয়ন করিতে গিয়াছেন?—তবে কি তিনিও মুখে যাহা বলেন, কার্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন?

যোগীন্দ্রের সংশয়ের মীমাংসা

যোগীন্দ্র বলিতেন, "ঐ চিন্তার উদয়মাত্র সন্দেহ, ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পরে স্থির করিলাম, নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ হইলেও যাহা সত্য তাহা জানিতে হইবে। অনন্তর নিকটবর্তী এক স্থানে দাঁড়াইয়া নহবতখানার দ্বারদেশ লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। কিছুকাল ঐরূপ করিতে না করিতে পঞ্চবটীর দিক হইতে চটিজুতার চটচট শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং অবিলম্বে ঠাকুর আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে, তুই এখানে দাঁড়াইয়া আছিস যে?' তাঁহার উপরে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছি বলিয়া লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকিলাম, ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। ঠাকুর আমার মুখ দেখিয়াই সকল কথা বুঝিতে পারিলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, 'বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখিবি, রাত্রে দেখিবি, তবে বিশ্বাস করিবি!' ঐ কথা বলিয়া ঠাকুর আমাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া নিজ গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। সন্দিগ্ধ স্বভাবের প্রেরণায় কি ভয়ানক অপরাধ করিয়া বসিলাম, এ কথা ভাবিয়া সে রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইল না।"

যোগীন্দ্রের গুরুপদে আত্ম-সমর্পণ

গুরুপদে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রথমে তাঁহার, এবং তাঁহার অন্তর্ধানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেবাতে প্রাণপাত করিয়া স্বামী যোগানন্দ পরজীবনে পূর্বোক্ত অপরাধের সম্যক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় তীব্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন, জ্ঞান ও ভক্তির সমভাবে অধিকারী, সমাধিমান যোগী পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসিসঙেঘ বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি দেহরক্ষা করিয়া পরমপদে মিলিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের কার্য লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করেন

দক্ষিণেশ্বর-আগমনের পর হইতে ঠাকুর যে নরেন্দ্রনাথের প্রতি কার্য তন্ন তন্ন করিয়া নিত্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন এ কথা আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উহার ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মানুরাগ, সাহস, সংযম, বীর্য ও মহদুদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করা প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল নরেন্দ্রের হৃদয়ে স্বভাবত প্রদীপ্ত রহিয়াছে। বুঝিয়াছিলেন, শুভ সংস্কারনিচয় তাঁহার হৃদয়ে এত অধিক বিদ্যমান রহিয়াছে যে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বিশেষরূপে প্রলুব্ধ হইলেও ইতরসাধারণের ন্যায় হীন কার্যের অনুষ্ঠান তাঁহার দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না। আর, সত্যনিষ্ঠা—নরেন্দ্রের কঠোর সত্যপালন দেখিয়া তিনি যে কেবল তাহার সকল কথায় বিশ্বাস করিতেন তাহাই নহে, কিন্তু তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহার এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে যখন সত্য ভিন্ন মিথ্যা বাক্য প্রমাদকালেও তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইবে না—যখন তাহার মনের যদৃচ্ছা-উত্থিত সঙ্কল্পসকলও সর্বদা সত্যে পরিণত হইবে। সেজন্য তিনি তাহাকে ঐ বিষয়ে সর্বদা উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলিতেন, "যে কায়মনোবাক্যে সত্যকে ধরিয়া থাকে, সে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভে ধন্য হয়",—"বার বৎসর কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিলে মানব সত্যসঙ্কল্প হয়"।

রহস্যজনক ঘটনা—চামচিকাকে চাতক নির্ণয়

সত্যনিষ্ঠার জন্য নরেন্দ্রনাথের উপর ঠাকুরের দৃঢ় বিশ্বাস সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক ঘটনা আমাদিগের মনে উদয় হইতেছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তের স্বভাব চাতক পক্ষীর ন্যায় হইয়া থাকে বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলেন, "চাতক যেমন নিজ পিপাসা শান্তির জন্য সর্বদা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং উহার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করে, ভক্তও তদ্রূপ নিজ প্রাণের পিপাসা ও সর্বপ্রকার অভাব মিটাইবার জন্য একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে"—ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ তখন তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, চাতক বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য কিছু পান করে না—ঐরূপ প্রসিদ্ধ থাকিলেও ঐ কথা সত্য নহে, অন্য পক্ষীসকলের ন্যায় নদী প্রভৃতি জলাশয়েও পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে। আমি চাতক পক্ষীকে ঐরূপে জলপান করিতে দেখিয়াছি।" ঠাকুর বলিলেন, "সে কিরে—চাতক অন্য পক্ষীর ন্যায় জলপান করে? তবে তো আমার এতকালের ধারণা মিথ্যা হলো। তুই যখন দেখিয়াছিস তখন তো আর ঐ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি না।" বালকের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন ঠাকুর ঐরূপ বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, ভাবিতে লাগিলেন—ঐ ধারণাটা যেমন ভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হইল তাঁহার অন্য ধারণাসকলও তো ঐরূপ হইতে পারে। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি বিশেষ বিষণ্ণ হইলেন। উহার স্বল্পদিন পরেই নরেন্দ্র এক দিবস ঠাকুরকে সহসা ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন মহাশয়, চাতক গঙ্গার জল পান করিতেছে।" ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "কই রে?" নরেন্দ্র দেখাইয়া দিলে তিনি দেখিলেন একটি চামচিকা জলপান করিতেছে এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওটা চামচিকা যে! ওরে শালা, তুই চামচিকাকে চাতক জ্ঞান করিয়া আমাকে এতটা ভাবাইয়াছিস! তোর সকল কথায় আর বিশ্বাস করিব না।"

নরেন্দ্রের সংযম

সম্মান, শিষ্টাচার, সৌন্দর্যানুভব প্রভৃতি ভাবসমূহের প্রেরণায় যতদূর কোমল হওয়া সম্ভবপর, রমণীর সম্মুখে সাধারণ মানবের অন্তর অনেক সময়ে তদপেক্ষা অধিকতর মৃদুভাব অবলম্বন করে। হৃদয়ের সুপ্রচ্ছন্ন সংস্কারবিশেষ উহাকে ঐরূপ করিয়া থাকে, এ কথা শাস্ত্রসম্মত। নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ঐরূপ সংস্কার চিরকাল স্বল্প পরিলক্ষিত হইত! উহা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, নরেন্দ্র রূপজ মোহে আত্মহারা হইয়া সংযমের পথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইবে না। ঘন ঘন ভাবসমাধি হওয়ার জন্য আমাদিগের নিকটে এক সময়ে উচ্চসম্মানপ্রাপ্ত জনৈকের[13] সহিত নরেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত বিষয়ে তুলনা করিয়া ঠাকুর এক দিবস বলিয়াছিলেন, "রমণীগণের আদরযত্নে ঐ ব্যক্তি যেন এককালে আত্মহারা হইয়া গড়াইয়া পড়ে, নরেন্দ্র কখনও ঐরূপ হয় না; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐরূপ স্থলে সে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় সে যেন বিরক্ত হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেছে, 'এরা আবার এখানে কেন?'"

শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া নরেন্দ্রের অন্তরের ভক্তির পরিমাণ নির্ণয়

জ্ঞানের প্রকাশ এবং পুরুষোচিত ভাবসমূহ প্রবল থাকিলেও নরেন্দ্রনাথের ভিতরে কোমলতা ও ভক্তিভাবের স্বল্পতা ছিল না, ঠাকুর ঐ কথা আমাদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছেন। সামান্য সামান্য আচরণে প্রকাশিত কেবলমাত্র তাঁহার মনের ভাবসকল লক্ষ্য করিয়াই তিনি যে উক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার শারীরিক লক্ষণসকল দেখিয়াও তিনি ঐ বিষয়ে স্থির করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ হয়, একদিন নরেন্দ্রনাথের মুখ-শ্রী দেখিতে দেখিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এইরূপ চক্ষু কি কখনো শুষ্ক জ্ঞানীর হইয়া থাকে? জ্ঞানের সহিত রমণীসুলভ ভক্তির ভাব তোর ভিতরে বিলক্ষণ রহিয়াছে। কেবলমাত্র পুরুষোচিত ভাবসকল যাহার ভিতরে থাকে তাহার স্তনের বোঁটার চারিদিকে ভেলার দাগ (কালবর্ণ) থাকে না—মহাবীর অর্জুনের ঐরূপ ছিল।"

ঠাকুরের উদাসীনতায় নরেন্দ্রের আচরণ

পূর্বোল্লিখিত চারিপ্রকার সাধারণ উপায় ভিন্ন আমাদিগের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অন্য নানা প্রকারে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রধান দুই-একটির কথা আমরা পাঠককে অতঃপর বলিব। আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত হইতেন। তাঁহাকে দূরে দেখিবামাত্র ঠাকুরের সম্পূর্ণ অন্তর যেন প্রবল বেগে শরীর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিত! "ঐ ন -, ঐ ন -" বলিতে বলিতে আমরা কতদিন ঠাকুরকে ঐরূপে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি তাহা বলা যায় না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল যাতায়াত করিবার পরে এমন একদিন আসিয়াছিল যেদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত সর্বপ্রকারে উদাসীনের ন্যায় আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র আসিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন–ঠাকুর কিন্তু আদরযত্ন করা দূরে থাকুক একবার কুশলপ্রশ্ন পর্যন্ত না করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাতপূর্বক আপন মনে বসিয়া রহিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি ভাবাবিষ্ট রহিয়াছেন। অগত্যা কিছুক্ষণ পরে গৃহের বাহিরে আসিয়া হাজরা মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপে ও তামাকুসেবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুর অপরের সহিত কথা কহিতেছেন শুনিতে পাইয়া নরেন্দ্র পুনরায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখনো ঠাকুর তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। ঐরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইলেও ঠাকুরের ভাবান্তর না দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে তদবস্থ দেখিলেন। সেদিনও হাজরা মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলাপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঐরূপে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াও নরেন্দ্র ঠাকুরের কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু উহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত না হইয়া পূর্বের ন্যায় সমভাবে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিতে থাকিলেন। নরেন্দ্র বাটীতে থাকিবার কালে ঠাকুর তাঁহার কুশলসংবাদাদি লইতে মধ্যে মধ্যে কাহাকেও পাঠাইতেন বটে, কিন্তু নিকটে আসিলেই তাঁহার সহিত ঐরূপ ব্যবহার কিছুকাল পর্যন্ত করিয়াছিলেন। একমাসের অধিক কাল ঐরূপে গত হইলে ঠাকুর যখন দেখিতে পাইলেন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতে বিরত হইলেন না, তখন একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমি তো তোর সহিত একটা কথাও কহি না, তবু তুই এখানে কি করিতে আসিস বল দেখি?" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমি কি আপনার কথা শুনিতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখিতে ইচ্ছা করে, তাই আসিয়া থাকি।" ঠাকুর ঐ কথায় বিশেষ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা করে) দেখছিলাম–আদরযত্ন না পেলে তুই পালাস কি না; তোর মতো আধারই এতটা (অবজ্ঞা ও উদাসীনভাব) সহ্য করিতে পারে–অপরে এতদিন কোন্ কালে পলায়ন করিত, এদিক আর মাড়াইত না।"

ঈশ্বরদর্শনের আগ্রহে নরেন্দ্রের অণিমাদি বিভূতি প্রত্যাহার

আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের আগ্রহ নরেন্দ্রনাথের অন্তরে কতদূর প্রবল ছিল, তাহা উহার সহায়ে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক সময়ে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটীতলে আহ্বানপূর্বক বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, তপস্যাপ্রভাবে আমাতে অণিমাদি বিভূতিসকল অনেক কাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যাহার পরিধানের কাপড় পর্যন্ত ঠিক থাকে না, তাহার ঐসকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবসর কোথায়? তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে ঐসকল প্রদান করি;

কারণ, মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐসকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্যকালে ঐসকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি–কি বলিস?" ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিবার দিন হইতে নরেন্দ্র দৈবীশক্তির অশেষ প্রকাশ তাঁহাতে নয়নগোচর করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ঐ কথায় অবিশ্বাস করিবার নরেন্দ্রের কোন কারণ ছিল না। অবিশ্বাস না করিলেও কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ তাঁহাকে ঐসকল বিভূতি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিল না। তিনি চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ঐসকলের দ্বারা আমার ঈশ্বরলাভ-বিষয়ে সহায়তা হইবে কি?" ঠাকুর বলিলেন, "সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশ্বরলাভ করিয়া যখন তাঁহার কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইবি, তখন উহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।" নরেন্দ্র ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার ঐসকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বরলাভ হউক, পরে ঐসকল গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভূতিসকল এখন লাভ করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগকে অযথা ব্যবহার করিয়া বসি, তাহা হইলে সর্বনাশ হইবে যে!" ঠাকুর নরেন্দ্রকে অণিমাদি বিভূতিসকল সত্য-সত্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার অন্তর পরীক্ষার জন্য পূর্বোক্তভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা আমাদিগের সাধ্যাতীত–কিন্তু নরেন্দ্র ঐসকল গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে তিনি যে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগের জানা আছে।

[1] পূর্ব নাম – বাবুরাম।

[2] শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী।

[3] জগদম্বার সৃজনী ও পালনী শক্তির মূর্তিমতী-স্বরূপা নারীগণকে।

[4] স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

[5] ছোট নরেন্দ্র।

[6] স্বামী যোগানন্দ, পূর্ব নাম যোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

[7] স্বামী যোগানন্দ।

[8] হরিশের মাতা জীবিতা ছিলেন না, বোধ হয় সেইজন্য ঠাকুর ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

[9] ঠাকুরের এই কথার বিস্তারিত আলোচনা আমরা 'গুরুভাব – উত্তরার্ধ' -শীর্ষক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে করিয়াছি।

[10] আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এই ব্যক্তি কয়েকবার ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিবার পরেই তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশে সংসারত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবপ্রদেশের উত্তরে অবস্থিত হিমালয়গিরির কোন স্থলে তপস্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া শরীরপাত করিয়াছিলেন।

[11] পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

[12] কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহাকে প্রণাম করা ঠাকুরের রীতি ছিল। এই ব্যক্তিকে ইতঃপূর্বে ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিবার সময় তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

[13] নিত্যগোপাল – ইনি পরজীবনে জ্ঞানানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫.১৩. অষ্টম অধ্যায়—প্রথম পাদ: সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

আপনাতে স্ত্রীভাবের ও নরেন্দ্রে পুরুষভাবের প্রকাশ বলিয়া ঠাকুর নির্দেশ করিতেন—উহার অর্থ

ঠাকুর কখনও কখনও নরেন্দ্রের সহিত নিজ স্বভাবের তুলনায় আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বলিতেন, "ইহার (তাঁহার নিজের) ভিতরে যে আছে তাহাতে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভাবের ও নরেনের ভিতরে যে আছে তাহাতে পুরুষোচিত ভাবের প্রকাশ রহিয়াছে।" কথাগুলি তিনি ঠিক কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিতেন তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে ঈশ্বর বা চরম সত্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা উভয়ে যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন অথবা যে উপায় প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে পূর্বোক্ত কথার একটা সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, দেখা যায়, ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে যে-সকল উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহ নির্দেশ করিয়াছে, ঠাকুর ঐসকলের প্রত্যেকটি গুরুমুখে শ্রবণমাত্র উহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—নরেন্দ্রনাথের আচরণ কিন্তু ঐরূপ স্থলে সম্পূর্ণ বিভিন্নাকার ধারণ করিত। নরেন্দ্র ঐরূপ স্থলে শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে কি না তদ্বিষয় নির্ণয় করিতে নিজ বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রথমেই নিযুক্ত করিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে উহাদিগের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর

বিবেচনা করিবার পরে উহাদিগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। পূর্বসংস্কারবশে দৃঢ় আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও নরেন্দ্রের ভিতর–মানবমাত্রেই নানা কুসংস্কার ও ভ্রমপ্রমাদের বশবর্তী, অতএব কাহারও কোন কথা নির্বিচারে গ্রহণ করিব কেন?—এইরূপ একটা ভাব আজীবন দেখিতে পাওয়া যায়। ফলাফল উহার যাহাই হউক এবং উহার উৎপত্তি যথায় যেরূপেই হউক না কেন, বুদ্ধিবৃত্তিসহায়ে বিশ্বাসভক্তিকে ঐরূপে সংযত রাখিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে এবং অন্য সকল বিষয়ে অগ্রসর হওয়াই যে বর্তমান কালের মানবসাধারণের নিকটে পুরুষোচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, এ কথা বলিতে হইবে না।

নরেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থানুগত শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা, সংশয়, গুরুবাদ অস্বীকার করা

পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ মানবজীবনে সর্বত্র সর্বকাল বিশেষ অধিকার বিস্তৃত করিয়া বসে। শুদ্ধ অধিকারবিস্তার কেন?—উহারাই উহাকে গন্তব্যপথে সর্বদা নিয়মিত করিয়া থাকে। অতএব নরেন্দ্রের জীবনে উহাদিগের প্রভাব ও প্রেরণা পরিলক্ষিত হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ঠাকুরের নিকটে যাইবার পূর্বেই নরেন্দ্র নিজ অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে ইংরাজী কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও ন্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্য ভাবে বিশেষরূপে ভাবিত হইয়াছিলেন। স্বাধীন-চিন্তা-সহায়ে সকল বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া-রূপ পাশ্চাত্যের মূলমন্ত্র ঐ সময়েই তাঁহার মনে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যসকলে তিনি যে ঐ সময়ে বিশেষ সন্দিহান হইবেন ও অনেক স্থলে মিথ্যা বোধ করিবেন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকভাবে ভিন্ন অপর কোন ভাবে মানববিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পরাঙ্‌মুখ হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক।

পিতার জীবন ও সমাজের ঐরূপ শিক্ষায় সহায়তা

নিজ অভিভাবকদিগের জীবনাদর্শ এবং কলিকাতার তৎকালীন সমাজের অবস্থা নরেন্দ্রনাথকে পূর্বোক্ত ভাবপোষণে সহায়তা করিয়াছিল। পিতামহ আজীবন হিন্দুশাস্ত্রে অশেষ আস্থাসম্পন্ন থাকিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও নরেন্দ্রের পিতা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার ফলে উক্ত বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। পারস্য কবি হাফেজের কবিতা এবং বাইবেল-নিবদ্ধ ঈশার বাণীসমূহ তাঁহার নিকটে আধ্যাত্মিক ভাবের চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। সংস্কৃতভাষায় অজ্ঞতাবশতঃ গীতাপ্রমুখ হিন্দুশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে না পারাতেই যে তাঁহাকে আধ্যাত্মিক রসোপভোগের জন্য ঐসকল গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল তাহা বলিতে হইবে না। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রকে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া তিনি তাহাকে একখানি বাইবেল উপহার দিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, ‘ধর্মকর্ম যদি কিছু থাকে তাহা কেবলমাত্র ইহারই ভিতরে আছে’। হাফেজের কবিতাবলী এবং বাইবেলের ঐরূপে প্রশংসা করিলেও তাঁহার জীবন যে ঐসকল গ্রন্থোক্ত আধ্যাত্মিক ভাবে নিয়মিত ছিল, তাহা নহে। উহাদিগের সহায়ে ক্ষণিক রসানুভব ভিন্ন ঐরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি কখনও অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অর্থোপার্জন করিয়া স্বয়ং ভোগসুখে থাকিব এবং যথাসম্ভব দান করিয়া দশজনকে সুখী করিব–ইহাই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল। উহা হইতে এবং তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের আলোচনায় বুঝা যায়, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস কতদূর শিথিল ছিল। বাস্তবিক পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও ইহকালসর্বস্বতা তখন নরেন্দ্রের পিতার ন্যায় ব্যক্তিদিগের ভিতর আধ্যাত্মিক বিষয়সকলে দারুণ সংশয় ও অনেক সময়ে নাস্তিকতা আনয়নপূর্বক আমাদিগের প্রাচীন ঋষি ও শাস্ত্রসকলের নিকটে দুর্বলতা ও কুসংস্কার ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষিতব্য নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছিল এবং উহার প্রভাবে ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক-মেরুদণ্ড-বিহীন হইয়া তাহারা অন্তরে একরূপ ও বাহিরে অন্যরূপ ভাব পোষণপূর্বক দিন দিন স্বার্থপর ও কপটাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। মহামনস্বী রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ঐ দেশব্যাপী স্রোতের গতি স্বল্পকাল ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া পরিণামে পাশ্চাত্য ভাবের প্রবল প্রভাবে অন্তর্বিবাদে দুই দলে বিভক্ত

ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ দুই দলভুক্ত ব্যক্তিসকলের মধ্যেও পূর্বোক্ত স্রোতে গাত্র ঢালিবার লক্ষণ তখন কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছিল।

পাশ্চাত্য ন্যায়, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও নরেন্দ্রের সত্যলাভ হইল না বলিয়া অশান্তি

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এফ.এ. পরীক্ষার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। মিল-প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকসকলের মতবাদ তিনি ইতঃপূর্বেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন; এখন—ডেকার্টের 'অহংবাদ', হিউম এবং বেনের 'নাস্তিকতা', স্পাইনোজার 'অদ্বৈতচিদ্বস্তুবাদ', ডারউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ' ও কোঁতে ও স্পেন্সরের 'অজ্ঞেয়বাদ' এবং আদর্শ সমাজের অভিব্যক্তি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদসমূহ আয়ত্ত করিয়া সত্যবস্তু নির্ণয় করিবার বিষম উৎসাহ তাঁহার প্রাণে উপস্থিত হইয়াছিল। জার্মান দার্শনিকসকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দর্শনেতিহাসগ্রন্থসকলের সহায়ে তিনি কান্ট, ফিক্টে, হেগেল, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতির মতবাদের যথাসম্ভব পরিচয়গ্রহণেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে মেডিকেল কলেজে যাইয়া শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতাশ্রবণ ও গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ফলে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতা হইতে নিরপেক্ষ সদ্বস্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভের নিশ্চয় উপায় জানিতে পারা এবং শান্তিলাভ করা দূরে থাকুক, মানব-মন-বুদ্ধি-প্রচারের সীমা ও ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত সত্যবস্তুকে প্রকাশ করিবার উহাদের নিতান্ত অসামর্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া তাঁহার প্রাণে অশান্তির স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের সন্দেহ—প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য, কোন্ প্রথানুসারে তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য

পাশ্চাত্য-দর্শন ও বিজ্ঞানসহায়ে নরেন্দ্র স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের আক্ষেপ বা উত্তেজনা মানবমনে প্রতি মুহূর্তে নানা বিকার আনয়নপূর্বক তাহাতে সুখদুঃখাদি জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত করিতেছে। ঐসকল মানসিক বিকারই মানব দেশকালাদি-সহায়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভব করিতেছে, কিন্তু বহির্জগৎ ও তদন্তর্গত যে-সকল বস্তু পূর্বোক্ত উত্তেজনা ও বিকারসমূহ তাহার ভিতর উপস্থিত করিতেছে, তাহাদিগের যথার্থ স্বরূপ চিরকাল তাহার নিকটে অজ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। অন্তর্জগৎ বা মানবের নিজ স্বরূপ সম্বন্ধেও ঐ কথা সমভাবে প্রযোজ্য হইয়া রহিয়াছে। সেখানেও দেখা যাইতেছে কোন এক অপূর্ব বস্তু নিজশক্তিসহায়ে মনে অহংজ্ঞান ও নানা ভাবের উদয় করিলেও তাহার স্বরূপ দেশকালের বাহিরে অবস্থান করায় মানব উহাকে ধরিতে বুঝিতে পারিতেছে না। ঐরূপে অন্তরে ও বাহিরে, যেদিকেই মানব-মন চরম সত্যের অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে সেইদিকেই সে দেশকালের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া আপনার অকিঞ্চিৎকরত্ব সর্বথা অনুভব করিতেছে। ঐরূপে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধিরূপ যে যন্ত্রসহায়ে মানব বিশ্বরহস্য-উদ্ঘাটনে ধাবিত হইয়াছে, তাহার বিশ্বের চরম কারণ প্রকাশ করিবার অসামর্থ্য—ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, যাহার উপর ভিত্তিস্থাপনপূর্বক সে সকল বিষয়ে অনুমান ও মীমাংসায় ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার ভিতরে নিরন্তর ভ্রমপ্রমাদের বর্তমানতা—শরীর ভিন্ন আত্মার পৃথগস্তিত্ব আছে কি না তদ্বিষয় নিরাকরণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের সকল চেষ্টার বিফলতা, প্রভৃতি নানা বিষয় নরেন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়াছিলেন। ঐজন্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদর্শনের চরম মীমাংসাসমূহ তাঁহার নিকটে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় নাই। রূপ-রসাদি-বিষয়ভোগে নিরন্তর আসক্ত মানবসাধারণের প্রত্যক্ষসকলকে সহজ ও স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া লইয়া উহার উপর ভিত্তিস্থাপনপূর্বক পাশ্চাত্যের অনুসরণে দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া তোলা ভাল, অথবা বুদ্ধাদি চরিত্রবান

মহাপুরুষসকলের অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল ইতরসাধারণ-মানব-প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলেও, সত্য বলিয়া স্বীকারপূর্বক উহাদিগকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যের প্রথানুসারে দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য—ঐরূপ সন্দেহও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল।

ঈশ্বর বা চরম সত্যলাভের সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া নরেন্দ্রের পাশ্চাত্য প্রথার গুণভাগমাত্র গ্রহণ

পাশ্চাত্য-দর্শনোক্ত আধ্যাত্মিক মীমাংসাসকলের অধিকাংশ নরেন্দ্রনাথের অযুক্তিকর বলিয়া মনে হইলেও জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহের এবং পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ-প্রণালীর তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মনোবিজ্ঞানের ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্বসকলের পরীক্ষাস্থলে উহাদিগের সহায়তা সর্বদা গ্রহণ করিতেন। ঠাকুরের জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষসমূহ তিনি উহাদিগের সহায়ে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে এখন হইতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং ঐরূপ পরীক্ষায় যে-সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত সেইসকলকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্বক নির্ভয়ে তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতেন। সত্যলাভের জন্য বিষম অস্থিরতা তাঁহার প্রাণ অধিকার করিলেও না বুঝিয়া কোনরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া এবং কাহাকেও ভয়ে ভক্তি করা তাঁহার এককালে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বিচারবুদ্ধির যথাশক্তি পরিচালনের পরিণাম যদি নাস্তিক্য হয় তাহাও তিনি গ্রহণে স্বীকৃত ছিলেন এবং সংসারে ভোগসুখ তো দূরের কথা, নিজ প্রাণের বিনিময়ে যদি জীবনরহস্যের সমাধান ও সত্যপ্রকাশ উপস্থিত হয় তাহাতেও তিনি পরাঙ্‌মুখ ছিলেন না। সুতরাং চরম সত্যের অনুসন্ধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নির্ভয়ে তিনি এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুসরণে ও উহার গুণভাগ গ্রহণে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। উহার প্রভাবে তিনি বিশ্বাস-ভক্তির সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া সময়ে সময়ে নানা সন্দেহজালে নিপীড়িত ও অভিভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিই জয়ী হইয়া পরিণামে তাঁহাকে সত্যলাভে কৃতার্থম্মন্য করিয়াছিল। লোকে কিন্তু এই কালে অনেক সময়ে ভাবিয়া বসিত, পাশ্চাত্য গ্রন্থসকলে যে-সকল মত প্রকাশিত হয়, নরেন্দ্র সে-সকলই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার পাশ্চাত্য মতসকলের পক্ষপাতিত্ব এ সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের ভিতর এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, গীতা অধ্যয়ন করিয়া তিনি যেদিন তাঁহাদিগের নিকটে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন, সেদিন বিস্মিত হইয়া তাঁহারা তাঁহার ঐরূপ আচরণের কথা ঠাকুরের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাহাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সাহেবদের মধ্যে কেহ গীতা সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া সে ঐরূপ করে নাই তো?"

অদ্‌ভুত দর্শন ও শ্রীগুরুর কৃপায় নরেন্দ্রের আস্তিক্যবুদ্ধি এইকালে রক্ষিত হয়

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অন্তরে বিশেষ ভাব-পরিবর্তনের পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভপূর্বক কতকগুলি অসাধারণ প্রত্যক্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐসকলের কথা আমরা ইতঃপূর্বেই পাঠককে বলিয়াছি। নরেন্দ্রের আস্তিক্যবুদ্ধিকে সুদৃঢ় রাখিতে উহারা এখন বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। নতুবা পাশ্চাত্যের ভাব ও মতবাদ জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে কতদূরে কোথায় লইয়া যাইত তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। স্বাভাবিক পুণ্যসংস্কারবশে তাঁহার আস্তিক্যবুদ্ধির উহাতে এককালে লোপসাধন না হইলেও উহা বিষম বিপর্যস্ত হইত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইবার নহে। নরেন্দ্রের দেবরক্ষিত জীবন বিশেষ কার্য সম্পন্ন করিতেই সংসারে উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব ঐরূপ হইবে কেন? দেবকৃপায় তিনি যাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন সেই সদ্‌গুরুই তাঁহাকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "মানবের সকরুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্বদা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং তোমাতে আমাতে যেভাবে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতরভাবে তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে ও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, এ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি!"—আবার বলিয়াছিলেন, "সাধারণ-প্রসিদ্ধ ঈশ্বরের যাবতীয় রূপ এবং ভাবকে মানব-কল্পনাপ্রসূত

বলিয়া যদি না মানিতে পার, অথচ জগতের নিয়ামক ঈশ্বর একজন আছেন এ কথায় বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে—‘হে ঈশ্বর, তুমি কেমন তাহা জানি না; তুমি যেমন, তেমনি ভাবে আমাকে দেখা দাও’—এইরূপ কাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি উহা শ্রবণপূর্বক কৃপা করিবেন নিশ্চয়!” ঠাকুরের এইসকল কথা নরেন্দ্রনাথকে অশেষ আশ্বাস প্রদানপূর্বক সাধনায় অধিকতর নিবিষ্ট করিয়াছিল, এ কথা বলা বাহুল্য।

নরেন্দ্রের সাধনা

পাশ্চাত্য-দার্শনিক হ্যামিলটন তৎকৃত দর্শনগ্রন্থের সমাপ্তিকালে বলিয়াছেন, ‘জগতের নিয়ামক ঈশ্বর আছেন এই সত্যের আভাসমাত্র দিয়া মানববুদ্ধি নিরস্ত হয়; ঈশ্বর কিংস্বরূপ এ বিষয় প্রকাশ করিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় না; সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের ঐখানেই ইতি—এবং যেখানে দর্শনের ইতি সেখানেই আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ।’ হ্যামিলটনের ঐ কথা নরেন্দ্রনাথের বিশেষ রুচিকর ছিল এবং কথাপ্রসঙ্গে উহা তিনি সময়ে সময়ে আমাদের নিকটে উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, সাধনায় মনোনিবেশ করিলেও নরেন্দ্র দর্শনাদি গ্রন্থপাঠ ছাড়িয়া দেন নাই। ফলতঃ গ্রন্থপাঠ, ধ্যান ও সঙ্গীতেই তিনি এই সময়ে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেন।

নূতন প্রণালী অবলম্বনে সারারাত্র ধ্যান

ধ্যানাভ্যাসের এক নূতন পথ তিনি এখন হইতে অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, সাকার বা নিরাকার যেরূপেই ঈশ্বরকে ভাবি না কেন, মানবীয় ধর্মভূষিত করিয়া তাঁহাকে ভাবা[1] ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। ঐ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বে নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিবার কালে ব্রাহ্মসমাজোক্ত পদ্ধতিতে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের চিন্তাতে মনকে নিযুক্ত রাখিতেন। ঈশ্বরীয় স্বরূপের ঐরূপ ধারণা পর্যন্ত মানবীয় কল্পনাদুষ্ট স্থির করিয়া তিনি এখন ধ্যানের উক্ত অবলম্বনকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং ‘হে ঈশ্বর, তুমি তোমার সত্যস্বরূপ দর্শনের আমাকে অধিকারী কর’—এই মর্মে প্রার্থনা পুরঃসর মন হইতে সর্বপ্রকার চিন্তা দূরীভূত করিয়া নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় উহাকে নিশ্চল রাখিয়া অবস্থান করিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল ঐরূপ করিবার ফলে নরেন্দ্রনাথের সংযত চিত্ত উহাতে এতদূর মগ্ন হইয়া যাইত যে, নিজ শরীরের এবং সময়ের জ্ঞান পর্যন্ত তাঁহার সময়ে সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত। বাটীর সকলে সুপ্ত হইবার পরে নিজ কক্ষে ধ্যানে বসিয়া তিনি ঐভাবে সমস্ত রজনী অনেক দিবস অতিবাহিত করিয়াছেন।

ঐরূপ ধ্যানে অদ্‌ভুত দর্শন—বুদ্ধদেব

ঐরূপে ধ্যানের ফলে একদা এক দিব্যদর্শন নরেন্দ্রনাথের উপস্থিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিতভাবে তিনি উহা একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন:

“অবলম্বনশূন্য করিয়া মনকে স্থির রাখিবার কালে অন্তরে একটা প্রশান্ত আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত। ধ্যানভঙ্গের পরেও উহার প্রভাবে একটা নেশার ন্যায় ঝোঁক অনেক ক্ষণ পর্যন্ত অনুভব করিতাম। তজ্জন্য সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হইত না। ধ্যানাবসানে একদিন ঐভাবে বসিয়া থাকিবার কালে দেখিতে পাইলাম, দিব্য জ্যোতিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া এক অপূর্ব সন্ন্যাসিমূর্তি কোথা হইতে সহসা আগমনপূর্বক আমার সম্মুখে কিছু দূরে দণ্ডায়মান হইলেন! তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু এবং মুখমণ্ডলে এমন স্থির প্রশান্ত ও সর্ববিষয়ে উদাসীনতাপ্রসূত একটা অন্তর্মুখী ভাব যে, উহা আমাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া স্তম্ভিত করিয়া রাখিল। যেন কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উহাতে ভয়ে সহসা এমন অভিভূত হইয়া পড়িলাম যে, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আসন ত্যাগপূর্বক দ্বার অর্গলমুক্ত করিলাম এবং দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল, এত ভয় কিসের জন্য? সাহসে

নির্ভর করিয়া সন্ন্যাসীর কথা শুনিবার জন্য পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না! তখন বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলাম, তাঁহার কথা না শুনিয়া পলায়ন করিবার দুর্বুদ্ধি আমার কেন আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী অনেক দেখিয়াছি কিন্তু অমন অপূর্ব মুখের ভাব কাহারও কখনও নয়নগোচর করি নাই। সে মুখখানি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। হইতে পারে ভ্রম, কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভে আমি সেই দিন ধন্য হইয়াছিলাম!”

[1] Anthropomorphic idea of God.

৫.১৪. অষ্টম অধ্যায়–দ্বিতীয় পাদ: সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

এটর্নির কর্ম শিক্ষা

ঐরূপে নির্জনবাস, অধ্যয়ন, তপস্যা ও দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনপূর্বক নরেন্দ্রের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তাপূর্বক তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই সময়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি নিমাইচরণ বসুর অধীনে এটর্নির ব্যবসায় শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার আশায় শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণেও এই সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ করায় নরেন্দ্রের বিষম আপত্তি থাকায় এবং মনোমত পাত্রীর সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহার ঐ আশা সফল হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে উপদেশ

রামতনু বসু লেনস্থ নরেন্দ্রের পাঠগৃহে ঠাকুর কখনও কখনও সহসা আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সাধনভজন সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন। পিতামাতার সকরুণ অনুরোধে পাছে নরেন্দ্র উদ্বাহ-বন্ধনে নিজ জীবন চিরকালের মতো আবদ্ধ ও সঙ্কুচিত করিয়া বসেন এজন্য ঐ সময়ে তিনি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া ব্রহ্মচর্য-পালনে সতত উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, “বার বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য-পালনের ফলে মানবের মেধানাড়ি খুলিয়া যায়, তখন তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সকলে প্রবেশ ও উহাদিগের ধারণা করিতে সমর্থ হয়; ঐরূপ বুদ্ধিসহায়েই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়; তিনি কেবলমাত্র ঐরূপ শুভবুদ্ধির গোচর।”

নরেন্দ্রের বাটীর সকলের ভয়—সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া সন্ন্যাসী হইবে

ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলেই নরেন্দ্র বিবাহ করিতে চাহে না—এইরূপ একটা ধারণা বাটীর স্ত্রীলোকদিগের ভিতর এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র বলিতেন, "পাঠগৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর যখন একদিন পূর্বোক্তভাবে ব্রহ্মচর্য-পালনে আমাকে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন আমার মাতামহী আড়াল হইতে সকল কথা শ্রবণপূর্বক পিতামাতার নিকটে বলিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া পাছে আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাই—এই ভয়ে তাঁহারা ঐদিন হইতে আমার বিবাহ দিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু করিলে কি হইবে, ঠাকুরের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছিল। সকল বিষয় স্থির হইবার পরেও কয়েক স্থলে সামান্য কথায় উভয় পক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া বিবাহ-সম্বন্ধ সহসা ভাঙিয়া গিয়াছিল!"

ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের পূর্বের ন্যায় যাতায়াত

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করাটা বাটীর সকলের রুচিকর না হইলেও নরেন্দ্রনাথকে ঐ বিষয়ে কেহ কোন কথা বলিতে কখনও সাহস করেন নাই। কারণ জনক-জননীর পরম আদরের পুত্র নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতে কখনও কাহারও নিষেধ মানিয়া চলিতেন না এবং যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে অসীম স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং বালক বা তরলমতি যুবককে আমরা যেভাবে নিষেধ করিয়া থাকি, প্রখরবুদ্ধি নরেন্দ্রকে এখন সেইভাবে কোন বিষয় নিষেধ করিলে ফল বিপরীত হইবার সম্ভাবনা, এ কথা তাঁহাদিগের সকলের জানা ছিল। সেজন্য পূর্বের ন্যায় সমভাবেই নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সকাশে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যেভাবে দিন কাটিত তদ্বিষয়ে নরেন্দ্রের কথা

ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গে শ্রীযুত নরেন্দ্র এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে যেসকল দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেইসকলের মধুময় স্মৃতি তাঁহার অন্তর আজীবন অসীম উল্লাসে পূর্ণ করিয়া রাখিত। তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের নিকটে কি আনন্দে দিন কাটিত, তাহা অপরকে বুঝানো দুষ্কর। খেলা, রঙ্গরস প্রভৃতি সামান্য দৈনন্দিন ব্যাপার-সকলের মধ্য দিয়া তিনি কিভাবে নিরন্তর উচ্চশিক্ষা প্রদানপূর্বক আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখন ভাবিয়া বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বালককে শিখাইবার কালে শক্তিশালী মল্ল যেরূপে আপনাকে সংযত রাখিয়া তদনুরূপ শক্তিমত্তা প্রকাশপূর্বক কখনও তাহাকে যেন অশেষ আয়াসে পরাভূত করিয়া এবং কখনও বা তাহার নিকটে স্বয়ং পরাভূত হইয়া তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়, আমাদিগের সহিত ব্যবহারে ঠাকুর এইকালে অনেক সময়ে সেইরূপ ভাব অবলম্বন করিতেন। তিনি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর বর্তমানতা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন। আমাদিগের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার বীজ ফুল-ফলায়িত হইয়া কালে যে আকার ধারণ করিবে, তাহা তখন হইতে ভাবমুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদিগকে প্রশংসা করিতেন, উৎসাহিত করিতেন, এবং বাসনাবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পাছে আমরা জীবনের ঐরূপ সফলতা হারাইয়া বসি, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত আমাদিগের প্রতি আচরণ লক্ষ্য করিয়া উপদেশপ্রদানে আমাদিগকে সংযত রাখিতেন। কিন্তু তিনি যে ঐরূপে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্যপূর্বক আমাদিগকে নিত্য নিয়মিত করিতেছেন, এ কথা আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না। উহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাপ্রদান এবং জীবনগঠন করিয়া দিবার অপূর্ব কৌশল। ধ্যান-ধারণাকালে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া মন অধিকতর একাগ্র হইবার অবলম্বন পাইতেছে না অনুভব করিয়া তাঁহাকে কি কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐরূপ স্থলে স্বয়ং কিরূপ করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে জানাইয়া ঐ বিষয়ে নানা কৌশল বলিয়া দিতেন। আমার স্মরণ হয়, শেষ রাত্রিতে ধ্যান করিতে বসিয়া আলমবাজারে অবস্থিত চটের কলের বাঁশির শব্দে মন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত।

তাঁহাকে ঐ কথা বলায় তিনি ঐ বাঁশির শব্দতেই মন একাগ্র করিতে বলিয়াছিলেন এবং ঐরূপ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। আর এক সময়ে ধ্যান করিবার কালে শরীর ভুলিয়া মনকে লক্ষ্যে সমাহিত করিবার পথে বিশেষ বাধা অনুভব করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি বেদান্তোক্ত সমাধিসাধনকালে শ্রীমৎ তোতাপুরীর দ্বারা ভ্রূমধ্যে মন একাগ্র করিতে যে ভাবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই কথার উল্লেখ পুরঃসর নিজ নখাগ্র দ্বারা আমার ভ্রূমধ্যে তীব্র আঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঐ বেদনার উপর মনকে একাগ্র কর।' ফলে দেখিয়াছিলাম, ঐরূপে ঐ আঘাতজনিত বেদনার অনুভবটা যতক্ষণ ইচ্ছা সমভাবে মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং ঐ কালে শরীরের অপর কোন অংশে মন বিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক ঐ অংশসকলের অস্তিত্বের কথা এককালে ভুলিয়া যাওয়া যায়। ঠাকুরের সাধনার স্থল, নির্জন পঞ্চবটীতলই আমাদিগের ধ্যান-ধারণা করিবার বিশেষ উপযোগী স্থান ছিল। শুদ্ধ ধ্যান-ধারণা কেন, ক্রীড়াকৌতুকেও আমরা অনেক সময় ঐ স্থানে অতিবাহিত করিতাম। ঐসকল সময়েও ঠাকুর আমাদিগের সহিত যথাসম্ভব যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্ধন করিতেন! আমরা তথায় দৌড়াদৌড়ি করিতাম, গাছে চড়িতাম, দৃঢ় রজ্জুর ন্যায় লম্বমান মাধবীলতার আবেষ্টনে বসিয়া দোল খাইতাম, এবং কখনও কখনও আপনারা রন্ধনাদি করিয়া ঐ স্থলে চড়ুইভাতি করিতাম। চড়ুইভাতির প্রথম দিনে আমি স্বহস্তে পাক করিয়াছি দেখিয়া ঠাকুর স্বয়ং ঐ অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হস্তপক্ক অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না জানিয়া আমি তাঁহার নিমিত্ত ঠাকুরবাড়ির প্রসাদী অন্নের বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। কিন্তু তিনি ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর মতো শুদ্ধসত্ত্বগুণীর হাতে ভাত খেলে কোন দোষ হবে না।' আমি উহা দিতে বারংবার আপত্তি করিলেও তিনি আমার কথা না শুনিয়া আমার হস্তপক্ক অন্ন সেদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

ভবনাথ ও নরেন্দ্রের বরাহনগরের বন্ধুগণ

শ্রীযুত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন প্রিয়দর্শন ভক্তিমান যুবক ইতোমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আগমনপূর্বক নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত ও বিশেষ সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। বিনয়, নম্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস-ভক্তির জন্য ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। তাহার রমণীর ন্যায় কোমল স্বভাব এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া ঠাকুর কখনও কখনও রহস্য করিয়া বলিতেন, "জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।" ভবনাথ বরাহনগরে থাকিত এবং সুবিধা পাইলেই নরেন্দ্রনাথকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া আহারাদি করাইত। তাহার প্রতিবেশী সাতকড়ি লাহিড়ী নরেন্দ্রের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত এবং দাশরথি সান্যাল তাঁহার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। ইঁহারাও নরেন্দ্রকে পাইলে দিবারাত্র তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন। ঐরূপে দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে এবং কখনও কখনও বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বরাহনগরে এইসকল বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাল অথবা দুই-এক দিবস অতিবাহিত করিতেন।

পিতার সহসা মৃত্যুর কথা নরেন্দ্রের বরাহনগরে শুনা

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে বি.এ. পরীক্ষার ফলাফল জানিতে পারিবার কিছু পূর্বে ঘটনাচক্রে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের শরীর ইতঃপূর্বে অবসন্ন হইয়াছিল; এখন সহসা এক দিবস রাত্রি আন্দাজ ১০টার সময় তিনি হৃদ্রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নরেন্দ্র সেই দিবস নিমন্ত্রিত হইয়া অপরাহ্ণে তাঁহার বরাহনগরের বন্ধুবর্গের নিকটে গমন করিয়াছিলেন এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত ভজনাদিতে অতিবাহিত করিয়া আহারান্তে তাঁহাদিগের সহিত এক ঘরে শয়নপূর্বক নানাবিধ আলাপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বন্ধু 'হেমালী' রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ঐ স্থলে আগমনপূর্বক

তাঁহাকে ঐ নিদারুণ বার্তা শ্রবণ করাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় ফিরিলেন।

নরেন্দ্রের সাংসারিক অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন

বাটীতে ফিরিয়া নরেন্দ্রনাথ পিতার ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, পরে অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পিতা কিছু রাখিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, আয়ের অপেক্ষা নিত্য অধিক ব্যয় করিয়া কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন; আত্মীয়বর্গ তাঁহার পিতার সহায়তায় নিজ নিজ অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া লইয়া এখন সময় বুঝিয়া শত্রুতাসাধনে এবং বসতবাটী হইতে পর্যন্ত তাঁহাদিগের উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; সংসারে আয় একপ্রকার নাই বলিলেই হয়, অথচ পাঁচ-সাতটি প্রাণীর ভরণ-পোষণাদি নিত্য নির্বাহ হওয়া আবশ্যক। চিরসুখপালিত নরেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নানা স্থানে চাকরির অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু সময় যখন মন্দ পড়ে মানবের শত চেষ্টাতেও তখন কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না! নরেন্দ্র সর্বত্র বিফলমনোরথ হইতে লাগিলেন।

ঐ অবস্থা সম্বন্ধে নরেন্দ্রের কথা–চাকরির অন্বেষণ, পরিচিত ধনী ব্যক্তিদিগের অবজ্ঞা

পিতার মৃত্যুর পরে এক দুই করিয়া তিন-চারি মাস গত হইল, কিন্তু দুঃখ-দুর্দিনের অবসান হওয়া দূরে থাকুক আশার রক্তিম ছটায় নরেন্দ্রনাথের জীবনাকাশ ঈষন্মাত্রও রঞ্জিত হইল না। বাস্তবিক, এমন নিবিড় অন্ধকারে তাঁহার জীবন আর কখনও আচ্ছন্ন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই কালের আলোচনা করিয়া তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে বলিয়াছেন:

"মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম–অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখের দুঃখী হইয়া কোন দিন সঙ্গে থাকিত, কোন দিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল– দুর্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুই দিন পূর্বে যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখনও কখনও সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেন্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই-একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল –

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি।

শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হইয়া ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে, নে, চুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'"

দারিদ্র্যের পেষণ

"আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে! প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোন দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুগণের অনেকে পূর্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্বক তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না—তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল দুই-একজন কখনও কখনও বলিত, 'তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও দুর্বল দেখিতেছি কেন, বল দেখি?' একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।"

রমণীর প্রলোভন

"যৌবনে পদার্পণপূর্বক যে-সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জন করিতেছিল, তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য হীন পথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম তাহারা সত্য সত্যই আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতাপ্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণী ঐরূপ প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাই-ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কত কি তো করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হীন বুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।'"

ঈশ্বরের নাম লওয়ায় মাতার তিরস্কার

"যাহা হউক এত দুঃখকষ্টেও এতদিন আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ অথবা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—এ কথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ-মননপূর্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যা ত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান—ভগবান তো সব করলেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান কি বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অ-শিব কোথা হইতে আসিল—মঙ্গলময়ের রাজত্বে এতপ্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়া এক সময় যাহা বলিয়াছিলেন—ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন?—তাহা কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।"

অভিমানে নাস্তিক্য-বুদ্ধি

"গোপনে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখনও ঐরূপ করা দূরে থাকুক, অন্তরের চিন্তাটি পর্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন তো তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা এবং প্রয়োজন নাই, এ কথা হাঁকিয়া-ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয়ে পর্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভোগী হইতে পারি—এ কথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।"

নরেন্দ্রের অধঃপতনে ভক্তগণের বিশ্বাস হইলেও ঠাকুরের অন্যরূপ ধারণা

"কথা কানে হাঁটে। আমার ঐসকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে-ইশারায় জানাইলেন। আমাকে তাঁহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্বলতা, এ কথা প্রতিপন্নপূর্বক হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকসকলের মতামত উদ্‌ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম আমার অধঃপতন হইয়াছে, এ কথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায়গ্রহণ করিলেন। বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়তো ইঁহাদের মুখে শুনিয়া এরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন—মানুষের ভালমন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদিগের মুখে ঐ কথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ, না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐ কথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে এ কথা স্বপ্নেরও অগোচর!'—তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ কর শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখনও আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না!'"

ঘোর অশান্তি

"ঐরূপে অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি? পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে, জীবনে যে-সকল অদ্‌ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল, সেইসকলের কথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; দুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূরপরাহতা হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না।"

অদ্‌ভুত দর্শনে নরেন্দ্রের শান্তি

"গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল। এখনও পূর্বের ন্যায় কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদ ও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর বুকে জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে-সকল বিষয় নির্ণয় করতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।"

সন্ন্যাসী হইবার সঙ্কল্প ও দক্ষিণেশ্বরে আগমনে ঠাকুরের অদ্‌ভুত আচরণ

"সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতরসাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই–এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পিতামহের ন্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।' নানা গুজর করিলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাহার সঙ্গে চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণপূর্বক সজল নয়নে গাহিতে লাগিলেন–

কথা কহিতে ডরাই,

না কহিতেও ডরাই,

(আমার) মনে সন্দ হয়,

বুঝি তোমায় হারাই, হা–রাই!"

ঠাকুরের অনুরোধে নিরুদ্দেশ হইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ

"অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না–ঠাকুরের ন্যায় আমারও বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরূপ আচরণে অন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতনি আছি ততদিন আমার জন্য থাক।' বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন!"

দৈব সহায়তায় দারিদ্র্য-মোচনের সঙ্কল্প ও সেজন্য ঠাকুরকে জেদ করায়, তাঁহার 'কালীঘরে' যাইয়া প্রার্থনা করিতে বলা

"ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা আসিয়া অন্তর অধিকার করিল। পূর্বের ন্যায় নানা চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে এটর্নির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম্ম জুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণপোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ত ঈশ্বর শুনেন–তাহাকে অনুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের খাওয়া পরার কষ্ট যাহাতে দূর হয় এরূপ প্রার্থনা করাইয়া লইব; আমার জন্য ঐরূপ করিতে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলাম এবং নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম, 'মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস না, সেই জন্যই তোর এত কষ্ট!' বলিলাম, 'আমি ত মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন, বলতেই হবে, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কতবার বলেছি, মা নরেন্দ্রের দুঃখ কষ্ট দূর কর। তুই মাকে মানিস না, সেই জন্যই ত মা শুনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন!'

জগদম্বার দর্শনে সংসার-বিস্মৃতি

"দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন ঐরূপ বলিলেন, তখন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। এক প্রহর গত হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল, এবং মাকে সত্যসত্য দেখিতে ও তাহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব, এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া বিষম একাগ্র ও তন্ময় হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্যসত্যই মা চিন্ময়ী, সত্যসত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও!' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন!"

তিন বার 'কালীঘরে' আর্থিক উন্নতি প্রার্থনা করিতে গমন ও ভিন্ন ভাবের আচরণ

"ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, মা'র নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছি ত?' তাহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাই ত, এখন কি করি?' তিনি বলিলেন, 'যা, যা, ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চলিলাম এবং মা'র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত হইয়া সকল কথা ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্বক জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কি রে, এবার বলিয়াছিস ত? আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কি এক দৈবীশক্তি প্রভাবে সব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলিয়াছি! কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দুর ছোঁড়া, আপনাকে একটু সামলাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না? পারিস ত আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা।' পুনরায়

চলিলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিলাম, একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে আসিয়াছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাহার নিকটে 'লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা' এ যে সেইরূপ নির্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘৃণায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'অন্য কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও।' মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিনবার মার নিকটে আসিয়াও বলা হইল না। অতঃপর তাহাকে ধরিয়া বসিলাম, 'আপনিই নিশ্চিত আমাকে ঐরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না।' তিনি বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কাহারও জন্য ঐরূপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে উহা বাহির হয় না। তোকে বললুম, মার কাছে যাহা চাহিবি তাহাই পাইবি; তুই চাহিতে পারিলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই, তা আমি কি করিব!' বলিলাম, 'তাহা হইবে না মহাশয়, আপনাকে আমার জন্য ঐকথা বলিতেই হইবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না।' ঐরূপে যখন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না, তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।"

নরেন্দ্রের প্রতীক ও প্রতিমায় ঈশ্বরোপাসনায় বিশ্বাস ও ঠাকুরের ঐজন্য আনন্দ

পূর্বে যাহা বলা হইল, নরেন্দ্রনাথের জীবনে উহা যে একটি বিশেষ ঘটনা, তাহা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও প্রতিমায় তাহাকে উপাসনা করিবার গূঢ় মর্ম্ম এতদিন তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী মূর্তিসকলকে তিনি ইতিপূর্বে অবজ্ঞা ভিন্ন কখন ভক্তিভরে দর্শন করিতে পারিতেন না। এখন হইতে ঐরূপ উপাসনার সম্যক রহস্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া তাহাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসারতা আনয়ন করিল। ঠাকুর উহাতে কিরূপ আনন্দিত হইয়া ছিলেন তাহা বলিবার নহে। আমাদিগের জনৈক বন্ধু[1] ঐ ঘটনার পর দিবসে দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুরের ঐ বিষয়ক আনন্দ সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠনাথের কথা

"তারাপদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সহিত এক আফিসে কর্ম্ম করায় ইতিপূর্বে পরিচিত হইয়াছিলাম। তারাপদের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সেজন্য আফিসে তারাপদের নিকটে নরেন্দ্রকে ইতিপূর্বে কখন কখন দেখিয়াছিলাম। তারাপদ একদিন কথায় কথায় বলিয়াও ছিল, পরমহংসদেব নরেন বাবুকে বিশেষ ভালবাসেন; তথাপি আমি নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করি নাই। অদ্য মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকী গৃহে বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্র বাহিরে এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। ঠাকুরের মুখ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে তাই মার কাছে টাকা-কড়ি চাইবার কথা বলে দিয়াছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পারলে না, বলে, 'লজ্জা করলে!' মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে মার গান শিখিয়ে দাও-'মা ত্বং হি তারা' গানটি[2] শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে। তাই এখন ঘুমুচ্ছে। (আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, লো? তাঁহার ঐকথা লইয়া বালকের ন্যায় আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, "হাঁ, মহাশয় বেশ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে–কেমন?' ঐরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারম্বার ঐকথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রকে ঠাকুরের বিশেষ আপনার জ্ঞানের পরিচায়ক দৃষ্টান্ত

"নিদ্রাভঙ্গে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল এইবার তিনি তাহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবান। ঠাকুর কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া এক প্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া) 'দেখছি কি এটা আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি–কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে-সত্যসত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। বুঝতে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাব।' আমি ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাহার হুঁকাটি তাহাকে দিলাম। দুই-এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে খাব' বলিয়া কল্কেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর ত ভারি হীন বুদ্ধি, তুই আমি কি আলাহিদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐকথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাকু খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজ হাত দুইখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই-তিন বার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাকু সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান। কিন্তু সে কথা শুনে কে? 'দূর শালা, তোর ত ভারি ভেদবুদ্ধি' এই কথা বলিয়া ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে ঠাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কখন খাইতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অন্য ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদূর আপনার জ্ঞান করেন।"

নরেন্দ্রের সহিত বৈকুণ্ঠের কলিকাতায় আগমন

"কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তখন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাঁহার নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্বক পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পরে কতদিন আমরা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে কলিকাতায় শুনিয়াছি, 'একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম আগমন দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে–নিজের মা-ভাইরাও নহে। তার ঐরূপ বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভান মাত্র করিয়া ফিরিয়া থাকে'।"

[1] শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।

[2] (আমার) মা ত্বং হি তারা।

তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপর।

তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী,

তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।।

তুমি জলে, তুমি স্থলে,

তুমিই আদ্যমূলে গো মা,

আছ সর্বঘটে, অক্ষপুটে

সাকার আকার নিরাকার।।

তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,

তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা,

তুমি অকুলের ত্রাণকর্ত্রী

সদাশিবে মনোহরা।।

৫.১৫. নবম অধ্যায়: ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের বিশেষ ভক্তসকলের আগমন–১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে

ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে যে সকল ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কথা বহু পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা সকলেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অতীত হইবার পূর্বে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিল। কারণ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূর্ণ তাহার নিকটে আসিয়াছিল এবং তাহাকে কৃপা করিবার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে আসিবে বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্তসকলের আসা সম্পূর্ণ হইল; অতঃপর ঐ শ্রেণীর আর কেহ এখানে আসিবে না!"

ঐ সকল ভক্তের সহিত মিলনে ঠাকুরের আচরণ

পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের ভিতরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র তখন সাংসারিক অভাব অনটনের সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত এবং রাখাল কিছুকালের জন্য শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও আসিবার কথা, ঠাকুর সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে "আজ (উত্তর দক্ষিণাদি কোন দিক দেখাইয়া) এই দিক হইতে এখানকার একজন আসিতেছে" এইরূপে পূর্বেই নির্দেশ করিতেন। কেহ বা উপস্থিত হইবামাত্র 'তুমি এখানকার লোক' বলিয়া পূর্ব-পরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোন ভাগ্যবানের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে তাহাকে পুনরায় দেখিবার, খাওয়াইবার ও তাহার সহিত একান্তে ধর্ম্মালাপ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্যক্তির স্বভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্বাগত সমসংস্কারসম্পন্ন কোন ভক্তবিশেষের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া তাহার সহিত ধর্মালোচনায় যাহাতে সে অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারে, তদ্বিষয়ের সুযোগ করিয়া দিতেন। আবার

কাহারও গৃহে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিভাবকদিগের সন্তোষ উৎপাদনপূর্বক যাহাতে তাহারা তাহাকে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে আসিতে নিষেধ না করেন তদ্বিষয়ে পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

অধিকারিভেদে ভক্তসকলকে দিব্যভাবাবিষ্ট ঠাকুরের স্পর্শ, মন্ত্রদান ইত্যাদি ও তাহার ফল

ঐসকল ভক্তের আগমনমাত্র অথবা আসিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্বক ধ্যান করিতে বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহৃত অন্তর্মুখী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্মসংস্কারসকল অন্তরে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্য-জ্যোতিমাত্রের অথবা দেব-দেবীর জ্যোতির্ময় মূর্তিসমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব আনন্দ, কাহারও হৃদগ্রন্থিসকল সহসা উন্মোচিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও নির্বিকল্প সমাধির পূর্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার নিকটে আগমন করিয়া ঐরূপে জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। তারকের মনে ঐরূপে বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রন্থিসকল একদিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ স্পর্শে এককালে নির্বিকল্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরূপে স্পর্শ করা ভিন্ন কখন কখন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষা প্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠি-বিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টি সহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্বক ‘তোর এই মন্ত্র’ বলিয়া মন্ত্রনির্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজনকে তিনি ঐরূপে কৃপা করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাহাদিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। শাক্ত বা বৈষ্ণব বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিতেন না। কিন্তু অন্তঃসংস্কার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শক্ত্যুপাসক কোন কোন ব্যক্তিকে বিষ্ণুমন্ত্রে এবং বৈষ্ণব কাহাকেও বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সর্ব্বদা প্রদান করিতেন।

ঠাকুরের দিব্যস্পর্শ যাহা প্রমাণ করে

ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে মহাপুরুষগণ অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি অপরে সংক্রমণপূর্বক তাহার মনের গতি উচ্চপথে পরিচালিত করিয়া দিতে সমর্থ, এই কথা শাস্ত্রগ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে। অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের ত কথাই নাই–বেশ্যা লম্পটাদি দুষ্কৃতকারীদিগের জীবনও ঐরূপে মহাপুরুষদিগের শক্তিপ্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে-সকল মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সংসারে অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের জীবনেই ঐ শক্তির স্বল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ঐরূপ থাকিলে কি হইবে, ঐ শ্রেণীর পুরুষদিগের অলৌকিক কার্য কলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় বহুকাল পর্যন্ত হারাইয়া সংসার এখন ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, ঈশ্বর-বিশ্বাসও এখন অনেক স্থলে কুসংস্কারপ্রসূত মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মানব সাধারণের চিত্ত হইতে ঐ অবিশ্বাস দূর করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন করিতে ঠাকুরের ন্যায় অলৌকিক পুরুষের সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করা বর্তমান যুগে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তির প্রকাশ তাহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন পূর্ব্ব পূর্ব

যুগের মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐ বিষয়ে বিশ্বাসবান হইতেছি। ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঠাকুরকে বিশ্বাস না করিলেও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যপ্রমুখ মহাপুরুষসকলের সমশ্রেণীভুক্ত লোকোত্তর পুরুষ, এবিষয়ে উহা দেখিয়া কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভক্তসকলের ঠাকুরকে নিজ নিজ ভাবের লোক বলিয়া ধারণা ও ঠাকুরের তাহাদিগের সহিত আচরণ

পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ, সংসারী ও অসংসারী, সাকার ও নিরাকারোপাসক, শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা অন্য ধর্মসম্প্রদায়ভূক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও অশেষ প্রকার ভাবের লোক বিদ্যমান ছিল। ঐরূপ অশেষ প্রভেদ বিদ্যমান থাকিলেও এক বিষয়ে তাহারা সকলে সমভাবসম্পন্ন ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও পথে আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং নিষ্ঠাবান থাকিয়া ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত অশেষ ত্যাগ সহিত আচরণ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। ঠাকুর তাহাদিগকে নিজ স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সামান্য বা গুরুতর সকল বিষয়ে তাহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই অনুমান করিত তিনি সকল ধর্মমতে পারদর্শী হইলেও সে যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতেই অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন। ঐরূপ ধারণবশতঃ তাহার উপর তাহাদিগের ভক্তি ও ভালবাসার অবধি থাকিত না। আবার তাহার সঙ্গগুণে এবং শিক্ষাদীক্ষাপ্রভাবে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি সমূহ একে একে অতিক্রমপূর্ব্বক উদারভাবসম্পন্ন হইবামাত্র তাহাতেও ঐ ভাবের পূর্ণতা দেখিতে পাইয়া তাহারা প্রত্যেকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি –

ভক্তগণের অন্তরে উদারতা বৃদ্ধির সহিত ঠাকুরকে বুঝিতে পারিবার দৃষ্টান্ত–বলরাম বসু

কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু বৈষ্ণববংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সংসারে থাকিলেও ইনি অসংসারী ছিলেন এবং যথেষ্ট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ইহার হৃদয়ে অভিমান কখনও স্থান পায় নাই। ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্বে ইনি প্রাতে পূজা-পাঠে চারি-পাঁচ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতেন। অহিংসাধর্ম পালনে তিনি এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, কীট পতঙ্গাদিকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। ঠাকুর ইহাকে দেখিয়াই পূর্বপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণপূর্বক বলিয়া ছিলেন, "ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গের অন্যতম– এখানকার লোক; শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদদিগের সহিত সঙ্কীর্তনে হরিপ্রেমের বন্যা আনিয়া কিরূপে মহাপ্রভু দেশের আবাল-বৃদ্ধ নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, ভাবাবেশে তাহা দর্শন করিবার কালে ঐ অদ্‌ভুত সঙ্কীর্ত্তনদলের মধ্যে ইহাকে (বলরামকে) দেখিয়াছিলাম"।

ঠাকুরের দর্শনলাভে বলরামের উন্নতি ও আচরণ

ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্যপূজাদি বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রমপূর্বক স্বল্পকালেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদসদ্বিচারবান্ হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-ধন-জনাদি সর্বস্ব তাহার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন পূর্ব্বক দাসের ন্যায় তাহার সংসারে থাকিয়া তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পূত সঙ্গে যতদূর সম্ভব কাল অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিত থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ সুখের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে অবসর অন্বেষণপুর্ব্বক তিনি সর্বদা সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপে বলরামের আগ্রহে বহু ব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়লাভে ধন্য হইয়াছিল।

বলরামের অহিংসা-ধর্ম সম্বন্ধীয় মতের পরিবর্তনে সংশয়

বাহ্যপূজার ন্যায় অহিংসাধর্মপালন সম্বন্ধীয় মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক, উপাসনাকালেও মশকাদি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না; মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্ম্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন ঐরূপ সময়ে সহসা একদিন তাহার মনে উদয় হইল,-সহস্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম্ম, অহিংসা ধর্ম্ম। মশকাদি কীটপতঙ্গের জীবনরক্ষায় উহাকে সতত নিযুক্ত রাখা নহে; অতএব দুই-চারিটা মশক নাশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম্ম হওয়া দুরে থাকুক সমধিক লাভই আছে। তিনি বলিতেন, “অহিংসাধর্ম প্রতিপালনে মনের এত কালের আগ্রহ ঐরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ নির্মুক্ত হইল না। সুতরাং ঠাকুরকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম। যাইবার কালে ভাবিতে লাগিলাম, অন্য সকলের ন্যায় তাহাকে কোন দিন মশকাদি মারিতে দেখিয়াছি কি? মনে হইল না; স্মৃতির আলোকে যতদুর দেখিতে পাইলাম তাহাতে আমাপেক্ষাও তাহাকে অহিংসাব্রতপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, দুর্ব্বাদলশ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া অপরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজবক্ষে আঘাত অনুভবপুর্বক তিনি যন্ত্রণায় এক সময়ে অধীর হইয়াছিলেন–তৃণরাজিমধ্যগত জীবনীশক্তি ও চৈতন্য এত সুস্পষ্ট এবং পবিত্র ভাবে তাহার নয়নে প্রতিভাসিত হইয়াছিল! স্থির করিলাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রতারণা করিতে পূর্বোক্ত চিন্তার উদয় করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি, মন পবিত্র হইবে”।

ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব আচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সন্দেহভঞ্জন

“দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! নিকটে উপস্থিত করিয়া তাহার হইয়া প্রণাম করাতেই তিনি বলিলেন, ‘বালিশটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার ব্যাঘাত করে, সেজন্য মারিয়া ফেলিতেছি’। জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্য্যে মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গত দুই-তিন বৎসরকাল ইহার নিকটে যখন তখন আসিয়াছি, দিনে আসিয়াছি রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে তিন-চারি দিন ঐরূপে আসা যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইহাকে এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই–ঐরূপ কেমন করিয়া হইল? তখন নিজ অন্তরেই ঐ বিষয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতিপূর্বে ইহাকে ঐরূপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইহার উপরে অশ্রদ্ধার উদয় হইত–পরম কারুণিক ঠাকুর সে জন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্বে কখনও করেন নাই”।

ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও বালক ভক্তগণ

পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণ ভিন্ন অন্য অনেক নরনারী এইকালে ঠাকুরকে দর্শনপূর্বক শান্তি লাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদিগকেও তিনি সস্নেহে গ্রহণপূর্বক কাহাকেও উপদেশ দানে, আবার কাহাকেও বা দিব্যাবেশে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ঐরূপে যত দিন যাইতেছিল ততই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এক বৃহৎ ভক্তসঙ্ঘ স্বতঃ গঠিত হইতেছিল। তন্মধ্যে বালক ও অবিবাহিত যুবকদিগের ধর্মজীবনগঠনে তিনি অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন। ঐ বিষয়ের কারণ নির্দেশপূর্বক তিনি বহুবার বলিয়াছেন, “ষোলআনা মন না দিলে ঈশ্বরের পূর্ণদর্শন কখনও লাভ হয় না। বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদের নিকটে আছে-স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পত্তি, মান যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয়সকলে ছড়াইয়া পড়ে নাই; এখন হইতে চেষ্টা করিলে ইহারা

ষোলআনা মন ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক তাহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে—ঐজন্যই ইহাদিগকে ধর্মপথে পরিচালিত করিতে আমার অধিক আগ্রহ”। সুযোগ দেখিলেই ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে লইয়া যাইয়া যোগধ্যানাদি ধর্মের উচ্চাঙ্গসকলের এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনে উপদেশ করিতেন। অধিকারী নির্বাচন করিয়া ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং শান্তদাস্যাদি যে ভাবের সম্বন্ধ ইষ্টদেবতার সহিত পাতাইলে তাহারা প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

গৃহী ভক্তদিগকে ও নরনারী সাধারণকে ঠাকুর যেভাবে উপদেশ দিতেন

বালকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহের কথা শুনিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, সংসারী গৃহস্থ ভক্তদিগের প্রতি তাহার কৃপা ও করুণা স্বল্প ছিল। উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্বসকলের অভ্যাস ও অনুশীলনে তাহাদিগের অনেকের সময় ও সামর্থ্য নাই দেখিয়াই তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে বলিতেন না। কিন্তু কাম-কাঞ্চন-ভোগবাসনা ধীরে ধীরে কমাইয়া ভক্তি মার্গ দিয়া যাহাতে তাহারা কালে ঈশ্বরলাভে ধন্য হইতে পারে, এইরূপে তাহাদিগকে নিত্য পরিচালিত করিতেন। ধনী ব্যক্তির গৃহে দাসদাসীদিগের ন্যায় মমতা বর্জনপূর্বক ঈশ্বরের সংসারে অবস্থান ও নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে তিনি তাহাদিগকে সর্বাগ্রে উপদেশ করিতেন। “দুই-একটি সন্তান জন্মিবার পরে ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের সংসারে থাকা কর্তব্য”—ইত্যাদি বলিয়া যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভিন্ন নিত্য সত্যপথে থাকিয়া সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে, বিলাসিতা বর্জনপূর্বক ‘মোটা ভাত মোটা কাপড়’ মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া শ্রীভগবানের দিকে সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে এবং প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন, পূজা, জপ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাহারা ঐসকল করিতেও অসমর্থ বুঝিতেন, তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালে একান্তে বসিয়া হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ করিতেন। সাধারণ নরনারীগণকে একত্রে উপদেশকালে আমরা তাহাকে অনেক সময়ে ঐকথা এইরূপে বলিতে শুনিয়াছি, কলিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি—উচ্চরোলে নামকীর্ত্তন করিলেই জীব উদ্ধার হইবে; কলির জীব অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ু, স্বল্পশক্তি—সেইজন্যই ধর্মলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার যোগধ্যানাদি কঠোর সাধনমার্গের কথাসকল শুনিয়া পাছে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হয়, এজন্য কখন কখন বলিতেন, “যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে ত ভগবানকে ডাকিবেই। কারণ, ঐ জন্যই ত সে সংসারের সকল কর্তব্য ছাড়িয়া আসিয়াছে— তাহার ঐরূপ করায় বাহাদুরী বা অসাধারণত্ব কি আছে? কিন্তু যে সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি কর্তব্যের বিষম ভার ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে একবারও তাহাকে স্মরণ-মনন করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হন, ভাবেন, ‘এত বড় বোঝ স্কন্ধে থাকা সত্বে এই ব্যক্তি যে আমাকে এতটুকুও ডাকিতে পারিয়াছে, ইহা স্বল্প বাহাদুরী নহে, এই ব্যক্তি বীরভক্ত’ ”।

নরেন্দ্রকে ঠাকুরের সকল ভক্তাপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান

নবাগত শ্রেণীভুক্ত নরনারীদের ত কথাই নাই, পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে নির্দেশ করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বরকোটী, অথবা শ্রীভগবানের কার্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল; এই কয়েক জনকে ঐ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও, ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা বড় জোর বিশদলবিশিষ্ট”। অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর

আসিল না।” দেখাও যাইত, ঠাকুরের অদ্‌ভুত জীবনের অলৌকিক কার্যাবলীর এবং প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদূর সমর্থ ছিলেন, অন্য কেহই তদ্রূপ ছিল না। এই কাল হইতেই নরেন্দ্রের নিকটে ঠাকুরের কথাসকল শুনিয়া আমরা সকলে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতাম, তাই ত ঐ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, কিন্তু উহাদিগের ভিতরে যে এত গভীর অর্থ রহিয়াছে তাহা ত বুঝিতে পারি নাই! দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ একটি কথার এখানে উল্লেখ করিতেছি–

ঠাকুরকে নরেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারিবার দৃষ্টান্ত–‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণপরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুত নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। নানা সদালাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্তাও চলিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সারমর্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, “তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে–নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর–নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া” (প্রকাশ করিবে)। ‘সর্ব্ব জীবে দয়া’ পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “জীবে দয়া–জীবে দয়া? দুর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়–শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!”

ঠাকুরের ঐ কথায় নরেন্দ্রের অদ্‌ভুত আলোক দর্শন ও তাহা বুঝাইয়া বলা

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “কি অদ্‌ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে–এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল-বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল–ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ– তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্প কালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি-লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে-সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবা রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহার লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে, একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান্ যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব–পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

লোকোত্তর ঠাকুর ঐরূপে সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব আলোক প্রতিনিয়ত আনয়নপূর্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তাহার কথা তখন ধারণা করিতে পারিতাম না। মনস্বী নরেন্দ্রনাথই কেবল ঐসকল দেববাণী যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশপূর্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।

৫.১৬. দশম অধ্যায়: পাণিহাটির মহোৎসব

নরেন্দ্রের শিক্ষকের পদ গ্রহণ

পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট নিবারণের জন্য কিরূপে নরেন্দ্রনাথ অবশেষে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব থাকিবে না'-রূপ বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। উহার পর হইতে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং সচ্ছল না হইলেও পূর্বের ন্যায় দারুণ অভাব সংসারে আর কখন হয় নাই। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরে কলিকাতার চাঁপাতলা নামক পল্লীতে মেট্রোপলিটান্ বিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে তিনি উহাতে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। সম্ভবত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন-চারি মাস কাল তিনি ঐস্থানে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জ্ঞাতিগণের শত্রুতা, ঠাকুরের রোহিণী রোগ, শিক্ষকতা পরিত্যাগ

সাংসারিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হইলেও জ্ঞাতিবর্গের শত্রুতা চরণে নরেন্দ্রনাথকে এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সময় বুঝিয়া তাহার পৈতৃক ভিটার উত্তম উত্তম গৃহ এবং স্থানগুলি ছলে বলে কৌশলে দখল করিয়াছিল। তজ্জন্য তাহাকে এখন কিছুকালের জন্য ঐ বাটী ত্যাগপূর্বক রামতনু বসুর লেনস্থ তাহার মাতামহীর ভবনে বাস করিতে হইয়াছিল এবং ন্যায্য অধিকারলাভের জন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ আনয়নপূর্বক সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃবন্ধু এটর্নী নিমাইচরণ বসু মহাশয় তাহাকে ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমার তদ্বিরে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ওকালতি (বি,এল) পরীক্ষা প্রদানের কাল নিকটবর্তী জানিয়া তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শিক্ষকতা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের অন্য একটি গুরুতর কারণও বিদ্যমান ছিল–ঠাকুর এখন রোহিণী (গলরোগ) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং উহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় নরেন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবাদির বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

অধিক বরফ ব্যবহারে ঠাকুরের অসুস্থতা

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাতিশয়ে ঠাকুরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখিয়া ভক্তগণ তাহাকে বরফ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। বরফ খাইয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে দেখিয়া অনেকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ লইয়া যাইতে লাগিল এবং সরবত পানীয়াদির সহিত উহা সর্বদা ব্যবহার করিয়া তিনি বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-এক মাস ঐরূপ করিবার পরে তাহার গলদেশে বেদনা উপস্থিত হইল। বোধ হয় চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখের প্রারম্ভে তিনি ঐরূপ বেদনা প্রথম অঙ্কুভব করিয়াছিলেন।

অধিক কথা কহায় ও ভাবাবেশে রোগবৃদ্ধি

মাসাবধিকাল অতীত হইলেও ঐ বেদনার উপশম হইল না এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেক যাইতে না যাইতে উহা এক নূতন আকার ধারণ করিল-অধিক কথা কহিলে এবং সমাধিস্থ হইবার পরে উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার কন্ঠতালুদেশ ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে সামান্য প্রলেপের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু কয়েক দিবস ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওয়া গেল না দেখিয়া জনৈক ভক্ত বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারের ঐরূপ ব্যাধি আরোগ্য করিবার দক্ষতার কথা শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগনির্ণয় করিয়া গলার ভিতরে এবং বাহিরে লাগাইবার অন্য ঔষধ ও মালিসের বন্দোবস্ত করিলেন এবং ঠাকুর যাহাতে কয়েক দিন অধিক কথা না বলেন ও বারম্বার সমাধিস্থ না হয়েন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।

পাণিহাটির মহোৎসবের ইতিহাস

ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী আগতপ্রায় হইল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত গঙ্গাতীরবর্তী পাণিহাটি গ্রামে প্রতি বৎসর ঐ দিবসে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদগণের অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্বলন্ত ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। পরমা সুন্দরী স্ত্রী ও অতুল বৈভব ত্যাগপূর্ব্বক পিতার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়-মানসে যখন প্রথম শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি তাহাকে 'মর্কট বৈরাগ্য' [1] পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ, মহাপ্রভুর ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং সংসার ত্যাগ করিবার প্রবল বাসনা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া ইতর-সাধারণের ন্যায় বিষয় কার্য্যের পরিচালনা প্রভৃতি সাংসারিক সকল বিষয়ে পিতা ও পিতৃব্যকে সাহায্য করিতে থাকেন। ঐরূপে অবস্থান করিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক কখন কখন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস তাহাদিগের পূতসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইতেন। ঐরূপে দিন যাইতে লাগিল এবং ত্যাগের অবসর অন্বেষণ করিয়া রঘুনাথ সংসারে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে বাস করিলেন এবং নিত্যানন্দ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরবর্তী খড়দহ গ্রামকে প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা বহু ব্যক্তিকে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবৃত শ্রীনিত্যানন্দ ধর্মপ্রচারকল্পে এক সময়ে পাণিহাটি গ্রামে অবস্থান করিবার কালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়েন এবং চিড়া, দধি, দুগ্ধ, শর্করা, কদলী প্রভৃতি দেবতাকে নিবেদনপূর্বক ভক্তমণ্ডলীসহ তাহাকে ভোজন করাইতে আদিষ্ট হয়েন। রঘুনাথ উহা সানন্দে স্বীকার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে সেইদিন ভাগীরথী তীরে ভোজনদানে পরিতৃপ্ত করেন। উৎসবান্তে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণামপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি ভাবাবেশে রঘুনাথকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'কাল পূর্ণ হইয়াছে, সংসার পরিত্যাগপূর্বক নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট গমন করিলে তিনি তোমাকে এখন আশ্রয়

প্রদান করিবেন এবং ধর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য সনাতন গোস্বামীর হস্তে তোমার শিক্ষার ভার অর্পণ করিবেন'। নিত্যানন্দ প্রভুপাদের ঐরূপ আদেশে রঘুনাথের উল্লাসের অবধি রহিল না এবং বাটীতে ফিরিবার অনতিকাল পরে তিনি চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ চলিয়া যাইলেন কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তগণ তাহার কথা চিরকাল স্মরণ রাখিয়া তদবধি প্রতি বৎসর ঐ দিবস পাণিহাটি গ্রামে গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া তাহার ন্যায় ভগবৎপ্রসন্নতা লাভের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে ঐরূপ উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কালে উহা পাণিহাটির 'চিড়ার মহোৎসব' নামে ভক্ত-সমাজে খ্যাতি লাভ করিল।

ঠাকুরের উক্ত মহোৎসব দেখিতে যাইবার সংকল্প

ঠাকুর ইতঃপূর্বে পাণিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহার ইংরাজী শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে ঠাকুরের উক্ত, নানা কারণে তিনি কয়েক বৎসর উহা করিতে পারেন নাই। নিজ ভক্তগণের সহিত ঐ উৎসব দর্শনে যাইতে তিনি এই বৎসর অভিলাষ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে বলিলেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে–তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল' কখন ঐরূপ দেখিস নাই, চল দেখিয়া আসিবি।" রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্ত দিগের মধ্যে একদল ঐ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ তাঁহার গলদেশে বেদনার কথা ভাবিয়া তাহাকে ঐ বিষয়ে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদিগের সন্তোষের জন্য তিনি বলিলেন, "এখান হইতে সকাল সকাল দুইটি খাইয়া যাইব এবং দুই-এক ঘণ্টা কাল তথায় থাকিয়া ফিরিব, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বটে, ঐ বিষয়ে একটু সামলাইয়া চলিলেই হইবে।" তাহার ঐরূপ কথায় সকল ওজর-আপত্তি ভাসিয়া গেল এবং ভক্তগণ তাঁহার পাণিহাটি যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

উৎসব দিবসে যাত্রার পূর্বে

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী–আজ পাণিহাটির মহোৎসব। প্রায় পঁচিশ জন ভক্ত দুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া প্রাতে নয় ঘটিকার ভিতরে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইল। কেহ কেহ পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের নিমিত্ত একখানি পৃথক নৌকা ভাড়া হইয়া ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে দেখা গেল। কয়েকজন স্ত্রীভক্ত অতি প্রত্যুষে আসিয়াছিলেন–শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিত হইয়া তাহারা ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা দশটার ভিতরে সকলে ভোজন করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর না যাইবার কারণ

ঠাকুরের ভোজনান্তে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী জনৈকা স্ত্রীভক্তের দ্বারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি (মা) যাইবেন কি না। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, "তোমরা ত যাইতেছ, যদি ওর (মা'র) ইচ্ছা হয় ত চলুক।" শ্রীশ্রীমা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি যাইব না।" শ্রীশ্রীমা যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং দুই-তিন জন স্ত্রীভক্ত যাহারা যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া ঠাকুরের নৌকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন।

যাত্রাকালে ও উৎসবস্থলে পৌঁছিয়া যাহা দেখা গেল

বেলা দ্বিতীয় প্রহর আন্দাজ পাণিহাটিতে পৌঁছিয়া দেখা গেল গঙ্গাতীরে প্রাচীন বটগাছের চতুঃপার্শ্বে অনেক লোক সমাগত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ভক্তগণ স্থানে স্থানে সঙ্কীর্তনে আনন্দ

করিতেছেন। ঐরূপ করিলেও কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ভগবৎনামগানে যথার্থ মগ্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। সর্বত্র একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল। নৌকায় যাইবার কালে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ, বলরাম, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান ভক্তসকলে ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি কোনও কীর্তনসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া মাতামাতি না করেন। কারণ, কীর্তনে মাতিলে তাহার ভাবাবেশ হওয়া অনিবার্য্য হইবে এবং উহাতে গলদেশের বেদনা বৃদ্ধি পাইবে।

মণি সেনের বাটী

নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বরাবর শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাটীতে যাইয়া উঠিলেন। তাহার আগমনে আনন্দিত হইয়া মণি বাবুর বাটীর সকলে তাহাকে প্রণামপুরঃসর বৈঠকখানায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন। ঘরখানি টেবিল, চেয়ার, সোফা, কার্পেটাদি দ্বারা ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত। এখানে দশ-পনর মিনিট বিশ্রাম করিয়াই তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া ইহাদিগের ঠাকুরবাটীতে রাধাকান্তজীকে দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন।

মণি বাবুর ঠাকুরবাটী

বৈঠকখানাগৃহের পার্শ্বেই ঠাকুরবাটী। পার্শ্বের দরজা দিয়া আমরা একেবারে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরের উপরে উপস্থিত হইয়া যুগলবিগ্রহ মূর্তির দর্শন-লাভ করিলাম। মূর্তি দুইটি সুন্দর। কিছুক্ষণ দর্শনান্তে ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। নাটমন্দিরের মধ্যভাগ হইতে পাঁচ-সাতটি ধাপ নামিয়া ঠাকুরবাটীর চক্‌মিলান প্রশস্ত উঠান ও সদর ফটক। ফটকটি এমন স্থানে বিদ্যমান যে ঠাকুর বাটীতে প্রবেশমাত্র বিগ্রহমূর্তির দর্শন লাভ হয়। ঠাকুর যখন প্রণাম করিতেছিলেন তখন একদল কীর্ত্তন উক্ত ফটক দিয়া উঠানে প্রবেশপূর্বক গান আরম্ভ করিল। বুঝা গেল মেলাস্থলে যত কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিতেছে তাহাদিগের প্রত্যেকে প্রথমে এখানে আসিয়া কীর্ত্তন করিয়া পরে গঙ্গাতীরে আনন্দ করিতে যাইতেছে। শিখা-সূত্রধারী, তিলকচক্রাঙ্কিত দীর্ঘ স্থূলবপু, গৌরবর্ণ, প্রৌঢ়বয়স্ক এক পুরুষ ঝুলিতে মালা জপিতে জপিতে ঐ সময়ে উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার স্কন্ধে উত্তরীয়, পরিধানে ধোপদস্ত রেলির উনপঞ্চাশের থান ধুতি, সুন্দরভাবে গুছাইয়া পরা এবং ট্যাঁকে একগোছা পয়সা—দেখিলেই মনে হয় কোন গোস্বামিপুঙ্গব মেলার সুযোগে দুই পয়সা আদায়ের জন্য সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইয়াছেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিবার জন্য এবং বোধ হয় সমাগত ব্যক্তিবর্গকে নিজ মহত্বে মুগ্ধ করিতে তিনি আসিয়াই কীর্ত্তনদলের সহিত মিলিত হইয়া ভাবাবিষ্টের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী, হুঙ্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভাবাবেশ ও নৃত্য

প্রণামান্তে ঠাকুর নাটমন্দিরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্তন শুনিতেছিলেন। গোস্বামীজীর বেশভূষার পারিপাট্য ও ভাবাবেশের ভান দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি নরেন্দ্রপ্রমুখ পার্শ্বস্থ ঠাকুরের ভক্তগণকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঢং দ্যাখ!" তাঁহার ঐরূপ পরিহাসে সকলের মুখে হাস্যের রেখা দেখা দিল এবং তিনি কিছুমাত্র ভাবাবিষ্ট না হইয়া আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুর কেমন করিয়া তাহারা বুঝিবার পূর্বে চক্ষের নিমেষে তাহাদিগের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক লম্ফে কীর্ত্তনদলের মধ্যভাগে সহসা অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। ভক্তগণ তখন শশব্যস্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তিনি কখন অর্ধ-বাহ্যদশা লাভপূর্বক সিংহ-বিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখন সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'সুখময়

সায়রে’ মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য-মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের হাবভাবময় মনোমুগ্ধকারী নৃত্য অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্র-মধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাতও ঐ সকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে হইল না, কীর্ত্তন সম্প্রদায় গোস্বামীজীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্বক শতগুণ উৎসাহ-আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।

রাঘব পন্ডিতের বাটীতে যাইবার পথে

প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থির হইল, এখন হইতে অল্প দূরে অবস্থিত মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পন্ডিতের বাটীতে যাইয়া তিনি যে যুগলবিগ্রহ ও শালগ্রামশিলার নিত্য সেবা করিতেন তাহা দর্শনপূর্বক নৌকায় ফিরা যাইবে। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইয়া ভক্তবৃন্দ সঙ্গে মণি সেনের ঠাকুরবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কীর্তনসম্প্রদায় কিন্তু তাহার সঙ্গ ছাড়িল না, মহোৎসাহে নামগান করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ঠাকুর উহাতে দুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ভাবাবেশে স্থির হইয়া রহিলেন। অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তাহাকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল, তিনিও দুই-চারি পদ চলিয়া পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ হওয়াতে ভক্তগণ অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের অপূর্ব শ্রী

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখনও নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। দেব-দেহের সেই অপূর্ব শ্রী যথাযথ বর্ণনা করা মনুষ্যশক্তির পক্ষে অসম্ভব। ভাবাবেশে দেহের অতদুর পরিবর্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে এ কথা আমরা ইতিপূর্বে কখনও কল্পনা করি নাই। তাহার উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুঃপার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবা মাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল! উজ্জ্বল গৈরিক বর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাহাকে অগ্নিশিখাপরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।

ঠাকুরের দিব্যদর্শনে কীর্তন-সম্প্রদায়ের উৎসাহ ও উল্লাস

মণি বাবুর ঠাকুরবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে আসিবামাত্র কীর্ত্তনসম্প্রদায় তাহার দিব্যোজ্জ্বল শ্রী, মনোহর নৃত্য ও পুনঃ পুনঃ গভীর ভাবাবেশ দর্শনে নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গান ধরিল—

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে,

বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

ওরে হরি বলে কে রে,

জয় রাধে বলে কে রে,

বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে–

(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে–

(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

জনসাধারণের আকৃষ্ট হওয়া

শেষ ছত্রটি গাহিবার কালে তাহারা ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বারংবার 'এই আমাদের প্রেমদাতা' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের ঐ উৎসাহ উৎসবস্থলে সমাগত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করিতে লাগিল এবং যাহারা আসিয়া একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল তাহারা মোহিত হইয়া মহোল্লাসে কীর্ত্তনে যোগদান করিল অথবা প্রাণে অনির্বচনীয় দিব্য ভাবোদয়ে স্তব্ধ হইয়া নীরবে ঠাকুরকে অনিমেষে দেখিতে দেখিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। জনসাধারণের উৎসাহ ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অন্য কয়েকটি কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া পূর্বোক্ত দলের সহিত যোগদান করিল। ঐরূপে এক বিরাট জনসঙ্ঘ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া রাঘব পণ্ডিতের কুটীরাভিমুখে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মালসা ভোগ

গঙ্গাতীরবর্তী বটবৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের উদ্দেশে কয়েক মালসা ফলাহার উৎসর্গ করাইয়া স্ত্রীভক্তেরা ঠাকুরের নিমিত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইবার কিছু পূর্বে একজন ভেকধারী কুৎসিত কদাকার বাবাজী সহসা কোথা হইতে আসিয়া এক মালসা প্রসাদ জনৈকা স্ত্রীভক্তের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং যেন ভাবে প্রেমে গদগদ হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুয়ের মুখে স্বহস্তে প্রদান করিল। ঠাকুর তখন ভাবাবেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাবাজী স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সর্বাঙ্গ সহসা শিহরিয়া উঠিয়া ভাবভঙ্গ হইল এবং মুখে প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য থু থু করিয়া নিক্ষেপপূর্বক মুখ ধৌত করিলেন। ঐ ঘটনায় বাবাজীকে ভণ্ড বলিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না এবং সকলে তাহার উপর বিরক্তি ও বিদ্রুপের সহিত কটাক্ষ করিতেছে দেখিয়া সে দূরে পলায়ন করিল। ঠাকুর তখন অন্য এক ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদকণিকা গ্রহণপূর্বক ভক্তগণকে অবশিষ্টাংশ খাইতে দিলেন।

নৌকায় প্রত্যাবর্তন ও নবচৈতন্যকে কৃপা

ঐরূপে ঐ পথ অতিক্রম করিয়া রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে পৌঁছিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাগিল। এখানে আসিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রামাদি করিতে ঠাকুরের অর্থ ঘণ্টা কাল অতীত হইল এবং সঙ্গে সেই বিরাট জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। ভিড় কমিয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাহাকে নৌকায় লইয়া আসিল। কিন্তু এখানেও এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। কোন্নগরনিবাসী নবচৈতন্য মিত্র উৎসবস্থলে ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছিল। এখন নৌকামধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইয়া এবং নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং 'কৃপা করুন' বলিয়া প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শনে তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। উহাতে কি অপূর্ব দর্শন উপস্থিত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ব্যাকুল ক্রন্দন

নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হইল এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় সে নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারূপে স্তবস্তুতিপূর্ব্বক বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল! ঐরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া নানা প্রকারে উপদেশ প্রদানপূর্বক শান্ত করিলেন। নবচৈতন্য ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ঠাকুরকে দর্শন করিলেও এতদিন তাহার কৃপালাভ করিতে পারে নাই, অদ্য তল্লাভে কৃতার্থ হইয়া সংসারের ভার পুত্রের উপর অর্পণপূর্বক নিজগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরে জীবনের অবশিষ্ট কাল বানপ্রস্থের ন্যায় সাধন-ভজন ও ঠাকুরের নামগুণগানে অতীত করিয়াছিল। এখন হইতে সংকীর্ত্তনকালে বৃদ্ধ নবচৈতন্যের ভাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং তাহার ভক্তি ও আনন্দময় মূর্তি দর্শনে অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। ঐরূপে নবচৈতন্য ঠাকুরের কৃপায় পরজীবনে বহুব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে পৌছান–বিদায়কালে জনৈক ভক্তের সহিত ঠাকুরের কথা

নবচৈতন্য বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। কিছুদূর আসিতে না আসিতে সন্ধ্যা হইল এবং রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইলাম। অনন্তর ঠাকুর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ তাহাকে প্রণামপূর্বক কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে নৌকারোহণ করিতেছে এমন সময়ে একব্যক্তির মনে হইল জুতা ভুলিয়া আসিয়াছে এবং উহা আনিবার জন্য সে পুনরায় ঠাকুরের গৃহাভিমুখে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসাপূর্বক পরিহাস করিয়া বলিলেন, “ভাগ্যে ঐ নৌকা ছাড়িবার পূর্বে মনে হইল, নতুবা আজিকার সমস্ত আনন্দটা ঐ ঘটনায় পণ্ড হইয়া যাইত।” যুবক ঐ কথায় হাসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কেমন দেখিলি বল দেখি? যেন হরিনামের হাটবাজার বসিয়া গিয়াছে-না?” সে ঐ কথায় সায় দিলে তিনি নিজ ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উৎসবস্থলে ভাবাবেশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ছোট নরেন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “কেলে ছোঁড়াটা অল্পদিন হইল এখানে আসা-যাওয়া করিতেছে, ইহার মধ্যেই তাহার ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না–এক ঘণ্টার উপর বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না! সে বলে তাহার মন আজকাল নিরাকারে লীন হইয়া যায়। ছোট নরেন বেশ ছেলে–না? তুই একদিন তাহার বাটীতে যাইয়া আলাপ করিয়া আসিবি–কেমন?” যুবক তাহার সকল কথায় সায় দিয়া বলিল, “কিন্তু মশায়! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আর কাহাকেও না, সেজন্য ছোট নরেনের বাটীতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।” ঠাকুর উহাতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুই ছোঁড়া ত ভারি একঘেয়ে, একঘেয়ে হওয়াটা হীন বুদ্ধির কাজ, ভগবানের পাঁচ ফুলে সাজি–নানা প্রকারের ভক্ত, তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে না পারাটা বিষম হীন বুদ্ধির কাজ; তুই ছোট নরেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় যাইবি-কেমন, যাইবি ত?” সে অগত্যা সম্মত হইয়া তাহাকে প্রণামপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি কয়েক দিন পরে ঠাকুরের কথামত ছোট নরেনের সহিত আলাপ করিতে যাইয়া তাহার কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমস্যার সমাধান লাভপূর্বক ধন্য হইয়াছিল। নৌকা সেইদিন কলিকাতায় পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছিল।

রাত্রে আহারকালে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে জনৈকা স্ত্রীভক্তের সহিত কথা

স্ত্রী-ভক্তেরা সেই রাত্রি শ্রীশ্রীমার নিকটে অবস্থান করিলেন এবং স্নানযাত্রার দিবসে ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহ হইবে জানিতে পারিয়া ঐ পর্বদর্শনান্তে কলিকাতায় ফিরিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাত্রে আহার করিতে বসিয়া ঠাকুর পাণিহাটির উৎসবের কথা প্রসঙ্গে তাহাদের একজনকে বলিলেন, “অত ভিড়– তাহার উপর ভাবসমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল–ও (শ্রীশ্রীমা) সঙ্গে না যাইয়া ভালই

করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত ‘হংস-হংসী এসেছে’। ও খুব বুদ্ধিমতী।” শ্রীশ্রীমার অসামান্য বুদ্ধির দৃষ্টান্ত স্বরূপে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “মাড়োয়ারী ভক্ত[2] যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাহিল তখন আমার মাথায় যেন করাত বসাইয়া দিল; মাকে বলিলাম, ‘মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি!’ সেই সময়ে ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম, ‘ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলায় তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লও না কেন– কি বল’? শুনিয়াই ও বলিল, ‘তা কেমন করিয়া হইবে? টাকা লওয়া হইবে না, আমি লইলে ঐ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ, আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না; সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য–অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না’। ওর (শ্রীশ্রীমার) ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি!”

শ্রীশ্রীমার সহিত উক্ত ভক্তের কথা

ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতে মাতাঠাকুরাণীর নিকটে যাইয়া তাহার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেছিলেন তাহা শুনাইলে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, “প্রাতে উনি (ঠাকুর) আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম–উনি মন খুলিয়া ঐ বিষয়ে অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন-হাঁ, যাবে বৈ কি। ঐরূপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপরে ফেলিয়া বলিলেন, ‘ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক,’ তখন স্থির করিলাম যাইবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভাল।”

স্নানযাত্রার দিবসে নানা লোকের সংসর্গে ঠাকুরের ভাবভঙ্গ ও বিরক্তি

গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া সে রাত্রে ঠাকুরের নিদ্রা হইল না। উৎসবস্থলে নানাপ্রকার চরিত্রের লোক তাঁহার দেব-অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছিল। কারণ দেখা যাইত, অপবিত্র অশুদ্ধমনা ব্যক্তিগণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্যপ্রকার সকামভাবে তাহার অঙ্গস্পর্শপূর্বক পদধূলি গ্রহণ করিলে ঐরূপ দাহে তিনি অনেক সময়ে প্রপীড়িত হইতেন। পাণিহাটি উৎসবের একদিন পরে স্নানযাত্রার পর্ব উপস্থিত হইল। ঐ দিবসে আমরা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে পারি নাই। স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে শুনিয়াছি ঐ দিবসে অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে অ-র মা নাম্নী জনৈকা নিজ বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করাইয়া লইবার আশয়ে তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া তাহার আনন্দের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোজন করিবার কালে তাহাকে নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কথা কহেন নাই এবং অন্য দিবসের ন্যায় খাইতেও পারেন নাই। পরে ভোজনান্তে আমাদের পরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে আচমনার্থ জল দিতে যাইলে তাহাকে একান্তে বলিয়াছিলেন, “এখানে লোক আসে ভক্তি প্রেম হইবে বলিয়া–এখান হইতে ওর বিষয়ের কি বন্দোবস্ত হইবে বল দেখি? মাগী কামনা করিয়া আঁব সন্দেশাদি আনিয়াছে–উহার একটুও মুখে তুলিতে পারিলাম না। আজ স্নানযাত্রার দিন, অন্য বৎসর এই দিনে কত ভাবসমাধি হইত, দুই-তিন দিন ভাবের ঘোর থাকিত, আজ কিছুই হইল না–নানাভাবের লোকের হাওয়া লাগিয়া উচ্চ ভাব আসিতে পারিল না?” অ–র মা সেই রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের বিরক্তির ভাব প্রশমিত হইল না। রাত্রিতে আহার করিবার কালে একজন স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, “এখানে স্ত্রীলোকদিগের এত ভিড় ভাল নয়, মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবু এখানে রহিয়াছে–কি মনে করিবে বল দেখি? দুই-এক জন মধ্যে মধ্যে আসিলে, এক-আধ দিন থাকিয়া চলিয়া যাইল–তাহা নহে, একেবারে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে! স্ত্রীলোকদিগের অত হাওয়া আমি সইতে পারি না।” ঠাকুরের বিরক্তির কারণ হইয়াছেন ভাবিয়া স্ত্রীভক্তগণ সেদিন বিশেষ বিষণ্ণ হইয়াছিলেন এবং রজনী প্রভাত হইলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। স্নানযাত্রা উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহে পূজা এবং যাত্রাদি হইয়াছিল, তাহারা কিন্তু পূর্বোক্ত

কারণে সেদিন কিছুমাত্র আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। নিরন্তর উচ্চ ভাবভূমিতে থাকিলেও ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে কতদূর লক্ষ্য ছিল এবং ভক্তদিগের কল্যাণের জন্য তিনি তাহাদিগকে কিরূপে শাসন ও পরিচালনা করিতেন, তাহা পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

[1] অর্থাৎ লোক-দেখান
[2] ইহার নাম লছমীনারায়ণ ছিল।

৫.১৭. একাদশ অধ্যায়: ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

পাণিহাটিতে যাইয়া গলায় বেদনা বৃদ্ধি ও বালক-স্বভাব ঠাকুরের আচরণ

পানিহাটি মহোৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুরের গলায় বেদনা বৃদ্ধি হইল। সেদিন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া আর্দ্রপদে বহুক্ষণ ভাবাবেশে অতিবাহিত করিবার ফলেই রোগ বাড়িয়াছে বলিয়া ডাক্তার ভক্তগণকে বারম্বার অনুযোগ করিলেন এবং পুনরায় ঐরূপ অত্যাচার হইলে উহা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। ভক্তগণ উহাতে এখন হইতে সতর্ক থাকিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন এবং বালক স্বভাব ঠাকুর ঐ দিবসের অত্যাচারের সমস্ত দোষ রামচন্দ্রপ্রমুখ কয়েকজন প্রবীণ ভক্তের উপর চাপাইয়া বলিলেন, "উহারা যদি একটু জোর করিয়া আমাকে নিষেধ করিত তাহা হইলে কি আমি পাণিহাটিতে যাইতে পারিতাম।" চিকিৎসা-ব্যবসায়ী না হইলেও রাম বাবু ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তারী পাশ করিয়া ছিলেন। বৈষ্ণব মতের প্রতি অনুরাগবশতঃ পাণিহাটির উৎসবে যাইবার জন্য তিনিই ঠাকুরকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই এখন ঐ বিষয়ে সমধিক দোষভাগী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। আমাদিগের জনৈক বন্ধু একদিন এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গলদেশে প্রলেপ লাগাইয়া গৃহমধ্যে ছোট তক্তাখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলেন, "বালককে শাসন করিবার জন্য কোন কার্য করিতে নিষেধ করিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখিলে সে যেমন বিষণ্ন হইয়া থাকে, ঠাকুরের মুখে অবিকল সেই ভাব দেখিতে পাইলাম। প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে? তিনি তাহাতে গলার প্রলেপ দেখাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "এই দ্যাখ না, ব্যথা বাড়িয়াছে, ডাক্তার বেশী কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছে"। বলিলাম, তাই ত মশায়, শুনিলাম সেদিন আপনি পেণেটি গিয়াছিলেন, বোধ হয় সে জন্যই ব্যথাটা বাড়িয়াছে। তিনি তাহাতে বালকের ন্যায় অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, দ্যাখ দেখি, এই উপরে জল নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি পথে কাদা, আর রাম কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো! সে পাশকরা ডাক্তার, যদি ভাল করে বারণ করতো তা হলে কি আমি সেখানে যাই"। আমি বলিলাম, 'তাই ত মশায়, রামের ভারি অন্যায়। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকুন, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে'। শুনিয়া তিনি খুশী হইলেন এবং বলিলেন, "তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়? এই দ্যাখ দেখি–তুই কতদূর থেকে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয়?" বলিলাম, 'আপনাকে দেখিলেই আনন্দ হয়, কথা না-ই বা কহিলেন, আমাদের কোন কষ্ট হইবে না–ভাল হউন, আবার কত কথা শুনিব'। কিন্তু সেকথা শুনে কে? ডাক্তারের নিষেধ, নিজের কষ্ট প্রভৃতি সকল বিষয় ভুলিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।"

গলায় ক্ষত হওয়া ও ডাক্তারের নিষেধ না মানিয়া ঠাকুরের সমীপাগত জনসাধারণকে পূর্ববৎ উপদেশ দান

ক্রমে আষাঢ় অতীত হইল। মাসাধিক চিকিৎসাধীন থাকিয়াও ঠাকুরের গলার বেদনার উপশম হইল না। অন্য সময়ে স্বল্প অনুভূত হইলেও একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উহার বিশেষ বৃদ্ধি হইত। তখন কোনরূপ কঠিন খাদ্য গলায় ক্ষত হওয়া ও তরিতরকারি গলাধঃকরণ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত। সুতরাং দুধ ভাত ও সুজির পায়স মাত্র ভোজন করিয়া ঠাকুর ঐ সকল দিন অতিবাহিত করিতেন। ডাক্তারেরা পরীক্ষা পূর্ব্বক স্থির করিলেন, তাঁহার

Clergyman's sore-throat হইয়াছে অর্থাৎ লোককে দিবারাত্র ধর্মোপদেশ প্রদানে বাগযন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত হইবার উপক্রম হইয়াছে; ধর্মপ্রচারকদিগের ঐরূপ ব্যাধি হইবার কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রোগনির্ণয় করিয়া ডাক্তারেরা ঔষধপথ্যাদির যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর তাহা সম্যক্ মানিয়া চলিলেও দুইটি বিষয়ে উহার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় অবশ হইয়া তিনি সমাধি ও বাক্যসংযমের দিকে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইলেন না। কোনরূপ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তিনি দেহবুদ্ধি হারাইয়া পূর্বের ন্যায় সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত, শোকে তাপে মুহ্যমান জনগণ পথের সন্ধান ও শান্তির প্রয়াসী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি পূর্বের মত তাহাদিগকে উপদেশাদিপ্রদানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।

বহু ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দানের অত্যধিক শ্রম ও মহাভাবে নিদ্রারাহিত্যাদি ব্যাধির কারণ

ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্মপিপাসু ব্যক্তিসকলের আগমন বড় স্বল্প হইতেছিল না। পুরাতন ভক্তসকল ভিন্ন পাঁচ-সাত বা ততোধিক নূতন ব্যক্তিকে ধর্মলাভের আশয়ে দক্ষিণেশ্বরে তাহার দ্বারে এখন নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা যাইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কেশবের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছুকাল পর হইতে প্রতিদিন ঐরূপ হইতেছিল। সুতরাং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্য গত একাদশ বৎসরে ঠাকুরের নিয়মিতকালে স্নান, আহার এবং বিশ্রামের সত্য-সত্যই অনেক সময়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল। তদুপরি মহাভাবের প্রেরণায় তাহার নিদ্রা স্বল্পই হইত। দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে অবস্থানকালে আমরা কত দিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১টার সময় শয়ন করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে পদচারণ করিতেছেন–কখন পশ্চিমের, কখন উত্তরের দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতেছেন, আবার কখন বা শয্যাতে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছেন। ঐরূপে রাত্রের ভিতর তিন-চারি বার শয্যাত্যাগ করিলেও রাত্র ৪টা বাজিবামাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ, মনন, নাম-গুণ-গান করিতে করিতে উষার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব দিবসে বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার অত্যধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অনিদ্রায় তাঁহার শরীর যে এখন অবসন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি!

ভাবাবেশ কালে জগন্মাতার সহিত কলহে ঠাকুরের শারীরিক অবসন্নতার কথা প্রকাশ

অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইতেছিল, ঠাকুর তদ্বিষয় আমাদিগের কাহাকে না বলিলেও উহার পরিচয় শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত তাঁহার প্রেমের কলহে আমরা কখন কখন শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারিতাম না। পীড়িত হইবার কিছুকাল পূর্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের জনৈক দেখিয়াছিল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া ছোট তক্তাখানির উপর বসিয়া কাহাকে সম্বোধন করিয়া আপন মনে বলিতেছেন, "যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি, এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল, ফু দিয়ে জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে আমার চোখ গেল, হাড় মাটি হল, অত করতে আমি পারব না, তোর সখ থাকে তুই করগে যা! ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দুই-এক কথা বলে দিলেই (চৈতন্য) হবে।" অন্য এক দিবসে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে আজ বলিতেছিলাম-বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মাষ্টার এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে, যাতে নতুন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈরী হইয়া আমার নিকটে আসে।" ঐরূপে লোকশিক্ষায় সহায়তাপ্রদানের বিষয়ে ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রীভক্তকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তুই জল ঢাল, আমি কাদা করি।" ধর্মপিপাসুগণের জনতা দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন বাড়িতেছে দেখিয়া তাহার গলদেশে প্রথম বেদনা অনুভবের কয়েক দিন পরে এক দিবস ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন,

"এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস! লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না! একটা ত এই ফুটো ঢাক (নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া), রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে?"

দক্ষিণেশ্বরে কত ধর্মপিপাসু উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য

বাস্তবিক, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের লোকোত্তর ভাব, প্রেম, সমাধি ও অমৃতময়ী বাণীর কথা মুখে মুখে এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার পুণ্যদর্শনলাভের আশয়ে নিত্যই দলে দলে লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেছিল এবং যাহারা একবার আসিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মোহিত হইয়া তদবধি পুনঃ পুনঃ আগমন করিতেছিল। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঠাকুরের কণ্ঠপীড়া হইবার পূর্বে ঐরূপে কত লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হওয়া সুকঠিন। কারণ, এক স্থানে একই দিনে তাহাদিগের সকলের একত্রিত হইবার সুযোগ কখনও উপস্থিত হয় নাই। ঐরূপ সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় একপ্রকার ভালই হইয়াছিল, নতুবা আমার পূজ্য দেশপূজ্য হইতেছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাসিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ তাহার ভক্তসংখ্যার বৃদ্ধিতে এতদিন যে আনন্দ অনুভব করিতে ছিলেন, তাহা ঐ সংখ্যার বাহুল্যদর্শনে বহু পূর্বে বিষাদ ও ভীতিতে পরিণত হইত; কারণ, তাহার নিজমুখে তাহারা বারম্বার শ্রবণ করিয়াছিলেন, "অধিক লোক যখন (আমাকে) দেবজ্ঞানে মনিবে, শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, তখনই ইহার (শরীরের) অন্তর্ধান হইবে।"

নিজদেহরক্ষার কালনিরূপণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

তাঁহার দেহরক্ষা করিবার কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত ঠাকুর সময়ে সময়ে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রেমে অন্ধ আমরা সে সকল কথা তখন শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তাঁহার অলৌকিক কৃপা লাভে আমরা যেরূপ ধন্য হইয়াছি, আমাদিগের আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত সকলে তদ্রূপ কৃপা লাভে শান্তির অধিকারী হউক– এই বিষয়েই তখন সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহার অদর্শনের কথা ভাবিবার অবসর কোথায়? কণ্ঠরোগ হইবার চারি-পাঁচ বৎসর পূর্বে ঠাকুর ঐবিষয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, "যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।" কণ্ঠরোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার নানা স্থানে নানা লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্যপদার্থ যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিতেছিলেন–কলিকাতায় আগমনপূর্বক ঘটনাচক্রে শ্রীযুত বলরামের বাটীতে ইতিপূর্বে রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছিলেন এবং অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া বহুদিবস না আসিলে, ঠাকুর একদিন তাহাকে প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত ঝোল-ভাতের অগ্রভাগ নরেন্দ্রনাথকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ বিষয়ে আপত্তি করিয়া তাহার নিমিত্ত পুনরায় রন্ধন করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কুচিত হইতেছে না। উহাতে কোন দোষ হইবে না, তোমার পুনরায় বাঁধিবার প্রয়োজন নাই।" শ্রীমা বলিতেন, "ঠাকুর ঐরূপে বুঝাইলেও তাহার পূর্বকথা স্মরণ করিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল।"

ঠাকুরের শিবজ্ঞানে জীবসেবানুষ্ঠান

লোকশিক্ষাপ্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইলেও ঠাকুরের মনের উৎসাহ ঐবিষয়ে কখনও স্বল্প দেখা যায় নাই। অধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিতে পারিতেন এবং কোন্ এক দৈবশক্তির আবেশে আত্মহারা হইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্শাদি করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। সে যে ভাবের ভাবুক তাহার মনে তখন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্য সকল ভাবকে কিছুক্ষণের জন্য প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং উক্ত ভাবে সিদ্ধিলাভ করিবার দিকে ঐ ব্যক্তি কতদূর যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার পথের বাধাসকল সরাইয়া তাহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় করাইতেন। ঐরূপে দেহপাতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার সর্বদা অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সেই অভয় পদবীর দিব্য জ্যোতিতে অভিষিক্ত করিয়া আবালবৃদ্ধ বনিতার জন্মজন্মাগত বাসনাপিপাসা চিরকালের মত মিটাইয়া দিয়াছেন!

লোকের মনের গূঢ়ভাব ও সংস্কারসমূহ ধরিবার ঠাকুরের ক্ষমতা

লোকের মনের নিগূঢ়ভাব ও সংস্কারসমূহ ধরিবার ক্ষমতা আমরা তাহাতে চিরকাল সমুজ্জ্বল দেখিয়াছি। শরীরের সুস্থতা বা অসুস্থতা তাঁহার মনকে যে কখন স্পর্শ করিত না, উহা তদ্বিষয়ের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু অপরের অন্তরের রহস্য সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলেও, নিজ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্য তিনি উহা কখনও প্রকাশ করিতেন না। যখন যতটুকু প্রকাশ করিলে কাহারও যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইত, তখন ততটুকু মাত্র প্রকাশপূর্বক তাহাকে উচ্চপথ দেখাইয়া দিতেন। অথবা কোন সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে তাহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অচল অটল করিবার জন্য তাহার নিকটে পূর্বোক্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ঐ বিষয়ক সামান্য একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি–

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত

ঠাকুরের কণ্ঠের বেদনাবৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণের শেষে আমাদিগের সুপরিচিত জনৈকা তাহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পল্লীবাসিনী অন্য এক রমণী ঐ কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন, "ঠাকুরকে দিবার মত আজ বাটীতে দুধ ভিন্ন অন্য কিছু নাই যাহা তোর হাতে পাঠাই; এক ঘটি দুধ লইয়া যাইবি?" পূর্বোক্ত রমণী তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে ভাল দুধের অভাব নাই, তাঁহার জন্য দুধ বরাদ্দও আছে জানি এবং উহা লইয়া যাওয়াও হাঙ্গাম, অতএব দুধ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্য দুধ ভাত ভিন্ন কোনরূপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাওয়া চলিতেছে না এবং কোন কারণে গয়লানী সেদিন নিত্য বরাদ্দ দুধ দিতে না পারায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বিশেষ চিন্তিতা রহিয়াছেন। কলিকাতা হইতে দুধ না লইয়া আসায় তিনি তখন বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং পাড়ায় কোনস্থানে দুধ পাওয়া যায় কি না সন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, ঠাকুরবাটীর অনতিদূরে 'পাড়ে গিন্নি' নামে পরিচিত এক হিন্দুস্থানী রমণীর গাভী আছে এবং সে দুগ্ধ বিক্রয়ও করিয়া থাকে। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, তাহার সকল দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; কেবল দেড়পোয়া আন্দাজ উদ্‌বৃত্ত থাকায় সে উহা জ্বাল দিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ প্রয়োজন বলায় সে ঐ দুগ্ধ তাহাকে বিক্রয় করিল এবং তিনি উহা লইয়া আসিলে ঠাকুর উহার সাহায্যেই সেদিন ভাত খাইলেন। আহারান্তে আচমন করিতে উঠিলে তিনি তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাহাকে সহসা একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে, তুমি রোগ আরাম করিবার যে মন্ত্রটি জান তাহা উচ্চারণ করিয়া একবার হাত বুলাইয়া দাও তো।" রমণী ঐ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিবার পরে শ্রীশ্রীমার

নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যে ঐ মন্ত্র জানি, উনি একথা কিরূপে জানিতে পারিলেন? ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্ত কোন রমণীর নিকটে আমি উহা সকাম কর্মসকল সাধনে বিশেষ সিদ্ধিদ জানিয়া বহুপূর্বে শিখিয়া লইয়া ছিলাম, পরে নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই জীবনের কর্তব্য জানিয়া উহা ত্যাগ করিয়াছি। জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে বলিয়াছি, কিন্তু কর্তাভজা মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনিলে পাছে উনি ঘৃণা করেন ভাবিয়া ঐ বিষয় তাহার নিকটে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম–কেমন করিয়া উনি তাহা টের পাইলেন?" মাতাঠাকুরাণী তাহার ঐকথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওগো, উনি সকল কথা জানিতে পারেন, অথচ মনমুখ এক করিয়া সদুদ্দেশ্যে যে যাহা করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তাহাকে কখন ঘৃণা করেন না; তোমার ভয় নাই; আমিও ইহার (ঠাকুরের) নিকটে আসিবার পূর্বে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া ঐকথা উহাকে বলায় উনি বলিয়াছিলেন, 'মন্ত্র লইয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই, উহা এখন ইষ্টপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দাও'।"

ব্যাধির বৃদ্ধিতে ঠাকুরের গলার ক্ষত হইতে রুধির নির্গত হওয়া ও ভক্তগণের তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়নের পরামর্শ

শ্রাবণ যাইয়া ক্রমে ভাদ্রেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের গলার বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা গেল না। ভক্তগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে সহসা একদিন এক ঘটনার উদয় হইয়া তাহাদিগকে কলকাতায় কর্তব্যের পথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিল। বাগবাজার বাসিনী জনৈকা রমণী সেদিন তাহার বাটীতে ভক্তগণকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে আনিবার তাঁহার বিশেষ আকিঞ্চন ছিল, কিন্তু তাহার শরীর অসুস্থ জানিয়া সেই আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তথাপি যদি তিনি কোনরূপে কিছুক্ষণের জন্য একবার বেড়াইয়া যাইতে পারেন ভাবিয়া জনৈক ভক্তকে অনুরোধ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাত্রি নয়টা হইলেও ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া না আসায় আর বিলম্ব না করিয়া তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগকে ভোজনে বসাইতেছেন, এমন সময়ে সেসংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল– ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হইতে আজ রুধির নির্গত হইয়াছে, সেইজন্য আসিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র, মাষ্টার (মহেন্দ্র) প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল কলিকাতায় একখানি বাটী ভাড়া লইয়া অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপূর্বক চিকিৎসা করাইতে হইবে। ভোজনকালে নরেন্দ্রনাথকে বিষণ্ন দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "যাহাকে লইয়া এত আনন্দ তিনি বুঝি এইবার সরিয়া যান–আমি ডাক্তারি গ্রন্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, ঐরূপ কণ্ঠরোগ ক্রমে 'ক্যান্সারে' (Cancer) পরিণত হয়; অদ্য রক্তপড়ার কথা শুনিয়া রোগ উহাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে; ঐ রোগের ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয় নাই।"

ঠাকুরের চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন ও বলরামের ভবনে অবস্থান

পরদিবস ভক্তদিগের মধ্যে প্রবীণ কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন। বাগবাজারে দুর্গা চরণ মুখার্জি স্ট্রীটের ক্ষুদ্র একখানি বাটীর ছাদ হইতে গঙ্গাদর্শন হয় দেখিয়া ভক্তগণ উহা ভাড়া লইয়া অনতিকাল পরে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু ভাগীরথীতীরে কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া আসিলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মনোমত বাটী যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন তাহার নিকটে থাকিতে অনুরোধ করায়, তিনি ঐস্থানে থাকিয়া যাইলেন।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের রোগ নিরূপণ ও শ্যামপুকুরের বাটী ভাড়া

বাটীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধিসম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ সেদিন আহূত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাহার রোহিণী নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবার কালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "ডাক্তারেরা যাহাকে ক্যান্সার বলে, রোহিণী তাহাই; শাস্ত্রে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।" কবিরাজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশা না পাইয়া এবং অধিক ঔষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতুতে কোনকালে সহে না জানিয়া, ভক্তগণ তাঁহার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সপ্তাহকালের মধ্যেই শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানাভবনটি ঠাকুরের থাকিবার জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন তাহাকে রাখা সর্ববাদিসম্মত হইল।

ঠাকুরকে দেখিবার জন্য বলরাম-ভবনে বহু ব্যক্তির জনতা

এদিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন শহরের সর্বত্র লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বহু ব্যক্তি তাহার দর্শনমানসে যখন তখন দলে দলে উপস্থিত হইয়া বলরামের ভবনকে উৎসবস্থলের ন্যায় আনন্দময় করিয়া তুলিল। ডাক্তারের নিষেধ ও ভক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় সময়ে সময়ে নীরব থাকিলেও ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে বোধ হইল তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে আগমন করিয়াছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যাহাদের পক্ষে সুগম নহে তাহাদিগকে ধর্ম্মালোকপ্রদানের জন্যই তিনি কিছুকালের জন্য তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন! প্রাতঃকাল হইতে ভোজন কাল পর্যন্ত এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই আন্দাজ বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শয়নকাল পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নসকল সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং ভজন সঙ্গীতাদি শ্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। সকল দিবস সকল সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমাদিগের কাহারও ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সম্বন্ধে নানা বন্দোবস্ত করিতে অনেক সময়ে স্থানান্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং ঐ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কি ভাবে ঠাকুর, বলরামের ভবনে এই কয়দিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্য নিয়ে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা নিরস্ত হইব।

বলরাম ভবনে একদিনের ঘটনা

আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে দুই-একদিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম। একদিবস অপরাহ্নে ঐরূপে বলরামের ভবনে আসিয়া দেখি, দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পূর্ণ ও গিরিশচন্দ্র এবং কালীপদ[1] মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন–

আমায় ধর নিতাই।

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

গৃহমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও প্রসারিত এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া এক ব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার

চক্ষু নিমীলিত এবং মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জম্ জম্ করিতেছে। গান চলিতে লাগিল

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,

আমায় ধর নিতাই।

(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে

উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে

সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।

(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে

অষ্ট সখী সাক্ষী তাতে

(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।

(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল

তবু ঋণের শোধ না হ’ল,

প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

গীত সাঙ্গ হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, “বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।” ঐরূপে উপর্য্যুপরি তিন বার তাহাকে ঐ নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঐ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল গোস্বামী, ঢাকার কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। গোস্বামী যেমন ভক্তিমান্, দেখিতেও তেমনি সুপুরুষ ছিলেন।

[1] গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কালীপদ ঘোষ

৫.১৮. দ্বাদশ অধ্যায়–প্রথম পাদ: ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

শ্যামপুকুরের বাটীর পরিচয়

ঠাকুরের জন্য যে বাটীখানি এখন ভাড়া লওয়া হইল, উহা পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরমুখে বাটীতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার চাতাল ও স্বল্পপরিসর 'রক' দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই ডাহিনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্বদিকে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর, উহাই সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং বামে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই বৈঠকখানা ঘর নামে অভিহিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দ্বার–এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারান্দা, তন্মধ্যে উত্তরের বারাণ্ডা প্রশস্ততর ছিল এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুইখানি ঘর–একখানিতে ভক্ত দিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সাধারণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে স্বল্পপরিসর বারাণ্ডা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের পূর্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার পার্শ্বে চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও ঐরূপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ চাতালটিতেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং ঐ স্থানেই ঠাকুরের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রন্ধন করিতেন। ভাদ্র মাসের শেষার্ধের কোন সময়ে ইংরেজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে ঠাকুর বলরামের বাটী হইতে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার দুই-এক দিন থাকিতে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসার ভার গ্রহণ

শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিবার কয়েক দিন পরেই ভক্তগণ পূর্বপরামর্শমত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ আনয়ন করিল। মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে তাহার পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত সামান্যভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের উহা মনে না থাকাই সম্ভব, ঐ জন্য কাহাকে দেখিতে আসিতেছেন তাহা না বলিয়াই ভক্তগণ তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তিনি কিন্তু ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং বহু যত্নে পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয়পূর্বক ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবার পরে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী সম্বন্ধীয় কথা ও ধর্মালাপে স্বল্পকাল অতিবাহিত করিয়া তাহার নিকটে সেদিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ আছে, ডাক্তার ঐদিন ভক্তগণকে প্রত্যহ প্রাতে ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন এবং যাইবার কালে তাহারা তাহাকে নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করিলে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া যখন তিনি কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ভক্তগণই তাহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনয়নপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করিতেছে, তখন তাহাদিগের গুরুভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না-বলিলেন, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোমাদিগের সৎকার্যে সহায়তা করিব।"

পথ্য ও রাত্রে সেবার বন্দোবস্তের পরামর্শ

ঐরূপে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তালাভ করিয়াও ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত করিবার এবং দিবসের ন্যায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের আবশ্যক মত সেবা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ব্যয়নির্বাহ করিয়া ঐ দুই অভাবের একটিও যথাযথ নিবারিত হইবার নহে ভাবিয়া

তাহারা তখন দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনয়নপূর্বক প্রথমটি এবং ঠাকুরের বালক-ভক্তগণের সহায়তায় দ্বিতীয়টি মোচনের পরামর্শ স্থির করিল। ঐ অভাবদ্বয়ের ঐরূপে নিরাকরণের পথে কিন্তু বিষয় অন্তরায় দেখা যাইল। কারণ, বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট অন্দরমহল না থাকায় শ্রীশ্রীমা এখানে কিরূপে একাকিনী আসিয়া থাকিবেন তদ্বিষয় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর হইল এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র বালক-ভক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া নিত্য রাত্র-জাগরণাদি কৰিলে অভিভাবকদিগের বিষম অসন্তোষের উদয় হইবে, একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর লজ্জাশীলতার দৃষ্টান্ত

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব লজ্জাশীলতার কথা স্মরণ করিয়াও ভক্তগণের অনেকে তাহার আগমন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইল। দক্ষিণেশ্বর উদ্যানের উত্তরের নহবতখানায় অবস্থানপূর্বক ঠাকুরের সেবায় নিত্য নিযুক্তা থাকিলেও দুই-চারি জন বালক-ভক্ত ভিন্ন-যাহাদিগের সহিত ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন-অপর কেহ এতকাল কখন তাঁহার শ্রীচরণদর্শন অথবা বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই। ঐ স্বল্পপরিসর স্থানে সমস্ত দিবস থাকিয়া ঠাকুরের ও ভক্তগণের নিমিত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাদ্যদ্রব্যসকল দুই বেলা প্রস্তুত করিয়া দিলেও, ঐ স্থানে কেহ যে ঐরূপ কার্যে নিযুক্ত আছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। রাত্রি ৩টা বাজিবার স্বল্পকাল পরে অন্য কেহ উঠিবার বহু পূর্বে প্রতিদিন শয্যাত্যাগপূর্ব্বক শৌচ-স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি সেই যে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন, সমস্ত দিবস আর বহির্গত হইতেন না–নীরবে, নিঃশব্দে অদ্‌ভুত ত্রস্ততার সহিত সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া পূজা-জপ-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবার কালে তিনি একদিবস এক প্রকাণ্ড কুম্ভীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন–কুম্ভীর ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপানের উপর শয়ন করিয়াছিল, তাহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল! তদবধি সঙ্গে আলো না লইয়া তিনি কখন ঘাটে নামিতেন না।

শ্রীশ্রীমাকে শ্যামপুকুরে আনিবার প্রস্তাব

এতকাল ঐস্থানে থাকিয়াও যিনি ঐরূপে কখন কাহারও দৃষ্টি মুখে পতিত হয়েন নাই, সর্বপ্রকার সঙ্কোচ ও লজ্জা সহসা পরিত্যাগপূর্বক তিনি কিরূপে এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে আসিয়া সর্বক্ষণ বাস করিবেন-ইহা ভক্তগণের কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অথচ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা তাহাকে আনিবার প্রস্তাব ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতে বাধ্য হইল। ঠাকুর তাহাতে শ্রীশ্রীমার পূর্বোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, “সে কি এখানে আসিয়া থাকিতে পারিবে? যাহা হউক, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, সকল কথা জানিয়া শুনিয়া সে আসিতে চাহে ত আসুক।” দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে লোক প্রেরিত হইল।

শ্রীশ্রীমার দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তি

‘যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন’-ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপে দেশকাল-পাত্র-ভেদ বিবেচনাপূর্বক সংসারে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে পারিলে শান্তি লাভে, অথবা নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে কেহ সমর্থ হয় না। সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ আবরণের দুর্ভেদ্য অন্তরালে সর্বথা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়া নিজজীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি পূর্ব সংস্কার ও অভ্যাসের আবরণসমূহ হইতে আপনাকে নিষ্ক্রান্ত করিয়া নির্ভয়ে যথাযথ আচরণে কতদূর সমর্থা ছিলেন, তাহা তাহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের বিবরণে[1] এবং নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে–

কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথ

স্বল্পব্যয়সাধ্য যানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে তৎকালে অনেক সময়ে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদব্রজে আসিতে হইত। ঐরূপে আসিতে হইলে জাহানাবাদ (আরামবাগ) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পথিকগণকে চারি-পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলোর মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া তারকেশ্বরে, এবং তথা হইতে কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া বৈদ্যবাটীতে আসিয়া গঙ্গা পার হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন ডাকাইতগণের ঘাঁটি ছিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, প্রদোষে অনেক পথিকের এখানে তাহাদিগের হস্তে প্রাণ হারাইবার কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত তেলো-ভেলো নামক ক্ষুদ্র গ্রামদ্বয়ের এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে প্রান্তরের মধ্যভাগে করালবদনা, সুভীষণা এক কালীমূর্তির এখনও দর্শন মিলিয়া থাকে। জনসাধারণের নিকট ইনি তেলোভেলোর 'ডাকাতে কালী' ৎনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোকে বলে, ইহাকে পূজা করিয়া ডাকাতেরা নরহত্যারূপ নৃশংস কার্যে অগ্রসর হইত। ডাকাইতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথিকেরা ঐসময়ে দলবদ্ধ না হইয়া এই প্রান্তরদ্বয় অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

শ্রীশ্রীমার পদব্রজে তারকেশ্বরে আগমনকালে ঘটনা

ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অপর কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এক সময়ে পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরামবাগে পৌঁছিয়া তেলোভেলোর প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্বে পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাহার সঙ্গিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও রাত্রিযাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্তি অনুভব করিলেও শ্রীশ্রীমা তজ্জন্য ঐ বিষয়ে কাহাকেও না বলিয়া তাহাদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুই ক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই দেখা গেল, তিনি সঙ্গীদিগের সহিত সমভাবে চলিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছেন। তখন তাঁহার নিমিত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং তিনি নিকটে আসিলে তাহাকে দ্রুত চলিতে বলিয়া তাহারা পুনরায় গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। অনন্তর প্রান্তর মধ্যে আসিয়া তাহারা দেখিল, তিনি আবার সকলের বহু পশ্চাতে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। আবার তাহারা তাহার নিমিত্ত এখানে অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং তিনি নিকটে আসিলে বলিল, এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাতের হস্তে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহাদিগকে তাহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছিয়া বিশ্রাম কর গে, আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদিগের সহিত মিলিত হইতেছি।" বেলা অধিক নাই দেখিয়া এবং তাহার ঐকথার উপর নির্ভর করিয়া সঙ্গিগণ আর কালবিলম্ব করিল না, অধিকতর বেগে পথ অতিক্রম পূর্ব্বক শীঘ্রই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইল।

তেলোভেলোর প্রান্তরে

শ্রীশ্রীমা তখন যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় তাহার প্রান্তরমধ্যে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিষম চিন্তিত হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ যষ্টি স্কন্ধে লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পশ্চাতে দূরে তাহার সঙ্গীর ন্যায় এক ব্যক্তিও আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। পলায়ন বা চীৎকার করা বৃথা বুঝিয়া শ্রীশ্রীমা তখন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগের আগমন সশঙ্কচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাগদি পাইক ও তাহার পত্নী

কয়েক মুহূর্ত মধ্যে ঐ পুরুষ নিকটে আসিয়া তাহাকে কর্কশস্বরে প্রশ্ন করিল, "কে গা এ সময়ে এখানে দাঁড়াইয়া আছ?" শ্রীশ্রীমা তখন তাহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে পিতৃসম্বোধনপূর্ব্বক একেবারে তাহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার সঙ্গিগণ আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আমি পথও ভুলিয়াছি, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া যদি তাহাদিগের নিকটে পৌঁছাইয়া দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাটীতে থাকেন, আমি তাহার নিকটেই যাইতেছি, তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে লইয়া যাও তাহা হইলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করিবেন।" ঐ কথাগুলি বলিতে না বলিতে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীমা দেখিলেন সে পুরুষ নহে রমণী, প্রথমাগত পুরুষের পত্নী। ঐ রমণীকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহার হস্তধারণ ও মাতৃ-সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলিয়া যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি আসিয়া পড়িলে, নতুবা কি করিতাম বলিতে পারি না।"

তেলোভেলোয় রাত্রিবাস এবং পাইক ও তাহার পত্নীর যত্ন

শ্রীশ্রীমার ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগদি পাইক ও তাহার পত্নীর প্রাণ এককালে বিগলিত হইল। সামাজিক আচার ও জাতির কথা ভুলিয়া তাহারা সত্যসত্যই আপনাদিগের কন্যার ন্যায় দেখিয়া তাহাকে অশেষ সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল! পরে তাহার শারীরিক অবসন্নতার কথা আলোচনা করিয়া তাহারা তাহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে না দিয়া সমীপবর্তী তেলোভেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লইয়া যাইয়া রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল। রমণী নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিল এবং পুরুষ দোকান হইতে মুড়িমুড়কি কিনিয়া তাহাকে ভোজন করিতে দিল। ঐরূপে পিতা মাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রত্যুষে উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া দুই-চারি দণ্ড বেলা হইলে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া এক দোকানে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিল। অনন্তর রমণী তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার মেয়ে কাল কিছুই খাইতে পায় নাই, বাবার (তারকনাথের) পূজাদি শীঘ্রই সারিয়া বাজার হইতে মাছ, তরিতরকারি লইয়া আইস, আজ তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে।"

তারকেশ্বরে পৌঁছিবার পরে ও পাইকের সহিত বিদায় কালে

পুরুষ ঐসকল কর্ম করিতে চলিয়া যাইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন শ্রীশ্রীমা তাঁহার রাত্রে আশ্রয়দাতা পিতামাতার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া বলিলেন, "ইহারা আসিয়া আমাকে না রক্ষা করিলে কাল রাত্রে কি যে করিতাম তাহা বলিতে পারি না।" অনন্তর পূজা, রন্ধন ও ভোজনাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ঐস্থানে বিশ্রামপূর্বক সকলে বৈদ্যবাটী অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, "এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলাম যে, বিদায় গ্রহণকালে ব্যাকুল হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুবোধপূর্বক ঐকথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতি কষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং রমণী পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাইশুটি তুলিয়া দিতে দিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাইবি তখন এইগুলি দিয়া খাস'। পূর্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও (ঠাকুর) আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহারে ও আদর-

আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাবা পূর্বে কখন কখন ডাকাইতি যে করিয়াছিল একথা কিন্তু আমার মনে হয়।”

শ্রীশ্রীমা শ্যামপুকুরে আগমনপূর্বক যে ভাবে বাস করিয়াছিলেন

ডাক্তারের উপদেশমত সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আপনার থাকিবার সুবিধা অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন। একমহল বাটীতে, অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে, সকল প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়া এখানে তিন মাস অবস্থানপূর্বক তিনি যে ভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্নানাদি করিবার একটি মাত্র স্থান সকলের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকায় রাত্রি ৩টার পূর্বে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক তিনি কখন যে ঐ সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া ত্রিতলে ছাদের সিঁড়ির পার্শ্বস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুতপূর্বক তিনি বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ (অধুনা পরলোকগত), অথবা স্বামী অদ্‌ভুতানন্দের দ্বারা ঐ সংবাদ নিম্নে প্রেরণ করিতেন–তখন সুবিধা হইলে লোক সরাইয়া তাঁহাকে উহা আনয়নপূর্বক ঠাকুরকে খাওয়াইতে বলা হইত, নতুবা আমরাই উহা লইয়া আসিতাম। মধ্যাহ্নে তিনি ঐস্থানে স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রি ১১টার সময় সকলে নিদ্রিত হইলে ঐস্থান হইতে নামিয়া দ্বিতলে তাহার নিমিত্ত নির্দিষ্ট গৃহে আসিয়া রাত্রি দুইটা পর্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর দিন ঐরূপে কাটাইয়া দিতেন এবং এরূপ নীরবে নিঃশব্দে সর্বদা অবস্থান করিতেন যে, যাহারা প্রত্যহ এখানে আসা যাওয়া করিত তাহাদিগের অনেকেও জানিতে পারিত না তিনি এখানে থাকিয়া ঠাকুরের সর্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন।

বালক ভক্তগণের ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ

পথ্যের বিষয় ঐরূপে মীমাংসিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের সেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জন্য ভক্তগণ মনোনিবেশ মত জগতের করিল। শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন ঐ বিষয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্বক রাত্রিকালে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্মঠ যুবক ভক্তকে ঐরূপ করিতে আকৃষ্ট করিলেন। ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তাঁহার অসীম স্বার্থত্যাগ, প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পূত আলাপ ও পবিত্র সঙ্গে তাহারা সকলেও নিজ নিজ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্বক শ্রী গুরুর সেবা এবং ঈশ্বরলাভরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যে জীবন নিয়মিত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। তাহাদিগের অভিভাবকেরা যতদিন ঐকথা বুঝিতে না পারিলেন ততদিন পর্যন্ত শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া তাহা দিগের ঠাকুরের সেবা করিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহারা সেবাকার্য্যে সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কলেজে অধ্যয়ন এবং নিজ নিজ বাটীতে আহার করিতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিল, তখন তাহাদিগের প্রাণে প্রথমে সন্দেহ এবং পরে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য ন্যায্য অন্যায্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা ঐ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্বোচ্চ কর্তব্যপথে কখনই যে অচল অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বলা বাহুল্য। ঐরূপে শ্যামপুকুরের বাটীতে চারি-পাঁচ জন মাত্র জীবনোসর্গ করিয়া এই সেবাব্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উদ্যানে উহার পূর্ণানুষ্ঠানকালে ব্রতধারিগণের সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

[1] ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-সাধকভাব’ –বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫.১৯. দ্বাদশ অধ্যায়–দ্বিতীয় পাদ: ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

গৃহী ভক্তগণের সেবার ভার গ্রহণ ও ঠাকুরের ভিতর মধ্যে মধ্যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ দেখা

ঔষধ, পথ্য ও দিবারাত্র সেবার পূর্বোক্তভাবে বন্দোবস্ত হইবার পরে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মতামত গ্রহণপূর্বক তাঁহারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ঠাকুরের কণ্ঠরোগ এককালে চিকিৎসার অসাধ্য না হইলেও বিশেষ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই এবং তাহার আরোগ্য হওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সুতরাং শেষ পর্যন্ত

সেবা চালাইবার ব্যয় কিরূপে নির্বাহ হইবে, ইহাই এখন তাহাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। ঐরূপ হইবারই কথা–কারণ বলরাম, সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাহারা ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসাদির ভার লইয়াছিলেন, তাহারা কেহই ধনী ছিলেন না। নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহপূর্বক সেবকগণের সহিত ঠাকুরের ভার একাকী বহন করেন, এরূপ সামর্থ্য তাহাদিগের কাহারও ছিল না। ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহারই প্রেরণায় তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পূতধারা যে সর্বক্ষণ একটানে বহিতে থাকিবে এবং ভবিষ্যতের ভাবনা উহার ভাটার সময়ে তাহাদিগকে বিকল করিবে না, একথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। ফলে ঐরূপ হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলেই তাহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল দেখিতে পাইতেন যে, ঐ দুর্ভাবনা কোথায় বিলীন হইয়া যাইত এবং তাহাদিগের অন্তর পুনরায় নূতন উৎসাহ ও বলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন বিচারবুদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহণপূর্বক তাহারা দিবালোকে দেখিতে পাইতেন যে, যাহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র অতিমানব নহেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি-দেবমানব নারায়ণ! তাহার জন্ম, কর্ম্ম, তপস্যা, আহার, বিহার–এমন কি দেহের অসুস্থতা-নিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্যন্ত সকলই বিশ্বমানবের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষাদির অতীত সত্যসঙ্কল্প পুরুষোত্তমের দেহের অসুস্থতা কোথায়? সেবাধিকার প্রদানপূর্বক তাহাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন! দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত গমন করিয়া যাহাদিগের তাহাকে দর্শন করিবার অবসর ও সুযোগ নাই, তাঁহাদিগের প্রাণে দিবালোকের উন্মেষ উপস্থিত করিবার জন্যই তিনি সম্প্রতি তাহাদিগের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন! পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন জড়বাদী মানব, যে বিজ্ঞানের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আপনাকে নিরাপদ ও সর্বজ্ঞপ্রায় ভাবিয়া ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনকেই জীবনের লক্ষ্য করিতেছে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকাররূপ দিব্য বিজ্ঞানের উচ্চতর আলোকে উহার অকিঞ্চিৎকর প্রতিপাদনপূর্বক তাহার জীবন ত্যাগের পথে প্রবর্তিত করিবার জন্যই তিনি এখন ঐরূপ হইয়া রহিয়াছেন! – তবে কেন এই আশঙ্কা, অর্থাভাব হইবে বলিয়া কি জন্য দুর্ভাবনা? যিনি সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনিই তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

গৃহী ভক্তগণের ঠাকুরের জন্য স্বার্থত্যাগের কথা

ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে অতিরঞ্জিত করিয়া আমরা উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছি, পাঠক যেন ইহা মনে না করেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে ভক্তগণকে ঐরূপ অনুভব ও আলোচনা করিতে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। দেখিয়াছি, অর্থাভাববশতঃ ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইয়া তাহার পূর্বোক্ত ভাবের প্রেরণায় আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন, "ঠাকুর নিজের জোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন, যদি করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? (নিজ বাটী দেখাইয়া) যতক্ষণ ইটের উপরে ইট রহিয়াছে ততক্ষণ ভাবনা কি? বাটী বন্ধক দিয়া তাহার সেবা চালাইব।" কেহ বা বলিয়াছেন, "পুত্রকন্যার বিবাহ বা অসুস্থতা কালে যেরূপে চালাইয়া থাকি সেইরূপে চালাইব, ধীর গাত্রে দুই-চারি খান অলঙ্কার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভাবনা কি?" আবার কেহ বা মুখে ঐরূপ প্রকাশ না করিলেও আপন সংসারের ব্যয় কমাইয়া অকাতরে ঠাকুরের সেবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐরূপ ভাবের প্রেরণাতেই সুরেন্দ্রনাথ বাটীভাড়ার সমস্ত ব্যয় একাকী বহন করিয়াছিলেন এবং বলরাম, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া ঠাকুরের ও তাহার সেবকগণের নিমিত্ত এইকালে যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সমস্ত যোগাইয়া আসিয়াছিলেন।

ভক্তসঙ্ঘ গঠন করাই ঠাকুরের ব্যাধির কারণ

ভক্তগণ ঐরূপে যে দিব্যোল্লাস প্রাণে অনুভব করিতেন, তাহা এখন ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর-উদ্যানে উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত দ্রুত বদ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।

ভক্তগণের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারনার শ্রেণীবিভাগ–যুগাবতার, গুরু, অতিমানব ও দেহমানব

যতই দিন গিয়াছিল ততই ঠাকুরের অসুস্থ হইবার কারণ এবং কতদিনে তাহার আরোগ্য হওয়া সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানা জল্পনা ও বিশ্বাস ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যেন কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার অতীত জীবনের অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাবলীর আলোচনাই যে উহাদিগের মূলে থাকিয়া ভক্তগণকে অদ্‌ভুত মীমাংসাসকলে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একদল ভাবিতেন–শুদ্ধ ভাবনা কেন, সকলের নিকটে প্রকাশও করিতেন–যুগাবতার ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিটা মিথ্যা ভানমাত্র; উদ্দেশ্যবিশেষ সংসাধনের জন্য তিনি উহা জানিয়া বুঝিয়া অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; যখনই ইচ্ছা হইবে পুনরায় পূর্বের ন্যায় আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইবেন। বিশাল কল্পনাশক্তি লইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রই এই দলের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্য একদল বলিতেন, যাহার বিরাট ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া অবস্থান ও সর্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ঠাকুর অভ্যস্ত হইয়াছেন, সেই জগদম্বাই জনকল্যাণসাধনকর নিজ গূঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে কিছুকালের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; উহার সম্যক রহস্যভেদ ঠাকুরও স্বয়ং করিতে পারিয়াছেন কি না বলা যায় না; তাহার ঐ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইলেই ঠাকুর পুনরায় সুস্থ হইবেন। অপর একদল প্রকাশ করিতেন–জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এ সকল শরীরের ধর্ম, শরীর থাকিলে ঐ সকল নিশ্চয় উপস্থিত হইবে, ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিও ঐরূপে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উহার একটা অলৌকিক গূঢ় কারণ আছে ভাবিয়া এত জল্পনার প্রয়োজন কি? যত দিন না স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছি, তত দিন পর্যন্ত ঠাকুর সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ক মীমাংসা আমরা তর্কযুক্তির দ্বারা বিশেষরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি; আমরা তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে সেবা করিব এবং তিনি মানবজীবনের যে উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, সেই ছাঁচে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিব। বলা বাহুল্য, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথই ঠাকুরের যুবকশিষ্যবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপে শেষোক্ত মত প্রচার করিতেন।

ভক্তগণের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা

ঠাকুরের বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট শিষ্যবর্গ তাহার সম্বন্ধে ঐরূপ নানা ভাব ও মত পোষণ করিলেও, তাহার মহদুদার শিক্ষানুসারে জীবন অতিবাহিত করিলে এবং সর্বান্তঃকরণে তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তাহাদিগের পরম মঙ্গল হইবে, একথায় পূর্ণ বিশ্বাসবান ছিল। ঐজন্যই একদল তাহাকে যুগাবতার বলিয়া, অন্যদল গুরু ও অতিমানব বলিয়া এবং অপরদল দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস করিলেও তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কোনদিন উপস্থিত হয় নাই।

ভক্তগণপরিদৃষ্ট ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশের দৃষ্টান্তসকল

যাহা হউক, কিরূপ আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া এখন ভক্তগণের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হইতেছিল, পাঠককে উহা বুঝাইবার জন্য আমরা আধ্যাত্মিক যাহা দেখিয়াছি,

এইরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে প্রকাশের উল্লেখ করিব। ঘটনাগুলি ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ভিন্ন অন্য যে-সকল লোক তাহাকে ঐকালে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহারাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সরকারের ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও আচরণ এবং এক দিবসের কথোপকথন

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পরম উৎসাহে তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে বৈকালে ঠাকুরের শরীর কিরূপ থাকে তাহা উপর্যুপরি কয়েক দিবস আসিয়া দেখিয়া তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকের কর্তব্য শেষ করিবার পরে ঐসকল দিবসে ধর্মসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রসঙ্গে কিছুকাল ঠাকুরের সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ফলে ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকতায় তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া অবসর পাইলেই এখন হইতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইতে ও দুই-চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মূল্যবান সময়ের এত অধিক ভাগ এখানে কাটাইবার জন্য ঠাকুর একদিন তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপক্রম করিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওহে, তুমি কি ভাব কেবল তোমারই জন্য আমি এখানে এতটা সময় কাটাইয়া যাই? ইহাতে আমারও স্বার্থ রহিয়াছে। তোমার সহিত আলাপে আমি বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকি। পূর্বে তোমাকে দেখিলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তোমাকে জানিবার অবসর ত পাই নাই–তখন এটা করিব, ওটা করিব, ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকা গিয়াছিল। কি জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে; তুমি যেটা সত্য বলিয়া বুঝ তার একচুল এদিক ওদিক করিয়া চলিতে বলিতে পার না ; অন্যস্থলে দেখি তারা বলে এক, করে এক; ঐটে আমি আদৌ সহ্য করিতে পারি না। মনে করিও না, তোমার খোশামুদি করচি, এমন চাষা আমি নই; বাপের কুপুত্র! -বাপ অন্যায় করলে তাকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; ঐজন্য আমার দুর্ম্মুখ বলে নামটা খুব রটিয়া গিয়াছে।”

ডাক্তারের সত্যানুরাগে সকল প্রকার অনুষ্ঠান

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু এই ত এতদিন এখানে আসচ, আমি ত তার কিছুরই পরিচয় পাইলাম না।” ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, “সেটা আমাদের উভয়ের সৌভাগ্য! নতুবা অন্যায় বলিয়া কোন বিষয় ঠেকিলে, দেখিতে মহেন্দ্র সরকার চুপ করিয়া থাকবার বান্দা নয়। যাহা হক, সত্যের প্রতি অনুরাগ আমাদের নাই, একথা যেন ভাবিও না। সত্য বলে যেটা বুঝেছি, সেইটা প্রতিষ্ঠা করতেই ত আজীবন ছুটাছুটি করেছি, ঐজন্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারম্ভ, ঐজন্যই বিজ্ঞানচর্চার মন্দিরনির্মাণ– ঐরূপ আমার সকল কাজেই।”

অপরা বিদ্যার সহায়ে পরাবিদ্যালাভ

যতদূর মনে হয়, আমাদিগের মধ্যে কেহ এই সময়ে ইঙ্গিত করিয়াছিল, সত্যানুরাগ থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অপরা বিদ্যার শ্রেণীভুক্ত আপেক্ষিক (relative) সত্যাবিষ্কারের দিকেই অনুরাগ - ঠাকুরের কিন্তু পরাবিদ্যার প্রতিই চিরকাল ভালবাসা।

ডাক্তার উহাতে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “ঐ তোমাদের এক কথা; বিদ্যার আবার পরা, অপরা কি? যা হ’তে সত্যের প্রকাশ হয়, তার আবার উঁচু নীচু কি? আর যদিই একটা ঐরূপ মনগড়া ভাগ কর, তাহা হইলে এটা ত স্বীকার করিতেই হইবে, অপরা বিদ্যার ভিতর দিয়াই পরাবিদ্যা লাভ করিতে হইবে–বিজ্ঞানের চর্চা দ্বারা আমরা যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেই জগতের আদি কারণের বা ঈশ্বরের কথা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। আমি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের ধরিতেছি না। তাদের কথা বুঝিতেই পারি না–চক্ষু থাকিতেও তারা

অন্ধ। তবে একথাও যদি কেহ বলেন যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সবটা তিনি বুঝে ফেলেছেন, তা হলে তিনি মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর-তার জন্য পাগলাগারদের ব্যবস্থা করা উচিত।”

ঈশ্বরের ‘ইতি’ করাটা হীন বুদ্ধি

ঠাকুর ডাক্তারের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের ‘ইতি’ যারা করে তারা হীনবুদ্ধি, তাদের কথা সহ্য করতে পারি না।”

মন বুঝে প্রাণ বুঝে না

ঐ বলিয়া ঠাকুর আমাদিগের জনৈককে ভক্তাগ্রণী শ্রীরাম প্রসাদের ‘কে জানে মন কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন’ [1] গীতটি গাহিতে বলিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে উহার ভাবার্থ মৃদুস্বরে ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ‘আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন’ গীতের এই অংশটি গাহিবার কালে ঠাকুর গায়ককে বাধা দিয়া বলিলেন, “উঁ হুঁ, উল্টোপাল্টা হচ্ছে; ‘আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না’-এইরূপ হইবে; মন তাকে (ঈশ্বরকে) জানতে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে ধরা তার কর্ম নয়, প্রাণ কিন্তু ঐকথা বুঝিতেই চাহে না, সে কেবলি বলে–কি করে আমি তাকে পাব।”

ডাক্তার ঐকথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ, মন ব্যাটা ছোট লোক, একটুতেই পারব না, হবে না বলে বসে; কিন্তু প্রাণ ঐকথায় সায় দেয় না বলেই ত যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে।”

ভাবাবিষ্ট যুবকের নাড়ী পরীক্ষা

গান শুনিতে শুনিতে দুই-একজন যুবকভক্তের ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্যের লোপ হইতে দেখিয়া ডাক্তার তাহাদের নিকটে যাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “মুর্চ্ছিতের ন্যায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।” বুকে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে নাম শুনাইবার পরে তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া তিনি ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন, “এ সব তোমারই খেলা, বোধ হইতেছে।” ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার নয় গো, এসব তারি (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়। ইহাদের মন এখনও স্ত্রী পুত্র, টাকা কড়ি, মান যশাদিতে ছড়াইয়া পড়ে নাই বলিয়াই তাঁর নামগুণ শ্রবণে তন্ময় হইয়া ঐরূপ হইয়া থাকে।”

বিদ্যার গরম

পূর্ব প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া এইবার ডাক্তারকে বলা হইল, তিনি ঈশ্বরকে মানিলেও এবং তাহার ‘ইতি’ না করিলেও যাহারা বিজ্ঞানচর্চায় রত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একদল ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দেন এবং অপর দল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তিনি এইরূপ ভিন্ন অপর কোনরূপ হইতে বা করিতে পারেন না, এই কথা উচ্চৈস্বরে প্রচার করিয়া থাকেন। ডাক্তার বলিলেন, “হাঁ, ঐ কথা অনেকটা সত্য বটে; কিন্তু ওটা কি জান?-ওটা হচ্চে বিদ্যার গরম বা বদহজম–ঈশ্বরের সৃষ্টির দুই-চারিটা বিষয় বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া তারা মনে করে, দুনিয়ার সব ভেদটাই তারা মেরে দিয়েছে। যারা অধিক পড়েছে দেখেছে, ও দোষটা তাদের হয় না; আমি ত ঐ কথা কখনও মনে আনিতে পারি না।”

পান্ডিত্যের অহঙ্কার

ঠাকুর তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ, বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি পণ্ডিত, আমি যা জেনেছি বুঝেছি তাহাই সত্য, অপরের কথা মিথ্যা–এইরূপ একটা অহঙ্কার আসে। মানুষ

নানা পাশে আবদ্ধ রয়েছে, বিদ্যাভিমান তাহারই ভিতরের একটা; এত লেখাপড়া শিখেও তোমার ঐরূপ অহঙ্কার নাই, ইহাই তার কৃপা।”

ডাক্তারের নিরভিমানতা

ডাক্তার ঐকথায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “অহঙ্কার হওয়া দূরে থাক্, মনে হয় যা জেনেছি বুঝেছি তা যৎসামান্য, কিছু নয় বলিলেই হয়–শিখিবার এত বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে, মনে হয়, শুধু মনে কেন, আমি দেখিতে পাই–প্রত্যেক মানুষেই এমন অনেক বিষয় জানে, যাহা আমি জানি না; সেজন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু শিখিতে আমার অপমান বোধ হয় না। মনে হয়, ইহাদের নিকটেও (আমাকে দেখাইয়া) আমার শিখিবার মত অনেক জিনিস থাকিতে পারে, এ হিসাবে আমি সকলের পায়ের ধূলা লইতেও প্রস্তুত”।

ভিতরে মাল আছে

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “আমিও ইহাদিগকে বলি, (আমাদিগকে দেখাইয়া) ‘সখি, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি!” পরে ডাক্তারকে দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন, “কেমন নিরভিমান দেখছিস? ভিতরে মাল (পদার্থ) আছে কিনা, তাই ঐরূপ বুদ্ধি।”

ঐরূপ নানা কথাবার্তার পরে ডাক্তার সেদিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ডাক্তারকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ঐরূপে দিন দিন ঠাকুরের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, ঠাকুরও তেমনি তাঁহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন গুণী ব্যক্তির সহিত আলাপেই গুণীর সমধিক প্রীতি জানিয়া ঠাকুর তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাছা বাছা লোকসকলকে মধ্যে মধ্যে সুবিদ্বান ডাক্তারের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পরে ডাক্তার একদিন ‘বুদ্ধচরিতে’র অভিনয় দর্শন করিয়া উহার শতমুখে প্রশংসা করিয়া ছিলেন এবং তৎকৃত অন্য কয়েকখানি নাটকেও অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ঐরূপে নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং গীতবিদ্যাতেও তাঁহার অধিকার আছে জানিয়া একদিন ভজন শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহার কয়েক দিন পরে ডাক্তার একদিবস অপরাহ্নে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে নরেন্দ্রনাথ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষাপূর্বক দুই-তিন ঘণ্টা কাল তাহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। ডাক্তার সেইদিন উহাতে এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আশীর্বাদ, আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “এর মত ছেলে ধর্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত; এ একটি রত্ন, যাতে হাত দিবে সেই বিষয়েরই উন্নতিসাধন করিবে।” ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিয়াছিলেন, “কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ওঁর (নরেন্দ্রের) জন্যই তো সব গো!” এখন হইতে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া নরেন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত দেখিলেই ডাক্তার তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি ভজন না শুনিয়া ছাড়িতেন না।

ঔষধে সম্যক্ ফল না পাওয়ায় ডাক্তারের চিন্তা ও আচরনের দৃষ্টান্ত

ঐরূপে ভাদ্র-আশ্বিনের কিয়দংশ অতীত হইয়া ক্রমে দুর্গা পূজার কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের অসুস্থতা ঐ সময়ে কোন কোন দিন কিছু অধিক এবং অন্য সকল দিনে অল্প, এইভাবে চলিয়াছিল। ঔষধে সম্যক ফল পাওয়া যাইতেছিল না। ডাক্তার একদিন আসিয়া রোগ বাড়িয়াছে দেখিয়া বলিয়া বসিলেন, “নিশ্চয় পথ্যের কোন অনিয়ম হইতেছে; আচ্ছা বল দেখি, আজ কি কি খাইয়াছ?”

প্রাতে ভাতের মন্ড, ঝোল ও দুধ এবং সন্ধ্যায় দুখ ও যবের মন্ডাদি তরল খাদ্যই ঠাকুর খাইতেছিলেন, সুতরাং ঐ কথাই বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "তথাপি নিশ্চয় কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আচ্ছা বল ত, কোন্ কোন্ আনাজ দিয়া ঝোল রাধা হইয়াছিল?" ঠাকুর বলিলেন, "আলু, কাচকলা, বেগুন, দুই-এক টুকরা ফুলকপিও ছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "এ্যাঁ–ফুলকপি খেয়েছ? এ ত খাবার অত্যাচার হয়েছে, ফুলকপি বিষম গরম ও দুষ্পাচ্য। কয় টুকরা খেয়েছ?"

ঠাকুর বলিলেন, "এক টুকরাও খাই নাই, তবে ঝোলে উহা ছিল দেখিয়াছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "খাও আর নাই খাও, ঝোলে উহার সত্ত্ব ত ছিল—সেইজন্যই তোমার হজমের ব্যাঘাত হইয়া আজ ব্যায়ামের বৃদ্ধি হইয়াছে।"

ঠাকুর বলিলেন, "সে কি গো! কপি খাইলাম না, পেটের অসুখও হয় নাই, ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলিয়া ব্যারাম বাড়িয়াছে, এ কথা যে আদৌ মনে নেয় না।"

একটু অত্যাচার অনিয়মে কতটা অপকার হয় তাহার দৃষ্টান্ত

ডাক্তার বলিলেন, "ঐরূপ একটুতে যে কতটা অপকার করিতে পারে তাহা তোমাদের ধারণা নাই। আমার জীবনের একটা ঘটনা বলিতেছি, শুনিলে বুঝিতে পারিবে। আমার হজমশক্তিটা বরাবরই কম; মধ্যে মধ্যে অজীর্ণে খুব ভুগিতে হইত; সেজন্য খাদ্যের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়া সর্বদা চলি। দোকানের কোন জিনিস খাই না; ঘি, তেল পর্যন্ত বাড়ীতে করাইয়া লই। তথাচ এক সময়ে বিষম সর্দি হইয়া ব্রনকাইটিস হইল, কিছুতেই সারিতে চায় না। তখন মনে হইল, নিশ্চিত খাবারে কোন প্রকার দোষ হইতেছে। সন্ধান করিয়া উহাতেও কোন প্রকার দোষ ধরিতে পারিলাম না। উহার পরে সহসা একদিন চোখে পড়িল–যে গোরুটার দুধ খাইয়া থাকি, তাহাকে চাকরটা কতকগুলো মাষকড়াই খাওয়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কোনও স্থান হইতে কয়েক মণ ঐ কড়াই পাওয়া গিয়াছিল, সর্দির ভয়ে কেহ খাইতে চাহে না বলিয়া কিছুদিন হইতে উহা গোরুকে খাইতে দেওয়া হইতেছে। মিলাইয়া পাইলাম, যখন হইতে ঐরূপ করা হইয়াছে প্রায় সেই সময় হইতে আমার সর্দি হইয়াছে। তখন গোরুকে ঐ কড়াই খাওয়ান বন্ধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্দিও অল্পে অল্প কমিতে লাগিল। সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে সেইবার অনেকদিন লাগিয়াছিল এবং বায়ু পরিবর্তনাদিতে আমার চারি-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল।"

ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও বাবা, এ যে তেঁতুলতলা দিয়া গিয়াছিল বলিয়া সর্দি হইল–সেইরূপ!"

সকলে হাসিতে লাগিল। ডাক্তারের ঐরূপ অনুমান করাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইলেও, উহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কেহ উত্থাপন করিল না এবং তাঁহার নিষেধ মানিয়া লইয়া এখন হইতে ঠাকুরের ঝোলে কপি দেওয়া বন্ধ করা হইল।

ডাক্তারের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ও ভক্তগণের প্রতি ভালবাসা

ঠাকুরের ভালবাসা, সরল ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিকতায় ডাক্তারের মন তাহার প্রতি ক্রমে কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাহার এক এক দিনের কথায় ও কার্যে বেশ বুঝা যাইত। শুধু ঠাকুরকে কেন, তদীয় ভক্তগণকেও তিনি এখন ভালবাসার চক্ষে দেখিতেছিলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া তাহারা যে একটা মিথ্যা হুজুক করিতে বসে নাই, এবিষয়ে বিশ্বাস হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে তাহারা যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস করিত তাহা তিনি কি ভাবে দেখিতেন তাহা বলা যায় না। বোধ হয় তাহার নিকটে উহা কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইত। অথচ তাহারা

যে উহা কোন প্রকার স্বার্থের জন্য অথবা ‘লোক-দেখান’র মত করে না তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং তাহার নিকটে উহা এক বিচিত্র রহস্যের ন্যায় প্রতিভাত হইত বলিয়া বোধ হয়। ভক্তদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ বিষয়ের সমাধানে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ প্রহেলিকাভেদে সমর্থ হয় নাই। কারণ, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেও মানবের ভিতর তাহার অসাধারণ শক্তিপ্রকাশ দেখিয়া তাহাকে গুরু ও অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা-পূজাদি করাটা তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বুঝিতে পারিতেন না এবং বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া উহার বিরোধী ছিলেন। বিরোধের কারণ, সংসারে যাহারা অবতার বলিয়া পূজা পাইতেছেন, তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা তাঁহাদিগের মহিমা প্রচার করিতে যাইয়া বুদ্ধির দোষে কোন কোন বিষয় এমন অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহারা স্বরূপৎ কীদৃশ ছিলেন লোকের তাহা ধরা-বুঝা এখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে ডাক্তার একদিন ঠাকুরের সম্মুখে স্পষ্ট বলিয়াও ছিলেন, “ঈশ্বরকে ভক্তি-পূজাদি যাহা বল তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই অনন্ত ভগবান্ মানুষ হইয়া আসিয়াছেন-এই কথা বলিলেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা বুঝা কঠিন-ঐ নন্দনের দলই দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়াছে।” ঠাকুর ঐ কথায় হাসিয়া আমা দিগকে বলিয়াছিলেন, “এ বলে কি? তবে হীনবুদ্ধি গোঁড়ারা অনেক সময় তাহাকে বাড়াইতে যাইয়া ঐরূপ করিয়া ফেলে বটে।”

ডাক্তারের অবতার সম্বন্ধীয় মত ও তাহার প্রতিবাদ–৺দুর্গাপূজাকালে ঠাকুরের ভাবাবেশ দর্শনে ডাক্তারের বিস্ময়

অবতার সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত মত প্রকাশের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের সময়ে সময়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়া ছিল। ফলে, উহার বিপরীতে অনেক যুক্তিগর্ভ কথা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় ঐরূপ একান্ত বিরোধী মত সহসা প্রকাশ করিতে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কে যাহা হয় নাই, ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্য ও প্রেম এবং তাহার ভিতর হইতে যে অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তারের সময়ে সময়ে নয়নগোচর হইতেছিল, তাহা দ্বারা সেই বিষয় সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ মত ধীরে ধীরে অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছিল। ঐবৎসর –দুর্গাপূজা সন্ধিক্ষণে যে অলৌকিক বিভূতিপ্রকাশ ঠাকুরের ভিতরে সহসা উপস্থিত হইতে আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, ডাক্তার সরকারও উহা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দিন অপর এক ডাক্তার বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া ভাবাবেশকালে ঠাকুরের হৃদয়ের স্পন্দনাদি যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন সঙ্কুচিত হয় কি না দেখিবার জন্য তন্মধ্যে অঙ্গুলী প্রদান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ফলে হতবুদ্ধি হইয়া তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই; পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে চূড়ত্ব বলিয়া নির্দেশ ও ঘৃণা প্রকাশপূর্বক নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্বস্বতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান, যাহাদের রহস্যভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই–কোনও কালে পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না। বাহিরে মৃতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া ঠাকুর সেদিন ঐকালে যাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া ভক্তগণ মিলাইয়া পাইয়াছিল, সে-সকল কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করায় উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

রোগবৃদ্ধি

আশ্বিন অতীত হইয়া কার্তিক এবং শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন ক্রমে নিকটবর্তী হইল, কিন্তু ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। চিকিৎসার প্রথমে যে ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দিন দিন নষ্ট হওয়ায় ব্যাধি প্রবলভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল।

ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বরং অধিকতর বলিয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতিভাত হইল। ডাক্তার সরকার পূর্বের ন্যায় ঘন ঘন যাতায়াত ও পুনঃ পুনঃ ঔষধ পরিবর্তন করিয়াও আশানুরূপ ফল না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন ঋতু পরিবর্তনের জন্য ঐরূপ হইতেছে, শীতটা একটু চাপিয়া পড়িলেই বোধ হয় ঐ ভাবটা কাটিয়া যাইবে।

৺কালীপূজা দিবসে ঠাকুরের অদ্‌ভুত ভাবাবেসগের বিবরণ

দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্‌ভুত আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ কোন সময়ে প্রতিমা আনয়নপূর্বক কালীপূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাহার ভক্তগণের সম্মুখেই ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে বিবরণ পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ হইবে ভাবিয়া, তিনি শ্যামপুকুরের বাটীতে উক্ত পূজা করিবার কথা পাড়িলেন। কিন্তু পূজার উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর অবসন্ন হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেন্দ্র ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কিন্তু পূজার পূর্ব দিবসে কয়েকজন ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন, "পূজার উপকরণসকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখি-কাল কালীপূজা করিতে হইবে।" তাহারা তাহার ঐ কথায় আনন্দিত হইয়া অন্য সকলের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিল। কিন্তু পূর্বোক্ত কথাগুলি ভিন্ন পূজার আয়োজন সম্বন্ধে অন্য কোন কথা ঠাকুরের নিকটে না পাওয়ায় কি ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তদ্বিষয় লইয়া নানা জল্পনা তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইল। পূজা, ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চোপচারে হইবে, উহাতে অন্নভোগ দেওয়া হইবে কি না, পূজকের পদ কে গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ের কোন মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে স্থির হইল, গন্ধ-পুষ্প, ধূপ-দীপ, ফলমূল এবং মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা যাইবে। কিন্তু সেই দিবস এবং পূজার দিনের অর্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে বলিলেন না।

পূজার আয়োজন

ক্রমে সূর্যাস্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখনও তাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অন্য দিবসের ন্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা তাহার সন্নিকটে পূর্বদিকের কতকটা স্থান মার্জন করিয়া সংগৃহীত দ্রব্যসকল আনিয়া রাখিতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুর কখন কখন আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। অদ্যও সেইরূপে তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তি-রূপিণীর পূজা করিবেন, অথবা ৺জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা সম্পন্ন করিবেন, তাহারা পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল। সুতরাং পূজোপকরণসকল তাহারা এখন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে পূর্বোক্তরূপে সাজাইয়া রাখিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

ঠাকুরের নীরবে অবস্থান

ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ-দীপসকল প্রজালিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া একমনে তাহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। ঐরূপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া

অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই না করিয়া পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

গিরিশচন্দ্রের মীমাংসা ও ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান–ঠাকুরের ভাবাবেশ

যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিসকল উপস্থিত ছিলেন-তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস[2] বলিয়া-ঠাকুর কখন কখন নির্দেশ করিতেন। পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অনেকে এখন বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান্ গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্যভাবের উদয় হইল। তাহার মনে হইল, আপনার জন্য ঠাকুরের ৺কালীপূজা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় তাহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে–তাহা হইলে উহা করিয়া এরূপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অতএব তাহা বোধ হইতেছে না; তবে কি তাহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজায়োজন? –নিশ্চয় তাহাই। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং সম্মুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয়-মুদ্রা ধারণপূর্বক তাহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল! এত অল্পকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শ্ববর্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাহার পদে বারম্বার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিদ্দূরে ছিল তাহারা দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন!

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে ভক্তগণের পূজা

বলা বাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। তাহারা প্রত্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্বক 'জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। কতক্ষণ ঐরূপে গত হইলে ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্ধবাহ্য অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফলমূলমিষ্টান্নাদি পদার্থসকল তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাহাকে খাইতে দেওয়া হইল। তিনিও ঐ সকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহারা সকলে প্রাণের উল্লাসে ৺দেবীর মহিমা কীর্তন ও নামগুণ-গানে অতিবাহিত করিল।

ঐরূপে ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিয়া যে অভূতপূর্ব উল্লাস অনুভব করিয়াছিল তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে এবং দুঃখ-দুর্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্যহাস্যফুল্ল প্রসন্ন আনন ও বরাভয়যুক্ত করদ্বয় তাহাদিগের সম্মুখে উদিত হইয়া তাহাদিগের জীবন সর্বথা 'দেবরক্ষিত', এই কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

পর্ববিশেষ ভিন্ন অন্য সময়ে ভক্তগণের ঠাকুর সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিব্যশক্তি ও দেব ভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্বোক্তরূপে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পর্বকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহসা যখন তখন তাহাতে ঐরূপ ভাবের বিকাশ দেখিবার অবসর লাভ করিয়া তাহার প্রতি তাহাদের দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ঐ ভাবের ঘটনাসকল ইতিপূর্বে উল্লিখিত ঘটনাগুলির ন্যায় অনেক সময়ে সকলের সমক্ষে উপস্থিত না হইলেও, ভক্তগণের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ

করিয়াছিল অগ্রে তাহাদিগের প্রাণে এবং পরে তাহাদিগের নিকটে শুনিয়া অপর সকলের প্রাণে পূর্বোক্ত ফলের উদয় করিয়া ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠকের ঐ বিষয় বোধগম্য হইবে—

ঠাকুরকে শ্রদ্ধাভক্তি করায় বলরামের আত্মীয়বর্গের অপ্রসন্নতা

বলরামের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন বলিয়া তাহার আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। ঐরূপ হইবার তাঁহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথমত, তাঁহারা বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষানুসারে তাহাদিগের ধর্মমত যে কতকটা একদেশী এবং অতিমাত্রায় বাহ্যাচারনিষ্ঠ হইবে ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং সকল প্রকার ধর্মমতের সত্যতায় স্থির বিশ্বাসসম্পন্ন, বাহ্যচিহ্নমাত্র ধারণে পরাঙ্‌মুখ ঠাকুরের ভাব তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না—ঐরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন না। অতএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কৃপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাবসম্পন্ন হওয়াটা তাহারা ধর্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—ধন, মান, আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্য মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান অহঙ্কারই পরিপুষ্ট করে। পুণ্যকীর্ত্তি ৺কৃষ্ণারাম বসু যে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারাও আপনাদিগকে সমধিক মহিমান্বিত জ্ঞান করিতেন। ঐ বংশমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া বলরাম ইতরসাধারণের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্মলাভের জন্য যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকেও তথায় লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের অভিমান যে বিষম প্রতিহত হইবে, একথা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাহাদিগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল।

বলরামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণে তাহাদিগের চেষ্টা

সৎ উপায় অবলম্বনে কার্যসিদ্ধি না হইলে অহঙ্‌কৃত মানবকে অসদুপায় গ্রহণ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বলরামের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রায় ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কালনার ভগবানদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেমের আতিশয্য কীর্ত্তন করিয়া এবং আপনাদিগের বংশগৌরবের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াও যখন তাহারা বলরামের ঠাকুরের নিকটে গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া তাহারা কখন কখন তাহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। অবশ্য, অপরের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াই যে তাহারা ঠাকুরকে নিষ্ঠাপরিশূন্য, সদাচারবিরহিত, খাদ্যাখাদ্য-বিচার বিহীন, কন্ঠী তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণের বিরোধী ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, একথা বলিতে হইবে। যাহা হউক, উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিকৃত আলোচনা তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতৃদ্বয় ৺নিমাইচরণ ও ৺হরিবল্লভ বসুর কর্ণে উত্থাপিত করিতে লাগিলেন।

বলরামের পূর্বজীবন

আমরা ইতিপূর্বে একস্থলে বলিয়াছি, বলরামের ভিতরে দয়া ও ত্যাগবৈরাগ্যের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল। জমিদারী প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে অনেক সময় নির্মম হইয়া নানা হাঙ্গামা না করিলে চলে না দেখিয়া, তিনি নিজ বিষয়সম্পত্তির ভার নিমাই বাবুর উপরে সমর্পণপূর্বক তাহার নিকট হইতে প্রতি মাসে আয়স্বরূপে যাহা পাইতেন অনেক সময়ে উহা পর্যাপ্ত না হইলেও তাহাতেই কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাহার শরীরও ঐ সকল কর্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা এক সময়ে এতদূর স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল যে, একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর অন্ন ত্যাগপূর্বক তাহাকে যবের মণ্ড ও দুগ্ধ পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের

জন্য তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্য দর্শন, পূজা, জপ, ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্যেই তাহার তখন দিন কাটিত এবং ঐরূপে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল সেই সকলের সহিত সুপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর ঐকালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কার্যানুরোধে কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দর্শন ও পূতসঙ্গে তাহার জীবন কিরূপে দিন দিন পরিবর্তিত হয়, তদ্বিষয়ের আভাস আমরা ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছি।

বলরামের কলিকাতায় আগমন ও ঠাকুরকে দর্শন

প্রথমা কন্যার বিবাহ দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা ৺পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ একাদশ বৎসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্য কোন প্রকারে শান্তিভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়া ছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ পাছে বললাম সংসার পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাহাকে ঐ বাটীতে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধুদিগের পূতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম ক্ষুণ্নমনে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন, বোধ হয় পূর্বে তাহার এরূপ অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং পাছে হরিবল্লভ বাবু তাহাকে উক্ত বাটী খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাই বাবু বিষয়সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাহাকে কোঠারে আহ্বানপূর্বক ঠাকুরের পুণ্যসলে বঞ্চিত করেন, এই ভয়ে তাহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত।

বলরামের ভ্রাতা হরিবল্লভের কলিকাতা আগমন

অন্তরের চিন্তা সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনা করে। বলরামেরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। তিনি যাহা ভয় করিতে ছিলেন প্রায় তাহাই উপস্থিত হইল। আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণায় তাহার উভয় ভ্রাতাই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পত্র পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভ বাবু তাহার সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া তাহার সহিত একত্রে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন, এই সংবাদও অবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। অন্যায় কিছুই করেন নাই বলিয়া বলরামের অন্তরাত্মা উহাতে ক্ষুব্ধ না হইলেও ঘটনাচক্র পাছে তাহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়, এই ভয়ে অবসন্ন হইল। অনন্তর অশেষ চিন্তার পরে তিনি স্থির করিলেন, ভ্রাতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন তথাপি তিনি ঠাকুরের অসুখের সময়ে তাহাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইবেন না। ইতিমধ্যে হরিবল্লভ বাবুও কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এইরূপে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া বলরাম নিজ সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যেভাবে যাতায়াত করিতেন, প্রকাশ্যভাবে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

বলরামের প্রতি কৃপায় ঠাকুরের হরিবল্লভকে দেখিবার সঙ্কল্প

মুখই মনের প্রকৃষ্ট দর্পণ। হরিবল্লভ বসুর কলিকাতায় আসিবার দিবসে বলরাম ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন তাহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। বলরামকে তিনি বিশেষভাবে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তাঁহার বেদনায় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রশ্ন পূর্ব্বক সকল বিষয় জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "সে লোক কেমন? তাহাকে (হরিবল্লভ বসুকে) একদিন এখানে আনিতে পার?" বলরাম বলিলেন,

"লোক খুব ভাল, মশায়! বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সদাশয়, পরোপকারী, দান যথেষ্ট, ভক্তিমানও বটে-দোষের মধ্যে বড় লোকের যাহা অনেক সময় হইয়া থাকে একটু 'কানপাতলা'-এ ক্ষেত্রে অপরের কথাতেই কি একটা ঠাওরাইয়াছে। এখানে আসি বলিয়াই আমার উপরে অসন্তোষ, অতএব আমি বলিলে এখানে আসিবে কি?" ঠাকুর বলিলেন, "তবে থাক, তোমার বলিয়া কাজ নাই; একবার গিরিশকে ডাক দেখি।"

গিরিশচন্দ্র আসিয়া সানন্দে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "হরিবল্লভ ও আমি যৌবনের প্রারম্ভে কিছুকাল সহপাঠী ছিলাম, সেজন্য কলিকাতায় আসিয়াছে শুনিলেই আমি তাহার সহিত দেখা করিয়া আসি; অতএব এই কাজ আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, অদ্যই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

গিরিশচন্দ্রের হরিবল্লভকে আনয়ন ও ঠাকুরের আচরণে তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়া

পরদিন অপরাহ্নে প্রায় ৫টার সময় গিরিশচন্দ্র হরিবল্লভ বাবুকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সহিত তাহাকে পরিচিত করিবার মানসে বলিলেন, "ইনি আমার বাল্যবন্ধু, কটকের সরকারী উকীল হরিবল্লভ বসু, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া তাহাকে পরম সমাদরে নিজ সমীপে বসাইয়া বলিলেন, "তোমার কথা অনেকের নিকটে তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইত, আবার মনে ভয়ও হইত–যদি তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়! (গিরিশকে লক্ষ্য করিয়া) কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ত নয়, (হরিবল্লভ বসুকে নির্দেশ করিয়া) এ যে বালকের ন্যায় সরল! (গিরিশকে) কেমন চক্ষু দেখিয়াছ? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হইলে অমন চক্ষু কখন হয় না! (হরিবল্লভ বাবুকে সহসা স্পর্শ করিয়া) হাঁ গো, ভয় করা দূরে থাকুক, তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে।" হরিবল্লত বাবু প্রণাম ও পদধূলী গ্রহণপূর্বক বলিলেন, "সেটা আপনার কৃপা।"

গিরিশচন্দ্র এইবার বলিলেন, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উঁহার তো ভক্তিমান হইবারই কথা; ৺কৃষ্ণরাম বসুর ভক্তি তাহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কীর্তিতে দেশ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাহার বংশে যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিমান হইবেন না ত হইবে কাহারা।"

ঐরূপে ভগবদ্ভক্তির প্রসঙ্গ উঠিল, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি ও ঐকান্তিক নির্ভরতাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা–ঐ বিষয়ে নানা কথা উপস্থিত সকলকে বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। অনন্তর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর আমাদিগের একজনকে একটি ভজন সঙ্গীত গাহিতে বলিলেন এবং উহার মর্ম্ম হরিবল্লভ বাবুকে মৃদুস্বরে বুঝাইয়া বলিতে বলিতে পুনরায় গভীর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইলে দেখা গেল, দুই-তিনজন যুবক ভক্তেরও ভাবাবেশ হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাবোল মূর্তি ও মর্মস্পশী বাণীতে এককালে মুগ্ধ হওয়ায় হরিবল্লভ বাবুর নয়নয়ে প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল গত হইবার পরে হরিবল্লভ বাবু সেদিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলাপ করিবার কালে ঠাকুরের অপরকে স্পর্শের কারণ ও ফল

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাইতাম, আগন্তুক ফোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করিলে অথবা কোন কারণে তাহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে, ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ করিতেন এবং ঐরূপ করিবার পরমুহূর্ত্ত হইতে তাহারা তাহার কথা মানিয়া লইতে থাকিত। অবশ্য যাহাদিগকে দেখিয়া তাহার মন প্রসন্ন হইত তাহাদিগের সম্বন্ধেই তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি এক দিবস আমাদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। 'অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া অথবা আমি কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে

ন্যূন নহি, এইরূপ ভাব লইয়াই লোকে কাহারও কথা সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। (আপনার শরীর নির্দেশ করিয়া) ইহার ভিতরে যে রহিয়াছে তাহাকে স্পর্শমাত্র তাহার দিব্যশক্তিপ্রভাবে তাহাদিগের ঐ ভাব আর মাথা উঁচু করিতে পারে না। সর্প যেমন ফণা ধরিবার কালে ওষধিস্পৃষ্ট হইয়া মাথা নীচু করে, তাহাদিগের অন্তরের অহঙ্কারের অবস্থাও তখন ঠিক ঐরূপ হয়। ঐজন্যই কথা কহিতে কহিতে কৌশলে তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকি।”

হরিবল্লভ বাবুকে ঐদিন ঠাকুরের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া সশ্রদ্ধ হৃদয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদিগের মনে ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উদয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বলরাম ঠাকুরের নিকটে যাতায়াত করায় অন্যায় করিতেছেন, এইরূপ ভাব তাহার ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে এখন হইতে আর কখন দেখা দেয় নাই।

ভক্ত-সংখ্যার বৃদ্ধি; সাধনপথ নির্দেশ–সাকার ও নিরাকার চিন্তার উপযোগী আসন

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভে সমাগত জনগণের সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুস্তফি প্রমুখ অনেক গৃহস্থভক্তের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙেঘ যিনি পরে স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন– শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন মিত্র[3], মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত[4] প্রভৃতি অনেক যুবক ভক্তেরাও এখানে ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে আবার ইতিপূর্বে দুই-এক বার দক্ষিণেশ্বরে গতায়াত করিলেও এখানেই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। নবাগত এই সকল ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি ও সংস্কার লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে ভক্তিপ্রধান অথবা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিপ্রধান সাধনমার্গ নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং সুযোগ পাইলেই নিভৃতে নানারূপ উপদেশ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর করাইতেন। আমাদিগের জানা আছে, জনৈক যুবককে ঐরূপে ঠাকুর একদিন সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপযোগী নানাপ্রকার আসন ও অঙ্গসংস্থান দেখাইতেছিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপরে দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপনপূর্বক ঐভাবে উভয়হস্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন করিয়া বলিলেন, ইহাই সকল প্রকার সাকার-ধ্যানের প্রশস্ত আসন। পরে ঐ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয় বাম ও দক্ষিণ জানুর উপরে রক্ষাপূর্বক প্রত্যেক হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর সকল অঙ্গুলী ঋজু রাখিয়া এবং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, ইহাই নিরাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন। ঐকথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বলপূর্বক মনকে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে নামাইয়া বলিলেন, “আর দেখান হইল না; ঐরূপে উপবিষ্ট হইলেই উদ্দীপনা হইয়া মন তন্ময় ও সমাধিলীন হয় এবং বায়ু উর্দ্ধগামী হওয়ায় গলদেশের ক্ষতস্থানে আঘাত লাগে; ডাক্তার ঐজন্য সমাধি যাহাতে না হয় তাহা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে।” যুবক তাহাতে কাতর হইয়া বলিল, “আপনি কেন ঐ সকল দেখাইতে যাইলেন, আমি ত দেখিতে চাহি নাই।” তিনি তদুত্তরে বলিলেন, “তা ত বটে, কিন্তু তোদের একটু-আধটু না বলিয়া, না দেখাইয়া থাকিতে পারি কৈ?” যুবক ঐ কথায় বিস্মিত হইয়া ঠাকুরের অপার করুণা এবং তাহার মনের অলৌকিক সমাধিপ্রবণতার কথা ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ঠাকুরের প্রতি কার্য্যের মাধুর্য্য ও অসাধারণত্ব দেখিয়া অনেকের আকৃষ্ট হওয়া

দৃষ্টান্ত–উপেন্দ্র মুনসেফ

ঠাকুরের দৈনন্দিন ব্যবহারসকলের মধ্যেও এমন মাধুর্য্য ও অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত যে, নবাগত অনেক ব্যক্তি তাহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপে নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি আমরা মহাকৰি গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবৎসল কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলায়। যথাসম্ভব তাহারই ভাষায় আমরা উহা

লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব—“উপেন্দ্র[5] আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, বিদেশে ডেপুটিগিরি চাকরি করিত। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে তাহাকে চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, ‘এবার যখন আসিবে তখন তোমাকে এক অদ্‌ভুত জিনিস দেখাব’। বড়দিনের ছুটিতে আসিয়া সে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিল। আমি বলিলাম, ‘মনে করেছিলাম তোমায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখাব—কিন্তু এখন তার অসুখ, শ্যামপুকুরে আছেন, কথা কহিতে ডাক্তারের বারণ—তুমি নূতন লোক, তোমায় এখন কেমন করিয়া লইয়া যাই? সে দিন গেল। তাহার পর উপেন্দ্র আর একদিন মেজদাদার (গিরিশচন্দ্রের) সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, ঠাকুরের কথা উঠিল এবং মেজদাদা তাহাকে বলিলেন, ‘যা না একদিন অতুলের সঙ্গে, তাঁকে দেখতে’। উপেন বলিল, “উনি তো ছয় মাস (পূর্ব) হইতে বলিতেছিলেন লইয়া যাইব, কিন্তু যখন এখানে আসিয়া সেই কথা বললাম, তখন বলিলেন—এখন হইবে না”। আমি শুনিয়া মেজদাদাকে বলিলাম, ‘আমরাই এখন সব সময়ে ঢুকিতে পাই না, নূতন লোককে কেমন করিয়া লইয়া যাই। মেজদাদা বলিলেন, ‘তাহা হউক, তবু একদিন লইয়া যা, তাহার পরে ওর অদৃষ্টে থাকে তিনি ওকে দর্শন দিবেন, আদর করিবেন’।

উপেন্দ্রের শ্যামপুকুরে আগমন ও ঠাকুরের সপ্রেম ব্যবহারে উপলব্ধি

“তাহার পর একদিন অপরাহ্নে উপেনকে লইয়া যাইলাম। সেদিন ঠাকুরের ঘরে তাহার বিছানার নিকট হইতে দুটি সপ বিছাইয়া একঘর লোক বসিয়া, আর নানারকম আজে-বাজে কথা হইতেছে—যেমন, ছবি আঁকার কথা (কারণ চিত্রবিদ্যাকুশল অনুদা বাগচী সেদিন সেখানে ছিল), সেকরার দোকানে সোনারূপা গলানর কথা[6] ইত্যাদি। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলাম, (ঐরূপ কথা ভিন্ন) একটিও ভাল কথা হইল না! ভাবিতে লাগিলাম, আজ এই নূতন লোকটিকে লইয়া আসিলাম আর আজই যত আজেবাজে কথা! ও (উপেন) ঠাকুরের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব লইয়া যাইবে!–ভাবিয়া আমার মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যতবার দেখিলাম, দেখিলাম তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন—যেন ঐ সকল কথায় সে বেশ আনন্দ পাইতেছে। তখন ইসারা করিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলাম, সে তাহাতে আর একটু বসিতে ইশারায় জানাইল। ঐরূপে দুই-তিন বার ইসারা করার পরে সে উঠিয়া আসিল। তখন তাহাকে বলিলাম, “কি শুনছিলি এতক্ষণ? ঐসব কথায় শুনিবার কি আছে বল দেখি? সাধে তোকে ‘বাঙাল’ বলি!” তাহার কপালে একটি উলকির টিপ ছিল বলিয়া তাহাকে আমরা ঐরূপ বলিতাম। সে বলিল, “না হে, বেশ শুনিতেছিলাম। পূর্বে universal love (সকলের প্রতি সমান ভালবাসা) কথাটা শুনেছি, কিন্তু কাহাতেও উহার প্রকাশ দেখি নাই। সকল বিষয় লইয়া সকলের সঙ্গে উহাকে (ঠাকুরকে) আনন্দ করিতে দেখিয়া আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু আর একদিন আসিতে হইবে—আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিব”।

“তাহার পর একদিন প্রাতে উপেনকে লইয়া যাইলাম। তখন ঠাকুরের নিকটে বড় একটা কেহ নাই-কেবল, সেবকদিগের দুই-এক জন ও আমার ভগ্নীপতি ‘মল্লিক মহাশয়’ ছিলেন। যাইবার পূর্বে উপেনকে পৈ-পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, ‘যাহা জিজ্ঞাসা করিবার স্বয়ং করিবি, তাহা হইলে মনের মত উত্তর পাইবি; কাহাকেও দিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করাইবি না’। কিন্তু সে মুখচোরা ছিল, যাহা বারণ করিয়াছিলাম এখানে আসিয়া তাহাই করিয়া বসিল-মল্লিক মহাশয়ের দ্বারা প্রশ্ন করাইল। ঠাকুর উত্তর করিলেন, কিন্তু উপেনের মুখের ভাবে বুঝিলাম উত্তরটি তাহার মনের মত হইল না। তখন আমি তাহাকে পুনরায় চুপি-চুপি বলিলাম, ‘ঐরূপ ত হবেই, আমি যে তোকে বার বার বলে এলাম, যা জিজ্ঞাসা করবার আপনি করবি; নিজে জিজ্ঞাসা কর না, মোক্তার ধরেছিস কেন?’

ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুই-ই—যেমন জল আর বরফ

"সাহস করিয়া সে এইবার স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? আর যদি দুই-ই হন, তাহা হলে একসঙ্গে ঐরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের দুই কেমন করিয়া হইতে পারেন? ঠাকুর শুনিয়াই বলিলেন, 'তিনি (ঈশ্বর) সাকার নিরাকার দুই-ই–যেমন জল, আর বরফ'। উপেন কলেজে বিজ্ঞান (Science course) লইয়াছিল, তজ্জন্য ঠাকুরের পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত তাহার মনের মত হইল এবং উহার সহায়ে সে তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া আনন্দিত হইল। ঐ প্রশ্নটি করিয়াই কিন্তু সে নিরস্ত হইল এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপেন, তুমি তিনটি প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে, একটি মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই উঠিয়া আসিলে কেন?" সে তাহাতে বলিল, "তাহা বুঝি বুঝ নাই–ঐ এক উত্তরে আমার তিনটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে"।

রামদাদার কথায় অতুলের বিরক্তি

"তোমার মনে আছে বোধ হয়, রামদাদা[7] এই সময়ে প্রায়ই বাটীতে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আফিসের কাপড় চোপড় সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের নিকটে আসিতেন এবং দুই এক ঘণ্টা এখানে কাটাইয়া বেশপরিবর্তনপূর্বক কর্মস্থলে চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর যখন আজ উপেনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, তখন তিনি আফিসে যাইবার বেশ পরিতে পরিতে ঐ ঘরে সহসা আসিয়া ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। আমরা যেমন বাহিরে আসিয়াছি অমনি রামদাদা বলিয়া উঠিলেন, "অতুলদাদা, ওঁকে (উপেনকে) এদিকে নিয়ে এস; ঠাকুর ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বড় শক্ত কথা বলিয়াছেন, উনি বুঝিতে পারিবেন না। আমার এই বইখানা[৪] ওঁকে পড়িতে হইবে, তবে উনি ঠাকুরের ঐকথা বুঝিতে পারিবেন"। ঐকথা শুনিয়া আমার ভারি রাগ হইল, বলিয়া ফেলিলাম, 'রামদাদা, তুমি না আমাদের চেয়ে সাত বৎসর আগে ঠাকুরকে দেখেছ ও তার কাছে যাওয়া আসা করছ? উনি (ঠাকুর) যা বললেন তা বুঝতে পারবে না, আর তোমার বই পড়ে উনি যা বোঝাতে পারলেন না তা বুঝতে পারবে! এটা তোমার কেমনতর কথা? তবে উপেনকে তোমার বইখানা পড়তে দেবে দাও-সেটা আলাদা কথা'। রামাদাদা ঐ কথায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া পুস্তকখানি উপেনকে দিলেন।"

[1] কে জানে মন কালী কেমন।

ষড়দর্শনে না পায় দরশন।।

কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।

তাকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।।

আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।

তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।।

মায়ের উদর ব্রহ্মান্ডভান্ড, প্রকান্ড তা মান কেমন।

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।।

প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুগমন।

আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন।।

(গায়ক ভুল করিয়া 'প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না' গাহিয়াছিল)

[2] অর্থাৎ-ষোল আনার উপর চারি-পাঁচ আনা অধিক বিশ্বাস।

[3] সারদাপ্রসন্ন ১৮৮৪ খৃঃ-এর ডিসেম্বরের মধ্যে আসিয়াছিলেন–‘কথামৃত’ ২য় ভাগ, ২১৫ পৃঃ এবং ১ম ভাগ, ৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।–প্রঃ

[4] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রথম পরিচয় হয় এখানে। ইহার ২/৩ বৎসর পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র–তাহার লিখিত ‘শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি’, ‘উদ্বোধন’, ৩৯শ বর্ষ, ভাদ্র-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।–প্রঃ

[5] শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইনি শ্যামবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভুগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কোন আত্মীয়াকে বিবাহ করেন এবং মুন্সেফ ছিলেন।

[6] সেকরাদিগের সোনারূপা চুরি করিবার দক্ষতা সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদিগকে একটি মজার গল্প সময়ে সময়ে বলিতেন। অতুল বাবু এখানে এ গল্পটির ইঙ্গিত করিয়াছেন। গল্পটি ইহাই–কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে এক ব্যক্তি একখানি গহনা বিক্রয়ের জন্য এক স্বর্ণকারের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিলকাঙ্কিত সর্বাঙ্গ শিখামাল্যধারী বৃদ্ধ স্বর্ণকার সম্মুখে বলিয়া গম্ভীরভাবে হরিনামকরিতেছে এবং তাহার তিন-চার জন সহকারী ঐরূপ তিলকমালাদি ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে নানাবিধ অলঙ্কারগঠনে নিযুক্ত আছে। বৃদ্ধ স্বর্ণকার ও তাহার সহকারীদিগের সাত্বিক বেশভূষা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি ও তাহার বন্ধুগণ ভাবিল–ইহারা ধার্মিক, আমাদিগকে ঠকাইবে না। পরে যে অলঙ্কারখানি তারা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তাহা বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া উহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করিল। বৃদ্ধও তাহাদিগকে সাদরে বসাইয়া একজন সহকারীকে তামাকু দিতে বলিল এবং কষ্টিপাথরে কষিয়া অলঙ্কারের স্বর্ণের দাম বলিয়া তাহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্বক উহাঁ গলাইবার নিমিত্ত গৃহমধ্যস্থ এক সহকারীর হস্তে প্রদান করিল। সেও উহা তৎক্ষণাৎ গলাইতে আরম্ভ করিয়া সহসা দেবতার স্মরণপুর্বক বলিয়া উঠিল, ‘কেশব, কেশব’। ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, ‘গোপাল, গোপাল’। গৃহমধ্যস্থ এক সহকারী উহার পরেই বলিয়া উঠিল, ‘হরি, হরি, হরি’। যে তামাকু আনিয়াছিল সে ইতিমধ্যে কলিকাটি আগন্তুকদিগকে প্রদানপূর্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, ‘হর, হর, হর’। ঐরূপ বলিবামাত্র প্রথমোক্ত সহকারী কতকটা গলিত স্বর্ণ সম্মুখস্থ বারিপূর্ণ পাত্রে দক্ষতার সহিত নিক্ষেপ করিয়া আত্মসাৎ করিল। স্বর্ণকার ও তাহার সহকারিগণ শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত নামসকল যে ভিন্নার্থে ব্যবহার করিতেছে, অর্থাৎ ‘কেশব’ না বলিয়া ‘কে সব’–-ইহারা চতুর অথবা নির্বোধ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং ঐ প্রশ্নের উত্তররূপেই ‘গোপাল’ অথবা গরুর পালের ন্যায় নির্বোধ, এই কথা বলিতেছে এবং ‘হরি’ ও ‘হর’ শব্দদ্বয় ‘অপহরণ করি’ ও ‘কর’ এই অর্থে উচ্চারণ করিতেছে–একথা বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক ব্যক্তিগণ ইহাদিগের ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া নিশ্চিন্তমনে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। অনন্তর গলিত স্বর্ণ ওজন করাইয়া উহার মূল্য লইয়া তাহারা প্রসন্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

ঠাকুরের পরম ভক্ত অধরচন্দ্র সেনের ভবনে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যেদিন তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেদিন বঙ্কিম বাবু সন্দেহবাদীর পক্ষাবলম্বনপূর্বক ঠাকুরকে ধর্মবিষয়ক নানা কূট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ সকলের যথাযথ উত্তর দিবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিহাসপূর্বক বলিয়াছিলেন, “তুমি নামেও বঙ্কিম, কাজেও বঙ্কিম।” প্রশ্নসকলের হৃদয়স্পর্শী উত্তর লাভে প্রীত হইয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, “মহাশয়, আপনাকে একদিন আমাদের কাঁঠালপাড়া বাটীতে যাইতে হইবে, সেখানে ঠাকুরসেবার বন্দোবস্ত আছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম করিয়া থাকি।” ঠাকুর তাহাতে রহস্যপূর্বক বলিয়াছিলেন, “কেমনতর হরিনাম গো, সেকরাদের মত নয় ত?”–-বলিয়াই পূর্বোক্ত গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন এবং সভামধ্যে হাস্যের রোল উঠিয়াছিল।

[7] শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত

[৪] শ্রীরামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা'।

৫.২০. দ্বাদশ অধ্যায়–তৃতীয় পাদ: ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

ঠাকুরের নিজ সূক্ষ্মশরীরে ক্ষত দর্শন–অপরের পাপভার গ্রহণ-কারণ ঐরূপ হওয়া ও উহার ফল

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের এক দিবস এক অদ্‌ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাহার গলার সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া তিনি ঐরূপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, নানারূপ দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া লোকে তাঁহাকে স্পর্শপূর্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরূপে তাহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণসাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ পূর্বক দুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, একথা আমরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং পূর্বোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে এখন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্র বোধ হইল না এবং উহাতে তাঁহার অপার করুণার কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের শরীর পূর্বের ন্যায় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যাহাতে কোন নূতন লোক আসিয়া তাহার চরণ স্পর্শপূর্বক প্রণাম না করে, তদ্বিষয়ে ভক্তদিগের–বিশেষতঃ যুবক-ভক্তদিগের ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াস উপস্থিত হইল এবং ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার পূর্বজীবনের উচ্ছলতার কথা স্বরণপূর্বক এখন হইতে ঠাকুরের পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করিবেন না, এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিলেন। আবার নরেন্দ্র প্রমুখ বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া অন্যকৃত কর্মের জন্য অন্যের স্বেচ্ছায় ফলভোগ করারূপ যে মতবাদ খৃষ্টান, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন কোন ধর্মের মূলভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, উহাতে তাহারই সত্যতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া, ঐ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন।

ভক্তগণের নবাগত ব্যক্তিসকলের সম্বন্ধে নিয়মবন্ধন

ঠাকুরের নিকটে নূতন লোকের গমনাগমন নিবারণের চেষ্টা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "চেষ্টা করিতেছ কর, কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে-কারণ, উনি (ঠাকুর) যে ঐজন্যই দেহধারণ করিয়াছেন।" ফলে দেখা গেল, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকসকলকে নিষেধ করিতে পারিলেও ভক্তগণের পরিচিত নবাগত ব্যক্তিসকলকে নিবারণ করা সম্ভবপর হইল না। সুতরাং নিয়ম হইল, ভক্তগণের মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত কাহাকেও ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং ঐরূপ ব্যক্তি সকলকে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহার কাহারও ব্যাকুলতা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইতে লাগিল।

কালীপদের সাহায্যে অভিনেত্রীর ঠাকুরকে দর্শন

ঐরূপ নিয়ম লইয়া একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্মমূলক নাটক বিশেষের অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর একদিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ঐদিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদ-বন্দনা করিবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিল। তদবধি সে তাহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত এবং আর এক দিবস তাহার পুণ্যদর্শন লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনয়-বিনয়পূর্বক ঐ বিষয়ের জন্য তাহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধারণা করায় দুষ্কৃতকারী অনুতপ্ত হইয়া তাহার চরণস্পর্শ করিলে তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইবে–এ কথায় আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাহার মনে কোনরূপ দ্বিধা বা ভয় আসিল না। গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি তাহাকে পুরুষের ন্যায় 'হ্যাট কোটে' সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকটে পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই অভিনেত্রী ঐরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসাপূর্বক তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই-চারিটি তত্ত্ব-কথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্য-পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।

ভক্তগণের মধ্যে ভাবুকতা বৃদ্ধির কারণ

ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং তাহার সেবা করিবার ফলে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তি-বিশ্বাস দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকিলেও, এক বিষয়ে তাহাদিগের মনের গতির বিপদসঙ্কুল বিপরীত পথে যাইবার সম্ভাবনা এখন উপস্থিত হইয়াছিল। কঠোর ত্যাগ এবং কষ্টসাধ্য সংযমের আদর্শ অপেক্ষা সাময়িক ভাবের উচ্ছাসই তাহাদিগের নিকটে এক্ষণে অধিকতর প্রিয় হইতেছিল। ত্যাগ ও সংযমকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বনপূর্বক উদিত না হইলে ঐ প্রকার ভাবোচ্ছাসসকল ধর্ম মূলক হইলেও যে মানবকে কাম-ক্রোধাদি রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার সামর্থ্য দিতে পারে না, একথা তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না। ঐরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ একে একে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে সহজ বা সুখসাধ্য পথ ও বিষয়কে অবলম্বন করিতে যাওয়াই মানবের সাধারণ

প্রকৃতি। ধর্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়াও সে ঐ সংসার ও ঈশ্বরভোগ ও ত্যাগ উভয় দিক রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। ভাগ্যবান কোন কোন ব্যক্তিই তদুভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করে এবং ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগরূপ আদর্শকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া অনেকটা মাইয়া না আনিলে যে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব, একথা বুঝিয়া ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয় না। ঐরূপে উভয় দিক রক্ষা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে, তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শের দিকে এতটা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য ভাবিয়া সীমা নির্দেশপূর্বক চিরকালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া বসে। ঠাকুর ঐজন্য কেহ তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সে ঐরূপে নোঙর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে কি না এবং ঐরূপ করিয়াছে বুঝিলে ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগ রূপ আদর্শের সে যতটা লইতে পারিবে ততটা মাত্র প্রথমে তাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন। ঐজন্যই দেখা যাইত, অধিকারিভেদে তাঁহার উপদেশ বিভিন্ন প্রকারের হইতেছে অথবা তাহার গৃহী ও যুবক-ভক্তদিগকে তিনি সাধন সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিতেছেন। এজন্যই আবার সর্বসাধারণকে উপদেশ দিবার কালে তিনি বলিতেন, 'কলিতে কেবলমাত্র হরির নামসঙ্কীর্ত্তন ও নারদীয়-ভক্তি।" সাধারণের মধ্যে তখন ধর্ম ও শাস্ত্র-চর্চা এতটা লুপ্ত হইয়াছিল যে, 'নারদীয়-ভক্তি' কথার অর্থও শতের মধ্যে একজন বুঝিত কিনা সন্দেহ। উহাতেও যে ঈশ্বর-প্রেমে সর্বস্ব ত্যাগের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, একথা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইত না। সুতরাং ঠাকুরের অনভিজ্ঞ ভক্তগণ যে দুর্বল প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া সময়ে সময়ে সংসার ও ধর্ম উভয় বজায় রাখিবার ভ্রমে পতিত হইবেন এবং সুখসাধ্য ভাবুকতার বৃদ্ধিটাকেই ধর্মলাভের চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইবেন, একথা বিচিত্র নহে।

আবার ঠাকুরের কঠোর সংযম ও তপস্যাদি আমরা তাহার নিকটে যাইবার পুর্বে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহার অলৌকিক ভাবুকতা কোন্ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাওয়া ভক্তগণের ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত কারণ উপস্থিত হইল, যখন গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রয় লাভ এবং তাহাকে যুগাবতার বলিয়া স্থির ধারণাপূর্বক প্রাণের উল্লাসে সাধারণের সম্মুখে ঐ কথা হাঁকিয়া ডাকিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা ইতিপূর্বে অনেকের প্রাণে উপস্থিত হইলেও তাহারা সকলে তাহার নিষেধ মানিয়া ঐ বিষয় প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল–কারণ ঠাকুর চিরকাল একথা বলিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার দেহরক্ষার অনতিকাল পূর্বেই বহুলোকে তাঁহাকে ঈশ্বরবতায় বলিয়া জানিতে পারিবে। গিরিশচন্দ্রের মনের গঠন অন্যরূপ ছিল, তিনি দুষ্কর্ম বা সুকর্ম যাহা কিছু করিয়াছেন আজীবন কখনও লুকাইয়া করিতে পারেন নাই, সুতরাং ঐ বিষয়েও ঠাকুরের নিষেধ মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তাহার প্রখর বুদ্ধি, উচ্চাবচ ঘটনা বলপূর্ণ বিচিত্র জীবন এবং প্রাণের অসীম উৎসাহ ও বিশ্বাসই যে তাঁহাকে ঠাকুরের দিব্যশক্তির অনন্ত প্রভাবের কথা বুঝাইয়া তাহার হতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে সহায়তা করিয়াছে, একথা ভুলিয়া যাইয়া তিনি স্বয়ং যাহা করিয়াছেন তাহাই করিবার জন্য সকলকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ফলে আন্তরিকতার পরিবর্তে লোকে মুখে বকা দিয়াছি, আত্মসমর্পণ করিয়াছি ইত্যাদি বলিয়া সাধন, ভজন, ত্যাগ ও তপস্যাদির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষাপূর্বক ধর্মলাভ ব্যাপারটাকে সুখসাধ্য করিয়া লইল। ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অসীম ভালবাসা ঐ বিষয় প্রচারের পথে অন্তরায় হইতে পারি, কিন্তু তাহার বুদ্ধি তাহাকে বুঝাইয়া দিল যুগযুগান্তের গ্লানি দূরপূর্বক অভিনব ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য যাহার দেহধারণ এবং ত্রিতাপে তাপিত জীবকুলকে আশ্রয় দিবার জন্যই যিনি জন্মজরাদি দুঃখ-কষ্ট স্বেচ্ছায় বহন করিতেছেন, অভীষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহার দেহাবসান কখন সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঠাকুরের আশ্রয় লাভপূর্বক লোকে তাহার ন্যায় শান্তি ও দিবব্যাঙ্গাসের অধিকারী হইবে বলিয়া তিনি যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহাতে দূষণীয় কিছুই নাই।

উহার বৃদ্ধি বিষয়ে গিরিশের অনুসরণে রামচন্দ্রের চেষ্টা

গিরিশচন্দ্রের প্রখর বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের সম্মুখে রামচন্দ্র প্রমুখ অনেক প্রবীণ গৃহী ভক্তের বুদ্ধি তখন ভাসিয়া গিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, রামচন্দ্র বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং দিব্যশক্তির বিকাশ দেখিয়া তিনি যে ঠাকুরকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, ইহা বিচিত্র বিষয়ে নহে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রচারের পূর্বে তিনি উহা অনেকটা রাখিয়া-ঢাকিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতেন। এখন গিরিশচন্দ্রের সহায়তা পাইয়া তাহার উৎসাহ ঐ বিষয়ে সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি এখন ঠাকুরকে অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, কিন্তু তাহার ভক্তগণ গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণাবতারে কে কোন সাঙ্গোপাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তদ্বিষয়ের জল্পনাও করিতে লাগিলেন এবং বলা বাহুল্য, সাময়িক ভাবুকতার উচ্ছাসে যাহাদিগের এখন শারীরিক বিকৃতি এবং কখন কখন বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইতেছিল, তাহারা তৎকৃত সিদ্ধান্তে উচ্চস্থান লাভ করিতে থাকিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঐ বিষয়ে সহায়তা

ঠাকুরের যুগাবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ভক্তগণের অনেকে যখন ঐরূপে ভাবুকতার উচ্ছাসে অঙ্গ ঢালিতেছিল, তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা হইতে আগমন এবং ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, তিনি ঢাকায় গৃহমধ্যে বসিয়া ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তথায় সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি (বিজয়) তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছিলেন[1]—অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের ন্যায় ফলদ হইয়াছিল। ঐরূপে নানা প্রকারে ভাবুকতার বৃদ্ধিতে ভক্তগণের মধ্যে পাঁচ-সাত জনের তখন ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্র বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ ও শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইতেছিল এবং অনেকেই সহজ-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিচারের প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঠাকুরের দৈবশক্তি প্রভাবে কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসিবে, এইরূপ একটা ভাব লইয়া সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইতেছিল।

নরেন্দ্রের ঐ বিষয় খর্ব করিয়া ভক্তদিগের মধ্যে ত্যাগ-সংযমাদি বৃদ্ধির চেষ্টা—ঠাকুর ঐ চেষ্টা করেন নাই কেন

ঐরূপে ভাবুকতার বৃদ্ধিই যখন ধর্মের চূড়ান্ত বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরিগণিত হইতেছিল, তখন ত্যাগ, সংযম ও নিষ্ঠাদির তুলনায় উহা যে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু এবং উহার নির্বাধ প্রশ্রয়ে ভবিষ্যতে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে—একথা ঠাকুর যাহাকে ভক্তগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চাসন সর্বদা প্রদান করিতেন, সেই সূক্ষ্মদর্শী নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি ঐ বিষয় বুঝাইয়া উহার হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তগণের ঐরূপে বিপথে যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়াও ঠাকুর নিশ্চেষ্ট ছিলেন কেন? উত্তরে বলা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কিন্তু যে ভাবুকতায় কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই, তাহাকে ঈশ্বয়লাভের অন্যতম পথ জানিয়া ঐসকল ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ঐপথের যথার্থ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ঐ পথে চালিত করিবার সময় ও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন—কারণ, তাঁহাকে আমরা বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, 'ইচ্ছা করিলেই সহসা কোন বিষয় সংসিদ্ধ হয় না, কালে হইয়া থাকে', অথবা ঐ বিষয়ের সিদ্ধি উপযুক্ত কালের আগমন প্রতীক্ষা করে। হইতেও পারে, ভক্তগণের ঐ ভ্রম দূর করিতে নরেন্দ্রনাথকে বদ্ধপরিকর দেখিয়া ঠাকুর উহার ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিলেন, অথবা নরেন্দ্রনাথকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঐ বিষয় সংসিদ্ধ করাই তাঁহার অভীপ্সিত ছিল।

জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনে না বলিয়া ভাবুকতার মূল্য নাই

দৃঢ়বদ্ধ শরীর এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ মন-বিশিষ্ট যুবক ভক্তমণ্ডলীই তাহার কথা সহজে ধরিতে-বুঝিতে পারিবে ভাবিয়া নরেন্দ্রনাথ নানা যুক্তিতর্ক সহায়ে তাহাদিগকে সর্বদা বলিতে লাগিলেন,

“যে ভাবোচ্ছ্বাস মানব জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন উপস্থিত না করে, যাহার প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরক্ষণে কামকাঞ্চনের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তাহার গভীরতা নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও অতি অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিকৃতি যথা অশ্রু পুলকানি, অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোগ হইলেও তাঁহার নিশ্চয় ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্বল্যপ্রসূত; মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশ্য কর্তব্য।”

অশ্রুপুলকাদি শারীরিক বিকৃতির মধ্যে অনেক সময় কৃত্রিমতা থাকে

নরেন্দ্র বলিতেন, “ঐরূপ অঙ্গবিকার এবং বাহ্যসংজ্ঞা লোপের ভিতর অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। সংযমের বাঁধ যত উচ্চ এবং দৃঢ় হইবে মানসিক ভাব তত গভীর হইতে থাকিবে, এবং বিরল কোন কোন ব্যক্তির জীবনেই আধ্যাত্মিক ভাবরাশি প্রবলতায় উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া ঐরূপ সংযমের বাধকেও অতিক্রম পূর্বক অঙ্গবিকার এবং বাহ্যসংজ্ঞার বিলোপরূপে প্রকাশিত হয়। নির্বোধ মানব ঐকথা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবিয়া বলে। সে মনে করে, ঐরূপ অঙ্গবিকৃতি ও সংবিলুপ্তির ফলেই বুঝি ভাবের গভীরতা সম্পাদিত হয় এবং তজ্জন্য ঐ সকল যাহাতে তাহার শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা করিতে থাকে। ঐরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তাহার স্নায়ুসকল দিন দিন দুর্বল হইয়া ঈষন্মাত্র ভাবের উদয়েও তাহাতে ঐ বিকৃতিসকল উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ প্রশ্রয়ে মানব চরমে চিররুগ্ন অথবা বাতুল হইয়া যায়। ধর্মসাধনে অগ্রসর হইয়া শতকরা আশী জন জুয়াচোর এবং পনর জন আন্দাজ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচজন মাত্র পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়া থাকে। অতএব সাবধান।”

কোন কোন ভক্তের আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্রের কথা বিশ্বাস

নরেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত কথাসকল সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কিন্তু অনতিকাল পরে ঘটনাচক্রে যখন জানিতে পারা গেল নির্জনে বসিয়া ভাবোদ্দীপক পদাবলী গাহিতে গাহিতে অনুরূপ অঙ্গবিকৃতিসকল আনয়নের জন্য জনৈক ভক্ত চেষ্টা করিয়া থাকে–ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক বিলোপ হইলে অপর জনৈক ভক্ত যেরূপ মধুর নৃত্য করে, সেইরূপ নৃত্য সে পূর্বে অভ্যাস করিয়াছিল–এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তির নৃত্য দেখিবার স্বল্পকাল পরে অপর এক ব্যক্তিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার (নরেন্দ্রনাথের) কথার সত্যতা আমাদিগের অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। আবার, জনৈক ভক্তের পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ হইতে দেখিয়া যেদিন তিনি তাহাকে বিরলে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া ভাবসংযম অভ্যাস ও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং এক পক্ষকাল ঐরূপ করিবার ফলে সে যখন অনেকটা সুস্থ ও সংযত হইতে পারিল, তখন নরেন্দ্রনাথের কথায় অনেকে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তাহাদিগের ন্যায় ভাবাবেশে অঙ্গবিকৃতি ও বাহ্যসংজ্ঞাবিলুপ্তি হয় নাই বলিয়া আপনাদিগকে অভাগ্যবান্ বলিয়া আর ধারণা করিতে পারিল না।

ভাবুকতা লইয়া নরেন্দ্রের ব্যঙ্গ পরিহাস–দানা ও সখী

যুক্তিতর্ক অবলম্বনে ঐবিষয় প্রচার করিয়াই নরেন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু কাহারও ভাবুকতায় কিছুমাত্র কৃত্রিমতার সন্ধান পাইলে ঐ বিষয় লইয়া সকলের সমক্ষে ব্যঙ্গ পরিহাসে তাহাকে সময়ে সময়ে বিশেষ অপ্রতিভ করিতেন। আবার, পুরুষের স্ত্রীজনোচিত ভাবানুকরণ, যথা–বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত সখীভাবাদি সাধনাভ্যাস কখন কখন কিরূপ হাস্যাস্পদ আকার ধারণ করে, তদ্বিষয়ে প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি ভক্তদিগের মধ্যে পরিহাস কখন কখন হাস্যের রোল তুলিতেন এবং আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ঐরূপ ভাবপ্রবণতা ছিল, তাহাদিগকে সখী-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া

নির্দেশ করিয়া পরিহাস করিতেন। ফলকথা, ধর্মসাধনে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া পুরুষ নিজ পুরুষকার, তত্ত্বানুসন্ধানপ্রবৃত্তি, ওজস্বিতাদি বিসর্জন দিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিবে এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবানুকরণ, বৈষ্ণবপদাবলী ও রোদনমাত্র অবলম্বন করিবে ইহা- পুরুষসিংহ নরেন্দ্রনাথ একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তজ্জন্য ঠাকুরের পুরুষভাবাশ্রয়ী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তদিগকে 'শিবের ভুত অথবা দানা-শ্রেণীভুক্ত' বলিয়া পরিহাসপূর্ব্বক নির্দেশ করিতেন এবং তদ্বিপরীত সকলকে পূর্বোক্তরূপে 'সখী-শ্রেণীভুক্ত' বলিতেন।

ভাবুকতার স্থলে যথার্থ বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রেম প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা

ঐরূপে যুক্তিতর্কে এবং ব্যঙ্গ পরিহাস সহায়ে ভাবুকতার গণ্ডী ভগ্ন করিয়াই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হন নাই। কাহারও কোনরূপ ভাব ভঙ্গ করিয়া তাহার স্থলে অবলম্বনস্বরূপে অন্য ভাব যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, ততক্ষণ প্রচার-কার্য্য সুসম্পন্ন ও ফলদ হয় না–একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং তজ্জন্য ঐ বিষয়ে এখন হইতে বিশেষ প্রয়াস ও ঈশ্বরপ্রেম পাইয়াছিলেন। অবসরকালে যুবক-ভক্তসকলকে দলবদ্ধ করিয়া তিনি সংসারের অনিত্যতা, বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরভক্তিমূলক সঙ্গীতসকল তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গাহিয়া তাহাদিগের প্রাণে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং ভক্তিভাব অনুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া অনেকে তখন তাহার মধুর সুরলহরী উৎক্ষিপ্ত 'কেয়া দেলমান তামিল পেয়ারা আখের মাট্টিমে মিল যানা', অথবা–'জীবন মধুময় তব নামগানে হয় হে, অমৃতসিন্ধু চিদানন্দঘন হে', অথবা–

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং

ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।

ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।।

ঠাকুরকে ভালবাসিলে তাঁহার সদৃশ জীবন হইবে

প্রভৃতি সঙ্গীত ও স্তবাদি শ্রবণে বৈরাগ্য ও ঈশ্বর-প্রেমের উত্তেজনায় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ঠাকুরের জীবনের গভীর ঈশ্বরানুরাগপ্রসূত সাধন-কথাসকল বিবৃত করিয়া কখন বা তিনি তাহাদিগকে তাঁহার তাহার মহিমাজ্ঞাপনে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেন এবং 'ঈশানুসরণ' গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, 'প্রভুকে যে যথার্থ ভালবাসিবে তাহার জীবন সর্বতোভাবে শ্রীপ্রভুর জীবনের অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইয়া উঠিবে,অতএব ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক ভালবাসি কি-না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহা হইতেই পাওয়া যাইবে'। আবার 'অদ্বৈত-খান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা কর'–ঠাকুরের ঐকথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহার সকলপ্রকার ভাবুকতা ঐ জ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইয়া থাকে–অতএব ঐ জ্ঞান যাহাতে সর্বাগ্রে লাভ করিতে পারা যায় তজ্জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

ভক্তগণকে নতুন তত্ত্বসকল পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করাইবার চেষ্টা

নূতন তত্ত্বসকলের পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণে তিনি তাহাদিগকে অনেক সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। আমাদের স্মরণ আছে, ধ্যান বা চিত্তৈকাগ্রতা সহায়ে আপনার ও অপরের শারীরিক ব্যাধি দূর করা যাইতে পারে, ঐকথা শুনিয়া তিনি একদিন আমাদিগকে একত্র মিলিত করিয়া ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দুর করিবার মানসে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে ঐরূপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপ আবার, অযুক্তিকর বিষয়সকল হইতে ভক্তগণ যাহাতে দূরে অবস্থান করে,

তদ্বিষয়েও তিনি সর্বদা প্রয়াস পাইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে–

মহিম চক্রবর্তীর লোকমান্যলাভের লালসা

মতিঝিলের দক্ষিণাংশ যথায় কাশীপুরের রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর পাশে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাটী ছিল। নানা সদগুণভূষিত হইলেও চক্রবর্তী মহাশয় লোকমান্যের জন্য নিরন্তর লালায়িত ছিলেন। বোধ হয় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি লোকমান্য পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কিসে লোকে তাঁহাকে ধনী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধার্মিক, দানশীল ইত্যাদি যাবতীয় সদগুণশালী বলিবে, এই ভাবনা তাহার জীবনের প্রত্যেক কার্য নিয়মিত করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে লোকের নিকটে হাস্যাস্পদ করিয়াও তুলিত। চক্রবর্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, 'প্রাচ্য-আর্য্য-শিক্ষা কাণ্ড-পরিষৎ', তাহার একমাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, 'মৃগাঙ্ক মৌলী পূততুণ্ডী, বাটীতে একটি হরিণ ছিল তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন, 'কপিঞ্জল'। কারণ তাহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির ছোটখাট সরল নাম রাখা কি শোভা পায়? তাহার ইংরাজী, সংস্কৃত নানা গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল। আলাপ হইবার পরে একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বাটীতে যাইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'চক্রবর্তী মহাশয়, আপনি এত গ্রন্থ সব পড়িয়াছেন?' উত্তরে তিনি সবিনয়ে উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নরেন্দ্র উহার মধ্যস্থিত কতকগুলি গ্রন্থ বাহির করিয়া উহাদিগের পাতা কাটা নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'কি জান ভায়া, লোকে আমার পড়া পুস্তকগুলি লইয়া যাইয়া আর ফিরাইয়া দেয় নাই, তাহার স্থলে এই পুস্তকগুলি পুনরায় কিনিয়া রাখিয়াছি, এখন আর কাহাকেও পুস্তক লইয়া যাইতে দিই না। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বল্প দিনেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চক্রবর্তী মহাশয়ের সংগৃহীত যাবতীয় পুস্তকেরই পাতা কাটা নাই! সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ যে তিনি কেবলমাত্র লোকমান্যলাভ ও গৃহশোভা বন্ধনের জন্য রাখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে নরেন্দ্রের একরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল।

জ্ঞানী মহিমের ব্যাঘ্রাজিন

আমাদের সহিত আলাপ হইবার কালে ধর্মসাধনার কথাপ্রসঙ্গে চক্রবর্তী মহাশয় আপনাকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া পরিচয় দিয়া ছিলেন। কলিকাতাবাসী ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার বহু বৎসর পূর্ব হইতে মহিমাচরণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং কোন কোন পর্বদিবসে পঞ্চবটীতলে ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া গেরুয়াবস্ত্র পরিধান, রুদ্রাক্ষ ধারণ ও একতারা গ্রহণপূর্বক আড়ম্বর করিয়া সাধনায় বসিতেন। গৃহে ফিরিবার কালে ব্যাঘ্রাজিনখানি ঠাকুরের ঘরের এক কোণে দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। ঠাকুর তাহাকে 'এক আঁচড়ে'ই চিনিয়া লইয়াছিলেন। কারণ ঐ ব্যাম্রাজিন খানি কাহার, একথা আমাদিগের একজন এক দিবস প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিলেন, "ওখানি মহিম চক্রবর্তী রাখিয়া গিয়াছে। কেন জান? লোকে উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ওখানি কার এবং আমি তাহার নাম করিলে ধারণা করিবে মহিম চক্রবর্তী একটা মস্ত সাধক।"

মহিমের গুরু

দীক্ষাসম্বন্ধে কথা উঠিলে মহিম বাবু কখন বলিতেন, "আমার গুরুদেবের নাম আগমাচার্য্য ডমরুবল্লভ।" আবার কখন বলিতেন, "ঠাকুরের ন্যায় তিনিও পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত তোতাপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন! পশ্চিমে তীর্থপর্যটনকালে এক স্থানে তাহার দর্শন পাইয়াছিলাম এবং দীক্ষিত হইয়াছিলাম, ঠাকুরকে তিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে বলিয়াছেন এবং আমাকে জ্ঞানমার্গের সাধক হইয়া সংসারে থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য ঐকথা কতদূর সত্য তাহা তিনি স্বয়ং এবং সর্বান্তর্যামী পুরুষই জানিতেন।

মহিম বাবুর ধর্ম-সাধনা

সাধনার মধ্যে দেখা যাইত মহিম বাবু যখন তখন এবং যেখানে সেখানে একতারার সুরের সহিত গলা মিলাইয়া প্রণবোচ্চারণ, মধ্যে মধ্যে এক-আধটি উত্তরগীতাদি পুস্তকের শ্লোক পাঠ ও হুঁকারধ্বনি করিতেন। তিনি বলিতেন, উহাই সনাতন জ্ঞানমার্গের সাধনা, উহা করিলে অন্য কোনও সাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। উহাতেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া উঠিবে এবং ঈশ্বরদর্শন হইবে। মহিম বাবুর বাটীতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বোধ হয় প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রীপূজাও হইত–উহা হইতে অনুমিত হয় তিনি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি শাক্ত সাধনপ্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ তখন ইহাকে একখানি ছোট বগি-গাড়ীতে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে ওনা যাইত, 'তারা তত্ত্বমসি, ত্বমসি তৎ'। চক্রবর্তী মহাশয়ের অল্প-অল্প জমিদারী ছিল, তাহার আয় হইতেই তাহার সংসার নির্বাহ হইত।

শ্যামপুকুরে মহিমাচরণ

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান করিবার কালে মহিম বাবু দুই তিন বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের কহিত কুশল-প্রশ্নাদি করিবার পরে তিনি সাধারণের নিমিত্ত যে ঘর নির্দিষ্ট ছিল, তাহাতে আসিয়া বসিতেন এবং একতারা-সংযোগে মন্ত্রসাধনে এবং উহারই ভিতর মধ্যে মধ্যে অপরের সহিত ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার গৈরিকপরিহিত সুন্দর কান্তি, বিশাল বপু এবং বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে তখন তাহাকে আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন করিতে থাকিত। ঠাকুরও কখন কখন তাঁহাকে বলিতেন, "তুমি পণ্ডিত, (উপস্থিত সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগকে কিছু উপদেশ দাও গে।" কারণ কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহপূর্বক ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া নিজ নাম জাহির করাটা যে তাহার প্রাণের ইচ্ছা, একথা তাহার জানিতে বাকি ছিল না।

মহিম ও নরেন্দ্রের তর্ক

শ্যামপুকুরে আসিয়া মহিম বাবু একদিন ঐরূপে নানা কথা কহিতে লাগিলেন এবং অন্য সকল প্রকার সাধনোপায়কে হীন করিয়া তাহার অবলম্বিত সাধনপথই শ্রেষ্ঠ এবং সহজ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের যুবকভক্ত সকলে তাহার ঐ কথাসকল বিনা প্রতিবাদে শুনিতেছে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের আর সহ্য হইল না। তিনি বিপরীত তর্ক উত্থাপিত করিয়া মহিম বাবুর কথা অযুক্তিকর দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আপনার ন্যায় একতারা বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই যে ঈশ্বর-দর্শন উপস্থিত হইবে তাহার প্রমাণ কি?' উত্তরে মহিম বাবু বলিলেন, 'নাদই ব্রহ্ম, ঐ স্বরসংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হইবে, অন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই'। নরেন্দ্র বলিলেন, "ঈশ্বর আপনার সহিত ঐরূপ লেখা-পড়া করিয়াছেন না কি? অথবা ঈশ্বর মন্ত্রৌষধিবশ সর্পের ন্যায়-সুর চড়াইয়া হুম-হাম করিলেই অবশ হইয়া সুড়সুড়, করিয়া সম্মুখে নামিয়া আসিবেন!" বলা বাহুল্য, নরেন্দ্রনাথের তর্কের জন্য মহিম বাবুর প্রচার কার্যটা সেদিন বিশেষ জমিল না এবং তিনি ঐ দিবস শীঘ্র শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নরেন্দ্রের যথার্থ সাধকসকলকে সমান জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেওয়া

ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত যথার্থ সাধকসকলে যাহাতে ঠাকুরের ভক্ত দিগের নিকটে বিশেষ সম্মান পায়, তদ্বিষয়েও নরেন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, সাধারণে যেরূপে অপর সকলের নিন্দা এবং কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের সাধকসকলকেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, ঐরূপ করিলে ঠাকুরের 'যত মত তত পথ'-রূপ মতবাদের উপরে– সুতরাং ঠাকুরের উপরেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। শ্যামপুকুরে থাকিবার কালে ঐরূপ একটি ঘটনার কথা আমাদিগের স্মরণ হইতেছে–

খৃষ্টান ধর্মযাজক প্রভুদয়াল মিশ্র

প্রভুদয়াল মিশ্র নামক জনৈক খৃষ্টান ধর্মযাজক ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য একদিন উপস্থিত হইলেন। গেরুয়া পরিহিত দেখিয়া আমরা তাহাকে প্রথমে খৃষ্টান বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি যখন তাহার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন, তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি খৃষ্টান হইয়া গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে ঈশামসির উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে নিজ ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই কি আমাকে আমার পিতৃপিতামহাগত চালচলনাদি ছাড়িয়া দিতে হইবে? আমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং ঈশাকে ইষ্টদেবতারূপে অবলম্বন করিয়া নিত্য যোগাভ্যাস করিয়া থাকি। জাতিভেদে আমার বিশ্বাস না থাকিলেও যাহার-তাহার হস্তে ভোজনে যোগাভ্যাসের হানি হয়, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি এবং নিত্য স্বপাকে হবিষ্যান্ন খাইয়া থাকি। উহার ফলে খৃষ্টান হইলেও যোগাভ্যাসের ফল–যথা, জ্যোতিদর্শনাদি আমার একে একে উপস্থিত হইতেছে। ভারতের ঈশ্বরপ্রেমিক যোগীরা সনাতন কাল হইতে গৈরিক পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং উহাপেক্ষা আমার নিকটে অন্য কোন প্রকার বসন কি প্রিয়তর হইতে পারে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার প্রাণের কথাসকল ঐরূপে একে একে বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং সাধু ও যোগী জনিয়া তাহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আমাদিগকেও ঐরূপ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনেকেও উহাতে তাহার পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও তাঁহার সহিত একত্রে ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নদি ভোজন করিয়াছিল। ঠাকুরকে ইনি সাক্ষাৎ ঈশা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ব্যাধির বৃদ্ধি ও ভক্তগণের তাঁহাকে কাশীপুর লইয়া যাওয়া

ঐরূপে নরেন্দ্রনাথ যখন ঠাকুরের ভক্তগণকে সুপথে পরিচালিত করিতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরের শারীরিক ঠাকুরের ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। ডাক্তার সরকার পূর্বে যে-সকল ঔষধপ্রয়োগে স্বল্পাধিক ফল পাইয়া ছিলেন, ঐ সকল ঔষধে এখন আর কোন উপকার হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাতার দূষিত বায়ুর জন্য ঐরূপ হইতেছে স্থির করিয়া শহরের বাহিরে কোন বাগানবাটীতে ঠাকুরকে রাখিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন। তখন অগ্রহায়ণের অর্ধেক অতীত হইয়াছে। পৌষ মাসে ঠাকুর বাটী পরিবর্তন করিতে চাহিবেন না জানিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া ঐরূপ বাগানবাটীর অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে বরাহনগর-বাজারে যাইবার বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর (পূর্ব) পার্শ্বে অবস্থিত রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটী ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্য ভাড়া করিয়া লইলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার শিমুলিয়া পল্লীনিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত বাটীভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

বাটী স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়া শ্যামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইয়া উক্ত বাটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির এক দিবস পূর্বে অপরাহ্নে ভক্তগণ শ্যামপুকুরের বাসা হইতে ঠাকুরকে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে আনয়ন করিলেন এবং ফলপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষরাজিশোভিত ঐস্থানের মুক্তবায়ু, নির্জনতা প্রভৃতি দর্শনে ঠাকুরকে আনন্দিত দেখিয়া পরম চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন।

[1] 'লীলাপ্রসঙ্গ–গুরুভাব', উত্তরার্ধ, ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫.২১. পরিশিষ্ট: কাশীপুরের উদ্যান-বাটী

কাশীপুরের উদ্যান-বাটী

কলিকাতার উত্তরাংশে যে প্রশস্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে তাহার উপরেই কাশীপুরের উদ্যান-বাটী বিদ্যমান।

বাগবাজার পুলের উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত উদ্যানের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত কাশীপুরের চৌরাস্তা পর্যন্ত ঐ রাস্তার প্রায় উভয় পার্শ্বেই দরিদ্র মুটেমজুর-শ্রেণীর লোকসমূহের থাকিবার কুটীর এবং তাহাদিগেরই দৈনন্দিন জীবননির্বাহের উপযোগী দ্রব্যসভারপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকখানি ইষ্টকালয়-যথা, কয়েকটি পাটের গাঁট বাঁধিবার কুঠি, দাস কোম্পানির লৌহের কারখানা, রেলির কুঠি, দুই-একখানি উদ্যান বা বাসভবন ও কাশীপুরের চৌরাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পুলিসের ও অগ্নিভয়নিবার ইঞ্জিনাদি রক্ষার কুঠি এবং উহারই পশ্চিমে অনতিদূরে সর্বমঙ্গলা দেবীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির–যেন মানবদিগের মধ্যে বিষম অবস্থাভেদের সাক্ষ্যপ্রদান করিবার জন্যই দণ্ডায়মান। শিয়ালদহ রেলওয়ের উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় অধুনা আবার উক্ত রাস্তার ধারে অনেকগুলি টিনের ছাদসংযুক্ত গুদাম ইত্যাদি নির্মিত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্বে উহার যাহা কিছু সৌন্দর্য ছিল তাহারও অধিকাংশের বিলোপসাধন করিয়াছে। ঐরূপে ঐ প্রাচীন রাস্তাটি নয়নপ্রীতিকর হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে উহার কিছু মূল্য আছে। কারণ শুনা যায়, এই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াই নবাব সিরাজ গোবিন্দপুরের বৃটিশ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং বাগবাজার হইতে কিঞ্চিদধিক অর্ধ মাইল উত্তরে উহারই একাংশে মসীমুখ নবাব মীর্জাফরের এক প্রাসাদ এককালে অবস্থিত ছিল। ঐরূপে বাগবাজার হইতে কাশীপুরের চৌমাথা পর্যন্ত পথটি মনোদর্শন না হইলেও উহার পর হইতে বরাহনগরের বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত উহার অংশটি দেখিতে মন্দ ছিল না। উক্ত চৌমাথা হইতে উত্তরে স্বল্পদূর অগ্রসর হইলেই মতিঝিলের দক্ষিণাংশ এবং উহার বিপরীতে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে আমাদিগের পরিচিত মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সুন্দর বাসভবন তৎকালে দেখা যাইত। রেল কোম্পানি অধুনা উক্ত বাটীর চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানের অধিকাংশ ক্রয় করিয়া উহার ভিতর দিয়া রেলের এক শাখা গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া উহাকে এককালে শ্রীহীন করিয়াছে। ঐস্থান হইতে আরও কিছু দূর উত্তরে অগ্রসর হইলে বামে মতিঝিলের উত্তরাংশ এবং তদ্বিপরীতে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে কাশীপুর উদ্যানের উচ্চ প্রাচীর ও লৌহময় ফটক নয়নগোচর হয়। মতিঝিলের পশ্চিমাংশের পশ্চিমে অবস্থিত রাস্তার ধারে কয়েকখানি সুন্দর উদ্যানবাটী গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, তন্মধ্যে মতিলাল শীলের উদ্যানই–যাহা এখন কলিকাতা ইলেকট্রিক কোম্পানির হস্তগত হইয়া ইতিপূর্বের বিরাম ও সৌন্দর্যের ভাব হারাইয়া কর্ম ও ব্যবসায়ের ব্যস্ততা ও উচ্চ ধ্বনিতে সর্বদা মুখরিত রহিয়াছে–প্রশস্ত ও বিশেষ মনোজ্ঞ ছিল। মতি শীলের উদ্যানের উত্তরে তখন বসাকদিগের একখানি ভগ্ন বাসভবন গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। রাস্তা হইতে উক্ত জীর্ণ ভবনে যাইবার যে পথ ছিল তাহার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ ঝাউগাছের শ্রেণী বিদ্যমান থাকায় তখন এক অপূর্ব্ব শোভা ও দিব্যধ্বনি সর্বদা নয়ন ও শ্রবণের সুখ সম্পাদন

করিত। কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে ঠাকুরের নিকটে থাকিবার কালে আমরা উক্ত শীলমহাশয়দিগের উদ্যানে অনেক সময়ে গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিতাম এবং ঠাকুর ভালবাসিতেন বলিয়া ঘাটের ধারে অবস্থিত বৃহৎ গুলচি পুষ্পের গাছ হইতে কুসুম চয়ন করিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতাম। অনেক সময় আবার অপূর্ব ঝাউবৃক্ষরাজিশোভিত পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া বসাকদিগের জনমানবশূন্য উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকিতাম। ঐ উদ্যানের কিঞ্চিৎ উত্তরে প্রাণনাথ চৌধুরীর প্রশস্ত স্নানের ঘাট এবং তদুত্তরে সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নীর বিচিত্র গোপাল-মন্দির। ঐ স্থানেও আমরা কখন কখন স্নান এবং গোপালজীর দর্শন জন্য গমন করিতাম। রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর উদ্যানবাটীর সত্বাধিকারী ছিলেন। ভক্তগণ তাহারই নিকট হইতে উহা ঠাকুরের বাসের জন্য মাসিক ৮০ টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথমে ছয় মাসের এবং পরে আরও তিন মাসের অঙ্গীকার পত্র প্রদানে ভাড়া লইয়াছিল। ঠাকুরের পরমভক্ত শিমলাপল্লী নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রই উক্ত অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া ঐ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ না হইলেও কাশীপুরের উদ্যান-বাটি বেশ রমণীয়। পরিমাণে উহা চৌদ্দ বিঘা আন্দাজ হইবে। উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষা ঐ চতুষ্কোণ ভূমির প্রসার পূর্ব-পশ্চিমে কিছু অধিক ছিল এবং উহার চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উদ্যানের উত্তর সীমার প্রায় মধ্যভাগে প্রাচীরসংলগ্ন পাশাপাশি তিন চারিখানি ছোট ছোট কুঠরি রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে উদ্যানপথের অপর পার্শ্বে একখানি দ্বিতল বাসবাটী; উহার নীচে চারখানি এবং উপরে দুইখানি ঘর ছিল। নিম্নের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি দুইখানি ছোট ঘর, তন্মধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠনির্মিত সোপানপরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্বের ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের ঘরখানি—যাহার পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা ছিল—সেবক ও ভক্তগণের শয়ন উপবেশনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিম্নের হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপরিসর একখানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পপরিসর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কখন কখন পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সিঁড়ির ঘরের উপরের ছাদ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্নানাদির এবং দুই-একজন সেবকের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত।

বসতবাটীর পূর্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি সোপান বাহিয়া নিম্নের হলঘরে প্রবেশ করা যাইত এবং উহার চতুর্দিকে ইষ্টকনির্মিত সুন্দর উদ্যানপথ প্রায় গোলাকারে প্রসারিত ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উহার পশ্চিম দিকের প্রাচীরসংলগ্ন দ্বারবানের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ঘর এবং তদুত্তরে লৌহময় ফটক। ঐ ফটক হইতে আরম্ভ হইয়া গাড়ি যাইবার প্রশস্ত উদ্যানপথ পূর্বোত্তরে অর্থ চন্দ্রাকারে অগ্রসর হইয়া বসতবাটীর চতুর্দিকের গোলাকার পথে সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। বসতবাটীর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র ডোবা ছিল। হলঘরে প্রবেশ করিবার পশ্চিমের সোপানশ্রেণীর বিপরীতে উদ্যানপথের অপর পারে উক্ত ডোবাতে নামিবার সোপানাবলী বিদ্যমান ছিল। উদ্যানের উত্তর-পূর্ব কোণে উক্ত ডোবা অপেক্ষা একটি চারি-পাঁচগুণ বড় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে দুই-তিনখানি একতলা ঘর ছিল। তদ্ভিন্ন উদ্যানের উত্তর পশ্চিম কোণে পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র ডোবার পশ্চিমে আস্তাবল ঘর এবং উদ্যানের দক্ষিণ সীমার প্রাচীরের মধ্যভাগের সম্মুখেই মালীদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট দুইখানি পাশাপাশি অবস্থিত জীর্ণ ইষ্টকনির্মিত ঘর ছিল। উদ্যানের অন্য সর্ব্বত্র আম্র, পনস, লিচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষসমূহ ও উদ্যানপথসকলের উভয় পার্শ্ব পুষ্পবৃক্ষরাজিতে শোভিত ছিল এবং ডোবা ও পুষ্করিণীর পার্শ্বের ভূমির অনেক স্থল নিত্য আবশ্যকীয় শাকসবজী উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। আবার, বৃহৎ বৃক্ষসকলের অন্তরালে

মধ্যে মধ্যে শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড বিদ্যমান থাকিয়া উদ্যানের রমণীয়ত্ব অধিকতর বর্ধিত করিয়াছিল।

এই উদ্যানেই ঠাকুর অগ্রহায়ণের শেষে আগমনপূর্বক সন ১২৯১ সালের শীত ও বসন্তকাল এবং সন ১৯৯২ সালের গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ আট মাস কাল ব্যাধি যেমন প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন করিয়া শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত করিয়াছিল, তাহার সংযমসিদ্ধ মনও তেমনি উহার প্রকোপ ও যন্ত্রণা এককালে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগতভাবে ভক্তসংঘের মধ্যে যে কার্য ইতিপূর্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া প্রয়োজনমত তাহাদিগকে শিক্ষাদীক্ষাদি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নিজ সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যৎ কথা ভক্তগণকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, যথা "যাইবার (সংসার পরিত্যাগ করিবার) আগে হাটে হাঁড়ি ভাজিয়া দিব (অর্থাৎ নিজ দেব-মানবত্ব সকলের সমক্ষে প্রকাশিত করিব); "যখন অধিক লোকে (তাহার দিব্য মহিমার বিষয়) জানিতে পারিবে, কানাকানি করিবে তখন (নিজশরীর দেখাইয়া) এই খোলটা আর থাকিবে না, মা'র (জগন্মাতার) ইচ্ছায় ভাঙ্গিয়া যাইবে"; "(ভক্তগণের মধ্যে) কাহার অন্তরঙ্গ ও কাহারা বহিরঙ্গ তাহা এই সময়ে (তাহার শারীরিক অসুস্থতার সময়ে) নিরূপিত হইবে" ইত্যাদি–এই সকল কথার সাফল্য আমরা এখানে প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণসম্বন্ধী তাঁহার ভবিষ্যৎবাণীসকলের সফলতাও আমরা এই স্থানে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যথা-"মা তোকে (নরেন্দ্রকে) তাঁর কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন," "আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়, "এরা সব (বালক ভক্তগণ) যেন হোমা পাখীর শাবকের ন্যায়; হোমা পাখী আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া অণ্ড প্রসব করে, সুতরাং প্রসবের পরে উহার অণ্ডসকল প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে-ভয় হয় মাটিতে পড়িয়া চুর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হয় না, ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্বেই অণ্ড বিদীর্ণ করিয়া শাবক নির্গত হয় এবং পক্ষ প্রসারিত করিয়া পুনরায় উর্দ্ধে আকাশে উড়িয়া যায়; ইহারাও সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ হইবার পূর্বেই সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে।" তদ্ভিন্ন নরেন্দ্রনাথের জীবনগঠনপূর্বক তাঁহার উপরে নিজ ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষত বালক-ভক্তসকলের ভারাপণ করা ও তাহাদিগকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এই স্থানেই করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশীপুরের উদ্যানে সংসাধিত ঠাকুরের কার্যসকলের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল তাহা বলিতে হইবে না।

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল গুরুগম্ভীর কার্য্য যেখানে সংসাধিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি যাহাতে তাহার পুণ্য-স্মৃতি বক্ষে ধায়ণপূর্বক চিরকাল মানবকে ঐ সকল কথা স্মরণ করাইয়া বিমল আনন্দের অধিকারী করে তদ্বিষয়ে সকলের মনেই প্রবল ইচ্ছা স্বতঃজাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু হায়, ঐ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন অধুনা উদিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, উক্ত উদ্যান-বাটী রেল কোম্পানি হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং ঠাকুরের এই অপূর্ব লীলাস্থল যে শীগ্রই রূপান্তরিত হইয়া পাটের গুদাম বা অন্য কোনরূপ শ্রীহীন পদার্থে পরিণত হইবে তাহা বলিতে হইবে না।[1] কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যদি ঐরূপ হয় তাহা হইলে দুর্বল মানব আমরা আর কি করিতে পারি? অতএব 'যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্' বলিয়া ঐ কথার এখানে উপসংহার করি।

[1] আনন্দের বিষয় এই যে, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে কর্তৃপক্ষ এই উদ্যাননাটী ক্রয় করিয়া নিজেদের অধিকারে আনিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি এইখানে যথোচিত রক্ষিত হইবে।–প্রঃ

৫.২২. কাশীপুরে সেবাব্রত

কাশীপুরে সেবাব্রত

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, পৌষ মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঠাকুর অগ্রহায়ণ মাস সম্পূর্ণ হইবার দুই দিন পূর্বে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর উদ্যানে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় জনকোলাহল পূর্ণ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত শ্যামপুকুরের বাটী অপেক্ষা উদ্যানের বসতবাটীখানি অনেক অধিক প্রশস্ত ও নির্জন ছিল এবং উহার মধ্য হইতে যে দিকেই দেখ না কেন, বৃক্ষরাজির হরিৎপত্র, কুসুমের উজ্জ্বল বর্ণ এবং তৃণ ও শষ্পসকলের শ্যামলতা নয়নগোচর হইত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনায় উদ্যানের ঐ শোভা অকিঞ্চিৎকর হইলেও নিরন্তর চারি মাস কাল কলিকাতা বাসের পরে ঠাকুরের নিকটে উহা রমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার, দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরের বাটীতে যেরূপ রুদ্ধ, সঙ্কুচিতভাবে থাকিতে হইয়াছিল এখানে সেইভাবে থাকিতে হইবে না অথচ ঠাকুরের সেবা পূর্বের ন্যায়ই করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও যে আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাঁহাদিগের উভয়ের আনন্দে সেবকগণের মন প্রফুল্ল হইয়াছিল একথাও বলা বাহুল্য।

উদ্যানবাটীতে বাস করিতে উপস্থিত হইয়া যে-সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ অসুবিধা প্রথম প্রথম নয়নগোচর হইতে লাগিল সেই সকল দুর করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ঐ সকলের আলোচনায় নরেন্দ্র নাথ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের সেবার দায়িত্ব যাহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকেও চিকিৎসকগণের আবাস হইতে দূরে অবস্থিত এই উদ্যানবাটীতে থাকিতে হইলে লোকবল এবং অর্থবল উভয়েরই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। প্রথম হইতে ঐ দুই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্যে অগ্রসর না হইলে সেবার ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বলরাম, সুরেন্দ্র, রাম, গিরিশ, মহেন্দ্র প্রভৃতি যাহারা অর্থবলের কথা এ পর্যন্ত চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন তাহারা ঐ বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন এক উপায় নিশ্চয় স্থির করিবেন। কিন্তু লোকবলসংগ্রহে তাহাকেই ইতিপূর্বে চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইবে। ঐজন্য কাশীপুর উদ্যানে এখন হইতে তাহাকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। তিনি ঐরূপে পথ না দেখাইলে অভিভাবকদিগের অসন্তোষ এবং চাকরি ও পাঠহানির আশঙ্কায় যুবক-ভক্তদিগের অনেকে ঐরূপ করিতে পারিবে না। কারণ, ঠাকুরের শ্যামপুকুরে থাকিবার কালে তাহারা যেরূপে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিয়া আসিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হইতেছিল এখান হইতে সেইরূপ করা কখনই সম্ভবপর নহে।

আইন (বি.এল.) পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র ঐ বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলেন। উক্ত পরীক্ষার ও জ্ঞাতিদিগের শত্রুতাচরণে বাস্তুভিটার বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া

ছিল তদুভয়ের নিমিত্ত তাহার কলিকাতায় থাকা এখন একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও তিনি গুরুর সেবার নিমিত্ত ঐ অভিপ্রায় মন হইতে এককালে পরিত্যাগপূর্বক আইন-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি কাশীপুর উদ্যানে আনয়ন ও অবসরকালে যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন করিবেন, এইরূপ সংকল্প স্থির করিলেন। ঐরূপে সর্বাগ্রে ঠাকুরের সেবা করিবার সংকল্পের সহিত সুবিধামত ঐ বৎসর আইন-পরীক্ষা দিবার সংকল্পও নরেন্দ্রনাথের মনে এখন পর্যন্ত দৃঢ় রহিল। কারণ, অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ইতিপূর্বে স্থির করিয়া ছিলেন আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকটা বৎসরের পরিশ্রমে মাতা ও ভ্রাতাগণের জন্য মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের একটা সংস্থান করিয়া দিয়াই সংসার হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক ঈশ্বরসাধনায় ডুবিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, ঐরূপ শুভ সংকল্প ত আমরা অনেকেই করিয়া থাকি–সংসারের পশ্চাদাকর্ষণে এতদুর মাত্র গাত্র ঢালিয়াই বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সম্মুখে শ্রেয়ঃমার্গে অগ্রসর হইব এইরূপ ভাবিয়া কার্যারম্ভ আমরা অনেকেই করি, কিন্তু আবর্তে না পড়িয়া পরিণামে কয়জন ঐরূপ করিতে সমর্থ হই? উত্তমাধিকারিগণের অগ্রণী হইয়া ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভে সমর্থ হইলেও নরেন্দ্রনাথের ঐ সংকল্প সংসার-সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া কালে অন্য আকার ধারণ করিবে না ত?–হে পাঠক, ধৈর্য্য ধর, ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছাশক্তি নরেন্দ্রনাথকে কোথা দিয়া কি ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছা'ইয়াছিল তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

ঠাকুরের সেবার জন্য ভক্তগণ যাহা করিতেছিলেন সেই সকল কথাই আমরা এ পর্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে যাহাকে আমরা বেদ-বেদান্তের পারের তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত একযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন বিষয়সকলে এবং প্রত্যেক ভক্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে দেখিয়াছি, সেই ঠাকুর কি এইকালে নিজ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া সকল বিষয়ে সর্বদা ভক্তগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন? উত্তরে বলিতে হয়, তিনি চিরকাল যাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন সেই জগন্মাতার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ও একান্ত নির্ভর করিয়া এখনও ছিলেন এবং ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে যে প্রকারের যতটুকু সেবা গ্রহণ করিয়া ছিলেন তাহা লওয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার অভিপ্রেত ও তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত একথা পূর্ব হইতে জানিয়াই লইতেছিলেন। তাহার জীবনের আখ্যায়িকা বলিতে আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই ঐ বিষয়ের পরিচয় পাইব।

আবার ভক্তগণকৃত যে-সকল বন্দোবস্ত হার মনঃপূত হইত না সেই সকল তিনি তাহাদিগের জ্ঞাতসারে এবং যেখানে বুঝিতেন তাহারা মনে কষ্ট পাইবে সেখানে অজ্ঞাতসারে পরিবর্তন করিয়া লইতেন। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিবার কালে ঐজন্য বলরামকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, দশজনে চাঁদা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোঙ্গনের বন্দোবস্ত করিবে এটা আমার নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ, কারণ কখন ঐরূপ করি নাই। যদি বল, তবে দক্ষিণের কালীবাটীতে ঐরূপ করিতেছি কিরূপে, কর্তৃপক্ষেরা ত এখন নানা সরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলে মিলিয়া দেবসেবা চালাইতেছে?-তাহাতে বলি এখানেও আমায় চাঁদায় খাইতে হইতেছে না; কারণ রাসমণির সময় হইতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, পূজা করিবার কালে ৭ টাকা করিয়া মাসে মাসে যে মাহিনা পাইতাম তাহা এবং যতদিন এখানে থাকিব ততদিন দেবতার প্রসাদ আমাকে দেওয়া হইবে। সেজন্য এখানে আমি একরূপ পেন্সনে[1] খাইতেছি বলা যাইতে পারে। অতএব চিকিৎসার জন্য যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।" ঐরূপে কাশীপুরের উদ্যানবাটী যখন তাহার নিমিত্ত ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০) জানিতে পারিয়া তাহার 'ছাপোষা' ভক্তগণ উহা কেমন করিয়া বহন করিবে এই কথা ভাবিতে লাগিলেন; পরিশেষে ডষ্ট কোম্পানির মুৎসুদ্দি পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা অত টাকা চাদায় তুলিতে কেমন করিয়া পারিবে, অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।" সুরেন্দ্রনাথও করজোড়ে

'যাহা আজ্ঞা' বলিয়া ঐরূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। ঐরূপে পরে আবার একদিন তিনি দুর্বলতার জন্য গৃহের বাহিরে শৌচাদি করিতে যাওয়া শীঘ্র অসম্ভব হইবে আমাদিগকে বলিতেছিলেন। যুবক ভক্ত লাটু[2] ঐদিন তাহার ঐ কথায় ব্যথিত হইয়া সহসা করজোড়ে সরলগম্ভীর ভাবে "যে আজ্ঞা মশায়, আমি ত আপকার মেস্তর (মেথর) হাজির আছি" বলিয়া তাহাকে ও আমাদিগকে দুঃখের ভিতরেও হাসাইয়াছিল। যাহা হউক, ঐরূপে অনেক বিষয়ে ঠাকুর নিজ বন্দোবস্ত যথাযোগ্যভাবে নিজেই করিয়া লইয়া ভক্তগণের সুবিধা করিয়া দিতেন।

ক্রমে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল এবং যুবক ভক্তেরা সকলেই এখানে একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে, পরম আনন্দে কোথা দিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তাহা তাহাদিগের বোধগম্য হইতে লাগিল না। একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্র নাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ এক মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্যসত্য জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং নিতান্ত আবশ্যকে কেহ কোনদিন বাটীতে ফিরিলেও ঐ দিন সন্ধ্যায় অথবা পরদিন প্রাতে তাহার এখানে আসা এককালে অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ঐরূপে শেষ পর্যন্ত এখানে থাকিয়া যাহারা সংসারত্যাগে মেধাতের উদ্যাপন করিয়াছিল সংখ্যায় তাহারা দ্বাদশ[3] জনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ ও অসামান্য কর্মকুশল ছিল।

কাশীপুরে আসিবার কয়েক দিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চতুঃপার্শ্ব উদ্যানপথে অল্পক্ষণ পাদচারণ করিয়াছিলেন। নিত্য ঐরূপ করিতে পারিলে শীঘ্র সুস্থ ও সবল হইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের শীতল বায়ুস্পর্শে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কারণে পরদিন অধিকতর দুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা দুই-তিন দিনেই কাটিয়া যাইল, কিন্তু দুর্বলতা-বোধ দূর না হওয়ায় ডাক্তারেরা তাহাকে কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া খাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উহা ব্যবহারে কয়েক দিনেই পূর্বোক্ত দুর্বলতা অনেকটা হ্রাস হইয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক একপক্ষকাল পর্যন্ত তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও এই সময়ে একদিন তাহাকে দেখিতে আসিয়া ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের সংবাদ চিকিৎসককে প্রদান করিতে এবং পথ্যের জন্য মাংস আনিতে যুবক সেবকদিগকে নিত্য কলিকাতা যাইতে হইত। একজনের উপরে উক্ত দুই কার্য্যের ভার প্রথমে অর্পণ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায়ই বিশেষ অসুবিধা হইত দেখিয়া এখন হইতে নিয়ম করা হইয়াছিল, নিত্য প্রয়োজনীয় ঐ দুই কার্যের জন্য দুইজনকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কলিকাতায় অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলে ঐ দুইজন ভিন্ন অপর একব্যক্তি যাইবে। তদ্ভিন্ন বাটা ঘর পরিষ্কার রাখা, বরাহনগর হইতে নিত্য বাজার করিয়া আনা, দিবাভাগে ও রাত্রে ঠাকুরের নিকটে থাকিয়া তাহার আবশ্যকীয় সকল বিষয় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য পালাক্রমে যুবক-ভক্তেরা সম্পাদন করিতে লাগিল এবং নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের প্রত্যেকের কার্যের তত্ত্বাবধান এবং সহসা উপস্থিত বিষয়সকলের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন।

ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার কিন্তু পূর্বের ন্যায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর হস্তেই রহিল। সাধারণ পথ্য ভিন্ন বিশেষ কোনরূপ খাদ্য ঠাকুরের জন্য ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকের নিকট হইতে উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া গোপালদাদা প্রমুখ দুই-এক জন, যাহাদের সহিত তিনি নিঃসঙ্কোচে বাক্যালাপ করিতেন তাহারা যাইয়া তাহাকে উক্ত প্রণালীতে পাক করিতে বুঝাইয়া দিত। পথ্য প্রস্তুত করা ভিন্ন মাতা ঠাকুরাণী মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে এবং সন্ধ্যার কিছু

পরে ঠাকুর যাহা আহার করিতেন তাহা স্বয়ং লইয়া যাইয়া তাহাকে ভোজন করাইয়া আসিতেন। রন্ধনাদি সকল কার্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে এবং তাহার সঙ্গিনীর অভাব দূর করিবার জন্য ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে এই সময়ে আনাইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকটে রাখা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাহারা সর্বদা যাতায়াত করিতেন সেই সকল স্ত্রীভক্তগণের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কয়েক ঘণ্টা হইতে কখন কখন দুই-এক দিবস পর্যন্ত থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐরূপে কিঞ্চিদধিক সপ্তাহকালের মধ্যেই সকল বিষয় সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

গৃহী ভক্তেরাও ঐকালে নিশ্চিন্ত রহেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র অথবা গিরিশচন্দ্রের বাটীতে সুবিধামত সম্মিলিত হইয়া ঠাকুরের সেবায় কে কোন বিষয়ে কতটা অবসরকাল কাটাইতে এবং অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। সকল মাসে সকলের সমভাবে সাহায্য প্রদান করা সুবিধাজনক না হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহারা প্রতি মাসেই দুই একবার ঐরূপে একত্রে মিলিত হইয়া সকল বিষয় পূর্ব হইতে স্থির করিবার সঙ্কল্পও এই সময়ে করিয়াছিলেন।

যুবক-ভক্তদিগের অনেকেই সকল কার্যের শৃঙ্খলা না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাটীতে স্বল্পকালের জন্যও গমন করে নাই। নিতান্ত আবশ্যকে যাহাদিগকে যাইতে হইয়াছিল তাহারা কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়াছিল এবং বাটীতে সংবাদটাও কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাহারা পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে বাটীতে আসিতে ও থাকিতে পারিবে না। কাহারও অভিভাবক যে ঐ কথা জানিয়া প্রসঙ্গচিত্তে ঐ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন নাই, ইহা বলিতে হইবে না। কিন্তু কি করিবেন, ছেলেদের মাথা বিগড়াইয়াছে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে না ফিরাইলে হিত করিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা—এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগের ঐ আচরণ কিছুদিন কোনরূপে সহ্য করিতে এবং তাহাদিগকে ফিরাইবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঐরূপে গৃহী এবং ব্রহ্মচারী ঠাকুরের উভয় প্রকারের ভক্ত সকলেই যখন একযোগে দৃঢ়নিষ্ঠায় সেবাব্রতে যোগদান করিল এবং সুবন্দোবস্ত হইয়া সকল কার্য্য যখন সুশৃঙ্খলার সহিত যন্ত্রপরিচালিতের ন্যায় নিত্য সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন নরেন্দ্রনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন এবং শীঘ্রই দুই-এক দিনের জন্য নিজবাটীতে যাইবার সংকল্প করিলেন। রাত্রিকালে আমাদিগের সকলকে ঐ কথা জানাইয়া তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং গোপাল প্রমুখ আমা দিগের দুই একজনকে জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন, "চল, বাহিরে উদ্যানপথে পাদচারণ ও তামাকু সেবন করি"। বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষায় সংকল্প করিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে? সময় থাকিতে তাহার সেবা ও ধ্যান-ভজন করিয়া যে যতটা পারি আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নে, নতুবা তিনি সরিয়া যাইলে পশ্চাত্তাপের অবধি থাকিবে না। এটা করিবার পরে ভগবানকে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইলে সাধন-ভজনে লাগিব, এইরূপেই ত দিনগুলা যাইতেছে এবং বাসনাজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। ঐ বাসনাতেই সর্বনাশ, মৃত্যু– বাসনা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।"

পৌষের শীতের রাত্রি নীরবতায় ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। উপরে অনন্ত নীলিমা শত সহস্র নক্ষত্রকে ধরার দিকে স্থিরদৃষ্ট নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। নীচে সুর্যের প্রখর কিরণসম্পাতে উদ্যানের বৃক্ষতলসফল শুষ্ক এবং সম্প্রতি সুস্থ হওয়ায় উপবেশনযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণ, ধ্যানপরায়ণ মন যেন বাহিরের ঐ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আর পদচারণ না করিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তৃণপল্লব ও ভগ্ন বৃক্ষ শাখাসমূহের একটি শুষ্ক স্তূপ নিকটেই রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "দে উহাতে অগ্নি লাগাইয়া, সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া থাকে, আর আমরাও ঐরূপে ধুনি জ্বালাইয়া অন্তরের নিভৃত বাসনাসকল দগ্ধ করি।" অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং চতুর্দিকে অবস্থিত পূর্বোক্ত শুষ্ক ইন্ধনস্তূপসমূহ টানিয়া আনিয়া আমরা উহাতে আহুতি

প্রদানপূর্বক অন্তরের বাসনাসমূহ হোম করিতেছি এই চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া অপূর্ব উল্লাস অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন সত্যসত্যই পার্থিব বাসনাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া মন প্রসন্ন নির্মল হইতেছে ও শ্রীভগবানের নিকটবর্তী হইতেছি! ভাবিলাম তাই ত কেন পূর্বে এইরূপ করি নাই, ইহাতে এত আনন্দ! এখন হইতে সুবিধা পাইলেই এইরূপে ধুনি জালাইব। ঐরূপে দুই-তিন ঘণ্টা কাল কাটিবার পরে, যখন আর ইন্ধন পাওয়া গেল না তখন অগ্নিকে শান্ত করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম। রাত্রি তখন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। যাহারা আমাদিগের ঐ কার্যে যোগদান করিতে পারে নাই প্রভাতে উঠিয়া তাহারা যখন ঐ কথা শুনিল তখন তাহাদিগকে ডাকা হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাতে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য বলিলেন "আমরা ত পূর্ব হইতে অভিপ্রায় করিয়া ঐ কার্য্য করি নাই এবং অত আনন্দ পাইব তাহাও জানিতাম না, এখন হইতে অবসর পাইলেই সকলে মিলিয়া ধুনি জ্বালাইব, ভাবনা কি।"

পূর্বকথামত প্রাতেই নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া যাইলেন এবং একদিন পরেই কয়েকখানি আইনপুস্তক লইয়া পুনরায় কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

[1] পেন্সনে না বলিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পেন্সিলে খাইতেছি।"

[2] স্বামী অদ্‌ভুতানন্দ নামে অধুনা ভক্তসংঘে সুপরিচিত। ইনি ছাপরানিবাসী ছিলেন। বাঙ্গালা বুঝিতে সমর্থ হইলেও ঐ ভাষায় কথা কহিতে ইহার নানাপ্রকার বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়া বালকের কথার ন্যায় সুমিষ্ট শুনাইত।

[3] পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ঐ দ্বাদশ জনের নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপাল দাদা (যুবকভক্তদিগের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন), কালী, শশী, শরৎ এবং (হুট্‌কো) গোপাল। সারদার পিতার নির্ব্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই-এক দিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। হরিশের কয়েক দিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিয়া মস্তিষ্কের বিকার জন্মে। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা-যাওয়া করিত; তদ্ভিন্ন অন্য দুইজন অল্পদিন পরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হইয়া তাহার বাটীতেই থাকিয়া গিয়াছিল।

৫.২৩. আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

কাশীপুরের উদ্যানে আসিবার কয়েক দিন পরে ঠাকুর যেরূপে একদিন নিজ কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানপথে অল্পক্ষণের জন্য পাদচারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বে বলিয়াছি। উহাতে দুর্বল বোধ করায় প্রায় এক পক্ষকাল তিনি আর ঐরূপ করিতে সাহস করেন নাই। ঐ কালের মধ্যে তাহার চিকিৎসার না হইলেও চিকিৎসকের পরিবর্তন হইয়াছিল। কলিকাতার বহুবাজার-পল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রুর দত্তের বংশে জাত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা সহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইহার সহিত মিলিত হইয়াই হোমিও-মতের সাফল্য ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গমপূর্বক ঐ প্রণালী-অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ব্যাধির কথা রাজেন্দ্র বাবু লোকমুখে শ্রবণ করিয়া এবং তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিলে হোমিওপ্যাথির সুনাম অনেকের নিকটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া চিন্তা ও অধ্যয়নাদিসহায়ে ঐ ব্যাধির ঔষধও নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের সহিত ইনি পরিচিত ছিলেন। আমাদের যতদুর স্মরণ হয়, অতুলকৃষ্ণকে একদিন এই সময়ে কোন স্থানে দেখিতে পাইয়া তিনি সহসা ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসাপূর্বক তাহাকে চিকিৎসা করিবার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং বলেন, "মহেন্দ্রকে বলিও আমি অনেক ভাবিয়া চিলি একটা ঔষধ নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছি, সেইটা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাইবার আশা রাখি, তাহার মত থাকিলে সেইটা আমি একবার দিয়া দেখি।" অতুলকৃষ্ণ ভক্তগণকে এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে ঐ বিষয় জানাইলে উহাতে কাহারও আপত্তি না হওয়ায় কয়েকদিন পরেই রাজেন্দ্র বাবু ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং ব্যাধির আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণপূর্বক লাইকোপোডিয়াম (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ উপকার অনুভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন।

ক্রমে পৌষমাসের অর্ধেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐ দিন বিশেষ সুস্থ বোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের দিন বলিয়া সেদিন গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবার কিছু পরেই একে একে অথবা দলবদ্ধ হইয়া উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপে অপরাহ্ন ৩টার সময় ঠাকুর যখন উদ্যানে বেড়াইবার জন্য উপর হইতে নীচে নামিলেন তখন ত্রিশ জনেরও অধিক ব্যক্তি গৃহমধ্যে অথবা উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলের তলে বসিয়া পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি নিম্নের হলঘরের পশ্চিমের দ্বার দিয়া উদ্যানপথে নামিয়া দক্ষিণমুখে ফটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। ঐরূপে বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েকজনকে পশ্চিমের বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে প্রণাম করিয়া সানন্দে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া উর্দ্ধমুখে করজোড়ে গদ্গদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাস-বাল্মীকি যাহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি!" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ

হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।" ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহীন তাহার সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহারা দেশ-কাল ভুলিল, ঠাকুরের ব্যাধি ভুলিল, ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতিপূর্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিল এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন! তাহাকে প্রণাম ও তাহার পদধূলি গ্রহণের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং জয়রবে দিক মুখরিত করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। ঐরূপে প্রণাম করিবার কালে ঠাকুরের করুণাব্ধি আজি বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপূত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অর্ধবাহ্যদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাহার ঐরূপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা বুঝিল আজি হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা শুদ্ধ তাহাদিগের নিকট নহে কিন্তু সংসারে কাহারও নিকটে আর লুক্কায়িত রাখিবেন না এবং পাপী তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করিবে-নিজ নিজ ত্রুটি, অভাব ও অসামর্থ্য-বোধ হইতে তদ্বিষয়ে ও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং ঐ অপূর্ব ঘটনায় কেহবা বা নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা গৃহমধ্যস্থ সকলকে ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইবার জন্য চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আবার কেহ পুষ্পচয়নপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঙ্গে উহা নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঐরূপ হইবার পরে ঠাকুরের ভাব শান্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণও পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং অদ্যকার উদ্যান-ভ্রমণ ঐরূপে পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে নিজ কক্ষে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অদ্যকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমা দিগের বোধ হয়, উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্ম প্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর ত ঐরূপ করেন নাই, নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্বিচারে অভয়াশ্রয়প্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনায় সুব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যে-সকল ব্যক্তি অদ্য তাহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিল তাহাদিগের ভিতর হারাণচন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, হারাণ প্রণাম করিবামাত্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার মস্তকে নিজ পাদপদ্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐরূপে কৃপা করিতে আমরা তাহাকে অল্পই দেখিয়াছি।[1] ঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় ঐদিন ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাদিগকে বলিয়া ছিলেন, "ইতিপূর্বে ইষ্ট-মূর্তির ধ্যান করিতে বসিয়া তাহার শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ম দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্যন্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, ঐচরণ দেখিতে পাইতাম না, ঐরূপে যাহা দেখিতাম তাহাকে সজীব বলিয়াও মনে হইত না, অন্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইষ্টমূর্তি হৃদয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল।"

অদ্যকার ঘটনাস্থলে যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের আট দশ জনের নামই মাত্র আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, যথা-গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়। 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্ত গণের একজনও ঐদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহাদিগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদি ভিন্ন পূর্বরাত্রে অধিকক্ষণ সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়া গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। লাটু ও শরৎ জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বিতলের ছাদ হইতে ঐ ঘটনা দেখিতে পাইলেও স্বেচ্ছায় ঘটনাস্থলে গমন করে নাই। কারণ, ঠাকুর উদ্যানে পাদচারণ করিতে নীচে নামিবামাত্র তাহারা ঐ অবকাশে তাহার শয্যাদি রৌদ্রে দিয়া ঘরখানির সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কর্তব্য কার্য্য অর্ধনিষ্পন্ন করিয়া ফেলিয়া যাইলে ঠাকুরের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তাহাদিগের ঘটনাস্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও অনেক জনকে আমরা অদ্যকার অনুভবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই বিষয়ের উপসংহার করিব। বৈকুণ্ঠনাথ আমাদিগের সমসাময়িক কালে ঠাকুরের পুণ্য-দর্শনলাভ করিয়াছিল। তদবধি ঠাকুর তাহাকে উপদেশাদি প্রদানপূর্বক যে ভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলেন তদ্বিষয়ের কোন কোন কথা আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গের' স্থলে স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। মন্ত্রদীক্ষাদানে ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। তদবধি সে সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ছিল। ঠাকুরের কৃপা ভিন্ন ঐ বিষয়ে সফলকাম হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া সে তাহার নিকটেও মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময়ে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন এবং পরে কাশীপুরে গমনরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল। ঐ কালের মধ্যেও বৈকুণ্ঠনাথ অবসর পাইয়া দুই-তিন বার ঠাকুরকে নিজ মনোগত বাসনা নিবেদন করিয়াছিল। ঠাকুর তাহাতে প্রসন্নহাস্যে তাহাকে শান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "রোস্ না, আমার অসুখটা ভাল হউক, তাহার পর তোর সব করিয়া দিব।"

অদ্যকার ঘটনাস্থলে বৈকুণ্ঠনাথ উপস্থিত ছিল। ঠাকুর ভক্ত দিগের মধ্যে দুই-তিন জনকে দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে কৃতার্থ করিবামাত্র সে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ভক্তিভরে প্রণামপুরঃসর বলিল, "মহাশয়, আমায় কৃপা করুন।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার ত সব হইয়া গিয়াছে।" বৈকুণ্ঠ বলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন হইয়াছে তখন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি যাহাতে উহা অল্পবিস্তর বুঝিতে পারি তাহা করিয়া দিন"। ঠাকুর তাহাতে "আচ্ছা" বলিয়া ক্ষণেকের জন্য সামান্য ভাবে আমার বক্ষস্থল স্পর্শ করিলেন মাত্র। উহার প্রভাবে কিন্তু আমার অন্তরে অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আকাশ, বাড়ী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি যেদিকে যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম তাহারই ভিতরে ঠাকুরের প্রসন্ন হাস্যদীপ্ত মূর্তি দেখিতে লাগিলাম। প্রবল আনন্দে এককালে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম এবং ঐ সময়ে তোমাদের ছাদে দেখিতে পাইয়া 'কে কোথায় আছিস এই বেলা চলে আয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকিলাম। কয়েক দিন পর্যন্ত আমার ঐরূপ ভাব ও দর্শন জাগ্রতকালের সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিল। সকল পদার্থের ভিতর ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। অফিসে বা কর্ম্মান্তরে অন্যত্র যথায় যাইতে লাগিলাম তথায়ই ঐরূপ হইতে থাকিল। উহাতে উপস্থিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে না পারায় ক্ষতি হইতে লাগিল এবং কর্মের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া উক্ত দর্শনকে কিছুকালের জন্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ করিতে পারিলাম না। অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়া কেন উহা প্রতিসংহারের জন্য তাহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিদাভাস হৃদয়ঙ্গম হইল। মুক্ত পুরুষেরা সর্ব্বদা একরস হইয়া থাকেন ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ হওয়ায় কতটা নির্বাসনা হইলে মন উক্ত একরসাবস্থায় থাকিবার সামর্থ্য লাভ করে তাহার কিঞ্চিদাভাসও

এই ঘটনায় বুঝিতে পারিলাম। কারণ, কয়েক দিন যাইতে না যাইতে ঐরূপে একই ভাবে একই দর্শন ও চিন্তাপ্রবাহ লইয়া থাকা কষ্টকর বোধ হইল। কখন কখন মনে হইতে লাগিল, পাগল হইব না কি? তখন ঠাকুরের নিকটে আবার সভায় প্রার্থনা করিতে লাগিলাম ‘প্রভু, আমি এই ভাবধারণে সক্ষম হইতেছি না, যাহাতে ইহার উপশম হয় তাহা করিয়া দাও’। হায়, মানবের দুর্বলতা ও বুদ্ধিহীনতা! এখন ভাবি কেন ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম-কেন তাহার উপর বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐ ভাবে চরম পরিণতি দেখিবার জন্য ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি নাই?-না হয় উন্মাদ হইতাম; অথবা দেহের পতন হইত। কিন্তু ঐরূপ প্রার্থনা করিবার পরেই উক্ত দর্শন ও ভাবের সহসা এক দিবস বিরাম হইয়া গেল! আমার দৃঢ় ধারণা, যাহা হইতে ঐ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহার দ্বারাই উহা শান্ত হইল। তবে ঐ দর্শনের একান্ত বিলয়ের কথা আমার মনে উদিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি কৃপা করিয়া উহার এইটুকু অবশেষ মাত্র রাখিয়াছিলেন যে, দিবসের মধ্যে যখন-তখন কয়েকবার তাঁহার সেই দিব্যভাবোদ্দীপ্ত প্রসন্ন মূর্তির অহেতুক দর্শনলাভে আনন্দে স্তম্ভিত ও কৃতকৃতার্থ হইতাম।”

[1] বেলিয়াঘাটানিবাসী হারাশচন্দ্র কলিকাতার ফিনলে মিওর কোম্পানীর আফিসে কর্ম করিতেন। ঠাকুরের কৃপার স্মরণার্থ তিনি ইদানীং প্রতি বৎসর মহোৎসব করিতেন। স্বল্পদিন হইল দেহরক্ষাপুর্বক তিনি অভয়ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।